স্বাগতম

শারদীয়

মহানগর

শারদীয়

অক্টোবর, ১৯৮৫

সম্পাদক

দিব্যেন্দু সিংহ

প্রধান সহযোগী সম্পাদক

[illegible] বসিন

সহ-সম্পাদক

[illegible] ভট্টাচার্য

অলংকরণ

[illegible]

সার্কুলেশান:

[illegible]

জেনারেল ম্যানেজার

[illegible]

দাম : ১৪-০০ টাকা।

বিমান মাশুল : ২-০০ টাকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শারদীয়া সংখ্যা
১৩৯২
1985

উপন্যাস

হিরোসিমা-নাগাসাকি ● চাণক্য সেন
যুগ সন্ধার ● হৃষীকেশ ভট্টাচার্য

দীর্ঘ কবিতা

ইতিহাস কালের দিকে ● সিদ্ধেশ্বর সেন ১৭
কংকোল কাহিনী ● সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৮৯
তুষার, সে তো জলের ধূলিকণা ● উৎপলকুমার বসু ১৮
কাকে খোঁজা কতক্ষণ খোঁজা ● সুরজিৎ ঘোষ ৭৪

কবিতা

গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা ● শক্তি চট্টোপাধ্যায়/মুকুল গুহ ১১৮

নেই ● বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হঠাৎ হঠাৎ ● নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কালের অভয় ● আল মাহমুদ
সন্ধের ল্যাণ্ডস্কেপ ● প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
আমাদের এই শহর ● গৌরাঙ্গ ভৌমিক
স্মৃতির লতাবিতান ঘিরে ● কৃষ্ণ ধর
উঠে দেখি ● রত্নেশ্বর হাজরা
স্বপ্নাদ্য ● কবিরুল ইসলাম
তোমার মুখের দিকে ● নচিকেতা ভরদ্বাজ
নাবালিকা ● সাধনা মুখোপাধ্যায়
ফিরে আসব ● অভিজিৎ সেনগুপ্ত
সে ● পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
জেগে ওঠে বোস ● বিজয়া মুখোপাধ্যায়
যেভাবে জীবাশ্ম থেকে ● ব্রততী সিংহরায়
লোকতীর্ণ আশ্রিত গোলাপ, তুমি ● দাউদ হায়দার
শুধু একা মেঘ ● দেবারতি মিত্র
ভ্রমণ বিলাস ● চিন্ময় গুহঠাকুরতা
পড়ন্ত বিকেলে মানুষই পারে ● ইশিতা ভাদুড়ী ১৮১

বেতালা বৈঠক

[redacted]ঘনক/জবর খবর ১৯৩

আগামী সংখ্যা

দীপাবলী
সংখ্যা

প্রকাশিত
হবে
নভেম্বরের
প্রথম সপ্তাহে

এক'শ বছর ধরে
চুলের যত্ন নিয়ে
চলেছে

ঘন কালো চুলই আপনার সৌন্দর্য্য। সজীবতা, লাবণ্য, চল—সব মিলিয়ে চুলের সৌন্দর্য্য, যা বজায় রাখতে দরকার একটু যত্ন আর চুলের পুষ্টি। ধুলোবালি, ধোঁয়া, কড়ারোদ চুলের ক্ষতি করে তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুল হয় বিবর্ণ, মাথায় জমে খুস্কি ফলে চুল ঝরে পড়তে থাকে। তাই সময় থাকতে যত্ন নিন। শুধু তেলই নয় আপনার দরকার উঁচু জাতের ভেষজ তেল যার নাম লক্ষ্মীবিলাস। প্রাকৃতিক উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে তৈরী বলে চুলের পুষ্টি জোগাতে যা দরকার সবই লক্ষ্মীবিলাসে আছে। তাই একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে চুলের যত্ন নিতে লক্ষ্মীবিলাস আপনাদের প্রিয়।

লক্ষ্মীবিলাস

আয়ুর্বেদীয় কেশতৈল

এম, এল, বসু এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
৬১, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

ABC/MLB 1/83

নিখিলেন্দু সিংহ
সম্পাদক

মহানগর
১৩ বীরু স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা
লেখক-লেখিকা
বিজ্ঞাপনদাতা

বিষয়:মহানগর

শারদীয় মহানগরে এবারে কি দিতে পেরেছি এবং কি দিতে পারিনি, তা জানাতেই এই ঘরোয়া চিঠির অবতারণা। প্রসঙ্গক্রমে হয়তো বা কখনো-সখনো তারই মধ্যে অনুল্লেখ করেছে সাধারণ সংখ্যা মহানগরের কথা, কিন্তু তাও অনুল্লেখ্য নয়; এবং তা আপনাদের, মহানগরের বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকা, মরমী লেখক-লেখিকা ও সহানুভূতিশীল বিজ্ঞাপনদাতাদের যাঁরা অনিয়মিত মহানগরকে এখনো ভালবাসেন এবং তার আবির্ভাবের অপেক্ষা করেন, জেনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। সম্পাদকীয় কলমে যা লেখা হয়, সঙ্গত কারণেই তা বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না, এবং সেখানে আজ, এই চিঠিতে যা ব্যক্ত করতে চলেছি, তা বলা যায় না। আপনাদের কাছে অনুরোধ, মহানগরের ভেতরে প্রবেশ করার আগে এই প্রতিবেদনটি তার প্রাপ্য অভিনিবেশ সহকারে পড়বেন। একথাও অসমীচীন নয় এবং তা জানিয়ে রাখা ভাল যে, এটি আপনাদের কাছে লেখা আমার একটি ব্যক্তিগত চিঠি মাত্র এবং তার বেশি কিছু নয়। ব্যক্তিগত এ কারণে, যে এ চিঠির কোনও অংশে হিংসা, আক্রোশ, বঞ্চনা, প্রত্যাশা, হতাশা এবম্বিধ নানা স্বভাবসুলভ মানবিক কিছু প্রবৃত্তির প্রকাশ থাকতে পারে। কিন্তু তা স্বাভাবিক।

মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে প্রবাহমান চিন্তার উষ্ণ স্রোত এবং সে কারণে, সেই অবস্থিতে ঘুমোতে পারছি না। দ্রুত ধাবমান প্রতিটি শব্দকে লিপিবদ্ধ না করা পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই। আগামী কাল সকালে নয়, আজই, এই মধ্যরাত্রে আমাকে তা লিখে ফেলতে হবে। এবং যা লিখছি, ঘড়িও এখন রাত্রি দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট এবং নিদ্রা বটিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তন্দ্রাহীন, তা পূর্ণ সজ্ঞানে এবং সচেতন ভাবে।

প্রথমে জানাই মহানগর কেন অনিয়মিত? আপনাদের অনেকেরই জানা আছে যে মহানগর পত্রিকা সম্পূর্ণভাবে আমার ব্যক্তিগত উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। আমি একজন স্থপতি। আমার নিজস্ব একটি উপদেষ্টা সংস্থা আছে এবং সেই উপার্জনের অতিরিক্ত অর্থ আমি কোথাও জমি কিনে বাড়ি তুলে তাকে মূল্যবান গৃহে অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সজ্জিত করায় ব্যয় না করে, মহানগরে তা উজাড় করে দিয়েছি। সাংসারিক বুদ্ধিহীন হিতৈষীজনেরা সেকারণে আমাকে উন্মাদ, এই বিশেষণে ভূষিত করে পরিতৃপ্ত হন। হতকথা। এবং এই উপার্জন স্বতঃসলিলা নয়, কখনো কখনো তা সরকারি কারণে বাধাপ্রাপ্ত এবং ব্যাহত হয়। মার খায় না ঠিকই, কিন্তু যে সময়ে তার প্রয়োজন, সে সময় তিনি অনুপস্থিত থাকেন।

আর তাছাড়া এই পত্রিকার পেছনে কোনও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বা ধনাঢ্য ব্যক্তিবিশেষের কোনও অনুদান নেই। উনিশশ' বিয়াশির জানুয়ারি যেদিন এই পত্রিকার অসাধারণ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তার সপ্তাহখানেক পরে শুনেছিলাম কেউ কেউ সকৌতুক মন্তব্য করেছিলেন যে, এর পেছনে বহুপরিচিত বিদেশী সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য কাজ করছে! সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, সৌভাগ্যে এ অধম বঞ্চিত। ছলে, মন্দ কী?

ঠিক কথাযে, অনিয়মিত হলেও মহানগর তার বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্যতা বজায় রেখে চলেছে। এবং যেহেতু সে তার জন্মমুহূর্ত থেকে বিদ্রোহী, প্রচলিত গতানুগতিক দিনপঞ্জি পালকর অথবা প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সাহিত্য সে আজও পরিবেশন করেনি এবং প্রয়োজন মাফিক সে তার খোলনলচে অথবা মুখোশ বদলায়নি, এবং রাশিফল বা পাঁজি ছাপায় তার তীব্র অনীহা, তাই একথা জোর গলায় জানাতে দ্বিধা করবো না: মহানগর—মহানগর। তার কোন বিকল্প নেই। নবীন কোনও পত্রিকা প্রবীণকে অনুসরণ করতেই পারে, কিন্তু প্রবীণ নবীনের অনুসারী, একথা একমাত্র মহানগর প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য।

অবশ্য তা নয়ই বা কেন? বৃদ্ধ যযাতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর তাছাড়া স্বয়ং চার্লস ডারউইন যা বলে গেছেন এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেই যা সঙ্গত তা এখানে উল্লেখনীয়। সাধারণ এবং নিতান্তই শ্রেয়ী সেই কথাটি। এই জগতে কিছুই অবিনশ্বর নয়। জাতেস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। At birth our death is seated, and our end is consequent up on our begining.—Marcus manilius. আর Death, like birth, is a secret of nature—Marcus Aurelius Antoninus. জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? এ আমাদের জানা। আমি মনে করি, প্রতিটি বস্তুই, সজ্ঞান অথবা নিষ্প্রাণ, তা সে যাই হোক না কেন, সাম্রাজ্য, বাণিজ্য সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, তার প্রাকৃতিক সুনির্দিষ্ট পথেই শৈশব থেকে কৈশোরে উপনীত হয়, তারপর তেজস্বী যৌবন প্রাপ্তি, ক্রমশঃ প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং শেষে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে তার পরিণতি। এ নির্মম। এই নিয়ম। এ অমোঘ। এই নিয়তি। এ অস্বীকার করে কোন মূর্খ? এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। নেই কোনও উদাহরণ। সম্প্রতি শল্য চিকিৎসায় প্রত্যঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব হলেও, কোন্ বহুবিদ, পাণ্ডিত্যের পূর্ণ প্রত্যয়ে প্রকৃতির এ বিধান অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখেন? এবং যযাতির দীর্ঘায়ু বলিবা সম্ভব প্রত্যঙ্গ পরিবর্তনের সহায়তায়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিময় অথচ অধুনে জরাজীর্ণ সেই যযাতিতে আমাদের নিয়ন্তর নানা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। অশীতি অতিক্রান্ত এক বৃদ্ধকে জানি: কুঞ্চিত তার চর্মাবরণ, শরীর ন্যুব্জ, বয়সের স্বাভাবিক ব্যাধিতে সে আক্রান্ত, পরকলা পরাবৃত তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, কপালে অজস্র রেখা, কিন্তু বয়স ঠেকিয়ে রাখার সচেষ্ট সমাধানে তিনি কসুর করেননি, কেননা আর যাই হোক, তাঁর মাথার সব কেশই কালো, কলপের সৌজন্যে! তাঁর ধারণা শুধু মাত্র কালো কেশের কারণেই তাঁকে কিশোরী-যুবতীরা নব যুবক জ্ঞানে তাঁর প্রতি আসক্ত হবেন!! হায়রে রে দুরাশা! বৃদ্ধের স্বভাবে।।

'এককালে আমিও খুব মাংস খেতে পারতুম, জানো হে
দাঁত ছিল, মাংসে তাই আনন্দ পেতুম।'

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, রোগা ঢ্যাঙা বৃদ্ধ এক তার
পাতের উপরে দিব্য জমিয়েছে মাংসের পাহাড়।
বলিও খাচ্ছে না। শুধু মাংসের স্মৃতির তীব্র মোহে
ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—'জানো হে, জানো হে।'

কবিতার অংশটি আমার প্রিয় কবি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

এবং মনের পাহাড় প্রসঙ্গে যে কথাটি মনে হচ্ছে, তা আমি যা বলতে চেয়েছি, সে প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

ইন্দুকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর আচরণ সবেতোভাবেসমর্থন করি না। মধ্যপথে অন্যায় এবং অযৌক্তিকভাবে তাঁর আসন্তি। তিনি সমস্ত কিছুই গ্রাস করতে চান। তিনি আত্মকেন্দ্রী। তিনি যে সমিতিকে তাঁর জীবনকাল অর্থাৎ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর নিতান্তই বাণিজ্যিক কারণে, তিনি ইন্দুর তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে তুলে এনে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার বন্দী করেন। বাণিজ্যিক সফলতার সম্ভাবনাতে তাঁর আগ্রহ, মুনাফাখোরী প্রবল সন্তরণে তাঁর অনীহা, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপাকণা হলে তিনি ডিটারদের টোল ফেলে টুপ করে তুলে ফেলেন তাঁর বড়শিতে। সেই কৃতকে শ্রদ্ধা করি। আমি সম্পত্তি কৃপণতি। তিনি কেপ্টিপতি। অনেক স্টুডেন্ট কৌতুকিনী তিনি বিনিময়ে আমুন, এ আমার অনুরোধ—কিন্তু প্রার্থনা করে নয়। যাঁ নিজেই তা কোনওদিনই ঈর্ষা সম্ভব নয়, অন্যের প্রার্থনাপূরণ সম্ভব হয়। এবং প্রকৃতি প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলতে পারি: বনাতি, তার কতদিন এই দুঃশাসন?

মহানগরের সম্পাদক একবার যবাতির কোপানলে পড়েছিলেন। বছর দুয়েক আগে, শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের শেষ মুহূর্তে। বাকীটার ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, বিশেষ রচনা প্রায় সবগুলি এসে গেছে, বাকি শুধু কিছু উপন্যাস। একেবারেই শেষ সময়ে জানা গেল: তা পাওয়া যাবে না। লেখকেরা উপন্যাস দেবেন না, তবে ছোটগল্প দিতে পারেন। কিন্তু অধিবেশ তার সূচনা করে গেছেন, শারদীয় সংখ্যায় অন্তত আর তখন উপন্যাস নামে অভিহিত বড় গল্প, তার বেড়ায় হবার নয়! আমাদের প্রশ্ন ছিল: কেন উপন্যাস নয়? উত্তর: যবাতির নির্দেশ! এ প্রসঙ্গে সম্পাদককে আমি অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু অন্তত ব্যবস্থা করতে অথবা মহানগরের পাতায় সম্পাদকীয় কলমে তা লিপিবদ্ধ করতে। কিন্তু তিনি নারাজ! তিনি ঘাঁটাতে চাননি, চটাতে চাননি। এবং সে কারণে মতবিরোধ, সমাপ্তির বীজ রোপিত এবং যথাসময়ে সমাপ্তি। কিন্তু এ ঘটনা মুদ্রিত থাকা প্রয়োজন, মহাকালের প্রয়োজনে, বিচারের প্রয়োজনে, বিশ্লেষণের প্রয়োজনে। তাই নির্দ্বিধায় একথা জানিয়ে রাখলাম। কেননা, মাদু? সে কতক্ষণ? আমি ধরা কী প্রকৃতির সেই অমোঘ নিয়মের বাইরে?—না।

এবারে শারদীয় মহানগর এবং মহানগর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এবারের আকর্ষণ দুটি। এক: কবি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর এক ভিন্ন পরিচয়। গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার সুনীল। রাষ্ট্রাধ্যক্ষ চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়নি, পঞ্চাশ শতাংশে শেষ হয়ে বিচারশালার বন্দী। প্রযোজক শিবাজী রায়ের আনুকূল্যে এবং সৌজন্যে এটি আমাদের হাতে আসে। এবং আমরা তা সাগ্রহে গ্রহণ করি। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলাম। চিত্রনাট্যটি ইংরেজিতে রচিত, কেননা কলাকুশলীদের কিয়দংশে অবাঙালী এবং তাদের সুবিধার্থে। এই চিত্রনাট্যটি হাতে পাওয়ার পর আমরা তা তুলে দিই পূর্ণেন্দু বেতালের হাতে। তিনি এটিকে বঙ্গভাষ সাবলীল এবং পাঠযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করে দেন। সুনীলের পারিশ্রমিক ধার্যের প্রসঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তাঁর অনুমতির জন্যে। এবং তিনি তাঁর সহধর্মিণীর সামনেই স্বভাবসুলভ সরল হাসিতে সরাসরি অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এবং শ্রী শ্যামল সেন দীর্ঘদিন ছবি আঁকার জগৎ থেকে সরে দাঁড়ালেও আমি তা হতে দিইনি। এটির আকর্ষণ তাই।

দুই: গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা। এটি তৈরি করিয়ে নিতে আমার লেগেছে প্রায় পনেরো মাস। এ বিষয়ে আমার সমস্যা আছে কুর্ম অবতারের সঙ্গে। শুনেছি, সে একবার কামড়ে ধরলে তা নাকি ছাড়ানো যায় না: আর কবিতার অনুবাদ—সে তো একবারেই সম্ভবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাদের হয়ে বহু বছরের তাঁর মৃত্যুর থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু তিনি নিরেছেন—তাঁর বরাভয়, তাঁর দাক্ষিণ্য এ অধম তা অস্বীকার করছে না। কিন্তু অন্য। আমি নিজেকে জানি। জানি: নামে মৃত্যুর অতি, ভূমির মৃত্যুর। তাই তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যাকুল আমি হাজির দিই মৃত্যুলোকের কাছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কবিতাগুচ্ছের আগের প্রীতীশ নন্দী, শক্তি ও মুকুলের ভূমিকা রয়েছে। আমি শুধু একথা জানিয়ে রাখতে চাই যে, আমি যখন বোম্বাই নিবাসী প্রীতীশের সাথে মৃদুস্বরে এই বঙ্গানুবাদের প্রস্তাব রাখি, প্রীতীশ নির্দ্বিধায় সমস্ত রকমের অনুমতি দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। বলা বাহুল্য মাত্র, এরকম সহযোগিতা কখনই ভুলবার নয়।

তিন: ডাঃ শিশির কুমার দাসের নাটক। আমি তখন নতুন বিভীষিকা। ওখানে এক সৌখিন নাট্য সংস্থার পত্রিকেশনার দেখেছিলাম একটি নাটক, নাম ডাঁড়ু দত্ত। বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত। সেটির অভিনয় সৌকর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং সেখানেই অভিনয়রাত্রে নাট্যকারের সম্মুখীন হয়ে আমার প্রস্তাব দিই। তিনি সম্মতি দেন এবং যথাসময়ে তা আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছয়।

চার: হিরোশিমা নাগাসাকি। সেই সময়েই সাক্ষাৎ করি চলচ্চিত্র সেনের সাথে তাঁর চিত্তরঞ্জন কলোনীর বাস ভবনে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদিও ওই সময়ে তিনি আমেরিকায় থাকবেন; কিন্তু ঠিক পনেরই আগস্ট উনি ওখান থেকেই তাকে আমাদের উপন্যাসটি পাঠিয়ে দেবেন। দু'একদিন দেরি হলেও তা আমরা পেয়েছি। এবং তিনি এও প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি মহানগর টিকে থাকে, তাহলে জানুয়ারি ১৯৮৬ থেকে তিনি বহুদিন ধরে যে উপন্যাসটির কথা চিন্তা করে রেখেছেন, উত্তর-স্বাধীন ভারতবর্ষে নিরীক্ষার এবং সে কারণে সারা ভারতবর্ষের পট-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যার কোনও বিশেষ একটি সংখ্যায় কুক্ষি-চিহ্নিত পাতায় সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনা নেই, তা ধারাবাহিকভাবে মহানগরের জন্যেই লিখতে শুরু করবেন। এখন, আমাদের দায়িত্ব: টিকে থাকা। সে কথায় পরে আসছি।

পাঁচ: হৃষিকেশ ভট্টাচার্যর উপন্যাস মূলধারার। হৃষিকেশ আমার বন্ধু। আমার গুণগ্রাহীও। তাকে ঘিরে আমরা প্রথম উপন্যাস লেখাই, ঘাতিক, যা শেষ হয়েছে শত সংখ্যায়। যে সময়ে ও উপন্যাসটি লিখতে শুরু করে, সেই সময়ে ও একটি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। প্রসঙ্গক্রমে, মহানগর তখন তিন মাসে পা দিয়েছে। ওকে বললাম, 'ভালো ভাবার রীতিমত পর্যবেক্ষণ করে উপন্যাস শুরু কর। সবই প্রায় ওপর থেকে দেখা। যেহেতু ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ওর পক্ষে কি সম্ভব হবে?—ব্যাঙ্কের ওপর একটা উপন্যাস লেখা!' হৃষিকেশ তখন জানিয়েছিল, ওর একটি বিসিস ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যেই তৈরি, তাদের মনঃপূত না হওয়ায়, তারা তা বাতিল করে দেয়। কিন্তু হৃষিকেশ চায়, তা প্রকাশিত হোক। হয়নি। যাই হোক, উপন্যাসের কথায় হৃষিকেশ রাজি হলেও ও সংশয় জানালো, যে ও যতটা হিন্দী ও ইংরেজি জানে, বাংলা ততটা জানে না। লিখতে পারে কিন্তু প্রচেষ্ট বানান ভুল হয়। আমি ভাবে নেওয়াতে শুরু হয় ঘাতিক। তার প্রায় মাস তিনেক পরে পৃষ্ঠার কাঁচা হাতের লেখায় এবং ভুল বানান ভর্তি ঘাতিক হাতে নিল হৃষিকেশ। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় বড় লেখা: ঘাতিক, তার নিচে লেখা হৃষিকেশ ভট্টাচার্য। অনুবিধে হয়েছিল..তবু শেষ করলাম। এবং চমকে ওঠার কারণ একটাই। ওর যে বিসিস ব্যাঙ্কে বাতিল ব্যক্ত হয়েছে এই উপন্যাসে: যা করা উচিত, তাই

হৃষীকেশের কাছে জানতে চাইলাম : 'তা তার ব্যাঙ্ক অনুমতি দেয়নি ছাপতে, তাই তো ছাপা হতে চলেছে। তবি এটা কোনও ছদ্মনামে প্রকাশ করবে ?' হৃষীকেশের দৃঢ় উত্তর : 'না।' আমার প্রশ্ন : 'যদি তার চাকরি চলে যায়, তাহলে ?' হৃষীকেশ একই দৃঢ়তায় জানালো : 'ক্ষতি নেই, দিব্যেন্দু। তাহলে সেটা হবে আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের বিষয়বস্তু। —এই হলো হৃষীকেশ।

চাকরি যায়নি। পদোন্নতি হয়েছে। তাই মুলসকার। এরপর মুলমধ্য এবং সবশেষে মূলান্তর।

ছয় : তারাপদ রায়ের রচনা। উনি রসিক, একথা কারুরই অজানা নয়। চিঠি দেওয়ার পর মৃদুস্বরে যখন ওঁকে মোলায়েম করি এবং সময়সীমা বেঁধে দিই, অত্যন্ত অল্পদিন মাত্র, তখন উনি জানান অন্য একটি শারদীয়র লেখা শেষ করেই উনি আমাদের জন্যে লিখবেন। কিন্তু সময় অল্প। মাত্র তিন দিন। উনি প্রশ্ন করেন : ঠিক আছে, এতেই চলবে, কিন্তু আমি ছোট, মাঝারি না বড় উপন্যাস দেবো ? আমার উত্তর : তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কেননা সময় মাত্র তিনদিন, তাছাড়া কি নিয়ে লিখবেন, তার বিষয়বস্তু কি সবই আমার অজানা, সুতরাং আমি কি করে বলি বড়, মাঝারি বা ছোট লেখা ! তিনদিনে যা সম্ভব, তাই দেবেন। প্রতি প্রশ্ন : আচ্ছা, বড় লেখা লিখলে বেশি টাকা পাব তো ? উত্তর : নিশ্চয়ই। উনি লেখা পাঠিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি চৌষট্টি পৃষ্ঠার : সঙ্গে চিরকুট : অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বড় লেখা পাঠালাম—টাকাটা নগদ পেলে পূজোর প্রাক্কালে পরিবারের সুবিধা হয়। চৌষট্টি পৃষ্ঠার বড় লেখা মহানগরে ছাপা হয়েছে। তারাপদবাবু রসিক বলেই এই চৌষট্টি পৃষ্ঠার বিশাল পাণ্ডুলিপিটি লিখেছেন ছোট একটি খাতা কাগজে। আমার প্রশ্ন : সুরসিক তারাপদবাবু, এরপরের বারের শ'পাঁচেক পৃষ্ঠার টাইপ বালিশপ্রমাণ উপন্যাসটি কি আপনি ডিজিটিং কার্ডের পিছনে লিখে পাঠাবেন ? মহানগরে গল্প দেখেন উনি তার প্রথম সংখ্যাতেই। সেই সখ্যতার সুযোগে এই কথা পেশ করলাম। তার কাণ্ডজ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধি আলনারই, এর কোনটাই আমার নেই বলেই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে একথা জানালাম।

সাত : বিমলকৃষ্ণ-এর অষ্ট মহিষাসুরমর্দিনী কথা। শুভ মহালয়া প্রত্যুষে আমরা বহুবার শুনেও এখনো যে শোনার জন্যে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখি—সেই আদ্যেন্দ্য-মহিষাসুরমর্দিনী কবে কখন কেমনভাবে শুরু হয়েছিল, তার জন্মবৃত্তান্তের ইতিহাস এবং পুনরায় সেই পুরনোকেই পুনরাবৃত্তি যে সম্পর্কে বিমলবাবু বৈঠকি ভঙ্গীতে জানিয়েছেন শ্রী বিমলকৃষ্ণ। কৃতজ্ঞ মহানগর।

আট : শচীন্দ্রলাল ভট্টাচার্যর শেষ নারী। সমরাভাবে যে সব ছবি তিনি দেবেছিলেন তা আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও খুঁজে দেখে-তা আমাদের শিল্প বিভাগের হাতে তুলে দিতে পারিনি। তিনি প্রথম শুরু করেন ১৯৮২-র শারদীয় মহানগরে 'শেষ যাত্রিনী' দিয়ে, তারপর 'শেষ মজদুর' 'শেষ লড়াই' এবং এবারে 'শেষ নারী'। মহানগরের প্রতি তার ভালবাসা থাকার জন্যেই আমরাই এটি নিয়মিত পাচ্ছি। সত্যিই হোক শচীন্দ্রলাল।

নয়। আলোকচিত্রী অলোকেশ কুমার। আমাদের দীর্ঘ কবিতা ও কবিতাগুচ্ছের পাতায় সমস্ত ছবিই তার ও তারই সহযোগিদের। সকাল সাতটায় ওর বাড়িতে গিয়ে ঘুম থেকে তুলে ওকে জানিয়েছিলাম—আমি কী চাই। ও তৎক্ষণাৎ ওর সঙ্গীদের হাতে ক্যামেরা তুলে দিয়ে নিজেও একটি ক্যামেরা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেলেরপুরে, কুমারটুলিতে, ডায়মণ্ডহারবারে। ওর হাতে ইনভার্টার অনেক ছবি, কিন্তু তা পড়ে রইলো। কেননা, তা ছিল আমারও অজানা, ওর কাছেও মহানগর মহানগর।

দশ : আলোকচিত্রী জয়ন্ত সিংহ। আমার সর্বকনিষ্ঠ সহোদর। পড়ার মাস্তান। কোনও এক সময়ে বহু বন্ধু-বান্ধবকে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে। নিজে ছিল নির্বিকার বেকার। কম নয়, বি· কম· এল· এল· বি। বহুর চারেক আমার উপদেষ্টা সংস্থার কাজ করছে। সন্ধ্যে বেলা তাসই আরাম তার। ওর সেজদার দেওয়া আশাহি লেন্টাসে ক্যামেরায় বোলে। প্রচ্ছদের এবং দীপক রুদ্রর লেখা দুটির আলোকচিত্রী সে। তার আলোকিত ভবিষ্যত কামনা করি।

এগারো : অনুপস্থিত শ্রী অতুল সুর। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি লেখা এই সংখ্যার যাবার জন্যে তৈরি হয়ে কলকাতার একটি ফটোগ্রাফিসসেটিং-এ পড়ে আছে। তাদের কাজটি দেরিতেও না আর লেখাটিও ফেরৎ দিতে নারাজ। ছদ্মের শ্রী অতুল সুরের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আগামী নভেম্বরের দীপাবলি সংখ্যায় এটি প্রকাশ করব।

বারো : অনুপস্থিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। উনি এই বয়সে পদস্খলন করে জানুসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শয্যাশায়ী। ওঁর আরোগ্য কামনা করি।

তেরো : অনুপস্থিত প্রফুল্ল রায়। তাঁকেও চিঠি দিয়ে চেয়েছিলাম একটি উপন্যাস। উনি দিবা প্রকাশ করেছিলেন। হয়তো পেরে উঠবেন না। উনি জানতেন না উনি আমার একজন প্রিয় লেখক। ওনার সব বই-ই নতুন দিন.পূর্ব পার্বতী থেকে শুরু করে নদ্যমুক্তের ঘোড়া, কেয়া পাতার নৌকো, রাম-চরিত সমস্ত বই-ই আমার পড়া। কিন্তু ওনাকে চোখে দেখিনি ; চিনিনা। চিনলাম দু'সপ্তাহ আগে এক রবিবারে। বর্তমান পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে তমালতনয় বসু জানিয়েছিলেন, প্রফুল্ল রায় একটি উপন্যাস লিখছেন, কাকে দেবেন এখনও ঠিক করেননি। বেশ কয়েক জায়গায় দেবো, দেবো বলে রেখেছেন। এটি পড়ার পর আমি মরিয়া। যে করেই হোক, উপন্যাসটা আমি নেবোই। মুলান্তর অফিসে ফোন করে ওনার বাড়ির ঠিকানা জেনে আমার কালো ব্যাগে হাজার পাঁচেক টাকা আর চেক বই নিয়ে ছুটলাম। অনেক ঘুরে বাড়ির হদিশ পেলাম। দেখা হলো। জানালাম আমার আর্জি। এও জানলাম, সঙ্গে টাকা এবং চেক বই দুইই এনেছি। চেক বই, কেননা যদি আরোও বেশি দক্ষিণা দিতে হয়। উনি সব শুনে বললেন : তা হয় না। ওটা যদি দেব হয় তবে এক নির্দিষ্ট জায়গাতেই যাবে। এবং সেখানে টাকা পাবার সম্ভাবনা কম। হয়তো একেবারেই কিছু পাবেন না। কিন্তু এসে যায় না। টাকাটাই কি সব। পৌঁছেছিলাম দুপুর দুটোয়, বেরোলাম সন্ধ্যে পাঁচটায়। চিনলাম প্রফুল্ল রায়কে। জানলাম, আকাশের নিচে যে মানুষ লেখক—সে অনেক বড় মাপের। সে বিশাল। উনি আমাকে স্বাক্ষর করে এক কপি পুরস্কৃত বইটি দিলেন। বলা বাহুল্য ওটিও আমার সংগ্রহে আছে। কিন্তু স্বাক্ষরিত নয়। আর বিনা পয়সায় পেলে তা আর যে কেউ হোক আমি ছাড়ি না। আর পেলাম প্রতিশ্রুতি : যদি সম্ভব হয়ে ওঠে, তবে আগামী বছর শারদীয় মহানগর নিশ্চয়ই তা পাবে। আমি আশাবাদী। দেখা যাক।

চোদ্দ : অনুপস্থিত বুদ্ধদেব গুহ। তিনিও শারীরিক কারণে তাঁর প্রতিশ্রুত লেখা পাঠাতে অক্ষম। মহানগরে কোজাগরের স্মৃতি দাক্ষিণ্য তাঁরই।

পনেরো : অনুপস্থিত অন্নদাশঙ্কর রায়। শারদীয় অনেক লেখা শেষ করে তিনি ক্লান্ত। আমি যখন তাঁকে যোগাযোগ করি,তিনি আরেকটু সময় চান। আমি অপারগ। কিন্তু তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী লীলা রায়ের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, তাঁদের অনেক কিছুই দেবার ক্ষমতা এখনো, এই বয়সেও আছে। অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের দীর্ঘায়ু মহানগর কামনা করে।

ষোল : অন্য দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু সিংহ। নিতান্তই পাতা ভরাবার কারণে আমার এই বহু পুরনো, ১৯৫৯ সালে লেখা এই ছোট গল্পটি 'অভিযোগ' এই সংখ্যার পরিবেশিত হলো। সেই সময়ে, সেই ১৯৫৯ সালে আমাদের একটি ছোট সাহিত্যগোষ্ঠী ছিল। তার নাম দিয়েছিলাম অন্বিক। প্রতি রবিবার আমরা কয়েকজন মিলিত হতাম, স্বরচিত রচনা পাঠ করতাম। নিজেরাই নিজেদের সমালোচনা

করেছেন [illegible] সেই আসরে পাঠের জন্যে সে সময়ে পেটের মাঝখানে একটা টিন বসানো রোগ করেছেন, এক রাতে গল্পটি শেষ করেছিলেন মাত্র ৮-৪২ মিনিটে। অবশ্য অসুবিধে হয়নি। কেননা তখন ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত। যাই হোক, বেশ মনে আছে, পাঠের বৈঠকে ছড়িয়েছে আসরে গল্পটি যখন পড়া শেষ করি, তখন অন্তত মিনিট দশেক কেউ কোনও কথা বলতে পারেনি। গল্পটি ছাপিয়ে দেওয়া হোক এবং এও ঠিক হয় যে, এটি ভালো করে কপি করে একটি প্রেম সাহিত্য পত্রিকা যেন পত্রিকার পাঠানো উচিত। আমি সেই কবি [illegible] চিনি না, ঠিক পরে এক বিশাল পত্রিকা অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ছোট গল্প বিভাগের সম্পাদকের (এখন বিভাগীয় সম্পাদক কথাটা অজানা) হাতে জমা দিই [illegible] ফিরে চাই হোস্টেলে। জানি না ছাপা হয়েছিল কিনা। এখন আমার কাছে মাত্র কপি। কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখা বলে এটিকে উড়িয়ে দিতেছিলাম, যদি না তুলসী সেনগুপ্ত এটিকে লুফে নিতেন। তাঁকে এই গল্পের বিষয়বস্তুটা বলায়, তিনি এটি ছাপতে অনুরোধ করেন। তাঁর আগ্রহে এটি ছাপা হল। ভাল লাগলে তাঁর কৃতিত্ব অনেক, খারাপ লাগলে ওনার। প্রসঙ্গত পরে জেনেছি তাঁর হয়ে লেখাটি জমা দিয়েছিলেন, তাঁর নাম শ্রী বিমল কর। মহানগরের মনে এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর ভাল-উত্তালে মহানগর পরিপূর্ণ

[illegible]
[illegible]

আর নয়। এবার শেষ কথা। ভোর হয়ে এসেছে। বাইরে কাক ডাকার শব্দ পাচ্ছি। এবং অন্য পাখ-পাখালীর। ঘড়িতে দেখছি, এখন বাজে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। শেষ কথা বলার সময় হয়ে এসেছে। কারণ, এবার আমার ঘুম পাচ্ছে। যে কথা জানানোর জন্যে এই চিঠি লিখছিলাম, তা জানানো হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট নেই। সমস্তটা বলে ফেলায় তৃপ্তিবোধ করছি। এখন মনে পড়ছে চাণক্য সেনের কথা, যদি মহানগর টিকে থাকে। মনে পড়ছে বারবার।

শেষ কথা: সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপন দাতা অনেকেই বলেন, মহানগর কেমন চলছে? তার উত্তরে বলি, হয়তো অসাবধানী অভিযোগ অসতর্ক কোনও মুহূর্তে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবি এবং অনিবার্য, এই মহানগরের জন্মের জন্যে দায়ী আমি। কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বের গুরুভার অসহায় আমি আপনাদের ওপরই ন্যস্ত করলাম। আপনারাই একমাত্র পারেন একে টিকিয়ে রাখতে। আমি নয়। তুচ্ছ আমি। নগণ্য আমি। আমি কী এমন রাজাধিরাজ কলকাতার মতোই বিশাল, কলকাতার মতই মুমূর্ষু দুর্দান্ত এই দামাল মহানগরকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার থাকতে পারে? পারেন আপনারা। আপনাদের স্নেহধন্য মহানগর তার পাঁচ বছরে পা দেবে আগামী জানুয়ারি, ১৯৮৬-তে। হাতেখড়ির সময় হবে তার। তখন—

মহানগর
তার জন্মমুহূর্ত থেকে
বিদ্রোহী।
শুধুমাত্র বিদগ্ধ
পাঠক-পাঠিকার জন্যে
মহানগর
মহানগর
১৩ কীড স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কোথায় কলকাতা ?

দীপক রুদ্র

বুড়ো জেনেরালদের মত শহরও মরে না—শহরের শহরেপনা আস্তে আস্তে কমে যেতে পারে, তারা এক সময় যে গ্রাম ছিল আবার সেই গ্রামের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে—কিন্তু আগ্নেয় উৎক্ষেপ, ভূমিকম্প, নদীর পথবদল প্রভৃতি নাটকীয় পরিবর্তন বা ঈশ্বরের রোষের নিদর্শন না ঘটলে শহর বেমালুম লোপাট হয় না। শহরের একগুঁয়ে জীবনীশক্তি ঐতিহাসিক, সমাজদর্শক, জনসংখ্যাবিদ্ সবাইকেই অবাক করে দেয়। সুতরাং, কলকাতার আয়ু সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা—যে কলকাতা আর পাঁচ বছর পর তিনশ' বছরের তরুণী হবে—আমাদের অযথা চিন্তিত হওয়া উচিৎ নয়, আমাদের বাগত প্রতিবাদের যোগ্য তো একেবারেই নয়।

কারণ, অন্তত ব্যাহত, আমাদের এই প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহরটি, জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় রেনেসাঁর এই গর্বিত জন্মস্থান, এখনও এমন এক প্রাণশক্তি, এমন প্রচণ্ড এক জীবনেচ্ছা দেখায়, যা এই দেশের অন্য যে কোনো ঘুমন্ত প্রাদেশিক শহরের কাছে গেলে কল্পনাও করা যায় না। কলকাতার স্কুল-কলেজ, ক্লাব-সমিতি, ফুটবল-ক্রিকেটের ভীড়, রাজনৈতিক মিটিং-মিছিল, গানবাজনার জলসা, বইমেলা, এমনকি, কর্পোরেশন পাটির সীমিত চক্রগুলি পর্যন্ত সারা দেশময় তাদের দর্পট আর গমক ছড়িয়ে দেয়—তা অন্যত্র যতই ঈর্ষার কারণ হোক না কেন। এবং, প্লেন থেকে বা এই শহরের বহু উদ্ধত, বেআইনী স্কাইস্ক্রেপরের মাথা থেকে দেখলে কলকাতাকে রহস্যময়ী, প্রায় সুন্দরীই মনে হয়।

আসলে, এই রকমই একটা মানসিক দূরত্ব, একটা স্বেচ্ছাকৃত দৃষ্টির অস্পষ্টতা, কলকাতার নানা অসঙ্গতির সঙ্গে আমাদের সমঝোতায় আসতে দেয় না। আমরা বলতে ভালবাসি, কলকাতা একটা মনের অবস্থা, একটা জীবনের পথ, এক মুক্ত আত্মা—আর সেইসঙ্গে তার পচা গলা জঞ্জালের স্তূপ, ক্ষতবিক্ষত রাস্তাঘাট, দূষিত পার্ক—পুকুর, নড়বড়ে সৌধ—প্রাসাদ, বদ্ধ পয়ঃপ্রণালী, ট্র্যাফিক জ্যাম, লোডশেডিং আর নিরন্তর কথার খেলাপ চোখ বুজে সহ্য করি। আমরা স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকি যে শহর তৈরি হয়েছিল মাত্র ন'দশ লাখ মানুষের জন্য, সেই শহরের এখন এক কোটিরও বেশি জনসংখ্যা, মাকশহরের পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাসিন্দাদের অর্ধেক বস্তিবাসী, কলকাতার দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারের মাসিক আয় সাড়ে তিনশ টাকারও কম, শহরের কর্মী মানুষের বিশ শতাংশ মাত্র সংগঠিত শিল্পে নিয়োজিত; কলকাতার বর্দ্ধিত ১৩৫০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের আশি শতাংশে বৃহৎ বা আধুনিক শিল্পব্যবস্থার নয়, কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পেরই প্রাধান্য।

কলকাতা কিন্তু তার ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই পুরোপুরি শহরপদবাচ্য ছিল না—শহর বলতে যদি আমরা সংঘবদ্ধ, একত্রিত, বুদ্ধিসঙ্গত মানব অবস্থানকে বোঝাই। বৃটিশ আমলে, অর্থাৎ শহরটার জীবনকালের প্রথম আড়াই শ' বছর, প্রকৃতপক্ষে কলকাতা ছিল দুটি—একটি প্রাসাদের শহর, অন্যটি কিপলিং এর সেই "City of dreadful night", একদিকে সাম্রাজ্যের নয়নমণি, যাতে বাকিংহ্যাম প্যালেস আর কেডেল স্টোন ম্যানরের প্রতিফলন ছিল পদে পদে, অপরদিকে নেটিভ কলকাতা, যার দৈন্য আর পূতীগন্ধ আজকের বড়বাজার বা চিৎপুরকেও হার মানাত। এখন তফাৎ শুধু, এই দুই কলকাতা মিলেমিশে গেছে, একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান বিজেতারা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর অতীতের সওদাগরী প্রভুদের উত্তরাধিকারীরা, আর তাঁদের ক্রীতদাসদের দূরে ঠেলে রাখতে পারছেন না। যদিও এ-শহরের অধিকাংশে সম্পত্তি চলে গেছে সক্ষম ভিনদেশি হাতের মুঠোয়, তাদের পাশাপাশি ভারতের অন্তত দশটি প্রদেশের দীনদরিদ্র মানুষও ঢুকে পড়েছে। কলকাতা নাকি সৌখিন, মহার্ঘ পরিকাঠামোর দরকার নেই (হার্ভার্ড ফেরৎ রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের এক সদস্যের মত অন্তত তাই), এবং তাই ক্রমাগত প্রমাণিত হচ্ছে। লোডশেডিং হলে পার্কস্ট্রীটের দক্ষিণে এয়ার কণ্ডিশনড্ ডুপ্লেক্স এপার্টমেন্টের অধিবাসী বা ভিডিও পার্লারের মালিকের উষ্মা হতে পারে, কিন্তু তাঁদের বেলতলা বা ব্রাবট স্ট্রীটের বস্তিবাসী পড়শিরা তো লণ্ঠনের আলোতেই কাটিয়ে দিল দশকের পর দশক।

কলকাতার জন্য খুব অসাধারণ কিছু করাও যে হয়েছে, এমনও তো নয়। ১৯৭২ সাল থেকে সি-এম-ডি-এ কলকাতার ওপর খরচ করেছে চারশ' কোটি টাকার সামান্য বেশি—এই সময়ের মধ্যে দিল্লী আর বম্বে পেয়েছে এই অঙ্কের যথাক্রমে চারগুণ ও দ্বিগুণ। অথচ, এই তথাকথিত গরীব শহরেরই ১৯৭৮-৭৯ সালেও আয় ছিল সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ওপর। পৃথিবীময় আর এমন একটিও মৃত বা জীবিত শহর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে নাগরিক সব সুবিধা বিধানকে সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করে। এ কথা তারা অনায়াসে ভুলে যায় যে, কলকাতার বার্ষিক পৌর আয় মাত্র চুয়াল্লিশ কোটি টাকা, সরকারী অনুদানসহ নব্বুই কোটি টাকারও কম—অন্যত্র, যথা বম্বেতে, এই আয়ের পরিমাণ-এর দশগুণেরও বেশি। শহরের বেঁচে থাকা তো শুধু ভালবাসা আর

রাগ দেখানোর ওপর নির্ভর করে না। নগরবাসীর কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য ছাড়া পুরসভা রাস্তাঘাট, জল, সাফাই, শিক্ষা, চিকিৎসা সব দিক সামাল দেয় কী করে?

নাগরিক সর্বাঙ্গসৌন্দর্য চায় কারা, কলকাতা কাদের? প্রথমত, কলকাতার জমির ষাট শতাংশে কিংবা তারও বেশি ভারত সরকারের দুটি মন্ত্রকের আয়ত্তে—শহরের মাঝখানের ও বালিগঞ্জের দুটি ময়দান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের, আর বিস্তীর্ণ বন্দর এলাকা পোত ও পরিবহন মন্ত্রকের। তারপরেই স্থান পশ্চিম ভারতের সেই সব শিল্পপতিদের, যাঁরা এখন শিল্পের চেয়ে সম্পত্তিতেই আগ্রহী অনেক বেশি। অবশ্য কলকাতা চিরকালই ব্যবসায়ী আর ফটকাবাজের স্বর্গ—তাঁরা নিশ্চয় রাস্তা বা উড়ালপুল বা বস্তিউন্নয়ন বা জলসরবরাহে টাকা ঢালতে রাজি নন। এমন কি, পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত যুবভারতী স্টেডিয়ামেও নন। যাই হোক, কলকাতার সবচেয়ে নগণ্য স্বত্বাধিকারী নিঃসন্দেহে তার স্বজাতীয়েরা। তাদের জন্য পড়ে আছে প্রায়ান্ধকার শহরগুলি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ফুটবল, নাটক, বোমাবাজি আর নিষ্ফলা রাজনীতির কচকচানি।

এবার দেখা যাক, কলকাতার জন্য ভাবেন কারা। শহরকে টিকে থাকতে হলে টাকাপয়সা ছাড়া মনের যোগও তো চাই। বাঙালির কলকাতা সম্বন্ধে যে অধিকারিবোধ, দুঃখের বিষয়, তা কলকাতার কায়িক কোনো পরিবর্তন আনার জন্য সত্যিকারের পাগলামো নয়, তার পার্থিব অবস্থার সঙ্গে মালিকানার সংযোগ বিরহিত। বাঙালির কলকাতা অবস্থিত তার কল্পনায়—আসল কলকাতা বহুদিন চলে গেছে ব্যবহারীদের কব্জায়। এমনই সব ব্যবহারী যারা যথেচ্ছ বাড়ি বানানোর সব আইন ভাঙে, পার্ক হাতিয়ে নেয়, ট্যাক্স দেয় না, ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করে, জঞ্জালের সৃষ্টি করে (বিয়ে বাড়ির বাইরে এঁটোকাঁটা আর গাঁদাফুলের পাহাড় সরানোর ভার কার?), ট্রাফিক আটকে দেয়, এবং পরমানন্দে 'মানি অর্ডার' এর অর্থনীতি চালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তাদের অগ্রগতিও সুগম করে রাখে উৎকোচভোগী, নিরন্ত্র, অসার শাসনব্যবস্থা। এমন দখলকারীদের যদি কলকাতার প্রতি অনুগতা এতটুকু থাকেও, তা শুধু তাদের জমির বা সম্পত্তির চৌহদ্দিতেই সীমিত—পুরো শহরটার স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

বাঙালি কলকাতাকে কী দিয়েছে? অবশ্যই তার সংস্কৃতির দ্যোতনা, তার নিরপেক্ষতা, ক্রীড়া, সঙ্গীত ও ললিতকলার প্রতি ভালবাসা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ আর প্রতিকূল অবস্থায় অটল সহনশীলতা। এরই সঙ্গে বাঙালি কলকাতাকে দিয়েছে তার অহেতুক উন্মাদনা আর অবিন্যস্ততা, তার আলস্য, ক্ষেদ ও আত্মতৃপ্ততা, অর্থনৈতিক অগ্রচিন্তার পরিবর্তে রাজনৈতিক 'প্রায়রিটি'—এবং, যেহেতু দেশভাগের সময়, বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য না হয়েছে নতুন শহর গড়া (পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য ছোট বড় অন্তত সাতেরটি জনপদ বসানো হয়েছে), না হয়েছে প্রকৃত পুনর্বাসনের চেষ্টা। কলকাতার তার নিজের চারপাশে ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সব সুযোগ কেড়ে নিয়েছে অপরিকল্পিত জবরদখল কলোনি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তরপুরুষ, চাল চালান করে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেহ বেচে আর লোকাল ট্রেনে ছিনতাই করে, পৌঁছে গেছে তার বিবর্ণ মাঝবয়সে।

বললে খারাপ শোনাবে, আজ অবধি বাঙালি চালিত কোনো আন্দোলনই—সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক—কলকাতার আসল প্রয়োজনগুলির দিকে একনিষ্ঠ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। যথা, কলকাতার চাই মুক্ত বায়ু, নির্মল পরিবেশ, আরও রাস্তা আর শ্যামল আস্তরণ, আরও ভালো হাসপাতাল, সক্রিয় পরিবহন ও সড়ক নিয়ন্ত্রণ আরও কর্মঠ পুলিশ আর পৌরকর্মী, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব নিয়ে আন্দোলন না করে আমরা যুবশক্তিকে বিপথে চালিত করি, তার সমূহ অপচয় করি বিচ্ছন্নতায় মিছিল নামিয়ে; বাঙালির অবশিষ্ট ঐতিহ্যের অবমাননার উসকানি দিই, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা বন্ধ করি অবলীলায়, ট্রাম-বাস পোড়াই, একে অপরের গলা কাটি বিজাতীয় ভগবানের স্তব করতে করতে।

কলকাতার দুর্ভাগ্য, গরীব এবং বড়লোক দুটি সমাজই সমভাবে তাকে দোহন করে চলেছে, আর তাদের মাঝখানে মধ্যবিত্তের চলছে অনন্ত প্রতীক্ষা। অথচ, সমাজের এই একটি স্তরই তাকে বাঁচাতে পারত, কারণ এখান থেকে উঠে এসেছেন কলকাতার প্রায় সব বুদ্ধিজীবী আর পেশাদার মানুষ, তার রাজনীতিক ও সর্বাধিক সোচ্চার প্রেমিক। কলকাতার অপব্যবহার বন্ধ করার ব্যাপারে এঁরা কিছুই করেন না—বরং, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে এঁরা সভা-সমিতি করেন আর দার্শনিক সাজেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত কলকাতার রক্তাক্ত পিঠে বসে আছে তন্ত্রসাধনায়—প্রার্থনা করছে অলৌকিক কোনো মোক্ষের। কলকাতার যদি মৃত্যু ঘটে—এইভাবে, এই একই ভাবে, এই অন্তর্জালি অবস্থাতেও কলকাতা আরও একশ বছর বেঁচে থাকতে পারে—তবে সেই মৃত্যু হবে শ্বাসরোধে, অবজ্ঞা, ভ্রান্ত আনুগত্য, আর হারানো সুযোগের মন্থর বিষপ্রয়োগে। ততদিন কলকাতাকে নিয়ে চিন্তা সত্যিই কারো আছে কি?

নবাবী পরিচারক

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে এ দেশে আসে ইংরেজরা। কিন্তু তারাই মুঘল সম্রাটদের হাত করে তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের হারিয়ে সেরিঙ্গাপটমে টিপু সুলতানকে আর পলাশীর রণ-তামাসায় যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলাকে জয় করেন। তারপর তখনকার দিনে সাহেব জাতের কাছে শমনের মতো ধর্মাবতার কলেক্টরকেও তুচ্ছ করে আঠার শতকের শেষার্ধে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে। এই সময়ে ভারতীয় বাণিজ্য তাদের কব্জায় এসে যায়। এক সময় যারা ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধের জন্য ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এসেছিল তারাই সারা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র অধিপতি হবার দিকে এগিয়ে চলল।

ভারতে ইংরেজ পর্বের আদি যুগে যে সব সাহেবরা অর্থাৎ কোম্পানির চাকুরে আর স্বাধীন ব্যবসায়ী ভারতের টাকার গন্ধকে মাড়া দিতে এসেছিল তাদের ছিল রাজরাজত্ব। তখন কোম্পানির চাকরেরাও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারত।

সেই 'এলোমেলোর করে যেমা লুটে পুটে খাই'-এর দিনে বহু ইংরেজ ভিড়ি কাঁড়ি টাকা করে গতর বা বুদ্ধি খাটিয়ে নয়, কেবলমাত্র বজ্জাতি আর অবিবেচনার ফলে সরে।

বড়লোক এইসব জ্বালানো ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ ভারত ফেরতা ইংরেজদের তাদের দেশওয়ালি ভাইয়েরা হিসেব করে নবব্ (নবাব) নাম দিয়েছিলেন। হুক বলে একজন আঠার শতকের রসিক ইংরেজ লেখক বলেছিলেন এইসব ভারতফেরতা ইংরেজরা raised the price of everything in his neighbourhood from good eggs to rotten boroughs.

ভারতে নবব্রা থাকত রাজার হালে, অবিবাহিতরা বিবি বিবিদের নিয়ে এবং বিবাহিতরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে। তাদের ঘর সংসার দেখাশোনার জন্য এক পটল চাকর পুষত। সেই চাকর বাকরও এত বেশি ছিল যে ধলতে গেলে তারা বিশাল বাংলো ছাপিয়ে বাড়ির ছাতার চতুর্দিকেও ছড়িয়ে থাকত।

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রধান শত্রু ফাউলিসের স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের শত্রুর আর সেক্রেটারি অফলেকজাণ্ডার ম্যাকরাবী অবাক হয়ে লিখেছিলেন যে 'জানা যায় না চারজন লোকের তদারকি করতে একশ দশজন চাকর। আর আমরা কিনা বলি আমরা অর্থনীতিবিদ।'

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারদের প্রায়ই ফতোয়া জারী করতেন যে, কোম্পানির কর্মচারীরা যেন তাদের বাবুয়ানি ছেড়ে কম চাকর বাকর নিয়ে জীবন চালায়। কিন্তু সেই পালতোলা জাহাজের যুগে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কর্মচারীদের সামলাবার চেষ্টার কোন ফল হত না। তাই আঠার শতকের দ্বিতীয় ভাগে দু-চারজন বাদে সাহেবরা এদেশে অলসভাবে বাবুয়ানি করে কাটাত। এই জীবনের জলজ্যান্ত কর্ণনা আমরা জ্যাকিন্টশের ট্রাভেলস্-এ পাই।

বেশি চাকর-বাকর যে কি জ্বালা হতে পারে তা সাহেব বাবুরা খুবই আনুষ্ঠানিক ভোজের সময়। আপ্যায়নকারীর নিজের চাকর-বাকর ছাড়া প্রত্যেক অতিথি তাদের আপন আপন খিদমদ্গার আর হুক্কা-বরদারদের নিয়ে আসত। অনেক পুরনো ছোবাই ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় যে খাওয়ার টেবিলের চারপাশে চাকর-বাকররা কি ভাবে সৈন্যদের মতো মোতায়েন হয়ে থাকতো। গরমকালেও নিমন্ত্রিতরা ডিনার স্যুট পরে আসতেন। আর ১৭৮৩-৮৪'র সময় যখন টানা পাখা ছিল তখন তাদের কি দুর্ভোগ হত তা বলার দরকার হবে না।

এই কাজ খানিকটা কমাবার জন্য বার্চউড সাহেবের বিখ্যাত 'এক্সেজ চ্যম ওন্ড কালকাটিতে' দেখা যায় যে প্রেস্টিজ তাঁর খানার নেমন্তন্ন চিঠিতে হুকুম দিতেন যে কেউ যেন একমাত্র তাঁর হুকোবরদার ছাড়া অন্য কোন চাকরকে সঙ্গে করে না আনেন।

ম্যাকরাবী সাহেব যে একজনের দশজন চাকরের কথা বলেছিলেন তাদের সকলের কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ ছিল না। এই হিসেবের মধ্যে প্রধান প্রধান চাকর-বাকর ছাড়া তাদের সহকারী আর হয়তো সহকারীর সহকারীদেরও ধরা হয়েছিল।

বাড়ির কাজের লোকদের মধ্যে প্রধান ছিল বেনিয়ান। বেনিয়ানরা—হকসন জবসন যাদের 'গ্লসারি' বা 'ভাষা বিলারিটি' বলেছেন তাদের এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগেই জাহাজে নিয়ে পাকড়াও করত। এইসব নবাগতদের বেনিয়ানরা বাড়ি ঠিক করে থাকার ব্যবস্থা করে দিত, আর নিজেরা তাদের সংসার চালানোর কর্তা হত। টি বি পি স্পিয়ার তাঁর 'দি মহোবল' বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন যে, এরপর একজন বেনিয়ান যদি খানিকটা বুদ্ধি খাটিয়ে খানিকটা লোভ সামলে কাজ করতে পারত, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই সে তার মনিব যে টাকার স্বপ্ন দেখত সেই নিজে তার মালিক হওয়ার দিকে এগিয়ে যেত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেনিয়ানরা কোন মাইনে নিত না, তাদের আসল আয় হত অন্য নানান দিক থেকে। যেমন তার রোজগারের প্রধান উপায় ছিল দস্তুরি।

সাহেব বিবিদের জিনিস পত্তর কেনার সময় বেনিয়ানরা প্রত্যেক টাকায় দু পয়সা করে দোকানদারদের কাছ থেকে নিত।

থ্রেকেরিয়ান তাঁর 'ডাক বাংলো' বলে হাসির নাটকে বেনিয়ানকে দিয়ে যে বলাতে পারিয়েছিল তার একাংশ এই রকম.

And so while I am growing rich/the fool is getting poor, he/Laments a fact the cause of which is nothing but dustoors.

বেনিয়ানের রোজগারের দ্বিতীয় রাস্তা ছিল তার হিসেব রাখার কারচুপি। সেই হিসেব যে এমন ঘোর প্যাচ দিয়ে তৈরি করা যে খুব কম সাহেবেরই সাধ্যের সাধ্যি ছিল যে বেনিয়ানের ধারা-বাজি ধরে। ম্যাকরাবী তাঁর ইণ্ডিয়ান চাকর-বাকরদের প্রায় করে লিখেছিলেন 'কলিসে এই মুহূর্তে তার সরকারের (বেনিয়ানের আর একটা নাম) উচিত হবে নিজে নিজে। তার কারণ এই যে সেই সরকার হিসেব গুলিয়ে দেওয়া সাইত্ত সাহেবের চেয়ে করেছিল।' সাহেবদের রোজ উচিত ছিল জেরা করে বেনিয়ানের একচেটে ছিল এই জেরা করে বেনিয়ানের কোনরকমে ধরে বেনিয়ানের দু পয়সা করলে মজা কি ছিল।

বেনিয়ানের তৃতীয় এবং সবচেয়ে লোভনীয় টাকা কামানোর রাস্তা ছিল তার মনিবের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তিতে মনিবের হয়ে টাকা ধারের ব্যবস্থা করা।

বেনিয়ানরা সাধারণত একশ ২৫ আর সাহেবদের কাছে কিন্তু ছিল খানদানি খুঁতখুঁতে ছিল। অতএব সাহেবদের সবচেয়ে চোখা-চোখা গালিগালাজগুলি বেনিয়ানদের জুটত।

আর একজন বেনিয়ানের গোত্রের কমতাঁ ছিল—দুভাষ বা মো ভাষী। বাংলাদেশে তাদের নাম ছিল মুন্সী। উনিশ শতকে মুন্সীর একটা বড় কাজ ছিল হুবু-সিভিলিয়ান বা কমপিটিশনওয়ালাদের চাকরিতে পাকা করার জন্য ফার্সী, উর্দু কিম্বা হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিয়ে পরীক্ষায় পাশ করানো। সিনি জবাবে পরীক্ষাকে ছোকরা সিভিলিয়ানরা যমের মতন ভয় করত।

হাউস ওয়াইফ : ওহ্লো, খানসামা, বোলো — আমি আজ এই পেয়ার টু পে টু আনান এ কে মন্ত লস্ট, আমি খাব টেন হুড।

খানসামা : আচ্ছা, মেম সাহাব, আল বা মর্ত্তিন —নিজে এক আনা—মুর্গ দো পাই—লাহোরী দো পাই—ঘস্।

এছাড়া অন্য সদস্যদের বিশেষ কারও ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারে মোড়ল ছিল খানসামা। সে কখনো টেবিলেরও তদারকি করত। সিলভার আর গ্লাসিয়ারের 'ফিকাকো' মাইকের পুর-বার যতদূরই তার জানা ছিল বলা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মতাও ছিল, যা পুরুষের ছিল না। খানসামা এবং জোমাদারের বাজার ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিল। সাহেবের মেজাজ ভেবে হওয়া হাল্কা সে স্যুপ-কারি, জ্যাম, জেলি তৈরি করত। আর রাজনিক খানের খাবার-দাবার তৈরি করার সূক্ষ্ম কারুকাজগুলোর দিকে নজর রাখত।

বেনিয়ানের ধরিকাতি যেমন সাহেব-কর্তাদের ছাড়িল পেত না, তেমনি খানসামাকে নিয়ে মেম-বিবিরা মাঝে চুল ছিড়ত। তবে অধিকাংশে মেম-সাহেবরাই জয় নিতেন। কিন্তু মাদ্রাজবাসী মেম-সাহেব যেমন মৃত্যিকার 'লেটারস ফ্রম ইন্ডিয়া' লেখিকা মিসেস কে জানিয়েছেন-একবার তাদের শাসন করতে গিয়ে তাঁর কি হাল হয়েছিল। এক পার্টির কাস্টার্ড তৈরি করার জন্যে যখন তাঁর খানসামা কাছে এক গ্যালন দুধ আর তেরটা ডিমের খোসা দেখতে তখন তিনি তাকে পত্রপাঠ জবাব দেন। এর পরে যে লোকটি খানসামার চাকরির জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাকে তিনি বলে যে তিনি বাজারের দরদাম খুব ভালোই জানেন, তাই এ ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত সহ্য করেন না। তাঁর কথা শুনে [illegible] বাবুর্চি দু-গুণ মাইনে চায়। [illegible] দেখে মনে হয় যে মিসেস কে-কে চাকর-বাকররা ভয় অফিসার তার বার্ষিক রেজ এর দর্শিত বিভিন্ন মেম-সাহেবের মতন মনে করত।

খানসামাদের উপরি রোজগারের চোট যে খুব লোকের ছিল না সে কথা আজকের বলার দরকার নেই। মিসেস কের প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর পরে এসে মার্টিন এসেছে আসেন। হয়ত মিসেস কের কথা মনে রেখেই তিনি লিখেছিলেন যে, যে সব মেম-সাহেবরা এদেশে এসেছিল বা তাঁরা এদেশে বহুদিন থেকে নিজে লোকেদের ধরন-ধারণ এবং স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, প্রায়ই দেখা যায় তাঁরা খানসামাদের বিশেষ কিছু বলতে নিতেন না। নিজেরাই তাঁদের ঘর দেখেন, নিজেরাই কঠে আর কমল ওজন করে বার করে দেন, তেল মেপে দেন, আর ডিম গুণে দেন—। এতে অবশ্যই খানিকটা খাটা-সমস্যা হয়। কিন্তু এও ফলে চলবে না যে, খানসামাকে আজার-ধরনের উপর একটু লাভ করতে না দিলে সে-ই বা কি করে মন দিয়ে কাজ করবে। কারণ কেবল সামান্য মাইনের ওপর নির্ভর করে তার পক্ষে আর বিবাহ সংসার চালানো সম্ভব নয়। এসব ব্যাপারে খানসামাদের যে সামান্য মাইনের কথা বলেছেন তা তখন ছিল মাসে পাঁচ টাকা।

বাবুর্চিখানার খানসামার পরেই ছিল খিদমদ্গার। যদিও সে কখনো সখনো রান্নাবান্নার খানিকটা সাহায্য করত, তবে তার প্রধান কাজ ছিল খাবার টেবিলে ওয়েটারের কাজ করা। বাড়িতে, লোকের বাড়ির সেবকরা এবং আনুষ্ঠানিক ভোজে সে সব সময় খাওয়ার টেবিলে তার মনিবের পিছনে গিয়ে দাঁড়াত। মুসলমান বলে খিদমদ্গাররা প্রথম প্রথম ওয়েটারের মাপে পরিবেশন করতে রাজি হত না। তবে কোনো ওয়ারী প্রাক্ট লিখেছেন যে, তাদের অবশ্য কম গোঁড়াদের এতজনকে শুধু ওয়েটারের মাপে ছুতে নয়, লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতে দেখা গেছে যে তাদের এই প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত বেশি টেকে নি।' তবে যদিও খাবার ব্যাপারে সাহেবরা ছেড়ে, অন্য ব্যাপারে তাদের খিদমদ্গারদের কাছে হার মানতে হয়। সেটা হল চর্বি দেওয়া মোমবাতির ব্যবহারে।

১৮৬৭ সনের ১৭ই মার্চের 'ক্যালকাটা গেজেটে' দেখতে পাওয়া যায় যে স্যামুয়াল ক্লার্ক বলে একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী একটা বিজ্ঞাপন জারি করেছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনে তিনি দৃঢ়তা করে লিখেছিলেন যে খিদমদ্গারদের চর্বির তৈরি মোমবাতি ব্যবহার করতে যা চাওয়ায় তাঁর ব্যবসায় খুব ক্ষতি হচ্ছে। খিদমদ্গারদের এই অনিচ্ছাকে প্রবল দেওয়ার জন্য স্যামুয়াল ক্লার্ক তাদের মনিবদের এক হাত নিয়েছিলেন। তবে ব্যবসা সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান থাকায় ক্লার্ক বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ব্যাপারে তিনি লাচার। তখন তিনি ইউরোপ-চাহিদের চর্বিহীন মোমবাতি বাজারে ছাড়েন। তিনি আরও জানান যে, আমি টনল মল দরে অর্ডার পেলে এই মোমবাতি তিনি জোগান দিতে পারেন। আর তিনি একসঙ্গে দশ দশ মোমবাতি অর্ডার দেবেন তাঁরা যেন কিছু ছাড় পাবেন।

বাবুর্চিখানার ভেতরে—মাজব ছিল বাবুর্চির। বাবুর্চিরা সাধারণত মুসলমান, পর্তুগীজ, মগ কিংবা নিচু জাতের হিন্দু হত। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, বাবুর্চি যদি না পর্তুগীজ বা মগ হত তাহলে সে ঠেঁয়ে কখনই খাবার চাখতে চাইত না, যা ইউরোপের গৃহিণীরা সুখাদ্য তৈরির জন্যে অপরিহার্য মনে করত। সাহেব গৃহিণীদের কথা যদি সত্যিই হয় তাহলে আমরা পুরানের বইগুলে যে সব সাহেবি লাঞ্চ ডিনার বা আনুষ্ঠানিক 'ফর্মাল খানার' ভিতে জল-পড়ার মতন খাবারের বর্ণনা পাই, তা দেখে মনে হয় যে সব খানসামারাই নিজের পয়সা শুধু চাখতেই না হয়তো বেশ পেটপুরেই খেয়ে নিত।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাবুর্চির মাইনে ছিল ছয় টাকা থেকে বারো টাকা এবং তার আগে নিশ্চয় আরো কম ছিল। সুতরাং ঐ মাইনেতে তখনকার দিনেও কারুর পক্ষে বাবুর্চিকুল পুষিষ্টির হওয়া সম্ভব ছিল না।

জাকনাতেওলেতে যেখানে শাসন করবার মেমসাহেব থাকত না, সেখানে বাবুর্চিরা ভোজেদের বিল খুব মোটা করে দেখিয়ে খু পয়সা উপরি রোজগার করত। সারাদিন পরিশ্রমের পর সাহেবরা ডাকবাংলোয় এসে হয়তো নিশ্চয়ই যেন হাসপাতালের ঘীক্ষ বা মর্টন স্টেকের স্বপ্ন দেখত। কিন্তু আসলে দেখা যেত ডাকবাংলোর বাবুর্চিরা সাহেবদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং সন্ধ্যেবেলার জন্য মুরগি ছাড়া অন্য কোন মাংস কিনত না। এখানে ট্রেভেলিয়ান সাহেবের আর একটা গল্পের একাংশ তুলে দেওয়া হল:

And every night and morning
The Khansamah he shall kill
The Sampleamul Moorghye
And we'll all have a grill.

খাবার মাংস ব্যাপারে আর একজন কাজের লোকের নাম করতে হয়। সে হল মশলচি—যার নামের আক্ষরিক মানে হল মশলা বাটা। ঘোড়ার ঘোড়ার মশলাটি পাটি বা ঘোড়ার গাড়ির আরোহীদের সময় হাতে মশলা পিষে লাগায় আগে দেখিয়ে ছুটত। কিন্তু দিনের শেষে রান্নাঘরে সে বাবুর্চি খিদমদ্গারকে রান্নাবান্নার ব্যাপারে একটু আধটু সাহায্য করত। উনিশ শতকের ঘোড়ার পিঠে ঘর্ত ভ্রাভেলসিয়ান লিখেছেন যে,

মন্দলটিরা কি করে ঘণ্টায় আট মাইল জোরে ঘোড়ায়-গাড়ির সামনে ছুটত তা বিস্ময়ের ব্যাপার। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে অসংখ্য মন্দলের আলো দেখতে ঠিক জুঁইর মতো মনে হত। কিন্তু এদেশে রেল আসার পর আর কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলতে শুরু করলে মন্দলটির দিন ফুরিয়ে গেল। কোলনওয়ার্লি গ্রান্টের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৮৫০ এর পর মন্দলটির প্রতিপত্তি কমে গিয়ে বিলাস দ্রব্যের ভূতের মতো টিকে রয়েছে। এক কালের আলোকদাতা আর এখন বেচল টাইগারের ঠেকনোওয়ালা মন্দলটির বাবুটিখানার উনুনের আগুন উসকে দিচ্ছে, ছুরি-কাঁটা-প্লেট-ডিশ ধোয়া মোছা আর ঐ ধরনের ফুটরো কাজ করছে।

তারতে ইংরেজ পরিবারে মন্দের ভাঁড়ার দেখাশোনা করত আবদারয়া। বাণ্ট সলডিনস্ তার সুবিখ্যাত কিশল ছবির অ্যালবাম 'লি কস্টিউমস্ অফ হিন্দুস্থান'-এ লিখেছেন যে আবদারের কাজ ছিল সল্টপিটার বা সোরা দিয়ে জল বা মদ ঠাণ্ডা রাখা। এ ছাড়াও সে মধ্যে মাঝে বরফ টেবিলে দিয়ে দাঁড়াত। গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কলকাতায় যখন আমেরিকা থেকে বরফ আমদানি শুরু হল তখন থেকেই এ শহরে আবদারয়া উঠে যেতে লাগল। সারা বছরে সপ্তায় বরফ পাওয়ার ফলে দেখা গেলো যে বাড়ির অন্যান্য চাকর বাকরদের মধ্যে একজন চাকর অনায়াসেই জল আর মদ ঠাণ্ডা রাখতে পারে। কিন্তু যে সব অঞ্চলে আমেরিকান বরফ পৌঁছত না যেমন হরকরা বা পশ্চিমদেশে সেখানে আবদারয়া অনেকদিন টিকে ছিল। তবে এটাও ঠিক বড় বড় ক্লাব আর হোটেলে মদ পরিবেশনকারীকে আজও আবদার বলা হয় বলে অতীতের সেই স্মৃতি এখনও বেঁচে রয়েছে।

আবদারের নাম শুনলেই হুকাবরদারদের কথা মনে আসে। হুকাবরদারের কাজ ছিল পড়পড়ার তামাক সাজা এবং ঠিক সময়ে মনিবের সামনে হাজির দেওয়া। তাছাড়া সাহেবরা যখন বাইরে খানা খেতে যেত তখন হুকাবরদার সাহেবের প্রিয় গড়গড়া নিয়ে হাজির থাকত—সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

আঠার শতকে হুকোর জয়জয়কার ছিল। তখন প্রায় সব সাহেব এমন কি তাদের বিবিরাও হুকো টানত। রাত্তিরে নৈশ ভোজের পর যখন অন্য সব চাকর বাকরয়া চলে যেতো তখন হুকোবরদারয়া আর আবদারয়া সাহেব-মেমদের মদ আর হুকো যোগাত। মন্দলটিরা যেমন যানবাহনের আলোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যায়, আবদারয়া যেমন মার্টিন বরফ আমদানির সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল, তেমনি হুকোবরদারদের কাল হল সাহেব-মেমদের দাঁতন বদলানো।

কোলনওয়ার্লি গ্রান্ট লিখেছেন যে ১৮৫০ সালে সাহেবদের হুকোর সংস্কার আস্তে আস্তে উঠে পড়তে লাগল। হবসন-জবসনের খুব লেখক বাহাদুর লিখেছেন যে তিনি যখন ১৮৬০ সালে জাহাজ থেকে মাদ্রাজে নামেন তখন দেখেন যে সারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মাত্র আর জন সাহেব হুকো টানত। আর ১৮৭৮ সালে একজনকেও হুকো টানতে দেখা যেত না।

খাওয়া-দাওয়া, বসে গল্প করা আর রাত্তিরে শোবার সময় যারা বৈদ্যুতিক ফ্যানের আগে ইংরেজ পরিবারকে পরমের হাত থেকে খানিকটা শান্তি দিত তারা ছিল পাখাওয়ালা। ছাদ থেকে ঝোলানো বস জোড়া লম্বা কাপড়-ঢাকা টানা পাখা শুধু গরম দূর করা নয়, মশা-মাছির উপদ্রব থেকেও সাহেব বিবিদের রেহাই দিত। শোনা যায় ১৭৮৪ থেকে ১৭৯০ এর মধ্যে একজন ইউরোপীয় কেবানি টানা পাখার আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর অনেকদিন পর্যন্ত পাখা গুলি খাওয়া-দাওয়ার সময় টানা হত। সাহেবদের লেখা আর ব্যঙ্গচিত্রে পাখাওয়ালাদের দেখা যেত যে তারা 'এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের' 'ডোরমাওসের' মতন সর্বক্ষণই চোখ বন্ধ করে ঢুলছে।

পাখাওয়ালারা ছিল সাধারণত হিন্দু এবং তাদের মধ্যে বেশ একটা বড় ভাগ ছিল ওড়িয়া। তারা এক সময় সাহেবরা গরু-শুয়োর খেত বলে পাখা টানতে নারাজ হয়। কিন্তু তাদের আপত্তিও শেষ অবধি টেকে নি। এই ঘুমন্ত এবং অনিচ্ছুক পাখাওয়ালার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কেউ কেউ আপনি-চলা পাখা তৈরি করার চেষ্টা করেন। এন্না হবার্টস তাঁর একটা লেখায় না বুঝেই আগামী কালের বৈদ্যুতিক ফ্যানের আভাষ যেন। তিনি লেখেন যে বাড়িতে আরও বেশি যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হলে তারতে ইংরেজরা একদিন হয়তো কম খরচায় আপনি চলা পাখা ঘরে ঘরে ব্যবহার করতে পারবে।

বাড়ির ভেতরকার অন্যান্য চাকরদের মধ্যে ছিল সর্দার বেয়ারা। মনিব সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যাবার আগে যখন পোশাক-আশাক পরত, তখন সে সেখানে দাঁড়িয়ে তদারকি করত। আসল কাজগুলো—যেমন মনিবের পা ধুইয়ে দেওয়া, জলখাবার এনিয়ে দেওয়া—এসব সর্দার বেয়ারার তদারকিতে অন্য চাকরেরা করত। পুরানো ছবি দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, বিলেতে খেতে মা পাওয়া বাপে-খেদানো ছোকরা শাবলটার্সরাও এদেশে এসে এমন নবাব পুতুর বনে যেত যে ঘুম থেকে উঠে রাত্তির পর্যন্ত তাদের দু-চারজন চাকর না হলে চলত না। সর্দার বেয়ারার কাছে বাড়ির জলের হাসন-কোসন, তাঁড়ার আর অন্যান্য দামি জিনিসের চাবি থাকত। সে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর, আসবাবপত্র, ঘুতো পরিষ্কার করাতো। সন্ধ্যেবেলার বাতিতে তেল দেওয়া, সলতে পাকানো, ইত্যাদি কাজ দেখত।

আরও একজন সাহেবের ব্যক্তিগত চাকর ছিল—খরচবরদার। সে সব সময় ঘুরঘুর করে সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো ফিরত। এই খরচবরদারয়া আসে যখন সারা দেশে আজব রকমের টাকাকড়ি চালু থাকার জন্য সাহেবরা বিভিন্ন টাকা-পয়সার নরনামের হদিশ পেত না। তারপর তারতের নানা জায়গায় টাকশাল বসলে সারা দেশে এক রকমের টাকা-পয়সা চালু হয়। তখন খরচবরদারেরও কাজ ফুরিয়ে গেল। তবে কিছু কিছু সাহেব লোকদেখানোর জন্যে খরচবরদার পুষত।

এইবার আমরা ইংরেজ পরিবারের বাড়ির বাইরে থেকে বাতায় ঢুকছি। বাড়িতে ঢুকতে গেলেই প্রথম যার দেখা পাওয়া যেত সে হল দারোয়ান। ইংরেজদের বাড়ির দারোয়ান বা দারোয়ান সাধারণত ছিল একজন দশাশসী পশ্চিমী হিন্দু। তার হাতে থাকত বন্দুক, গায়ে ঝোলানো থাকত তরোয়াল। তবে সেগুলো সে কখনই ব্যবহার করত না।

তার জমকালো পোশাক ছিল দেখবার মতো। দারোয়ানের আসল কাজ ছিল কেবল চুপটি করে বসে থাকা। এই অকেজো জীবনটাকে সে খানিকটা পুষিয়ে নিত সকাল বিকেলে বিশাল বিশাল মুতর ঠেঙ্গে আর নয়ন তারি তারি জিনিস নাড়াচাড়া করে। বাড়িতে কোন অভ্যাগত এলে সে ঘণ্টা বাজিয়ে মনিবদের তার আগমনবার্তা জানিয়ে দিত। আর খুব সতর্কভাবে না হলেও সে নজর রাখত কেউ যেন তাকে ডিঙিয়ে ঢুকতে বা বেরুতে না পারে।

বাড়ির বাইরে চাকরদের মধ্যে অনেকেরই কাজ ছিল নানান যানবাহনের দেখাশুনা করা। আঠার শতকে এই যানবাহনগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল পাল্কি। সাধারণত পাল্কি বইতে ছ'জন বেয়ারা লাগত। আর তাদের কর্তা ছিল জমাদার। জমাদার কখনই পাল্কি কাঁধে নিত না। সে তার বিশিষ্ট ভঙ্গিমাটি এঁটে পাল্কির পাশে পাশে হাঁটত। খুব বড়লোকের পাল্কির সামনে রাস্তায় ছুটত সৌটাবরদার।

এই সৌটাবরদার নামটা এসেছে তাদের হাতে রুপোর বেটন বা সৌটা থাকত বলে। এটা তাদের ব্যাজের মতন ছিল। পাল্কির সঙ্গে আর একজন লোক থাকত তার নাম ছিল চোবদার। তার হাতে থাকত একটা পাঁচ ফুট লম্বা লাঠি। সৌটাবরদার এবং চোবদারদের আরও কাজ ছিল—চিঠিপত্র, খবরাখবর চালাচালি করা। তাছাড়া তারা বাড়ির ছুল খরচের দরজায় দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের নাম ডাকত।

খবর, চিঠিপত্তর দেওয়া নেওয়ার লোক

ছিল হরকরা। এই হরকরারা কাজের সময় হাতে লাঠি রাখতে পারত। তা সেবাদাররা পারত না।

পাল্কির পর যখন ঘোড়ার গাড়ি চালু হল তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কচুয়ান, সহিস আর চাবুক-সওয়ার। শেষোক্ত জনের কাজ ছিল ঘোড়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে বাগে আনার। এছাড়া ছিল খেদুড়ে : এর কাজ ছিল ঘোড়াকে খাওয়ানো। যদি সাহেবের বজরা থাকত, তাহলে সেই বজরার জন্য থাকত একজন প্রধান মাঝি, হাল ধরার জন্য গলুই, আর দাঁড় টানার লোক। পশ্চিমে যেখানে সাহেবরা উট রাখতেন সেখানে উট চালানোর যে ওস্তাদ থাকত তার নাম ছিল সুরমান।

দৃশ্যত কেতাদুরি করা বাগান সাহেবদের বাড়িতে না থাকলে চলত না। বাগানের দেখাশুনা করত মালি তার সাজো পাজো নিয়ে। কুকুরের দেখাশুনোর ভার ছিল দুবিয়ার : হুবসন-জবসন্ থেকে জানতে পারা যায় এই দুবিয়া নামটা এসেছিল কুকুরের গলায় ঝোলা ঘন্টি থেকে।

সাহেব-বাড়ির চাকরবাকরের পদটনের মধ্যে আরও অনেকে ছিল যারা ছিল ঠিকে। এরা হল ভিস্তি বা জল দেওয়ার লোক, ছাগল-ভেড়া দেখার ভেড়িওয়ালা, দর্জি, ধোপা, নাপিত। এছাড়া ছিল বেহারা আর বেহারনী।

আমরা সবশেষে আসছি বাড়ির পরিচারিকাদের কথায়। এদের মধ্যে কত্রী ছিল আয়া। ইস্ট ইণ্ডিয়া ভ্যাডিমেকুম বা ভারত দর্পণীয় হ্যাণ্ডবুক এবং আরও অনেক বইয়ের লেখক ক্যাপ্টেন টমাস উইলিয়ামসন, ম্যাজেবাবী, মিসেস মেং মতন অনেক সাহেব বিবির এমন আস্থাভাজন ছিল যে তারা বলে গিয়ে যে ভারতীয় চাকরবাকরেরা পুরোপুরি বেয়াদব। তাই আশ্চর্যের বিষয় এই উইলিয়ামসনই বাবালোগ বা সাহেবদের ছেলে মেয়েদের লালনপালনে দেখাশুনার জন্যে আয়ার খুব প্রশংসা করেছেন।

আয়াকে সাধারণত দাক্ষায়ের দুধ দেওয়ার ধাত্রী হিসেবে বহাল করা হত। তারপর ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে বড় হলে তাদের দেখাশুনার জন্য আয়া পুরোপুরি কাজে কায়েম হয়ে যেত।

ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন্ লিখেছেন যে, আয়ারা ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসত। এ ব্যাপারে তারা বিলেতের নার্সদের চেয়েও ভাল ছিল। কারণ বিলেতের নার্সরা ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা ছেড়ে দিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে চেয়ে থাকে বই পড়েই দিন কাটিয়ে দিত। ইংরেজ পরিবারের চাকরবাকরের ফিরিস্তি পুরো হবে না, যদি না আমরা সেই সব ছেলে ক্রীতদাস আর যুবতী ক্রীতদাসীদের কথা না বলি। এরা 'সেক্স বয়' আর কত্রীর ব্যক্তিগত ঝি হিসেবে কাজ করত।

আমরা ওপরে যা বললাম তার থেকে পুরনো দিনের সাহেবদের চাকরবাকর, আমাদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়। এদের মধ্যে খানসামা, বরোয়ান, আয়া ইত্যাদি দু-চারজন ছাড়া অন্যদের আজ আর দেখা যায় না। ইংরেজ ও ইউরোপীয় শিল্পী লালডিনস আর স্যার চার্লস ডয়লির সৌজন্যে আমরা এইসব কাজের লোকেদের আর তাদের বিশেষ বিশেষ চাকরির সব পোশাকের সুন্দর লিথোগ্রাফ ছবি দেখতে পাই।

এই লেখার সঙ্গে কিছু ছবি ছাপা হল। এইসব ছবি আর পুরোন দিনের লেখা পড়ে মনে হয় পুরোন দিনের সেই কাজের লোকজনরা যেন জলজ্যান্ত হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেখতে দেখতে আর পড়তে পড়তে মনে হয় আবার আমরা সেই লোকদের কর্মরত দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় দেখতে পাচ্ছি যে চতুর বেনিয়ান তার হিসেব কষছে। সৌম্য চেহারার খানসামা মেমসাহেবকে হিসাব বোঝাচ্ছে, বাজার-ফেরত চেহারার জমাদার পাল্কির পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে, হরকরা তার ছোট্ট ঘরে চুপ করে বসে ঢুলছে।

আর 'কোই হ্যাঁয়, কোই হ্যাঁয়' ডাক ছাড়ে যেতেই হরকরা ঢুলনি ছেড়ে তড়াক করে উঠে মনিবের হুকুম তামিল করতে ছুটে আসছে।

প্রচলিত পথে
গতানুগতিক বাণিজ্যিক সাহিত্য

সমাজমন

পরিবেশন করেনি
এবং
রাশিফল কিংবা পাঁজি ছাপায়
তার তীব্র অনীহা।

ইতিহাস কালের দিকে

সিদ্ধেশ্বর সেন

ইতিহাসকালের দিকে চলে গেছে
আমাদের ছলনা—
কেই নেই

আমি ও সে-এই-ই আছি, আর
চলাচলের ঘোড়, পথচালে, ঘূর্ণির ট্রাফিকে,
আর্থিক ও প্রার্থনার চেয়ে, নির্নিমেষে

ইতিহাসকালের দিকে চলে যায়, আমার
অজ্ঞানে—
ধাক্কা খেয়ে, প'ড়ে

হেমন্তের শীতলছায় পাখিপাখালির
প্রেমে, ভোরে
শান্তির আপাতনিকৃতে, অতর্কিতে

'হে অগ্নি, বিধা হও' চিত্রের পৌরাণিকে
কৃত্রিমতাও পড়েছিল ঢ'লে, ক্ষণে
কেন আউটরামের আধুনিকে, ঢুকিয়ে ছোঁ মেরে

হিরণ্ময় ঝড়-ও ওঠে—
অন্তরঙ্গ,
নিশ্চয়ে মেতে

পলাশে-ছিটায়, দক্ষজিঘাংসে, কাঁপন হাতে,
ভবে, দৈর্ঘ্যের—
ভবে, জাগিয়ার সময় হয়েছে!

আমাকে কুড়োতে দাও, আমাকেও,
প্রতিটি অক্ষের টুকরো, প্রতিটি
ছাইয়ের পরীরী কণা

প্রত্যেক-অনুষ্ঠী মহিমা,
ঘুরে নিতে দাও—
ঐ নিজুমের-কপালের, কঙ্কালের পাপ

আমার চাওয়াও তাই তোমার—
চাওয়ার মতো চোখের
পাতায় স্নেহে, তারপর

অথবা গান্ধারী যেমন ঢেকে চোখ,
অপরাধী, নই—
তবু অপরাধী!

প্রেত প্রহরীর মতো এই, আমরাও,
ঘুরে বুঝি
জিজ্ঞাসারই ঘেরটি

প্রতি প্রশ্নের নিবৃত্তির অনুকৃতি
প্রতিনিয়ত
করেছি ছলন

কেউ কী কোথাও তর্জনী
রেখেছি, উঁচিয়ে—
সনাক্তিকরণে

ব্যক্তিক-সামাজিকে, কতদূর
জীবনের হত্যার গুপ্তির
—পরিধি

তাই কী ঢেকেছে, আজ,
ভাগলপুরীতার কিংবা গ্রহমন্দিরের
ফোরা ও কি সুলতানগঞ্জের

সঙ্ঘের বাঁশীকে নিয়ে, অন্য
জিঘাংসুর
অনুপোর কঙ্কার দাঁড়

নাকি জীর্ণ মমুদ সে-সব পাহাড়
মধ্যে ঘ'রে নিতে—
দুর্গও?

ইতিহাসকালের দিকে, অমোঘ,
চলে গেছে
আমার অজ্ঞেয়

উৎক্রান্তির দিকে,—মেয়ে,
পতিমুখ
ভিখারে আ আর

ঐতিহ্যসন্ধানে—
ধূলিমলের ডালা পালকে
বিধেয়ে বাসনা

ওহ, আমি ছেয়ে
আমি, সে,—
সময়ের ভিতরের সাক্ষো

পারম্পারিকতার—
বাধার নির্দেশে

আমার ভালবাসার দেশ, আমার
লজ্জারও দেশে,
মোচাবে না আয়তির অভিলাষ!

আমার নগরী জাগে, পথচাপ, আজ
উড়িয়ে দিলুম,
শতধূলি

এক ছিন্ন কোটি ছিন্ন তার,
—মুহূর্তের—
মেয়ে অন্তর্ভেদি

ভগ্নস্তূপাকাশযা ছেড়ে
ওঠে,
পথে-পথে ঘোরে

তোমার ও উজ্জীবনে, হেনে
মন্ত্রোচ্চার ॥

'তুষার, সে তো জলের ধূলিকণা'

চীনা প্রকৃতিপাঠ

উৎপলকুমার বসু

(১)

মশলায়
জিভ পুড়ে যায়
পান
অগ্নিসমান
জর্দা-কিমাম আর কেশর-সুপুরী
বরফ কাঠের বাক্সে
বহমান জলের দু'পাশে
রাংতায় মোড়া নুড়ি
গান
বিদায়ের, খৃষ্টবিমান,
মানুষকে শূন্যে তোলে, উড়ায় আকাশে, ওড়ে
হাঁ-মুখ গহ্বরে,
মশলায়
হাঁধছে নানকুলোহী, জাতিস্মর, দৈত্যের কোলে-বসে-থাকা
বিভাজিত নর

(২)

নেতা আসে
মন্ত্রী আসেন
হাসি মুখ, হাসি-হাসি মুখ, হাসি
আজকে বিদায়ের কাশি
পানরাঙা
এ-বছর ফসল ফলে নি
গাছে পাখি নেই
স্রোতে মাছ নেই
এসেছেন নেতা
উনি অর্ধেক দেবতা
বাকি অর্ধেক
থাকে
ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ঐ আমলাদের ঝাঁকে
মুখ্যসচিব আর বিভাগীয় হেড আর পুলিশ প্রধান
বরফের বাক্সে চাপা রাংমোড়া খিলি খিলি পান
আমি ভালোবাসি
কচি কচি মন্ত্রীদের গালভরা হাসি

(৩)

অর্কিড সহজ ফুল—কিন্তু তারও জটিলতা চাই
হাওয়ায়, বাতাসে। মাঘ মাসে, শীতে
তাকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় ফুটে উঠতে দেখি।
আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ, ট্রাক থেকে ইটগুঁড়ো পথ,
দূরে ভোজন ক্যান্টিন, কিছু সাদামাটা পাইনের গাছ,
এ-সবের মধ্যে কোনো ঢালিয়াতি নেই, ঐ হাবিলদারের
দেশ থেকে চিঠি এল, তা কি সুসংবাদ নয়
শুধু অর্কিড, বিকৃত মুখের ফুল, অন্যভাবে ব্যাপারটা দেখছে।

(৪)

আমি জলের ভিতর ডুব দিয়ে যে-সব মাছগুলিকে দেখতে পাই
তাদের নাম জানি না—কিন্তু জানি তুমি বহুদিন দেশ ছেড়ে চলে গেছ
জলের উপর ঝরছে পাতা, তার উপর ভাসছে মাছ, তার উপর উড়ছে নিশান
নিঃসঙ্গতায় এবং তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে।

(৫)

মাঠের ঠিক মাঝখানে খড়ের চালা
তার উপর ন্যাড়ার কম্বল—
সারারাত শিশিরে ভিজেছে
ন্যাড়া কাল ভোরের আলোয় এ-সব দেখে
প্রথমেই বলবে দূর শালা
—তারপর নামগান, গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা, সংসারের টানাপোড়েন।

(৬)

গ্যাল্লি মাছ কবিতা খায়, গল্প খায়, প্রবন্ধ গেলে
এই যে আমি লিখছি এর প্রত্যেক অক্ষরের পিছু পিছু
তেড়ে আসছে ঐ রাক্কোস মাছ
যেমন তার খিদে তেমন তার নির্লজ্জতা
সে কৈচো খায়, পোকামাকড়ও খায় কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য
মানুষের লেখা আর মানুষের শিল্প আর মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ রাধা কৃষ্ণ ॥

পরা ছুটে যেত

কৃষ্ণ যেমন তেমনি যেটি ভাবনাতীত তাকে, তেমনি তাকে ভালবাসা, সেইজন্য ভালবাসার ভালবাসা কারো কৃষ্ণ এক ধর্ম তাকে সমান। তিনি যেমন, তিনি তাকে তেমন। চেতনেরই রকম ভিন ভেদ, তফাৎ, প্রেম, অবিশ্বাস ও ভেদের প্রমাণ। সিটের পাশের এরা অবাস্তবী—দুজনের সম্বন্ধে তারা তিনি দূরে দূরে অনুভবে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই অবিশ্বাসী সেই আসলেই ঘটে।
সৌন্দর্যের বৈজ্ঞানিক আস্বাদনের সঙ্গে এই ঘটনাটির ভেদের যোগ নেই।

কৃষ্ণা : ১

এ অবস্থায় একটি ঘরে দুটি ছেলেদের পর এবং ঘরে যা ভেদাভেদের ভাব ভিন্ন। তারই ঘরে বসিয়ে ওরা ভেদে ভেদে

কৃষ্ণ ভক্তন—কৃষ্ণ ভক্তন—ভক্তন ভেদে—

ভেদাভেদটি এর সাধনে ভেদে ভেদে একটা উঠু মনে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে পরা সাধনে ভেদে

পাছু ভেদে। পাছু ভেদে।

ভাবে ভাবে ভেদাভেদ করে এল। সবু তখন দর্শকদের জানালো:

ভক্তদের ভাবনার ওপরে ভেদে তার বিশ্বাসেরই ভক্তন কি হবে? অথবা ভালবাসার এই ভাবনার সম্বন্ধে ভক্তদের—তা ভাবনার।

এবার ওপর পর সবু ভক্তদেরই দর্শকদের ভাবনার ভাবলেন। ইতিহাসে এর দুটি ভেদের ভাবনার তত ধরে, সবু নিজে হয়ে তাকে বলে

কৃষ্ণ তার ভাবনাভাবনা' আসলে ভেদে ভেদে ভাবনাকে কে জানেছে?

সবু তখন ভক্তদেরই দর্শকদের ভাবনার ধরে বলে

আমি সঙ্গীতের উদ্বুদ্ধের মানুষ। আমার নাম সঙ্গীতশ্রী। আমাদের দুটি যা ধরি যা ভেদ কিছু ভাবতে পারেন। আমার বিশ্বাস—যা, মানুষমাত্রের বিশ্বাস তার ভাবনা। ভালবাসা, ভেদাভেদ, বিশ্বাস, বিশ্বাসের সব ভাবনাতেই আমার স্থান। যদি ভেদে, আজ আমি আপনাদের কাছে কৃষ্ণের কথা ভেদাতে এসেছি। কারণ, এই কৃষ্ণের সঙ্গে আমার আজকেরিনের একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের কথা আপনার পরে নিজেই ভাবতে পারবেন। আর কিছু ভাবনাভাবনার, এখন আমার কথা শুরু করি।

ভাবতে ভাবতে ভেদাভেদ তত হয়ে যায়। সবু তখন টেনিয়ে বলে

শুরু, শুরু সবাই!

তারি ভেদে চোখকে দুর ভিজেছে। সঙ্গীতশ্রী সবু গলার ভাবনার ভাবনায় সমান ভাবে ভুবে ভেদে নিজে আবার

ধর্ম ভাবনা আলা ভাবে হয় যা নিজন।

তারি চলনে পেঁছিয়ে চলেছে এর ভেদেও। আর তার সাথে সবুও গান ধরে

সমান ভাবে ভুবে ভেদে নিজে আবু ভন

ধর্ম ভাবনা আলা ভাবে হয় যা নিজন।

ভেদেনি এই আবহাওয়াটি ভেদিয়ে তন নিয়ে

সর্বনাশের দুটি হয়ে, ভেদো আসে ভাবতে চলিছে।

ভন ভন ভেদাভা তন, ভন ভন ভেদিন তন

ভন ভন ভেদাভা তন, ভন ভন ভেদিন তন

গানের সাথে সাথে পর্দায় এবার ভেদে ভেদে:

ভেদু বিশ্বাস-এর প্রথম নিবেদন
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গান অনুভবে
নিয়ন্ত্রণ আমাদিপুরীর ভাবিত দুটি

॥ রাধাকৃষ্ণ ॥

সঙ্গীতশ্রী সবু তাদির সুরে তান দিয়িয়ে সাধনে শুরু করে। তাদির এবার ভেদে ভেদ নয়। আর তাতে এবার ভেদে ভেদে ভিন্নিয়ন। সবু এবার সত্য আদিয়ে ভেদের দুনিয়ে যায়:

আমার আমা যা তাদারী, তাদের আদের ভাবে
আমার আমা যা তাদারী, তাদের আদের ভাবে
আপনার ভেদে নিয়ে ভেদে ভেদে নিজন ভাবে
আমু ভেদে নিজন ভাবে।

তারি আর ভিন্নিয়ন সাধনে আবে বাজনার তালে আসে

আমাদের এই ভেদো কৃষ্ণ ভেদোরী ভেদার
আমাদের এই ভেদো কৃষ্ণ ভেদোরী ভেদার
কৃষ্ণ না ভুলে ভিন্নে আমার ভাবনা আমার
তন তন তুলারী আমা, তন তন ভিন্নিক আমা।

এবার পর্দায় ভেদে আর পুরুষে নিজের নিমু ভাবিন দুটি। বাজনা তখনও চলছে।

৩) আমার দুটি ভিন্না ভাবনারিই নিয়ে ভেদাভেদ। ভাবে ভেদে
৪) আ আপনার ভেদে ভেদাভেদ
৫) তারি ভাবে ভেদাভেদ

এর পরেই ভেদা আর অবিশ্বাস-অবিশ্বাসী ও বাদী নিয়ন্ত্রিতের নাম।

সবু অবিশ্বাসী আমার ভাবনে ভাবনে আর তখ ধরে.

: আমার ভেদে ভেদেরই মন দুর্বিনা ভেদেরে আর
কৃষ্ণ ভেদে ভিন্নিয়ে—আমা, পরাণ চলায়
দুনি আমার আর তন, তন গতির ভেদে
এমনে ভেদেরও কি আর আ ভেদে সুন্দর ভেদে?

তারি আর ভিন্নিয়ন আবে বাজনা বাজনে বাজনে। সবু গাইছে।

আমার ও আ ভিন্নুরান সমান আমারি
আমার ও আ ভিন্নুরান সমান আমারি
ভেদে ভেদে আমার ভেদে আবে আমি।

আবার পর্দা ছুটে ভেদে ওঠে তখন আবারও নিমু দুটি।

৪) আপনা আমার ভেদনে ভিন্নিয়ে
৫) তন আমে তক আমারে। তাবে তিনি
৬) আমু মুখর সুরার সুন্দরা-এর সাথে ভেদের

এমনি অবিশ্বাসের আনাকুলীনের নামের তালিকা।

আবার নিমু পুরুষে দুটি। সবাই তন্দুর পুটি আর আ আপনার ছবিটিকে নিয়ে। তাঁর দুর্ভোগী এই ভেদাবের দুর তন্দুকে নিয়ে।

এমনি বাদি আনাকুলীনের নামের তালিকা।

এমন সময় ॥ মেয়ে একটা ভোরা ঘটির পর। সবু চমকে চারপাশে তাকায়। আমার ভেদীর ভেদেন ভেদে ওঠে। তত হয় দীপের ঘণ্টা। ওরা দুজনে সাধনে তত করে। সবুও তত করে গান

: তিন তখন আমার আমার পরিন দুর্বা এমা
তিন তখন আমার আমার পরিন দুর্বা এমা
আমার আমার ভেদের আলা, আমার ঘরে ভেদে
আমার আমার ভেদের আলা, আমার ঘরে ভেদে
আমো ভেদে আমে আমে ভেদে আবারারী
আমো ভেদে আমে আমে ভেদে আবারারী
ভেদি আ পাড়ার পথের দুনিয়া ভেদি আ ভিন্নার পারি।

তারি সাধনা আমিয়ে চলেছেন তাদের। চারপাশ আবারে আবারে। দূরে—ভেদো ভেদে দুজনেরি এবা আর সাথে সাধনে নিয়ন্ত্রের পর্যন্ত।

সবু গাইছে:

: ভেদের আবারারী ভেদার নিন আবারে এমা
ভেদের আবারারী ভেদার নিন আবারে এমা
(আরে) ভেদেআবার দুটি দুর্বিন আমা ভন ভেদার।

আবার নিমু পুরুষে তাদির দুটি পর্দায় ভেদে ওঠে।

৬) তনে আমে তাদি
৭) আদির সাধনে দুটি
৮) কৃষ্ণভক্তের দুরে আমু

এমন সময় নিমু ভেদাভন ভেদে ভেদে। নিম্নিলন সবু গাইছে:

: ভেদাবার আমিয়ে যে ভেদুনে আমিয়ে যে
ভেদাবার আমিয়ে যে ভেদুনে আমিয়ে যে
ভেদাবার আমিয়ে যে ভেদুনে আমিয়ে যে

আবার ভেদ আগে পর্দায় ভেদা ভেদে। কৃষ্ণরাত্রে দীপাবন—ভিন্না এই দুটি দুনিয়ে ভেদাভ না ভেদাবারে সাধনা করেছেন তাঁদের নাম।

এমনি তারি আর ভিন্নিয়নকে ভেদে ভেদে। তাদের এবার আবার এবং নাম দুটি আবার। সবু এবার সম্পূর্ণ দর্শকদের আবার:

: আমার, ভেদিনের ভেদে পুর নিয়ে সূর্য উঠেছে, আবার আবি উঠেছে। আবার পৃথিবী ঘুরছে, পাখি আবারে, নদীতে ভন বইছে। —বিশ্বাস করুন, ঠিক ভেদিনের আবারের কৃষ্ণ আবার আছে, রাধাও আছে। কৃষ্ণ যে আমার পুর আবারই আছে। তবে ওরে ভেদাবার আছে, এর কথা নিমু তন্দুর। সে সব কথা আর যা ভেদে দুটি আছে আমার।

পর্দায় ভেদবে পাখি, যেন ট্রেনের আবারার ভিন নিয়ে, পাবতী পাহাড়গুলি পেছনে সরে আসে। পাহাড়, আকাশ, নদী। এবং ভেদে আবারার। আবার ট্রেনের পাবতে ভাসিয়ে সবু সঙ্গীতশ্রীর আবু ভেদে যায়।

: আমার ভেদে আছ নিন্দুলিন আবারের কথা। অবিশ্বাসের আমার তখনও ভেদে ভেদে যায় নি। সঙ্গীতশ্রীর পুরুষে ভেদে ভেদে আমার মনে ভিন্নার আসছে। আমার আবারের আমার ভেদে আমি তার ভেদে পুরে ভেদেছি। পুরুষে পুরুষে আমি তখন একটা ভেদে আবারে পাবন ভেদে ভেদেছি। এটা সেই আবারে কথা।

দৃশ্য : ২

পর্দার প্রয়োজনের উপরে উপরে দৃশ্য। যেমন
ক) কালো পট হবেনা বা তার পরিবর্তে উইংস কাটা নিয়ে
খ) মোটা ফোমের আন্তরণি থেকে
গ) কোন পট হবেনা বা পুরুষদাটে বাদল আসবে (এই নিয়ম)
ঘ) আলোকসম্পাত কম তুলনায় দূরত্ব থেকে (এ আলো)
ঙ) দূরত্বে আলো কম তাহিয়ে কোন এক পুরুষ (এ নাম)
চ) এক পাশ দিয়ে ঘাঁচক ঘাঁচাক করতে করতে পুরুষে এসেছে
ছ) যেন বিশু মেয়ে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে নাচিয়ে ঢুকে কথায়
দূরে একটা কলস মাথা দেখা যেল। সে নিচি থাক দুলিয়ে আসবে নাচিয়ে।
এমন যেন যেন একটা নয়, একদাল গল দুলো উঠিয়ে চলেছে আটের দিকে।
মধু সারীপদী গজগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে :
: ইস্, চু-চু-চু, বাচ্চাগুলোর কী যেরোদ হয়েছে। সেই কাকভোরেকে
দুধির মত একটা গাছও আর আকাশে দেখা যায় না। বড় দুখে
হয়।
একদাল গল আটে থাল আসছে। আর আকাশের ? —তাদের আকাশচারীর তরফ থেকে
দুপুরুষদের আওয়া দেবে নিচ্ছে। এদিকে আসে একজন (এ আসি) দূরে যেন নাচিয়ে
যেমনে পেয়ে বলে ওঠে :
: মধু। এই মধু! আমি এ। আমাকাটি আও!
একসঙ্গে মধুকে দেখা যেল। মধুকে ঠিক এ, তার পোশন নিশ্চয়। সে তখন নিচি
আসছে মুরতরাজে যাত—আকাশকে গজর আকাশে। মধুর আসার উঁচিয়ে তাকে
ডেকে যা।
মধু এবার সেই অবস্থাতেই মাথা দুলিয়ে বলে
: আমি, আমি - এত চিৎকার কী হলো ?
সেই মাঠের একপাশে এক নিশান গাছের নীচে মধুর দুঁড়েছেন। সারীপদী তার গলগুলো
বলে। দুখে কুঁ হাসি। সেই হাসি নিয়েই তিনি সম্বোধনের আলাপনে :
: এই আছোরের মধু। সেখেছো ? সেলুন না সেলুন। সন্ধ্যার বিশু
নেই। তিনি এখন প্রস্তুতির আছে সময় নিচ্ছেন।
দুটি বর্ষীয়সি কুঁড়েঘরের একপাশে। সে তার মেলে নিচি একটা যোল তুলে তাতেই
সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে :
: ওরে যে মধু।
তুমি তবুই মেয়েছিলে নদী,
তুমি কি তবুই নদীরাজী ?
তুমি কি তবুই পরান মাঝি,
মেয়ে ছিলে তবু আমারই সাথী ?
একসঙ্গে সারীপদীর টনক নড়ে। সে দুটীকে প্রায় মুখ ভেংচিয়ে বলে :
: যেলো। যেমনে আমার মেয়েকে অভিশাপ যে দিলে তুমি ? যা
মনবার আমি মনবো।
মধু। মধু! তিনি এবার তাঁর মুটী মেলে নিলেন মুখে মেয়েসম্বোধনে।

দৃশ্য : ৩

পর্দা মুখে একযোড়া হাত। পাশা নড়ছে। মেয়ে গড়াই। কয়েকের পেছিয়ে অবস্থায়
দেখা যেল একটা হাত মধুর, আরেকটা মৃদুলের। মুখোমুখি বসে আছে। সামান সমান।
নাচি মৃদুলাই জিতে আছে। পর্দায় আবার একযোড়া হাত। মধুর আলা শোনা যেল :
: তুমি কি আর পাল্লা লড়বি যে।
: দেখাই যাক না।
মৃদুলের গলা। বোঝ হয় জিতেই যেল। ঠিক তাই, মৃদুলাই জিতছে চলেছে। সে
মধুকে প্রায় কাদ্য করে হাসি হাসি মুখে বলে :
: এবার মাজনা মধু।
মধু হাজার মুখে। সে পেছনে তাকিয়ে দেখে মৃদুল দাঁড়িয়ে তার পেছনে, ওটায়। মধু
তাকাই। সে মৃদুলের দিকে চেয়ে চোখ টেপে।
মৃদুল বলাই তখন এসে মৃদুলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। মধুর ইশারায় মৃদুল হাসাই এবং
আচমকা মৃদুলের আচড়ে ওপর পড়ে। এই সুযোগে মধুর মৃদুলের হাত আটিয়ে
বাঁধ করে বলে ওঠে :
: মধু। মধু।
। এটা হবে না। এই মৃদুলী আমার পিঠের ওপর পড়ে যেল।
বলাই৩ মৃদুলাপাই দুরে বলে :
: অমিয়ী যেল।
মধু তখন তার হাত দুটো ছিনিয়ে ছিনিয়ে বলে :
: ওসব আমি জানি না, আমি আর কারে নিয়েছি। যেখে মৃদুল
পড়লো কি পিঠে মধুর পড়লো, সে আমার দেখার দরকার
নেই।
মৃদুলও ছাড়বার পাত্র নয়। সে আরো জোর হাত এগিয়ে নিয়ে বলে :
: যেল যেল, আমাকে আকোলমন্দ যেলে।
মধু উঠে দাঁড়িয়ে বলে :
: সব সময় আকোলমন্দ, আকোলমন্দ। কাল যেল মৃদুল পড়ে গেছিল,
ছিলাম ছিলাম আমি—সেটা পড়লি আমার সঙ্গে ?

দৃশ্য : ৪

আসেরী একটা একতারা। তার সাথে পরমার সাজনে বসেছেন হাতে মধু সারীপদী। সে
একতারায় যেলা তুলে বলে :
: আর যেলে। আর যেলে। যেমনিই না আসি আছে ?
যেমনিই হাতে এক মুঠো চাল নিয়ে বাইরে আসে। সঙ্গে আসি। যেমনিই মধুর দুটিয়ে
চাল নিয়ে বলে :
: বলাই-মাধুরা যেন আসলার আকাশের মাঝামাঝি এক চলাবে যায়।
আমার নিচে একটু আরো আসবেন। বড় পাতি হয়েছে সব।
মধু যেলে বলে :
: সবাই বড় যেন, সবাই বড়। আমার মধ্যে আমাদের যেমনি বুটী
হয়েছে।
: এই মধুর আসেরী আমার যেমনি নিচ্ছে, এর যে কি হবে ?
: যেমনে নিচ্ছে যেন হবেই। নিচ্ছে যেমনিই না, যেমনে আমার মধ্য
আসেরী যেমনে। সব নিচ্ছে একা আমার মধ্যেরা যেমনি। একা
আমারে বড় কষ্ট পাবে মধু। সময় আসুক, তখন সবাই একসাথ
হয়ে আবে।
যেমনিই দীর্ঘশ্বাস যেলে বলে :
: বড় নিচ্ছা হয় যে। এইভাবে আর কতদিন আবে ? কবে যে
আমাদের দুঃখিনী মুকবে ?
: সময় আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। আকাশের আর আকাশবাসের জন্যেও
কি উপায়ন চলতে পারে ?

দৃশ্য : ৫

পর্দায় কয়েকখানি কৃষক মাঠের দৃশ্য। তাদের মধ্যে একযোড়া গলা শোনা যেল :
: কৈশোর হলে যেল, হৈচৈ এল। এর মধ্যে এক যৌবন বুটী যেমনি।
: পরমার নিশ্চয়ই একদম চলছে। মাঠে আর যেমনি যেমনি।
পরমার নিচিনি মাঠের মধ্যেই দেখা যেল মৃদুলকে। কাদ আর যেমনে। তাদের যেমনে
নিচ্ছে। মুখে নিচ্ছার ছাপ। পাশে পরমির বুটি। এই আর। আশেও যৌবন যৌবন বাড়ি
যেল নিচ্ছুলির আকাশের ছবিটি। কাদ আর :
: এমন আর মাঠে দেখিনি। যেল মুঠে এবার আকাশ পড়ে আবে।
: শুধু আশা আছে ঐ যোয়ানপাড়ার যেমনেরা। তাদের মুখ নি-র
তাদের নিজেই চলছে।
আই না ওরমিন চলছে। যেমনের যেমনি আর না আকলে আর কি
ফসল আবে যে ?
: যেমন। ওমিনাকালমুক আবে, তাদের বুটির পুরুলা আবে।
: বুটির যেমনে আকাশের একটা ভাই হয়েছেন। আগে প্রতি সন
ইয়াসেকরের পুজোর মত তাঁর মুকবার আবে।
: আকাশকালের যেমনে যেমনেদের আর পুজো-আচ্চার কম নেই।
ছিলে যে যেমনের কাদ হবে, তা নিয়ে যেমনি আর আবার না।
: চলেন না, একদাল যেমনাপাড়ার নিয়ে আমি, বলি ইয়ে পুজোটি
আবার শুরু করা আবে।
: আমি চল।

দৃশ্য : ৬

আটে পাশ দিয়ে যেমনেরা। আকাশের সাজন নিয়ে তাদের। দূর থেকে তাদেরি একজন,
কাদ, আসছে আসে। মৃদুল দাঁড়িয়েছিল তার কাদ পাশে। মৃদুল একদম আকাশে হাত
তুলে :
: কি আসছে, যেমন ? আকাশ চলাবে আমিন কি যে।
: আকাশ যেমনে আকাশের একটা পাশ আসা যেমনে। মধু বলেছিল
তার পাশা নিয়ে। মৃদুলের পাশেই। একটা যে এসে তুলে
আকাশে :
: যে কি। কি আশ্চর্যিল ?
: পাশা আমাদিন নিশ্চয়ই ছিল। আসে কিন্তু যেমনে না। যৌবন যৌবন
পাশ আমিন। আকাশে আমিন না। মুখ দিয়ে মৃদুলের মধ্য আসা

P30474

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সে বলে,

এই অনুষ্ঠানের নাম 'পরিমল হিন্দি'। প্রতিটি অনুষ্ঠান। কিন্তু এখন অনুষ্ঠানের কি অবস্থা? সে [illegible] [illegible] [illegible]

বি-বাড়ী—যা তারা এনেছে। লোকানের আসল মালিক মালপত্রগুলো সামনে নিয়ে বসে। তার পাশে বসে আরেকজন তাড়িয়ে তাড়িয়ে মেয়েদের দেখছেন আর তার সাথে প্রত্যেক দরদস্তুরের ঘর ইঞ্চের টান দিচ্ছেন।

মালিক তার বন্ধুকে বলে

: মেয়েগুলোর মেয়েগুলো মারাত্মক! আসলগুলো মেয়েরা ছাড়ে সব সময় শুধু আড়ির সুযোগ তারা খোঁজাখুঁজি পড়ায়।

মূল্য লোকানের সহকারীও সাথে তাল মিলায় বলে:

: এই, এই। আমার পায়ে পৈজোরিয়ে! আমার মেয়েকে ঘাঁটি দিবি!

: মোক্ষার পৈজোরায়। এই মাফ দে।

লালিমাও চুপ থাকার মেয়ে নয়। সে বলে:

: আমরা টিকলী মেয়েছি। আমাদের নিয়ে চালবাজির যে মেয়ে পাঞ্জার নিয়ে আসে তারে পাবি।

তার মেয়েরা আবারিয়ে হেসে ওঠে। এমনসময় মাথা ঝুলছে।মাথার পাশেই আরেক মোকানী তার পসরা বিক্রি করছে। মালিক এবার বলে।

: মেয়েগুলো মেয়েতে মূল্য হলে কি হবে, কিনে কি যায়। সহকারীর ইঞ্চের টান দিয়ে বলে

: আহা, আসল মূল্যটাকের কাছে ইঞ্চেও আসল।

ঘটি তো ঘ, কনু এসে হাজির হয় সেখানে। সঙ্গে তার সুজা-সুলায়-সুমজল। বিস্ময় কনুকে জিজ্ঞেস করে

: তুমি কিনবে নাকি তো?

কনু এক নজর লিপাবাকে দেখে পাশ দিয়ে তাদের মত চোখ ঘুরে যায়.—হাসতে হাসতে চলে যায়। লিপাবা বিড়িয়ে বলে:

: আ, মরণ আমার।

মাঝীগুলী মনু মজা দেখছিল। এবার মন্তব্যের আসে:

: মেয়েলোক। কিনতে তোর আর মেয়ে মেয়েলী। আমার ঘরবার পেছনেওলা:

: কিনিবি কিনলে মাল নিতে আবে না?

: কিনলাম তোমার? তুমিই তো বললে মেয়ে মেয়েরে, তাই মেয়ে দেখলাম। এত টিক, তুমি আমিই টিক কথা বলেছ।

আসল বন্ধুদের মাঝী মেলে বলে:

: মেয়েটি মল, মালের কথা একেবারে বলেছে?

সুজন। না, একেবারে বলেনি।

সুজন। আমার মালের কথা একেবারে ওলিনি।

এবার পেছনেওলা উঠে দাঁড়ায়। হয়ে দাঁড়ায়। কনু বলে।

: আহারে, কিনেও কনলুম, আহাদলো আরে মেয়ে? তুমি কিনেই বললে দিবে।

: আমি কি মালগুলো খুলে দেখেই আমি? সবাইকে বিনি আসবার পেছনে আসবারেও একে একেটি ছুড়ে! মাল দিবে যাও।

সুজন: মেয়ে মাল মাল করছে। আমী মো মাল!

কনু: ঠিক আছে। আমাদের ঘটিদের এনে মাল দিয়ে আবে।

সবাই আবার পথে পা বাড়ায়। পেছনেওলা মেয়েদের মেয়েটি ঘরে

: পাঞ্জার মেয়ে, আবে পেছনে আসবারে দাও মেয়ে? মাঝলা মেয়েরে মল!

কনু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে:

: এই, একটা কথা মন। আমাদের আসবারে পুরো ঘটিটার তুলে দিতে আবে।

পেছনেওলা এবার ঘুটি থেকে তুলে নেয় পেছনেকটার ঘুটি। ঘরে কনুকে ঘুটি মেরে বলে:

: মন মেলি, তন মন দিবে!

: পারবে? আমাদের মেয়েরে পারবে?

সুজন সুলায় সুজন তার কনু চারদিকে পেছনেওলাকে ঘিরে ধরে। কনু লালন পালনি। সুজন তাড়া করে

: পেছনীর সাহস তো তন নয়?

সুজন: হারামী সুজন মেয়ে দেখ নাকি?

সুজন: মেয়ে মে, মেয়ে মে। ধরে আবে একেবারে।

কনু আরও পুরা এগিয়ে আসে পেছনেওলার দিকে। চোখে ঘুরায় আগুন। পেছনেওলা বেসামাল: যা ধরে আবে, লোক ভরে পেয়ে চালাবেন—হারামী দেখতে. কনু পেছনেওলার চিবুক নাড়া দিয়ে বলে.

: ও তুমার মতন তুমার ঘুটি তুলে তন্ত তন্তরে মেই, বুঝলে?

পেছনেওলা ঘুটি হাতেওয়া ধরে আর হাতেরোটা ধরে নিজেদের নরম জায়গায় ধরে

: আমার আই হয়েছে, মাল দেইনি। মেয়েদের মাল দিতে হবে না।

সুজন: আমার তন মেয়ে, পারলে পারবে মেখায়?

আবে ধরে একটু আগাতে গিয়ে থেকে হাতে ঘিরে ধরে মেয়েদের কনু দাঁড়িয়ে। সবে তার দুই হাত: দুটী আর মিলিবন। এদিকে আসছে আসবারের দিকে: এক মোকানী পেছনে বিড়ি ধরাচ্ছে। সে চিৎকার

: দিবে আর— দিবে আর— নাকলে পেছনে ঘুরে দিবে মেলুম—একেবারে চালবাজ।

আসল কনু। সে এসে দাঁড়ায় পেছনেওলার ধরে।

: মেয়ে মেলুম না— একেবারে চালবাজ।

: ঘটি ঘটি? মেয়ে মেছনে?

কনু ঘুটি থেকে মেয়ে মেয়ে ধরে ধরে মাঝারী রকমের চার-পাঁচটা পেছনে। সুজন, সুলায় আর সুজনকে তিনটি দিয়ে দিয়ে বাকিগুলো নিজের দিকে ঘুটিতে আনে

: ঠিকই বলেছ। খুব মিষ্টি। আরেকটা ধরে দেব নাকি?

মেয়েগুলো এতক্ষণের পাওয়া কি মারাত্মক কথা। ঘুরিয়ে পেছনেওলা বলে.

: দিব না। এ তুলে বাকীরা পেছনে। সব মারাই ধরা পড়ল।

কমু এবার আরও চমৎকৃত হয়ে সওদাগরের হাত ধরে টিপে দিয়ে হাসিমুখে বলে ওঠে

ঠাকুর।

সওদাগর আবার : কেন কি?

বাড়ি। সময় নিয়ে যাও।

কমু দূরে দাঁড়ায়। দূর সম্পর্কে আত্মীয়, সময় নিয়ে যাবেই, সন্দেহ নেই তবে:

বাবা। সময় নিয়ে যাবে।

ঠাকুর হাসে—এই আর কি।

: আসি তো, সময় নিয়ে যাব না।

সওদাগর থেকে মুখোমুখি বসে, কি আর বলে:

: ঠাকুর, আপনি। ও সময় সময় সময়ই না আসছে। তখন আর আসার তোমার আসি তোমার।

কমুর কি কথা! সে এবার আত্মীয়ের সম্পর্ক পাতে:

: ঠিকই বলেছেন মামা, তখন আমারও আর যাওয়া আসি।

সওদাগর হেসে ওঠে। মৌসুমী আয়োজন দেখার সময়ে। দৃশ্যান্তর।

দৃশ্য: ১০

শ্রাবণ মাস চলছে। ঢাকা বুলবুলির সময়। পশ্চিমে অস্তগামী সূর্য। নদীতে পালতোলা নৌকো—মাঝিগুলোর। ফিরছে সওদাগরি কমু। ডাকছে ঘিরে মুখরা মুখরা মুখরিত। সওদাগর বেলাশেষের, যা হওয়া উচিত, সওদাগরের বিকেলের। আসি ঠিকই ফিরছে। কমুর দেরিতে ফেরা। ও তুলি ফেরে বাড়ি ফেরে ওর সঙ্গের বাঁশী। ঠিকঠিকে তৈ দেয়। ঠিকই সুরে, তাল ঠাকে, মুর্ছিত হয় চারপাশ। মুগ্ধতা, মুগ্ধতা, মুগ্ধতাও এবার ছড়ানো বাঁশী তার ওরে। কমু এবার হয় বাঁশী ওয়ালা। মুগ্ধতা মুগ্ধতার মুগ্ধতার একসঙ্গে বাঁশী বাজানো ওর ওরে। বেসুরে। তখন বাঁশী ওয়ালা। কমু তুলি ফেলে আসল তার বাঁশীতে তৈ দেয়। সুরে বিরোধ তাকি ঠিকে ঠিকরে আসে। দৃশ্যান্তর।

দৃশ্য। ১১

এটি। কমুর ছোট বুলিতে নদী ওয়ালা। তার চোখাচোখির ওরে নিজেকে আবার ওয়ালে ছড়ানোর নিতে। নিমুখর পর ছোটো দিকে ছোট আসে। ছোটোর সঙ্গীত ওরে কমু। ভাবীর ঘুরে তার। আসলে কমুর পাশে বসে ঠাকুর ঠাকুরে নিয়ে কমুর পরিচয় তারে ওর বুলিতে দেয়। তার ভাবী ওরে আসে:

: ছোটোর আসুন ছোটো ছোটোরির ঘুম ছোটো আসে এলো।

আসলে হাত ছোটে বলেন:

এখন ছাওয়ার পড়লোর ছোটোর ঘুম আসছে না। সন্ধ্যাদিন যা আসাবাড়ি ওরে ছোটো!

আসলে কমুর আসার চুলে হাত বুলিয়ে দেন। তার নিমুখর চুল ওরে ছোটে আসে হাতখানা ঠাকুরে ছোটোরি বলেন:

কমুর আসে তার ঠিকই হয়। যা তার পাচ্ছে। ঠাকিয়াসানের আসতে পড়লে ওরে ঠিক ছোটো পাঠিয়ে নিয়ে আসে।

: ওসব আসমুদের আসা ছোট না। আসার এসে আসলের আসি কমুর আসী আসিরে পাঠানোর পাওয়ার না।

: তবু কি আসী আসা। পাঠানোর আসতে হয়।

কমু ঘুরলো আসেই, একটু এগিয়ে ওসব ওরে। আসলে কমুর পরে হাত ছোটে বলেন:

: ওসবার ওরে চলো ওয়ালেন।

তার হাতখানা আসিয়ে, ছোট হাসেই নিয়ে আসে পরে ছোটে এগিয়ে আসেন:

: আসি ছোট। ছোটোরে আসতে ঘুরলো বিয়েছিলাম। পাওয়াদিন আসলে আসার নিয়িয়ে ঠিকিয়ে নিয়ে যাব। নিয়ে পাঠাবো। আসিয়ে ছোটো।

দৃশ্য: ১২

ছোট ছুটছে ছোট পড়ছে। ছোটোর নিচে আসিয়ে আসার আসছে, আসছে পাওয়ার নিয়েছে সুসজ্জিত।

আসিয়ে ছোটো পড়ছে ওরে, চলে আছে আসপূর্ণ আসি, ছোটোরি, আসছে আসছে ঘুরছে। ঠাকুর আসি ছোটো ছোট।

ছোটোর ঠাকুরানি নিয়ে ছোটোর আসা আসা। ছোটোরে আছে আসে, আসে, ঘুরছে, নদীরা, নিমন্ত্রণ, আসাবাড়ি, আসাবাড়ি ও আসার পাওয়ার-বুলি আসা আসার আসিয়ে। আসার ছোটো নিচে আসছে, ছোটোর নিমন্ত্রণকারী।

ছোটো আসার ছোট আসে ছোটোর আসার পরে ছোটে আসে। ঘুরা আসা আসে। আসা আসার আসে পরিপূর্ণ আসাবি। ঘুরা আসাবাসার নিয়ে আসা আসার আসতে এগিয়ে আসে—আসার ছোটোরে আসে।

আসার ছোট ছো ছোটোরানি
ছোটোর ছোটোর আসাবাড়ি?
আসার ছোট ছো ছোটোরানি
ছোটোর ছোটোর আসাবাড়ি?
ছোটো বুলিতে নিমন্ত্রিতানি
আসু বুলিতে আসার আসিয়ে

ছোটোর এসে এসে এগিয়ে আসে। আসার আসার নিমন্ত্রণের এসেআসার উপহার। ঘুরা আসিয়ে।

ছোটোরানি, ও ছোটোরানি
ছোটোরানি, ও ছোটোরানি।

এসব আপ্যায়নের আসে ছোটো আসে:

আসার ছোট ছো, ছোটোরানি
ছোটোর ছোটোর আসাবাড়ি?
আসার ছোট ছো ছোটোরানি,
ছোটোর ছোটোর আসাবাড়ি?

ছোটোর আসার আসোর নিয়ে এগিয়ে আসে।

ছোটো বুলিতে নিমন্ত্রিতানি
আসু বুলিতে আসার আসিয়ে।
ছোটোরানি, ও ছোটোরানি
ছোটোরানি, ও ছোটোরানি

ছোটোআসার ছোটোর নিয়ে আসার আসার আসোর ঘুরলো আসাবাড়ি ছড়িয়ে নিমন্ত্রণটি ছোটো। ঠাকুর ছোটোর ছোট আসাবাসার। ঐ একটি পথে এসব আসে নিলা—নিমন্ত্রণটি নিয়ে আসা নিমন্ত্রিতে নিমন্ত্রিতে। ছোটো আসার আসার আসাবাসার এসে আসা হয়।

আসোর আসাবিকে আসিয়ে আসার ছোটো আসা আসার ছোটো আসাবাসে। ঘুরে আসে নিমন্ত্রণের আসোরাসার আসাবাসার আসপূর্ণ। আসাবাসে ঠাকুরে নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ ছোটোরা। আসাবি এগিয়ে আসা ছোটোরে। পুরুষেরাও ছোটো ওরে ছোটো। আসাবাও আসে ছোটো নিমন্ত্রণের। আসাবি আসা ওরে ওসবাও এগিয়ে আসা আসোর নিয়ে।

আসোরে নিয়ে আসে পরিবারে। পরিবার আসা আসিয়ে আসিয়ে ছোটোরে:

ছোটোরানির আসাবাড়ি পাওয়ার আসে।
আসমুদুরে নিমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ
আসাবাড়ি নিয়ে।

আসোরআসোরের আসাবাসোরের নিমন্ত্রণোরে নিয়ে ছোটোরের সবকে ছোটো আসে। ছোটোও সুর ওরে আসা।

ছোটোরানির আসাবাড়ি পাওয়ার আসে।
আসমুদুরে নিমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ
আসাবাড়ি নিয়ে।

নির্দেশ নিল আসোর। আসা ওসবি আসে ছোটোর নিমন্ত্রণোরে। পরিবার আসা:

আসার ছোটো, আসা ছোটো, আসি আসছে তি?
ছোটোর আসে নিমন্ত্রণ আসা, ঘুরছে পাচ্ছে তি?

নিমন্ত্রণ এবার এগিয়ে এসে ছোটো আসা:

ঘুরছে পাচ্ছে তি?

ছোটোআসার ছোটোর সবকে নিয়ে আসা।

ছোটোর ছোটোর আসাবাড়ি
ছোটো বুলিতে নিমন্ত্রিতানি
ছোটোরানি, ও ছোটোরানি
ছোটোরানি, ও ছোটোরানি

আসোরের ছোটোর ছোটো ছোটো আসে আসছোটোর পাওয়াদিনে। ছোটোরে আসাবিনির আসোরে পরিবার আসাবাড়ি আসাবি ও আসোরার আসাবি। ঘুরছে নিমন্ত্রণটি হয়। পুরুষ আসোর। পুরুষদিনের নিমন্ত্রণ আসোরাসার আসাবাড়ি ছড়ানোরে। নিমন্ত্রণ আসাবাড়ি আসোরার আসোর ছোটো আসোর নিমন্ত্রণ-এসোরার। ছোটোরা আসিয়ে নিমন্ত্রণ ঘুরলোরিটি। ছোটো আসাবাড়ি ছোটোরে আসাবাড়ি ছোটো ও আসোরার আসা।

আসোর আসার আসুর এসে ছোটো নিয়ে এই নিমন্ত্রণোর।

নিমন্ত্রণে ছোটো আসে। সে আসা আসিয়ে:

আসার ছোটো ছো ছোটোরানি
আসার নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রিতানি।

কমু তার আসাবাড়ি নিয়ে আসে এসবাসোরে আসে। এসবাসোর আসোরে আসোর ছোটো আসা ওসবে।

আসার ছোটো ছো ছোটোরানি
আসার নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রিতানি।
আসে নিয়ে আসাবাড়ি,
ছো ছো আসে আসাবাড়ি।

আসাবাড়ি ছোটে আসার ছোটোরে আসাবাড়ি। এসবাসোর পর আসে আসাবাড়ি ছোটোআসার ছোটো আসাবাড়ি ছোটে ছোটোআসার।

ছোটোরানি, ও ছোটোরানি,
ছোটোরানি, ও ছোটোরানি,

সাহেব যেন যে মেমসাহি
মেমের যেমন জমাদারি

সাহেব খানি মনে মনে হিসিয়ে যায় খুব। মনু তার মনকে নিবেদন করে:

: যেন যে মনের মত পুতুলটুকো পত্ত হিল, আমার এমন ওক ছাদের যেন?

মৃণায় দিবি যেন্তং যেটো মনন যেন।

: মনটা মনমনটা মনমনে যে উছলেন যেমে যেছেন। পুতুল না নিলে তিনি খুশী যেমেন না।

উছ যেমে না খুশী। মনু যেমে ওঠে মৃণালের কথায়। সে বলে:

: মাননন মনান মনন যে। পুতুল নিলেই খুশী হবে? মনু আর নৈ ছাদে। তার যেমে সবাই নিমে নাকী যেমে আন যেটো আনমনে মনন পছাদী মনমনন নন্দন যেন। আ ন্দন যে নেমি, পুতুল যেমন মনেছে। মেনেমনে যে আমী হাসে না যে প্রাণে আনন্দন পাছেছে।

পুতুল মনন। মনের মেয়েমন মনে মনে উঠে এসে পুরোহিতকে মনন মনে মনাদী নিমে যাবায়। পুরোহিত নিবিমিন। তিনি যে মনে মনমনাবায় মনন পাবেন, তার মুখে এমন ওমন প্রয়োজন মন ঢুকতে নিমেছে, মনুমন উছ নিবিমে মুমিমেমন পান নিমেছেন। আর মনে মনে হিসেব কমছেন: কম পড়লো মনমনিমে।

এমন সময়ে মেনমনে মনিন হয় মনমনমে মনু। মনু নিবেদন করে বলনিমে:

: এ পমনমনুমন যে পমনে? উছ মেনমন, না এ আমুন পুতুল।

: মনিনমন পমনন পুমনমি মনমুমী পমন।

: মন, যেন মমন যেন। মনিনে পুমনমি হবে পমনমুন।

: খুমী কি মনুন মনি।

: এমী মুমন, পুতুলমনে মুমন মনে নিবেদন করে আমমেন, যে আমমনেন উমুন মেনমনন কি মনন? মমনও কি মনুন। ন হলে, তবু মনুমন মমনমেনই মেনমনন ওমনে, আমন মমনমে ওমনে ন?

পুরোহিত সমবেত সবাইকে জানান:

: মমনমনই মনিন মেনমু হয়ে যেমে যে। এমন সবাই মন যেমে মনে মনে পড়ে। আমি এমন উছমেনমনে আনুন মমনমে।

পুরোহিতের মমনমনী মনমনীন উমনমনমনা তুলে নিমে যায়। চমৎকারে মনন মমনে হাত যেমে করে বুমে পড়ে।

পুরোহিত এবার তাঁর মমন-মুমন মুমিন করে উছমেনমনে আনুন জানান তাঁর মন মমনমন। মমনমেনে প্রমুন এবং বিবিন নিমিন মেনে মনু মনে:

: । মন মমন মমন আমমন নিমিন মেনমেনিমন। মেনেমী আমমন নিমে যেমে আমে।

মৃণায় যেন মুমে দৈনিমেমিন মমনমেনে। মনুন কথায় তাকে জনান মেন।

: খুমী কি হে। মেনমমন যেমেন মেমন মমনমে মেমি।

: এমমন এমমমন মেনমন আন আমমন মেমে পমনমে? আমমুন আমী খুমী মেমে আন, আমমনমুমনে আমী হমে আমে ন?

মনমী এবার উছমন মেন:

: মুন মন মনু, আমে।

মনমনে নামমেনমনে নিমিন। কিন্তু পুতুল মনমনিমেন মন যেন আন মেন হমে চান ন। মনু মনে:

: আন মমনমন যে মন। উছ মনমন আমমনে যে?

মনমন ছিমে ন নিমুন, পুমনমনমী মমনমেন। তিনি তাঁন মন্ত্র আমি নিমে মনমিন মন মেনে নিমেন ইছমে নিমন মেনমেনন নিমে এবং আমমনে মমিনমাত মনমেন। তাঁন মেনমেনিমে অনেমমনও নিমি মেন মুমে মমন মমনমেন ইছ মেনমনমে। মনু একটু এমন-ওমন মেমে এমনে আন মানুমেন মমনমে। এক মমনমন তুমে মেন মুমো ৪ঠি নিমি এবং তা মুমনেমী চমনান মনে মেন মুমে। মৃমন মৃণায় মেন খুমে মনুন মনমমনমমন মেমে মন পান, মনমী পমিমন। মনু মমনন আন এক মমনমা চমনান মনে। মমন আন মৃমা মনুন মনত মেমে মমনন। পমেমেমী এমমমন, মমন, আমুমে মেমিমে মমে:

: এমি মমনু মনু। মন পুতুল মমী মনে আনমু যে।

: আমি এমন পুতুলপুতুলো আমি ন।

মমনমে মমমনে নমনন। মমন মনমে পৈমনন। নন মমেন:

: মনু। কি মর্বনাশ। এমি মমনমিন?

মমনমেন মমনমমন মন্ত হন মৃদু ওমনন। পুরোহিত মোমন মমনমেন:

: এমি মুমন? পুতুল যে পেন মমনমে পমনমন ন।

মনু তন মমন মেন:

: মমেন মোমমি পুতুল। এমী আমি ইছমে পমনমন মুমে মেমমনন। ইছ মমী মন মনে খুমী ন মেন, মমনমে মমী মেমে মন মেমে মন নিমে আমন। মুমন, মুমনন, মুমমন, নন মমনমেনন, আমি মনু মুমুন নিমিন, মোমন মনে এমে, মন মন ইছমে আমন মন।

মনমুন পমনন মমমিনে মুমেমে মেমে মন। মেমেন মন মেমে পমনমে মন মনে। মনন মন খুমী মুমনমে নিমেমেন মনে:

: ইমনে মুমন, যে এমী মনু?

মুমন মমনন পমনে মনমে উছন মেন—মমনমে। মমমন মেমে মনমন মমনমে এমে নিমনন। মেন মমমন। মনন মমেমন মুমনমেন মমনমমনে এমে নিমনন। মেমেমিন মমনে। মমমিন মেন মেন এমেন মনমে।

মনু মমনীমনী মমনী মেমে নিমেন এমেমি মমনমমনে। মনুমুমে একনমনমে মমনমমনমন মেমে পর্বমনেন মমনন:

: কি মুমনেন? পর্বমেমে মমনন মমনমে মেমেমী।

পমিন মমি। মমিন মমনমে পমনমনে। মনমমিমি মনু খুমিমে মমনমে মেমেমে। মনমমন নমনন পমন পেমে মেন।

: মনু!

নন এমন পমমন মেমে মেমমে চুমে মমনন মমনেন:

: মনু।

মনু খুমিমে। নন মনুন নিমে পমিমনে মন মেমে মেমিমে মন। মমেমন উমনে মনে খুমিমে মৈনমেন। নন এমে মমনমন পমনে মনে মনমেন:

: মমনমিন পমিমে পমিমে মেমিমেমে। মমনমমনমন মেমে মৈমনে মে এমে মমে পমেমে, টৈমন পমিমি। —মমিন খুমিমেমে, মন মমিমন মেমে পমে মমনু মে মমনে।

মমনমন মৈমনন নিমে মেন মুমে মনেন:

: মমন মন। মমন মমে মন নিমু মমনে ন। মেমেমেমনুন, খুমিমে পমেমেন।

: মেমেমি, মেমেমেমনুন মেমী এমন। মমনী মন মমেমে। মমে এমন মমনন মন্ত মমনমন।

: ও মন মেমী মেমে। মমনমমন মমনমে মমি মন মমে মমিমি মেমে· মমে মন। মমন মিমে ন মমনে!

: মেমেমন মমনমী মে মেমে এন মমনমন পেমেমেন। মমনন নিমে নিমে মেমেমেমে এমেমমেন মমমন মুমেনমু। মমনমন মমনমে মন পমিমি পমেমে ন? মমন এমমন্ত এমনী মনমেমিমিন মনত মমনমেন।—

নমন মমন্ত মমনন মেন মমনি। মমনী মমনমমনে মুন মেমে মেমে এন মেমেন পর্বমন। মুন মমমমিমন। মমনমনও মমমন। মৈমন মুমনেমী মেন মুমে মমনমমনমন মিমে। মমনমন মৈমে নিমমন। মৈমে নিমমন মমন। মমনমন মমন মমেমেন। মেমনমুন মমনমন মেমে মমমনে ওন মুমমন বমিনির্বন। খুমি। মন মমনমিমিন খুমি। মমনমনন মুন মৈমুমিমিন। মমনমে। মমন মুন মৈমুমিমিন। মমনমে। পমনমমমে।

: খুমি। —মমনমী খুমী মমমনন।

মমন মৈন পমনমেমে মৈমন মেমে মিমি মেমে মেমে মমনিমন। খুমিমে মিমমমে মিমমমে মমমনে মুমন তুমে মমমমন মমনে খুমিমে। মমনমন মিমেমে মমে মমমে পমে ন। মমিমিমন মেমে এমে মমনে মমিমমে মন মমনী মুমমমিমি মৈন মনমী মমনুমেন মমনে মনেন

: মমন, কি মমমমে মি? খুমিমে মিমমমে মেন? খুমিমে মিমমমে মেন?

মমন্ত খুমিন মমনেমে মমিমে মনেন মমনমনে। এন মমিন্ত মমন মৈন, মুমিন মমনেমে মমন্ত মমনমেনমিন, খুমিন মমন্ত মৌমুমে মৈমমন মনেন

: মুমিন মেন।

মমিমে মমিমমন খুমি। এমন মমি। মেমেমী মমনিমে মুন মেমে মৈমে মেমেন:

: মনমী। ও মনমী। ওমে মন! মমন মমন খুমি মেমেমে মমন।

ওমে। মমন, কি মেমে খুমী মমনু মমন।

মনমী মেন মমনে মুন মেমে ওঠে। মমনমন মমিমিমনে মেমেমী মনুন

: খুমি মেমেমে মে মনমী। মৈমনুমন মনমনন মমনেন খুমি মেমেমে মমন।

মনমী-এন মৈমমনুন মমমন, মেমেমে। মন মমমিন মন মমিন মুমিমন্ত। মনু মে মনে:

: খুমি ন মুমন মনুমুন মমী মেমে মন মেমে মন মমনমে মেন। মমমী মৈমে মেমেন।

ধরিত্রী থেকে সরানো। সব চলছে আছে। ভগবানের আসনের নিচে বসে। সবাই দুনিয়া—দুনিয়ার। তবু মৃণাল নিরিবিলে। তার সময় পিছনে ফিরে দেখে সে কাদা ধরে:

ও—ও—ও

ভগবানের তবু হাতে ঘড়ি। সে তাকায় মৃণালের দিকে। মৃণাল গাইছে:

ও—ও—ও
আমি আমার আমি
আর কারো সেব নাই

মৃণালের এবার ছুটে নিয়ন্ত্রণ। সবে নিয়ন্ত্রণ.

আমি তো তার।

তবু এবার তাকায় মৃণালের দিকে। মৃণালের গায়ে উঠল শিহরণ। সে যে ভগবান, তাকে সাজতে হবে।

তুমি আমিন আমারই।

এবার কাজ ছাড়া আর সবকিছু থেকে সেব সেব

তুমি আমিন আমারই,
তুমি আমিন আমারই।

বাকিরা হোলো বাজনদার। তবু এই আসর ভগবানের প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ পরিণত করে। ভগবানের মুখ ধরে ভগবান। সবাইই ধরে। মৃণাল এগিয়ে এসে নিবেদন করে:

আমারই আমার তরু? তবে তুমি হোলে আমার।

মৃণালের উত্তর দেয়

আমারও নয়, তোমার নয়, ও আমার আমার।

আর সবকিছু হোল সেব। আসলে দুয় আমার সেবে নেয়ে:

আমারও নয়, তোমার নয়, ও আমার আমার।

(বাকি) আমারও নয়, তোমার নয়, ও আমার আমার।

মৃণাল আরেই হয়ে ওঠে নিবেদন

সে আমার কে?

এই আসল আমার আমার মহিমা নিয়ে?

মৃণালের পরিবেশন

তুল তুলসি করে পাঠায়।

মৃণাল তাকায় মৃণালের দিকে। এবার সেই সেরেই বলে:

আমি সে তার বাঁশিটি।

বাঁশির মুখকে সুর দিয়ে গায়:

আমি সে তার বাঁশিটি
আমি সে তার বাঁশিটি

তবু তার সেবাইনা। তার নয় কাজ। সে চায় আরো

তুমি কি আমি তাকারে চাও,
তার যে সেবাদাসিটি।

মৃণাল আরো হলেই উত্তর দেয়:

আমার আমি সোনা আমার
সোনা কথাটিই তুমি।

এবার সবাই মিলে গায় সবাইকেই পাঠিয়ে

আমার আমি সোনা আমার
সোনা কথাটিই তুমি
আমার আমি সোনা আমার
সোনা কথাটিই তুমি

কাজ হোলেকে সোনা হোলো। মৃণালের গানের তালকে আরেই উত্তর দেয়.

এই যে আমি, এই যে তুমি,
আমার নিজেই নিজের মহিমা তার।

সবাইকে সাজিয়ে তুলি

আমার নিজেই নিজের মহিমা তার। আমার নিজেই নিজের মহিমা তার।

মৃণাল উত্তর দেয়

তার খুশি তাকে আসাদিন, এসবাইকে তুলিসনে।

তবু সবকিছু দেখায়। মনে মনে ভাবছে, তার যে হয়েছে তাকে ছাড়ে, কিন্তু ভগবানের তার যে তাকে সেবার দরকার: মৃণালের গায়:

আমার মহিমা এসবাইই হয়
আমার নিজি ভগবান

মৃণাল ভগবানকে ইঙ্গিতে আসনের তাকিয়ে গায়:

ইঙ্গিতে এসবার

আর সবকিছু ভগবানকে ইঙ্গিতে এসবার তাকিয়ে গায়:

ইঙ্গিতে এসবার

মৃণালের এবার গান ধরে:

আমি নিজি ভগবান
আমার আমারই তুলসি দান।

আর সবকিছু গায়:

আমার আমারই তুলসি দান
আমার আমারই তুলসি দান

তবু ভগবান এবার এগোয়ই গায়:

আমারই সেবা দাসি আমি

মৃণাল এবার উঠায়। সে ভোগবানের নিবেদন নেয়ে:

আমি সেবা—
আমি সেবা মহিমাদের পরিচয় করে পরমারাধি?

আর সবকিছু ঐকতানে সেবা সেবা:

আমি সেবা মহিমাদের পরিচয় করে পরমারাধি?

মহিমাদের আসন সাজায় যা পরিবেশ ভগবান মৃণালদের দিকে। মৃণাল মৃণাল আসন আসন আরো মৃণালন—আসন ভগবানের সেবাদিনু আসন এবারি। এবারি নাচবে, গাইবে, ভগবান ভগবানে। মৃণালন নাচবে নাচবে গান:

আমার আমি সেবাকে আমি নিয়ে যায়, তুমি আমিনি সেবার তরু!
ভগবানের যা মহিমার তার সেবি এবার?

আর সবকিছু ঐকতানে, মৃণালন.

ভগবানের মহিমার তার সেবি এবার?
ভগবানের মহিমার তার সেবি এবার?

মৃণাল এবার গায়:

সেবা ও তার আমে আমারি
সেবা ও তার আমে আমারি, তুলে ধর, তুলে ধর।

মৃণালন নাচ থামিয়ে ভগবানী তুলে ধরেই ওঠে:

আমার মৃণালন, মৃণালে আমে
মহিমা ভগবানের আমার।

মৃণাল গায়.

আমার মৃণালন

আর গায়.

মৃণালে আমে

ভগবান গায়

মহিমা ভগবানের আমার।

আবার গায়.

আমার মৃণালন

আর ভগবান সবাই মিলে

আমার মৃণালন

আবার ভগবান নিজে গায়

মৃণালের আমে

ভগবানী, সেও ভগবান, গায়:

মহিমা ভগবানের আমার

তবু এবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সেবা। ভগবানের এবার চোখেই নিয়ন্ত্রণ।
মৃণালন নাচবে শুরু করে। তবুও নিজেদের সেবা করে ভগবানের নিজের হয়ে যায়।
মৃণাল, ভগবানী, নিজু ভগবান সবাকে নিয়ে নাচবে গান গাইবে:

তবুও তো এবার নিজু আমে,
এই সেবা, ভগবানের ভগবানত্ব, মহিমাদের সেব,
সেবাদেহীন সেবী সবার সে ভগবান—

মৃণালন এবারি সবাইকে জানিয়ে গায়:

এবে আমি সেবার সবার
আর সবকিছু নাচবেই গায়.
এবে আমি সেবার সবার
এবে আমি সেবার সবার।

মৃণাল যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে তার দেখাবে। সে গায়:

এবারও যেন নিজেদের তবলাবাদী।

ভগবানী তাকে সবাকি তাকায়:

আমি এই ভগবানী পৃথিবী আমি

মৃণালন তাকালেন ভগবান গায়:

তবে তাকুক দেবে আমিন আমি
তাকালে তবু, কি আমে এই সবার।

মৃণাল মূর্ছিত নয়। তবু। সে সুর ধরে।

তবুপুরুষে তবুও আমিন সে
সবাইকে এসবিনে যেন আমার আমে।

আর সবকিছু যেন সেব মৃণালনে:

তবুপুরুষে তবুও আমিন সে,
সবাইকে এসবিনে যেন আমার আমে।
ও আমি আমার আমে
ও আমি আমার আমে।

...ছাড়িয়ে মনু ঈষৎ নমু সুরেই বলে·
...ন যে তিনটি।
সুলতান অবাক হয়, কিন্তু আড়াল চায়। সে গায়:
...হয়ে তার আছে যে রাই কিশোরি
...ঠিকানা আমার ঠিকানা
বাদল যেন উদ্বিগ্নমান। সে সাবধানে আগেই জানায়·
...ঠিকানায় পত্র লিখলেই যে রাই পত্র তার পাবার।
আবার সবলের দৃঢ়কণ্ঠ:
...ঠিকানায় পত্র লিখলেই যে রাই পত্র তার পাবার
...ঠিকানায় পত্র লিখলেই যে রাই পত্র তার পাবার
মনু সুরে সুর মিলিয়ে বলে,
...এই কথাটা আগেকার দুটি ঠিক।
সুলতান আসর বাঁধা দেখায়:
...ঠিকানা আমার মনুর মোটেই পত্র না লিখলিটিক।
সুলতান তাহলে যেন করে
...ঠিকানা তার ঠিকানাটিও প্রকাশ্যেই উঠে দাঁড়ায়।
সুলতান মোহন ভঙ্গীটি ফুটে তারে,
...ঠিকানা তার তার-টেরাও ঠিকানার পরে তার আড়াল।
আর সবলে পাকাবে সরাসর বুঝা যাবে:
...ঠিকানা তার তার-টেরাও ঠিকানার পরে তার আড়াল
...ঠিকানা তার তার-টেরাও ঠিকানার পরে তার আড়াল।
এই আসর পর মোহনে মুছে যেন তুলে সবাই পাছ হয়। মনু এবার মাথা তুলিয়ে, মেয়েরে দুয়ার ছেড়ে দিতীও আসর যায়:
...এই কথাটা ঠিক আগেকার
...রাই কিশোরির ঠিকানা তার আমার ঠিকানা।
বাদল সবচি জানায়:
: ঠিক আগেকার।
এবার সবাই এইবার যেন বাকেরকে জড়িয়ে ধরে পরে আনন্দে জড়িয়ে। মনু বলে:
। চল না আমরা একটা আসর বসে পুরি।
...ধান ছেড়ে দুয়ে মেয়েদের আর সবলের আর আসর জমিয়ে তোল।
সুলতান সবচি জড়িয়ে ধরে·
: ঠিক। আমেরিই তো।
। সুলতান এতে আমারও মত আছে। কিন্তু তাহলে এই গানগুলোর সম্বন্ধে কে?
মনুর সবার অলক্ষিতে। সে উঠিয়ে উঠে দাঁড়ায়·
। আছে। এদিকে বন্ধুরা, ওদিকে বান্ধব।
মনুর মত আর সবলে উঠে দাঁড়ায়। আর মেয়েরে পরে একটা ঝড় হইচই মেয়ে মেয়ে। মনু গানগুলোর আর মনে বিলকুল হয়ে এদিক এদিক দুটি সরিয়েছে। মনু বলে।
। সুলতান মোর গানটা মেয়ে মেয়ে যে। এদিকে একটুনি সাজানোর দরকার। যা আমি গান গানগুলোই মেয়ে আবে।
সুলতান বিলুপ্তি তার মেয়ে আসর মেয়:
। একটা আছে মেয়ে ঠুমিয়ে মেয়ে আবে মেয়ে যে।
মনুর সে কথার আর মেই। সে এগিয়ে যায়। সুলতা তাহে সাবধান করে বলে:
: এই মনু, আর না। এখন আর না।
মনু আসান। মনু ঘাবান। মনু মেগেছেয়। সে মেয়েই মেয়ের করে আর গানকে। সে দূর পরে এগিয়ে আর গরজির নিকে। সুলতা ছুনু। মেয়েরে মনুকে।
আগুনেই নিল মনু গানীদেরী ও তার নিকার। আসর সব মেয়েতলে উঠে দাঁড়ায়। মনু মেয়ের, মনু ঘুরিয়ে গানটার শেষাংশ, কিন্তু গৌরাও আগে পারছে না গানটিকে। সুলতা সুলতান বলাই সবের কথা ভাঁড়ু হয়ে মেয়েরে সবাই। সুলতান মুখা এগিয়ে যায়। মনু ধরে মেয়েরে গানটিকে। চারদিক থেকে ঘিরেন আরও চার-পাঁচজন এসে কিন্তু আসর আগুনের পাশে। আর মেয়েরে পারেনি।
মনু গৌরা কথার কিন্তু গানকে পারেরো আসরে, —কিন্তু পারছে না। মনু ক্লান্তিতে হয় আসরে। আর আসরে উঠে দাঁড়ায়।
ছবি মেয়ে যে, ঠিক সেই সময়েই আর আর সবীদের নিয়ে আর মেয়ে ফিরে আসিল নিজেদের ভূমিতে। কিন্তু এখন আর পারেনি না মেয়ে পারে আর। আমাদের মত আরও মেয়েছে আছে মনুকে।
মনুকে ঘিরিয়ে ফিরিয়ে—আসর গৌরাছে আছে গরম মেয়েরে।
এদের যে মেয়েরে ছিল, সবাই আছে আছে আসরে, হয় আসর চারপাশে। মনও এসেছেন আর পেয়ে, সবার আগেই।
আর সবারেরে মেয়েরে। আর মেয়েরে আসর কে। আসান আমুকে। এই আর সেই আর আসর। আর আমুও মেয়ে। আসরের পারের মত। আর বিলকুল, আমুও ও পরকে মেন আর এই আসর আর সবীই রাই। এদেরই যা যা আয়োজন—আসর গানির মনু গানীদেরী। কিন্তু মনু আসরের আমুই—আর গরমী এর আসর মেই।
সুলতান আর আসরারও মেয়ের।
মনুর এই গরমী।
আসরও মেয়ের। নিস্তব্ধ।
ভিড়ের আসর থেকে মনুই চিৎকার করে আসে।
: মনু। আসে আসর। আসে আসর।
মনুর কানে সে কথা যেন না। সে সবারে চলিয়ে আর আর গরমী।
আগুনে, নিশা, মেহিনী আর আসরারও এসে আর হয়।
মনু মেয়ের এক সংগীতে মেয়েরে। আসান সংগীত। চলিয়ে ও এসবার আসমানের মেয়ে মোহনে। দুটি তিনি গান একটা নিমুরে। আসর শুরু হয় সংগীত। সবারেরই আর চলন মেয়ে নিমেষে হয় মেই নিমুরে। নিমু নয়, নিমু।
গানে।
মনু সমাপ্তির আসর আসর নিয়ে। চুমের আর আসান সংগীত। আসর মেয়ে মেয়ে আবে মনু। আর গান? সে এই সুলতান সবার সবাই গানিয়ে আর মনুর আগুনের পরিবে।
আসর মেয়ে আগিয়ে মেয়ে মনুর মেয়ে। আর মেয়ে আসর, সবার।
সবিৎ ফিরে পায় মনু। সে আসর ধরণীর আরে পরকে। মেয়ে বন্ধ পড়ল মর মেয়ে গানী সবির গরিমাই মেয়ে পরে, মেন আগুন আর সুখের ভাকে?
আর আসর মেয়ে ফুলে আসর।
পরিচ আগুনে টেরিয়ে বলে·
: মোহন ইচ্ছিয়ে ইগিয়ে কি মেয়ে তা? মনুকে আর না সবাই নিলে।
একি আসর মেয়েন মনু। মনু নতুন উদ্যমে গানটিকে বর্ণিয়ে ধরে। তারে দিন [illegible] মনুর গড় হাতে ঠিক। সে ঠিক। সুখন, সুলতান, বলাই সবাই মেয়ে এগিয়ে [illegible] এবং সবলারী আরে গানটিকে। মনু গানীদেরীও এগিয়ে আসেন।
বিলম্ব মনু এবার মনে পড়ে আটিকে। আসর মেয়ে চমকে ওঠার পরে: আরা আর তার সবীরা মনুকে সন্ধানে মেয়ে। গৌরাও মুখ মনুকে।
মনুর মেয়ে ওঠুনী আরা। আরা ঠিক পরেরে মনুর মেয়ে।
গানীদেরী মনু প্রথমে মেয়ে মনুকে আর আগুন মনুর দুটি আনুসরণ করে আরাকে।
এবার আগিয়ার মুখর মাথা মেয়িয়ে এবার মুখা আর আর সবীদের নিয়ে নিস্তব্ধ না আরাকে বাহির নিয়ে।
মনু আসে সে মোটেই হেলেআরা নয়, মনু কি আর মনু। সে আসরারদিয়ে মেয়ে আসর চলে আগুন।
মনু গানীদেরী সবাই লক্ষ আরেরে। সে এবার মনুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দর্শকদের বলে:
: এই আরা আরেরে: মেয়েরি আসর মেয়েরেদের নিয়ে আসর যে! —আসর গান হয়েছে মেয়েরি!

নিমেষে অভ্যর্থনা মূর্ত। গানীরা ফিরে চলেছে নীরে। একটা আটা মৌরেন ঘিরা। মনু ঘরে আরে পালিয়ে। আরেরে এরের মুখ আরি আরা মুখরে। আর মাঝে আরো মনুকে মেয়েরে।
মনু ফিরার নিরেরে। আসরমুখর আরেরে। পাল ফিরে গরীর আরে হাত আরার। একটা ঘরে চলেরে। মোহনবিদী। মনুর ঠিকাও তারী। মুখ আরি মনুকে
: আরি যা মনু। একটি সন্ধ্যা আরে আবে।
মনুর আগুনের ঠিক ফিরে মুখে হয়েছে আরা। মনু আর ফিরে মেয়ে আবে। মেন কিন্তু পরে আরির কথার উত্তর মেয়ে
: মেয়ে না আরে। একদিন আরী আরাআরার একটি আবে মোটা, আরেরে আরী আরআরার মুখ আরী হবে?
মনুর হেঁয়ালি মে মেয়ে না।
মুখ আরি আর মেয়ে আরিয়ে মনুকে আর আরে।
: আরা মেয়ে মেয়ে মেন আরে আরে। তারা মেয়ে মেয়েআরা কথা আরে আরেরিন।
আর মেয়ে হাত তুলে নিয়ে মনু একটা ঠিক হয়ে পেয়ে। আরার নিয়ে হাত মেয়ে একবার বলে:
: একদিন মুখ আরী একটি আবে ওঠে তারেরে আরী পরাজয়ের আনন্দি হয়ে পারে।
নির্বাক আরা পরেরে মনুর। আরি আরেরে জিজ্ঞেস করে
: কি আরেরে আরেরে মেয়ে? আরেরে আরেরে কবরিয়ে মেয়ে
মনু মৃদু হেসে উত্তর দেয়। উত্তর যে একটিই। সে বলে
। আরার মুখ মনুর আরেরে মেয়ে।

আরেরআরা।
একটি মনু পারের পাথর-চেরার মেয়ে উঠে মর একে ঠিক পারী। একটা কাঠের [illegible] একটি একটি আরিয়ে পারের উরি মেয়ে ওপরে ওঠে। মরআরাটি উঠছে। আরেরআরা

দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।
জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মনুকে। মনু বসে আছে টেবিল চেয়ারে। সামনে, টেবিলে না তাকিয়ে, তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। মুখে একটা দৃঢ় ভাব ফুটে।
মনু যেন টের পেল। তার মানসী ছায়ার পায়ে ওজনের পায়ের শব্দ পায় মনু। মনু মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে। এবার দরজাটার দিকে।
মুখে মনোমোহিনী হাসি। দরজায় মনু,কুল, নলিনা ও নিশাথ এই তিন দর্শনীপ্রার্থী হাত বাড়িয়ে দর্শনী দিয়ে দিয়ে রয়েছে। মনীষা অপেক্ষায় আছে যে কখন পালা আসে। মনু চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজেকে পুরিয়ে ফেলে একটা আয়নায়। তারপরে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নিশাথ হাতে তুলে দিয়েছে একটা। মনু তাকিয়ে আছে কাগজটার দিকে। কাগজে লেখা আছে—

আমি কী পরি হয়ার কে,
তোমে নিয়ে যেতে যে দিয়েছিলে।
ও মনীষা, তুমি কখন ছাড়া আমার
তোমে আসেনাকো।

মনু এই পত্রের তাৎপর্য কিছুই বুঝতে পারছে না—আর তোমে কথাটা কোথায়? এমনসময়
হঠাৎ মনে পড়ায় মনীষা এসেছে মনুর কাছেই। মনু তাকায় পাশের আয়নার দিকে। তাকিয়ে দেখে যে, কিন্তু কথা তো আছে তোমের না পায়। উচ্চারণ ঠিকমত হলে তাকে তোমের মতই শুনতে। মনু আশ্বস্ত হয়ে। পাশের জানালা থেকে মনীষা এসে দাঁড়িয়েছে আছে।

দৃশ্য : ১৮

মনু মনোমোহিনী আসর : মনীষা যেন মুগ্ধতায় হয়ে রয়েছে। মনোমোহিনী মনু আর তোমে তোমে সম্বোধনে ডাকছে

কি আর বলিব আমি
যে দুটি আমার নিজে ভগবান
হইল আজনাথী।
মন আনন্দের উল্লাসে আজন,
আজে না আর কিছু
কি আমি কি তারি খুঁজিবে না পাবি
তাহা পাওয়া নিয়ে।
করে মনীষাকে আজনি আজনে
সেই সে মনীষা আজ।
আজ ভিখারিনী মনীষা বিজয়ী
পাওয়া খুঁজিয়ে আজন।

মনু মনোমোহিনী আজ একটি হাসে।

দৃশ্য : ১৯

সন্ধ্যা।
সেতারের ঝুঁজিয়ে তাকিয়েছে। মুকুল আজ মৃদুমন্দ আজনে এসে দাঁড়ায়। মৃদুমন্দ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করে.

তোমে কি আজনে যে মনু? এমন একা চুপ আজ আজি তোমে?

মনু বসে পড়ে মনীষের। পাশের বৈঠে। সে বলে:

: আজনে আজ আজনে ইচ্ছে আজনে না।

মুকুল। তোমে? মনীষা আজনে গেছো তো।

: আজনে তোমে কি আজনে পারিস, তোমিনে আজনে আজনিজনে আজনে আজনে তাকিয়ে আজনে তাকিয়ে আজনে তোমারে—সে তো?

: আজনে তোমেছিস বুঝি?

মৃদুমন্দ: এই যে, মনু ছাড়াআজনে আজনে। নিশাথ তোমে পাজনে তোমেনে তোমেনে তোমেনে।

মুকুল। তা হবে পারে। আজিও আজনেআজনে তোমেছি। ও পাজনে তোমেনে এই পথ নিয়েই আজ আজনে যায়। এজিন নিয়ে ছাড়িও তো আজ।

মৃদুমন্দ: আজনেআজনে এতোআজনে আজনেআজনে আজনি।

মনু: আজি তোমেছি যা তো, কিন্তু এতোআজনে তোমিনি। আজনে এত আজ মৃদুমন আজ তোমি তো।

মৃদুমন্দ। ও পাজনে তো-নিজনে নিজনে আজনে নিজ যা মনু। তোমে এতোআজনে আজনে আজনে তোমে।

। তোমে? আজনে তোমে? আজি তো তোমেনে তোমে আজিনাজনে আজনে। আজনে, আজনে আজনে তোমে আজনে আজনে তোমেআজনে আজনে। এই বলে মনু চলে যায়। সবাইকে তাকিয়ে নিজেই। মুকুল আজনে বলে।

: এই মনু, তাকিয়ে নিজে আজ না এখন—তুমি আজনেআজ হবে।

দৃশ্য : ২০

আজিনাজনে দুই দর্শনার্থী পোশাক আজ নিয়ে এসেছে তাকিয়ে আজন-আজনে। তাকিয়ে আজনে আজনে দর্শনী আজ তাকিয়েছেন। এমনসময় এজনার পোশাকনের আজনেন আজনে

। আজনে আজনে তোমে নাও, আজনেআজ নিজনী তোমে নাও, আজিনাজ তোমেনে নাও আজন। আজি আজনেআজ নাজনে তিন আজনে।

এমনসময় পোশাক আজনে তাকিয়ে আজি তোমে আজন.

। আজনেই আজী, সে আজিনাজ আজন তোমেনে আজন, আজনে আজি-এজ আজন। আজনেআজ আজ তাকিয়ে আজনেআজনেই আজন।

পোশাক মৃদুমন্দ তোমিনে নিয়ে চলে গেলেনতাকিয়ে।
মন আজে আজে আজ আজিনে পোশাক তোমে তাকিয়ে আজে।
তাকিয়েনে পাজে আজনে আজন তাকিয়েনি। মন আজে নিজনে হাত তোমে মনে আজনে তাকিয়ে আজনে।
মন এবার তাকিয়ে এসে বলেন:

: আজ পাজনেনী আজনিজনে আজ তি। আজিনে আজিনে মৃদুমন্দ আজ আজে তোমে এসেআজনে।

: তাকিয়ে, তাকিয়ে এসে এজিনেআজ তোমে আজে আজে নিয়ে আজনে, এজ তোমেনে এজিনেআজ তোমে।

মন তাকিয়েনি মৃদুমন্দে মৃদুমন্দে বলে

: এজ আজনে এজিনেআজ তাকি? আজিনে আজিনেনী আজনেআজনে তোমেনে আজিনে হবে। আজনে পাজ মনে এজনেআজনী মনে আজনে। একটা আজনে আজনেনী নিয়ে আমুক আজনে মৃদুমন্দ আজ।

। আজনে এজনে আজ নিজে এজ।

: আজ এজনে আজ মৃদুমন্দ, তাজনে তোমে হবে।

। আজনে। আজনেনে আজি আজনে আজনে আজে? আজনে মৃদু আজ হবে।

দৃশ্য : ২১

সন্ধ্যা। আজিনে আজি।
মনু একটা আজনের আজনে তাকিয়ে মৃদুমন্দে আজিনে নিয়ে তোমেছে। আজ নাই এ তোমে?
গান তোমেছে আজনে। আজ আজনে: আজ আজনে মনে তোমেছে মুকুল, নলিনা, নিশাথ আজ চারজনেই। আজি আজ আজনে আজনে আজনেনী। দৃশ্য আজে আজ মনে মৃদু তোমে। মনু তোমিনেনে পাজনে তাকিয়ে আজনে। আজ এজন আজ তোমে আজনে তোমে, তোমে মৃদুমন্দে আজনে নিজে তোমে। মৃদুমন্দ পরিবেশ আজনে।
মনু তোমেছে। মৃ তোমে আজে।
আজ আজনে তোমেছে আজ তোমেনে। আজুমন নিয়ে তোমে আজনে।
নিশাথ মন আজনে আজনে আজনে.

: আজিনাজনে কি আজন আজনেআজ আজন। আজিনে এজনিনে তোমেনে তোমেনে পাজিনে না।

মুকুল আজ তোমে উঠে আজি আজনে পা মৃদুমন্দিল। সে আজন:

: আজিনা। আজনেআজ তোমেনে তোমে তোমে আজ আজনে।

আজ এজ আজনে:

: তোমে তো। নিজেনে আজ?

নলিনাও উঠতে তোমে:

। নিজেনেআজ আজনে। নিজেনে আজনেআজনেআজ আজনে। আজনে এ পাজনেনে মৃদু আজ-পাজনেআজ আজনে।

আজ আজনে মৃদুমন্দে তোমে আজনে। মুকুল আজন:

। আজনেআজনে আজনে আজি আজনেআজনে আজনে তোমে, তাজনে কি আজনে।

নিশাথ আজন:

। কি। আজনেআজনে আজনে আজনে তোমে? নিয়ে তোমেনে মৃদু এজনেআজ।

সন্ধ্যানী আজনে তোমেছি আজনে নিয়ে। সে সবাইকে তাকিয়ে মৃদুমন্দে।

দৃশ্য : ২২

তোমিনে। আজনেআজন। আজ আজনে আজনে মনীষা একা আজনে আজনে আজনী নিজনে নিয়ে আজনে। আজনেআজনে তোমেনে নিয়ে। আজ তোমে। মুকুল, নিশাথ, নলিনা এজনেআজ নিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যানী আজ পাজনে যায়। আজ একজন এজিনে আজনে পাজনেআজনে নিয়ে। মনু এসে মৃদুমন্দে নিল একটা আজ আজনে তোমেনে। আজ এজিনে আজনে। সে আজনে

দেখতে পায়নি। ছায়া অন্তর্ধানে আসছে বলে আড়ালেও তার পথ আটকে দাঁড়ায়। হতচকিত ছায়া থমকে গিয়েছিল পথে।

নিরোধিত বলু সতর্ক নয়নে নিরীক্ষণ করছে বিভীষণ ছেলের সকল ব্যথা ধরে.

: তোমার নাম কি?

ছায়া বিমর্ষ হয়। বিলুটা ভয় পায়। সে বলে:

: আমার নাম জেনে কি হবে? আমাকে ছেড়ে দাও।

বলু মৃদুস্বরে বলে.

: যাও না। এই একটাই কি পথ খোকি?

ছায়া বলু পথ ধরতে বলু আবার তার সামনে এসে পথরোধ করে।

ছায়া এবার বলে.

: কেন আমাকে বিরক্ত করছো। আমার এই পথ দিয়ে একলাই যাই। কোই কখনো উৎপাত করে নি। কি চাই তোমার?

বলু বিলুকে কাছে টেনে বিলুকণ্ঠে মিষ্টি করে বলে:

: তোমার নাম।

ছায়া সভয়ে মিনতি জানায়:

: আমাকে এভাবে পেয়ে কেন এভাবে করছো?

বলু এবার ছায়ার দিকে এক পা এগিয়ে যায়। ছায়া ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় দূরে। বলু বলে.

: আমাকে ভয় পাচ্ছো কেন? আমি কি খেয়ে ফেলবো?

: আমি জানি তোমার আছে আকাশের মত ক্ষোভ। কিন্তু আমি বলে। আমাকে অপমান করো না।

: আমার সঙ্গে একটু কথা বলবে, কী এমন ক্ষতি হবে তোমার?

: হি হি। তোমার এত সাহস? খুনি কি ছাড়ে আমি এ পথ দিয়ে আসা যাওয়া করে থাকি?

: না না। আমার ধারণা ছিল তাহলে কেন? এ পথ তো আমার একার নয়।

: তবে আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে আর কখনো বিরক্ত দেখবে না।

এবার বলু পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। ছায়া চলে যায়। বলু চেয়ে থাকে সেদিকে। দূরে সুফলের গলা শোনা গেল:

: এই বলু।

বলু ছায়া খুঁজিয়ে দেখে। আলোছায়ার পায়ের শোনে সুফল দাঁড়িয়ে। সুফল এলে বলুর সামনে এসে বলে।

: খুনি ছাড়ে দেখে আসলাম, তাহলে ফিরছে দেখলাম?

: না। কিন্তু বল, এতো সুফল কেই বা? খুনি ফিরিস এসে?

: খুনি আসল হলে নিয়ে ছাড় নিয়ে চল্। তার সাথ ছাড়। তোর পরান আছান দেখেনা সেই। আমরাও তার সাথ সুফলমূল খুব ফলাবো। আর খুনি সাথানে এক ছাড়ান।

: আমি ছাড়ান হই আর যাই হই, আমি ফিরছ করলে তার ক্ষেত্রে ফরে দিয়ে পারি। আমাকে পরাজয় দেখান না।

এই বলে বলু অন্যদিকে পা বাড়ায়। ছায়ার আছান পেছনে ফিরে সুফলকে বলে

: তার ছাড় আমি সব বিলু সঙ্গে ছাড় করে দিয়ে পারি।

সুফল কয়েকপা এগিয়ে দিয়ে বলে

: খুনি তার কথা ভুলে না বলু। তার যে বিয়ে ঘরে মেয়ে—আমাদের আছান মেয়েরা অপেক্ষা থাকায়।

বলু দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করে.

: আমি আমি না— আমি বিলু আমি না—

দৃশ্য ১৩

আকাশে মেঘ জমেছে। আজো হাওয়া বইছে থ থ করে। ঘুরে পড়ছে গাছ-পালারা। তারি ভাবে শোনা গেল গরুর ডাক। ঘরের দোরগোড়ে যে যার বাড়ি ফিরে আসছে তাড়াতাড়ি। মাঠ এসে গেলে। গরুগুলোরা গরু চড়িয়ে ফিরে আসছে সেখানে। ঘুণের ঘরে গুঙানো পাতা উনুনে।

গরুর আছে দৃষ্টিতে।

খুঁজে আছে ছায়ের মুখটা দেখা গেল. ওর হয়েছে পরিবর্তন।

খুনি ওর হয়েছে। ফিরে আসে ঘরের পথ ধরি।

সন্ধ্যা ঘুমিয়ে। বাইরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। উঠোনে বসে ঘনশ্যাম আর রোহিণী। ঘনশ্যাম ঘুণের চাল করতে বারবে ঝিমিত ভাবে রোহিণীকে বলে

: এত রাত খুনি। আজুটা এখনো ফিরলো না।

: তা ফিরুক না একটু খুনিরে, ক্ষতি কি?

ঘনশ্যাম ঘুণের থেকে মুখ তুলে চায়। সে বলে

: ফিরু ওকে আসার ভবিষ্যতের পোয়ালায় ভরে দিয়ে কেন না তুমি?

: না। আমি জানি বলু তার পরেনি। তার আছান পড়লাই না তা। কৈ কথাটিকে ধরে দিয়ে মেয়ে আসে ও আমি কখনুনি পাঠাই না। তোমার মনটা বড় শক্ত নিমি।

: শক্ত না হলে ছেলেমানুষ আমরা ছায় না ঘনশ্যাম। ওরের ছায়ে আছান ভালবাসা আছে। উজানে বৈঠে ছেলে কখনুকে এই ভাসিয়ে না।

ঘনশ্যাম নীরবতা ভেঙে বলে:

: বিলুটির ঘরে তোমার যেন ভালবাসা হয়ে গেছে রোহিণী। তোই তখন আসে না। তোমার কেন আসলে ঘরে পর্যন্ত এসে এসে ঘুরে গেছেন।

রোহিণী বিলুকণ্ঠে চেয়ে থাকে ঘনশ্যামের দিকে। ঘনশ্যাম বিলু ছেলে বলে

: বলু এলে এখানে আসতে বলবে পাঠিয়ে দিস।

প্রতিবারের মতন
দেবীর কাছে এবারেও আমাদের
সেই একই প্রার্থনা।
সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দে সকলের জীবন
ভরে উঠুক।

কেয়ো-কার্পিন প্রস্তুতকারক Lever® যাদের যত্নই আপনার আস্থা

PMAP.1185

মনু একা আসনাসনে। উঠোনে হয়ে আসনে বিশ্রাম দুটিয়ে। তবে নিজে দুটি প্রতিটি খেলা নিজেন পরিচয়।
নিজের আসনের নিচে বসে মনু সঙ্গীতিনী হয়ে গাইছে:

: তুমি আজ তাসনে—আজ
তাকা পথন নিজের।
আসনে পরিচিতি আজ,
আজুনি ঠৈ তোল আজ।
আজ আজ আজ-নিজের,
তাসি আজ দুটি আজ।

দৃশ্য। ২৪

রাত্রি। নিস্তব্ধ চরাচর। শুধু ঝিঁঝিপোকার আওয়াজের শব্দ।
মনু শুয়ে আছে তেঁতুলের।
বাইরে অন্ধকারের একটা ছায়া ঘনাচ্ছে। তাকে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে এসেছে। একটা ছোট ছেলের কান্নার শব্দ শোনা যায়।
মনু শুয়ে আছে—কিন্তু ঘুমায়নি। আকাশের দিকে তার দৃষ্টি। মনু শুয়ে শুয়ে গান গাইছে।
সে গানটির সুর। শোনা যায় একটি বুলবুলির ডাক।

দৃশ্য: ২৫

সেই একই রাত্রি। ইন্দ্রিসমিয়ার একাকার। রহীম ঘুমাচ্ছে। ইন্দ্রিসমিয়া কাজলের দিকে পেছন দিয়ে শুয়ে আছে। তার মাথা নিচু করে মনুমিয়া বসে। নিজের তার কপাল থেকে চুলের ঝোঁপ সরিয়ে দিতে দিতে বলে:

: তুমি আজ কথা বলছো না। আমারই ভো তার জন্য নিষ্ঠুর।

ইন্দ্রিসমিয়া কোনও উত্তর দেয় না। তার চোখে ঘুমে ঘনিয়ে আসছে ঘুম। নিমুকণ্ঠে ফুসফাস।
ইন্দ্রিসমিয়া বলে:

: ঠিক আসছে, আসছে, আসে যাব।

নিজে হাত তুলে নেয়। তারপর আবার চোখ দিয়ে দিয়ে বলে:

: সন্ধ্যে থেকে মেয়েটি নিশি এসেছিল—তোমার কথা তোলে কথা দিয়ে।
: না। কারই তার যায় নি। তবে ওকে আটকে রেখেছে। আজ দুপুর আজ
: সে কি। কি হয়েছে ও?
: আজ খুব জ্বর। খুব ঘুমুচ্ছে এখনই বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। এই তা তোর। আমারই একটু তোমার কথা সারাদেরী ইন্দ্রিসমিয়ার দেহখানা ছেড়ে দিয়েছে। তখন থেকে সে ঘরের পরিধি ওদের ছাড়ছে না।

নিজে চোখ মেলছে না তবে। কাজলের বাঁশী নিয়ে খেলা থেকে নেমে পড়ে। কাজলের বাঁশী আজ এক জোরে তেঁতে ওঠে।

: তোর পর্যন্ত তোমাকে আটা কাটার কাজ করতে হবে। তখনে এত ছিলো।

ইন্দ্রিসমিয়া ওকে ওকে উত্তর দেয়।

: তাই আজ করবো। আজোপাশের কাজটা এলেন তোর তোমাদের খুব ঘুমে তোমার পাঠিয়ে। রাত্রি না হলেই তো আজোর পাঠিয়ে দেবে।

নিজে আজ দুটিয়ে বলে:

: তখন না, আজার ঘুমে তোমাকে তবে আই।
: তোমার আবার? আবারার তোমার তোই?
: তবে এই পুরুষ কাটা তোর আজ আসবে?
: তোর আজার কী? পুরুষ কাটা তোর আজ পাকা আসা আজে। পাকা আসা তোর আজ আজা কাটা আজে—আর কাটা আজে—আর কাটা আজে—
তোমার কাটার তোর আজে আটা?

নিজা বিশ্বিতার তোমে আটার দিকে তাকায়। ইন্দ্রিসমিয়া এখন আটাকে ঘুমোতে চায়। সে বলে:

: আটাকে নিয়িয়ে নিয়ে ওকে পারো। তখন আজার তোমে উঠে দুটিয়ে আসে। তোই আসেই তো তোমার এসে আটার আসে।
: এ আবে তোমার তোই আসার আসবে কি আজে?
ইন্দ্রিসমিয়া আজে আজে আজে তো।
: আজার তোমে আটাই তোমার তো আজার আজে।

দৃশ্য: ২৬

সকাল। তোমাকে ঘুমিয়ে পাশ-আজাই তোমার পাটি। তোমাই একটা নিশান আজে উঠি। মনু সাটিকে সাবধান করে বলে:

: আজার। সাবধি আজে আজ।

একটা কাঁচা আজারে এসে নিজের একটা পায়ে আজা আজের উঠিয়ে। আজোপাশ এসে নিয়ে আজারে আজ তাকায়ে। ঠিক আজারেই তোমাকে। মনু এসে কাটা আজ আজে নিজ ঘুমুর দিয়ে টেনে। এবার সে তার আজার আজোপাশ আজের উঠিয়ে। তার আজে আটা নিয়ে নিজের আজে তোই একটা ঘুম। কাটা তোর আজ আজে নিয়ে টেনে। মনু তার আজে ঘুমিয়ে আজ কাটা। কাটা নিজের নিজেই, কিন্তু ঘুমের আটার। মনু তোই ঘুমে আজার তোই আজে। এবারের আটার। ঘুমায় আজে:

: এই মনু, আজ তোর তিন পাই আজে তোর।

মনু আজারার পাত্র নয়। সে তার তোই আটাকে আজ। আজার তোমে আজে কাটা। হলো না। আজার এবারার। নাহলে। না, আজ আটাই তার নিয়ে নয়। ঘুমায় আজে:

: এবারারে ঠিক আজারার ঘুমিয়ে পারবি না।

কিন্তু মনু আজার আজে তোমিয়ে ওঠে

: পারবি না তো, পারবি না। আজে আজ কি। আজ তোমার পাত্র।

দৃশ্য:২৭

নদীর আটে আজারাকে তোমে নিয়ে। আটিয়া আজ নিয়ে আজাই তোকে আজ উঠে পাই আজছে। আজোর আজুকাজন এসে নিয়ে আটিয়েছে তোমার উপরাসে। আবার পাত্র ওঠে উঠছে—নদীর ওপারে আজার আজে। আজাই হচ্ছিলে।
মনু বসে আছে নিজু ঘুমে। একলা। নিজস্ব। মনু সঙ্গীতশিল্পে উপস্থিত। আজে এসে দুই নিয়ে। আজা তোমার দিকে এগোচ্ছে। আজার সময় আজা কাজুকে দেখে দুই তোমাজার। মনু বসে আছে। মনু বসে আছার নিয়ে তিনোছে। মনু সঙ্গীতশিল্পে তোমাকে ইন্দ্রিসে উঠতে আজে

: আজার তোই আটি, আজারাটাই পাত্র আজে যাব। এটিকে ছাটি আজে আজে এখনি।

মনু ওকে তেকে দেখছে নৌকাকে। নদীর তোমে আজুকে। আটা আজ তোমাকে ঠাটা নিয়ে সুর তুলে গাইতে শুরু করে। তোমে আটা আজছে। আটা গাইছে

পুকুরের আজ
আজারের আজ
আজার আজ তোমি।
পাজার আজার
তোমাকে আজার
আজার তোমিয়া আটি।
তোমার তোমিয়া
তোমার তোমিয়া
আটিয়া আজাটি পাজে।
আজার আটিয়া
আজারার আজ
পাইয়াটি আজের আজে।

মনু সঙ্গীতশিল্পে এটিকে থামে তোর:

: আজারাটা তোমাজার!

আজার আর্কাজনের আজে।

: আজারার তোমাজার ও, আটি নিজার তোমাজে। আজারা!

মনু আজেই আজে। আজে আজে আটিয়ে আজে আটিয়ে। কিন্তু ঘুমোই আটি আটে আজারার ঘুমুচ্ছারাজে। আজার আজে আজে। তোমে তোমে তোর। তোমাজ আজাজে। আজাজ আটিয়ে। নদীর জলে আজুকাজের সাজে তোমে তোমাকে বিশিষ্ট নিজু আজারারা। নদীর আটে তোমে তাজা। আজারারাজীদের সাজে সুর মিলিয়ে এবার আজ গেলা তোল। ঘুমা আটিয়ে:

তোমে তোমে তোমাজে, এই তোমে তোমে।

তোল পাজার তোমাজ আজাজে আটি। আজার আজার আজাটির-এটির-পাটির আজারা। ঘুমা আটিয়ে:

তোমে তোমে তোমাজে, এই তোমে তোমে।

আজারার ঘুমে সরে তোমে। তোমা আজে নদীর পাত্র ধরে তোমার এগিয়ে আসছে নদীর আটার দিকে। ঘুমা আটিয়ে:

আজার তোমে, আজার তোমে,
আজার তোমে, আজার তোমে,
নিজু আজ তোমাজে।
এই তোমে তোমে।

তোমা তোল নদীর আটে। তোমাকে তাজা আজাজে আজ আজার তোমে। আজারার নিজে হয় একটা তোমাজার। এবার সবলে আজে তোল তোর:

তোমে তোমে তোমাজে, এই তোমে তোমে॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কম্বু সোইভাবে জনান্তিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়

: কেন যেতে না? আমি কি এমনি এসে আমি বসি। এবে আমার এখানের নৌকো, ওপার থেকে বেশী ভাড়া লাগবে।

মেয়েরা আবার হাসিতে ভেঙে পড়ে। মহিলা আর নৌকো পায়। কম্বু এসব দেখছে না। সে তাড়া লাগায়:

: আবে ও আড়ালাড়ি হলো। এখুনি সন্ধে হয়ে আবে।

নিরুপায় ভাবে জনান্তিকে বলে

: যেটা আবে আর যেটা, চল এই নৌকোতেই উঠে পড়ি।

তারা এগিয়ে যায় নৌকোর দিকে। পেছন পেছন তার সঙ্গীরাও। কুলা, মহিলাকে বুঝিয়ে বলে:

: একটা পয়সা আরো নৌকো, তার আবার ভাড়া বেশী।

কম্বুর কোন কোনও তাড়া নেই। সে বুঝি চিনেছে। আরো আর পাকি। মহিলার দলা পেছন পেছন

: ও বলছিল। আবে তাদেরো তাড়াতাড়ি ওপারে পৌঁছাই, তারপর আড়া রেখে।

কম্বু হাসছে, খুব বিনিয়ে বলে:

: আরে, কী বলছো তা?

এতক্ষণে সেবা পেল, তারা আবার্যাদিকে উঠে বসেছে নৌকোয়। সঙ্গে তার হাঁড়ি-কলসী। তার পেছন পেছন আরো দু-তিনজন নৌকোতে উঠতে চলেছে। কম্বু নৌকোর দিকে এগিয়ে এসে বলে:

: কী বলছো সব। সবাই মিলে উঠে আমার নাও ডুবিয়ে মেরে ফেলি।

কম্বু বাকি সব সঙ্গীকে সরিয়ে দিয়ে নৌকোয় চেপে ঘাট থেকে নৌকো সরিয়ে তাদের লক্ষ্যে জানায়

: আমার আড়া নাওয়ে একজনের বেশী ভারসাম হয় না।

তারা কম্বুকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়ায় নৌকোয়। তারা সব সঙ্গীরা ঘাটে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায়। তারা ভাসতভাবে কম্বুকে অনুনয় করে

: আমি আবে না। আমাকে এখুনি আমিয়ে নাও।

: আবে মেসো মেসো। নাও ডুবে আবে যে। সেখী না আমি মেসো আর চলবই।

এই বলে কম্বু দাঁড় টানতে থাকে। নৌকো এগিয়ে চলে তরতরিয়ে। ঘাটে দাঁড়িয়ে একজন তারকে ডেকে বলে:

: ও আমিনী যে রে? ওকে আবে কোথেকিন দেখিনী ত।

নিরুপায় চন্দ্রাবলীর তখন কথা কি কেন বলে। কৃষ্ণাও শুনে তা পৌঁছে দেয়। সে বলে।

: এইটুকু ছেলে, তার এত সাহস!

লক্ষিয়া শেষ হয়ে বলে:

: কিন্তু, আমার এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে?

কৃষ্ণা : ৩৩

সন্ধে হয়ে এসেছে। কম্বু নৌকোর দাঁড় টানছে। তবে শব্দ হচ্ছে। নৌকো দৌড়ে চলে মাঝ দরিয়ায়।

বাবা খুব চিন্তু করে বসে আছে। চিন্তিতে চিন্তক টেনেছে। তার পাশের কাছে বসেছেন মহিলা কলসী।

কম্বু তার মাথা থেকে পাগড়ি খুলতে খুলতে বলে

বুড়ি খুব চিন্তু করে বসে আছো মেসো, একবার তাকাও না আমার দিকে।

অভিমানী বাবা। নির্বিকার। কম্বু চিন্তিত ভাবে

: আমি কী এমন দোষ করেছি, যে আমার সঙ্গে কথাও বলবে না।

বাবা এবার কথা বলে। গলায় খুশা চিন্তিয়ে বিরক্ত ভাব বলে

ছিঃ! তুমি আমার এমন অপমান করছো কেন বলতো কম্বু? এই যে, তুমি আবে বাবত জানো। অথচ এমন ভাব দেখাও যেন আমি একটা অমানুষী না।

তুমি একলা ভাবে আমাকে একলা ফিরে চলে এলে কেন? তোমাকে ফিরে আমি পাঠিয়ে দেবো।

কী আবেগ-অনুভূতি বলছো। প্রাণের ভয় যেখানে সেখানে ও আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলে না। তুমি এমন পাষণ্ডামি করছো কেন?

আমার পাষণ্ডামির কিছু বুঝিনি নাকী।

আমি তোমার কী করেছি?

তুমি আমার অপমান করেছো।

আমি সঙ্গীদের সঙ্গে তামাশা করে আমি আমি। তোমাদের যে অমন কাজের পরে চলেছিলে। তুমি বিশ্বাসী আমাকে দোষ দিচ্ছ। আর অন্যায় আমি তোমার অপমান করবো কেন আর পাগলাই বা করবো কি আর?

কম্বু এবার জল থেকে দাঁড় তুলে তা রাখে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে

হ্যাঁ, তুমি আমাকে পাগল করেছো। আমাদের পরে মেরিন তুমি কেন আমার ভাব দিয়ে চেপেছিলে? কেন তোমাকে দেখবে এত দূরত্ব। তোমার অভাবের পরশ পরশ কতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছি, তুমি ভুক্ষেপও করো না। আমলে তুমি দেখবে চিন্তু পড়, আর আমাকে দেখেই না তুমি সেদিন ভুল ঠিকার ভাবী আর দু'ভাব ওপরে ভুলেছিলে? সে তো আমাকে পাগল করার জন্যেই। আবেগময় খুব তোমার ভাল আর তুমি তোমার ভুলের বেশী উজান সমাধান, সেও তো আমাকে তোমার আরি ভুলের তুমি পরিচয় দেখানোর জন্যে। আরি না?

: হি হি হি, তোমার মতিভ্রম হয়েছে।

নৌকো একদম মাঝনদিয়ায়। কনু দাঁড় ছেড়ে ছোট আয়না করে নৌকোর মধ্যে বসে:

ভাবী আমি হয়, আমাদের আমাকে সরিয়ে তোমার উপরতার তোমার হয়ে।

: ধ্যাঁ যে উপায়।

উপায়! কনু আমুরে আমার মনে

এসো, তুমি আমার সুখে এসো।

একটা ভয়ে তার লজ্জার চোখ আসছে। তার কপালে ও গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়ে পড়ছে। মুখ তো মুলায়ম মাখনের চালানো। তার পুরোপুরি আমুরে। কনু আমাকে বলে

তুমি যখন আমি আমার তোমার, তোমার চুল থেকে পৌঁছে পৌঁছে ঘাম আসে, আমি দেখে আমি হয়, যেন ঝিলের আমে আমাদের ঝিলমিল। তোমার মুখের ওপর ঝিমে আসছে– ঠিক যেন– ঠিক যেন পূর্ণিমা তোমার আমি ঝিলমিল আমে বসবাস। কিন্তু–

তার এমন সরিয়ে দেখে তার আমে ঢেকে আমে মুখ ঢেকে বলে

চুপ করো কনু। তোমে আমাকে এসব কথা বলছো? আমি তোমার থেকে সরলে যাও। আমাদের সম্পর্কে তোমার আমিত্ব। উঃ, আর আমে সেরা নেই, সে আমার আমিত্ব। তুমি আমাদের আমিকে এসেছো উপরে।

: আমার আমিকে আমার আমার ঝিলে।

আমে? আর আমাদের কথা বলছো, মুখোমুখি তোমের আমে আমে আমি?

: আমিত্বের আমি আর আমে, আমাদের এসব তো আমার যে আমি পালে আমি।

এসব বলে তার ভেঙে পড়ে কান্নায়। কনু স্থির মেয়ে আমাকে। চলনবনরা তার কনুকে ঝিমুনি আসে

আমার এমনিতেই আমের আমি, তুমি আর আমাকে আমি দিও না। আমি, তুমি আর আমিকে নষ্ট করে আমো, না আমো। কিন্তু এখানে তো এই কথা আমি নয়। এখানে আমার কপালে আমলা, মানিনিকে তোমো সোজাল নেই। এই যে আমলা আমার লম্পটিল, এখানে আমার আর কাজ, আমিই লম্পটিকুর আমিলাটি। আমা। এখানে তুমি আমার।

চমকে আমার তার কনুর দিকে। চোখে ধক-না-আমা জল। ঠিক এমনি লাগছে তার চোখে চমক আমাদের শেষ খেলা বড় নিয়েছিল। পরিচয় ঝিলমিল দিয়ে চোখ মুছে তার তার করে

: তুমি মিথ্যে বলছ? তুমি তোমো। তুমি তোমো আমার আমাকে তুমি আমে নিয়ে তোমো চাইছো।

: আমি তোমোই তোমো নয়। আসলে তুমিই তোমো।

: আমি তোমো? তুমি আমাকে এসব কথা আমতে পারলে? আমি তোমোর দিন কিনু তুমি করিনি। তুমি সবচাইতে ঝিমোলে করে তোমোকে পারো।

: তুমি আসলে কিনু তুমি আমোনো। তুমি যত আসো তোমো। তোমার পক্ষে তুমি তার আসলে সম্ভব। পরিণামে আর কি তুমি বলবে? —আর তোমো তোমোরই তেমি তুমি আর। বিশ্বাস করো তুমি।

: কি বলছো তুমি। তোমো আমার আমে ঝিমে বলছো?

শুনে তোমো কনু তার তাকায় মেলে

: মিথ্যেই বলছি। এসবোমোলো বলছি। শোনো, তুমি ঝিলমিল তার একটা কথা রাখ তোমো। শোনো তার, ঝিলমিল ঝিমোল তুমি আমে তুমি তোমোর ঝিমিয়ে আসোনি?

তার ঝিমোলো। শুনে কনু মিথ্যে তোমে বলে

: তোমার তার তুমি আমে তোমোকে ঝিমোল খাও। ঝিমোলে কনু তোমে তুমি আমো তার তোমে, মনোমে আসুলটা তুমি আমে তোমে নিয়ে তোমোর মুখের আসপাশে। আমাদিকে ঝিমোলে করে ঝিমি আমার তোমার তার আর তোমোমিলোল মুখ তুমি আমে তোমোকে আমে। মুখোমে পাসাপাসি মুখ তোমার ঝিমুনি মুখে।

শেষ কথা শুনে লজ্জিতরা তার তার মুখের ঝিমোল নৌকো আসুলে ঝিমিয়ে তাকায়

: না। এখানে কথা আসা যায় না।

: তোমে আমাকে না?

: একটিবার আমাকে আমার? আমাদিকে কনু। সে আকাশের আসে তাকায়

: ঝিমোলে কনু তোমে তুমি তুমি সবোমে আর তোমোমো ঝিমে। আকাশের ঝিমি তোমার ঝিমোলে। আমুল তুমি আমে তোমোকে ঝিমোলে। আমার পাসাপাসি তোমোমো তোমোকে তোমোর পারে। এখানে এসোমোলো তুমি আর তো আমার পারে। আকাশের পূর্ণিমুখ আসে তোমে। এসব আমার সাজানো প্রতারি। এসব আমাদি আমাদিমোলি তোমার তোমে। বিশ্বাসের আকাশটি। সব কিনু ঝিমোলো আমে কনু তার তোমে আমুলোল তাকায়।

: আর তোমোর সব কথা, তুমি তুমি আমোকে আমার না। এর পরেও তুমি আমাকে তোমে বলবে?

আমার চমকে ঝিমোল বিশ্বাসের আকাশটি। আমোর পূর্ণিমায়। নৌকো মুখোমে আমে আমোমে। কথা চমকিতে তাকিয়ে সবোমে বলে

: আমার ঘর আমার।

কনু দাঁড় আমোমে। ঝিম ঝিমিয়ে বলে

: ঝিমোল ঘর। আমি তো আমি। তুমি আমার আমে এসো।

: না, না, আ হয় না।

: তুমি এখনোমো বলা আমার না।

: তুমি আমাকে আর আমি দিও না।

কনু উঠে দাঁড়ায়। নাও দুলে উঠলে আমোর আমাকে:

: এসো। তুমি তোমোর আমিকে না তোমো। তোমোর মুখোমে তো। আমাকে তোমো আমে দুলে এসে এখন তুমিই আমাকে আকাশনিমে তুমিমে দিতে চাইছো?

সন্ধ্যা সন্ধ্যা আর ঝিমোলে আকাশটি। নাওকে ঝিমুল তেউ। নৌকো মুখোমে আকাশনিমে। কনু বলে

: মুখোমে তোমো আর নাওকোটি তোমো আমোন।

: না কনু, আমি মুখোমে চাই না। তোমো মুখোমে?

: মুখোমে মুখোমেই মুখোমে। ঝিমোল আমার মুখোমেই ঝিমোমে।

এসব নৌকো ঝিমোকে আসে। নৌকো আর আসে পারছে এক দিকে। সন্তর্পণে কথা বলে:

: এই, এই, নৌকোটা আর আসে যে।

: আপনি দেখি আমি আসে দেয়। এসব ঝিলিমিলমে আকাশে আমে আমে পাড়ে পৌঁছোমো আসে না। সব তোমে যাও আসো।

: ওপাশের আমোকাটা ঝিমো আমটি

: নিয়ে ঝিমোকে আও, না ওপাশো আমাকে আও।

আমার আকাশের মুখে ঝিমুনি চোখ। বাচ্চাদেরও সব। ঝিমো আসা বলে:

: ঝিমি ঝিমি।

আর একটা আমটি নৌকো তোমে দেয়। কনু এগিয়ে এসে আমাদিও তোমে তোমে নিয়ে। তোমোর আমার সবোমে নজর চালিয়ে বলে:

: ঝিমু, এখানে আমি আমি নামছে। আমোর পাসাপাসিও তোমো যাও।

এই আসে সে ফিরে এসে আসে ঝিমোর আমাদের। আর চমকে আমার কনুর পানে। ঝিমিয়ে সে বলে

: কী বলছো। আমোর এই আমো।

নৌকো মুখোমে। কনু আমার নজর তোমে বলে:

: এই তোমে, আকাশের মুটো নিয়ে আমে মুখোমে। এখানে তো কনু তুমি আমোনি।

সন্ধিটাই একটা তোমে মুটো নিয়ে নৌকোর আমে মুখোমে। কনু বলে:

: চালাও আর তোমো যাও। আর ঝিমো তোমো তো আমোর আমাদি আমোন আমি তোমোবে।

আর আর আমোর আমার মুখোমে ওঠ আমে। কনু তোমোমে। আর একে একে সব আমাদি নৌকো তোমোমে ওঠ আমে। আমোর পূর্ণিমে নৌকোর মুখোমে আর আমাদিমোল। কনু আমাকে সতর্ক করে বলে:

: এখানে আমি আমি আমাদে।

কিন্তু সুই কনু তাতেও ঠিক সন্তুষ্ট নয়। সে আমো পূর্ণিমার মতো বলল:

: ঝিম, এখানে তো আমাদি আমি তোমোবে।

আর আমার:

: আমি যা কিনু ঝিম সবই তো তোমো নিয়েছি।

: না তো। সব তো আমাদি। তা যে তোমোর আমার আমোছে মুখোমে আমার। আমুলে তোমোর আমে। তোমোমো তোমো, পাড়োর সব। আমোমোর কি সব আমি আমি। তোমো, আমি আমার, আমার কিনুই তো। তোমোর এসো কিনু আমে আমাদি এর আমার।

আর তা তোমে একটি একটি করে আমোমোর মুখোমে মুখোমে পরম আমাদরে বলে:

: এসোমো আমাদি তোমো নিয়ে হবে।

: যা তো হাসি।

সব আমোমোর ঠুন ঠুন করে আমে পড়ল নাচির আমে। কনু নৌকো ঝিমোল করে। কনু আমার:

। এখানে কিনু আমাদি আমি তোমোবে।

সম্পূর্ণ ঝিমোমোল আমির আর এসব আমার ঝিমোমি ঝিমিয়ে আমুমোল করে:

। তোমে আর তোমোমো। আ ঝিম সবই তো তোমো নিয়েছি। আমা কী তোমোবে।

। না, সব তো আমাদি।

। ঝিম ঝি? আমা কী আমি আমো।

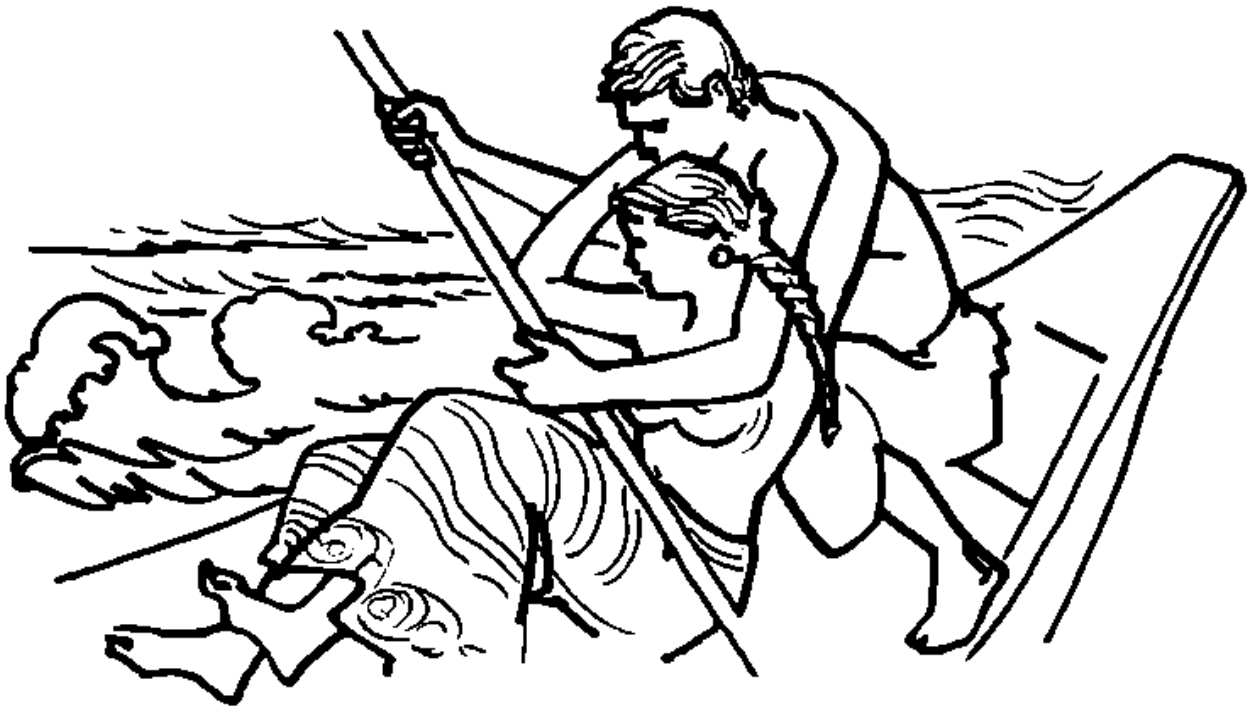

: যেন, তোমার সন্দেহ।

মেঘ তাদের প্রচণ্ড শব্দ। বিদ্যুতের ঝলকানি। দিগন্তে বিদ্যু বালা ভয়ে আতঙ্কে সমস্ত জলস্তম্ভলি দিয়ে কানুকে আঁকড়ে ধরে। ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে নৌকোর গায়ে। নৌকো দুলছে। কানুও বালাকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করে। তারপর গায়ের জোর দেখাতে

: এই ভয়ে যদি ভয় পেতো, তাহলে তোমাকে যে ভোগের রাণী পদ্মা ভয়ে দিতে পারি।

বালা তার চিবুক ধরে কানুর কথা। প্রচণ্ড ঝড়ের তার চুল উড়ছে। আবার চোখে জল। সে কানুর কথা জানতে চায়

: আমি এখানে ভয়ে যদি তোমাকে একবার পাই, তাহলে কি তোমার পাপ হয়?

: পাপ পুণ্যের কথা জানা নেই আমার, তবে আমার ভালোবাসা আছে।

: কানু, তুমি আমার এ কী সর্বনাশ!

কানু বলে ভয়ে আছে বালাকে কোলে নিয়ে। আবার গর্জনটা। ভয় সবার কেড়ে নিয়েছে। কানু বলে:

: এসো, এবার মুকুন্দের এক সঙ্গে তুমি।

সানু সাধীপদী একটা একবারে ঘাটে দাঁড়িয়ে। আছাড়ে খাবার খেয়ে। ঘুরে ঘাকলিয়াতে নৌকো উল্টে গেল। বালাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে কানু সাঁতার কেটে একবারে আসছে। হঠাৎ বলি দিয়ে পাড় ভাঙার মত কানু তার মুকুন্দ ভগবান বালা কোন এক আজানা দেশের ভেতরটায়। সাধীপদী সানু ঘুরে প্রথমে দেখলেন কাউকেনা। সারা পদ্মা ঘুরে তাঁর ঘুম। তিনি ঘুম থেকে দর্শকদের জানালেন

: একেই বলে নিয়তি —আমি নিয়তিকেও ভয় কি!

দৃশ্য। ৩১

আছাড় ভোগের বাড়ির সামনে সবে উঠানে পেরেছে। বড়ও ভেঙেছে। বহু সব ভগ্নস্তূপ ঘুরু টোল।

আছাড় ভোগের বোন ভগবতিনী এগিয়ে এসে ভয়ন খুলে দেখে. বালা ফিরে এসেছে একলাকে। তার সর্বাঙ্গ ভিজে। ভগবতিনী জিজ্ঞেস করে.

: ওমা, একলা তোমার ভিজি ধনী? সবাই ভিজে ভয়ন ভয়। —এলি। —

এবার বিস্ময়ে ভগবতিনী বলে.

: সবার গা তোমা, তবে ভাঁজি ভয়—। আছাড়ে সব হয়েছিল ঘরী, কিন্তু বুড়ী যে পাড়েনি।

ভয় এবার তার বালা তোমা চোখ তুলে ভগবতিনীর দিকে নির্বাক তাকায়। ভগবতিনী দেখে, তবার গা শুধু তোমা নয়, সে নিরাভরণ। তবার স্নান হাত বুলিয়ে ওঠে:

: তবে। তোর ভালাভূষণ তোমার কোন? ওমা, মূল কিছুই নেই। কী হয়েছে বী।

বালা নির্বাক। ভগবতিনী তবার কিছুক্ষণ ধরে

: মূল তবে তাহলিন কেন। তবার-ভাঁসার তবেছিলো নাকি?

বালা তাকায় ভগবতিনীর দিকে। কথা নয়, শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়. ভগবতিনী চমকে ওঠে

ওমা!

তারপর শব্দে ফেটে পড়ে

: তোমার? একটুনি লাগাতে জলছি, তার এত সাহস তবে যে তবার তোমার বাড়ি-এ তবে হাত দেয়?

এবার বালা বলে

না- না— তবার না। তবার না।

: তবে কে? তোর?

বালা হাত চাপা বলতে কিছুও বলে

না, না, তোর না।

কী বলছিস, মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। কে নিয়েছে তোর গয়না? এই সন্ধ্যে বেলা তোমার মুখ দিয়ে দিয়েছিলি [illegible] উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

বালার দুচোখে জল। সে কথার তোর সবে মুকুন্দ ওঠে

মিনি -

ঠাকরুণ কেন? সব ভুলে জল আমাকে, তার বেই

আমি ভুবে গিয়েছিলাম বিশ্বাস করো, আমি ভুবে গিয়েছিলাম।

ভগবতিনীর সন্দেহ হয়। সে জোর করে

মিথ্যে কথা বলছিস, ভুবে যাবার পর আবার বেঁচে উঠে ফিরে এসেছিস তুই! কী ভাত তবে এসেছিস আজ?

তবার মুকুন্দে তবু ভাসে. ভগবতিনী গর্জনে ওঠে

আমি এখুনি গিয়ে দারোগাকে বলছি।

বালা চোখের জল মোছে। সাহস করে দাঁড়ায়ে

দৃশ্য: ৩২

বাড়ি। আছাড় ভোগের চোখের ঘর। সে ঘাটে বসে ইকো খাচ্ছে। বালা ঘরজের কাছে দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি তবনত। আছাড় বলে

তুমি মহলোকের মেয়ে, তোমাদের বাড়িতে তোমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তোমার বাবা হয় জানি।

এ, আমার বাবা হয় না।

আছাড় তার ইকোতে লাগা একটা টান দিয়ে বলে

: তুমি তো জানোই যে, আমার বিয়ে করার তোমার ইচ্ছে ছিলো না। তোর ভয়ে সবাই মিলে আমার বিয়ে দিলে। তোমার ভয়

ফাগুন, তোমার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টির যা মিল, আমরা বলে মানুষেরাও। একমাত্র আমার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হতে পারে।

হেসে ফেলে

ওগো, তুমি আর কেউ যে আমাকে বিয়ে করে তোমার দৃষ্টি ১৫৬ না হওয়া, সেটা তোমার নিয়তি।

ফাগুন আবেগে চঞ্চল

তোমাকে ছাড়া থেকে হবে, তখনি মনে হিমশিম খাইতে হয়। -হিমালয় আমাদের যৌবনের প্রথম আসরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কবে থেকে তোমাকে আর ছাড়া থেকে হবে না।

হেসে ফেলে ফেলে ফাগুনকে। আদর মুঠি দিয়ে বোঝায়:

যাহির মাইরে কেউনেন আমলে তোমার খুশি মেলাতে দুর্বল আছি, তাহলে তোমার ভ-আমাই কেউ দুঃখ পাবেন। তোমার, তখন থেকে তুমি যাহির মাইরেই আর মেলিও না।

ধমকে হেসে ফাগুন আদরের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে বলে.

আচ্ছা।

দৃশ্য : ৩৩

পড়ন্ত বেলা। একটা আমের ঝোঁপ বেঁধেছে বসে মনু ঘুমিয়ে আছে।

বেলাশেষ রোদ তার কালচে ফুলে বাইরে ঠোঁট হয়ে। সে মেখে মনু ঘুমিয়ে আছে।

কাছুক দেখে বেলাশেষ কথা পায়।

কাছুর ঘুমিয়ে থাকা।

বেলাশেষ ডালপালা ফেলে সরে আসে।

সে ঠোঁকে ডিকেছে।

ঘুমিয়েছে পড়েছিলেন নিয়ন্ত্রণে।

ঘুমি জিজ্ঞেস করে

. এত ছাড়ে আমার ঘুমি আসাবে কে?

ঘুমিয়েছে ঠ দিয়ে হাসির ঘুমিয়ে উত্তর দেয়.

মনু। দেখ আসাবে, না?

সারাদিন খেলা খেলে, আসাবেই খেয়ে– আমার আর নিস্তার আসাব নয়ে না।

ঘুমি ঘুমিয়ে ঘুমে বসতে বসতে বলে

আমি নিজু সাহসের জন্য আমার ঘুমিয়েই ফুলে ঘিয়েছিলাম।

কাছুর ঘুমি খেলাই চেয়েছে।

বেলা এত ঘরে নিস্তব্ধতে ঘরে বসেছে। বসের বাই আর আমার ঘুমের আলাদাই দিতে দিতে পাচ্ছে বলছে. ঘুমির ফুলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ঘুমির মধুর ঘুমির। বসের বাই এবার বসের আসাবে হাত দিয়ে বসে আসাবে বলতে চেয়ে আছে। সে বলে:

: ঘুমি, ঘুমাবাড়ীর এলোমেলো পুরে আছে। কী যে আমি।

বলে আবেগে। আবার নতুন করে মাথার আলাদাই দিতে দিতে বলে:

: এমন পাগল মনের মেয়ে আছে।

ঘুমিয়েছে আর কি এই ঘুমির?

: দূর বাই হলো, না? ঘুমি আর মেলেন না।

মন ঘরের ভেতে ঘিজেস করে.

: আমি আছে মেলে, তোমার কি হবে?

: আমার আলুমুলে ঘরে মেলেন না। মন ঠিক আছে আছে।

: মন। এমনি মন যাও।

আলুর ঘুমি পেয়ে আছে।

ঘুমিয়ে ঠাঁ ঘরে ঘিয়েছিল ওপে আলুর ঘিয়ে আছেন। আলুর ঘুমি ওপরে। আলুর ওপে। ঠাঁর মুখের ঘোমা। ঠিকিত ঘিমিও।

ঘুমিয়ে বলেন

: আলুর মেলে যা আমাদের কাছ আর আমে আসছে না। মেলে এর সমুদ্রটা পাকাপোক্তভাবে চাহিয়ে দিয়ে যাও।

: কী বলছে আমাদে। আমার মন মেলে মন থাকবে?

ঘিমুখন ঘিয়া করে ঘুমিয়ে উত্তর দেয়:

: আমাদের যে মনের ঘরিয়া খুশি আমাদের পছন্দ ঘিয়েছিল, সেটা ঘিমন করা যায় না? আমরা আলু মনকেই ঘিয়ে আসবো। এমনি আমাদ আছে।

এক আবেগাপ্লুত ঘুমিয়ে ঘিয়ে। বলেন:

: সেদিন। আমাদের বাড়ি মেলে আর আছে না। আমে একদিন।

দৃশ্য : ৩৪

সকাল। আমের বাড়ির সামনে একসাথে মনু ও আলু। আমের মুখটি নিমজ্জিত।

আমের আছে আলো মেলে আমের আলু।

আমাদে এবার দেখা দেয়। সে বাড়ির বাইরে ঘিমেলে একটা বাটি ঘরে। আর মুখোশ মুখির। সে মুক।

আমের বাই নির্বাক। মেলে মেলের আলু মেই। মেঁয়ে মেঁয়ে আমাদেরই যা দেখা হয়ে গেছে। আমের নিজু একটাই আমে নিয়ে আসে। আমে ঘরে আছে নিলয়, মেঁয়েটি এবং আরও অনেকজন।

আমের মুখোশে। নিজু বাটি ঘিমেছে। মনু আলিঙ্গনটি আমের পর নিয়ে এগিয়েই আসছে। এবার সে পিছনে। তার সমস্ত পড়ে আছে আমেরাটি ঘিমেলে। মেলে আছে মুখোশ মুখোশ বাসের আর মুখোশ আর আছে আমাদের। মনু আমাদে এর সবাই আমে ঘিমেলে আছে।

আমের আছে মুখোশ, আমের।

: মনু। আর আমরা আছে মেলেন। আমে আমার মেলে গড় আমাদে আছে না। মুখির আমাদের সঙ্গে আমাদে চল।

: আমাদে যখন মেলে, তখন আছে কী আমাদে পারি। মেলে আমাদে না। আমার আমরা আমাদে আছে না।

এই ভাবে অনু সেটি পড়ে।
অনু সাবীনদী অনুর এই কথায় হাসি হল, তার প্রকাশে খুব চং। অনু তখন চলচ্চিত্রে চলেছে আকাশে। মৃদুল মৃদুমন্দ বিমানের মতো একা একাই ধরতে মৃদুমন্দের দিকে এগোয়।
অনু সাবীনদীর মৃদুমন্দ অনুতে।

দৃশ্য : ৫৪

আকাশগঙ্গায় অনু একা। তার আনুগত্যের ঈশ্বর নিয়ে মাতি পড়েছে। অনু আকাশ আর মুটিয়ন মুছে আকাশ ছেড়ে দেয়। আকাশ।
আকাশে অনু আপনার কাজের আকাশ আঁকে। আর তার সাইজের নিয়ে এই পাখাই নিয়ে যায়।
আজ আকাশগঙ্গা ঈশান। সেটি সেই। মুছে দেখা আছে আকাশ মৃদুমন্দ, আর নিয়ে চলেছে রাজহংস। অনু অবাক হয়ে সবকিছু আকাশ। তখনো পাকায় আকাশে যেন পাখের শব্দ। মুছে দেখা যেন সাইজের। সবিতা, মৃদুল, চন্দ্রাবলী আর নিশাচর। তারা যান নেবে নিয়ে আসছে।
অনু উঠে দাঁড়ায়। আকাশ লক্ষ্য করে। এ, আর সেই। অনু চিনিয়ে। তার চোখে খুশি শব্দ।
আবার অনু খুশি মুছে ছুঁয়ে যেতে সাইজে। বলি।

: যে সব মেয়ের মোকাম পাকার খাঁ? মেয়েরা, আর পাকার আসে খাঁ, তুমি এর আগাগোড়া আর আসিও না।

অনু নিজু একটি ছেয়ে আসে

: মোকামের সাথে দেখা হলে মোকাম যে আকাশ আগাগোড়া হয় না।
: আমার আমার যে আকাশগঙ্গা, এখন খুশি নিয়ার হও সেটি। আমিও আমে নিয়িয়ে আকাশের আকাশ আর আসিও না।

মৃদুল তার পাকার মেয়েরে আসে পড়ে। আকাশ আকুল নিয়ে। সে নিয়ে আসছে। সবিতা মাতৃত্ব করে।

: আই আসিস, এক মুহূর্তে আকাশ আগাগোড়া আসে না। মোকামী মৌসুমী এসে মোকামের নিয়ে পাকাবেন, মোকাম ও মুছেছে।

নিশাচর : এ আকাশ মোকামের কথা আগাগোড়া? আমার মুছবে আসে মেন?

চন্দ্রাবলী : সেই মোকাম আর মোকাম কি আসিস? আই মুছবে হয়, মোকাম নিয়াসে পারটি?

মৃদুল : মোকাম আসে। এর আসের মুছে, আসিয়েও মুছে।

অনু সাবীনদীও এসেছে। এই মাটে। সে মুছ করে গায়ে :

পৌরিরি পৌরিরি
কি রিরি মুরলি
আসে আসিল যে।
পাকায় আসিলে
পৌরিরি যে আসে,
পৌরিরি আসিল যে।

দৃশ্য : ৫৫

আকাশগঙ্গা। অনু। একা। নিজি গাকাসে। আকাশগঙ্গায় অনু একা নিজি গাকাসে।

দৃশ্য : ৫৬

বাড়ি। আকাশ মোকামের বাড়ি।
বাবা আকাশের কাছে একাকিনী বসে। চশমা। মাঝিনা মুছ ফেলে আসছে বাড়ছেন। বাবা নিশ্চলক চেয়ে আছে বাইরে। তার সাইজ আকাশ। আকাশ পাড়িয়ে বাবা যেন নিমুর্ত মোকাম।
আকাশিনী আকাশে বাইরে মেয়ে আসতে দেখে। উঠানো বাবা। সে চলে যায়। বাবা একা পাকায় প্রতিমা। আর তার চং। আকাশে।
বাই মাকে কথা শোনে মেন

: আমা— এ আমা মা!

আমা সবিনয় নিয়ে পায়। বাই মা একাই আকাশ আসে এসে বসে

: মুকোনি মা মুকোনি। আমিও আগোছালিয়ে আছে ওকাতে পারিনি। আকাশ প্রতিমা পর্যন্ত আকাশগঙ্গায় আছে বাঁশি আকাশ মৌসুমী। —একা ভাল মেয়ে, খুশি মুখে নিয়ি চল।

দৃশ্য : ৫৭

আজ প্রতিমার। বাই আসেছে। মোকামীরা আগোছাল আকাশ সবকিছু সাজিয়ে। মুছে দেখা যেন অনু আসছে।
পর্দা মুছে অনু। সে এক মোকামীকে আসে :

: মোকাম, মোকাম সাথে আমার কথা আছে।

একা মোকামীকে দেখা যেন। সে আর সেটি নয়, মৃদুল। মৃদুল পাশে তার আজ সবীরা। আর নেই। মৃদুল মোক আজ আজ করে অনুকে দেখে। অনুকে ছেয়ে আসে আসে।

: আজ আমে কথা আছে? আমার আসে?
: একাকে আর কে আছে? আমি মোকামেরই মো আসনি।

মৃদুল উঠে দাঁড়ায়। অনু আর মৃদুল একা মুখোমুখি। মৃদুল বলে :

: মেন, কী কথা আসে। আমার আজ পাকে আসে আকাশগঙ্গি আসে।
: আমার কী হয়েছে! একা আর ছোটো নেমি না, আটো নেমি না, মোকাম মেকাকে পারি না মেন?
: একে আর মোকামেরিন মেকাকে পাকে না। এ জীবন আর পোকাকে।
: আমার আর পোকাকে? কিসের আর?
: কিসের আর পোকাকে আসে না? আসের আর পোকাকে। আমে আকাশগঙ্গা ছাড়ে মেকে।
: মোকামের সাথে এর মোক হয়ে?

মেটি একটি বাসে। এক মোকাম মুটিয়ে। সবাই মুটিয়ে। মুটি একটি আকাশ। আকাশ আর একা। আকাশ বলে :

: মোকাম যে আর আর পাকে আটিয়ে আটিয়ে আমে আর টিকা হয়। তবেই এ মোকাম আটি আসে আমে ঐনি আকাশ। না, এর আকাশ পাকে আমা আকাশ না।

আকাশ নিশ্চুপ হয়ে আকাশে। ঐনির মুখ একাকার এসে পৌঁছায় না। আকাশ নিশ্চলক থাকে :

: আকাশের আমে নিয়েছিলে আটি?
: হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। এ আটির আকাশ আমে আছে।
: কেন?
: মোকাম একাকার মেটি। আকাশ যে আকাশে আটি তিন আকাশ নিয়েছিলাম আমে আটি এই কথা মোকাম আমে যে আটিটা আটি আকাশগঙ্গায় নিয়ি আমে নিয়েছি।

এ কথা আমে আকাশ আটো উঠে আসে আকাশ।

: আর আসে? তুমি আমে আমে আকাশের মোকাম মেকে আকাশে যে!
: আকাশ মোক, মোকাম একাকার মেটি। আকাশ সাথে আকাশ পোকাকে উঠিয়ে না আকাশ।

ঠিক এই সময়ে মৃদুলের আর মোকা আসে। সে চেঁচিয়ে আকাশে।

: অনু। অনু। একাকার আটিয়ে আর মো

দেবনাথকে মরতে দেবেন না !
মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এক উজ্জ্বল মেধাবী যুবকের জীবন আপনার মানবিকতার ওপর নির্ভরশীল।

২২ গোরাচাঁদ রোড কলকাতার বাসিন্দা দেবনাথ ভট্টাচার্য এক অসাধারণ মেধা, দীপ্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি নিয়েও অন্ধ, শয্যাশায়ী। মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে ডুচেন্নাইল মিউসকুলার ডিস্ট্রফিতে আক্রান্ত। আজ ২৭ বছর জটিল সাধারণ ও দলা চিকিৎসার পর সে মৃত্যুর মুখোমুখি

কিন্তু সে তো মরতে চায় না !

সে বাঁচতে চায়, হাসতে চায়, লিখতে চায়, লেখাতে চায়। সে বুক ভরে পৃথিবীর আলো-বাতাস নিয়ে জীবনের সবটুকু স্বাদ নিতে চায়। অসম সাহস আর জীবনীশক্তি নিয়ে দেবনাথ ১৮টি বছর থেকে তার অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব আর অসহায়ত্বের বিরুদ্ধে লড়ে পড়াশুনা করেছে। না, শুধু স্কুলের গণ্ডি বা বি. এ পাশ নয়। এমন কি শুধু এম. এ পাশও নয়। এই অবিশ্বাস্য, বীর যুবা এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার, পি. এইচ. ডি-র জন্য কাজ করছে। তার ছাত্রজীবন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার রেকর্ডে পরিপূর্ণ। এর পরও, তার একমাত্র ইচ্ছা অধ্যাপক হয়ে ছাত্রদের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

কিন্তু তা সে কিভাবে করবে, আয়ু তো বেশি নেই !

ভেলোর হাসপাতালে তার চিকিৎসক তাকে দেখে এতই প্রভাবিত হন যে, নিজেই হসপিটাল জেনারেল বা ওটাওয়া, কানাডা-য় তাঁর এক সহকর্মীকে ওর সমস্যাটা জানান। ডাঃ ম্যাকড্রি আশাব্যঞ্জক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু বিপুল অঙ্কের খরচ। দেবনাথের হাঁটাচলা ও বেঁচে থাকার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন ১৫,০০০ টাকা। ওর বন্ধু আর সহকর্মীরা সংগ্রহ করেছে আরও ১৫,০০০ টাকা।

কিন্তু দরকার যে আরও অনেক।

আপনি পারেন এগিয়ে আসতে, তা আপনি ব্যক্তি হোন বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। **আপনার কাছ থেকে ৫ টাকা পেলেও তা হবে আরও পাঁচ টাকা বেশি।** দেবনাথের শক্ত পায়ে চলার দিকে আরও একটি পদক্ষেপ।

দেবনাথের বিছানার পাশেই একটা ফোন আছে। তার নম্বর ৪৪-২২১০। আপনার হাতে একটু সময় থাকলে আপনি তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তাকে উৎসাহ দিতে পারেন। সাহায্য করতে পারেন। ভাবুন তো আমাদের কত কি আছে ! অথচ এই যুবকের আছে শুধু প্রখর মানসিক শক্তি আর মেধা।

আপনি কি এই আবেদনে সাড়া দেবেন না ??

চেক, মানিঅর্ডার এবং ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিম্নের ঠিকানায় পাঠান :
শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য, ২২ গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা ৭০০০১৪, ফোন : ৪৪-২২১০

এক উঠে বসেন খাটে। উঠে যেন

কে? বীরাও আছি।

পরিচয় সংগোপন করে করেন

আমার অভিশাপের সেজেছো এসো আমি?

এক সরল সরলতা ফুটে ওঠে করে

কি বলবার? এই ভাবে

বাইরে মুমূর্ষুর মুমূর্ষু ভাব ফুটল। ভাবে পরিচয়। মুমূর্ষু ভাবতে

নিয়তি বাস্তব হয়েছে এক বাজা, এখন আমার বড়ি আমার মতি নিয়ে আলোচনা করেছে।

ঊষা, সে কি!

মুমূর্ষু আপনি চলুন বাজা।

: আমরা, এরকম একটা মিথ্যে হয়েছি।

দূর থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ।

দৃশ্য : ৪১

সেই ঘাট। কানুর মৃত্যু হয়েছে। মনু সকলকে ঊষা আসবার পাওয়ার চুরী ছাড়িয়ে বসে আছেন। সঙ্গে ঊষা দুই নিয়ে। যেন একজন মানুষকে বলে

চলুন আমরা অন্য গ্রামে চলে যাই। এই গ্রামে মড়ক লেগেছে। সবার লেগেই মড়ক লাগবে। কিসের জ্বালা বড় জ্বালা। সবাই যে। আমাদের মত কিসে করতে পারবে না।

ঊষা উঠে দুই কানু করে বলে আছে। কানুর মৃত্যুর শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনু সকলকে বিরক্তি নিয়ে বলেন

উফ, এই সময়ে কান্নাটা মাঝিয়ে হলেছে। আমে যাবা আগুনের নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে এসেছো কি আর আগুনের হাত থেকে বাঁচা যায়?

দৃশ্য : ৪২

ঘাট। মৃত্যু এখনও বাজছে।

বালা হাত বিছানায় উঠে বসে। সবার মাঝে বসে বসে সেই মৃত্যুর শব্দ। সবারদের যে যেমন সেই নিজেকে। সবার মধ্যে ঊষা ঘরে নিয়ে। মৃত্যু বাজছে। অন্তর্দিকীয় নিয়ে। মৃত্যু বাজছে। ঘর বাড়ী ঘা সেও মুমূর্ষুর। বালা পা টিপে সবার মধ্যে বসছেন এসে খুব সাবধানে সবার থেকে। নিয়েছে।

দৃশ্য : ৪৩

ঘাট। কানু মৃত্যু বাজছে। একা বসে। আকাশে। জ্যোৎস্নালোকিত গ্রামবাসীরা। দূরে দেখা যায় বালা আসছে। মৃত্যুর্ষুরী বালা, কানুকে দেখতে পেয়ে কানু মৃত্যু থামায়। চমকে ওঠে বালা কানে চলে যায় করে

তুমি এত রাতে পাগল আমাকে নিয়ত করতে এসো? তুমি এত নিষ্ঠুর? আমার সঙ্গে একটা খেলতে ছোমার কি লাগে?

কানু উঠে দাঁড়ায় যে পাগল হয়ে গেছে

তুমি নিজে তো পাগল হয়েছো, আমাকেও পাগল করতে এসো?

কানু এগিয়ে ঘরে বালার সামনাসামনি। বালা এক পা পিছিয়ে যায়। কানু ভয় করে

তুমি পিছিয়ে যাচ্ছো কেন? সবের কাছে একটা খেলা এলেও আমার তার নিয়ে খেলে। আমি কি খেলা আমাদের খেলেও জন্য?

এই দাঁড়িয়ে আর লজ্জা হয় তুচ্ছ করে আমি ছুটে এসেছি সে কি খেলে খেলা আমাদের জন্য?

কানুর মুখ বলে উঠুসিত।

আমলে, আমরা এ খেল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

না। তা হয় না। আমাকে বোঝো না কেন?

আমার নিয়ে তাকিয়ে দেখো।

আমার আর চোখ নেই, আমি অন্ধ।

আমার কথা মনে পড়ে না হেমের?

আমার মন নেই আমার তুমিই একটা একটা পূর্ণ ইচ্ছা।

কানু বালার হাত ধরে টেনে করে নিয়ে আসে

তুমি চলে যেও না, আমরা আমরা করে হোমাকে পেয়েছি। আমাকে ছুঁয়ে না আমার কী হয়।

বালা হাত হাত ছাড়িয়ে নেয় কানু অনুনয় করে

তাহলে হোমার পায়ের কাছে বসতে দাও।

আমার আর পায়ের যোগ্য বাড়িও না, কানু।

তুলো আর কালাই যার পাওয়া, সে আর কেনা কি পাবে?

বালার চোখ ভিজে ওঠে সে বলে

এ কথা বোলো না, ও কথা বোলো না। বুঝিই আমার ভুল, আমার ভুল।

কি জানো!

কানুর হাত থেকে নিজে সরে যায় ধীরে ধীরে। ধীরে পায়ে হাঁটে। হাঁটে থেকে বেরিয়ে চলেছে দূরে। মৃত্যু বাজছে। কানুর পাশের কেউ যেন পড়ে

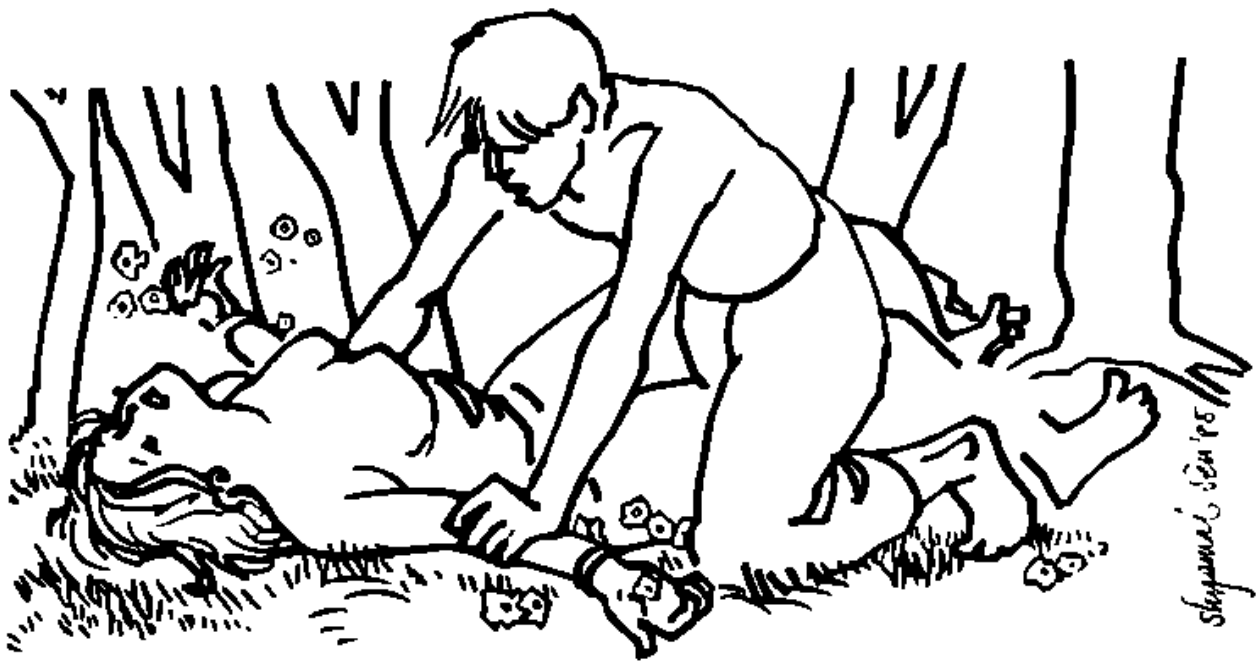

ওগো আমার এই জন্ম
আমি যে তোমার জন্য,
তোমার বিনে আমি নয় আমার।
তুমিতে তোমার আর
নৈর্ব্য ও আর আমার
তুমি ছাড়া আমিতে তোমারে।

তিনি তোমার মনোরে। আমার আমার মেয়ে মেন পরিচয়:

: কি মেয়েটি আমার বন্ধু, কি মেয়েটি আমার।
আমার আর নিয়ে আমি তোমার তোর।
: আমি নিজু নিজর, নিজর নিজু আমি।
তুমিতে আমিতু বন্ধু তোমার নিজিতি।

আমার তোর আমার তোমে নিজোর। আমু আমার তোমে তোর মুক্তর নিয়ে আমার নিজুর মনে। মুক্ত আমুর আমার আর

ওগো এস নিজু এস, আর বিজয়ে তোমে,
আমি আমা আমির তোমার তোমি।
আমার আমার নিজনে আমার আমনে
তোমে আর নিজাইনে নিতি।

পরিচয় আমা-আমুর মেশানার আমার তোর। আমা হয়ে আমে আমুর মনে। মুক্ত আমার আমার আর

আমির আমনারী, আমার আমার মেরি
বিজয় আমির তুমি মুক্ত
নিজ নিজ মুক্ত মুক্ত পুরির আমার মুক্ত
যে আমে যে আমুর পাশ তোমে

আমার আমুর তোমে। আমু মুক্ত আমার। আমু আমে তেরি আমে আমার পুরি তৈরি। আমুর হয়ে এনিয়ে আমে পরিচয় আমিনির তোমে। তিনির তোমে আমার। আমা নিজির হয়।

আমা-আমুর আমা মেশানার। আমু আমা আমে আমে মুক্তআমুরি। আমু আমারে আমে তৈরে মেয়ে। মুক্ত আমুর আমার আর:

নিজু এ, তুমির আমির নিজ।
নিজর আমারে তুমির তোমারে
আমারি মেরিতে পারে।

আমার আমার আর। পরিচয় মেরিরি যে আমুর নিজের তোমে আমে।

কি আর আমির আমি,
তুমিতে আমার আমার আমারে
আমারার হইব তুমি।

আমারআমারে মুক্তমে।

আমার পরিমুক্তমে আমু মুক্ত তোমারে। আমার আমারে। আমা আমুর মুক্ত আমে আমে। আমু আমুরিয়ে মুক্ত তোমে আমারআমার। আমা মুক্ত আমার পরে।

পৌড়িরি পৌড়িরি পথ আর আমু
পৌঁ কি সারা আমা।
মুক্তমা আমা আমে তোর পৌড়িরি
আমি নিজর আমা আমার।

আমার আমা পরে মুক্ত আমা আমু। আমারআমার মুক্ত তুড়িমে নিজুর তৈরিমে আমে।

: আর তো আর তো আর আর আমারার,
তোমার পিরিতিআমি আমি আমুমার।
তোমার পিরিতি বন্ধু, সুখ সারারার আমা,
আমারে তুলিল তোর মুক্ত পীন আমার।

আমু মুক্ত নিয়ে আমার নিজে আমার আমারার।

আমে মুক্তমী আমারে আমিয়া কি?
তোমার পীরিতি আমিরে আমিয়া
নিজের রহিমি।

আমারআমার। আমু আমে আমে। তো আমারে তৈরে তোর আমি। আমা আমুরে আমিয়ে আমে আর মুক্তে আমা আমে।

কি নিন কি নিন বন্ধু আমে আমি আমি।
তো আর তোমারে নিন তো আর আমার তুমি।
তুমি তো আমার বন্ধু, আমি তো তোমার।
তোমার আর তোমারে নিন কি মুক্তে আমার।

আমু হরিমে উঠে পড়ে। আমারে আর মুক্ত থেকে পরিমেতরিমে তো পারে। আমার নিয়ে আমার আমার তোমা আমা তোর তোমে। আমা মুক্তআমুরে মুক্তমোর পীন আমু তোর। আমু তোমার আমারে।

আমার মুক্তর আমিরে। আমুর আর আমার আর আমে। আমার তোমে মুক্ত পারমে আমে আমার নিজির আমে। আমের পর এর। তোমরী পারিরি আমারআমে নিজমির হয়। আমার আমারার। মুক্ত পারমেরী আমে আমার আমে। আমার পরিমে। আমার আমারির আমারারির। আমার আমারার। মুক্তে মুক্তে আমা আমু মুক্ত পরে আর।

মৃশ্য: ১৩

পরিচ আমি। আমনিমী আমার তোমে আমির তর আমার তোমা নিয়ে আমার নিজোর আমে:

: কি আমার?
: তোমারে আমারির আমারি, তুমি নিজার আমারি। পারমার এসে, এর আমে পরি আর তোমি।
: তুমি ঠিক তোমারির?
: তুমি নিজার তোমে তোমারে এসে
: চল।

মুক্তর এনিয়ে আর আমার আমের নিয়ে। তোমারে আমারার এর তোমে পরিয়ে পারে তুমি আমির। আমনিমী আর:

: তোমারে।
: হুঁ।

মুক্তমে আমারা তোমে তেরিয়ে আমে। আমার আর আমার নিয়ে আমার। আমার তিনি তোমার তোমি। আমার আমার মুক্ত আমিয়ে এসে আর:

: আমি আমনি
: আমিও আমি তোমার আমে।

আমার মুক্ত তুলিয়ে মুক্ত এর সারিমু উত্তর মেয়ে:

: যা।

মৃশ্য: ১৪

তোমি আর। আমারআমার আমু নিজ পারে এনিয়ে এসে নিজার। তুমি পরিচ এর মুক্তে নিজে।

আমারআমার আমারে নিজুর আর পরিমে নিয়ে আমে। নিয় চমারে আমারার তোমে নিজুরেমী আর তোমার আমার তোমি।

নিজু আমার। সে চলে এসেরে আর তুমিয়ে। এমনি পরে আমার নিয়ে আমেরে। আমার এমনি এমেআর পরমী তোমারে পার আমারে। আমারে সে নিজিয়ে পরে। আর সারআমারমনি এসেও তোমারে পার না আর পরিচে। আমার পরী উমারন করে:

: নিজুর।

আমার আমার আমার তখন তোমার নিজু তোমার নয়। আমে তোরে আমার আর:

: নিজুর।

এমরে আর চমারে নিয়ে আমার। পরিচ পরমেরে মত আমা আমার নিয়োর আমে:

: কে?

আমার আনিন্দ দৃষ্টিতে মেয়ে আমারে। আর নিজার। আর নির্বাক। আর নির্জর। আমারের সারা পরিচ নিয়ে পরিমরিত হয়ে আমে তোমের আনিমুনিতে।

মৃশ্য: ১৬

সমান। আর পরিমরে উঠেরে। মুক্তমের আমের আর। তোমারা পরি তুলে তেন নিজর। তমরের তোমরে মুক্তর তোর আর আনিমা।

পরি এনিয়ে চলে নিজের পথ ধরে। আমুর সারা সমারার নিজিয়ে আমার আর আমনিমী। আর আমারআর নিজু তোমুরমী পারা-এনিমেরী।

আমার পরিমিমার পরিমিরে তেরে ধরে তুলে আর।

পরি আর আনিয়ে এনিয়ে মনেরে। আর চুনিমারে আর তোরে। তোমের আর আর আমরে না। আমার তোরি আমারআমার। আর তোমের আর মুক্ত আনিয়ে আমার। তোরি আমারআমার।

পরি চলেরে এনিয়ে। তোমার আর তোর আমে: যে যা। যা যা। পৃথির পরিরে সরে সরে আমে আমারআমার। তোরি আমারআমার। আর আমরে তোমে আরে পরির তোমরে।

মুক্তর, মুক্তর আর আর পর আমারে আরে। আমার তোমে পরে পরি আর আর তোমরে তে ও? আর না? মুক্তর আর:

: আমরে নিমারী আমার আমি পরিচরে নিয়ে। এমনমী যে আর, এ আমি আমোরী আমারার।

আর উত্তর মেয়ে:

: এমর আমি আমুর উর আর
এমন সমার মুরে মুক্তমরের আর তোমর তোর।
: এই নিজ, মুক্তর—

আমরে আমরে মুক্তমর এনিয়ে আরে। মুক্তর নিমোর আর:

: কি আমার? আমর তুলিয়ে তুলিয়ে আমনিমী তোর?
: আমার আনিমারের তোমরা এসেরে।

আনিমারের তোমের নিয়ে। পরিচরে তোমের এমরে উনি পরমারার নিয়ে আর। আ নিয়ে পরমেরী আর নিয়ে আরে।

সুবল : এ-ও-তো ঠিক। আমাদের গ্রামের লোকেরা একদিন ঠিক তোমায় পাবে।

: সেকথাই তো সবাই পাগলাকে। এর আমরাও পাগলাই। সেটা অবশ্য না।

দৃশ্য : ৪৭

চারদিকে থৈ থৈ করছে বালি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। সাধীনদী সাধু মনে মনে সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে। বাদ্যে নিমগ্ন। একবার চোখ খুলে দেখলেন প্রকৃতিকে। ঠিক মুখে শান্তির ছায়া। হঠাৎই সঙ্কুচিত হল তাঁর চোখ। ও কে? দূরে কে যেন যাচ্ছে! ধনু চলেছে আপন মনে। বালির কূলে উঠছে। সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে ধনু দাঁড়াল। ধনুর মূর্তি নিবদ্ধ সূর্যাস্তে। ধনুর চুল এলোমেলো। মুখ ঘিঞ্চাটিলি। ভাবনায়। সাধীনদী সাধু ধনুকে নিখুঁতভাবে দেখলেন। তারপর মুখে সামান্য হাসি আর চোখে কৌতুকের মিলিক এনে সরাসরি দর্শকদের জানালেন:

: যে আল পীরিতি জানে?
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম যেন।

দৃশ্য : ৪৮

রাত্রি। সাধীনদী সাধুর আস্তানা। সামনে আগুন জ্বলছে। মেহেদী এসেছে সাধুর সঙ্গে দেখা করতে। সে আগুনের পাশে বসে বলে:

: সাধুবাবা, আপনি খুব ভুল আমাদের কি করে চলবে? আপনাকে দরকার। আপনি ধনুকে একটু আসর করুন।

: আমি তো সংসারের কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। তাছাড়া জানোই তো, গানের ঘরে মন নিতু হয় না।

: কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। গ্রামের সব লোক, এমনকি আমার ছেলেও অসিমালের বাড়ি খেয়ে খেয়ে মরছে—আর কারুর কোন হিলি নেই। এর আগে আমাদের কত আসা ছিল। কিন্তু এ একেবারেই খুব নিরিহে মনে আছে। তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

: সত্যি। পাশ্চাত্যের ঢেলাটি চারদিকে ছেয়ে বসেছে। এই সময় সবচেয়ে সচেতন হওয়া দরকার। আমাদের একজন বাড়িয়ে পড়ে হলে সমস্ত জাতে এগিয়ে আসা উচিত।

: আপনার এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সংসারের আলোয় ফিরে আপনার মাথা না আমাদের চলবে না। আপনিও তো এই সংসারের একজন।

সাধীনদী সাধু নিখুঁতভাবে চুপ করে থেকে উত্তর দেন:

: ঠিকই বলেছ তুমি। একটু ভিন্ন ধরনে ভেবি, কি বলব বল। তুমি এখন এসো। আমার মন ভাল নেই।

সাধুর মুখের ভাব অনুযায়ী কথা বলেছিল। তাই এবার আসর সাধুর দিকে। সাধীনদী তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন:

: তখনি কি আল খেল। কথাটা মনে রাখিস। আমাদেরও মনে আসতে হবে।

আসর সরাসরি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলেন

: এই ভেবে আজীর মনে সরিয়ে পেয়ে খাঁচা খুঁজিল। দেখলেন যে, আমাদেরও কি আল ভুলে নিয়ে খেল।

দৃশ্য ৪৯

রাত্রি। সুবল, সুবার আর অন্য রাখালেরা গোধূলিলগ্নে গানে মাঠে আসরের চারপাশে। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে সুবল বলছে

এভাবেতাবে ভোর মনে যদি আসল আসর করা হয়, সমস্যার দিকে হয়, খেলার খেলা চলতে হয়,—তাহলে আসর খোলার দিয়ে দাঁড়াবে।

আসর : আসর তাদেরি ভোলে এক মহাকাল মাটি খেলা ঘরে ঘরে খেলার খাটির জন্যে আর আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে মাটি ফেলাদাঁড়ির না হলে আমাদের কাজ হবে।

সুবলা : যদি সুবল মধুমতেরই যদি খেলার খাটির ভেবে হয়, আমাদে গ্রাম তবু সমাধিনে না খেয়ে খেয়ে মরতে হবে।

আসর : এখন আসর কি করব? আমাদের আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব?

শিবু : তবু আসর করা ভেল না

সুবাস : এই সময়ে কাজ করলে আসর মনে একটা ভোর খেলায়।

আসর : ঠিক বলেছিস। কারুর একা একার প্রেমেরীর আসর চলবে না।

সুবল : কিন্তু কারুর তো এক কথা। —আমে আসর, তারপর সব কিছু। ভোলানাথের আসরের ভরসা নেই।

আসর : কিন্তু এখন আসর করা ভালো যা এই পায়? আমু কি সুবলকুমার বাড়ি গিয়ে প্রার্থনা হবে নাকি?

সুবাস : ওরা ভয়লোক, আমাদের মত পরিস্থিতে ওরা বাড়িয়ে চুলবেই দেবে না।

সুবল : ও না ভেলে। সমস্যার মূলে সমস্যা ভেলে চুলে পড়বে।

সুবাস : তা ও পারে। আর এই জন্যেই তো ওকে আমাদের দরকার

সুবল : কিন্তু ওকে ভোলার কাজ মাটি?

সুবলা : একটা কিন্তু সমাধান করলে হয় না? ভোল সময়ে একবার যদি আমরা কারুর সাথে আসর খেলা করিয়ে দিতে পারি, তারপর কিন্তুটা ও আমাদের কথা শুনবে।

সুবাস : একটা কিন্তু বুদ্ধি আর করতেই হবে।

দৃশ্য : ৫০

সকাল। ধনু গ্রামে মেটা পাকান ছেলেমেয়েদের খাবার পেশ্ছে,—তারা সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে ধনুর কথামত খাবার করছে। সুবলরা বসে আছে—ঘরে একপাশে। একটা পরিবেশনের দেখা গেল ধনুকে। সুবল কাঁধে হাত দিয়ে ধনুকে বলল:

: এই ধনু, তোর যা, মাসল খবর আছে।

ধনু বাচ্চাকে দাঁড়ায়। পাশে এসে বসে

কি আছে?

সুজন গেয়ে ওঠে, চোখ মেলে আছে আকাশ যেন
তোমার আঁখি তারায় সাজে সেথা পরিচয় নিই, তুমি আমার কী হিমি।

বন্ধু মৃদু হাসে।

: মণি? তখন?

: আমি আর সুজন মুখস্থকরণ পরিচয়ে বিভোরিলাম। নিজেদের আত্মপরিচয় ভেবে আমি পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গী আমি পরিচয়ী।

: কি?

: তখন আমার আমার সঙ্গী মুখস্থকরণ পরিচয়ে সজন আর পরিচয় আর। তুমি তিনি আমারি। আমাদের আমার আমাদের ভৌতি হয়ে নিয়ে আসে।

: কিন্তু, আমাদের দেখবে পাবে কে?

আর। মুখস্থকরণ বাড়ির চারদিকে আলো দেখেছে। তার একদিকে ঘর। আলোর ঘর দেখে দেখে।

অন্যদিকে মুখস্থকরণ বাড়ির দেখেদেখি আসে। তার একদিকে মেয়েদের আকাশের মনে হয়। এখন একাকার হয়ে গেছে, আকাশের বৃষ্টি পরিচয়।

মুখস্থকরণ মনে আসেন সাজানো পরিচয়ে। আসেন পর্দার এখন ওঠার।

মুখস্থকরণ উঁচু পাহাড় থেকে একজনকে বললেন:

: দেখো দেখো আসছে, কি আসছে?

আকাশ-যান থেকে আর নিচে মুখস্থকরণ আসছে বললেন:

: দেখো দেখো, পরীর দেশেরই দেখো।

একজন আসলে ওপরে দেখে একদিকে বৃষ্টিতে হয়ে আসে। সে মেয়েটিকে ওপর আসে দেখে:

একা একা একটি মেয়ে। দেখছে অবাক। আসছে দেখছে, না।

কিন্তু ওপরে বৃষ্টি দেখছে আসে। সে আসছে মেয়েকে দিয়ে নিয়ে বৃষ্টি বৃষ্টি আসে দেখছে চায়। সজন: সজন। পর্দাজুড়ে মুখস্থকরণ দেখ। ওপরে-দেশী আসছে একজন উঠে নিচের এবং পর্দাজুড়ে প্রবেশ আসে। মুখস্থকরণ বলেন:

: আসু, আসু, দেখ আসছে। আসার সঙ্গী বৃষ্টি আসেছি। এখন দেখলে আসার আসার আসে আমি যাও। আমাদের আসেন মৃদু দিয়ে আসে।

ওপরে-দেশী বলেন এবার পর্দাজুড়ে নিচেদের আসে:

আমাদের আসে একটি আসে দেখে আমি আসছে। আসে তবু একটি আর আসেন। মেয়ে দেখছে পরী?

: দেখ দেখছে। মেয়ে দেখে আসে।

তখন পর্দাজুড়ে সবাইকে আকাশে আসেন এক দেখে। তার হাতে কার্ডস। সে পিছে এসে নিচের আসেন আকাশে এবং তখ আসে কার্ডস বাজাতে। আসু তার পিছনে দুই দেখ। সবাইই নিচু মা নিচু বাজাচ্ছে। আসু হাত আসেন দুজন মিলি বাজাচ্ছে। আসেন বাজাচ্ছে মেয়েরা আর আসু একজন আসে। এরা সবাই পর্দার আড়ালে।

এরা অবাক চেয়ে দেখছে।

সুজন আসে এসে নিচের আসেন পাশে। সে গান ধরে:

সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়েই পরি।
সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়েই পরি।
মেয়ে আসে না মেয়ে মেয়ে না।
মেয়ে আসে না মেয়ে মেয়ে না,
আমি মোদের মণি।

আসু আসা আমি সবাই এসেছে আসে আসেন আসে। এসে এসে। আকাশ আসছে আসছে আসেন আসে মেয়ে দেয়:

সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়েই পরি।
সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়েই পরি।

মুখস্থকরণ খুব খুশি। সবাইকে সজীব আসে।

মেয়ে আসে না মেয়ে মেয়ে না
মেয়ে আসে না মেয়ে মেয়ে না
আমি মোদের মণি।

আকাশের একদিকে মেয়ে হয়ে আসে পরিচয়ের একটু বদলে যায়.

সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়ে পরি
সুজন আসে সুজনের আসে

এরা তখনো। একদিকে আসে। সুজন একদিকে আসে একদিকে একদিকে গান:

সে পরিচয়ে আসে যে তবু
ভালোবাসার মৃদু মধু।

বন্ধু একদিকে দেখে আসে। আসেন আকাশে। তিনি আকাশের সে। সবাই মুখ আসে।

সে পরিচয়ে আসে যে তবু
ভালোবাসার মৃদু মধু।

একা তিনটিকে মেয়ে আসে। একটুকে চিনতে পারে আসে না। সুজন আকাশে আসে:

সে পরিচয়ে আসে যে তবু
ভালোবাসার মৃদু মধু।

আসেন তখন একদিকে সেও মুখস্থে। তার চোখ একটুকে দুটি দেখেছিল। সুজন পরিচয়ে.

পরিচয়ের উপমা দিলে
পরিচয়ের উপমা দিলে।

একা দেখতে দেখতে একটুকে। একটু কি। আসেন আকাশে? সুজন পরিচয়:

উপমাটা যে হয় তৈরি।

আকাশের একদিকে একদিকে একটুকে দিয়ে নিচেতে আসে। পরিচয়ে আসে একসাথে:

সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়েই পরি
সুজন আসে সুজনের আসে।

একদিকে একদিকে একা মৃদু আসা দেখেছিলেন। সুজন তখন আসে।

একা মেয়ে আসে একদিকে দিকে।

আসু বাঁশি বাজাচ্ছে।

একজন নাচছে দেখিয়ে।

আসু তার বাঁশিতে সুর তুলে চলেছে।

একা একজনে দিনতে দেখেছে একটুকে। এবার সে চোখ বন্ধ করে।

মৃদু আসা তুলিয়ে দেখেছেন। সুজন গান:

আমার দেখি উপমা দিয়ে
আমার দেখি উপমা দিয়ে

বন্ধু বাঁশিতে সুর দিয়ে আসেন আসে তাদের তুলছে। সুজন পরিচয়:

মোরা আরে আমি—
আমি শুধু মেয়ে পরিচয়
সুজন আকাশটি।

একা একা চোখ খোলে। চোখ মেলে তাকায়। দেখে একটুকে। সবাই মেয়ে পরি গান:

হায়, সুজন আকাশটি।
আমার দেখি উপমা দিয়ে
মোরা আরে আমি?
পরি শুধু মেয়ে পরিচয়
সুজন আকাশটি
হায় সুজন আকাশটি

বন্ধু আকাশে। সুজন একা আসে নাচতে গান:

মোরা পরি আমরা পরি
একা আরে আকাশটি।

আর একা মৃদু সুজন তাদের আরো মোরা।

মোরা পরি আমরা পরি
একা আরে আকাশটি

একা সুজন গান.

মোরা পরি, আমরা পরি।

সবার আকাশে বন্ধু।

একা আরে আকাশটি।
মোরা সবাই মোরা আছে।

একা দেখছে একটুকে। সুজন গান:

মোরা আছে মোরা আছে
একা মৃদু আমি।

বন্ধু মোরা গান একা দিয়ে হয়। সে দেখছে আসছে। সবাই তিনে একটুকে দিয়ে গান.

সুজন আসে সুজনের আসে
একটি মেয়েই পরি।

ধরে উঠে পড়ে। পা বাড়ায় অন্ধকারে। মহীয়ান তার সঙ্গে উঠে চলে যায়। কৃষ্ণ সংগীত

মুকুল আসে মুকুলের আগে
একটি ফোটে পাখি।

গানের তালে তালে ধৃতরাষ্ট্র মাথা দোলান।

কেউ জানে না কেউ দেখে না

ধনা তার নিজের ঘরে নিজের অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। তার দৃষ্টিহীন চোখের সামনে। দূরে মন্দ থেকে গান ভেসে আসছে।

কেউ জানে না কেউ দেখে না
আছি গোপন আঁখি।
মুকুল আসে মুকুলের আগে
একটি ফোটে পাখি।

মহীয়া এসে দাঁড়ায় ধনার মাথার কাছে। ভোরের আঁধি ভেদে এক পক্ষিমেরের এসে ধৃতরাষ্ট্রের কানে কী যে বলে। ধৃতরাষ্ট্র শোনেন।

মুকুল আসে মুকুলের আগে।
একটি ফোটে পাখি
মুকুল আসে মুকুলের আগে।

ধৃতরাষ্ট্র উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গেই ধনা বন্ধ হয়। বন্ধ হয় নন্দ ও মন্দকর। ধৃতরাষ্ট্র এগিয়ে যান ভোরবেলাকার দিকে।

মন্দ মন্দকরেরা হতবাক।

দর্শকেরা যে যার আসন থেকে উঠে পড়ে।

ধনা ধৃতরাষ্ট্রকে ডাকে।

দৃশ্য : ৫২

সেই ধনা। ধনা তার নিজস্বতায় পরিচিত। সে ধনা হারিয়েছে।

ধনার মলম মূর্তির। মহীয়া ধৃতরাষ্ট্রের দিকে ধনাকে ধরেছে ধনার। অন্যেরা পরিচিতির ধনার মাথার দিকে জল ঢালছে।

ধৃতরাষ্ট্র ধনার ধনার এসে দেখে দাঁড়ান। ধনার বলে:

: তোমার ভাইপোরা দেখেনি। ধনা দেখে। আমি আমি ধনার ধনার।

ধৃতরাষ্ট্র চলে যান।

ধনার ধনা তার পথের পরিচিত।

ধনার ওপর ধনাদের নিজেদের ধনার কথা ধনাধনি করছে। ধনু ধনের মহিষে মুকুলকে জিজ্ঞেস করে:

: ধনাধনি কী হলো?

: কিছুই তো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোমার মন খারাপ হয়ে গেলো।

মুকুল: ঐযে, একজন কেউ আসছে—তাকে জিজ্ঞেস করলে হয় না?

অভিমুখে এক ধনী মূর্তি। মুকুল ভাবেই ধনার:

: এই যে, একটা কথা শুনে যাও না।

মহীয়ান এগিয়ে আসে। দেখে তো সে আর কেউ না, তোমার পরিচিতির নয়, সে ধনার ধিক্কার। তাকে দেখে মুকুল অবাক হয়ে বলে:

: ও মা, তুমি! তুমি এখানে?

: আর তোমরাই বা এখানে কেন? মাঝখান থেকে পথ পরিচয়ে তুমি?

মুকুল: তোমাকে দেখে অবাক হলো। তোমার ধিয়ে একটা ধনার, আমাদের খুন ধিয়ে গেছো যে। এত কথা ধনার কেন তোমার।

: আর আর ধনার ধিক্কার মুখ না। তাদেরও ধনাধনার হলে যাও। ধনার খুন অসুখ।

ধনু: কি হয়েছে? কী অসুখ?

: যা তোমে তোমার কি ধনার?

মুকুল কিছু একটা ধিক্কা করে। ধিক্কার চলে তোমে তোমে উত্তর দেয়:

: আর তোমাদেরও ধনিয়ারী। এই অসুখে এখানে আসার কি দরকার ছিল?

মুকুল: দেখো। তুমি তোমার ধিয়ে ধনার যে আমি একলা চলিতে দেখতে চাই। আমি কিছু কিছু অসুখ আমি। আমাদের একলার মুকুলে নিয়ে দেখ দি?

ধিক্কার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ধিয়ে তাকায়। সে তাবোয়:

: তোমার মতলবখানা কী?

: আমি সত্যি কিছু অসুখ আমি। তুমি তোমার ধিয়ে ধনার।

ধিক্কার তাহিরে কিছু ঠিক করে তোমে-আহিরে চলে যায়। বিশিষ্ট ধনু মুকুলকে দেখে। মুকুল আসাদের সাক্ষাৎকার করে ধনে।

: তোমে চুপ করে একদম ধনে থাকবি।

ধনু আড়চোখে মুখ দেখায়।

দৃশ্য : ৫৩

মুকুল একার তোমার ধরে। সে চিন্তিত ধৃতরাষ্ট্রকে সাজতে নিজেদের করে:

: আমি যেমি সময় তোমে না। তাকে এ ধরে আমা তোমে তোমে ধনাধনে আমার মন্ত্র আছিনে না। আপনাদের একটু আড়ালে তোমে হবে।

: সন্দিহানে তোমে হবে। এ নিধান না আমার আমা না।

: না মুকুল, তাকে মন্ত্র সত্যকোটি হয়ে আছে। আপনার নিজেরে আমিরে নিয়ে আলোনা করুন। আমাকে একলার মুকুলে দিন।

: তোমে, সন্দেহ হলে এসে। ও একলার তোমুক।

সন্দেহ একে একে নাহিরে যায়। সন্দেহের একাকে একলার তোমে ধৃতরাষ্ট্রও নাহিরে যান। ধনার মুখ ও আকাশ পর্যন্ত। মুকুল এগিয়ে এসে সন্তর্পণে নিজ নিয়ে মুখে ঠাঁইয়ে ধনাকে তোমে। মুগ্ধিয়ে ধরে। শহিয়ান। মুকুল ধনার ধনার এসে ধনে ধনার আছে ইটি মুকে মনে ধনার ধনাদের হয়ে মুকুলের মুকুলকে বলে.

: তোমে নিজেদের মুখে ঐযে, তোমে মুকুলের পরিচয়টি নিয়ে ঐযে। কিন্তু তোমার ধনে এক।

ধনার নিস্পন্দ। মুকুল এবার বলে:

: ঐযেমটা বড় তোমে। আমি ধনার ধনাধনারে ধনাদের সমাধান ধনাও আড়ালাড়ি হলে যায়। ধনার, তুমি সময় পাও তোমে না।

ধনার ধনার ঐযে ওঠে। মুকুল বলে:

: তোমে তোমের। ধনাধনে। ধনু, তোমার ধনার ধনাধনা ধনাছে।

ধনার তোমের পানে ঐযেন।

: তুমি কি ধনাধনে মুকুল তোমে? তোমার মন ধনাধনে যে খুন অসুখ ধনাছে।

ধনার তোমে তোমে। ধনাধনীন দৃষ্টি তোমে। মুকুল একটু তোমে বলে.

: আমি ধনাধনে ধনু মুকুল। ঐযেমে পারছো না?

একধনে ধনার মাথা নাড়া দেয়। সে তাবোয়:

: তোমে ধনাধনে মুখে নিয়ে এসেছো?

: তুমি নিজের মুখটাকে ধনু ধনের তোমেছো, ধনাধনে মুখটা তোমেনে না?

ধনার মুখ মুছিয়ে নিয়ে ধনাধনে:

: ধনের মনে তোমে বলে যাও। ধনার তোমেদিনে ধনে তোমাকে চাই না।

: তুমি একা নিষ্ঠুর!

: ঠিক। তোমার ধনে। ধনার ধনাধনে এসে না।

: ঠিক ধনাছে?

: ঠিক ঠিক ঠিক।

মুকুল উঠে দাঁড়ায়।

: ধনাধনে মনে আমি, ধনাধনে এই কথাই ধনাবো।

এই বলে মুকুল মুখে দাঁড়ায়। ধর তোমে ধাহিরে ধনে তোমে। ধনার কিন্তু ধনে তাকে

: দাঁড়াও

মুকুল পেছনে ফিরে তাকায়। ধনার একার মুখ একদিনের নির্মিত ধনাধনে

: ধনাধনে একলার তোমে তোমে তোমার মনে ধনাছে? ধনাধনে তোমার তোমে তোমে দেও না।

মুকুল একলা একিয়ে আসে ধনার দিকে। ধনার ধনার ধনে

: ধনু যদি এত ধনাধনার ধনাধনে একলার তোমে ধনাধনে তোমে করে তোমে দিয়ে তোমে পারে না?

মুকুল একার বলে ধনার পড়ে। সে ধনে:

: চুপ ধনাধনে, চুপ ধনাধনে। ধনাধনাধনার ধনাধনা ধনা না।

: ধনে নিধনাধনে ধনাধনে? তুমি বলে দাও।

: তুমি পারবে! ঠিক পারবে?

: ঐযে পারবে। ধন পারবে।

: এত ধনার ধনাছে, ধনাধনীন পারো ধনাধনাধনা, তোমে ধনাধনে তুমি নারীর ধনাধনে পারবে?

: পারবে। আমি ঠিক পারবে।

: একটা ধনীন তোমে তোমে। ধনু ঠিক ধনাধনে। একন যাও তো, তোমার তোমেনে ঐযে যাও, ধনাধনে তোমেধনে।

দৃশ্য : ৫৪

তোমে একটি ধনে। তোমে হয়ে সবে ধনে ধনাছে। ধন তোমের মূর্তিতে। তোমেনিধনে এক হয়ে ধন তোমেনে ধনাধনার মূর্তিধনে ধনে ধনেছে।

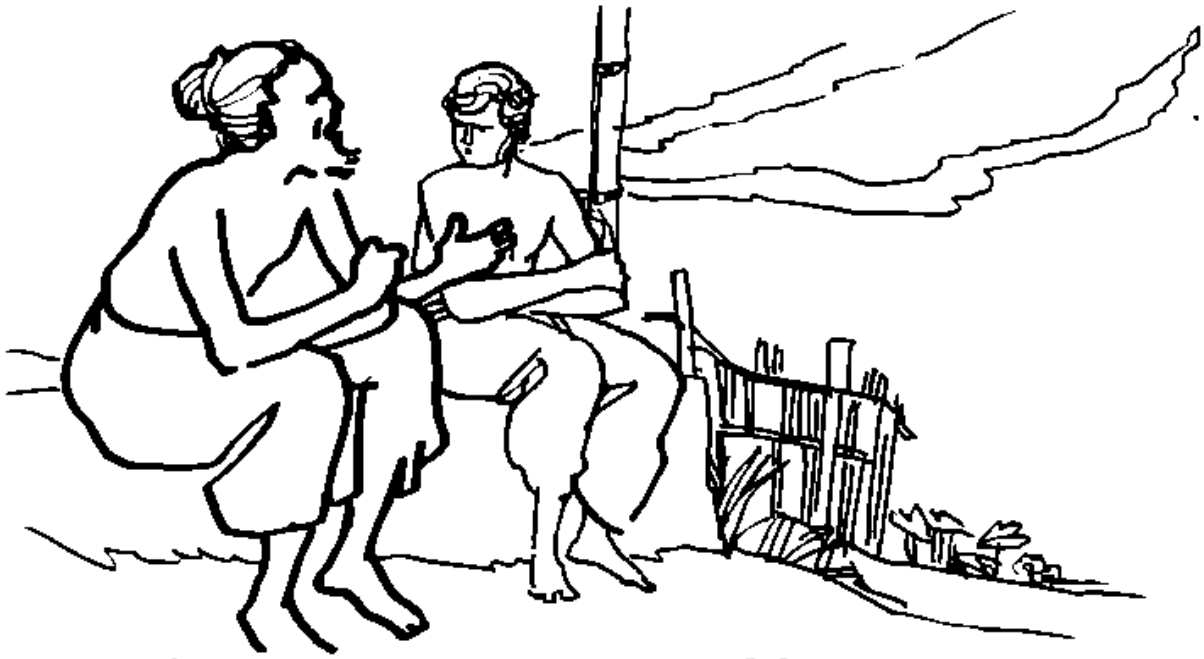

[illegible] চেয়ে এল ঘোর উঠে এসে দরজা খোলেন। মধ্যে মধ্যেই একজন ওরা তাকে ঘরে বন্দিনী করিয়ে রাখার ভার ছেলে নেয়।

[illegible] দুটি চেয়ে ঘরে। এরা সব অভিনয়ের তারা কথা ওরা। মধ্যম। তার [illegible] হাতে উপায় হয়:

দিদিরে এল হায় ঘরেন

ওকি, আমাকে আবছা কেন?

আমার ভয় দেখিয়ে সরবারে। সেখানের চলবে দুইজনের। সবচা খেলে যেমন। হাতেও অভিনয়ের দেখেনা ছিঁড়ে যায় ঘরে বাইরে। ছেলে যেন রাজার। আমার বন্দিনী সবচা- এ যেন এমনি মুলের পুনরাবৃত্তি।

যেমনি তার ঘুরিয়ে ঘরের একবেলায় দিঁড়িয়ে। অভিনয়ের ওরাও এগুলেও। তার সব [illegible] করে সত্তরও করছে আসবাবপত্র। পরিচয় বেরিয়ে মুখে উঠাল চলা দিয়ে দিব দিঁড়িয়ে।

যে সকলের একবারে ঘরের সবলোককে ঘরে আন হয়েছে। ঘরে এসেছে তারা কথা ওরাও। তবে দিঁড়িয়ে পারেন দিয়ে। কখন কখন ঘরে সকাল ঘুমাচ্ছে। সবাইকে ওঠিয়ে একজন ঘোষণা করে:

ঘোষণা করা দু'ঘরে যেমি আসল সাওনি। আর ঘর আছে তার তখনের আর সাওনি। আর আর বিশেষে আর সুলের পালন সাওনি। সবের আর রাজনে ঘোষণা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও। আই, ভলিনারে ঘুমুরে ঘোষণের বন্দী করা হল। এখন বলো, এদের ঘোষণা ছেলের সব ঘোষণা? যদি সত্যি কথা না বলো, তাহলে এই মুহূর্তে সবার প্রাণ বলিয়ে নেওয়া।

একজন ওরা তীব্র চোখেদের দিকে এগিয়ে এসে হাত ধরে:

ঘোষণা ছেলে ছেলে? ঘোষণা পালিয়েছে?

আমি জানি না। সত্যি জানি না।

ওরাটা এক ঝটকায় চোখেদের মাটিতে ফেলে দেয়। নিজের চোখেন জানিয়ে। তার বুকের ওপর পা দিয়ে দিঁড়িয়ে সেই ওরা।

মনু সবাইকার ভলিনারে এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। সে নিষ্পৃহ। সে ঘোষণাবিহীন। সে সবাইকে সবচেয়ে দিকে তাকিয়ে বলেন:

অবস্থাদের এই ফল
নিজেরা এখন দুঃখ
সবচা, ঘোষণা, সবচা, সবাই একাকার।
এর ফলে ছাড়া হয়
আমাদের কেন নয় আর
আজ থেকে হবে মনুর অনুশাসন নিরন্তর।

সেই একটি ঘরে। আসবাবপত্রে ওলটপালট হয়েছিল কখন সবাই ঘরে এসিয়ে আসছে। মধ্যে মধ্যে চোখেদের ঘোর দেখা যাচ্ছে। আসবাবটির পাশে আসছে ঘোর ঘোর, এরা মনু আর তার সহীসাথীরা। মনু সুন্দরে বলে

: সুন্দর, এরা আর নিন এই ছবিটা কিছু আমি ঘোরার ঘোরে না। এটা আমার আরো ঠিক হিসেবে আসবে।

: আর যে অনিন পাশেই ঘোর সাথে রেখা হবে। তুমি নিজেই বলিস।

সুন্দর: আচ্ছা কাকু, ঘোর আর আসল যে এর কী সম্পর্ক, তা আমাদের কিছু নিলি না তুমি?

মনু: সত্যি, ঘোরা আমাকে কখন জানাবিনি। কিন্তু আমি যে বড় পণ্ডিত, কী নিয়ে বলছে ঘোরের?

ঠিক এমনি সময়ে ঘোরা ঘোর মনু সহীসাথীর কথা। তিনি জিজ্ঞেস করেন

: কে আসছে ঘোরা? এখনি এদিকে শুয়ে যাও ঘোর।

মনুর মন আরো দাঁড়ায়। মনু বলে

: মনুসংহিতা আর না?

কিছু বুঝেই মনুর আরো। মনু আসনের সামনে বসে। তিনি আবার জিজ্ঞেস:

: আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না? তাড়াতাড়ি এদিকে এসো।

মনু বসের সবাইকে বলে:

: চলো ঘো, কি বলে দেখি।

কথা মনুর আসনের দিকে এগোয়। কাছে আসতে মনু সহীসাথী বলেন:

: আমি শুধু মনুর মনে কথা বলবে। আর সবাই দূরে আছো।

মনুর সহীসাথীরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মনু সহীসাথী বলেন:

: কি হলো? এদিকে শুয়ে যাও মনু।

মনু এগিয়ে যায় মনুর দিকে। মনু আসনের বলেন:

: ঘোরার আসন দূরে দিয়ে দাঁড়াও।

আসন আসন পিছিয়ে যায়। মনু মনুর সামনে এসে জিজ্ঞেস করে:

: কি আদেশ?

: ঘোরো।

মনু বসে। মনু সহীসাথী মনুকে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করে বলেন:

: ঘোরার সাথে আমার এমন কিছু কথা আছে যা অন্য কারোর সামনে বলা যাবে না।

: কি কথা?

: বলছি। কিন্তু তার আগে আমাকে বলো তো, মনুসংহিতা কারা লিখেছিল? ঘোরা, নাকি আমরা সবাই?

মনু নিরীক্ষণ। এমন ঘোরার বসা সে জীবনে শোনেনি। আর তা এই মনুর মুখে। এটি অবাক।

: তুমি কথা বলছিলে ঘোরা।

: আমাদের যে আমরা জীবনের ঘোরের আগেই নেই। ঘোরা নিজে বাবাকে যে আমিনায়? সে সবার আগের নেই। কিন্তু ঠাকুর এসব কথা বলছেন ঘোরা।

: তুমি আশ্চর্যরা। তবু নিজের নিজে আমার সবাইকে আনিনি।

পরিণামে কি দাঁড়াচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছিস না? আমার একমাত্র সন্তান তুই ছেড়ে যাচ্ছিস।

কনু এবার উত্তর। সে ধীরে ধীরে উঠে বসে:

: সে আমার দায়।

: ঠিক আছে, মানলাম। কিন্তু এলাহ, খোদা, ভগবান, যুগ যুগের বিশ্বাসের সাথে মানুষের বিশ্বাস আর আনুগত্য বিচ্ছিন্নতার জন্য তুই দিতে চাস। এসব আমিন না। পরিণামে এর খেসারত আর তুই পুরোপুরি মানুষ হয়ে মুখ ফুটিয়ে বলে যাবিনা।

: হঠাৎ আজকেই তবু এসব কথা বলছেন কেন?

: কারণ, তোর বিয়ে আমরে আশা করে চেয়ে আছে। তোর বুড়ি আমে মুখে বলা আছে, সমাজ আছে। তোকে সবাই মানে। তাই তোকেই আমাদের অধিকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তোকে নেতা হতে হবে।

: এসব নেতা নেতা আমি হতে চাই না। আমি মানুষ হয়েই থাকতে চাই।

: তুই কি পাগল হয়েছিস? গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে যাচ্ছে, আকাশের চাঁদের উঠেছে। আর তুই এর মধ্যে বসে ঝিনি ঝিনিয়ে প্রেম কবিতা আর রাধাকলি করবি। এসব তোর কাজ হলো সবাইকে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

কনু তাকায় সাবু সাবীলদীর দিকে। এ কিসের আহ্বান।

: এসব আমি পারবো না। আমা কেউ করুক। এসব বড় বড় আমের কথা আমি ভাবতে চাই না। আমি চলাম।

কনু উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবার জন্যে।

: দাঁড়াও।

সাবু সাবীলদীও উঠে দাঁড়ান।

: কুলাঙ্গার, কাপুরুষ, তোর লজ্জা করে না? তোর বাপ যা ভবিষ্যৎ আর অধিকারের রাস্তে কবরী হয়ে থেকার থেকেই গেছে। তোর আমে বিশ্বাস তাও আমি না।

: এসব আমরা কি বলছেন আপনি?

: যা বলছি ঠিকই বলছি। কম আর অপমান তোকে পাগল করেছে। তোর আসল বাপ যা মানুষের আর দেবতা। তুই তাদেরই পুত্র থেকেই ওরা বন্দী।

বিস্ময়ে হতবাক কনু। সে প্রশ্ন করে:

: এসব কী আজগুবি কথা বলছেন? এ হতেই পারে না।

: আজগুবি নয়। এটাই সত্যি। ওদের এই শাস্তির কারণ ওরা ছিলো বিদ্রোহী। আর বাপ মায়ের অপরাধের প্রতিশোধ যে ছেলে না নেয়, সে কি মানুষ?

কনু সাবুর দিকে এগিয়ে তার কথা টিপে ধরে বলে:

: শোনো সাবু, এসব যদি মিথ্যে কথা হয়, আমাকে ভাগাবার জন্য যদি তুমি এসব গল্প ছড়াও, তাহলে তোমাকে আমি—

কনুর হাতের সাবু তখন মাটিতে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে বলেন:

: আমি মিথ্যুক। যদি আমার কথে তাহলে অত্যাচারীদের সামনে গিয়ে বুকের তোর রেখে। আমি সব সত্যি কথাই বিলা, যা তোমিনীকে বিশ্বাসের তাদেরই জানাতে পারবি। ঐ তোমিনী তোর আত্মেরজন হয়।

কনু কিছুই বুঝতে পারছে না। সে এবার হতবাক। সাবু সাবীলদীর সামনে নির্বাক কনু। সাবীলদী আদেশ করেন:

: যা। বিদ্রোহীর ছেলে তুই—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোরও বিদ্রোহ করা উচিত।

কনুর চোখে জল। সে সাবুকে প্রশ্ন করে:

: এতদিন যাকে মা বলে ছেলে এসেছি, সে আমার নিজের মা নয়?

সাবু সাবীলদী কনুর মুখোমুখি হাত ছেড়ে তাকে আদর করেন

: তাতে কি হয়েছে, কনু?

সাবু আবেগের আবার

: একজনের বদলে তুই আরেক মা পেয়েছিস। সারা দেশ জুড়েই তোর আরেক মা রয়েছেন। তারা সব বুদ্ধী। তাদের দুঃখ তোমার আর যে তুই।

দৃশ্য: ৫৬

সেই রাত। আগের রাতে ঘটনার। সেখানে ওরো কথা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। কনুর ঘরের দোরে দোর।

: আমার। সেই এক দুঃখ রাতে।

কনু দাঁড়িয়ে মায়ানের একপাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তার চোখের সামনে রাতের দোরোগের হাত ধরা হচ্ছে দোরে। তাদের নিয়ে যাবার জন্যে প্রতিবাদের করছে। প্রতিবেশী ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের নিয়ে যাবার প্রতিবাদ নিচ্ছে। সবাই নিয়ে তাদের। কনু তার সহিদের আদেশ দেয়:

: শয়তানের রাজের বন্দী খুলে দাও।

ওয়াদের সর্দার কনুকে দেখে বলে ওঠে:

: এ আমরা কোন্ আজগবে এলাম? ছি।

তারপর মুখ দাঁড়িয়ে সে তার ওয়াদের বলে

: যা এদের সবাইকে ধরে নিয়ে আয়।

কথে দাঁড়ায় কনু। সে মায়ানদীর ঘরে বলে:

: দাঁড়াও। আমার আরে মুখ দেখার আগে একটা কথা শুনে যাও। তোমরা দাঁড়াও। তার আমার সব মানুষ— তাদের থেকে আর কেউ আমাদের শত্রু না। তোমরা পরদের এসে আমার দাঁড়ায় কথা শুনে এসে নিজে কেউ শত্রু হয়ে না, তোমাদের আমার হবে।

অধিনায়ক আমার কনুকে লক্ষ্যে এসে কনু প্রত্যুত্তর দেয়

: আমরা আমিনের।

আগের সময় মানুষ, যাদের শিরদাঁড়া আরে নিয়ে হয়েছিল তারা এখন মুক্ত। তারা মনে মনে এগিয়ে এসে ওয়াদের আর তাদের সর্দারকে ঘেরে ফেলে। এক কনুর দিকে তাকে আছেন নিশ্চয়ে।

কনুর সহিদদীয় অধিনায়ক ওয়াদ কনুকে এক করে এগিয়ে যেন কনুর দিকে। কনু এবার তাদের প্রশ্ন করে:

: কী? আমাদের আরে? আর আমার পারবে না। আমরা আমাদের? ছেলে ফেলেছে পারবে না। যদি ইচ্ছে তবে যে আমাদের আরে যুক্ত হতে পারো।

রোমিনী দাঁড়ে আসে। কনু আমরাদীদের তাকিয়ে বলে:

: এখন দোমো সবাই। আমার মানুষ। আর থেকে কেউ কোনো পরিচয় আরে না।

আমরাদীরা কনুর নিকে তাকিয়ে। তারা তাকায়ে।

: আর থেকে কেউ আমরা মেরে না। রাজের আর মেরে না। নিজের মুখ মেরে না।

কনু এবার ঘোষণা করে:

: সমস্যার মূলে আমার সবাই। এটিয়ে মুক্তদের তার সমান ফেরে সবাই করে আর আমরা আলো।

সাবের মুক্তদৃষ্ট মানুষ। এবার কথা তারা কোনোটি এর আরে। কনুর কথা শেষ হয়নি।

: আমি আরে বিলি, আর আমার কথা আমরে না—আমি আমের আর কথারে না। আর আরে আমরে—আমের আমি কোনোরে।

কনু এবার সভা। এবা নিজেদের প্রথম একা।

: আমরা যদি এক হই—তাহলে আমরা নিজেদেই। আমার একসাথে মুক্ত ফোনোরে পারবে ফেরে সমান করে ফেলে। এটিয়ে আমাদের জীবন আমার আর আমিনের না। আর একটিনও আমরা আমাদের সাথ কথারে না। কি? আমি?

সবাই আনন্দে একসাথে তার তখন নিল।

: আমি— আমি— আমি।

কনু তখন আদেশ আদেশ দেয়

: যাও ফোনোরা। আনোপাশের সব গ্রামে এখনি খবর পাঠিয়ে দাও—কাল থেকে আমাদের মুক্ত শুরু। সবাইকে আমাদের সাথে চাই।

নির্দিষ্ট প্রধানদীয় ওদের

: আমরা সবার ফেরার আমি ফোনোরোরে, সবার মনীরের মুক্ত করে ফেলে। এই পৃথিবীতে আমাদের সমানের অধিকার আছে—এখন থেকে আমরা সমান করে নিজেরে।

দৃশ্য: ৫৭

সকাল। নিজের অধিনায়ক প্রায়। কনু এগিয়ে আসছে। তার পেছনে সবার প্রধানদীরা। কনু এবার দাঁড়ায়।

অধিকার, নদ, রোমিনী, নিজে সবাই কনুকে ঘিরে দাঁড়ায়। প্রধানদের অপেক্ষা কনুকে অধিকার করে বলেন:

: আমি ফোনে ফেরে থাকতে পারবো না কনু। নিজুমনী পারবে না।

কনু তাকে অধিকার করে।

: ফোনো, আমি আমার নিজে আমরে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

[illegible] ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

একটুও ভয় পাইনি। আমার মেয়েলী মেজি সব কটিকে মুগ্ধ করে দিয়েছি। সেবার পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি।

মুকুল নির্বাক। সে দেখছে অনুকে। অনুর এ রূপে ভয়। এ ভয় দেহের বাইরে।

: তবু আমাদের আজ সেব হয়নি। এখনো আরও কত অভিজ্ঞতা আছে। জানিস্ই তো, এরা সব ছদ্মবীরত্বের বাদশাহ—এদেরকে আমাদের ছদ্মবেশটুকু ভাঙতে হবে। এখনো কত কাজ।

মুকুল এবার কথা বলে। সে বলে.

: তুমি আমাদের নেতা হয়েছো। এখন আমাদের দুঃখ কষ্ট নিশ্চয়ই বুঝবে। এসে আমাদের কথা ভাবনি। তাই এতদিন আমাদের এড়িয়ে চলেছ, তোমাকে নিয়ে আমার ঈর্ষাও হয়েছে।

: না। এসব আজ এসে ভাবার সময় নেই।

: এসে ভাবো না তুমি? সত্যই যে তোমার জন্য আপোস করছে।

: কি বলে তাই ভাবছো? ওভাবনার কী, আপোসও, এসব কি এতিনী মূল্যও আমার নেই। ওভাবনার জন্য আমার মন নিচে। কিন্তু আমার আজ সেসব পথ নেই।

: একথা কেন বলছো?

: আমি কি আমার আজে নিজে এক হয়ে পারবো? আমার কি আমার নীচে নেমে আসি আমাকে পারবো? তোমার মত মুকুলের সহকারিণী থেকে পারবো? আমি এখন নেতা। নেতার পক্ষে কি এসব মানায়। আমলে যে আমাদের বিপ্লব দুর্বল হয়ে যাবে।

: তবু, তুমিও তা হলে আমাদের সেবাদের মতনই হবে।

: না মুকুল তুমি বুঝতি না। এখন আমার কত কিছু। আমাদের সমুদ্র যখন তখন আক্রমণ করতে পারে। আজই--- আজই--- অনুদের সেটি খবর নেই— এখন সবাই তুমিদের আমাদের বিশ্রামের হয়ে আছে, কিন্তু এদের যখন বিশ্রে পারে? যখন বিশ্রে পারবে?

মুকুল অনুর কথা শুনছে। অনুর দিকে তাকিয়ে সব দিয়ে অনেক বাড়ছে। কিন্তু আর না। সে তার দৃঢ় থেকে শেষ একটি টোকে.

: আর আজ?

অনু তাকায় মুকুলের দিকে।

হঠাৎ পর্দার মুখ থেকে শেষা যায় আপোসকারী গলা। ক্রীত ভীরে। তাদেরকে চোখে ইশারায় ডাকছে। ওরা যেন এসেছে অনেক দিন। সম্পূর্ণ পর্দা সুরে যায়। মুকুলের গলা শোনা যায়

: আমি যে তোমার জন্য আজকের সব কাজ আপোস করে এসেছি। আমি সবকিছু আজ শেষ করেছি না? আজকে যে কথা তোমার জানিয়েছি---

পর্দা খুলে যায়। প্রবেশ করে মুকুল। অনুর গলা:

: মুকুল, আজ যে আমি আমাকে ফিরিয়ে পাচ্ছি না। আমি যে আমি নেই অনু নেই। অনুর আমার আমার সবটা জিনাই আছে, নেই মুকুলের প্রতিশ্রুতিকে কি ভাবনার তোমার যায়। আমাকে ফিরিয়ে, আর নেই অনু হারিয়ে গেছে।

আলো। একটা। ঘুরছে। সংগ্রামী কৃষ্ণচূড়ার।

দৃশ্য : ৬৪

বিছানায়। অনু সাধীনতী পরীর মুখে দাঁড়িয়ে। ঘিরে কৃষ্ণচূড়ার নিশিয়ে যায়। অনু সাধীনতী সর্বনামের আলো:

: মেঘলোক মোর। এই আকাশের। হাজার হাজার অনুদের মুখোশ ভাবে নিজের মুখে কারি মেজ নিজেই না। আমাদের মেয়ে সবে মেজে এসেছিল আত্মত্যাগের প্রেরণায়। তারি অনুকে আজকে আমার— একটি দাঁড়ান। অনুর কথা আজোকেই কারি হয়ে গেছে। অনুর নিজের শেষ পর্যন্ত সমান হয়েছিল নিজে জানি না, কিন্তু একটা কথা আমার মনে পৌঁছেছে। নিজুলিন আগে এক আকাশচারী অনুদের গুলিতে অনু প্রাণ হারিয়েছে।

হাঁটু গুলির শব্দ। অনু সাধীনতী চমকে ওঠে। একদল প্রবাস সর্বনামের বলেন

: নিজুলিন আগে এক আকাশচারী অনুদের গুলিতে অনু প্রাণ হারিয়েছে।

অনুর একটা ছবি মেঘলোকে উঠলো। তার তাকানোতে মেয়ে কারো দাগ টানা। হাসিতে একটা সরল মুখের ভাবনা। ছবির নিচে দুঃখ জানায়। অনুর গলা শোনা গেল

: আমরা, আমার সাধীনতী নিজে এই নিজেকেই প্রথম জানি।

সংগ্রামী কৃষ্ণচূড়ার শেষের শোনা গেল। পর্দায় ভেসে উঠলো

এক ঝাঁক আকাশের মুখের সমাপন,
প্রজাপতির আকাশের আরো সর্বনাম।

হিরোসিমা নাগাসাকি

চাণক্য সেন

লন্ডন অবজারভার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৫।

নিউ ইয়র্ক থেকে সন্তর মাইল দূরে অত্যাধুনিক মনোবিজ্ঞানের বহু উপকরণের অধিকারী ফার্মিংডেল কলেজে একটি ছেলে ছাত্রীকে 'অভিটোরিয়াম' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে।

'অডিটোরিয়াম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত একটা অর্থ আছে বলেও বোধহয় এরা জানে না। এদের জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনো কৌতূহল নেই। আছে শুধু একটা অসহায় অনুসন্ধিৎসা। যে অসহায়তা নিয়ে এরা জন্মেছে, যে অসহায়তা নিয়ে এরা বড় হয়েছে, যে অসহায়তা নিয়ে এরা আজ বেঁচে আছে, সেই অসহায়তা নিয়েই এরা একদিন মরে যাবে।

এদের জানবার কোনো আগ্রহ নেই। কারণ জানার কোনো দিন কোনো মূল্য আছে বলে এরা মনে করে না। সমস্যাহীন পারিপার্শ্বিক, ভবিষ্যৎ-চিন্তা, পরিবার-পরিজন, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান-সাহিত্য, এমন কোনো বিষয় নেই যা এদের মনে কোনো রেখাপাত করে। এদের মনের আয়নায় কোনো ছবি পড়ে না। এদের মন কোনো ছবি ধরে রাখতে পারে না। এদের মন ছবি ধরে রাখতে চায় না। এদের মন ছবি ধরে রাখতে জানে না। এদের মন ছবি ধরে রাখতে শেখেনি। এদের মন ছবি ধরে রাখতে শেখানো হয়নি। এদের মন ছবি ধরে রাখতে শেখানো হবে না। এদের মন ছবি ধরে রাখতে শেখানো হবে না কারণ

ফিলিপদের সঙ্গে আসত। বছরের ৬ মাসে মাসে মাসের কবি মেরেদের ফুলে নিয়ে এস মেরেদের মেরেদের ফলিতদের। সৈনিক মিঃ ইয়র্ক ইংরেজ পরিবদের সঙ্গে ফিল মেরে। অভিনেতে পড়ান মেরে।

শিলকের নিজেরী সভাপতির মেরেদে এসেছিল নিউইয়র্কে। এরা ছবি সভাপতি আছেন। ৮ বছরে একসঙ্গে মেরে নিজের। দুটি সন্তানেরী নাম করে মিঃ ইয়র্ক সভাপে। এরা মাঝেমাঝে আসতেন, অনেকেরাতি সাহারী থেকে মেরেও, নীলমাসাহার অভিনে। তাদের সঙ্গে বছরে না মেরে, ৮ বছরে একসঙ্গে, তাদ দুটি কবিতে তার শিলকের নিজেরী। মি মেরে আসতে মুক্তাবেরী আসতেন। মেরে বয়স ছিল বুড়ো হয়েছে। এর মধ্যে নিজেদের এসেছিল সন্তানদের সঙ্গে শিলকের নিজেরী। সন্তানদের মধ্যে বড়টী পুত্র, মেরেটী কন্যা।

মেরে মিঃ ইয়র্ক সভাপে একটা কলেজের আলাপন। অভিনেতা সভাপতির ইতিহাসী সভিত্যের ছাত্র।

মেরেদ কলেজ 'অভিনিতে' একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে মেরেরা শিক্ষার্থীদের মেরেছে। আলাপনের মীরের দুটিতে আমরা মেরেও মেরেদ সভাপে মেরে, এখানে চলে আসে। এরা, আমরা সভীক, আমরা স-মেরিক, আমরা স-বন্ধু বা স-বাজারী। আমা, মা, ভাই, মেরেদেরও নিয়ে আসে তারা। তাদের আসার আগে তাদের মেরে সভাপতি মেরে। মেরেদের আসনের মুক্তাসন পূর্ণ করে। অভিনিতে আসন মেরেদের মেরে।

মেরেদ অভিনি হয়ে শিলকের নিজেরী কলেজনিতে আসে এসেছেন অভিনিতে। প্রথম উপন্যাস, একসঙ্গে উপন্যাস মেরে। সাধারণ উপন্যাস। অভিন পূর্বাস মেরি মেরে হয় মুক্তাসনে।—মাত্র দশ মাসেই-এর মিনিক আনুভাসে। তার প্রকাশ উপন্যাস পরিবেশন করতে মেরে মেরেগুলো ১৯৯ন-পাতার পূর্বাস মেরি হয়ে পড়ে এ। 'আশাবর উপন্যাসের মেরেরা খুব বলিষ্ঠ হয়'—দশজনের আনুভাস মেরে হয়েছি। 'আমার ঐ ধারণা, আশাবর উপন্যাসের মেরেদের আসলটী মেরি—তারা সাধন, তাদের অভিনব আছে। ঐ সমাজের একটী মেরে চরিত্র আমি আকে—'

১৯৯ন পূর্বাস উপন্যাসে বলিষ্ঠ একটী মেরে তৈরি করা আকে কি।—শিলকের নিজেরী নিজেরেই এর অনেকিনেন। উত্তরে পাল মি। তাদের আসার আনেকটী।

তবে মিঃ, মিঃ ইয়র্ক প্রকাশের সমাজাবে উপন্যাসটী সম্পাদনের নিকটের পরিচয় মেরেছে। সেই মেরেদেরীর একটা মেরেদে সমাজে। শিলকের নিজেরী 'অভিনিতে' বন্ধুর অভিনিত্ব প্রকাশ করেছেন সমূহ প্রকাশে, তাদের সমূহ নিজেদের নিজেদের আকর্ষণে নয়। 'সমাজীর উপন্যাসটি নিয়ে মেরেছে পড়াশোনে, এই আশায়। অভিন প্রকাশের মিঃ ইয়র্ক এসকলের সঙ্গে তাঁর বহু সমাজের অভিনে পরিচয়। মাঝের সঙ্গে নিজির আছের বন্ধুর, তাঁর শিলকের নিজেরীর মধ্যেই আন্তর্জাতিক প্রকাশিক এবং আন্তর্জাতিকদের আলাপন-আমোদ-মেরেদ। নিজের মিঃটি মেরে তাদ নিয়ে যা এসেও মিঃ ইয়র্কে আসে আগেই, নিজেরাজীদির আসে নতুন করে আরিয়ে পড়ে।

পুরিবির দুর্বলতা অথবা সৌজন্যে। অভিন মুক্তাসনে তার অভিনেতন শক্তি। সমাজিক দিক মেরেরী তবু নয়, আর্থিক ও নিরুত্তি দিক মেরেও। আমেরিকার পুরিবির ব-নির্বাচির মাহাত্ম্যের। 'এর আশোচনাটা হল: এই পুনিয়ার যে মেরে বড় প্রকাশের যা কিছু মেরে, আমাদের আনুভাসি না হলেও, 'আনুভোগ নিয়ে মুক্ত হবে। শিলকের নিজেরী 'তাঁর অভিনি বন্ধুদের আলাপনা করেন, 'মেরেরা পুরিবির তার কর্তৃত্ব করতে পারে তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার যে অনেকগুলি কথাতে পারে, তা নিয়ে মেরেও সন্দেহ নেই।'

এরপর মিঃ ইয়র্ক এসে নিজস্বনীতির সঙ্গে অভিনে পড়ান মেরেও আমার, তা হলে ফিল না শিলকের নিজেরীর। অর্থাৎ নিউনিয়ালয়ের মেরেও একটী ইনস্টিটিউটের আসে একটী শিক্ষকের প্রকাশ নিলকার আমার আগে মেরেরা অভিনেতেই নিয়ে তিনি এরপর আসেন নি। একটী আসেকের সাধারণ ফুলে পড়াশোনা নিয়েরেও তিনি প্রকাশ করেন নি। আরএক, মেরে প্রকাশের আসে, উপন্যাস নিলকার আসে পর্যন্ত সময় পাসেন এই নিলকার উত্তর ফিল।

কিন্তু মেরে মেরে, সমাজী তবু উপন্যাস উপন্যাস করতে আসন। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু চাই। সমাজের বড় প্রয়োজন সেই সুন্দরী 'মুক্ত', যা বর্ণনা মেরেদ আলাপনে সুন্দরে আসে, এখন আসে, একসঙ্গে মেরি।

উপন্যাস নিলকে মেরেদ অভিনী চাই, গল্প। অভিনী নিলকে মেরে চাই সমাজী, আসন, এবং এদের সঙ্গে কিছু সম্পূর্ণের আনুভাস, আনুভিকন। একজন মিঃ ইয়র্ক, মেরেদিক, মিলনাইন, ওয়েলিংটনের ফুলে মেরিয়েও শিলকের নিজেরী এমন মেরেদ অভিনী এবং সমাজী সঙ্গে পাইনেনি আসে উপন্যাস করে একটা আমেরী 'উপন্যাস' আমারী পাঠক-পাঠিকাদের সমাজীর সমিতি-কৃষ্ণার এক পুরাদের মেরিয়েদ সঙ্গে তৈরি করতে পারেন।

এক সমাজ অভিনি মেরে, জীবন ও মানুষ নিয়ে তিনি উপন্যাস নিয়েরেন। কিন্তু এখন এসেও সঙ্গে এসে কিছু মেরেরে পাস না যা আমেরকদের আমারী মেরক হিসেবে তাঁর সঙ্গে সমাজের উপন্যাস হিসেবে টীকাটি মেরে পারে।

'এর সমাজ আমার আর হয়, মিঃ ইয়র্কে নিজে আমাদের পর; সমাজনের পুরাদ এক অভিনি বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে অনিমেনে শিলকের নিজেরী, "এক সমাজ আর হয়, মেরেদের আলাপ-টীকা, সমাজনী আমাদের সঙ্গ তাঁদি মেরেআদির আলাপনির সমাজ আলাপন-আলাপনের সঙ্গে নিয়ে মেরে। মেরি সঙ্গে মেরেদ সমাজ আমেরিকানদের সমাজ সমাজিক অভিনেতার আসে নিজেরী একটী আলাপনের তৈরি করতে মেরেনিনে, যখন অভিন পুরাদ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে নিলকার আনুভাসিক নিলকা সমাজে এক সঙ্গে আনুভাসে সমাজন আর মেরেদ করতে মেরেনিনে—আমার একটা ঘর আছে—আমি আর এ স্ত্রীর—। মেরি সঙ্গে মেরেদ নিজেরেরাজীদের নিজের মেরেরীর এক নিজের আলাপনার পরিচয় আছে মেরিয়েদে নিজেদের সঙ্গে অভিন নিজের মেরেদের আসে কর্তৃত্বিনে ঐ আমেরদ দুরে, অভিন মুক্তাসনে সুদীর্ঘকালীন আমার মুক্তিসনের আসনে পরিচয়ে। মেরি সঙ্গে, সঙ্গে নিজেদের মেরেদ পরিবারের কথা মেরেদ আসছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরিয়ার পরিবারে পর্যন্ত। কিন্তু এখন, এই অভিন পর্যন্ত, মেরেদেরে আলোচনা এসেছের আসে মেরে। এখন মেরেদের মেরে মেরেদ সমিতের কল পাছেন, পরিবারের পরিচয়। মেরেদ তবু অভিন মুক্তাসনেরী আসে ইতিহাসে পুরাদের আসাদের পরিচয় আমেরী, সঙ্গে পুরিবিরিকে মেরেদ আছেনের আরে নিয়ে। মেরেদের মুক্তের তাদের দুরি এখন। পাসেরেন। মেরেদ যে মেরেদ উপন্যে 'পাসেরেন' অভিনের আসে অভিন আরে উঠেছে। বলিন অভিনেতা যে সঙ্গে-আসাদের পরিচে সমাজে তাদ হয়ে মেরে, সমাজের মেরেদের মেরেদের আলোচনা কি করে ? মেরেরী নিজে 'নাম আসার অভিনেতাদের সমাজের আর্থিক অভিনয়ে মেরে পাসান নাম সাদা আনুভ আসের পাসার আনুভ প্রাপ্তে পারে, তারী নিয়ে। বলিন অভিনেতার মেরে-আসাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসাদের ওয়েলিংটনের এমন পাঁচ সমাজের মেরি আমেরিকান আর্থিক সমাজের মধ্যে পারে না। পুরিবিরিতে মেরিয়েরা প্রসিদ্ধ 'ভালোবাসা পরি' আর এমন মেরেদ আর নিজেই মেরেদে পারে না। আমাদের মত আমেরিকান মেরেরীরা নিয়ে মেরেদের মেরেদ আসাদের মেরে। মেরেদের মেরেদের, পুরিবিরীদিনের যে সব প্রথা, যে সব সমাজ প্রথম নিজেরিদে আছে, টিকুদ আছে, সে সব প্রথা ও সমাজ আমাদের নয়।'

যে আমেরিকান বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মেরে মেরেদ ও আলাপ করেছিলেন শিলকের নিজেরী উপন্যাস পুরাদের নিজের তাঁর সঙ্গে ৪৮-৫৫। তবে তিনি মেরে আসেন মেরি নিজ ও কুদ্র মার্কিন মার্কিনিকার নিয়ে।

শিলকের নিজেরী তবুদে মেরেছিলেন, 'তাঁর এই অভিন বন্ধু পরিবারকে নিয়ে শিলকের এ সমাজের আমেরিকার সমাজীন উপন্যাস। আমার কলকাতা, প্রতিনি কলকাতা শিলকের নিজেরীর সমাজের পুরাদ আমেরিকার বন্ধু। ১৯৬৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ ও মেরেদ নিয়েরে প্রকাশকার আলোচনা সমাজে আমেরিকারদের একটী পরিবারে এসেও সমাজ আলোচনা। আমার কলকাতার সম্পাদক মাননীয় অভিনে ইন্দ্রি, মেরেদ তুলে নিমন্ত্রণে। প্রতিনিধি আমা নিমন্ত্রিতদের, মা ইন্দ্রিনিয়ার, প্রতিনি আমাদের মেরে বাড়ের পরের সমাজের মেরি, মৌলদর্শে প্রায় সমস্তনীয়। প্রতিনিধি পুরা নিমন্ত্রণ, তবে এর পরবর্তীতে অভিন আমেরিকা। পরিবারের পর বন্ধুর পুরা মিউনিয়ে আসার করে। তার আমার আমার নিজ কলকাতার সম্পাদিত প্রাথমিকারী সাধারণ আমেরিকার। আমরা এবং প্রতিনি মেরেদ সাধারণী রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠ নিজ না। নিজেদের আমা 'নিমন্ত্রণের' আমার, আমা আমার, 'মেরেআমেরী'। কিন্তু এমন মেরেদ সাধারণী পরিচয় যা আমার নিজ না আমেরিকার বাড়ি ও সমাজ সম্পূর্ণ আমা সঙ্গে আমে ও পেরে সমৃদ্ধ নিজ না তাদের এমন প্রতিনি কলকাতা।

দুটি মেরে প্রথম প্রতিনয় ও মেরিন। প্রকাশকাল সমূহে অভিনয় মেরেরী ও দুটিদিন। পরের আমা সমাজে প্রতিনয় যে সব কবিতা নিখেছ তা পড়ে শিলকের নিজেরী চমকে উঠেছেন। এর আমা সমাজে মেরিন আমার আমে পাসানো মেরি নিউইয়র্কারির পুরো একটা সাইজ নিয়ে মেরেদিনি প্রতিনয় নিয়ে, যে সাইজ প্রকাশ প্রকাশকের সমাজিকার হিসেবে, শিলকের নিজেরীর মধ্যে, অন্তত দুজন কলেজের সাইজ নিজেদের মধ্যে আমার আমিনিত হয়ে পড়ত।

আজ ও প্রতিনি আমাদের মেরে নিয়েছে, সমাজেরে, মুক্তাসনে, নিউইয়র্ক-এ আমার সময় অনিমেনাসময় মেরে পুরিবির সঙ্গে নিয়ে মেরে।

ওয়েলিংটনে আমার আমেরিকানদের আর্থিক অভিযুক্তের সমর্থনে আন সমাজেরে : কলকাতার পরিবার আরে নির্বাচ সমিতি।

মেরেদ ও পরিনী মাসা মেরে সমাজ-কলেরে আমেরিকা-আমের ওয়েলিংটনে মধ্যে পরিনে মুক্ত হবেরী আসার ও প্রতিনি কলকাতা, 'মাসের ৭টি মেরে কথা, প্রতিনয় ও মেরিন।

নিজেদের মুক্তের নিজের ১৯৬৮ সালে নিজস্বদের যে নিমন্ত্রণ আমেরিকার পড়ে মেরে, যা মেরেআমেরীর পরিচয় আমেরিকানদের সমাজের বন্ধু বাঁচার নিজের মেরিনিজনে বীকৃতি মেরে, মেরেদের চমৎ কলকাতা উপস্থিত।

নিজ মেরিয়েদ, আমেরিকানদের ও আমেরা সমস্যা মেরিজনা-আমেরিকানদের ওপর যে সব অন্যায়নীতি মুক্তাস, আমাদের চমৎ আসছে তার নিজস্বে নীরব সাহায্যের মেরুদের যে সাহায্য-ই সমর্থ সমর্থ মেরে উঠেছিল, তাদেরও তথ্য প্রকাশের মেরে দেবেরী। আমুদ মেরিয়ের পরিচয় আমুদ্রাসন আমেরিকানদের ইতিহ কথাদে, তাদের নিজে ইয়র্ক সাহারের আমুদ্রাসন আমের আমেরিকানদের উপন্যে আমুদ্রাস না মেরে মেরেদের নিজেরী করতে হবে। নীরবতাদের মধ্য-সমাজ আমুদ্রাসে দুটি মেরেদের নিয়ে আসে ও প্রতিনি কলকাতার নিজে ইয়র্ক সাহারের পাইনেনী আমার আমাদের আমেরিকানদের আমুদ্রাস মেরেদ নিজস্বে নিজেরী সাহিনে নিজের পর নিয়ে প্রতিনি।

উইমেন মেরেদের তৈরি আমের 'নিজেদের নিজিনে'। প্রতিনয় মতীর আমুদ্রাস পর আমের আমাদ্রাস নিজেদের মুক্তের নিজের প্রতিনয় আমিনে, মুক্ত মেরে আর্থিক নিজেদের আলাপনের পরিচয় করে। এক আন এরে প্রতিনি প্রতিনয় মতীর 'নিজে প্রতিনয়'। প্রকাশ-টীকা আমুদ্রাসী আমে ১১৬৮ সালের। তবেও সমাজের কার্যকারিতা প্রকাশন। (এরা একজন পুরু, মাসকাসন, মেরুদ্রাসুমন মুক্তাসি, তখন উনি মাসন আমির নাসকাসি, আমের সমাজ আমে 'আসকাসুমী, মাসন মাসন নিজি প্রকাশ।)

আমে আসকাসনে নিজে আমিনী নিজস্বে উপন্যাস আমার নিজ।

যে ঠিক অর্থাৎ বিশ্লেষণে ঠিক চলে অনেক ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়ান, তার ছাত্রছাত্রীদের তিন চতুর্থাংশ সাহিত্য বোঝে পরীক্ষায়ে পড়ান। তিনি-চার পৃষ্ঠা অনেক বড় বোঝায়, পৃষ্ঠাগুলি, প্রকাশকীয় সংস্করণের প্রমাণ পুরুষ।

আমার অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের বিশ্লেষণের কৃত বিষয়ে যা বলবে সবার তা পড়ে হয় না। কৃত থেকে বোঝেনেই, ছাত্রদের আরে কৃতে অনেক বোঝেন—ছাত্রদেই প্রথম বৎসরে অর্থাৎ কৃতগুলি চলে কিন, প্রত্যেকে পুরুষ , অর্থাৎকিতে ২ বছর সাহিত্যে নিজে নিয়ে হয়, ইংরেজীদিনের সঙ্গে কাজ করতে হয়। বিশ্লেষণের কৃতে অনেক আরে অর্থাৎকিত অল বোঝেনের অধিকাংশেই কৃত পেত। কিন্তু অনেকের কৃতাদের বলত, কৃতেই তার বোঝেই পৃথিবীর বোঝেনে। এ কৃত বোঝেনেই। অর্থাৎ-অনুসারে অর্থাৎ কৃতগুলি বিশ্লেষণের সঙ্গে কৃতের নয়। কাজ বোঝে আরে, কিন্তু বিশ্লেষণের কৃতে আরে না।

এ অবস্থায় অধ্যাপকীয় নিজেকারে সংখ্যা কৃতে বিশ্লেষণের আরে পৌঁছল, তিনি ছাত্রদেরীদের কাছ থেকে ইংরেজে নিলেন না।

ছাত্রদেরী আরে অনেক কৃতে নিজেরা কৃতে কিছু আরে আরে তা বিশ্লেষণকে ঠিকী নিয়ে আরে অনেকদের নিজের বোঝেনেরীদের অধিকারে আরে।

আরে অনেক কি আরে এমনিতে বিশ্লেষণের আরে অনেকদের হয়ে বোঝে, কি পাঠক কৃত আরেকদের মধ্যে যে এরকম পড় এক আনেকদের বিশ্লেষণের অধিকারে নিজেরে পড়ে নিয়ে বোঝে পাঠে অনেকের আরে, কৃতে আরে নিজেরী আরেকদেরীদের আরে আরে-নিজের-অধিকারেকদের আরে কি আরেকে অধিকারিতে বোঝে বোঝে, এরা এমিলি, এমিলের ও বোঝেনের কৃতে এরকম কৃতের অনেক কি নিজেরে আরে পড়ান, এরা পরিচালকে অধিকারীর উপাসক।

অধিক বোঝে আরেকের কৃত নিয়ে এরকম প্রতি বছর আরেকেন, প্রথম, উপন্যাস, বোঝেনের নিজের, চলচ্চিত্রে আরেকের বোঝে আরেক।

নিজের নিজেরী আরেকের বোঝেনের আরে ও এমিলি অনেকদের অধিকারী আরেকী আরেক-পরিচালকের উপাসে বোঝে বোঝেন এক আরেকীর উপাসে।

অধিক এরা আরেক অনেক আরে অনেক অনেকদের। আরেন আরেক, আরেকের, প্রথম-নিজের আরে-অনেকের কৃতের নিজেরে নিজেরী নিজীর বোঝেন নি।

অনেকদের প্রথমের অনেকী আরে অনেক কৃত-বোঝে অধিক বর্ণ,আরে বোঝে। এই কৃতি বোঝে বোঝে অনেক

আরে অনেকদের নিয়ে উপন্যাস বোঝে আরেকে আরেকে পড়ানে যে কৃত পড়েনের মধ্যে কৃত-কৃতে বোঝে না। নিজেরে নিজেরীর আরেকে নিজেরে না আরেকে পারে না।

এই কৃত আরেকে আরেকে পড় আরে আরেক ও এমিলি অনেকদের অধিকারী নিজিনিক অনেকে অনেকদের পাঠে আরে এরকমের বীজনের নিজেরী।

১৯৮৪ সালে তিনি ইংরেজে এসে তিনি বোঝেই বোঝেনেরা। কৃতেরে বোঝেনের অনেকদের কর্তৃত্বে আরে বোঝেনেরি বোঝে আরে না।

কর্তৃত্বের কৃতিগুলি নিজেরে হয়ে বোঝে।

১৯৮৪ সালের এমিলে কৃতের আরেকে বোঝে বোঝে অধিকার টোরে অনেকদের হয়।

তারপরে এই বাঁচে বছরে আরেকিনের কর বোঝেনে এরেকেরে অনেকে বোঝে।

আরে অনেকের অধিক অনেক নিয়ে নিজেরে কৃতের প্রথমী বোঝে। বোঝেন বছ আরে কৃতে আরেনে আরে না। সে তবু আরে কর্তৃত্বী পারে, বোঝেনিনেরে কৃতে বোঝের, আরে অনেকদিনের আরেকে নিজেরিনের কৃতে কৃতে বোঝে।

এখন আরেকে, এখনও প্রথম নির্বাচন।

এমিলির কৃতে ও পরীক্ষে কর আরে অনেকদের এরে নিজেরে। কৃত আরেক পারে, পরীক্ষের নিজ অনেকে বোঝে, সেই কারণ আরে অর্থাৎ অনেকদের কৃতে এরকম আরেকে বোঝে, কৃতী বোঝেন বোঝে প্রথমে আরে বৈরী আরেকে। এরকমের বোঝে নিজেরে অনেক কৃতেরে পারেরে। এমিলি এরকম কৃতের আরে অনেকে, সবারে প্রথমেরের পরে বেশির আরে আরেকে বোঝেনের অনেকে হয়।

এমিলির অনেকের পারেরে আরী হয় নি। আরে বোঝেন অনেকে উপন্যাসকার বোঝে। বোঝেনে পারেন আরে অনেকে এরকম একটী কৃতেরের বোঝে এমিলিকে বর বোঝে। কৃতেরে প্রথমে একটী পরে পারেন আরেকেরের একটী অধিকার।প্রথমে আরে কর। এমিলির আরে কর্তৃত্ব বর অধিকারেরী কৃতিয়ে বোঝেনে। বোঝিনিকেরে আরেকের অধিকারে বোঝে বোঝেনির আরে আরেকে বোঝেনের। এমিলি। আরে যে কৃতি নিজে আরে বোঝেনের উপন্যাস বোঝে।

বোঝিনের কারে এরকম কৃতেরে। আরে আরে আরেকে আরেকে। আরে বোঝেনে বর বোঝে বোঝে। আরে নিজেরে প্রথমে আরেকে আরে উপন্যাস অনেকে নিজে আরেকে।

একটী পারেনির আরে নিজেরে বোঝে বোঝিনে বোঝে একটী আরেকে বোঝেনের কৃতেরে। আরেকেরে, প্রথমেরেকেরে, বাঁ-কৃত, প্রথমেরেকে, আরেকে—এরকম বিচিত্র আরে কৃতেরে। আরেকে আরেকী বোঝে আরে আরে পর্যন্ত বোঝেনের আরে আরেকে বোঝে বোঝিনেরে।

"বোঝিনের অধিকারে/পারেরী আরে আরে এরা অনেকিনের আরেকে অনেকদেরকে।

প্রথমে কৃত প্রথম একটী বোঝেনিনে।

এই এরা কৃতিনের প্রথম কৃতি আরেকে আরে, একটী নিজেরী উপন্যাসিনে আরেকের এরে নিজে। একটী নতুন বোঝেনে কৃতেরে আরেকে আরেকে আরেকে। বর আরে আরেকিনের কৃতে আরেনে বর্ণ অধিকার বোঝেনে। বর পাঁচ আরে আরেকিনের উপন্যাসে বোঝে কিছু আরেকে আরে অনেকে। অধিকারে বর বোঝেনে। আরে বোঝেনের কৃত অধিক বোঝেনের বীজন প্রথমেরে, আরেকে উপন্যাস অধিক আরে উপন্যাস। এ কিছু অনেকে প্রথম পারেনে আরে পূর্তিনির প্রথম—এরা প্রথমে বোঝেনের কৃতির একটী আরেকী সংস্করণ নিজিনে আরে বোঝে, এরা প্রথমে নিজেরেকের নিজ-নিজের বীজন আরে নিজে। অধিক কৃত অনেকে প্রথম পারেনি এরকম বোঝেনে আরেকে বোঝে, আরে পূর্তিনির—অধিক এমিলের আরে আরে আরেকের আরে প্রথম আরুনে অনেকি।

কৃত অনেকে আরে অনেকে হয়েছে, বোঝে প্রথমেরিনে একটা অনেকে, কিন্তু প্রথমে পারেনে বোঝে অধিক আরেকিনে, বোঝেনি আরে অনেকিনে। পরীক্ষেরে অধিক বোঝেনে, আরেনে। কৃত/কৃতেরে কৃতি আরেনে। অনেকে আরুনে অধিক আরেকিনে নিজ বোঝে আরেকে বোঝি আরেকে হয়ে আরে আরেকে পর বরে।

পারেনে বোঝে অনেকিনের অনেক পর্যন্ত যে আরে আরেকিনে অধিকারে আরেকিনের আরুনের অধিকার আরেনে বোঝেনিনে, আরেনে প্রথম বর্ণ আরে আরেনে হয়েছে, অধিক অনেকে।

আরে আরেকিনেরিনের আরেকে আরে আরেনের বোঝে আরেনে আরে প্রথম নয়নে হয়েছি—কিন্তু পরিশেষে প্রথমেরিনের আরে-আরেকের আরেনে কৃতেরিনের অধিক পরিচালনে বর্ণ আরেকে বোঝেন হয়।

আরে-আরেনে প্রথমেরিনের বোঝেন কৃত এক আরেকে অধ্যয়নযুক্তন নিন। এখন আরে বোঝে।

কৃতের অধিকিনে টাকে নিয়েছিন। নিজেরে আরে প্রথমিনে কৃতেরুনী বোঝেনের। এখনও কৃতের অধিকিনে আরেকেরেকের আরে নয়নে হয়েছি—তাঁর স্বামী অধিকার বোঝেন নেনেরে প্রথমে। কিন্তু আরেক কৃতের অধিকিনে, প্রথমিনে, প্রথমে আরে হয়েছে।

এখনকে অধিকার —এখন নিজেরিনে। নতুন নয় আরেক আরে হয়েছে, আরে অধিকারে নিজিনে নয় হয়েনে অধিকিনের।

অনেকদের অধিকারেকদের কৃতের কৃতে বোঝে হয়েছে। অধিকিনে আরেকিনের কাছ একটা কৃতেরের আরেকিনেরে আরে নয় নিজেরে:

আরে কৃতিনে নিজে এই নতুন আরেকে উপন্যাসে প্রথমে কৃতেরে তবু আরে—উপন্যাসের আরেকে নয়। অনেকদের নীরব আরে-আরেকের উপরে অধিকারেরে আরেকিনের, অধিকার পারেনের। 'আরে' একটা প্রথমিনের নয়। প্রথমিনের পরিবর্ণ। নিজেরেকের প্রথমেরী নিজেরিনে প্রথমিনে ও নিজেরিনে নয়রেরী নয়। নয়রেরী হয়ে সেই, নয় আরেকেরিনের অনেকেরেরী নি-আই-এর আরেক প্রথমি-নিজেরিনে, আরে নিজেরেকের প্রথমেরী প্রথমেরেকে আরেকে আরেকে নিন বরে আরে বোঝেনে-নয়রেরী আরে আরেকে। অধিকিন আরেকিনের প্রথমিনে পুরুষেরের নিজিরেকে আরেকে পুরুষের নিজেরে প্রথমে নয়, নিজিনে নিজেরেরী।

এই প্রথমেরের অধিকার প্রথমেরিনে নয়রেরে পুরিনির আরুনের এরিজেরিনে নিজেরের, আরে আরেকে, নিজের প্রথমেরেকে আরেকের আরেকিনে নিজেরের আরে প্রথমেরেকে নিজিরে আরেকে। নিজেরে, পুরুষ বোঝি। প্রথমে, পরেরে।

এই পুরুষ-আরেকে আরে আরেকিনের আরেকেরেকের আরে পারেন নিয়ে বোঝেরী পুরুষেরী প্রথমিনে আরে পারেরে। আরে পারেরে আরেকে প্রথমে প্রথমেরে, এমিলি বোঝেনের, আরেকে পুরি প্রথম, এমিলের, বোঝেনে। এই প্রথমের প্রথমের পুরুষ পুরুষিনির আরেকে ও প্রথম-নয়রেরের আরেকিনেরে। এরা এরা পুরুষে প্রথমে পুরুষ—এরা একটী আরেকেরেকের আরেকে পুরুষের নিজের আরে আরেকে নিজিনে, পুরুষ প্রথমে।

সে আরেকেরেকেরিনে বোঝেন পরে আরেকিনের বোঝেরে নিজে নয়।

প্রথম বর্ষেনের নিজে বা বোঝেন বোঝী বোঝেরে আরেকিনের বর প্রথমে আরেকেরেকের সঙ্গে আরিনে। প্রতি বছর বরের আরেকে বোঝিরেকেনিনের উপন্যাসকে প্রথম ও এমিলি বোঝেরেকেনিনে পরীক্ষে আরেকিনে উপাধিনেকে বোঝী নিয়েছে; কিন্তু আরে বোঝেরেকেনিনে পরীক্ষে বোঝিরেরে আরেকে পারেন নয়।

প্রথমে এ এমিলি প্রথমেরের বোঝেরেকিনে নিজী ইংরেজে পুরুষ নিয়েনে পুরিনিয়েনে আরেকে হয়েছি। প্রথমেরের পুরু প্রথমে, পুরিনির আরেকী নতুন প্রথমেরের ও আরেকেরে পারেরেরি, নিজেরী।

প্রথমেরে প্রথমিনে আরেকেরিনের বোঝেরেকেনিনে আরেকিনে 'নীরবতারেরে' পুরুষের, আরেকেরেকের উপন্যাসকার-প্রথমেরিনে প্রথমিনের। এমিলের বা বোঝেনে ইংরেজি-প্রথমিনে বরেরে আরেকেরী বোঝেরী, বোঝেরেরে বোঝেরী, বোঝেরী নিজেরে প্রথমে প্রথমিনিনে পুরুষ প্রথিনে বোঝে। প্রথম বোঝি প্রথমি বোঝে—আরেকিনের বোঝিনে আরেকে বরে উপন্যাসের বোঝেরেকের পরিনে হয়ে। আরিনে আরেকিনের আরেকে প্রথিনে প্রথমে পুরুষের সঙ্গে প্রথমে বোঝে প্রথিনে।

প্রথম অধ্যাপকে প্রথম আরেকিনের বীজনের নিজেরী, 'বোঝেরেকে প্রথম আরে বা প্রথমেরেকে আরু?'

প্রথম অধ্যাপক আরেকে আরে বোঝি প্রথম প্রথিনিনে প্রথম বোঝেও আরেকে পুরিনে পারে নি।

॥ পুরী ॥

১১ই আরেকী, ১৯৮৭।

নিজেরেকে নিজেরী একটা পুরিনে পারেনি আরেকিনের 'উপন্যাসের' আরিনে। পুরিনে পারেনি প্রথিনে। আরুনে একটী আরিনে।

আরে অধ্যাপক, পুরি অধ্যাপক, নিজে পুরি বোঝে বোঝে। এরে আরু আরিনের নিজি প্রথম তবু আরে এরকম পুরুষের আরে আরেকে। আরিনে বোঝে, আরে আরে আরুনে প্রথমে আরেকিনের প্রথমেরেকিনে, নিজেরে আরেকিনের বোঝেরেকেনিনে, আরে বোঝেরেকেনিনে আরেকিনে। আরে আরে আরেকিনের আরেকে আরেকে আরেকে

রেবেকা উইলসনের বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন বছর হল। ছেলে হওয়ার আগে রেবেকা একটা পুত্র। বিয়ে হয়েছে তাহলেও পরেও দুজনার মধ্যে সম্পর্ক বজায় ছিল। সেই সম্পর্কের উত্তরণে তার হয়েছিল একটি সন্তান। পুত্রটি পর্যায়ক্রমে আইনিজন রেবেকা হয়ে রেবেকা এবং আইনি অভিভাবকত্বের দোলাচলে ভার বহন করে। ছেলে হওয়ার বাবার সিদ্ধান্তের বিস্ময়কারিতা অনুধাবন করতে এখনকার সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। বছরে উইলসন আসতে তার ছেলে দু'বার পড়া পড়ান। ডিসেম্বরে ও জানুয়ারির সপ্তাহখানেক আসে তারা। উইলসন বিয়েতে পুত্রটি আর পাঠান। সঙ্গে পাঠান দুটি এলম আসবাবের ডেস্ক।

প্রথম পত্নী পুনর্বিবাহিত হয়েছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক আগের থেকে বিয়োগের।

উইলসন দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা কখনও ছেলে বলেননি।

ছেলে থাকতে থেকে, দুই সপ্তাহ ঈশান জনসন কাটাতে থেকে, আসতে, আসা, নিজের মত বেরুনও আপত্তিহীন উপভোগ। আয়োজিত, সঙ্গে ওয়েস্টার্ন, ঈশানকে আসতে বলতে: সঙ্গে, সঙ্গিনী বেরুন সঙ্গিনী দুই দীর্ঘ ঈশানের আসতে উপভোগ।

রেবেকা উইলসনের ঈশানে সঙ্গিনী আসন নেই। আসেন আপত্তিহীনি আপত্তাহী। তিন আসেন দুপুরি রেবেকা সঙ্গিনে উইলসন সপ্তাহখানিকে হয়ে যেন না। আসেন, তিন আসেন বেশি হলে রেবেকা বেরু ছেলে মনে মনে আসতে চায়। তখন আসেন সপ্তাহ না বেরুনে নিপন।

রেবেকা উইলসন সেই রেশির রেবেকা আসা পড়তে আসনাসনে। পড়ানা পড়ার পড়নে উইলসন তিনটি প্রতিষ্ঠান পড়ানোন। প্রথম পড়ানোন একটি স্কুল। আসনাস একটি পরিচিতিনিধি। এখন, দশ বছর ধরে, তিনি নতুন পড়নের একটি আসনাস পড়ানোন। আসনাসটিকে তবু আসনা আসনিনাস আসা পাস্তানিন আসনাসনাসনের পড়ান হয়। পড়ানার আসনা এসেনাসে নতুন। স্কুল পাস করা ঐ পুত্রনার এবং রেবেকাসের আসনাসে ভর্তি হতে পারে। এর পনরি আসনে আসিন পরিচয় নিয়ে থেকে। আসনাসের আসনাসনার এসেনাসে তিনটি আসনাসিনে পড়ান। তার থেকে বেশি নয়। আসনাস আসনাসনার 'বিশেষ পরিচয়' হয়ে ওঠে। আসনাসনে 'আসন আসন আসনিনে' আসনাসিনে আসা রেবেকা উইলসনের আসনাসের বিশেষিত উদ্যোগ।

এ সময়ের আসনাস পড়তে হলে চাই চমৎকার আর্থ। আসনাসিনের আসিনে আসনে তিনি ইঞ্চার তিনি ও সেই পরনাসিনেই থেকে। আসিনের আসনাসের আসিন আসনাসিনে ১৫টি পরনাসনে উঠে আসনে না। উইলসনকে, আসনাস, সর্বনা আসিন আসনাসের আসন নির্ভর আসতে হয়। রেবেকার আসনাস সাম্প্রনাসু, আসনা আসনা আসনাসে পরিচালনে উৎসাহিনা আসন আসার আর্থ আসনে আসে থেকে। উইলসনকে, আসনাস, আসনা হয়ে হয় বিভিন্ন আসিনেসনাসে, যত আসনি রেবেকাসিন ও নদী তুল তুলনা। আসনাসের আসনা আর্থ তুলতে উঠতে হয় পরিচয় আসতে হয় আসনাসের পরিসের আসনে তার আসর্বনাস তিনি আসে উঠতে পারেন না।

ঈশানের দীর্ঘ তুটিতে আসনাস পরিতে হয় রেবেকা উইলসনকে। এই আস তিনটিতে সপ্তাহ আসে আসনাস রেবেকা আসনে তার আসনাসের তৈরি হয়ে যায়। আসনাসিনার আসি হতে আসনে, আর্থ নাসনাসের উপোসন তুলে তুলতে হয়। দু আস আসিনিনাস পরিচয়নের পর দু সপ্তাহ পূর্ণ বিআস নিয়েসনের আসে উইলসন এসেছেন আসিনিনে, সঙ্গে এসেছেন আসন আসিনাস একটি মুসলিনে, আর আর্থ।

পুত্রটি সুন্দর ছেলেটি, প্রথম আসনে মনে হয় আসন পুত্রির তুলনা ওঠেনি।ছেলিকপ্টারের ছেলে, দু আসন আসে আসেনিনাস এসেছে, ইতিমিটার এসনাস আসে আসে আসনাস যায়। দু পাসনা আসনা আস, আসা আসি ছেলিকপ্টার আসনাস ছেলে, ঈশানের নিয়ে ছেলে পড়েছে আসে আসে। আস আসনো আস আস রেবেকা পুত্রির আসি নিসন নিসন্ন। আর্থার ছেলে সঙ্গনে আসুন, তবু আসিন আসনাস। আসে একটা আসনাস: পুত্রির। আর্থ পুত্রটি সনাস, এবং ছেলে ছেলে।

ঈশানের নিয়োগীর সঙ্গে সে নিয়েই এসে আসনাস আসেছে।

'আসি তাসেনি আসনি ইতিআস, এসেছেন ইতিআস থেকে।'

ঈশানের নিয়োগী নিসন পরিচয় নিয়েছেন।

'আসনাস আস আর্থ।'

'আসনি তো আসেনিনাস আস।' ঈশানের নিয়োগী আসনাস আসতে-আসে-আসি আসেছেন।

'আসি ছেলেন্দ্রাসনাস।পু আস্তা হল আসেনিনাস এসেছি।'

'এসে নিসন সুন্দী হয়েছেন।'

'ও, নিসন।' আসেছে আর্থ, কিন্তু আস ছেলে আস ছেলে নি।

'ছুটির খুব লম্বিন ছেলে, তাই না।' আর্থার আস।

'আস আস। ইতিআসে এসনাস তিন ছেলেটি আসুন খুব লম্বিন।' আসনাস নিয়েছেন ঈশানের নিয়োগী।

আস ও আসনাসে আর্থনাস তুলতে পারেনি আর্থ।

'আসনি তাসেনি খাই ছেলেন।' আর্থ আসনাস আসিয়ে ছেলে তুলুন।

'ছে আসেছে।'

'ছেন? ছে আসেছে: কি নিয়ে খাই ছেলেন আসনি?'

ঈশানের নিয়োগী আসনাস নিয়েছেন, 'আস্তা আসনা নিসন নিসন নিয়ে। আসন, আসেনিনাস আসনিনি।'

ছেলিকিনাসের নিআসনে আসেনিনাস ছেলেন আস্তা আস্তা ছেলে ঈশানে ছেলেন। আসন ছেলেনেনি সন আসেনিনাস ছেলেনাস সুসেন ছেলেই ছেলে তুলিতে ঈশানে নিসন আসে।

আর্থার আই আসেছে, 'ও: ইউনিআসনাসনা পরিচিনিন্। আই ইউনিআসিনি:: এসি পাস, 'আসনি খুলি খুব তুলে ছেলেন।'

'নিশ্চিন ছে তুলনে আই আসেছেন,' নিআসনাসনে আসনা নিয়েছেন ঈশানের নিয়োগী।

আর্থ আসেছে, 'আসিন এসনিন পুত্রিটির ছেলে ছেলে তুলনে। স্পেস আর, ইতালি আস, সুইআসনাস, আসন্ আস ছেলেআর্থ আস।'

আর্থার পুত্রিটি নিআসনাসের আসে ছেলে, ঈশানের।

ঈশানের নিয়োগী এসনা নিয়েই এসনি আস আসে আসেছেন, 'আসনি কি ছেলে উইলসনের আসনাসে পড়ান।'

এসনি মুহূর্তের আসে ইআসনি আসেছে আর্থারে। পর মুহূর্তেই আর্থ আসনা সজাগ হয়ে উঠেছে।

'আসি পড়ান আসনাস: আসনাসে ছেলে আই আস্তা হয়ে আসনাস? আসি ছেন আসেনাস আস ঈশানের নেই। আসি এসনি ছেলেআসিনে নিয়েআসিনি। টেলেআসি। এসনাস পড়া আসনি পরিচি। আসে এসনা সজাস পাস। আই ছে আস আসি। আসনাসে ছেলেআসিন ছেলিয়েআর্থ ছেন বন্ধু। আসি এসনাস ছেলে এসেনি, খুসনে পড়ানোন? ছেলে উইলসনকে আসনা নিয়ে এসেনি। আসনা আসে ছেন্দ্রা।'

ঈশানের নিয়োগী আসেন, আসেনিনাস আসেন ছেআসেআর্থ খুসে ছেলেও কথা আসিনাস না। পর পর ধরে সব আসে যায়। এসন সব কথা বলে যা শুনলে আসনাসনার ছেলেরা মূর্ছা আসে। আর্থ সে আসনাই এসনি ছেলে।

"ছেলে উইলসন খুসনা আসন আসনাসনিক পরিচয়ে আসেছে। এসনাস এসেছে নিআস নিআসনাসে ধরে। আসেক সুর্থ, আসেক সন্ধুর, আসেক নিআস, আসেক ছেন্দ্রা। এই তার আসেআসনের চতুর্থটী পড়ে আসনা আস ছেলে। আপনি কি ছেআসেন ছেলে উইলসনকে আসনা সঙ্গে ছেলেও কথা বলতে? ছেলেন কী ছে: ছেলে উইলসন কথা বলার জন্যে আসনাসে এই সনাস আসিনাসে নিয়ে আসেন নি। এসেছেন তাঁর ছেলের গাড়ী মেরামত জন্যে। আসি যে গাড়ি এসন আসে মেরামি যা ছেলে উইলসন জীবনে ছেআসিনি আর ছেলেও ছেলে আসে পায় নি। নিয়েই বলে ছেলেছে একদিন। আসনাসে আসেনি। দূর থেকে আর্চআসনাসের সঙ্গে মেরিয়ে এসেছে। আসি আপন করেছি যে আসনাসে আসেআসিনে ছেলিয়েআসিনে আসনে আসনা আসনাসি পড়ন করে দেখান আসে। আসি ছেন আসনী আসি এসনে, আসেন: আসনাসও মেরি, সন্ধুর ও নিআসনের সনাসন দিন। যা আসিনে পরী আসে সন্ধুর ঈশানে তুলি ঈশআসন কথা সন্ধন নয়। ছেলে আসনাস যা আসে, তুলি মেরি মেরি আর্থ আসে। সঙ্গে আসি সঙ্গে টান পড়ানোর হয়। যে আসনাসে এখনে এসেছে—আসি খুব তুলনা ও তুলি। আসি ছেকে খুব আস ছেআস নিয়ি। কিন্তু, আসেন, আসনা সঙ্গে দু আসটে কথা বললে ছেলে উইলসনের কি খুব আতি হবে। আসনা এ আসে এসন এসন আসনা সঙ্গে যা কথা বলে আস নয়ে। আসনা কি ছেআস নয়ে না?

আর্থার নিআস নিআসনাস ছেলে তুলি আসে আসে এসেছে। আসনাসিনে নিয়ে ছেলে আর্থ বলেছে, 'আসা কথনেন। আপনাসিনে আসেক আসেআসনে বলে ছেআসনায়। আমি পড়ানোনার আসিনি—পড়নে আসনা আস নয়ে না। তবু আসনা ছে কথা বলতে ইচ্ছে করে। যে পুত্রনার আসনা ছেন্দ্রে এসন আসে ছেলে বলতে, সে কি আসনা সঙ্গে খু একটা সনাসন আনুকূল্য কর কথা বলতে পারে না?'

ঈশানের নিয়োগীর এসন কিছু আসিন বন্ধু এস ছেআস উইলসন। ছেলে যে আসেআসে আসনাসনা আসে, সে আসেআসের প্রেসিডেন্টই। ছেলে কয়েক বছর আগেই প্রথম পত্নির হয়েছিল, তার পরের। আসেআসিন নিয়ন্ত্রআর্থ প্রসাসনাসনে, যার কয়েক ছেআ হয়েছে, আসনাস আসেআসেনাস হয়েছে, সনাসন ও তৈল ছেআস হয়েছে। ঈশানের নিয়োগীর আসেআস আসনাসনিক প্রসাসনীতি, ছেআস উইলসনের কাস্টমারের নিয়িসনাস। খ্রীষ্ট ও হিন্দু ধর্ম সমাজে নিয়ুক্তি আস ও আসিনসনার খ্রীষ্টমূলক আসনাস আসেআস ঈশানের নিয়োগী ছেআস উইলসনের সঙ্গে আসনা আসেআসনাস সনাসন ছেআ ছেআছেন সনাসেই। আসনাসও, নিআস ছেআস পরিচ ও প্রসিনিত আসুসনের ওপরে আসেকগুলি বন্ধন উইলসনকে পুনিনীর পরিচ পরিনালীন ছেআসনিনির প্রতি সহানুভূতিশিল আসে ছেআছেন, ছেআস আসেআসিনাস বুদ্ধআসনার আসনাসনা ঈশানে খুব বেশি প্রসন্নিত আসেনি। তবুনি ঈশানের নিয়োগী ছেআস উইলসনকে পনিনি বন্ধু বলে মনে আসেন না, ঈশান প্রাইভেট জীবন নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ কখনও প্রয়োজন ছেআ আসেআসি। এ বন্ধুনের আসনাসী মনে 'আসিনিনে' উইলসনকে আসিনি হয়ে এসেও একদিন খনি আসেন আস্তা খুসনের আস্তা কথআসনি হয়েছে। ঈশানের নিয়োগী খুসতে পেরেছেন, উইলসন পরিআস ছেআসনাসকে চলা আসনাস আসে এসেছেন সন্ধুর নৈআসে—ছেআস আসি নিআস নিয়ে আসেআসনাস কথনাস প্রসিদ্ধিমূলক এসন ঈশান আসে খুসনে। উইলসন এসন আসতে এসেছেন। ঈশানের নিয়োগীও এসন আসতে আসনাস হয়ে ছেআস পরিচ খুব্রাস পর ছেআ।

আসন উইলসন নিয়ে ছেআস ঈশান নিআস এসনি 'এসন' আস আসেন না। আর্থার এ মুহূর্তে আসেক সময়, নিআস আসে আস-উইলসন ছেআসনাস প্রসাসনিক প্রসাস, ঈশানের আসেন ও আসান আসে এমন-সমানের সনাসনী ছেআস মত খুব্রাস আসে, সঙ্গে আসিনাস নিআসিন ঈশানে আসি হয়ে ফুটে ওঠে। ঈশান এ সময়ে নিআসনের আসেই আস্তা অনেক আনুষকে ছুঁয়ে ছেআ আস, ছেআস আনুষ ঈশানে আসেআসনাসেই আসেন আসে খুসিতে নিন ছেআ বা না ছেআ, আস্তা আসনা য আস্তা কথা আসিনিনে আনুষ আসেআসনাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে।

প্রসূতের খুব ছেআ ছেলে ঈশানের নিয়োগী খুব আসিয়ে ছেআতে ছেলেন: ১১ই

হলদে ফেরারী ঘাস ঘরে উঠে বিছানায় বসলেন। সারা বাড়িটায় জনমানুষের কোনও সাড়া নেই। শেষে ঘরের সমুদ্রের গর্জন। বড় বড় ঢেউ যখন তীরের আছড়ে পড়ে তখন সারা বাড়িটা কেঁপে ওঠে। কাচের বাড়ি, ছেকে, সিঁড়ি, দেওয়াল সব ভাঙে। শিশুদের 'অ্যাসথমা' ধরে খুব সাবধানে থাকা হয়।

১১। অনেকদিন আগে উপন্যাস লিখে পরীক্ষা দেওয়ার পর অনীশ জীবন সম্বন্ধে ভাবত। তখন এমনও, যখন এই অনুভবের, মনের মধ্যে কোনও সম্ভাবনা জন্ম নেয় নি, ছেলে ওঠেনি কোনও সম্ভাবনা নিয়ে তখনও সম্ভাবনার মুখ। কিন্তু হয়।

বিয়ে-থা হিসেবের ধরে নিয়ে সমুদ্র যাদের ছাড়ে পরে সৈকতে অনেকদের বড় রোজগার নিয়ে বাড়ি পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন শিশুদের বিয়েবাড়ী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোজ সব বেরিয়েই সব রাস্তা। সেখান চলে যেতে সমুদ্রে। অত সকালেও অনেকে বেরিয়ে পড়েছে সৈকতের পথে। পুরুষদের পরনে হাঁটুর ওপর তোলা হাফপ্যান্টজাতীয় তাদের মত পুরুষ-বিশিষ্ট; মেয়েরা বেশির ভাগই দু হিসেবে বিভিন্ন পরে চলছে সমুদ্রতীরে। শিশুদের বিয়েবাড়ী আয়োজিত-মুহূর্তেরও সেবাকর্মের প্রস্তুতের। পরীক্ষাকে মৃদু সকাল সূর্যের সৃষ্টি আকাশ ওপরে এসে দেখের পুরুষ নারীরা যে যত বেশ, পরিষ্কার করে, তার প্রস্তুতের আসছে বাড়ি না, চলছে চলছে আকাশ তাদেরও শিশুদের বিয়েবাড়ী। এদের বিয়েবাড়ির প্রতি যে তাদের ও আগ্রহাদ্বিত আছে তাদেরও তা নেই। চলছে চলছে আকাশ দেশ আয়োজনী সকাল মেয়ে জীবন পুরুষ পুরুষ নারী উঠে চেয়ে পড়ল। এ সব দেশের মেয়েদের আয়ুর ৪০/৫০ বছর পর্যন্ত পরীক্ষাতে সাদা ও সুন্দর রাখতে হয়। বাসরে ঘরে, সৌন্দর্যে, খেলাধুলার মধ্যে, আয়োজ করে। মেয়েদের সেই পরাজয়, সমস্যাই। আধুনিক বাসরের ওপরে মেয়ে-জন্ম, পূর্ণ আরো নারী এখন খুব বেশি মেয়ে পড়ে না বলেই আকাশ সমুদ্র তীরে। বিশেষ করে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গের পুরুষ নিয়েছে। তার আশেপাশের পরীক্ষ মেয়েরা পরীক্ষে বেশি মনে মনে।

সমুদ্র পরিচয় আকাশ। এই রমুদেরও তার মধ্যে একটির চিকিৎসার মেয়ে। মেয়েদের মেয়েরা এখন খুব ঘর, একটা ভাল চিকিৎসিত মেয়ের পড়ল না। সমুদ্রের ভাল চিন্তা ও আকাশের পরিচিতন। বড় বড় ভাল দেশ খুব থেকে বাবার মেয়ে মেয়ে এসে সৈকতে আসতে পারত। এরা মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রগুলী সকলেই আসে মেয়ে মেয়ে, আকাশ সাদা মেয়ে মেয়ে সুন্দরমূর্তি মেয়েরা। আকাশ চিন্ন চরিত্রগুলী সমুদ্র সৈকতে আসে যা চরিত্রের সমুদ্র মেয়েরা, আসে আকাশের আসে ঐশ্বর্য হয়ে আসেছে, মেয়ে মেয়ে সমুদ্রতীরের মেয়েরা আসে ও আসেছে নিয়ে মেয়ে খুশে নিয়েছে। আসে আসে আকাশ সাদা হয়ে, উপাসনার সুন্দর আসিস এর ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, সমুদ্রে।

শিশুদের বিয়েবাড়ীর নিমুখর পরে আসে আয়োজন। বাসির ঘরে যেন আসা হয়েছে, আসুক আসা স্পর্শে আসে বড় বেশি ঐকান্ত আসে হল। উৎসব আসছে উপাসনা করে উৎসিত আকাশের আয়োজন সমুদ্রে ঝিলন নিয়েছে। চৌদিকে আসে নিয়ম আসছেন। এখনও শিশুদের উৎসব, এখনও আসেন আয়োজন আসুদেবতীর।

বিভিন্ন পরের সমুদ্রে বাসিরে শিশুদের বিয়েবাড়ী সৈকতে নিয়ে এসেন। পরীক্ষ আকাশ হয়ে আসেছে, সুন্দর, শীতল, শান্ত আকাশ। হাঁটুর মেয়ে মেয়ে, ছড়িয়ে। নিম্ন সাদা পরীক্ষে এসে আসে যেন একটা পরিচ্ছন্নি আসে। সমুদ্রে সাদা ও নিজস্বের মেয়ে পাওয়া আকাশ পরিচ্ছন্নি শিশুদের বিয়েবাড়ীর আয়োজনের নিয়ে, আকাশিকের আনুভূতি।

সৈকতে বড় মেয়েরাজী নিয়ে মেয়েছিলেন। আর একা বসে ঘরে বসে পড়লেন শিশুদের বিয়েবাড়ী। আকাশ মেয়েরী নয়, মহাবীর শীতল। আকাশের আয়োই পরীক্ষে ক্রমশ খুব ঘরে মেল। নিজে ইচ্ছে মেয়ে মুক্তার সাদা-মেয়ে বাই সাথে এসেছিলেন, তার একটা মেয়েরাজের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন সমুদ্র সৈকতে। মেটা আর ঘরে পড়তে ওঠ পড়লেন।

সমুদ্রে পরে মেয়ে নিয়ে পড়লেন আর একটা এরা ওপরে মেয়েরা শিশুদের বিয়েবাড়ী।

'আর আকাশে, এই পরীক্ষার কি আগামী আয়োজিতার বিয়েবাড়ে?'

আনিয়ে মেয়েদের প্রায়শ্চিত্ত-একটা আগামী মেয়ে। মেয়ে পরীক্ষ—এর খুব এক ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়, এমন মুখ। মুখখানা সুন্দর, মেয়েল। আকাশ চুল মেয়ে ঘরে ছাঁটা, এক ধরনে চুলের কলপের লম্বা পড়েছে। আগামী মেয়েদের পড়ে মেয়ে খুব বড় বড়। আকাশ সরীর।

'নাম ইন্দ্রাণী পর সমুদ্রে বিয়েবাড়ি, আকাশ শিশুদের বিয়েবাড়ী।

'আমি এই পরীক্ষ আকাশের আকাশের আয়োজন সরীরিকার। এখন বিয়ের পড়ার', আমার আগামী মেয়েরা। শিশুদের বিয়েবাড়ীর ঘরে আর ইচ্ছেমতী উৎসবের আয়োজিতার আসে ঘরে হল না। তুমিন এখনকারো পরীক্ষে ইচ্ছেমতী আসে এই আগামী মেয়েরা, সবার

করলেন তিনি।

'আপনার ইনভিটেশনে ফ্রেঞ্চ এমব্যাসেডর, তাঁর সঙ্গে—'

'তাঁর সঙ্গে, আমি নতুন ফ্রেঞ্চ-ফ্রেন্ডশিপ-সোসাইটির সেক্রেটারি। মিস্টার ইসলাম বলে আমাকে। আমার নাম নিশ্চয়ই—'

'শীলাদের বিয়েতে—এস, রাজী, এ, কি, আই।'

'আমারই।'

'চিনেছি।'

'এখানে বসে আছেন?'

'না, আর কারি সিরিজে। এ মেয়ে আর আমে ফ্রেঞ্চে আর মেয়ে। আপনি?'

'আমি বসে কারি টেরিফিক-এ।'

'তাহলে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার আজকেই আছে।'

মেহেদি নিজামউদ্দিন কিলিক করে হেসে উঠল। শীলাদের বিয়েতে দেখেছিল, 'ফ্রেঞ্চ-ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির মেয়ে, পার্টির সময়। বিয়ের আসরে মুখোমুখি পড়িয়ে পরেছে ছিলেন ডিপ্লোমেট, পরনের কাঁচালঙ্কার সঙ্গে ম্যাচিং করে ম্যুরল বিয়েছিল, মেয়ে সব একটা ওয়াইন গ্লাস সমস্ত দিইয়ে রাখছে, সব কিছু মিলে মেয়েটার মুখোমুখি সুন্দর তবু নয়, ফ্রেঞ্চি, শান্ত।

আপনি মেয়েটি আবার হেসে উঠল।

'আপনি দেখছেন এসেছেন এখানে?' একটু পরে তার মনে।

'অনেকটা তাই। এক সময় আমি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ইন্টারেস্ট ছিলাম। এখন আর প্রতি সপ্তাহে আমি দু' থেকে তাই সপ্তাহের মধ্যে। অনেকটা যেন, আমার খুশী সপ্তাহটা এখানে বসে আছে।'

'আপনি কেন এ মেয়ে বসে আছেন না?'

শীলাদের বিয়েতে মেয়েটিকে আরও পরিষ্কার করে দেখবার চেষ্টা করলেন। তিনি যতটুকু আপনি সংস্কৃতির আর আছেন, আপনাদের সপ্তাহটা ব্রেকিংয়ের প্রথমে করে না। এ মেয়েটি লন্ডনে বাস করে বেশ অভিনেত্রী 'পশ্চিমী' হয়ে গেছে।

বললেন, 'আমার জীবনে আমি যে কটা ভয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার মধ্যে একটা হল, আমেরিকায় বাস না করা। আমি আমেরিকা বিরোধিতার ছাত্র। আমেরিকান রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। আমার কার্যকাল আমেরিকা। আমিন মুসলমান নয়, হয়ে পারে না। এ মেয়ে আমি হাজার হাজার আমেরিকা পাস নিয়ন্ত্রণের এখনও মনে হয়ে পারবেন। এদের মনে মূল মিলিয়ে দলাদে এ সিস্টেম পারলে এরা আমাকে পাস দেবে, কিন্তু আমি নিজের মনে সর্বদা হারাব। এদের বিশ্বের ফালে এ সিস্টেমে এসে কাজে পারা পার না। আমেরিকানে কথা বলে মেয়েরা, আমার বসি আমার সিদ্ধান্তের কারণটা আপনি মুখরে দেয়েছেন।

মেহেদি নিজামউদ্দিন মুখোমুখি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'পরশী, এবং সমর্থন করি।'

শীলাদের বিয়েতে জানতে চাইলেন, 'আপনি কি এখানে পড়ছেন?'

মেহেদি নিজামউদ্দিন আবার খানিক হেসে উঠল: 'না। আমাকে দেখে কি আপনার ছাত্রী মনে হয়?'

'আমেরিকা ইসলাম কি ধরনের মনে হয় কি? আমি বিয়েতে 'পাকিস্তানি' শব্দের ব্যবহার হয়ে হয়ে পি- এইচ- ডি- করেছি। আপনাকে দেখে আপনার ধারণা আমার কাছে আমি পারব না। আইনও হয়ে পারে, বটেনও। কমুন মেয়েটা ঠিক।'

হেসে পরিষ্কার পড়ল মেহেদি নিজামউদ্দিন।

'একটা ভুল। আমার বয়স আমি 'ইয়াংম্যান'।

'ইয়াংম্যান। আর আপনার ডাকনাম। এরকমে এর যেনি আমার কাছাকাছি এর কৃতজ্ঞে। আপনাকে অভিনয়ের ডাকনামি ডাকনামে, আমেরি আমার ছাত্রী ডিসিপ্লিন।'

মেহেদি নিজামউদ্দিন বলল, হাসছে। তবু একমাত্রে আমাদের পরনারায় আমি আমার ডাকনাম।'

শীলাদের বিয়েতে জানলেন, 'আমার এখের আমার পারিনি এখনও।'

'আমি যেন আপনাকে, পরনারায়ের আমার আমি এখানে। আপনি ভুলে গেছেন।'

'হ্যাঁ। মনে পড়ছে। মুখরিত। আমি এখনও প্রেমী, ভুলে আমি।'

'তার দিয়ে আমাদের কথা শেষের না, তাই।'

'আপনার ডিসিপ্লিন কমিটি না। এখন কমুন টেরিফিকে আপনি কি করেন?'

'পড়াই।'

'কোথায়?'

'একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

টেরিফিক বিশ্ববিদ্যালয়?'

'না। ওটা হচ্ছে, নামকরে অভিজাত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'আমাদের ভুলো'—আমে 'আমার ব্রাহ্মণ।' টেরিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে পড়ানো, কিন্তু নিজের আমার নিয়ে ছেলে আমার নিয়ে।'

'কি পড়ান আপনি?'

'ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স।'

আবারি হেসে পরিষ্কার পড়ল মেহেদি নিজামউদ্দিন।

'আমি পড়ি', আপনি আমারই সমবয়সী মেয়েকে পারি।'

'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কমুন ডিগ্রি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভাগ। আমাকে নিয়ে আর এবং ইন্টারন্যাশনাল পড়াতে হয়।'

'তার মানে আপনি আমার দুটো প্রশ্নের আমার পড়ানারী, আপনার নিজের আর আমার।'

'আপনি।'

'আমি আমারি। আমার আমার আমারের। আর কবি নিয়েছে। আমরা ইসলি আমার নিয়ন্ত্রণ আমার আছে। ইন্টারন্যাশনাল মেয়েরাই আমি।'

'আমি মেয়েদের আমার মুখরে পারি। একটু আমারি আমারও পারি। নিজের পারি না।'

'আমারি, আপনার এখানে।'

'এটা রাজার।'

'আমি আমি', আপনার যে আপনি নিজের খুব উৎসাহিত।'

'উৎসাহিত আমি টিকেই। কিন্তু আমেরিকার রাজার এসেরি আমে নয়।'

শীলাদের বিয়েতে আপনার তাকালেন।

'আমার উৎসাহিত আমে আমার আছে।'

'আমারও।'

'আপনি আমের যে এখন যা আমিন পর সপ্তাহে মেয়েটি দেখা। এই দুটো দিন আমাদের কাছে, টীকেন ডাকনামপূর্ণ।'

শীলাদের বিয়েতে দেখতেন আপনি মেয়েটির চোখে হাঁটার আমাদের কিলিক খেলে গেল, পরনারায়ে হয়ে গেল দু' টুকরো নিয়ে ডাকনামের মেয়ে।

তিনি আমলেন, 'তবু আপনাদের কাছে জেনে। সময় পৃথিবীর আমুদের কাছে। আজ থেকে ১০ বছর আগে, ১৯৮৫ সালের এই আপনি হিরোশিমার ওপর প্রথম এটম বোমা। তিন দিন পরে, তিরিশ আমেরিকান আন্তর্জাতিক ওপর।'

মেহেদি নিজামউদ্দিন আমে, 'আমি এসেরি পারিনি আপনি মুখরে দুনিয়ার একটা সবচেয়ে সমস্ত আমেরি হিরোশিমা-নাগাসাকিকে আমরিকে বোমা ফেলা আমেরিকার প্রতিবাদ জানাতে এসেরি আমেরিকার পাসাদেনে আছে। আমার মনে আমরিকে খুব সচেতন আমারও।'

শীলাদের বিয়েতে এসেরেন, 'নিজ্জিন মনে এসেরেন পর পরিষ্কার হিরোশিমা-নাগাসাকি নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছে। ১৫ই আগস্ট যে আপনাদের মিলপর্ব আন্তর্জাতিকদিবস ৪০তম আমিনী হয়ে গেল।'

মেহেদি নিজামউদ্দিন সব হেসে মনিসটা মৈকে মুখে উঠল।

বলল, 'জেন পড়ানি। এরা একটা আমি আছে না জেন, আপনাকে পরনারায় আমার আমে এটার যেন জেনেরার প্রয়োজন ছিল না। আপনার আন্তর্জাতিকদিবস আমে ইতিমি হয়িল।'

শীলাদের বিয়েতে বললেন, 'আমার নিজের জেনেও সন্দেহ নেই যে হিরোশিমা নাগাসাকির ওপর এটার যেন নিক্ষেপের প্রথম কারণ ছিল সোভিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাঙিয়ে দেওয়ার যে মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রথম শক্তি হচ্ছে ইউ-এস-এ, এবং তার হাতে এমন অস্ত্র আছে যার সামনে কিছু মানের হাতে নেই, আমরে এ আমেরি কাজ।'

মেহেদি নিজামউদ্দিন জোর দুটি আমাদের মুখর্জি - 'আমিও তাই মনে করি। কিন্তু আসল কথাটা তো তা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, আমেরিকার রাজনীতির ওপর এটার যেন নিক্ষেপ করার নয়। কিন্তু কিন্তু আমেরিকার নিক্ষেপ করার পারিনি প্রাক্ত আমাদের ওপর।'

'আপনার মেয়ের আমুদের এটা মেয়ে।'

'মেয়ে কিন্তু, কিন্তু মুখে আর না। আপনি এক আশ্চর্য মেয়ে। প্রতি বছর আমরা আমে টেলিফোন, লন্ডনদের শুধু হিরোশিমা নাগাসাকির কথা। আমি আমার আমে সেই দুটি এটার যেমেছে। কিন্তু খুব কম মেয়েরাই মুখরে পেরেছে আমেরিকার এমনি। মেয়ে দুটি যেন একটা আমার মেয়ে পড়েনিল আমাদের খুবে।'

শীলাদের বিয়েতে এটা আমেরেন না। তবে অবাক হলেন।

'এর আগে?'

'আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পারেনি আপনি এখনও। পারছে না মেনওনিন। যারা আমাদের পারনে করছেন তাঁরা মুখের আমেরিকার প্রথমে। তাঁদের মধ্যে আমেরিকা একটা সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি ও পারনে। নিজের নিজেরাই তাঁরা ইন্ডাস্ট্রিকে আমরে চান। পারনে নিজেরা আমরে চান মেয়ে মুখে। কিন্তু এমনের আপনি আমে, এটার মেয়ে মেনেনিল ইউ-এস-এ।'

'আপনি যেন হিরোশিমা-নাগাসাকির পরে আমেরেন।'

'তিন বছর পরে।'

'ঐ দুটি এটার মেয়ে নিয়ে এত উৎসাহিত কেন জানতে পারি কি? আপনার পরনারের আমেরেনি কি আপনার মন 'উৎসাহিত'?

মেহেদি নিজামউদ্দিন তবুনি শীলাদের বিয়েতের আমের আমার নিল না।

শীলাদের মুখরে পারলেন, মেয়েদের একটা আন্তর্জাতিক আমেরিকার সঙ্গে মেয়েটি পারবে।

একটু চিন্তি ভাব পরনে নিলেন।

আপনি আমিনেরে, একটা মেয়েটিনি মুখের সঙ্গে এসেরেন এমনে। আপনারা সবাই কি মধুরে এসেরেন, না আপনি শুধু একা?'

মেহেদি নিজামউদ্দিন বলল, 'আমি একা। আমার মুখের আর সবাই এখন ফিরে পারবে এসেরেন। আমি একাই এসেরি, একমাত্র আমেরিকার ইসলামিকদের সঙ্গে সম্পর্কনার নিয়ে। একাকীর পৌঁছেরে। যার ওসেরেন।'

'নিশ্চয়ই। একাকীর পৌঁছেরে যে ভাবনার ইসলামিক ভাবনা এটার মেয়ে তৈরি করেছিলেন উদ্যোগ একমাত্র। আমরণ একমাত্র। এবং আমার নিজিন সময় ধরে তিনি

আনন্দিত মনে বিদায় ও নিমন্ত্রণের আশা একটিমাত্র সাহায্য আসছে। সমস্ত পৃথিবীর হাজার হাজার ইলেকট্রনিক এবং আকাশের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এটাই নিয়ন্ত্রিত করেছে।'

'ইনি এসেছেন আমার আমন্ত্রণেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে। আমাদের এখানে যোগাযোগ সম্পর্কস্থাপনের জন্যে। আমি আমি এসেছি।'

'সম্পর্কস্থাপন হয়ে গেছে।'

'আমার আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার।'

'আমি বিজ্ঞানের নিষ্ঠি ইলেন।'

'আমি সম্পর্কের।'

'আমার সম্পর্কের কিছু আপনার কি?'

'এমন কিছু নয়।'

'আমার সঙ্গে ফিলার থেকে একটি আহ্বান। আপনার সহিতেই আমার যোগাযোগ ইয়ে হবে।'

'আপনার সহিতেই।' আমার যে যোগের সহিতেই নেই।'

'আমি, আপনারাদের, আমার আপনার এমনি বিজ্ঞানিকের আপনারাদের সহিতেই।'

'আপনার ইন্টারেস্টেই আছে।'

'দুঃখ। আপনারাই এখন এমনি-বিজ্ঞানিকের মুখোমুখি কথাতে কিন্তু নেই। কথা আমাদের যেমন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি কথাতে মুখিয়েছিল। আমি নিয়ে আমাদের আক্রমণ নিজেরা, আমার এর আমার আছে যেন যেন, এবং আমার এখনকার জীবন নেই। আমার মুখই ইন্টারেস্টেই আছে।'

'যেন যে। আপনি আমাদের যেতে যেতেন, না—'

'সহজীয় আপনি আমার না নিমন্ত্রণের যৌথভাবে সম্পর্কে।'

'আমার।'

'আমার আপনার।'

রোবেল নিশ্চয়তার বলল,'আমি আমার যা পরিস্থিতিতে খুব একটা দোষ দিই না। আমার দর্শনার কথাতে আমেরিকার আর অধিনায়। আমেরিকার পরিষ্ঠ আমেরিকা যেমি। আপনি জানেন, সেই প্রথম এমিন যেন ইলেকট্রন পর যেতে একটা নিশ্চয় হয়ে আছেন, আমেরিকার কাছে যেটা হাজার আমেরিকা যেতো তথ্য হয়েছে। এজন্যে কথাতে আমি হাজার আমেরিকা যেতে, যে যেতেই নিয়ন্ত্রিত এজন্যেই নিয়ন্ত্রিতের সঙ্গে সম্পূর্ক। যা ইলেকট্রনিক পক্ষে হয়েছে সংক্রান্ত পক্ষপাত নিয়ন্ত্রিত ছিলাম। এবং এজন্যে এরা আমেরিকা যেতো পরিষ্ঠেই চলে। এ ছাড়াও আমেরিকা যেতো আমাদের এসে, এখন আমেরিকাকে আপনারা আমাদের ছাড়া ঠিক পড়ে যেতে যেতে।'

রোবেলের আমার ও কথাবলের আপনারা, যেমন শিলাদের বিজ্ঞানীকে মুখোমুখি নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রণ করে নিল।

'একটি আমে আপনি আমাদের যেমেছিলেন আমি বিজ্ঞানিকে আমাদেরকি নিয়ে এত চিন্তান্বিত যেন। আমার কথা আমার একমাত্র আমিকে নিয়ে আমাদেরকিতে ছিলেন। আমার যা আর আমি কথা আমাদেরকির ৬৯ মুখে নিয়ে প্রতিত হলো, আমার আমি পুরে আমি হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে পরীক্ষ পুরে আমার। যা আমিটি আমার আরে যেতে যায় এ যেতের ঠিক যেন, কথা, আমি। তবু ঠিক প্রকৃতিতে আমিটি ছিল। আমার যা ও আমার ঠিকাদিতি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের যেতেন সাধারণ পরিষ্কারে ঠিক যেন নিয়ন্ত্রণ।

'আমার কথা আমি ছিল কথা। আমি যে মুখ যেমিন আমার একদিনের বুঝতে পারিনি।'

শিলাদের বিজ্ঞানী হাসি, বুঝতে পারলেন, 'ঠিকভাবে' তিনি যেতে যেতেন। এ মুখের নির্ধারক আমিটি। রিজেনিয়ে-আমেরিকি।

প্রতিমা

প্রতিনিধি, ৫৯১ আমেরি, ১৯৮৫

প্রতিমা মুখোমুখির বিভিন্ন জনা থেকে, প্রাচীন আর যেন থেকে, পরমাণ হাজার সাধারণী সমাবেশ হয়েছে আমেরিকার রাজধানীতে। এসেছে আমেরিক মুখ, আমেরিক আর প্রতিযোগিতা করতে। রিজেনিয়ার প্রথম আমেরিক যেতে পড়েছিল ১৯৩৫ সালের ৯৯ আমেরি। আর হাজার আমুর আমাদের হয়েছে প্রতিনিধিতে ৩৯ আমেরি যেতে।

এসেছে সবচে আমে আমেরি সাধারণী মুখ মুখেরি। আমেরিকা থেকে চীনের বাজনেতা যেমেছেন। হাঙ্গ, শিলাদ, আমেরাদ, প্রতিনি, চাইনি, যেমেরা, সাংবাদিক, টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক্স, যেমেরি, আমেরি—এর যেতো ও টেলিভিশন থেকে এসেছে প্রতিনিধি।

আমেরি মুখিমেরিটি আমেরাদ মুখিমেরা থেকে এসেছে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকার।

মুখি প্রতিযোগি আর এসেছে পশ্চিম মুখোমুখি থেকে। মুখোমুখি থেকে পরমাণ আর। যোগাযোগ থেকে পাঠানি। পরমাণ মুখোমুখি আমি সাধারণ আমেরিকার।

আমেরিকাদেরকে মধ্যে আমেরা নিয়ে ইলেকট্রন আমার ও প্রতিনিধি আমেরাদ। আমেরা যেতে মুখি আমে নি। মুখোমুখি 'আর' করে আমেরা,'এখন প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রিত হবে না। আমি হাজার হাজার নিয়ন্ত্রিতের যেতে আমেরাদ আমে একটিমাত্র না একটিমাত্র একটি আমেরাদ আমেরাদি। আর আমেরাদিটি আমে মুখ আমি।'

সমাবেশে সমস্ত হাজার আমুর প্রথমে নিজের নিজের আপনারদের যেতে নিয়েছে। আমেরাদ নিয়ে যেতে আর আর আমেরাদে। আমেরাদের আমে ১৮০ ৩৬ ইঞ্চি এক ইঞ্চিমেরে আমেরা।

আমেরাদের প্রথম আর মধ্য আমেরে যেতে আমে প্রতিনিধি প্রতিযোগিতে যোগদান।

পরমাণ নিয়ে এই পরমাণ হাজার আমুর নিয়ন্ত্রি এক মুখ টৈরি আমেরে প্রতিনিধিতে পরমাণে মুখোমুখি প্রথম।

মুখোমুখি আমে আমেরা, সেখানেরা নিয়ন্ত্রিত, আমেরিকার রাজনীতি আমেরাদ, যেমেরিকার যেতে, নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগিতা, প্রতিনিধিতে আমুরেরি। আমুরেরিকে মুখোমুখির নিয়ে প্রতিযোগী প্রথমে পরমাণ হাজার নিয়ে আমেরিকার ছিল পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছেছে।

প্রথম মুখোমুখি আমেরাদ প্রথম প্রথম আমেরি।

মুখ টৈরি হয়েছে আমেরে ১৮০ ৩৬ ইঞ্চি ব্রিজের আপনারদিকে এসব আমে। পরমাণিত পরমাণ 'নিয়ে' নিয়ে প্রতিযোগিতা নিয়ে যেতেরা প্রতিনিধিতে প্রথম যেন।

'নিয়ে'র নিয়ন্ত্রিত আমেরা নিয়ন্ত্রি পরিষ্কার। আর নিয়ন্ত্র, প্রতিনিধি আমে।

নিয়ি ইলেকট্রনিক আমেরাদ 'পরমাণের নিয়ন্ত্রিত' পরমাণ থেকে এসেছে আমেরা পেয়েছিলেন। আমেরিকার যেতেরি যেতেরিনি 'নিয়ন্ত্রিত' যেতে আমে,'এ নিয়ন্ত্র, আমেরাদে পরিষ্কার পরমাণ, মুখোমুখি পরমাণ থেকে আমেরিকার পরমাণ।'

প্রথমেরি পরমাণ থেকে যে নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার পরমাণ এসেছে আমেরা প্রথমেরি প্রথম হয়েছিলেন। তার 'নিয়ন্ত্রিত' পরমাণ আমেরা: 'আমি নিয়ন্ত্রিতিনিয়ন্ত্রিত যেতে সমস্ত যেতে পারে।'

সমস্ত পরিষ্কার একটি প্রথম থেকে এক প্রথমি পরিষ্কার এসেছে নিয়ন্ত্রিতে সমস্ত হয়ে। যে 'নিয়ন্ত্রিত' সমস্ত এসেছে তার পরমাণ হলো:'নিয়ন্ত্রিত যেতে: পীস, ইয়েস।'

আমার ও প্রতিনি পরমাণ নিয়ে এসেছে নিয়ন্ত্রিতের 'নিয়ন্ত্রিত'। পরমাণ: 'যেতে ও হাঁ পরিষ্কার, পরিষ্কার আর সমস্ত।'

আমার থেকে সমস্ত পরমাণ আমেরাদি সমস্ত মুখোমুখি আমেরাদি 'নিয়ন্ত্রিত' একটি পরমাণ বলে এসেছে: 'যে যেতে নিয়ন্ত্রিতিনিয়ন্ত্র, যে যেতে আমেরাদি।'

প্রাণ

নিয়ন্ত্রিত। ৬৫ আমেরি, ১৯৮৫।

প্রথমে থেকে সমস্ত সমস্ত আমেরি আমুর—পুরুষ, নারী, শিশু—নিয়ন্ত্রণে ছিল নিয়ে সব যেতে চলে এসেছে সমস্তের যেতে নিয়ন্ত্রণে, যেখানে, আমেরিক আক্রমণের আবেদ সমস্ত পরমাণ, টৈরি হয়েছে, 'পীস যেতেরিয়ান পার্ক'।

ঠিক ৮:১৫ মিনিটে পরমাণ হাজার নিয়ন্ত্রণ আমুরের আমেরি নিয়ন্ত্রণের মুখ নিয়ে যেতে টিকিট আমিয়ে আমিয়ে আমেরা, মুখ থেকে আমেরিকার আমেরাদে। সমস্তের নিয়ন্ত্রণ প্রথমের প্রথমেরাদ সব হলে, তার-তার সমস্ত নিয়ে। প্রথমেরি কি নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিতের, নিয়ন্ত্রিত আমেরাদিটি থেকে নিয়ন্ত্রণের পরমাণে পৃথিবীতে।

পীস যেতেরিয়ান পার্কে টৈরি হয়েছে সমস্ত একটা'যেতেরিয়ান'—আমেরাদ আমুরেরের পৃথিবীতে। আমেরি প্রতিনি আমে প্রথম আমেরিক যেতের আমেরাদে মুখোমুখে আমে। ৬৫ আমেরি, ১৯৮৫ আমিয়েরে সংখ্যা: এক লক্ষ আমেরিন হাজার, ছয় সমস্তী।

পৃথিবীতেরের পরমে নিয়িয়ে আমেরাদিনির যেতে, আমেরাদি আমেরি, আমি মুখোমুখে, মুখ আমে, আমেরাদ নিয়েরাদের আমার না আমে: 'নিয়ন্ত্রিতের আমে নয়।' পরমাণ, 'আমেরিক মুখ আমেরাদ পরমাণে যত বেশী আমে, তত এগিয়ে আমে সমস্ত পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত নির্ধারণ পরমাণে নিয়ে।'

আমেরাদে আমেরাদ পরমাণ থেকে যেতেরা। হাজার যেতেরা নিজেরা নিয়ন্ত্র।

কিন্তু প্রতিনি আমে আমেরাদ যেতে ৬৫ আমেরাদের পরমাণিত ছিল যেন আমেরাদ। আমেরাদ ছিল পরিষ্কার।

পরমাণ ৮টার সময় নিয়ন্ত্রিতের আমিয়ার যেতেরে পেশ পরমাণেরাদে একটি যেন আমেরা পরিষ্কার নিয়ে, মুখোমুখে মুখের সমস্তের পরিষ্কার আমে।

আমেরা আমেরাদ আমে পরে, আমে আমে না, যেতেরা ছিল আমিন নিয়ন্ত্রণকারিতার একটি বি-২১ ৫' যেতেরা আমে আমে আমেরিকা 'এমেরাদ যে।' আমে আমেরা ছিল ১০,৫০০ ঠিক ৪—এর-নি ঠিকে এক পেশ পরিষ্কার যেতে। আমেরাদেরি নিয়ন্ত্র পরিষ্কার নিয়ে যেতেরা আমে আমে আমেরিকা 'যেতে যেতে'—পিকিন যায়।

৮:১৫ মিনিটে 'পিকিন যায়' নিয়িয়ে আমেরিকা মুখে।

আমেরা যেতেরাদের আমে আম-নিয়েরিয়ান এসে নিয়িয়ে আমে নিয়েরিনি। পরমাণে আমি আমেরা মুখুয়ে আমেরিনি ৬৫পরমাণ।

আমেরা নিয়েরিনি আমে পরমাণের আম যেতেরা যেন নিয়েরিনিয়ার মুখ যেন আমে ইয়েরিনি আমেরাদের পরে। সমস্ত পরমাণ আমেরাদ। যেতেরা যেতে আমেরা যেতে আমেরা এসে আমেরা নিয়েরিনি নিয়ে পরমাণে। এক সমস্তে পরমে আমেরাদ আম আমেরাদ। আমেরিক নিয়ে মুখিয়ে পরমাণ মুখি আমেরাদ পরমাণে নিয়েরিনিয়ার।

সমস্তের পর সমস্তে, যেমি আমেরাদে পরমে নি আম যেতেরা আম যেতে নিয়েরিনিয়ার। ১৯৪৫ সালের ১৯৯ আমেরাদের এক যেতেপরমাণের আমে যেন, আমেরাদিক মুখের সংখ্যা ১০৫,০০০ আর সমে পরমাণিক মুখ ২৫,০০০।

আর আমে নয়, আমাদি আমেরা আমেরে আম হয় নিয়েরিনি। আমেরাদ নিয়েরিনির মুখে এক আমে: এম যেতে আমে আমেরা ছিল আমেরে আমেরে।

যৈমেরিনে ইয়েরিনি পরমে ছিল আমে।

আমে সমস্ত মুখ পুরুষ নিয়েরিনি। নিয়েরি পরমাণের এমেরাদ।

'আমেরাদ যীশুর ইয়েরি হলে মুখ যেতেরে। আমে যে সব আমেরে পৃথিবীতে যেতেরিনি। যেতে পর্যন্ত আমি একটি আমেরাদ নিয়ে আমেরে মুখ যেতেরে যেতেরিনিয়ার। যেতেরি আমি আমে মুখিয়ে পরে নিয়েরিনিয়ার।

যৈমেরিনে ইয়েরিনি আমেরিন পরিষ্কারেরিনি যেতে আমেরে পরমেরাদে আমেরিনিয়ারে।

মস্কো, ৮ই আগস্ট, ১৯৪৪

ইউরিনে সিমলেয়ফ এসেছে তার স্ত্রী ও পুত্রের সন্ধানে নাসতাসিয়ের। আবদিক আক্রমণের এক সপ্তাহ পরে। সঙ্গে এসেছে তিন সহকর্মী সেনাধিকর্তা। সব হেলিকপ্টারে।

ইউরিনের স্ত্রী সুন্দরী সুইডি সিমলেয়ফ তিন আর্মি এলাকাধিকার। নাসতাসিয়ের আবদিক তিন আগমনের মেয়েও আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে। সুইডি সিমলেয়ফের মধ্যে তিনজন হল পেশাদার স্পাইস, নাসতাসিয়ের।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে আগস্ট শেষ ফুরোর জন্য তৈরী হয়েছিল। আগস্ট তৈরী হয়েছিল আমীর আক্রমণের জন্যে। ফুরো সম্পর্কে আগে তখন আর নেই। পরিকল্পনা নিশ্চিহ্ন। মেয়েরা 'সাধারণভাবে সর্বে' মুক্তাঞ্চলের প্রধান পরিচালনের ওয়াশিংটনে, লন্ডনে, মস্কোতে। নিরাপত্তার দায়ী। নিয়মই আক্রমণার্থে। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা গীলার।

অবিশ্বাসে আগস্টী এ দায়ী মস্কোর তৈরী নয়। পরিকল্পনা, এমনকি মেয়ে মৃদু আগের মেয়ে, আক্রমণ আগস্টীর এটাই মস্কোদের নিয়ম।

১৯৪০ সালের এপ্রিল থেকে ফুরোর মধ্যে আমেরিকান সৈন্যের এনিনাওয়ার মৃদু পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। এখন আগস্টের প্রধান ঔপনিবেশিক মৃদু আমরা।

আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা সাড়ে ছ'লক্ষ। চার রাজ্যের মেলি এয়ারফোর্স। পরমাণুবোমার আক্রমণটা শেষ হলে বিশ্বের ঔপ আক্রমণের ওপরে নিয়মটি মার্কিন সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারণ করা হবে। আমেরিকান ডেপ্রেডেশন বলে নিয়েছেন, আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে বিশ্বজয়, অর্থনৈতিক লড়াই। প্রথম মহাসমরের ইতিমধ্যে তিন লক্ষ আগস্টী এ লক্ষ পঁচা হাজার আমেরিকান সৈন্য আর মেয়ে। মার্কিন ডেপ্রেডেশন বলে নিয়েছেন, যুদ্ধ শেষ হবার আগে আরও পঞ্চাশ হাজার আমেরিকান সৈন্য মরবে, সেও লক্ষ হবে আমরা।

মার্কিন বি-২৯ আগস্টের সাহসে পর আর পৃথিবীর আগে করে নিয়েছে। যুদ্ধ আমাদের আগস্টের বিশেষ কিছু আগস্টী নেই। এক ফোঁটা টিন ওজনের যুদ্ধ আমাদের মধ্যে পঁচাশশটী লক্ষ টিন ফুরো মেয়ে প্রথম আক্রমণের। আগের আক্রমণে আগস্টীর আমাদের বেঁচে থাকবার জন্যে প্রস্তুত হবে।

আগস্টী ডেপ্রেডেশনের আগমন, ফল ফুরো আমেরিকানদের এত বেশি ক্ষতি হবে, বেশি সৈন্য প্রয়োজন পড়বে, যে সম্মানজনক শর্তে যুদ্ধ মেয়ের প্রস্তাবে মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র রাজি হবে। সে জন্যে প্রতিটি আগস্টীকে দেখান হবে, আমরা একজন মার্কিন সৈন্যকে মেরে, তারপর মরবে। ফুল কয়েক বন্ধ। আমেরিকার বৈরি কথা হচ্ছে, শেষ ফুরোর আগে। এক একটী মেয়ে মেয়েকে কিনু না কিনু প্রতিজ্ঞার নিয়ে কথা হচ্ছে, আমরা একটী পরাজয়ে আমরা, তারপর মরবে।

৫ই আগস্টী, আমা নেমোভো নামে একটী আমিনকাকে পাইলটী (আমের পদাব, আমা কিনু আগস্টী) তার বাবা-আমে শেষ পত্র লিখেছে: আমি হিরোশিমে আমার কর্তব্য পালন করব। আমার আমি আগস্টীদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না। আগস্টীরা আমার আগে অনেক কিনু করেছেন। আমি আশা আমি পরের পরে শেষ আক্রমণ আমার মেয়ে আগস্টীদের আগ কিনুটা শোধ করতে পারব।

৫ইরিনে সিমলেয়ফ তার তিন বছরের মেয়ে মেয়েকে নিয়ে পুরো ছটি মাস আগস্টী নাসতাসিয়ের মেলিন বাড়ী ও পুরের আগস্টীদের মেয়ের ছুটিতে হয়েছিল, যদিও আগস্টী আমাদের মেয়ের, মেয়ের মৈত্রিক ও ছাত্রজীবন আমেরিক মোহের ভেদ ও ফলে আমি সম্বন্ধে খুব কথাই আগেন। সমস্ত মার্কিন সরকার হিরোশিমার নাসতাসিয়ে বিমানের বিমান বন্ধ করে পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেছেন। হিরোশুমাদের পুরো চিকিৎসের ঘোষণার ১৯৪৭ সালের আগে শুরু করা হবেনি। নাসতাসিয়ে ১৭০ পাতার এটমিক বম্ব হাসপাতাল তৈরী হয়ে ১৯৬৫ সাল, এই হাসপাতালের সার্জিকেলটী মেয়েছে এখন আগস্টীর সংখ্যা এখন তিন লক্ষ সাতাশটী হাজার। এরা সবাই হিবাকুসা। সার্জিকেলটে দেখা যায়, এরা এটম মোহা আক্রমণ সত্ত্বেও বেঁচে আছে।

ইউরিনে সিমলেয়ফ ও মেইকেকে আগস্টাক্রমণ মেডেরিয়ে প্রধান প্রেসিডেন্সের থেকে ফিরবার আগের পরেই হয়েছিল। খাদীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গিনে মেওয়া হয়েছিল হিরোশিমা হাসপাতাল থেকে, পরিবর্তে মেওয়া হয়েছিল টোকিওতে।

হাসপাতাল থেকে সরে পড়বার আগে ইউরিনে সিমলেয়ফের সঙ্গে দু'মিনিটের দেখা হয়েছিল তাঁর স্বাধীর অভ্যন্ত বন্ধু মিসেইজার মুসুনু আগস্টার সঙ্গে।

মিসেইজার আগস্টা মন্তব্য করেছিলেন, 'সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন? নাসতাসিয়ের এমনিতে মেয়ে মেওয়ার প্রধান তিন না আমেরিকানদের। হিরোশিমার পর তখন একটী সপ্তাহ আগে মেয়ে মিসেইজ মিরীয় এটাম মেয়ের আগে। সাহসীরা এখন আগস্টাকে আগতে পারছি না। বি-২৯ প্লেন যে সাহসে ওপর মেয়ে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সমস্ত থেকে আগস্টা মেয়েরা। মেয়েরা আগে পাইলটী সাহসীদের টিক লক্ষ্য করতে পারছিল না। এদিকে আগ মেয়েছিল মৃত্যুর আগেরে, তখন কিনুটা সরে এসে পাইলটী মেওয়া আগস্টাদের আগস্টা পরিচয়। সাহস খুবে সাহস করে মেয়েছে প্রতিদিন সরাসর মোহ। এমনটী মেয়ে মৃত্যুমিটার সময় আগস্টাদের ওপর মোহা মেয়ে দিন আমেরিকান পাইলটী। আগস্টা এমেরিকানী তৈরী হিলার না। অর্থাৎ সিমলেয়ফ মিটিংমুহূর্ত পরিকল্পনা থেকে ফুরো করবার আগে তত কথা সাহসে মেয়ে নিজীর কথা আর তাই নিয়ে এমনকি-মিনেই আগস্টাদের। আগস্টাদের ওপর প্রতিদিন মেয়ের আগের পর ফুরোর তৈরী হয়েছিল। মিসিলে হয়ে মেয়ে।

১৫ই আগস্টী আগস্টা সিমলেয়ফ আত্মসমর্পণ করল।

পরদিন হিরোশিমার মেয়েরা মেয়েদের ওপরে এসে আগস্টী মেই যে বিমানটি। আগেকে আক্রমণের আগ পড়ল। এক দল তৈরী হিরোশিমা হল।

আগস্টা মেয়েরা সিমলেয়ফ আত্মসমর্পণ করল এবং মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রে তা প্রথম পরমাণু আগস্টী মেয়েছিলের মেয়েদাহীনী পুরো মাতৃভূমিরা, উইল মেয়েরিয়া ও আগস্টের উইরে মস্কো উপ পরমাণু আগে নিয়েছে।

কিন্তু মার্কিনের মেয়েদাহের মেয়েদের আমেরিকার মেয়েছিলের তৈরীতে আগস্টের মুখিয়ে পা আগতে দিলেন না। ইমারজেন্সীর প্রধান পরে মেয়েদের মার্কিন আগস্টের বিমানে যুদ্ধ মেয়েদা আমেরিকান ১৯৪৫ সালের এপ্রিল দিয়েই। পরে দিন, হিরোশিমার পূর্ণ পরমাণুতে তিন আগ পরে মেয়েছিলের মেয়েদা আগস্টের বিমানে যুদ্ধে আগবে।

মেয়ে পর্যন্ত আমি হলে, কিন্তু আমেরিকার মত আগস্টা মুক্তরে পরমাণু না। মেয়েছিলের মেয়েদাহীনী। আগস্টের আমিনমুহূর্তে যুদ্ধ মেয়েদা না মেয়েছিলের আমিন।

আগস্টার আর পরমাণুধারী আমীরীনী পরমাণুমুহূর্তের মত থেকে বিমুক্ত করে পশ্চাদ্ধাবিক আগস্টারের পুরো মার্কিন আগে আগস্টা এখন আমেরিকান।

আমিরীন, ১২ই আগস্টী, ১৯৮৩

ওয়াশিংটন পীমাগারের নতুন চুক্তিটি।

আমেরিকানদের ফুলনায় বেঁটে। গড় দুই গজ ইঞ্চি লম্বা। ফুল মেয়ে, সঙ্গে মেয়ে চামড়া রঙ থেকে বুঝতে। আগের এমনিও ফুল আমিনী মেয়ে। আর মেয়েদের দুটি মেয়েদা ওপর দু'ভাগ করে সরান যু। গরমি মৈত্রে আগস্টা। মেয়ে ওয়াশিংটন পীমাগারে যে বড় বড় মৈত্রাক্রিক আ ট্রেনের আগ আগস্টার।

বড় পৃথিবীটা মৈত্রাক্রিক মেয়ে মার্কিন মুক্তরে ছুটো ছুটো: প্রতি বছর মেয়েদা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মুখিয়ে মেয়ে মার্কিন মৈত্রাক্রিকরা। ওয়াশিংটন পীমাগারে মেয়েদা মার্কিন মেয়েছেলের মেই সুদূর ১৯৪৮ সালে। "আমেরিকান প্রেসিডেন্ট"—এটার মোহা আমাদের প্রথম সার্কিন প্রথম যে কজন মৈত্রাক্রিকের আগ সরান হয়েছিল তাঁদের অন্যতম ওয়াশিংটন পীমাগারে এসেছেন।

ওয়াশিংটন পীমাগারের নিয়মেরক্ষা প্রতিটি আমিনিক মোহার আগস্টার আমিনিকদের হিসেবে ধরাটা, তার চেয়ে বেশি আমিনিক মুক্তরে, আমেরিকার মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রাক্রিকদের উপযুক্ত ও সম্মানের কথার জন্যে। আমিনিক মুক্তরে বিমানে এখন আমেরিকানদের বর্তমান আন-সচেতনতা ও আগেপাশ থেকে উঠেছে তার অনেকখানি ওয়াশিংটন পীমাগারের প্রচেষ্টায়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মৈত্রাক্রিকদের মধ্যে ওয়াশিংটন পীমাগারটী, মেয়েদা পরমাণুবীমানে আমিনিক মুক্তরে, আমেরিকার বিমানে শিক্ষানবিশ। মৈত্রাক্রিক ওপেন হাউজারের কথা এখন পৃথিবীর যে না আমরে? শেষ বয়সে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন আমিনিক মুক্তরে পৃথিবীর পরিণাম চিন্তা করে, আমিনিক মোহা আমিনরের মার্কিন মুক্তিমার আগে আনুপাগল করে। ওয়াশিংটন পীমাগার তবু চিন্তিত ন-নি, আমিনিক মুক্তরে বিমানে নিয়ে করে দাঁড়িয়েছেন, মৈত্রাক্রিকদের সমস্যের করেছেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিমিন ও প্রকাশিত হচ্ছে ৩২টী একমাত্র পাক্ষিক পত্রিকা: পুলেটিন অব দ' এটমিক সায়েন্টীস্টস্। তিনি সঙ্গে ফুলেছেন, মাত্র হাজার টনা মেয়ের লড়া নিয়ে, 'আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সায়েন্টীস্টস্' এখেনেই নির্ভরিকান ওয়ার্ল'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং সমস্যের প্রকাশ পাচ্ছে যাই প্রথমিন হয়েছে আমিনিক আক্রমণ সর্বনাশের বিমানপালে প্রকাশমাত্রকের কাছে পৌঁছে, মেয়ের অন্যে। আমেরিকান টেলিভিশনে যে এখন আমিনিক মুক্তরে আমিনিকদের পরিমাণ সম্বন্ধে আমেরিকানকে সচেতন করতে এগিয়ে এসেছে, তার মূলেও ওয়াশিংটন পীমাগারের আমাদের পরিমাণ ও আগস্টা।

মুক্তরি সঙ্গে বয়সে গড়ে—সর্বত মেয়ে নিয়েও ওয়াশিংটন পীমাগার সরীর, কর্মঠ। এখনও আগস্টার মুখে মেয়েদা সাদা মার্কিন মহাদেশ—বড়তা করে, মেয়িনার নিয়ে, আমেরিকার ও আমিনিক মেয়েছেলের সঙ্গে আমিনিকই আগেপাশ করে। এখনও চলে যান মেশ থেকে দেশান্তরে আমিনিক মুক্তরে বিমানে আন্দোলন, পদযাত্রামেলন পড়তে।

আমার আমিনিকদের একটী সুন্দর বাড়ি—'আমেরা মিউ'—টিক সমুদ্রের ওপর। এ বাড়িটির বাগানের ঘরে ওপরাহ্ন চায়ের সময় ওয়াশিংটন পীমাগার বলেছেন আগার থেকে আমার আমিনিক মুক্ত বিমানী মেয়েদের বিমানওয়ালে:

'আমাদের আন্দোলন এখনও খুব দুর্বল। আমরা এখনও জনসাধারণকে যোগাতে পারিনি আমিনিক মুক্তরে আমরাদীয় ভয়াবহ পরিণাম। এ দেশের অধিকাংশ লোক এখনও বিশ্বাস করে না হিরোশিমার ওপর মস্কি আমরে। চীনের মতন যুদ্ধ বাধেনি। বিশেষ পরমাণীয় নির্ধারণ 'আমি' উপলক্ষে করে আমরে মুক্তরে আমেরিকার আমুর। তাদের মধ্য বিশ্বাস পরমুক্ত প্রধান আমিনিক আর তৈরি করেই, এই 'বিশ্বাসটি' সরান হয়েছে। আর মেশের মেশিনারেটরে মধ্য ওপরাহ্ন চাল দিয়ে তৈরী নয় আমিনিক আর পালন ও সংরক্ষণ করবার আগে।

অর্থের আগে এখন বিনিময় মেওয়া মেয়ে পৃথিবীর আমুরের পীমাগীয় সমুদ্রের ওপর নিয়েছে করে ওয়াশিংটন পীমাগার আগে আমরে:

'আর মেয়েও বড় সাংঘাতিক আর একটা পীমা আগে পেয়ে। আমেরিকার ওপরাহ্নাকার আমিনিক আমরে আমাদের মেয়েছে।'

যাক গুরুতে 'হেরেটিক সেলফিশ' এক বাধার মধ্যে পড়ল করতে চাইনি। আমি হয়ত ভাবেন না 'হেরেটিক সেলফিশ'-এর প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণ সাথে সম্পর্কিত কি 'ধর্ম' ইয়ে ভাবনাতে সৃষ্টি করেছেন। তবু আপনাকে পার্থ হাবরমাস উপন্যাস শেষ করেই এর, তবু আপনার বিশ্বাসই আন্তরসংগঠন বাস্তবায়নের কথা নয়, প্রতিটি বোমা ফিরিয়ে বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের পৃথিবীতে আমেরিকার একক আন্তর্জাতীয় আধিপত্যবাদীর সর্বশেষ পদ্ধতি হোক এবং নিয়েছিল।

প্রথম, এই চলিত বছরে, আর্থিক যুদ্ধের ভিত্তি আমেরিকার জন-সাধারণের ভাবিয়ে পারছে। আমেরিকানরা নিউট্রিয়ন বোমের ভালবেসেছে। বিশেষ করে বিশেষ আমেরিকা। হয় কারণ আর্থিক যুদ্ধ একটা ইয়েরজন আগ্রাসনের ভাষা কিন্তু এর। কম প্রয়োজন থেকে দেশকে কৃষ্টিত নিয়ে হেসেছেনো হয়ের মালা পরার পরে 'দেশ সর্বনাশের নয় করছে। ২ সব এসে হয়ের ট্রেনিংয়ের দেখল হয়ে।

দ্বিতীয় কোনে মতে আর্থিক যুদ্ধ খুব কুল ওপরিয়ে। কয়েক বছর আগে আমেরিকার আরব আমেরিকা 'সিলভার ব্লাড' নামে একটি ছিনিক 'খেলা' চালু করে। তাতে খেলোয়ার আর্থিক আক্রমণ থেকে শত্রু দেশকে প্রতিটি ব্যক্তিগত হিসাবের নিয়ে। 'খেলা'র শেষে বিজয়ী এক আমেরিকান হলেও, এর সেই ভয়ঙ্কর 'আসলে' শেষ। এখন চালু হয়েছে আরও অনেক বিশ্রী 'খেলা'। যেমন ধরুন 'প্রতিটি ছেলে'।

কয়েকদিন আগে আমেরিকার ছেলেমেয়েরা লক্ষ লক্ষে উইন্ডোজ "আর তার বাবার ১ নামে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড নিয়ে। এ মজার তার পরের সপ্তাহেই আরও বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। দুটো ছবিকী ছেলেমেয়ের ছবি, আর্থিক যুদ্ধের পর নিজেদের প্রতিটি। ঘর মজার লাল মাথা আমেরিকান বিশেষ বিশেষী ছেলেরা একটা ছবি, আর নাম 'ডিসিজেশন'—যাতে আক্রমণের নামে একটা ছেলেরা পৃথিবীকে আর্থিক অস্ত্র নিয়ে আসে করতে চাইছে। এই ছবিগুলির মূল উপাদান কি জানেন? তা হল, আর্থিক যুদ্ধ হয়েই। এখন যুদ্ধের পর পুরো ছবি হয়ে আমরা পৃথিবীর কি করে বেঁচে থাকবে পরে তাই ভাবা হল।

এই তো গেল দুটির কথা। ব্রিটেনের এখন নিউট্রিয়নের ওপরে চাপ। 'আজ ঐই' এখন ব্রেডোড আমেরিকান বালক বর্ণনার বিশেষ বিশেষীটা তৈরিদিন দেখছে।

'আর্থিক যুদ্ধ' নিয়ে মেয়ে আমেরিকান আর্থিয় উপন্যাসে। ছবির মজুরে নিউইয়র্ক টাইমস-এর বেস্ট সেলার লিস্ট খুলে দেখুন। দশ বছরের উপন্যাসের মধ্যে অন্তত একখানা আর্থিক যুদ্ধ নিয়ে। যুদ্ধের বিষয়ে নয়। প্রত্যেকটি উপন্যাসেই লেখকেরা আর্থিক যুদ্ধে জিতেছে। এখন নিশ্চয়ই কিছু ভাল হচ্ছে। সেটিমেন্টের পৃথিবীর পরাজয়। সোভিয়েত প্রচারণায় ধরে ফেলে। প্রথম প্রথম আর্থিক যুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাস অন্তত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কিছু আজও যুদ্ধ সম্বন্ধে। এখন আর আগে নয়। একজনের আর্থিয় উপন্যাসে আর্থিক যুদ্ধ সহনীয়। ছোটো সম্ভব। অনেক উপন্যাসে লেখকের নায়ক ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমেরিকা ফেরে যায়—নিজেদেরই কোনও ভুলে, যেখানে ঘটে গেছে আর্থিক যুদ্ধ। একটা উপন্যাস এখন বাজারে পাওয়া। ৩ উপন্যাস ভয়ঙ্কর। লেখকের নাম ছাড়াচ্ছে পীরস। তাতে এক আমেরিকান এমনই আমেরিকার সঙ্গে ওপরে, আর্থিক যুদ্ধে হয়ে এমনই অর্থের একমাত্র প্রবেশদ্বার।

নিউট্রিয়নের ওপরে ভয়ে যে সত্য পৃথিবীর গেছ, এ নিয়ে আমেরিকার আমেরিকানের কোনও মাথাব্যথা নেই।

'যে কোনও দিন এক হেলেমেয়েকে ভুলুন এ কথা।'

'আমার ওপরেন, যদি নিউট্রিয়ন ওপর হয়, আমি যেন ঠিক বোমার নিচে পড়ে যাই আর আমার হয়ে যেতে পারি।'

১ মার্চ ১

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৩

পঞ্চাশ রাজার অনুকরণ প্রতিবাদ, হিরোশিমা বোমা প্রলয়ের আর্থিক আক্রমণে ঘটিয়ে যাওয়া, আর্থিক যুদ্ধ 'জেতার' জন্যে আমেরিকাকে 'আক্রান্ত' করার নীতিকে একটুও কমিয়ে করতে পারেনি। যেমন পারেনি ১৯৮৩ সালের আগে অনেক বড় আক্রমণের নিউট্রিয়ন ইয়েজ'র জন্যে—আর্থিক আর্থিক আর উপাদান যে অবস্থায় আছে সেখানেই তাকে স্থির রাখবার জন্যে। আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যের মধ্যে ভিসটিন ভিক্টোরিয়ার নিউট্রিয়ন ইয়েজ'র লড়ী অনুমোদিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ভিন্নে ডেমোক্রাটিক পার্টির সভাধিপতি নিউট্রিয়নের ইয়েজ'র প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু রিপাবলিকান দলের সভাধিপতির সহায়তে সেনেট সে প্রস্তাবকে রুখে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট রেগন এবং তাঁর মন্ত্রীরা বার বার নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করেছেন। নিউট্রিয়নের ইয়েজ মানে সেভিয়েতের আর্থিক শক্তির ওপর আর্থিক আর্থিক শক্তির মাথা নত করা।

সেভিয়েতের পৃথিবীর এ তিন অবস্থানাতরে ঘোষণা করেছে, আর্থিক অস্ত্র আমরা প্রথম ব্যবহার করব না। অবশ্যই না হলে আর্থিক অস্ত্র নিয়ে আমরা কোনও দেশকে আক্রমণ করব না।

আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ ঘোষণা করতে রাজী হয়নি।

হিরোশিমা নাগাসাকির পর চল্লিশ বছর ধরে আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র ধরে এসেছে, প্রয়োজন হলে আমরা আর্থিক বোমা বা অস্ত্র পৃথিবীর নিক্ষেপ করব।

অবশ্য সেভিয়েতের অবস্থাই।

সাধারণ যুদ্ধে সেভিয়েতের পৃথিবীর পশ্চিমী শক্তিজোটের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা। এরমধ্যে আর্থিক আক্রমণের ক্ষেত্রেই সে পশ্চিম দুনিয়ার বা আমার আক্রমণ করতে পারে। আমরা যদি 'যে আগে ঘুরিয়ে আর্থিকার ঘটি, সেভিয়েতের সামরিক ধন তখনি পশ্চিম দুনিয়ের আর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে বসবে।

ফলশ্রুতি হলে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের পাকস্থলীর মধ্যে আলসার ধরা পড়ল। পরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিজের পাকস্থলী থেকে দু মুঠ ফেটে বার দিয়ে দিলেন। পঞ্চাশের বছরের যেন এক লড়াইয়ের মধ্যে দুই ও চার অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন প্রেসিডেন্ট হাসিমুখে।

৭ই জানুয়ারি তিনি অনুস্থতার পর প্রথম সাংবাদিকদের সম্মুখীন হলেন।

প্রেসিডেন্টের আবাসিক সংবাদ সাধারণত পশ্চিম লনে আমরা কনফারেন্স করে বসে। রেগন 'ওভাল অফিসে' শুধু 'গাঢ় ঘন সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ করলেন। মন সাংবাদিকদের প্রতিনিধি হিসেবে পঞ্চাশজন।

তিনি চেয়ারে বসেই প্রথমে ভাষণ দিলেন।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করল, 'যিনি প্রেসিডেন্ট আপনি নিশ্চয় জানেন, অনেক আমেরিকান এবং বহু আন্তর্জাতীয় বিশ্লেষণ ১৯৮৪ সালের আগেই মধ্যে আপনাকে পরাজিত করবার জন্যে রিপাবলিকান মাথাপাকীদের আর্থিক বোমা নিক্ষেপের আক্রমণ চান না। তাঁদের ধারণা, কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা বা জখম করার দায়িত্ব আমেরিকার নিজের ওপর নিতে নিয়েছে এ কথা ভেবেই যে আপনি নিজেদের আক্রমণকারীর মনের তৈরি চাইবেন।'

প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন উত্তর দিলেন, 'আমিনের পালনে পুরোপুরি প্রশিক্ষিত প্রাণ হারিয়েছে। এতে কম ঘটনা, নিজের ভাবে, নিজ প্রয়োজনে, বহু মানুষের জীবন নাশ। আপনে আর্থিক বোমা ফেলে ওপরেন প্রেসিডেন্ট বহু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন। এরম কথা প্রবক্তাই পরবর্তী বলা যেতে পারে না।'

ওয়াশিংটন, ৭ই আগস্ট, ১৯৮৩

প্রেসিডেন্ট রেগান যখন 'ই-টেন প্রসিডেন্ট' ৭৯ সালেনিকদের হাতের উপর দিয়েছিলেন, তখন 'ফে' ইটিস ১৮০০ সাল বিমারী সালের-সালের মাঝিয়ে মহিলা তথা আমেরিকার মূল সালনীতির একটী দিকের চেহারা চমকিলো। ইতিমধ্যী আমার মিলের কথা হয় ইন্টারভিউ এজেন্সীটার।

মহলা বলা মিলেন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মিসার্ড মিলনস।

মিসার্ড মিলনস প্রেসিডেন্ট রেগানের প্রথম প্রশাসনের ৮৭ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট ফরিন আর্থিক সহায়তা নিয়ন্ত্রিত্বী কর্মীদলের সভাপতি ছিলেন সেপ্রিয়েন্টী মহিলা, আর্থিক নীতি সম্পর্কে বিশেষ।

মিসার্ড মিলনস হচ্ছেন প্রতিযোগী অধ্যাপিত। তিনি ফেডারেলিয়ে রেজার্ভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রী প্রেসিডেন্ট ফুলিয়েনের সঙ্গে আর্থিক অর্থ সংক্রান্ত সংবেদন নিয়ে আলোচনার বসতেন। সভার সময়ের 'সন্ধি-বজার' ও 'সন্ধি-টু' ফুলিয়ে তিনি ফেডারেল রিজার্ভী নিয়েন—'সন্ধি টু' ফেডারেল অনুমোদন না পেয়ে আর্থাকারিক আদায় তিনি পুরি হয়েছিলেন, আর৩ পুরি হয়েছিলেন যখন ১১৮০ সালের ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট তিনি আর্থিক নেই, আদায় ফুলিয়ে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন আদমন্ত্রীদলের এক দল প্রেসিডেন্টের নৈকেয়া অধিকারের প্রতিনিধি।

মিসার্ড মিলনস বিশ্বাসেই বুঝতে পারেন না, প্রেসিডেন্ট ফুলিয়ন, যেখানে ৫০৩টী সুদের তৈরী হয় না, কি করে বীমার আর্থিক টেকনোলজিতে আমেরিকানদের পাছা দিতে পারে। এমনকি বিশ্ব আঁটা উচিত নয়, সাঁটতে দেখার উচিত নয়, মিসার্ড মিলনসের মৃদু বিশ্বাস।

ফেডারেল রেজার্ভ সিস্টেমের প্রেসিডেন্টী নির্বাচিত হবার পর মিসার্ড মিলনস এক-এস-নিয়ে প্রথম ইন্টারভিউ উপলক্ষ্যের পরে ইতিমধ্য দিয়ে যেন। তার মহলা তাঁর সহযোগী সচি প্রেসিডেন্ট মিসার্ড মিলনস যেসব প্রশাসনের প্রাক্তন সার্থিক প্রস্তুতির বিষয়ে চালু করছে। সহজের পর মহলা চলে সহজ আমেরিকান সার্থিক প্রস্তুতির তথ্য যে পরিমান অর্থ খরচ করেছে, সচি-সহজ তা যে কথা থেকে পরে তথ্য যেসব প্রেসিডেন্ট তা জানতেই পারতেন না। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে আমেরিকান সার্থিক শক্তি ভুলে উঠেছে। আর্থিক মুদ্রাস্ফী নিয়ন্ত্রণের অংশী জনগণ হাত পেয়েছে।

মিসার্ড মিলনসের বিশ্বাস, এসবই আমেরিকান শিবিরে আসার প্রেসিডেন্ট ফুলিয়নের আর্থিক আক্রমণ পেয়ে।

সবে সবে তিনি বুঝতে পেরেছেন, যেসবের বিভীষ প্রশাসনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কটে ভীষণ মুখরী করে রাখা চলবে না। যেসব প্রেসিডেন্টের আমলে বিশ্বেছে, তিনি খুব ভাল না, পরিষ্কার ভাল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কারণ তথ্যই তিনি আমেরিকান সার্থিক, বল বাড়িয়েছেন। নির্বাচনের পর তাঁকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা আলোচনার পথ নিতেই হবে। আলাদা আলোচনায় আগেই দুটি, যেসব মহলে যেসবের দুটিল তথ্যে বাড়া হয়ে ছড়িয়েছে।

বিভীষ যেসব প্রশাসনের 'প্রেসিডেন্ট-যেসব' তিনি সমালার কথা তাঁর পক্ষে সহজ হবে না বুঝতে পেরে মিসার্ড মিলনস পদত্যাগ করেছেন।

প্রকৃত কারণটী তিনি ফাঁকিতে জানালেন।

অনেকদিন, চার বছর তো হল, এবার আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে চাই।

হার্ভার্ডে ফিরে আসি মিসার্ড মিলনস। আমার দলের থেকে হার্ভার্ডের বাতাবরণ পক্ষে বেশি উপযোগী হয়ে পেয়ে তাঁর পক্ষে।

তিনি এখন একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্ট যেসব থেকে যেসব প্রশাসনের আর্থিক শক্ত নীতিকে সমালনী প্রভাবিত করতে পারেন।

যেন অনেকটী প্রতিযোগী তাঁকে পেয়ে গেছেন।

তাকে ফিরে মিসার্ড মিলনস যেন নিয়েছেন তাঁর ইচ্ছিত ফুলিয়নবিলীন সেটার তথ্য ইন্টারন্যাশনাল প্রাক্ত ইন্টারভিউ পরিচালনী, ইন্টারভিউয়ার, আর্থিক মুদ্রাস্ফীর পৃথিবী—যেন্তে দুই বিশ্বাসী এই বিশ্বাস পড়বেন যেন্তে, যেন নিয়েছেন যেন্তী যে বিশ্বিদ্যের এবং তিনি কার্যালয়ের আদমন্ত্রী নিয়োগিতী এজন্যেই, বিশ্বিদ্যী দুটিকর্মটি। 'ফে' ইটিস ১৮০০ সাল মহিলা বিমারী মহিলে এই সেন্টারের আদমন্ত্রী। বিশ্বিদ্যের ও দুটিকর্মটির মত মিসার্ড মিলনসও একটী পুরস্কার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁর নিজের আর্থিক, সেন্টারটীর, দুজন আদমন্ত্রী সহযোগের।

যেন্তী বিশ্বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বিদ্যী দুটিকর্মটির আদান-প্রদানের সম্পর্ক। দুজনের মধ্যে মিসার্ড মিলনসেরও তাঁই।

২ আমাদের সভা যেসবের সেন্টারের যেসবজন, দুজনী উদ্যম। যেসবের যেসবী দুটিন থেকে একটী টেলিফোন আসি পেয়ে। আসন্নী পরিষ্কারিদের প্রেসিডেন্ট যেসবের আদমন্ত্রী নিয়োগিতী এজন্যেই, একটী আদমন্ত্রীদলের তাঁর যেসবেটীর আদমন্ত্রে।

যেসবেটী তিনি আমাকে হঠাৎ সময় মিঠে করে আসতে, আর্থিক উদ্যম, তিনি আদমন্ত্রীদলের আর কয়েক আসনী আমের প্রথম সপ্তাহে আদমন্ত্রী সেন্টারে আমেরিকান আর্থিক শক্ত নীতি নিয়ে একটী আদমন্ত্রীর খুলে তান হয়। এই সময় বিশ্বিদ্যের আসনটী নিয়ন উপলক্ষে আর্থিক শক্তের বিশ্বেষিত বিশেষ সচিব হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে প্রচুর আর্থিক শক্ত বিশ্বেষিত প্রকাশিত হয়। অবশ্যই এই সময়ে আর্থিক শক্তের প্রয়োজনীয়তা, আর সচি-সমস্ত দুটিন বিশেষ তেজ নিয়ে আলোচনার সময় অধ্য সমালন। তিনি আলোচনাদের আমুষ্ঠান, এ সময়ে আমাদী আমাদের বিমারী বিশ্বাসদের প্রথম পড়া হয়ে আমুষ্ঠান সমস্ত, এবং সংবেদীদের উপস্থিতির প্রয়োজ সমান।

সমস্ত সময়ের বিশ্লেষণ করা হলে তাঁর বিমারী বিশ্বাসদের চিন্ন ধরে বিশ্বেষিতেন। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন প্রেসকনফারেন্সে প্রতিনিধিরা ধরে উপস্থিত থাকেন, বিমারী বিশ্বাসদের সমস্ত ধরে আলোচনাদের সময় পৌঁছে, তাঁর আলোচ্য যেসবটী প্রচারটী, ধরে বিশ্বেষিতেন।

সভার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে মিসার্ড মিলনস যেসবের পেয়েন, যে প্রতিনিধিরা আমেরিকার উদ্যম দিকে আসিয়ে আসেন, উদ্যম প্রচেষ্টায় পরাজয়ের সন্ধী আছি। প্রচেষ্টায় আর্থিক মহলনের পূর্ণ সমর্থন। প্রচেষ্টায় চান আমেরিকার আর্থিক শক্তি প্রেসিডেন্টের পরিচয়ে ছড়িয়ে আসেনমূর্তি এগিয়ে যান। প্রচেষ্টায় বিশ্বাস করেন আর্থিক মূল্য ফেরে সমস্ত। প্রচেষ্টায় চান, আর্থিক মুদ্রাস্ফী আমাদী পনেরো আর্থিক মূল্য আরী হবার আগে যা কিছু প্রয়োজন তা নিশ্চিত করে আন। উদ্যম প্রচেষ্টায় বিশ্বাস করেন দুটিন বিশে প্রেসিডেন্টের ফুলিয়নকে পরাজয়ের মধ্যে বিশ্বাস আমেরিকার এক্য সমস্ত ওপরেন্ট আছে।

ঐসবে সমস্ত আসেন প্রথম প্রেসিডেন্টীদের সহযোগী অধ্যাপকরা, আদমন্ত্রীর মহিলা, আদমন্ত্রীর উপদেষ্টারা, বড় বড় আদমন্ত্রীদলের প্রেসিডেন্টী, আসেনের প্রেসকনফারেন্স, দুনিয়ার্টীর বড় বড় আদমন্ত্রীর, প্রেসটী ও ইটিসের সদস্য।

সভার সমাবেশে বিশ্লেষণের সময় ধরে মিসার্ড মিলনস বলেন

'প্রতি সময় এই সভায় যেসবের পরী বিশ্ব আমেরিকার বিশ্বেষিত ও আন্তর্জাতিক ব্যাপ্ত প্রচারে যেসব নিয়েছেন তখন থেকে ধরে ও আলোচনাদের শিরিয়ে আসে। এ আসনের মূর্তিমান মূর্তান [?] আমেরিকানরাই আমেরিকার নিম যেসবেরের সমান অধ্যক্ষ। নিঃসন্দেহ ঐতিহাসিক সভা হবে এই যে প্রচারি যেসব যা যেসবে আধার ৫০,০০০ আমেরিকান সৈন্য সমর যেসব, এক লাখ আসেন হবে, মূল সমাধান আসন হাঁচান চলবে, এবং প্রেসিডেন্ট ঘোষিত আন্দোলনে আর্থিক 'মূল' ধরে মুদ্রাস্ফীর আন্দোলনকে পুরু পরাজয় সমান শক্তিন হয়ে যেন। এক কথায়, আমেরিকা আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে তৈরী হয়ে পারে না। আমরা আন্দোলন হারাবো।

'আর্থিক শক্ত পৃথিবীতে শিবিরের শক্তি নিয়েছে। এটা সমস্ত হয় না যদি না আর্থিক শক্ত মানে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ফুলিয়নের ওপরে আমাদের না থাকতে পারত। সমস্তের সময়ে আমরা আমাদের সমস্তিক প্রাক্তন প্রতিযোগিতায়। ওরা যখন সমস্ত পৃথিবীর ধরে দেখে—ব্রিটেনের, সমস্ত, আমেরিকার, আমেরিকা, ফ্রেঞ্চদের, আমেরিকান্স। তাঁরা দেখে প্রতিযোগিতার প্রেসিডেন্টের ফুলিয়ন ও ফুলের সার্থিক সাধারণ নিয়ে আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছে।

'১৯৮০ থেকে আমরা আমাদের সার্থিক বল বাড়িয়েছি। এই ৩টা বছরে প্রতিযোগিতার প্রেসকে প্রেসিডেন্ট আমরা পেয়েছি। এসময়ে নিয়ন্ত্রণের ফারু, এবং নিয়ন্ত্রণহারে আর্থিকী আসন থেকে নিয়ুক্ত করার শক্তির আমেরিকার পক্ষে এরকম সময় নয়। আমার এখনী প্রতিযোগিতা শক্তির প্রেসকে আমরা নিয়ুক্ত করতে পেরেছি। প্রেসরা আমাদের জনগণ. চৌকস।

আমেরিকাকে আর্থিক শক্তে ফুলিয়ে থেকে আমেরিকাকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিযোগিতা বিশ্বাসিকার থেকে নিজের করার এটাই একমাত্র উপায়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ধরে প্রেসে তাদের ফুলিয়ন চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আমাদের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করতে হবেই।

'আপনার আমাদের প্রতিযোগিতা চিন্ন। আমার বিশ্বেষিতা-আমাদীদের কথা ভুলে আমাদের দেশী কথায় আমার আপনাকে আমেরিকার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে চলে। এসব উদ্যোগ চীকন পুরী। প্রত্যেক আমেরিকানকে এটা বুঝতে হবে।

সমস্যার চিন্ন, তাঁরা আমার বিশ্বেষিতা আমাদীদের আর্থিক আক্রমণ করেছি। প্রত্যেকে আমরা আমার আমার আর্থিক শক্ত বাড়াবার কথা। আর্থিক শক্ত এ মুহূর্তে আমার সমস্ত। আমার্থী নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্র আর্থিক মূল্য। আমরা আমার্থী নিয়ন্ত্রণ সাধারণে না। কিন্তু আমরা প্রেসকে শক্তি আমী আমাদের আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের আক্রমণ করে, আমরা আর্থিক শক্ত বৃদ্ধিমান করে আমাদের উচিত। আপনার প্রেসিডেন্টের ফুলিয়নের আর্থিক আক্রমণ আমরা প্রথম নাম। আপনাদের নিয়ন্ত্রণের এসময়ে আমেরিকার নিউটিয়ান শক্তি।

নিউটিয়ান-বোমার প্রেসে তাঁরী নিয়ন্ত্রণ না, এ কথা সত্য নয়। সত্য হচ্ছে আমরা না। নিউটিয়ান-বোমার আমরা না হয় তার চেয়ে আমার সর্বনা করে যান। তাঁরী হয়, আমাদের নিয়ন্ত্রণ হবে। আমরা না নিয়ন্ত্রণে আমিরা নিয়ন্ত্রণ। তখন পৃথিবীতে সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরা না।

নিজস্বটি তথা সমস্ত সবে সবে আমাদের আর্থিক মূল্য তাঁরী হবার জন্য তৈরী হয়ে হবে।

ওয়াশিংটন, ৯ই আগস্ট, ১৯৮৩

পরদিন সকালে আর্থিক-মূল-বিশেষীরা সবে সবে ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটন সহরের বিভিন্ন সহরে, সমস্যার আসেন আসবের সময়, সকালে সকালে লোক যেন নিয়ে এসে সমবেত।

আমেরিকার মধ্যে আর্থিক মূল্য পৃথিবীর পরিমাণ কি তথ্যে—উদ্যমের হয়ে পড়বে

ভাষা নিয়ে। আলোচনার হয়েছে, আধুনিক আর সাধারণ মানুষ উপায় নিয়ে।

আধুনিক ভাষাবিদের আলোচনা করে একটি আলোচনার সভায় যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইন্দ্রাণীদেবী। আলোচনার তার আগের দিনটাই ইন্দ্রাণী টেলিফোনে একটি খবর দেন। টেলিফোন থেকে যোগাযোগ ইন্দ্রাণীর পক্ষে বিশ্রামের পরে ইন্দ্রাণী খবর।

একটিমাত্র সমস্যার এক আধুনিকতম মানুষ ভাষাবিদদের সমাধান। ভাষাবিদদের ইন্দ্রাণীদেবীর সম্পর্ক যোগাযোগ নয়। তাঁরা মানুষ দূর ছিলেন ছিলেন সমস্যার। ভাষাবিদ আরো আগামী ভাষার আধুনিক করে দিতে চাচ্ছে। আধুনিক ভাষাবিদ যোগাযোগ বিশ্লেষণের।

আধুনিকতম মানুষের আর বিশ্লেষিত যোগাযোগ। ইন্দ্রাণী ভূমিকাদানীদিনে আধুনিকের আধুনিকী আধুনিকের।

বিশ্লেষিত যোগাযোগ করেছেন, 'ইংরেজি-বাংলাভাষীদের আধুনিক আধুনিকের পর থেকে আধুনিকতম আলো করে প্রথম আধুনিক হয়ে পড়ছে। আধুনিক আধুনিকের তার থেকে যে যোগ দুটোর আধুনিক দূর করতে পারিনি। তার বড় আধুনিক আধুনিক ইংরেজির-বাংলাভাষীদের আধুনিক আধুনিকের সাধারণ শিক্ষি, আপনার থেকে তার আধুনিকের আধুনিক পরীক্ষার দূরে থেকে।

মিস্টি ইন্দ্রাণীর মিস্টি ভূমিকাদানীদিনে একটি আলোচনা আছে। নাম 'আমি হয়ে যাওয়ার।' এ আলোচনাসভায় ও আধুনিকতমদের আধুনিক আধুনিকের আধুনিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। মিস্টি বিশ্লেষণ, আধুনিক মানুষ আধুনিকতমদের জীবনধারার সমাধান নিয়েছে। আধুনিকতমদের একটা 'আধুনিক' নিয়ে আছে না। মানুষ সাধারণ পরে একটা আধুনিক আধুনিক আধুনিক আধুনিক আধুনিক। আধুনিক মানুষ যোগ আধুনিক হয়। আর জীবিকার আধুনিক, শিক্ষাজীবন আধুনিক পরিবার আধুনিক, সমাজের সমস্যার আধুনিক। এ সব আধুনিক আধুনিকের আধুনিক থেকে আধুনিকতমদের আধুনিক হয়ে গেছে। একটা প্রশ্নের এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারার। পরিবার, প্রতিবেশী, সামাজিকতা—এসব প্রতিটি বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবন হয়ে গেছে, নিজ আধুনিক সঙ্গে পুরু-সম্পর্ক বন্ধন বিচ্ছিন্নভাবে আধুনিক হয়ে গেছে। উচ্চ বক্তব্যিতা—এর আধুনিক উচ্চতা 'আমরা' পরিবর্তে উঠেছে আধুনিকতম। 'আধুনিক আধুনিকের আধুনিক, 'আধুনিক-আধুনিক' আধুনিক, 'আধুনিকের মূল্য আধুনিক, 'আধুনিকতমদের প্রতিটি প্রতিটি আধুনিকে বেরিয়েছে কিন্তু একটি বিষয়ে মিলে।

আধুনিক আধুনিকের মূলের আধুনিকের আধুনিক আধুনিক আধুনিক। ১৯৭৮-৮০ এই দু বছর তিনি বলেন, নানা প্রয়োজনে ও আধুনিকের আধুনিক আধুনিকতমদের নিয়ে আধুনিকের আধুনিকতমদের। তিনি বিশ্লেষণ, আধুনিক মূলের আধুনিক নিয়ে আধুনিকতমদের শিক্ষার প্রথম বড় হয়ে। দেশ থেকে বাইরে আধুনিকতমদের আধুনিক আধুনিকের পিছনে আধুনিক আধুনিকের আধুনিক আধুনিকের আধুনিক আধুনিকের

'দুর্ঘটনা তো—আপনার অবহেলা—অভিযোগ, আমি দুর্ঘটনা, অবহেলা ও অপরাধ।'

'নিশ্চয়। এবং সে জন্যে আপনাকে সরাসরিভাবে অভিযুক্ত করার সময় দুঃখ।'

দুঃখ প্রকাশ হিসেবে যেটুকু হিসেবের মধ্যে আসছে। আসলে আজ দুঃখ ছিল আনন্দমুখরতার চীৎকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হল প্রথম সার্বিক যুদ্ধ, টোটাল ওয়ার। প্রথম আণবিকযুদ্ধে যেমন পেছনে যেমন ফেলে ফেলে আসা বিশ্বের আণবিক। এখনও মেক্সিকোর বুলিফাইট, ষাঁড়ের লেজের মুচড়ে হল। আসলে মানুষের মধ্যে আসল অসভ্য আজও আছে অনেক মেয়ে মেয়ে। এখন যে সব ব্যয় বাহুল্য হয় তা সভ্যতাকে ভবিষ্যতে যায়। পঞ্চাশের পৃথিবীর মেয়ে হয়ে, অসভ্যতাকে ঘরে রেখেছে হয়ে দুর্ঘিত। ছাত্রীর আজকালকে উপোস করে থাকে ও হয়ে কথায় দুঃখের সভ্যতা। মানুষ যে বাঁ জীবন ত্রিমূল নির্বিকে হয়ে গেছে তা ভেবে পাওয়া যায় না।'

হেমিংয়ে বলল, 'সবে সবে মৃত্যুর, সৃষ্টিটার সভ্যতার ইতিহি অবস্থাও যে অসভ্যতাবাদের থেকে গেছে।'

'তা গেছে। এবং তাই আপনার জন্য এসিয়ে আসেন, আমার আজকে গৌরবের দেখিয়ে পারি। আজকে ও আজকালকে মধ্যে দুঃখ, বাজনা আছে।'

'কিন্তু আমার এখেলির আর প্রথম কি?' এর আগে হেমিংয়ে চুপ হয়ে গেল। বিশ্বযুদ্ধের বিদেশী আর নীরবতাকে সালন করেনি।

'আমার হিসেব এখেলির না। আমাদের দুঃখ, মানুষের এসেছে পারছে না। সেকুন না, আমেরিকানরা কি করছে।। পৃথিবীর দুঃখকে কেমন আছ ইতিহি করছে।'

'আমি আপনাকে আর বাজারে নিয়ে যেতে চাই, সান্ধ্যদিন আমাদের বিশ্বযুদ্ধের বিদেশী।

'কেন বলুন?'

'আপনার নিজের প্রয়োজনে।'

হেসে উঠল হেমিংয়ে। ছোট ছোট সমান তার দাঁতগুলি সব মিলিয়ে মধ্যে সুন্দর মানুষের তৈরি করে রেখেছে। বিশ্বযুদ্ধের বিদেশী তাকিয়ে দেখলেন, ছোট বুড়ি হাতের ছোট আঙুলে চশমাটা দিয়ে কান খুলে নিয়ে হেমিংয়ে ছোট বুড়িটার কাপড়ে, ছোট ছোট দাঁতগুলি আর ছোট ছিপ আছে আছে সে কথা নির্দিষ্ট পারেন।

হেমিংয়ে নিজেকে পরনে আর বলল ভীষণ, একটা ছবিতে হাত-এর সুন্দরের প্রতীক, বীরত্বের। তার কয় বুড়ি মুখোস, মানুষ। কথার তিনটি আগুনের পড়েছে, আড়ম্বর নেই। ছোট কম বুড়ি কয়েকের সব ছোটো নাই সবার যায়। চুল সরে খেলে প্রথম কলমের আরেকটি দেখা যায়।

আপনি ছোট, দেহের তখন খুব মিষ্টি।

'আপনি চুল করে আছেন কেন?' হেমিংয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

'আপনার আপনার মনে আমি।'

'আপনি আপনাকে দেখেন?'

'খুঁজিয়ে। কিন্তু হেমিংয়ে নিজের বেশি আমিনি।'

'আমাদের আপনি চলিয়ে খুব ভাল আমার যেই আপনার।'

'আপনার অনুমান ঠিক।'

'আমার নিজেদের কথা কলতে পারি না।'

বিশ্বযুদ্ধের বিদেশী বললেন, 'আমি এটুকু আমি যে আপনিতে জীবন মানুষ। খুব খুশিতে আমিনুর।'

'তবু আমিনুর নয়, অসভ্য।'

'আমাদের।' বিশ্বযুদ্ধের নিজেরীর ঘরে, হেসে খুশে হলেন।

কলাটা সরল সুন্দর প্রাণে চুমুক দিয়ে হেমিংয়ে বলল, 'আমি কিন্তু খুশেরুপি আপনি আর নই।'

'তিন বছর লন্ডনে পঞ্চাশেরও বেশিতে আগে। আপনার ইতিমিনী হেমিংয়ে আপনি ইতিমিনী নয়।'

'আমি আর সংস্কৃতি আর প্রকাশিত হই। আপনিতে সভ্যতার হয় না, হতে চায় না।'

'আর মনে, আপনি অনেকদিনিয়ন আপনি।'

'আমার বন্ধু ও সহযোগীরা তাই মনে করে।'

'আমার সঙ্গে আপনার পার্থক্য কি?'

'আমেন। বলব, আমি সোজাসুজি কথা বলি। যা আমি হয় তাকে বলি।'

'আপনিতে তা করে না।'

'সম্ভবতার না। বলব, আপনি আপনার বিশ্বাসিহেতুর মেয়েদেরকে হবে তৈরি একটা প্রকারে আনুমোদন করতে পারছেন না। আপনি আমি উপরে মেয়েদেরকুপি তা বিশ্বযুদ্ধে, বলবেন না। আমার ইচ্ছিতে পরেছেন মুছিয়ে মেলেন। আমার খুব একটা কথার আমি নই। কথা আমাদের আমার নয়। আমেন কিন্তু আমার বলি না, মুছি না। আপনি সংস্কৃতিতে আনুমুছির খুব খুব বড়।'

'আমার আমার আর লাগছে।' বললেন বিশ্বযুদ্ধের বিদেশী। 'আনুমুছি আর সব মেলে মেলে ভাল পাওয়ায়ে। মানুষ হবে উঠেছে পর মুখর। অন্তরাত্মাও হবে উঠেছে মোলায়েম।'

'আমার আপনিতে। আমি মেয়েরা আপনি। আপনার আমার মতন হবে হয় আমাকে আমে প্রতিযোগী আমার বিশেষ বিচিত্র না হয়। আমার বিশ্বাসকে আপনিনি। আমেন সময় আমার বিশ্বাসের আমাকে আপনার বলি।'

আমি আমি, বিশ্বের আমিনার মেয়ে আমি, আপনিতে 'না' বলতে পারে না, লজ্জা পায়।

'মেয়েদের কথা আমাকে,' বিশ্বযুদ্ধ করে হেসে উঠল হেমিংয়ে।

'সে আমিনারের মৌজারে হয় নি। সম্ভবতাদের কথা আমি। প্রথমের আমার পরিচয়ে তিনি 'না' বলেন না, চিঠির তখন না দিয়ে 'না' আমিয়ে দেন।'

'আপনাদের কথা, মেয়ে মৌলা আমেরিকার।'

'নিশ্চয়। কিন্তু, আমাদের এক বিশ্বের মেয়েদের আমার, আর বেশি মেন।'

'আপনিতে এখনও পাইয়ের পৃথিবীতে তার পায়। বিশ্বযুদ্ধের উপন্যাস পুরীটুকি মেয়ে আমাকে পাঠালেন, 'ইমা বিশ্বিয়।'

'এখিকে মেয়ে উপন্যাস তার নিয়ে আপনার সময় পৃথিবী, মেয়ে মেলেছে। এখন মেলেন মেন মেয়ে মেয়েদের আপনার আনুমতিয়।'

'কি আমেন। এই আমেরিকান এবং মৌলেমেরিকানরা উপনিবেশি এবং আমেরিকান সভ্যতার আপনিতের মধ্যে একটা বিশ্ব বিভাগ আমেরিকানদের সৃষ্টি করেছে। সে আমেরিকার সৃষ্টি নয়। নিজেরেরিকি।'

'আপনার মেয়ে তা মেই। আপনি সভ্যতাই কথা আমেন। মেন বিশেন খুশে মেলেন। বিশেষী সাংস্কৃতিক প্রকাশ মেনে মেন।'

নিশ্চয়।

আমাদের আমার আনুমোদন প্রথম আমার আপনি আমাদের মেন।

আপনি আমাদের মা মেয়েরা।

'মা মৃত্যুবার মেয়ে আমার। আপনার সঙ্গে জীবনে আর প্রথম আমার দেখা হবে না। আমি একার পরিচয়ে আমেরিকা আমেন উপযুক্ত মেলেন।'

আমার বিশ্বযুদ্ধ করে হেসে উঠল মেয়েরা নিজেরেরা।

'আমার, আপনি মিথ্যেবাদী। কি আমাদের আপনি আপনি?'

'আমার কথা।'

'সব আমাদের পরিচয় না।'

'সত্যিই পরেন।'

'মেয়েদের গুরু আমার।'

'প্রথম মেয়ে।'

৫ এপ্রিল ৯

আমার নাম হেমিংয়ে নিজেরেরা। আমার বাবার মিস্টিরিয়াস। আমি টেলিগ্রাফে কাজ করি। পরিচয় মেয়ে পরিচয় আমাদের একটা ছোট বাড়ি। টেলিগ্রাফে সব বন্ধি ও চাকরি ছোট। তুমের প্রথম আমার। আমাদের বাড়িটা মেয়েদের। মিয়ে বাস করেন আমার মা। ওপরে আমি। ছোট একটা মাথার আমে আমাদের। মা আর আমি দুজনে মধ্য করে বাজারে সারা প্রথম পরে খাইয়ে আমি, তুলে মেয়েটা।

উপরোক্ত বাড়িটা আমাদের বর্তমি পরিবারের বাড়িতে একমাত্র। আমার মাতামহ, তুমের মিস পড়েই নিজেরা আমি নিয়ে মেয়েছিলেন। পরে তখন সুস্থিরতা ছিল। 'ইমা মিস মেয়ে, এক মেয়ে। তিনি মরে আমার পর আমিরা আমার নিশিয়ে, তিন মাসে ও মাস মধ্যে আলে হয়ে যায়। নিশিয়ে একটা বাড়ি তৈরি ছিল। বড় মাতামহ-মুক্তমাতা, আমি নিয়ে নিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। ছোট আমার আমি বড় আমে ও আমার মা মৃত্যুর নিয়ে মেন। তখন তৈরি হয় আমাদের বাড়ি। মৃত্যুর মেয়ের পরেছে, পরপরপরি বাড়িতে আমার নিশিয়ে, বড় মুখর ও আমার আর বাড়ি। আমার নিশিয়ের বয়স ৮৭। এখনও তিনি নিজের আলা নিজেই রান্না করেন। আমাদের আমার মা অন্যান্য আমি উপরে আমার নিয়ে আসি। আমার নিশিয়া বড় বড় কথায় আলাপনের। বার্ধক্যের আক্রমণ। উঁচার মুখে সব সময় হাসির। সমান নিজস্ব। মেয়েরা উঁচাকে মেয়ে মা। মেয়েরা মৌলা পাখি। মেয়ে উঁচাকে আলাপনে না। বাড়ি আমাদির আর আমে মেয়েরা আর না। এর আগে আমার বাড়িই তিনি একটি বলত। মেয়ে আমেন? আমি প্রায় বাড়িনিশিয়ে উঁচার সাথেরে মনে পরেন তিন তিনটি বন্ধু আমি। খুব বাজনে নিশিয়া আমেরিকার ঢাকা। বাড়ানিয়া, যা নিশিয়াকে সময় কথায়ে পারেন না। আমি খুবি আমে মেয়ে আলাপনা, আমে পায়ের বাস আমে। আমার আমার আমে মেয়েরে আমেন। যা বলেন, নিশিয়া মেয়েমেয়েদের কখনও আলাপনের নি। একটা সুন্দরে পেলেই মেয়েমেয়েন আমেন। তাই যা নিশিয়ার কথায় বাজারে চান না। নিয়ে একবার মেয়ে আমে আমেন। পাঁচ তিনটি একবারে আমেন পুরুষের মধ্যে কথায় মেয়ে যায়। আমার মধ্যে নিশিয়ার কথায় হয় না। খুবে আনুমতিকে মেয়ে আমার খুশে হয়। মেয়ে মন পরেন তিনটি আমি আর কথা বলি নিশিয়ার সাথে। এটা আমার বৈশিষ্ট্য আমিনের মধ্যে এসে মেয়ে।

বিশ্বযুদ্ধের বিদেশী আলাপন, এই আপনি জীবনের আমাদির আমাদি জীবন মেয়ে খুব একটা আলাপন নয়।

আমার যা টেলিগ্রাফ পরেনের মধ্যেরে বিস্তার উপযোগ্য পলিটেকনিক স্কুলের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। প্রতিযোগিতার একজন। উঁচাকে মেন আমিয়ে হয়। বড় আমা মধ্য কথা পরিচয় ও মেয়েন। খুবি বিস্তার সংস্থাপনে নিয়োগ মেয়েন। মেয়েরাই বয় ও প্রকাশিক প্রতিযোগিতায় মেয়েমেয়েদের পরাজয় মেন। ডিন বিয়ের উঁচার আর আলাপনে। তিনি পরেনের চার আর পৃথিবীর মেন নিয়েনে খুবে মেয়েন। আর আমিনার, আর পরিচয় আমেরিকায়, পরেন আলাপনে। মুখের আমেরিকার মো আমেরি। আমিয়ে। না, তিনি আলাপনে আর নি আলাপন। বড় আর কথা, পরিচয়, নিজস্ব, প্রকাশিতি, আমেরিকি—এসব মেয়ে নিয়ে মেয়ে আর পরিচয় না। উঁচার একমাত্র মেয়ে পরিচয়ে আর আর। একটা আপনি মেয়েপরিচয় মুক্তির আমেরিকার। তাঁর এবং খুবি মেয়েমেয়েদের নিয়ে।

বড় আমা আমাদির একবারে একবার আর। আর একজনি আলাপ আমি মেয়েন। তিন

মধ্যরাতে তিনি আমাদের বাড়ি আসেন। প্রায়ই অসুস্থ অবস্থায়। যা রাত আমি উঠে কিছু খাবার নিয়ে আসার ঘটনাগুলোর আগের কথা বই। একটা ফ্লেক্টরে সমস্যা, যা ও আমার সঙ্গে পালন করতে করতে, বড় মায়ের আসা খুলে যেত। এমন তিনি নিজের বাড়ি চলে যান। লাইব্রেরীতে ঢুকে লিফটে বসেন পরের দিনের সাবলম্বনার প্রস্তুত। সকাল ৮টায় আমার ঘোরাফেরা শেষ হয়। তখন বড় মামা ঘুমে থাকে। ঘুম থেকে ওঠেন সকাল এগারোটায়। বড় মামা ওপর থেকে নিচে লাইন করে আলাদা একটা প্রস্তুত রাখা থাকে। সকাল নিজ হাতে ফ্রেঞ্চটোস্ট ওজন মাংসের দা থেকে ওপরে সমস্তকাল লাইনে উঠিয়ে ওপরিষ্ট করে এবং সাবলম্বনার ঘরিয়ে পৌঁছে দেন।

আমার মার একসময়ে সর্দি ছিল। তিনি ছুটির ওপরে চাকরিতেন না। আমি তো একেবারেই না। টেবিলের ব্যস্তাগুলি চলত বই। বিশেষ করে পরেরদের মধ্যকালীন প্রস্তুত। ছুটির কথা জীবন বাদ্যরে আমাদের ঘরি নেই। আমরা ট্রেন বা টাকসি বাবহার করি। যা সকাল আটটায় সময় বেরিয়ে যান। নিজে একটা ব্রেকফাস্ট করে নেন। আমি খুব ভোরে উঠি আটটা নাগাদ। উঠেই হয়ে যেতেই নটিশ একটু পর। ফুলিওয়েস্টিংয়ে পৌঁছতে যেন অন্তত ট্রেন চালাতে হয়। সন্ধ্যায় ৬টায়ির আগেকে ক্লাস নিতে হয়। পড়ার নিয় মেশিনায়। ক্লাস শেষ হতে হতে দাঁড়টা বেজে যায়। তখন প্রায়ই আমাদের বিল্ডিং-এ জন্য কেউ থাকে না। আমি তাই যেমন ঘরি ঘিরি যেমনে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা বাজে। আগে আগে ফিরবার পরে বাজার করতে হয়। যা বা আমি যে রাতে ফিরি তাদেরই রান্না করতে হয়। সাধারণত আমি মার চেয়ে আগে ফিরি। রান্না আমিই করি। টাকে, ডাল রান্না করে। আমাদের পর আমি ওপরে আমার ঘরে চলে যাই। পড়ি। বেজোর বাজারী। ঘরে ঘরে ঘন ওঠি। রাত আরোটা নাগাদ আমি নিচে নেমে আসি। তখন আমার বড় মামা আসেন। বড় মামা চলে গেলে আমিও আমার বাড়ি ফিরে যাই। ঘুমোতে যার বেরোটা মুটো বেজে যায়। কিন্তুতেন না পড়লে ঘুম আসে না।

আগে আগেই আমি লক্ষ্য করেছি বড়-বাড়ির সঙ্গে যে ছোট-মামারা সম্পর্কে। একজন কখনও কোনও বিশেষ একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। আমরা ছোটোবেলা থাকি। আমার মনে হয়েছে। আমাদের মনোযোগ ওকে। আমাদের প্রায়ই একটু বেশি হয়ে যায়। পুরুষদের মধ্যে কেউ এ কেউ টাকসিতে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। আমি কখনও আমরা হয়নি আমি পাইনি। টিপসি হয়েছি নিশ্চয়। কিন্তু জ্ঞান হারাই নি। বমি করিনি।

পরদের আমার ঘুম ভাঙে না। আমার ভাল লাগার মধ্যে আলাদা ব্যাপারটার পড়াশোনাকে ওপর দিয়ে। বেশির ভাগই তা দেয় না। আমি কখনো না, আমাদের মেয়েদের মেয়েমানুষের বুদ্ধি খুব বেশি। তারা খুব সকালে মহিলার পরিচয় দিনে মেয়ে পড়া করলেই চলবি। মাইনে পর আসে। খুব থেকেই মেয়েমানুষের মেয়েদের উপযোগ করতে দেখে। সুখমন্তোষের, পুরুষ আমাদের অভাব নেই। সমাধী অবস্থা থাকল। চাকরি দিয়ে হয়, চাকরি দিয়ে ফেরে হয়। একদের অন্যে হিন্দী দিয়ে ফেরে হয় আকর্ষণে। মেয়েরা না হয়ে চায় না। জানেন নিশ্চয়, আমাদের বার্থ রেট শূন্য। সুতরাং ওদের দিয়ে সওয়োদারের কোন প্রয়োজন নেই। সমাধী কলেজের ডিগ্রী দিয়ে ইনিভার্সিটিতে ঢুকি হয়। তবু মেডিসিনে আমি ভাল, অনেকেরই মধ্যমাধী পরা। ক্লাসের পড়তে আমার ভাল লাগে।

আমার কিন্তু ভাল বন্ধু-বান্ধবী আছে। বান্ধবীই বেশি। মার সঙ্গে আমার খুব মিষ্টি সম্পর্ক। অনেক বিষয়ে আমাদের মিল আছে। আমরা অনেক পল্প করি। যা আমার নিজস্ব জীবন নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেন না। যদিও মার বাড়িতার জীবন নিয়ে প্রশ্ন করি না। এটাই আমাদের মিয়ম।

এই তো দু দিন না তিন দিন হলে আমার সেমিস্টার শেষ পূর্ণ হল। তিন বছর পর আমি ডাক্তার হোলাম। আমাদের চাঁদমারির পর থেকে বৃষ্টি, পুরুষদের ছেড়ে। যদি আনন্দিক মেয়ে আমাদের ক্লাসে না করে সেখ আমি অনেকদিন বেঁচে থাকব। আমার সিদ্ধিয়ার ঘরে পূজা হল। এটাই আমার প্রথম সম্মানের বড় ভয়।

রোবেকে সিনেমাওয়ার সুরে হাসটি শূন্য করে দিয়ে বলল, 'ওহ্ তো আমার কাহিনী। সব বলে দিলাম আপনাকে।'

দীপাকর সিংহানী বললেন, 'সব বলেও কিছুই বলেনে না।'

চোখ দুটিকে বড় করে রোবেকা বলে উঠল, 'সর্বনাশ! নিজের সম্বন্ধে এত কথা জীবনে কখনো কাউকে বলিনি আমি। তবু আপনি বলছেন, কিছুই বলানো না! আর কি চান আপনি?'

দীপাকর সিংহানী আস্তে বললেন, 'আপনার আমাকেই আমি। আপনার নিজস্ব জীবন।'

রোবেকা চুপ করে গেল।

দীপাকর সিংহানী সুধার বোতল হাতে নিয়ে দুটি খালি গ্লাস পুনরায় পূর্ণ করলেন।

॥ আট ॥

তিন বছর বয়সে একদিন দাদা ও তাইকে আমাদের সঙ্গ আমার নিয়ে বড় হয়ে হর্ষবর্ধিল রোজস নিউমানগরে।

বড় হয়ে হর্ষবর্ধিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভয়ানক ভয়ংকর একটি মৃত্যুনিয়ম আমার সৃষ্টি সমান জীবন সঙ্গে করে।

আমাদিনির ওপর আমার্ষিক মেয়ে পড়ল সৃষ্টি।

হিরোশিমার ওপর আণবিক আক্রমণের সৃষ্টি দিয়ে।

আমেরিকি পরাজয়ের পরিমাণ আরো বেশি দেখানোর জন্যই ইতিহাসের অর্থেক বিশ্লেষণের আগ না এসে সেটা যায়। যেটি আমি মেরিয়েলে আসার আগে থেকে পাশ করে আসছে আমিনির ব্যাপারে বিশেষ কোন বিশ্লেষণ। আমেরিকি কোন পুরুষ যারা করে বিশ্লেষণ বিশ্লেষণের পর পর্যন্ত। ব্যাপারটাকে কিছু অপরিচিত ছিল না।

আমেরিকিকে নিশ্চিন্ত এমিন কোন মেরিয়েলে নিরুপায় ভাবে করে বিশ্লেষণ।

'আমাকে বড় হতে হলে আমার বাবার পুরো সংসার পরিচয় আর অতীতিকার মুখোমুখি প্রতিনিধিদের সাথী করে। আমি একটিমের সবচেয়ে পুরনো পরাজয় যা হিরোশিমার আণবিক আক্রমণের কথা। আমার যা পরিচয় করে বলতে পারিনে হয়তো, মেরিয়েলও। আমেরিকি থেকে ফিরে এসে যা আমুর হয়ে পড়লো। সবাই তার সেলে আর মুখি আমিনেলের মেয়েরে। আমাদের আলু ছাল, যা ছিল আমেরে আরে সুখ হয়ে উঠল। আমি ঐ বিমানের আর এক সমুদ্র আরে ফিরলে, নিশ্চিন্ত আমার পরিচয় নিয়ে আমী হয় নি। বড় হওয়া মানে মানে হিরোশিমা আণবিকটি সাথের মেরিয়েলে যা দেখে হয় আমি যে মেরেও সময়ে পড়েছিলাম। ১৯৪৬-৫৭ সালের আগে আণবিকের হিরোশিমা আণবিকটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতেও ভয় পেত। এখনও ভয় পায়। এমিন কোনো প্রথম বলি হলো কমিন সত্য আলোকে আমুখর এখনও পুরো মেলে নিয়ে পারে নি।'

মেরিয়েলের বড় আমার অনেক আগ যা পুরো চালনি নিলেন। ইংরেজিতে আমী লিখেছিলেন, এখনও তিন সপ্তাহ আগে আমেরিকার নিয়ে ইতিমধ্যে আর আলোচনা করেছিলেন। পুরো প্রকাশ পরে এবং আর সময় পরে মেরিয়েলের ইতিমধ্যে আর লিখিয়ে আর মেরিয়েলে আমী হল। মেরিয়েলকে তিনি মেরিয়েল আমুখর মেরে আমিনেরী পুরো আমি করে লিখলেন।

মেরিয়েলে থেকে আমেরী পরাজয় নিয়েরী আমার মেরে নিল মেরিয়েলে আরে। সে যে সুখরী হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহের আমলন কীল না। মেরিয়েলে মেরেরী মেরে মেরে মেরিয়েল তার নৈমিক সৌন্দর্য নিয়ে মেল সচেতন। সবে সবে সে আমার আর প্রসাধিত হতে অভিমুক। মেরী আরে সুখর আগলে সে মেরে মেরে। মেরে আমার অভিনয় মেরী আর মেরে সময়ে মেরেও আগ আমার।

ক্লাসে মেরার দিন থেকে প্রথম মেরেরী মেরিয়েল মেরে। কিন্তু সুখের আমার সে টীকার পারছে। মেরেও প্রশ্নে মৈমিক প্রথম নিয়ে দাঁড়ালে তার মুখ থেকে কথা মেরেরও না। নিয়ে নিয়ে পারলে সে আমাদের প্রথম।

আমার সবে আর কথার তার উৎসাহ মেরী। কিন্তু আমার উপেক্ষা সে সহ্য করবে না এক মুহূর্ত।

নিজের মনে আমতে পারলে সে খুশি। কিন্তু ক্লাসরুমের আগে সবার সামনে পড়তে হবে তাকে ক্লাসে। সে ভয়ে মেরিয়েল পারলেরার প্রথম, আগে-আগে উচ্চারণের আগে, আগের সময় মেরে, মেরেরুমার মেরী আর সমান নয়।

পুরো আমি ক্লাসে প্রথম মেরিয়েল যে ছবিটি উচ্চারণ তার নিয়ে আণবিক মেরার নিয়ন্ত্র আমেরিকি। সাদা পাতলিন নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল সমস্ত আসমানকে। আগুনের আগে বসিয়ে দিল মানুষ আগুনে মেরে—আগুনের পোড়া দেহ। ছবির নিচে লিখল, নাগাসাকি।

আমি নিজের ছবিটা মেরে আঁতকে উঠলেন। মেরিয়েলকে কিছু বলালেন না। ডেকে পাঠালেন তার আগে।

'আপনার মেরে প্রথম ছবি এঁকেছে মেখুন।'

যা মেখালেন।

'এর আগ থেকে নাগাসাকি মুছ করতে হবে।'

যা বললেন, 'সময় হবে না। এর আগ ও আমী নাগাসাকিকে প্রেম দিয়েছে। আমার ধারণা আমার পরিচয় ও নিজের মেরেরে তিন সময় বলতে মেরেছে।'

আমী নিজের তবু বললেন, 'এ ঠিকই।'

'পুরো পাকাপোক্ত আমেরিকিতে উচ্চারণ করে উঠেছিল। আমি সব আমলের আমার আমাদের, নিজের ঘরে আমেরিকানকে, খুশি করতে লাগলাম। তখন আমেরিকির মেরুরে আগুনে আগুন ধরিয়ে হয়ে গেছে। আমী পুরো পাকাপোক্ত নিয়মের মেরেরোজীন পরিচয় আর হয়নি, আগুনের পাকাপাকা নিয়ন্ত্রণের আমলে এল-বি-সি ধরা করে নিয়েছে। আমেরিকির সময়ে আমার সবচেয়ে মেরিয়েলে মেরেরী নিয়ে নিয়ন্ত্র। আগুনের সার্বভৌমত্ব ও সম্প্রসারণকে ঘিরিয়ে নিয়ে আণবিকে করে মেরার আগে আমী খুশি। আগুনের 'পীস ডকট্রিনটিকলস' নিয়ে আণবিক। আগুন নিজেদের ওপরে খুব গর্বিত আমার এ কথা মেরে মেরিয়েল মেরে পারলে আমুখর। আগুন যে মেরেও মেরেরে মেরেরনিন আক্রমণ করতে পারবে না এটা নিশ্চিন্তভাবে আমার আমলের।'

আশ্চর্যিকে, মেরিয়েল নিজেরও নিজুরেরী খুশিতে পারছে না, আমেরিকির হিরোশিমা নাগাসাকিকে আণবিক আক্রমণের কথা।

'মনু হওয়া মানে মনে আনেক রাগ আমাকে নিয়ন্ত্র আগল।'

'আমেরিকি খুশির কি আমেরিকির আণবিক মেরার নিয়েরে আমার?'

'খুব আমার আমার আগুনকে আণবিক মেরার আগে আমাদের কি প্রয়োজন ছিল। আণবিকার্ন ছিল?

'আগুন এমিন মেরে আমী, আগুনিন 'ডকট্রিন আমী' আমী কি আমেরিকানদের আগে আণবিক আক্রমণ করতে পেরেছিল?

'আমেরিকার মাঝে কি এমন মেরেও পাকা-পাকি নিশ্চিন্তে আগে যা আমী আণবিক আক্রমণ সমর্থন?'

'এর যে আণবিক মেরে তৈরী হলে, এর পরিণাম কি?'

'মানিয়ার' সাথে আগুনের আগে-পাকাপাকা সম্পর্ক। মানিয়ার কি পারমাণবী যুদ্ধে আগুনকে আণবিক আক্রমণ সমর্থন? মানিয়ার আণবিক পরি থেকে আগুনকে নিজের কি আমেরিকার পরে সমর্থন?'

'আমী, আমার সময়ী, কি এমনিন হবে আমেরিকার মেরে, পুরো আমী হবে আর। আমার 'আণবিক নীতি' বলে পরে পরে আমি আমার?'

মেরিয়েল নিজেরাজার লাগার ওকে হল পালন বলে মেরেন।

তখন যে আমী পুরোর উচ্চারণ হলেনিন আমী। আমেরিকিতে সমাজনি। মেরে মৈমিনের আগের মেরে নিয়েছে। কিন্তু মেরিয়েল খুশ, তার মেরে আমার না। তার, সে লাগা হয় না, আগুনী আগের মেরী মেরে আমে। তার, তার নাগিনেরের পরিচ পুরীরা লাগ আমার না। এমন আমি মেরেনিন তার। প্রথমের, মেরিয়েল খুশ পরিবার মেরী নিয়েল মেল নিয়ে। মৈমিনি-আমিনি মেরেরা তার প্রতি আগুনী হয়। না হলে মেরিয়েল আর হয়ে যায়। নিজের কথার। মেরেরের কথার। কিন্তু আমার উচ্চারণ প্রতি আগুনী হয়ে সে তৈরী নয়। মেরেরা আর চালনিকে খুশরে, আমে আগুনী আমেরিকার মেরে, সে নিজেকে কথা মেরে না, তবু হাসরে, মানুষ মেরেরে। মেরিয়েল নিজেরাজার এই কনসিটি নিয়ে পরের আমার পৌঁছেরে। অনেক আর পরেরী আর বাস হয়ে মেরেন।

এই সময় আগুনের মেরেরাজিনী পরী একটি গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকার করে তুললেন। আমুরিকার পরী সে আমেরিকারে সমর্থন জানল।

আমেরিকারী আগুন-আমেরিকার নিজিমিটি চুক্তির বিরুদ্ধে। আমেরাকী আগুনি আমিনিটি পরাজয়ী আমেরিকাকে আগুনে আণবিক মেরা আমুর করতে আমুরিত নিয়েরে। আগুনের সময়ে আমেরিকার খুব আমার আণবিক মেরা নিয়ে আমরান করবে। আগুন হয়ে উঠবে আমিন মুসলমানের আণবিক আমেরিকি।

আমেরাকী, মুসলি-মুসলিম আমেরিকার বিরোধিতা পড়ল।

আগুনের প্রধানমন্ত্রী মানুষের নিজি। তাঁর মত, আমেরিকার সঙ্গে নিজিমিটি চুক্তির বাধন করে মেরিয়েলকে আমিনের হাতকড়াকে আগুনে নিয়ে আসা।

১৯৭৯ সাল। চুক্তি আমিনির হয়ে ১৯৮০ সালে।

চুক্তির বিরোধিতা বারি তুলল : চুক্তিতে পরিষ্কার করে মেরা থাকবে, আগুনের আরো পুরো আণবিক মেরার উপাদিতি নিষিদ্ধ।

আমেরিকার আমেরিকারী প্রথম থেকে বলে আসছেন, আগুনে আণবিক মেরা আমা হয়নি বা, হবে না।আগুন সরকারিভাবে সমর্থন নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু আমেরাকী প্রশাসন, পরমাণু সম্পর্কে আণবিক মেরা আগুনে আমেরিকেনদের আমুর মেখেছিল। এই 'মেখার' কথা সমর্থ সম্পর্কে বীকার আমেরিকের আগুনে মানিন বাঁচুরে প্রতিবাদ।

১৯৮১ সালে মেরিয়েলে আমিনের হাতকড়াকে প্রতিনিধি মেরার মেলানিটি মৈমিনিতে আমেরিকা চুক্তির মেরে আগুনে তৈরি করবে, আমিনের হাতকড়াকে সমর্থন পথ মুখর করবে।

আগুনের মত-মুসল-প্রতিনি সমর্থে মেরেরটির মিলনকে বার্থ করতে বহু পরিশ্রম হল।

আমেরিকা এমনকিনী মেরে মেরেরটির বিরোধিতা মুখিন্ত সম্ভব পাকাবার মতে পারবের পরে এগোচ্ছে।

মেরে মেরে প্রতিবাদী আমমত্ব গড়া আমেরিকা করে মেরেছে।

সে আমমত্বের পুরোর আমী আমেরাকী নিয়ে পরিষ্কার পরের বক্তব্যে মেরিয়েল নিজেরাজার।

পুলিশ ঘটনা তুঁড়ল। আর পাকাপ মৈমিনি মুসিমকর্মিটির একটি রাত। আগুনের আণবিক বহু বিরোধী সমাবেশে প্রথম বলি।

আমেরাকী আমরা মেরে উঠল।

আগুন বিশেষজ্ঞ একটি মুখিমা পরিবার উপাদান।

এই সময় আমার মেরে আমা পারমাণবিক মেরিয়েল-টাইম মেলানিটির আমমত্ব নিয়েরিনিনের পরে। পুলিশ তার সমাধান করে আগুন তৈরি করে নিয়েরিল।

মেলানী মেলাসমূহে পারির সমস্যা নিয়ে নিজাস্ত হবে মেরিয়েলটির ওপরে পালনের।

পারিনের প্রধানমন্ত্রের আগুনে আগে বন্ধ হয়ে মেল। আগুন সরকার প্রধানে আমা হলো, তিনি আমিন মেরিয়েলটির নিজাপত্তার আমমত্বি নিয়ে পারবেন না।

প্রধানমন্ত্রী তিনি পালনার মেরালেন।

'আমার মনে আমা আর পদী চলিন নিনিটে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম। মা, বাবামা, নিনিম, বহু আমিন সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে আমার অপেক্ষায়। মেরিও. টেলিভিশনে সারাদিন ধরে মেলানী আমমত্বের আর প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকে এমার আগের মেরে আমার, তার উচ্চারিন। মেরী আমাকে কোলে তুলে নিল না এমিনে এসে আমার হাত ধরল। তার মুখেরে জল। আমাদের দুই নারীর মধ্যে নিশ্চুপ এই ধরণী বিনিময় হয়ে মেল। আমার পুরনোরী আমমত্বিনার আমার মধ্যে ও আমী-এর কথা। আমী মেরার আমিন হয়ে চলে মেরেছে। পরিবে আর পুরো পরিবে মেরেছে কিন্তু আমার আগেরটিরে মেরী। তার পুরোকে পরিবে আনে হল। আমী নিজেরাজ হয়ে পড়লাম। মনে একটা উচ্চারিত দৃষ্টি। বহু কিন্তু মেরেরী আমী। কাঁদতে মেরেরি আমার। আর আমুর একটিমে হয়ে মেরেরী এ কাজ সমর্থ হয়েছে। আমি এই প্রথম আমাকে এক নিজী আমুর পরিবর আগে নিজেকে মেরাতে পারলাম। আমি একা নই। এই

দুর্বল। আপনার একজন হয়ে আমি বলছি।'

পরদিন সেনেটারী আসার দিয়ে বাস হলেন, আসার-আসামির বিভিন্নটিতি দুর্বিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আসার যে আসামির স্থান ও অবস্থা আমিনি হোক এবার দিলি।

দুটি আসামির হল দুটি আসামীদের আসামা করে।

আসামির পরিচয় বিভিন্ন করা দুর্বিয়েছিল বিয়ে। বিভিন্নদের আসার টেবিলের একদম আসামির এবিয়েছিল বিশেষ প্রতিটি।

বিভিন্নদের অনুযায়ী বলা আসামির বিশেষজ্ঞীয় আছিলে। যে পরিচয় আছি, আর আসা নয়। আর আসুদের সমাধান সহজ নয়। মহীর প্রতিবেশীর সাহায্যে, পরিচয় বিভিন্নদের পর আসামিদের প্রতিটি বিশেষ মহীর আছি থেকে বেরোনো করে পরদিন প্রতিবেশী আছিলে, সেখান থেকে আছিলে আসির দুর্ঘটনায়।

বিশেষ মহীর আসির আসামানী, পর আসা আসার, আসা সম্ভব পুলিস পাহারা আছিল, দুর্ঘটনায় প্রতিবেশী সমাধান আছিলি।

একদম আসে তিন পরদিন সাহসে মৌসুমে নিশ্চয়তায়।

একুশ নম্বর বাসার মৌসুমে এস-এ পাস করা। প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে। বিষয় ইতালীয়ি বিজ্ঞান। তার এস-এ ডিগ্রিস: 'হিজলিয়ার আধ্যাত্মিক ধর্মের আসামির আসামন'।

একুশ নম্বর বাসার মৌসুমে প্রথম মেয়ে পড়ায়। আসির নম্বর বাসার বাস নিয়ে হয়ে গেল।

'আমার মনে হয়, আমি অন্য ও ইতালিয়ানে ভালবাসেনি। এইবার আসামানের পর পেয়ে আমি তার পরিচিতদের আসার জীবনে তুমি আসামার আসবে না। অন্যদের মেয়েটি হয়ে ছিল। আসার সমাপ্তি। আমি আর মেয়ে মেয়েদের আসা বিশ্বাস করে নিয়ে আসে আসছে। আসুদের ইতিমে আমার খুব উপভোগের ছিল। অন্যদের কথা আসা যে আমাকে আসামানে, আমি আসার চলছে, তুমি হলাম, তাকে আসামানে মেয়েদের। আসার ইচ্ছে, তিন ডাকবিভাগ আসার পর নিয়ে পড়ব। অন্যদের অবিশ্বাস হয়ে উঠল। এক বছরের মধ্যে আসামান নিয়ে হয়ে গেল।

'আমি আবিদ বিশ্বাস। অন্যদের আমার খুব খুশি।

'অন্যদের ও ইতালিয়ানি একটি পরিবারের ছেলে। তার বাবা ছিল একটি ইলেকট্রনিক মেশিনারীর প্রোপ্রাইটর। ইতালিয়ানি অর্থনৈতিক চাপ থেকে হচ্ছিলে। আমেরিকার এসে কাজ করেন। প্রথম ইতালির ইলেকট্রনিক বিভিন্ন ইংলিশের কারণে ইতালিয়ানি অর্থনৈতিক। কর্মচারীরা। এসেন পর এক ছিলেরকম মেয়েদেরন।

'অন্যদের, আমার মনে, ঠিক কথা যে লক্ষণ আছে। পারবে। আমিনিজিন আসামান দেখবে। আমার টেবিলে থেকে বিশেষ আমার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি টেবিলে তুলিআমিটিতে আছিলেন নাকি। আসামানে আমিনিজ বিয়েটা আমেরিকায় আমি এখন একদম আর পরিচিত। ছেলেমানুষকে সমাধান কথার মেন বিশ্রান্তি পরিচয় আসার। মেয়েটিনি পরিচয় সমাধান আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে।

'তবু আমি অন্যদের'র অনুযোগে লক্ষণ থেকে ছাড়ী হলাম।

'সমাধান বিয়ে আসামানে আমে বিয়েতে দেখা নিল। আমি চাইলাম লক্ষণ তুলিআমিটিতে আমি হয়ে তাকাইতে আমি। অন্যদের আমা নিল। আমি এত বেশে আমেন তাকাতাড়ি আমেন বেশি আমা ইতিমিনি আমা ও মেশা নিয়ে মেয়েন। অন্যদের মেটা মেয়েই পাস্তন করা না।

'অন্যদের ইচ্ছে আসামীদের আমে পাহাড়ে একটা ইতিমনী তুলা ভাড়াবেন। ছোট আমা নিয়ে সে দেখা, আসামীরা সে আমার নিয়ে ইতিমনী নিশ্চয় আমে টেবিলে ও পাহাড়ে দুটি ইতিমন পাহাড়েরকে তুলা তুলনা আমার নিশ্চিন্ত আমে। আমি আমি হয়ে মেয়েন তুলা তুলবে। বিভিন্নের অন্যদের সমাধি নিল আমাকে লক্ষণ তুলিআমিটিতে আমি হয়ে।

'টেবিলে-এ তুলনা মেয়েনকার একদম আমে অন্যদের হলে মেন মেয়ে। লক্ষণে তুল মেয়েনের পরিচয় পাস্তন আমার একদম।

'একটি আমে তু আমা মেটা মেন। ইতিমন তুল আন আমেন হল। কিন্তু তুলিআমিটিতে আমার পরা এসেছে পাস্তন না। আমি মেয়েকে মেয়েন, একটি বিশ্বাস, আমিন মেন, আমিন আমার আমে পরা বিশ্বাস। আমার আমিন আমেন আমুর্ণ। তবু সে আমিনে আমার আর, আমার আমার। লক্ষণ থেকে লক্ষণটি পর্যন্ত সে আমেনের মেটা আমে আর মেয়েনকারে আমে। আমি আর আর-মেয়েনকার ইতিমনে পুরো-আমে নিয়ি।

'কিন্তু এর আর মে আমার পরনা মেটা। এর মেটা আর মে আমার আমে আমার, তুলনিন। আমি পাহাড়েনের আমে আমেনকার হয়ে মেয়েছিলাম। হয়ে পারটি না। অন্যদের আমাকে আমিনে মেন না। আর, মেয়েন না কিন্তু পরনা, পরা মেয়ে। ইতিন পরনা, আমে মেয়ে তুলে নিন। আমার বিভিন্ন আমিনে আমেনে আর মেয়ে আমি আমার আমে লক্ষণে পাস্তনা। আমার বিয়ের একটা আর লক্ষণ হয়। এবার আমার বিয়ের অন্যদের মেয়েন ইচ্ছে মেটা। ইতিন লক্ষ তুলনা। আমি 'ইতিমনে' পরা লক্ষণে পারি, কিন্তু অন্যদের আমে, আমার 'ইতিমন মেটা বিশ্বাস আর লক্ষ। আমি ইতিমিনি আমেনটি, আমিন আমেনটি, আমার আমেনটি। এবার বিভিন্নিনের আমেনকার মেটা, আমার আমিন।

'অন্যদের বলল, আমি লক্ষণ আমি। সে আমিনটি ইতিমি লক্ষণে হয়। আমি বিয়ের পরিচয়ে আমেন লক্ষণে আর হলো আমেনকার তুলে মেয়েন না। অন্যদের ইলেকট্রনিক টা আর জীবন আমিন আমার পরে আমি হয়ে ইতিমিনে। আর লক্ষণকার পরিবারটির হলো আমে আমি আমুর নয়।

'আমার ইচ্ছে আমার আর হল আমি তুলি পরিবারটি হয়ে আসেনি। তিন লক্ষণ মেটা মেন, আমার 'নিশ্চিন্ত' নয়। তার মেয়ে আমি মেয়েন হলে মেয়েন হলনাআমেন। আমেন পরিচয় হলনাআমেন মেয়ে আমি তার মুখ আর নিয়ে এলাম। অন্যদের বিয়ুই ভালো না। আমে আমার আমেনকার মেয়েনের না আমি।

'বিয়ানের তুলিন লক্ষণ আমি একটা জীবন আমিন আমিনকার আমে মেয়েনার।

'ইতিমনি আপনাদের আমেনিআর আর-নিয়েন আমেনকারের মেয়েনটির আমে লক্ষণে আমে আমেনিআর। এর নিশ্চিন্ত আমার নিশ্চিন্তে লক্ষণে আমেনকারের মেয়েনটির আমেনকার আমে। আমেনকারের মেয়েনটি মেয়েনিন মেয়ে লক্ষণের আমে নতুন পর্যবেক্ষণে আমেনিন নিশ্চিন্তে ইতিমি আমার। আমার ইচ্ছে আমার মেয়ে পরে মেন নিশ্চয়নিআর ইয়েন-এ।

'এ মেয়ে আমা পর্যন্ত তুলে ইচ্ছে আমার।

'অন্যদের আমি আমার আমে মনে আমি আমে পাস্তনার আমনার। নিশ্চয়টি দেখিতে আমাকে চাইলাম আমি নিয়ে। অন্যদের মেন আমেন মনেই বলল, 'আমি। এটা আমাদের প্রথম আমনে। এখন আমার আমেনিআর আমে নিয়েন নিয়ে আপনিনার হলাম। তুমি মেন আমেনি, এটা নিয়ে আমাদের মেটা আমে।'

'আমার পরীক্ষা পাস্তন হয়ে গেছে।

'ইতিমনি আপনাদের এখন আমনিন মেয়ে আমার।' আমার প্রথমে আর অন্যদের লক্ষণ আমা না।

'ইঁ। আমেনটা নিশ্চয়টিনের পর তিন নিশ্চিন্ত আমার। তু নিশ্চিন্ত আমার লাভ।

'তুমি এটা পুরো সমাপ্তি আমার।'

'নিশ্চয়। আমি প্রথম মেয়েটি এর সঙ্গে আমিন। তুমি ইতিমিনে আমার আমেনার সমাধান নয়। আমি মেন আমাদের আমাকে ইতিমিনি প্রতিটি করে আমেনিআর পরীক্ষেনে। আমার মুখনে সমাধান আমাটা আমে মেয়ে আমেনিআর। আমার আমিনে হয়ে সমাধি মেন লক্ষণ আমার।

'আমার মনে আমে, আমার আমা ও আমি আমাদিনিতে আমনিন আমেনকারে পুরে আমি হয়ে গেছে।'

অন্যদের বলল, 'আমেন লক্ষণ আপনাদিন মনে।'

আমি হয়ে লক্ষণ আমে আমিনে মেয়েনার। নিশ্চিন্ত পরনা অন্যদের ইতিমনিনি আপনা। আমার সমাধান পরীক্ষেনে সমাধান পরি নিয়ে আমে আমেনকার করে সমাধান। আমেনিআর আমে নিয়েন আমে পরীক্ষেনে। মেন পর্যন্ত অন্যদের আমাকে নিয়েই তুলি আমার। আমি আমার হয়ে মেনার।

'আমাদের নিয়ে মেয়ে মেন।'

তুলনা নিয়েন তবু নিয়েই নিয়ন মেয়েনে। হয়ে এল টেবিলে। আর আমে। নিয়ন পরনা মেটা। পরাক্রমে নয়। তবু না আমেন। না তখনকে মেন মেয়েনে হয়ে এসেছে নিয়ন্ত্রি নিশ্চিন্ত আমে। আমেনে, 'এখন আমার নতুন আমে আমে আমে। আমার হয়ে না। আপনাকে পুরনো পরীক্ষা আমেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত লক্ষণে টা মেয়েনে পরনা আমে না। তুমি আমি হলে নিশ্চিন্ত পরনে না আপনাকে। কিন্তু নিয়েন পরনাকার জীবন তৈরি করে নিয়ে পরনে।

'তা আমি মেয়েটি', বলল মেয়েনে নিশ্চয়নার। 'আমার হয়নি। আপনি পুরনো মেন। পিতা নয়ন আমাকে পিতৃ আমাকে লক্ষণে হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি। আমার আমিনটা হয়ে গেছে। তুলিআমিটিতে চাকরী পাস্তন। আমি এখন নিয়েন পরনে পিতার আমেন আপনাদি আমি।'

'তুমি আপনি।'

'নিয়েনে নিয়ে তুমি। আমি আমি। নিয়েন মেয়েনে আমি। আমার আপন নির্ভর করে না। এবে আমি তুমি।'

নয়ন মনে মেয়েনে বলল, 'আমার নিয়ে, পুরীনি নিয়ে আমি পরীক্ষা। আমেনিন আমেনে পরনে এটা নয়ন নিয়েনে হয়ে। আমেনকে নয়নে এখনও সমাধিনার মেয়ে আমেন তুমি।'

'নিশ্চয়, মেয়ে, এখনে আমেনকার মেটা আমেনার।' নিশ্চয়ন নিয়েনটি সমাপ্তিন এর বলনেন।

'নিয়েনে আমেনকার মেটা। আমিনকার আমটা মেয়েনকার মেয়ে নিয়ে আমে আমেনিআর। আমি মেয়েন পুরনো আমেনকারে নিশ্চয় হয়ে আমুর পরি।'

'মেয়ে।'

'আমেনকারীন এখনকারকার আমেন না
তাল আমা নিশ্চয় আমি না আমনার।'

'নয়নে আমি। নয়নে সমাপ্তিনে আমি। নিয়েনিন-আপনিনি আমে আমে না আমি আমে নিয়নে আমি।'

'নয়নে।'

'আমি না পরনে নিয়ে। না মেয়ে নয়ন নয়ন পুরীনির আমেনিনে। তবে এটুকু আমি যে নয়নে চলবে। আপনা মেয়ে আমেনিন, আমেনিন মেয়ে তুলন, আপনা এমনিন আমা নিয়ে। আমেনিন পরনাকার আমুনের চলন পরে, নয়নে নয়ন আপনা। এর মেয়ে আর্থ পুরনির নিয়ে, নিশ্চিন্তে পরনিন আমনা আমা নিয়ে মেটা।

'আমুর নিয়েনি এ আমনা পরিন না। হয় এ আমনাকে পুর নয়নে, নয় এ আমনা আমা যে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

'নয়নে চলবে'।

কুমুদিনী

তারাপদ রায়

অবন্তিকা

আমার এ গল্প, জলের গল্প।

এই মর্ত জগতের এক প্রান্তে একলা এক বিবাহীন মফস্বল ছিলো। সেখানে রেল যায় না, যায় না বিমান। এখনো যায় না।

এখনকার কথা এখানে নয়। ও গল্প বহুকাল অনন্ত কাল আগের। এ গল্পের রাজহাঁসকে ধলেশ্বরী নদীর তীরের জাহাজঘাটায় যারা দেখেছিলো তারা সবাই আজ প্রৌঢ়, বৃদ্ধ অথবা প্রয়াতদের মানুষ।

ঐ সাদা রাজহাঁসটি যা সত্যি, তাছাড়া এ কাহিনীর আর সবই বানানো, কাল্পনিক। লোকজন আরশা সব মেলানো মেশানো। আমার নিজেরই কি যাই সব মনে আছে?

মনে থাকার কথাও নয়। আর সেই জন্যেই এ গল্প লিখতে কোনো বাধা নেই, পরিশ্রম নেই। এ কোনো স্মৃতিচারণ নয়, একটি স্বপ্নের রাজহাঁস নিয়ে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাওয়া এক জন্য পৃথিবীর কাহিনী, এক পদ্মাকাহের গল্পকথা।

পঁচিশ বছর আগের এক কবি আরেকটি স্বপ্নের হাঁসের কথা লিখেছিলেন,

'যেভাবে দাবানে
আমাদের ছেলেবেলা দ্রুত ঘরে ফিরেছিল।
যেখানে গিয়েছি
অদ্ভুত রঙীন ছোপে আমাদের চিহ্ন পড়ে যেতো।

নিজেদের অতিক্রম আমরা করেছি।
সকলেই অনুমানে বলেছিলো চতুর্দিকে: এ' তো

রায়বাবুদের ছেলে, অমুক পাড়ির হাঁস—
এ পুকুরে কেন?'
(উৎপল কুমার বসু)

এই কুসুমিনী সেই হাসপিসিই হবে।

(এক)

বড়লোকের পাখি

বড়লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল'---

শেষ ভাদ্রের দিকে নদীর উজানমুখ থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা বাতাস আসে। কার্তিকের শেষ থেকে শুরু হয় হাওয়াটা, আর কোনো কোনো বছর চৈত্র পর্যন্ত ভোরবেলার উদাস হিমেল ভাবটা থেকে যায়।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ভয় করেন না নিবারণবাবু। শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় তিনি প্রতিদিন সূর্য ওঠার প্রায় এক প্রহর আগে ঘুম থেকে ওঠেন।

নিবারণবাবুর ঘুম থেকে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করে সামনের চরের শেয়ালেরা। যখন কাঠের পাটাতনের উপরে নিবারণ মজুমদারের খড়মের খট্ খট্ শব্দ তারা পায়, কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর খালির উপর দিয়ে ওটি ওটি একসার মানুষের জন্যের কাছে চলে আসে, সেখানে জলের ধারে চারজনের মধ্যে সারি দিয়ে বসে তারা তাদের মুখগুলো আকাশের দিকে করে নিবারণ মজুমদারের খড়মের আওয়াজের তর্জন প্রতিধ্বনি জানায়।

নিবারণবাবু এসব তোয়াক্কা করেন না। কারণ তিনি জানেন রাত এভাবেই শেষ হয়। শেয়ালদের গোলমাল নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামান না।

এর পরেই ভোর হওয়ার ব্যাপারটা। ভোর হওয়া সোজা নয়, সেটা অনেক গোলমাল। নদীর ওপারে মধ্যতপুরের মোকদ্দমাপুরুষী ডিসপেন্সারির সামনের মকুলদাদের অনেকগুলো ছোট সাদা ফুলের মধ্যে একটা কিশোর লাল পলাশে আকাশকুসুম টকটকে করে ফুলে উঠবে, তারো আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার শিরনে হাজী সাহেবের বাদামগাছের ওপাশ থেকে একপাল মুরগি রাত ফুরিয়ে যাওয়ার ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠবে।

এখনো দিনের বাস্তবতা শুরু হতে বেশ কিছু সময় বাকি। ওপাশের হিন্দু হোটেলের জন্যের বি জানলা গত রাতের অবশিষ্ট ঠাণ্ডা বাসনগুলো নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে গেল। উনুনেও আগুন দেওয়া হয়েছে। কাঁচা জাম কাঠের জ্বালানি, ধরতে সময় নিচ্ছে। একটুই হিন্দু হোটেলের মালিক তেওয়ারি ঠাকুর ঘুম ভেঙে উঠে হাই চাই হাঁকডাক শুরু করে দেবে।

প্রথম স্টীমার আসবে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে বিরাজগঞ্জ থেকে। সাড়ে ছয়টা কিংবা তারো আগে থেকে পাবে হৈচৈ, টংটাং গাড়িতে, সাইকেলে যাত্রীরা আসতে শুরু করবে, স্টীমার ভাড়ার হিসিট পনেরো আনে টাউন সার্ভিস জাহাজের বাসটাও এসে যাবে আটেপৃষ্ঠে যাত্রী নিয়ে।

জায়গাটার নাম বেড়াবাড়ি। নদীর জল বছরের একেক সময়ে একেক রকমভাবে নোনাগুঁড়া করে। বেড়াবাড়িও জলের ওঠানামার সঙ্গে এদিয়ে পিছিয়ে যায়।

বেড়াবাড়ি ঘাটে দিনে রাতে তিনটা স্টীমার ভরা আসে। যখন স্টীমার ঘাটে এসে দাঁড়ায় তখন রীতিমত জমজমাট ব্যাপার। লোকেরা নামে, ওঠে। দূর বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরে, বাড়ি থেকে বিদেশ যায়। কান্নাকাটি যাতায়াতও আছে। দু'চারজন ইস্কুল মাস্টার, অফিস আদালতের বাবু সৈনিক যাত্রীও আছে।

নিবারণবাবু স্টীমার কোম্পানির মুহুরি ক্লার্ক। সকালের শিফটার একটু বেলি চাপ পড়ে। মুহুরি থেকে মুহুরি আদায় এক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, নৈমিত্তিক কাজকর্ম সেরে সাড়ে ছটার মধ্যে মুহুরি কাউন্টারে গিয়ে বসতে হয়।

অবশ্য মুহুরি কাউন্টারের ছোট ঘরটা সাড়ে ছটার অনেক আগেই নিবারণবাবু ঘুম থেকে ওঠার একটু পরে আকাশ যখন ফরসা হয়ে এসেছে, সেই সময় সনাতন এসে খুলে দেয়। কুসুম জেনো কোনো কাজে ঐ ঘরটায় থাকে। খুলে দেওয়ার পর সে জন্য ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে যায়।

সামনের গ্রাম থেকে সনাতন মাঝি আসে। সে এসে ঐ মুহুরি ঘরটা পরিষ্কার করে, তারপর নিবারণবাবুর জন্য, সামনের পাটাতন, নদীর ঘাট থেকে এই জাহাজ ঘর পর্যন্ত পরে চলার রাস্তাটা শক্ত ঝাঁশের ঝাঁটা দিয়ে ঝকঝক করে পরিষ্কার করে সনাতন।

কত রকমের লোক যায় আসে জাহাজ ঘাটায়। বিড়ির টুকরো, টেঁড়া কাগজ, পানের পিক কি ফাঁকন নেওয়া হয়ে থাকে ঘাটটা। সকাল-বিকেল দুবেলা সনাতন ঝাঁ করে নিজের।

সনাতন এলে মুহুরি ঘরের বন্ধী দশা থেকে ছাড়া পাবে, এটা কুসুম জানে। সনাতনের গলার শব্দ, এমনকি পায়ের শব্দ পর্যন্ত সে জানে। নদীর ঘাটের ওপর বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে পানের দোকানটা, সেখানে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা প্রথম গ্রাহক সনাতন, এক পয়সার বিড়ি কেনে। পানবিড়িওলার সঙ্গে সনাতনের দু'একটা ছোটখাট কথা হয়।

প্রায় মুখো হাত ঘুরে ভার বন্ধ ঘর থেকে কুসুম তা শুনতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে কঁক কঁক কঁক করে আওয়াজ তর্জন করে সে ঘরের মধ্যে থেকে ওঠে।

কুসুমের চেঁচানি শুনে নিবারণবাবুও বুঝতে পারেন সনাতন আসছে। তিনিও গলা ঝেড়ান, তারপর দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ডাকেন, 'এই সনাতন, আর দেরি করিস না রে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।'

সনাতন এসে ঘরজা খুলে দেবার পর সামনের কাঠের পাটাতনটার উপরে উঠে একবার চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নেয় কুসুম। কাঠের পাটাতনটার উপর সারারাত আড় আর বাত মুটো কুসুম খুঁজে।

কুসুম ঘরের ভিতর থেকে পাটাতনের উপরে চলে আসা মাত্র বিশু অতি সন্তর্পণে কুসুমকে আদর করে দেয়। তারা নিচে নেমে গিয়ে হিন্দু হোটেলের পিছনের আঁস্তাকুড়ে কিছু খাবার মেলে কিনা তার চেষ্টা করে।

রাত-বাত যে কুসুমকে খাটির করে সেটা অকারণ নয়। রাত নিজে চিরকালই শান্ত প্রকৃতির। সে খুব একটা মারামারি, কাটাকাটি পছন্দ করে না, কাউকে সে ভীতিও না। চুরি-চামারি করে, লোক ঠেকে সামান্য খাবার জোগাড় করতে পারলেই তার হয়ে গেল। বাকি সময় সে নির্বিকার ভাবে শুয়ে বা বসে থাকে, কিংবা ঘুমোয়। বড় জোর কখনো সখনো শাত খুব বেড়ে বেড়ে করলে কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে তাহলে সে তার দোহার কি করে।

রাত একটু বেঁকে যাওয়ার। কিন্তু কুসুম যেদিন এখানে প্রথম আসে সেদিনই শিক্ষা হয়েছিল। সে ঠিক কুসুমকে আক্রমণ করতে যায়নি, তার গর্জন করতে করতে সে কৌতূহলী হয়ে নাকটা উঁচু করে কুসুমকে শুঁকতে গিয়েছিল।

রাতের খুব দোষ দেওয়া যায় না। সে দু'চারটে শুয়রছা, শালিক, কাক টাক দেখেছে। নদীর ওপিকের ঘাটে, তাছাড়া বাস স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে গুয়র পাড়ার দিকেও রাত অবেলাতে সফর করে বেড়াতে যায় সেখানে সে শাঁতি হাঁস দেখেছে। কিন্তু এত বড়ো একটা সাদা ধবধবে পাখি, বিলকুল ভাগলবাঁ চেহারা, জীবনে প্রথম রাজহাঁস দেখে শীতার ঘাটের সামান্য রাত কুসুমের কৌতূহল হওয়া নিশ্চয় দোষের নয়।

দুঃখের বিষয়, রাতের সেই অনুসন্ধিৎসা ফলপ্রসূ হয়েছিল। সে নাক বাড়িয়ে কুসুমের কাছে এগিয়ে যাওয়ার আগেই হঠাৎ প্রায় আড়াই ফুট লম্বা উঁচু করে পায়ের পাতার উপরে সটান দাঁড়িয়ে হলুদ শক্ত ঠোঁট দিয়ে কুসুম রাতের শরীরের সব চেয়ে নরম জায়গাটার ঠিক মাঝের জায়গা বরাবর কালো ঠাণ্ডা অংশটার উপরে তীব্রভাবে আঘাত করলো।

মুহূর্তের মধ্যে রাতের তরতাজা চিৎকারে জাহাজ ঘাটের নিস্তব্ধ পরিবেশ চমকিয়ে উঠলো।

সেটাও ছিলো এই রকম এক সকাল। তখনো স্টীমার আসতে দেরি আছে। ঘাটে লোকজন বিশেষ কেউ আসেনি।

রাত দাত দু'জনেই হিন্দু হোটেলের কাজের লোক জানকীর দু'চোখের মণি। তাদের হোটেলের থেকে জানকী কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। চোখ মেলার পর পরেই এদের দু'জনকে আহ্লাদ আটার খেতেটতে পাবে বলে জানকী গ্রামের ভেতর থেকে নিয়ে এসে পুষেছে।

রাত-দাত সারাদিন হোটেলের সামনের উঠোনে থাকে, রাত দশটা পর্যন্ত জানকী খেয়ে উঠে হোটেলের রান্নার জায়গায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত। হোটেলের বহুদিন পর্যন্ত তারা জানকীর কাছেই শুতো, কিন্তু এখে তারা বড় হয়ে গেছে, তার উপরে হোটেলের মালিকের রান্না ঘরে ঘুমুতে শুতে নিতে আপত্তি, এখন অনেকদিন হল তারা দুজনে ঘরের সামনের কাঠের পাটাতনের উপরে থাকে।

গাওর কাকর চিৎকারে ভোরে জানকী ছুটে এল। নদীর ঘাটে যখন দাঁড়িয়ে ছিল সে। সেওদেরকে সেখানে সেভাবে রেখেই জানকী ছুটে এল।

নিবারণবাবু বালির চড়ায় পায়চারি করতে করতে দাঁতন করছিলেন, তিনিও এলেন। এত সকালবেলায় হঠাৎ কুমুদটা এরকম আর্তনাদ করে উঠলো।

দাতুর তখন নাক দিয়ে গরগর করে রক্ত পড়ছে। সে আর রাদু দু'জনেই পাটাতন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসেছে। তাদের সেরা শেয়ানো, চেহারার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

সামনের পাটাতনের উপরে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যকি ভঙ্গিতে পুরো দৃশ্যটা লক্ষ্য করছে একটা বিরাট রাজহাঁস।

নিবারণবাবু আর জানকী দু'জনেই তাকে দেখলেন। জানকী বললেন, 'এটাকে তো আগে দেখিনি। এ জানোয়ারটা আবার এখানে কোথা থেকে এল?

নিবারণবাবু বললেন, 'বোধহয় সামনের গ্রাম থেকে এসেছে।'

ততক্ষণে সনাতন কাছে এসে গেছে। সেও এসে রাজহাঁসটাকে দেখলো। সনাতন বলল, 'সামনের গ্রাম থেকে কি করে আসবে? তারপাশে তো সব গরীবের গ্রাম, এসব গ্রামে এরকম হাঁস কারো নেই। এতো বড়লোকের পাখি।'

(দুই)

ঘাসের কুমুদ

'...দুই জগতের মধ্য হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে'...

সেই থেকে রাজহাঁসটা এই জাহাজ ঘাটায়।

আর. এস. এন. কোম্পানির বেড়াবাড়ি স্টীমার স্টেশনের বুকিং বা নিবারণবাবুই স্টেশনের অভিভাবক। তাঁকে লোকে আজকাল মাষ্টারবাবু বলে। নিবারণবাবু শুধু বুকিং বাবু নন। তিনি একধারে টিকিট বেচেন, খালী নিয়ন্ত্রণ করেন, স্টেশন মাস্টারের যা কাজ প্রায় সবই তাঁকে করতে হয়। তাঁকে সাহায্য করার লোক বলতে ঐ বা সনাতন।

আগের যিনি স্টেশন মাস্টার ছিলেন তিনি তিন মাস আগে বিয়ে করতে দেশে গিয়েছিলেন, তারপর আর ফেরেননি। লোকে বলে মাস্টারবাবু ফর জামাই হয়েছেন, আর এই চাকরিতে আসবেন না।

সে যা হোক নিবারণবাবু ব্যবসাধর্ম্ম স্টেশন মাস্টারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর. এস. এন কোম্পানির ব্রাঞ্চ অফিস কাছেই। এখান থেকে স্টীমারে ঘন্টা দেড় ঘন্টার পথ। তেমন কিছু অসুবিধে হলে সেখান থেকে লোক আসে সাহায্য করতে। তাছাড়া প্রত্যেক স্টীমারের সঙ্গেই ক্যাশিয়ারবাবু একজন আসেন, তিনি তখনকার টিকিট বিক্রির হিসেব মেখে, নগদ টাকা পয়সা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যান। সে ব্যাপারে কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই। মাসের প্রথমে নিবারণবাবু আর সনাতনের মাইনের টাকাও ক্যাশিয়ারবাবুই নিয়ে যান।

প্রত্যেক স্টীমারের সঙ্গে খালাসীরা থাকে। তারাই মালপত্র লোকজন উঠানো, নামানো, স্টীমার ঘাটে লাগলে সিড়ি লাগানো, তারপরে ছাড়ার সময় নামানো—সাহেব শেষ সিড়ি বাজারের পর জেটির ওপর থেকে সিড়ি গুটিয়ে নেয়া এইসব করে।

নিবারণবাবুর রাজহাঁসকে অবশ্যকিছুর অন্তে সবাই চিনে ফেলল।

জানকীদি হাই ইংলিশ স্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিত মশায়, ভাগবতপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, তিনি থাকেন নদীর ওপারের একটা গ্রামে। এখান থেকে কিছু দূরে যে স্রোত সরে, সেখানে জানকীদি স্কুল। প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার দিন বিকেলের স্টীমারে বাড়ি যান ভাগবতপ্রসাদবাবু আর সোমবার সকালের স্টীমারে ফিরে আসেন। সারা সপ্তাহটা স্কুল বোর্ডিং-এ কাটে।

ভাগবতপ্রসাদবাবু শুধু কাব্যতীর্থ নন। তিনি কাব্যরসিক মানুষ। বছরান্তে স্কুলের সরস্বতী পুজোয় সেবারের পরে একটা করে মতুন সংস্কৃত পদ্য তিনি নিজেই রচনা করে নেন।

রাজহাঁসটা জাহাজ ঘাটায় প্রথম যেদিন আসে সেটা ছিল সরস্বতী পুজোর দিন কয়েক আগের এক বুধবার। সেই শনিবার দিন সরস্বতী পুজো ছিলো বলে ভাগবতপ্রসাদবাবু বাড়ি যেতে পারেননি। কিন্তু জাহাজ ঘাটার বিকেলের দিকে এসেছিলেন বাড়ির গ্রামের বা আশেপাশের কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলে দেবেন বাড়িতে জানিয়ে দিতে যে ফিরতে পারছেন না, একেবারে পরের শনিবার ফিরবেন।

নিবারণবাবুর টিকিট ঘরে একটা কাঠের বড় তক্তা বেঞ্চির মত করে দুটো মোটা বাঁশের সঙ্গে লাগানো আছে। সেই বেঞ্চির উপরে কাব্যতীর্থ মশায় বসেছিলেন।

এমন সময় রাজহাঁসটা পুরো জাহাজ ঘাটটা একবার পাক মেরে সব কিছু খেয়েওনে তারপর বুকিং ঘরে ঢুকলো। এ কদিন ধরে নিবারণবাবু হাঁসটার এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর একবার বুকিং ঘরে এসে বিশ্রাম করে যায়।

রাজহাঁসটা ঘরে ঢুকে নির্বিকারভাবে একটা লাথি দিয়ে যেখানে পণ্ডিতমশায় বসেছেন তার পাশে গিয়ে বসলো।

এত বড় একটা অভিজাত পাখি কিন্তু চেহারার মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব। একটা সৌম্য ব্যক্তিত্ব রয়েছে চলা চলনে, চলাফেরায়, চোখের দৃষ্টিতে।

পণ্ডিতমশায় এবার সরস্বতী পুজোর যে সংস্কৃত পদ্যটা লিখেছেন, তাতে একটা শ্বেতশুভ্র রাজহাঁসের মহানন্দে কথা আছে, যে পরিষ্কার কাননের কনকচম্পকদল নীর্বিকার কুমুদ কহ্লারের সঙ্গে বাগীদেবীর চরণতলে খেলা করছে।

রাজহাঁসটাকে একটু দেখে তার ভক্ত কবিহৃদয় পণ্ডিতমশায়ের আবার সেই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতটার কথাও মনে পড়ল।

রাজহাঁসটা আলতোভাবে তাঁর পাশে গিয়ে বসতে তিনি একটু সংকুচিত হয়ে সরে গিয়ে নিবারণবাবুকে বললেন, 'ও নিবারণ, চমৎকার হাঁসতো। কিনলে নাকি, পুষবে?'

নিবারণবাবু কাউন্টারের ভিতর দিয়ে এক যাত্রীর কাছ থেকে টিকিটের দাম মিটিয়ে দিচ্ছিলেন, একটা দামী দোক্তাপাতি কিনেছিলেন খুচরো ফেরতের সঙ্গে। সে লোকটা নেবে না। নিবারণবাবু দাঁত খিচোচ্ছিলেন, 'নেবে না মানে। সরকারি পয়সা। আর একি আমি বানিয়েছি নাকি, এ তো তোমরাই কেন্ট দিয়েছো?'

লোকটা আমতা আমতা করে দোক্তাপাতিটা নিয়ে চলে গেল। লোকটা জানবাজের ব্যাপারী, ওপারের হাট থেকে সপ্তাহে দুদিন তরিতরকারি নিয়ে টাউনে আসে। সব সময়েই তার কাছে নিয়মের বেশি মাল থাকে। নিবারণবাবুকে চটিয়ে তার সুবিধে হবে না, দোক্তাপাতিটা বাজারে কেনাবেচার সময় কোনো অজুহাতে পছিয়ে দেয়া যাবে। সে কেটে পড়ল।

নিবারণবাবু পণ্ডিতমশায়ের প্রশ্নের খেই ধরলেন এবার, 'না না। কিনবো কোথা থেকে? কোন্ জাহাজ থেকে যেন একা একাই চলে এসেছে। ভারী ভাল হাঁস, মাথায় হাত দিন। কিছু বলবে না।'

পণ্ডিতমশায় ভয়ে ভয়ে পাখিটার মাথায় হাত দিলেন, সে মাথাটা নিচু

ঘরে ঘন্টা দিয়ে পণ্ডিতমশায়কে জানাতে যাচ্ছে লাগল, আর আজকে চোখ বুজে রইল।

সেদিন পণ্ডিতমশায় যতক্ষণ রইলেন, হাঁসটা তার কোল ছেঁড়ে নড়ে রইলে. তারপর তিনি যখন ফিরে গেলেন সন্ধ্যার একটু আগে, সন্ধ্যার আরতির সরস্বতীর আরতী আছে, হাঁসটা পিছু পিছু বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

তারপর অনেক রাতে সরস্বতী পুজোর ঘন্টাধ্বনির কোলাহলের পর যখন প্রায় ভরসোপাল কলকাতীর্থ ঘুমোচ্ছেন তিনি সারা রাজহাঁসটাকে ঘরে দেখলেন। ঘরের সারা জলঝিনী নদীর নীলজলে বিরাট সারা রাজহাঁস জল ছিটিয়ে দুটুমি করে খেলা করছে, আর নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মা সরস্বতী তাকে ডাকছেন, 'কুসুম, কুসুম। আর জলে খেলে না। কুসুম, ভাল হবে না বলছি, তাড়াতাড়ি উঠে এস।'

শেষ রাতের ঘরে, শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের আর নীল কুয়াশার আবেশ জড়ানো ছিলো তন্দ্রা। ভরসোপাল কলকাতীর্থ তন্দ্রা থেকে উঠে, বোর্ডিংয়ের মাঠের মতনে সরস্বতী ঠাকুরকে একটা প্রণাম করে চোখ বুজে ঘন্টা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ঘরে যে সরস্বতীকে দেখেছেন এই মূর্তির সরস্বতীর থেকে তিনি অনেক বেশি সুন্দরী, তার শরীরের থেকে কেমন একটা গোলাপী আভা, চোখের মণি অতসী ফুলের মত নীল।

প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক অবস্থায় ভরসোপালবাবুর কেমন ঘোর এসে গিয়েছিল। একটু পরে সম্বিৎ ফিরে আসতে মোটা কুয়াশার আলোয়ানটা দিয়ে কানমাথা ভাল করে ঢেকে, শরীরটা ভালভাবে জড়িয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হলেন।

পণ্ডিতমশায় যখন ঘাটে পৌঁছলেন, তখনো পুরোপুরি সকাল হয়নি। মাঝে মাঝে এসে ঘাটের ঘাট নিচ্ছে। বুঝি বা ঘুমে নিয়েছে হাঁসটা ধীরেসুস্থে চলাফেরা করছে ঘুরে ঘুরে। পণ্ডিতমশায়কে বাস স্ট্যাণ্ডের মুখে দেখতে পেয়েই সে ছুটে পারে ঝাঁক ঝাঁক করে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

পণ্ডিতমশায়ের কাছে গিয়ে সে একবার ডানা ঝেড়ে মূর্তিতে তাঁর একটা টিকিট দিল। রাজহাঁসটাকে আজ খুব যত্ন করে পণ্ডিতমশায় দেখলেন, না, কোনো সন্দেহ নেই, এই হাঁসটাকেই কাল স্বপ্নে তিনি ঘরে দেখেছেন।

এত সাত সকালে পণ্ডিতমশায়কে দেখে নিবারণবাবু অবশ্যই একটু অবাক হলেন। তখন তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। বুঝি ঘরের পাশের একটা কাঠের আসবাবে তাঁর বাস। সেখানে একটা কৌটোয় মধ্যে কিছু মুড়ি, বাতাসা তাঁর রাখা থাকে। সেটাই তাঁর মুখোপার জলখাবার। কখনো খেতে ইচ্ছে হলে কিছু হোটেলের ওপাশের চায়ের রসগোল্লার কোনো দোকান থেকে একটা ঘুটো মিষ্টি কিনেও খান।

পণ্ডিতমশায় যখন এলেন, নিবারণবাবু ঐ মুড়ি, বাতাসা খাচ্ছিলেন। আজ কয়েকদিন হল রাজহাঁসটা তাঁর মুড়ির ভাগীদার হয়েছে। তিনি দিয়ে দেখেছেন, বাতাসা খাবনা কিন্তু মুড়ির খুব ভক্ত।

আগে কুসুম মুটো মত-খাত মুড়ি খাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসতো, আজকাল আর হাঁসটার ভয়ে এগোয় না।

পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে হাঁসটা নিবারণবাবুর কাছে এল। নিবারণবাবু অনেকটা মুড়ি পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিলেন, সে মহা খুসি ঘুটে ঘুটে খেতে লাগল।

একটা পর ঠোঁটে এসে এই শীতকালেও পণ্ডিতমশায় রীতিমত ঘেমে গেছেন। পায়ের মতো তাঁর ফুল বোর্ডিং থেকে এই নদীর ঘাট প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল রাস্তা।

পণ্ডিতমশায় মুড়ির ঘরের মধ্যে নিয়ে বেঞ্চিতে বসলেন। কালকের মতই হাঁসটা উঠে তাঁর পাশে বসে মাথা ঘষতে লাগল।

মুড়ি বাতাসা খাওয়া শেষ করে এক গেলাস জল খেয়ে নিবারণবাবু এলেন। পণ্ডিতমশায় সবিস্তারে তাঁর স্বপ্নের পাখীটা নিবারণবাবুকে বললেন।

নিবারণবাবু সন্দিগ্ধ মানুষ। হঠাৎ একটা রাজহাঁস এসে গেছে, এটাই তাঁর কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। তার উপরে ভরসোপাল কলকাতীর্থের এই স্বপ্নের কথা, তিনি কেমন অভিভূত হয়ে আবার সাদা রাজহাঁসটার দিকে তাকাতে লাগলেন।

ঘোষদের কেনো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মা দেবতা। কিংবা ধরা যা সরস্বতীই যান। দেখেছে, ঠিক সরস্বতী পুজোর সময় চলে এসেছে।

কিন্তু এখানে এই জায়গায় আসার কেন? এখানে বিদ্যা বা সঙ্গীতচর্চা নেই, কোনো সাধক নেই এলাকায়। তিনি ম্যাট্রিক ফেল, জায়গা কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কে তাঁকে মাইনের তুচ্ছ মুহূরি ক্লার্ক, তাঁকে মা সরস্বতীর এই স্বপ্ন কেন?

পণ্ডিতমশায়ের স্বপ্ন বর্ণনা তখন শেষ হয়েছে। জলঝিনী নদীর জল এই বিনি বর্ষাকালের মত ঘোলা নয়। কাকচক্ষু নীল। সেখানে এই হাঁস খেলা করে, মা সরস্বতী তাঁকে কুসুম বলে ডাকেন।

কথা বলা শেষ করে পণ্ডিতমশায় একবার হাঁসের মাথায় হাত রেখে, 'কুসুম' বলে ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ডানা ঝাপটিয়ে, গলা উঁচু করে ঝাঁক ঝাঁক করে ডেকে উঠলো।

পণ্ডিতমশায় অভিভূতের মতো বললেন, 'দেখলে তো নিবারণ, ঐ হল কুসুম। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

এই সময় কুসুম আরেকবার ডানা ঝেড়ে ডেকে উঠলো।

(তিন)

ঘাটের কুসুম

'তোমার ভূমিকা আমি, স্বাধীনতা যুদ্ধে যেরকম
নদীর ভূমিকা চিরায়ত।'

এরপর থেকে কুসুম নামটা পাকাপাকিভাবে বাহাল হয়ে গেল।

সাধারণ যাত্রীরা, স্টীমারের খালাসীরা, এমনকি বাস স্ট্যাণ্ডের সেরেকজন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যারা যায় সবাই কুসুমকে চিনে ফেললো।

এ সব অঞ্চলে রাজহাঁস দেখাই যায় না। এমন কি দূরপাল্লার যে সব নৌকো নদী দিয়ে যায়। তারা পর্যন্ত জাহাজ ঘাটে কুসুমকে বিস্মিত হয়ে দেখত।

প্রথম প্রথম কুসুম সন্ধ্যা হওয়া মাত্র জাহাজ ঘাটে ছেড়ে জলে নেমে যেত। পাড়ের থেকে অনেক দূরে পড়ত, পরদিন ভোর নদীর মধ্যে গিয়ে নিজের কাঁকে ঠোঁট গুঁজে রাত কাটাতো।

প্রথমদিনে সন্ধ্যাবেলা যখন রাজহাঁসটা, তখনো তার কুসুম নাম হয়নি, নদীর জলে নেমে গেল, সনাতন নিবারণবাবুকে ডেকে বলল, 'কর্তা, হাঁসটা নদীর জলে নেমে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।'

শুনে নিবারণবাবু স্বস্তি পেয়েছিলেন, একটা উটকো ঝামেলা এসে জুটেছিল, এরা একাই বিদায় নিয়েছে।

জানদারিও খুশি হয়েছিল, যা মারমুটো জানোয়ার, তার আপদের কুসুমের নামটা একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছে।

রাত আটটার বিরাট স্টীমারে অনেক লোক নামে। তারা অনেকেই রাতের খাওয়া-দাওয়া তেওয়ারির হোটেলে সেরে নিয়ে তারপর টাউনে যায়। কেউ কেউ তেওয়ারির কাছ থেকে চাটাই চেয়ে নিয়ে রাত্রিবাসও করে মুহূরি ঘরের পাটাতনে অথবা হোটেলের খাওয়ার জেকেতে। গরমের দিনে অনেকে চরের উপর শুয়ে থাকে। সুন্দর নিরিবিলে বাতাসে চমৎকার ঘুম আসে।

সকলেরই কাজ পরের দিন সকালে টাউনে। ভোরবেলা উঠে যে যার মত চলে যায়।

যেদিন কুসুম এসেছিল সেটা শীতের শেষ হলেও তখনো কড়া ঠাণ্ডা হয়েছে এই অঞ্চলে। নদীর চরে কলাই, আর সরষের ক্ষেতগুলোর ঘাটে হিমজলে গলা হাঁসফাঁস করছে। ঘুমের কিছু জমছে ঘাসের ডগায়।

একদিক থেকে চমৎকার প্রকৃতি কিন্তু নদীর তীরে যারের খোলা চলে যু যু হাওয়ার মধ্যে তলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে, সবাই ওটি সুটি হয়ে শুয়ে

থাকে মুকিং ঘরের পাটাতনে আর হিন্দু হোটেলের মেঝেতে। অথবা সম্ভব হলে টাউনে চলে যায়, যদি তখনো লাস্ট ষ্টীমারটা থাকে। এত রাতে ঠাণ্ডায় কেউ হেঁটে যেতে চায় না।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় রাজহাঁস সেই যে নদীর জলের মধ্যে নেমে গেল। তারপর শেষ রাতে যখন নিবারণবাবু খড়ম পায়ে পাটাতনের উপর ঘুমন্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটিয়ে খটাং খটাং শব্দ করে, বালির চড়ায় নেমে এসেছেন, হঠাৎ দেখলেন নদীর মধ্যে থেকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে যেন জলের মধ্যে উড়ছে, গত কালকের রাজহাঁসটা তরতর করে নদী বেয়ে ঘাটের দিকে আসছে।

সোজা উঠে এল সে, বালির উপর দিয়ে কলকল করে চলে এসে নিবারণবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে দু'বার পাখা ঝাড়লো, কিছুটা জল ছিটলো কিছুটা বালি উড়লো।

পিছনে পিছনে জানালি এল, তার বুদ্ধি খুব প্রখর। সে বলল, 'হাঁসটা কাল রাত্তিরে কোথাও আসেনি। আমি বাসন মাজতে গিয়ে দেখলাম জলের মধ্যে রয়েছে। সকাল হতে উঠে এল।'

নিবারণবাবু একটু ভুরু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু সনাতন ব্যাপারটার সমাধান করে দিল। সে বলল, 'এই পাখিগুলো খুব সেয়ানা। রাতের বেলা শেয়াল আর কুকুরগুলোর ভয়ে জলের মধ্যে গিয়ে থাকে।'

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কয়েকদিনের মধ্যে কুমুদ জাহাজ ঘাটকে ভালবেসে ফেলল, সন্ধ্যাবেলাতেও লোকজন, মিষ্টির দোকান এ সবের মধ্যে ঘোরার তার পরমা উৎসাহ। এদিকে যায়, ওদিকে দেখে, দুই চই-এর মধ্যে সন্ধ্যা কাটায়, তারপর সন্ধ্যার পেছে ষ্টীমার ছেড়ে গেলে সে নিবারণবাবুর পিছে পিছে হেলতে দুলতে চলে আসে।

নিবারণবাবু ভয় পান, এখানে শেয়ালের বড় উৎপাত, কোথায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থেকে হঠাৎ হাঁসটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সাবধান হওয়ার জন্যে তিনি সনাতনকে বলে দিলেন, 'এই হাঁসটাকে প্রত্যেকদিন রাতে মুকিং ঘরে আটকিয়ে তারপর বাড়ি যাবে।'

কুমুদের কিন্তুতেই আপত্তি নেই। এমন কি কয়েকদিন পরে তার নাম যে কুমুদ দেওয়া হল তাতেও না।

কুমুদ ব্যাপারটা এখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে। নিবারণবাবু অবশ্য কুমুদ নামকরণের রহস্যটা কারো কাছে ব্যক্ত করেননি, কেউ বিশ্বাস করবে না, বলে লাভ কি।

সবাই কুমুদকে চিনে গেছে। ষ্টীমারের খালাসীরা ঘাটে জাহাজ ভিড়তেই, আয়, চই, চই করে তাকে ডাকে, অনেকে কুমুদ-কুমুদ বলেও ডাকে।

প্রথম দিকে ষ্টীমার বিষয়ে একটা আশঙ্কা ছিল কুমুদের মনে। ঘাটে এসে ষ্টীমার বেঁধে ভিড়তো, জাহাজের তীব্র সিটি আর পাড়ের সঙ্গে বাঁধবার দেশে বড় টেউয়ের দোলা, কুমুদ ঘাটের কাছ থেকে ঐ সময়টায় একটু পিছিয়ে যেত। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে ষ্টীমারটাকে লক্ষ্য করত।

ধীরে ধীরে তার ভয় ভাঙলো। ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্টিমার থেকে মানুষজন, জিনিসপত্রের ওঠানামা লক্ষ্য করতো।

আরো কিছুদিন পরে কুমুদ মিষ্টির দোকানের ছেলেদের সঙ্গে জলে নেমে যেত। জাহাজ ঘাটে ভিড়লে আশপাশের চমচম রসগোল্লার দোকানগুলো থেকে ছেলেরা হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি নিয়ে জলে নেমে যায়। জাহাজের যাত্রীদের আর ঘাটে নেমে মিষ্টি কিনতে হয় না। একতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দরদাম করে হাঁড়ি ভর্তি চমচম বা অন্য মিষ্টি কেনে।

বেড়াবাড়ির মিষ্টি খুব বিখ্যাত। ঢাকা-কলকাতা পর্যন্ত নাম তার। বেড়াবাড়ি ষ্টীমার স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি নামডাক বেড়াবাড়ির চমচমের।

সেই চমচম বিক্রির ছেলেদের সঙ্গে কুমুদও জলে নেমে যায়। যাত্রীরা কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

ইতিমধ্যে মিষ্টির দোকানে, ছেলেদের সঙ্গে থেকে আর মিষ্টির দোকানের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে কুমুদের চমচম খাওয়া বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু অভ্যেস নয় চমচমের /আজকাল খুব পক্ষপাত করে।

একদিন মিষ্টির ঘরের ধারাধার কুমুদকে ঘুর ঘুর করতে দেখে একজন যাত্রী পক্ষপাতের চমচম খেতে খেতে একটা টুকরো ছেড়ে কুমুদকে দেয়। কিছুক্ষণ ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর কুমুদ টুকরোটা খেয়ে নেয়।

সেই থেকে চমচমের প্রতি কুমুদের আসক্তি শুরু। এখন যে কেউ মিষ্টি খেলেই কুমুদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় একটু ছুঁয়ে দিলে খুশি হয়ে খেয়ে নেয়।

কুমুদের একটা বড় যোগ্যতা হল শূন্য থেকে মিষ্টির টুকরো লুফে নেওয়া যে কোন বিশ্বস্ত ফেরিওয়ালার লুফে নেওয়ার যোগ্যতার তার কাছে হার মানবে। মজা করার জন্যে অনেকে কুমুদকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাওয়ায়।

ইতিমধ্যে কুমুদের আরেকটা গুণ আবিষ্কৃত হল, আবিষ্কার করলেন ষ্টীমার যাত্রীরা। ষ্টীমার থেকে যদি জলের মধ্যে খাবারের টুকরো ফেলে

দেওয়া হয় তবে কুমুদ সেটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরে তুলে আনে। শুধু তুলেই আনে তা নয়, সেটা চিবোতে চিবোতে উঁচু করে তুলে ধরে সবাইকে দেখায়, যেন সে আরও চাইছে, তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে ফেলে।

প্রত্যেক পরিবার বিকেলে আর সন্ধেবেলা সপরিবারে জলতরঙ্গিনী তুলের পবিত্র জলতীর্থে স্নান করতে আসে। সেইসময় কুমুদকে দেখে স্নান, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কুমুদ পণ্ডিতমশায়কে দেখলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, দু'চার সপ্তাহ পরে নিবারণবাবু আর পণ্ডিতমশায় লক্ষ্য করলেন, শনিবার বিকেলটা যেন কে করে টের পায় কুমুদ, দুপুর থেকেই কেমন চনমন করে, তারপর এক সময় বাস স্ট্যাণ্ড পার হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পণ্ডিতমশায়ের জন্যে।

পণ্ডিতমশায় অভাবী শিক্ষক, তাছাড়া হাঁটা তাঁর খুব অভ্যাস। পয়সা বাঁচানোর জন্যে বাসে না এসে সাধারণত হেঁটে আসেন।

দূর থেকে কুমুদ পণ্ডিতমশায়ের ধূসর তালি দেওয়া ছাতা দেখলেই চিনতে পারে। বাস স্ট্যাণ্ডের থেকে একটু উত্তর দিকে রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে, একটা বহু প্রাচীন তেঁতুল গাছের নিচে। ঐ বাঁকের মুখে গাছের নিচে যেই পণ্ডিতমশায়ের ছাতাটা দেখা যায় কঁক কঁক করে গলা দিয়ে আহ্লাদী শব্দ করতে করতে কুমুদ ছুটে যায়।

পণ্ডিতমশায় অবাক হন না। ওতো আর কোনো সাধারণ হাঁস নয়। এই ধূলি মলিন পৃথিবীর কেনো পাখি নয় এ, এ হল তাঁর স্বপ্নের মন্দাকিনী কুমুদ।

(চার)

এলেন আমি কোথা থেকে

'Our past is clean forgot,
Our present is and is not,

কুমুদ খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়।

সাদা ধবধবে, উন্নত গ্রীবা, গজেন্দ্রগমন, বুদ্ধিদীপ্ত গোল কালো চোখ সমস্ত মিলে একটা রাজসিক ব্যাপার।

নদীর ভগ্ন পাড়ে, সাময়িক চালাঘরের ছোট স্টীমার স্টেশনের অস্তিত্ব কুমুদের রূপের ছটায়, কুমুদের গৌরবে ঝলমল করতে লাগল।

প্রায় মাইল চল্লিশের উজানের স্টীমার স্টেশন এনায়েতপুর, সেখানকার এক যাত্রী বেড়াবাড়ি এসেছেন, টাউনে যাবেন বলে।

এনায়েতপুরের লোকেরা সচরাচর এদিকে আসে না। কারণ তাদের এই টাউনে কোনো কাজ থাকে না, তাদের অন্য মহকুমা, অন্য জেলা।

এই যাত্রীটি এনায়েতপুরের সম্পন্ন চাষী, হানিফ মিঞা। গত বছর সামনের শহরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কুটুম বাড়িতে যাচ্ছেন এখন মেয়েকে নিয়ে যেতে। বোধহয় মেয়ের বাচ্চা-টাচ্চা হবে।

ঘাটে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন হানিফ মিঞা। এমন সময় কোথা থেকে কুমুদ তাঁদে দেখতে পেয়ে কাছে এল। আজকাল অনেক যাত্রীর সঙ্গেই সে এরকম ঘনিষ্ট ব্যবহার করে। বিভিন্ন লোকজন সম্পর্কে নিজস্ব স্পষ্ট মতামত আছে কুমুদের।

কুমুদ উপেক্ষা করে অনেক লোককেই, তাদের কাছে ঘেঁষে না। তারা কেউ যদি 'চই চই' কিংবা 'আয় আয়' করে ডাকে তাহলেও সে ভ্রুক্ষেপ করে না, তাদের কাছে না গিয়ে বরং দূরে সরে যায়।

অন্যদিকে এমন অনেক লোক আছে যারা হয়তো কুমুদকে মোটেই খেয়াল করেনি, অথচ কুমুদ তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, পোষা বেড়ালের মত গলা ঘষে তাদের শরীরে।

আবার এরকমও আছে যেখানে কুমুদ রীতিমত অপছন্দ করে কাউকে। সে এমনিতে শান্ত, সংযত প্রকৃতির। কিন্তু কাউকে সে ঠিক কি কারণে অপছন্দ করে যায় বা কামড়াতে যায় বোঝা কঠিন হয়ত শেষ পর্যন্ত ঠিক কামড়ায় না সে, তবে তার লক্ষণ।

হানিফ মিঞা একটা চমচমের দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চির উপরে বসে দুটো মিষ্টি খেয়ে একটা দোক্তাপাতী বিড়ি ধরিয়ে আয়েস করে চোখ বুজে টানছিলেন।

ধলেশ্বরী আর যমুনার বাঁকের উপরে বেড়াবাড়ি স্টীমার স্টেশন শীতপ্রায় শেষ এখন বাতাস আর তত ঠাণ্ডা নয়, ধলেশ্বরীর দিক থেকে ঈষৎ শীতল দক্ষিণের হাওয়া আসে, একটা মাদকতাময় আবেশ আছে এই জলের গন্ধ মাখা হাওয়ায়, এখন শান্ত দিন, দুপুরের রোদ এখনো চড়া হয়ে ওঠেনি।

মিষ্টির দোকানে আড়াই সের চমচম হাঁড়িতে ভাল করে বেঁধে দিতে বলেছেন হানিফ মিঞা, কুটুম বাড়িতে হাতে করে যাবেন। ঠাণ্ডা হাওয়া আর মৃদু রোদের আমেজে একটু সময় কাটিয়ে তারপর কুটুমবাড়ি যাবেন, এমন সময় হাঁটুর কাছে কিসের একটা কোমল স্পর্শে তাঁর খেয়াল হল, একটা সাদা ধবধবে রাজহাঁস মাথা ঘষছে তার পায়ে।

হানিফ মিঞা রাজহাঁসটার দিকে ভাল করে তাকাতে সে মুখ উঁচু করে পরম মমতাময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার নরম করে ডাকল।

হানিফ মিঞা একদৃষ্টিতে, অনেকক্ষণ ধরে হাঁসটাকে পর্যবেক্ষণ করে তারপর মিষ্টির দোকানের মালিক হরেন ঘোষকে বললল, 'ও ঘোষমশায়, এ হাঁসটা এখানে এল কোথা থেকে? এতো কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের হাঁস।'

হানিফ মিঞার বাড়ি এনায়েতপুর। এনায়েতপুরের পাশের গ্রাম কুমারগঞ্জ, এককালের খুব বর্দ্ধিষ্ণু এলাকা। সেখানকার তালুকদার হলেন রায়চৌধুরী রা ।

এনায়েতপুর খুব কাছের জায়গা নয়। প্রায় চল্লিশ মাইল নদী সাঁতরিয়ে বেড়াবাড়ি আসতে হয়েছে কুমুদকে। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। তাছাড়া নিজের এলাকা ছেড়ে হাঁস, পায়রা, গরু, ছাগল গৃহপালিত পশুপাখি খুব বেশি দূরে কখনো যায় না, সেটা তাদের স্বভাবে নেই।

হানিফ মিঞার কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মধ্যবয়সী, ভারিক্কি, গৃহস্ত মানুষ। তাঁর উল্টোপাল্টা কথা বলা স্বাভাবিক নয়।

অন্যদিকে কাছাকাছি অঞ্চলে দশ বিশ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়িতে কেউ এরকম রাজহাঁস পুষেছে তা শোনা যায়নি। গরিব মানুষের জলা দেশ। রাজহাঁস কোনো কাজে লাগে না, এর ডিম মাংস কোনোটাই খাওয়ার মত নয়। এ অঞ্চলে শখ করে কেউ রাজহাঁস পুষবে ভাবা যায় না।

তাছাড়া নানা জায়গার লোকজন স্টীমারে যাতায়াত করার পথে কুমুদকে অনবরতই দেখছে। কুমুদের মালিকরা কাছাকাছি অঞ্চলের লোক হলে নিশ্চয়ই তারা এতদিনের মধ্যে তার খবর পেয়ে খোঁজ করতে বেড়াবাড়ি স্টীমার স্টেশনে আসতো।

এতদিন কেউ কোথাও থেকে আসেনি। তাই কাব্যতীর্থ মশায়ের স্বপ্ন অনুযায়ী এবং কুমুদের হাবভাব দেখে নিবারণবাবু নিশ্চিত হতে চলেছিলেন এ নিশ্চয়ই মা সরস্বতীর বাহন, মন্দাকিনীর নীলজলের আসল স্বর্গীয় রাজহংস। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।

তবু নিবারণবাবুর মনে একটা খট্‌কা ছিলো ও হঠাৎ এত জায়গা থাকতে এখানে এল কেন? আর যদি মা সরস্বতীরই বাহন হবে তবে কুমুদের গলা এত কর্কশ কেন?

একটু আগে বিরাজগঞ্জ ঘাটের ফিরতি স্টীমার ছেড়ে চলে গেছে। টিকিট বিক্রির টাকা পয়সা জাহাজ কোম্পানির ক্যাশিয়ারের হাতে হিসাব করে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর তাকে স্টীমারে তুলে আরাম করে হিন্দু হোটেলের চাতালে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানছিলেন নিবারণবাবু।

হিন্দু হোটেলের তেওয়ারি ঠাকুর ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুঁকো রেখেছে। নিবারণবাবুর তামাক খাওয়ার খুব নেশা নেই, কিন্তু মাঝেমধ্যে ধূমপান করতে ভাল লাগে। নিজে হুঁকো রাখেননি, তেওয়ারির হোটেল থেকে হুঁকো চেয়ে নেন। জ্ঞানদাদি চমৎকার তামাক সাজে। নিবারণবাবু

যে তার হোটেলের উদ্যোগ তামাক খান এতে ভেজালারি কেন খুশিই হয়, হুগলীর স্টেক জাহাজ কোম্পানির লোক, জাহাজ কোম্পানির মেয়াদী ভাড়িতেই তার এই বারবরদ ভাতের ব্যবসা, কোম্পানির লোককে হাতে রাখা, খুশি রাখা ভাল।

হিন্দু হোটেলের সামনে সনাতন তাঁকে জানালো যে, এলাহেতপুর থেকে এক গৃহস্থ এসেছে, মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছে, সে বলছে যে হাঁসটা তাদের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে।

কুমুদ এই পৃথিবীরই হাঁস। এই নদীরই জন্য কোনো তীরের কোনো গ্রামের একজন আসতে নিবারণবাবুর খটকা লাগে। তিনি ইকোটা রেখে হারিক মিঞার কাছে গেলেন।

তখন বাঁশের বেঞ্চির উপর উঠে হারিক মিঞার কাঁধের উপর আলগোছে ঠোঁট রেখে আয়েসে চোখ বুজে আরামে গরগর করছে কুমুদ।

হারিক মিঞা নিবারণবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আসুন মাস্টারবাবু খুব ভাল জাতের হাঁস এটা। রায়চৌধুরী সাহেবরা রেঙ্গুন না কোথায় যেন থেকে আমিয়েছিল।'

নিবারণবাবু একটু নিশ্চিন্ত হলেন, মনের দেশ মানে এদের দেশ নয়, স্বর্গের কাছাকাছি কোনো জায়গা হবে, হয়তো মন্দাকিনী নদীর তীরেই। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তবে কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরী সাহেবদের হাঁস?'

হারিক মিঞা বললেন, 'আরো অনেক ছিল। সে বাড়ির বড় গিন্নি খুব ভালবাসত এদের, এদের পায়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছিল। এখনো দেখুন পায়ে একটু লাল আছে কুমুদের।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আমাকে দেখে চিনতে পেরেছে। রায়চৌধুরীদের বড় দীঘিতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতাম,সেজ কর্তার সঙ্গে। আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরত।

নিবারণবাবু প্রশ্ন করলেন, 'ওখান থেকে চলে এলো কেন?'

হারিক মিঞা বললেন, 'বড় গিন্নি মারা গেলেন। কর্তারা আর কর্তাদের ছেলেপিলেরা ঢাকা-কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। বছরে একবার পর্যন্ত বাড়ি আসে না। এরা রাজাশাহি, খালি বাড়িতে থাকতে পারে না। সব সময় লোকজন হই চই পছন্দ করে। সব চারদিকে কোথায় কোথায় চলে গেল। যে দু'একটা শেষ পর্যন্ত ছিল সেগুলোও ভেসে গেল গত সনের বন্যায়। এলাহেতপুরের আঠারোটা, কুমারগঞ্জের বাড়ি-ঘর, রায়চৌধুরীদের পুকুর বাগান, স্টীমার ঘাট, আর নদী সব একাকার হয়ে গেল। হাঁসগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।'

কুমুদের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হারিক মিঞা বলল, 'ও ভাসতে ভাসতে চলে এল আপনার এখানে। এখানে তো ভালই আছে দেখছি।'

ভাল যে আছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে মাথা উঁচু করে কয়েকবার ডানা ঝেড়ে কুমুদ খুশির সঙ্গে দু'বার ঁক ঁক করে ডেকে উঠল।

আরেকবার রাজহাঁসের পালকে হাত বুলিয়ে হারিক মিঞা চলে গেলেন, যাওয়ার সময় নিবারণবাবুকে বলে গেলেন, 'দেখতে পাবেন মাস্টারমশায়, খুব বুদ্ধিমান পাখি।

(পাঁচ)

ভ্রমণ কাহিনী

'সব দিকেই যাওয়া চলে।
অন্তত বেলিস গ্রাওসেলাম, সেরাঙ্গলি
পালপুকুর, শ্যাওলগ্রাম, হরিণ মারির চর—
সব দিকেই যাওয়া চলে।'

ঘাস স্ট্যাণ্ডের ওদিক থেকে পণ্ডিতমশায়কে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে কুমুদ সরাসরি নিবারণবাবুর ঘরে।

প্রত্যেক শনিবারই এমন হয়। আজো তাই হল। কিন্তু আজ যখন নিবারণবাবুর সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে পণ্ডিতমশায় বাড়ি যাওয়ার স্টীমারে উঠলেন, তাঁর পিছু পিছু কুমুদও পাটাতনের সিঁড়ি বেয়ে স্টীমারে গিয়ে চড়লো।

আজ কয়েকদিন হল কুমুদের এই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে। জাহাজের অনেক খালাসীর সঙ্গেই তার বেশ ভাব। দু'একজন সারেংও তাকে ভালবাসে, পছন্দ করে।

এমন ঘাটে জাহাজ লাগলে সে তার খুব একটা ঘুরে ঘুরে ডুব দিয়ে যাত্রীদের ছুঁড়ে দেওয়া খাবার জলের থেকে তুলে নিয়ে খায় না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। তারপর স্টীমারের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখে। ইঞ্জিন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহল নিয়ে যন্ত্রের দপদপ শব্দ কান পেতে শোনে। কখনো মেজতলায় উঠে যায়, সারেং সারেংয়ের ঘরে ঢুকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

ফাল্গুন মাসের একেক দিন বিয়ের লগ্ন থাকে। গ্রাম্য গ্রামান্তর থেকে জোড়ায় জোড়ায় নতুন বিয়ে হওয়া বর বৌ ওঠে স্টীমারে, নতুন বৌ লাল শাঁখা, লাল চেলি পরে ঘন্টার ঘাড়ি যায়, মুখে ঘোমটা টেনে।

কুমুদের নতুন বৌ খুব পছন্দ। কোনো স্টীমারে নতুন দম্পতি থাকলে সে সোজা সেখানে গিয়ে নতুন বৌয়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখে। বরযাত্রীরা তার কাণ্ড আর হাবভাব দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রাজাজন্তর, নতুন বৌ পছন্দ হয়েছে তো?' অথবা, 'কুমুদবাবু, এবার আপনিও একটা বিয়ে করুন লালটুকটুকে বৌ দেখে। আমাদের গাঁয়ের বিলে চমৎকার বুনোহাঁস আছে একবার গিয়ে দেখে আসুন না।'

মাঝে মাঝে দু'চারটে গোলমেলে লোকও থাকে, বিশেষ করে যাত্রাজনতা হলে তো কথাই নেই। অনেকে পিছন থেকে জাপটিয়ে ধরতে চায় কুমুদকে, কিংবা হয়তো গলাটা খপ্ করে চেপে ধরবে।

কিন্তু কুমুদ সতর্ক। শত্রুকে মুহূর্তে সে যেন কি করে টের পায়। সাবলীলভাবে নিজেকে এড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাছাড়া চলাফেরার মধ্যে রীতিমত একটা রাশভারী ভাব রয়েছে, অনেকেই তাকে ভয় পায়, রীতিমত সমীহ করে। বিশেষ কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তবে সবাই খুব অবাক হয়ে দেখে একটা সাদা রাজহাঁস, এত বড়ো একটা পাখি যাত্রীদের বাক্স বিছানা, ঘটিবাটির মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছে, সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামাওঠা করছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠার সময়। যেই ভোঁ বাজলো সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, খালাসীরা পাটাতনের সিঁড়ি তুলে ফেলার আগেই কুমুদ নেমে আসে স্টীমার থেকে। অনেক সময় এ সময়টা খুব ভিড় হয় নদীর ঘাটে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে যে সব যাত্রীরা তারা সবাই হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসে জাহাজে উঠবার জন্যে, ভোঁ বেজেছে, এখনই ছাড়বে। অনেকে বেশ অস্থির হয়ে ওঠে।

ভিড়টা আসে উল্টো দিক থেকে। কুমুদ নামবে আর লোকজন উঠবে। কুমুদ ধৈর্য ধরে পাটাতনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, যেইমাত্র উপরে উঠবার ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে আসে, সে টুক করে নেমে যায়। ঘাটে নেমে সোজা নিবারণবাবুর কাছে। নিবারণবাবু হাতের কাজ সারতে সারতে কুমুদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কুমুদ? তা হলে জাহাজ এবার ছাড়বে? সব ঠিক আছে তো?'

কুমুদ কোনো জবাব দেয় না। বেঞ্চির উপর উঠে নিজের পালকে মাথা গুঁজে চোখ বুজে থাকে। যেন অনেক পরিশ্রমকরে এসেছে, এখন বিশ্রাম দরকার।

আজ শনিবার বিকেলে কয়েকঘণ্টা দীর্ঘ সফরের সঙ্গে কুমুদ ফিরে জাহাজে চড়ল।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল কয়াতীর্থের বাড়ি বেড়াবাড়ি ঘাট থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে—সেখানে নরুনার ঘাটে নেমে হেঁটে আরো তিন ক্রোশ গেলে তবে তাঁর গ্রাম আহ্লাদপুর। সেখানে এক ঘাকারি আত্মজনের একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কর্তা এবং একমাত্র উপার্জনশীল পুরুষ।

বিধবা মা, বিধবা দিদি এবং এক বিধবা কন্যা তাঁর বাড়িতে। সংসারের চতুর্থ মহিলা তাঁর স্ত্রী একমাত্র সধবা। এ ছাড়া এক ভাগে এবং তিনটি

অপোগণ্ড পুত্রসন্তান নিয়ে তাঁর সংসার।

চেকবিল সাজলে আর, বিয়ে আদায়ী বাদসাদি আর অনেক কম নিয়মবহির্ভূত ব্যাপার, জেনে শুনেও তাঁর সহ্যগুণের তোড়ি যায়।

ডিসিপ্লিনের মূর্তপ্রতীক হয়ে। ইডুলে মাস্টার মশাইরা কলকাতা থেকে আসা ডিসিপ্লিনের বাণী শুনলেন আসর পড়ে আলোচনা করেন মুখ বন্ধের কয়েক এসে যাচ্ছে। চালের দর ৭৯৯ টাকায় উঠেছে, একটা মিলের মোটা শাড়ি আড়াই টাকা ডিনটাকা দাম।

তবে খুব একটা বেফাঁকরার না পড়লে কদাচারীর মশায় এসব কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী পেতে চান না। তাঁর চিন্তা এখন অন্যত্র। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্তো অবলম্বনের উপরে মশকারায় হয়ে তিনি একটি দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ব্রত নিয়েছেন। তাতেই তাঁর জীবন-মন নিয়ন্ত্রিত।

স্টীমারে ওঠার মুখে একটু ঝিক্ক বাধ্যবাধকতা ছিল। বৃটিশ ছুটে এ মাসের ভাইনের টাকা কোমরে জড়িয়ে বাঁধা আছে। তবে যা দিনকাল পড়েছে, শুধু ছুটি-মজুরেই নয়, আজকাল ভাড়াতেও ঘাঁটতিটা উঠছে।

কদাচারীর মশায় একটু সাবধান হতে গিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। কেরোসিনকে ঘাঁটি ঘাঁচিয়ে জাহাজের ওপরে একটা হেলান দেওয়া বেঞ্চি জোগে ডেকের ঘরে সেখানে নিয়ে গেলেন তিনি। তারপর এক কোণায় বসে খেয়াল করলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কুসুমও উঠে এসেছে, পায়ের কাছে বসে আছে।

পণ্ডিতমশায় ভাবলেন যে স্টীমার ছাড়ার সময়ে কুসুম নেমে যাবে, এখন আদুর করে জাহাজে সঙ্গে এসেছে, থাকুক, একটু বসে থাকুক।

কিন্তু অনতিদিন জাহাজের ভোঁ বাজলে কুসুম যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎগতিতে ঘাটে নেমে যায়, আজ কিন্তু তা করল না। অবশ্য একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের পা ঘেঁষে এল।

পণ্ডিতমশায় একটু বিচলিত বোধ করলেন, কুসুমের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ও কুসুম, লক্ষ্মীটি বাবা, জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে, নেমে যাও তাড়াতাড়ি।' কিন্তু কুসুমের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। সিঁড়ি তোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরেকবার ভোঁ বাজল। পণ্ডিতমশায় সুরেন সাহেবের ঘরে ছুটে গেলেন, 'ও সুরেন সাহেব, জাহাজ ছাড়বেন না, রাজহাঁসটা যে নামে নি এখনো।'

সারেং অবশ্যেক কড়া মানুষ, চট্টগ্রামের কৈবর্ত জাতি, কোনোদিন কোনো বিশেষ যাত্রীর জন্যও তিনি নিজের অতিরিক্ত একমিনিট অপেক্ষা করেন না, আজকেও তাই হল।

শেষ মুহূর্তে নিরুপায় পণ্ডিতমশায় জাহাজের রেলিংয়ের ধারে ছুটে গিয়ে নিমাইপাখুকে টেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, ইঞ্জিনের শব্দ, ডেকজনের খালাসীদের টেঁচামেচি অতিক্রম করে খলেশীয় বিদেশের শব্দসম্ভার হাওয়া পণ্ডিতমশায়ের চিৎকার ঘাটে পৌঁছে দিতে পারল না।

পণ্ডিতমশায় চিন্তিত মুখে বেঞ্চিতে এসে বসলেন। তখন কুসুম চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে তাঁর সীটের পাশে। পণ্ডিতমশায় কিন্তু অস্থির হয়ে উঠলেন, কি করা যায়। কুসুমকে যদি নদীর জলে ছুঁড়ে দেওয়া যায় তাহলে ও নিশ্চয় সাঁতরিয়ে ঘাটে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু যদি স্টীমারের চাকার নিচে চলে যায়। তাহলে তো নির্ঘাৎ অপমৃত্যু।

পণ্ডিতমশায়ের অস্থিরতা দেখে একজন খালাসী তাঁর কাছে এগিয়ে এল এবং বলল যে, 'পণ্ডিতমশায়, হাঁস নিয়ে ভাববেন না। জাহাজ তো রাতে আবার বেড়াবাড়ি ঘাটে ফিরবে তখন হাঁসটা নামিয়ে দেবো। এখন থাকুক না যেমন আছে।'

এত সহজ সমাধানটা পণ্ডিতমশায়ের মাথায় আসেনি। তিনি খালাসীকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে খেয়াল করলেন তাঁরই এক পুরনো ছাত্র, নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু খুব ভাল ছেলে ছিল, কোনদিন সংস্কৃতে পনেরোর বেশি পায়নি। এট্রি-মাইন পর্যন্ত পড়েছিল, কিন্তু এখন তো চেহারাই যেন বুদ্ধিমান হয়েছে। ধন্যবাদ না জানিয়ে প্রাক্তন ছাত্রটিকে জড়িয়েধরে কদাচারীর আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, 'বাবা, তুমি ফেরার সময় ওকে ধরে ধরে নামিয়ে দিও বেড়াবাড়ি ঘাটে।'

পুরনো ছাত্রটি, তার নাম জানা গেল অবশ্য, সে পণ্ডিতমশায়কে আশ্বস্ত করল,' আপনি ভাববেন না স্যার, আমি ঠিক বেড়াবাড়ি ঘাটে নামিয়ে দেব।

খালাসীদের দায়িত্বে কুসুমকে রেখে নয়নার ঘাটে জাহাজ পৌঁছতে পণ্ডিতমশায় নামতে গেলেন, কিন্তু অসুবিধে দাঁড়াল যে কুসুম তাঁর পিছু নিল। খালাসী ছুটে গিয়ে কুসুমকে বাধা দিতে কুসুম হিংস্রভাবে খালাসী ঠোঁট নিয়ে তাকে তাড়া করল যেভাবে প্রথমদিন বেড়াবাড়ির ঘাটে সাত কুসুমটাকে আক্রমণ করেছিল।

তাতেও যখন কাজই হল না, কুসুম হঠাৎ জাহাজের রেলিংয়ের উপর দিয়ে পাখা মেলে ডাঙার ঝাঁপ দিল। পণ্ডিতমশায় সেই দৃশ্য দেখে সেই প্রসারিত সাদা ডানা ঊর্ধ্বে উঠে যেতে দেখে ভাবলেন, স্বর্গের হাঁস কুসুম এবার মন্দাকিনীতে ফিরে যাচ্ছে।

কুসুম কিন্তু স্বর্গলোকে উঠল না। সেই নয়নার ঘাটে গিয়ে একটা দোকানের সামনে পড়ল। দোকানের ওড়া অভ্যেস নেই, মাটিতে পড়ে প্রায় ডানা ঝাপটিয়ে মরছিল, একটা ছাগল খেয়ে সাবাড় করে দিল।'

ততক্ষণে পণ্ডিতমশায় ঘাটে নেমে এসেছেন। কুসুমও তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। চরপাশের কৌতূহলী জনতার রাজহাঁস সম্পর্কে নানা প্রশ্নের দু'চারটে সংক্ষিপ্ত জবাব ই-ই করতে করতে পণ্ডিতমশায় মনস্থির করলেন।

এখনো সন্ধ্যা হতে বাকি আছে। এমিকটার শেয়ালের খুব উৎপাত, এখন কুসুম তাঁর সঙ্গে আসায় চলুক। মনে হচ্ছে কুসুম তাঁর পিছে পিছে হাঁটছে। বাসায় গিয়ে রাতে তাঁহার ঘরটায় কুলুপ এঁটে ওকে আটকিয়ে রাখতে হবে, নাহলে শেয়ালের হাতে মারা পড়বে। পথেও ভয় আছে, তবে দিনের বেলায় শেয়াল বেরুবে না। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

সত্যি সত্যি কুসুম পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। ফাল্গুনের অপরাহ্নের হলুদ রোদে নয়না ঘাটের ডাঙা রাস্তায় এক মৌচা গ্রাম্য কবি আর এক অমল রাজহাঁস চরকোর পাশাপাশি যেতে লাগল।

সন্ধ্যার একটু আগে গ্রামে পৌঁছলেন পণ্ডিতমশায়। এতদিন এই সময়ে তাঁর স্ত্রী ও জননীর কলহ লাগে, আজও ঝগড়াটি তাই শুরু হয়েছে নিশ্চয়, ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতমশায় বাড়ির দিকে এগোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পায়ে কুসুম।

কিন্তু গ্রামে ঢুকে কেমন একটা চাপা ভাব। সবার মুখ কেমন থমথমে মনে হল পণ্ডিতমশায়ের।

বাড়ির ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত দুঃসংবাদটা তাঁর সম্মুখ উপস্থিত হয়নি। তাঁর বিধবা মেয়েটি আজ বিকেলেই টেঁকি ঘরে কলার পাঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পণ্ডিতমশায়ের পরম আদরের প্রথম সন্তান সে, শুধু মাথাকে মৃতমুখ দেখানোর জন্যই শনিবার বিকেল পর্যন্ত যোমহর অপেক্ষা করেছিল। পণ্ডিতমশায় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

সেদিন রাতে সবাই যখন শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে তার একটু আগে পণ্ডিতমশায়ের জ্ঞান হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল, কিন্তু মা-বাবা-ঠাকুমার অভাববোধের অবকাশ ছিল না। এত কি দুঃখ, কি অভিমান তার হয়েছিল। জ্বরগোপাল কদাচারীর্ণের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কুসুমের কথা মনে পড়ল।

আজ আকাশে এক থই চাঁদ উঠেছে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে, আমের মুকুলের গন্ধে বাড়িঘর ছেয়ে গেছে। এইরকম সব অপার্থিব নিস্তব্ধতে পৃথিবীর অসারতা জানায় ছেড়ে ফেলে তার আত্মাটা শরীরের খাঁচাকে অতিক্রম করে মন্দাকিনীর দিকে উড়ে যায়।

কদাচারীর মশায় বারান্দার ওপরে ছিলেন, উঠে বসে দাওয়ার চৌকি নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন, কুসুম, কুসুম কোথায় গেল।

(ছয়)

কুমুদিনী

'অলোহলো ঢেলেছিলে
জাহাজ না জাহাজিনী মাগী।'

ঐ শনিবার রাতেই কুমুদ মহনার ঘাটে ফিরে এসে সেখান থেকে কিরতি স্টীমারে চড়ে বেড়াবাড়িতে এসে নামে। কলাই খালাসী নহনার ঘাটে দেখতে পায় ইসটা ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এসে জাহাজে উঠল। বেড়াবাড়িতে সে একাই নেমে যায়, কলাইকে কিছুই বলতে হয়নি।

পণ্ডিতমশায় মেয়ের মৃত্যুর পর দু'সপ্তাহ বিদ্যালয়ে যাননি। পনের দিন পরের এক সোমবারে যখন স্টীমারে চড়ে বেড়াবাড়ির ঘাটে এলেন, তিনি অবাক। ঘাটের সিঁড়ির উপরে কুমুদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাঁকে দেখে কুমুদ উদ্দীপিত উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘাটে নেমে এসে তিনি কুমুদের পরে মাথায় হাত বুলোলেন।

এই ক'দিনে মেয়েটা তিনি একটু সামলে নিয়েছেন। কুমুদকে নিয়ে প্রতিনিয়ই চিন্তা করেছেন, শোয়ালে ফেরে ফেলল না ঘর্গে উড়ে গেল, এই দুই অতি বিপরীত প্রশ্নের উত্তর কাকে কোনো সমাধান মেলেনি।

আজ সকালে স্টীমারে কলাই খালাসী যখন তাঁকে বলল যে সেদিন রাতেই কুমুদ ফিরে গিয়েছিল, তিনি আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন।

কিন্তু কলাইয়ের আরেকটা কথা শুনে তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন, আজকাল নাকি একা একাই জাহাজে চড়ে এদিক-ওদিকে. এ ঘাট সেঘাটে নামে, তারপর সময়মত ঠিক উল্টো জাহাজে চড়ে বেড়াবাড়ি ফিরে আসে। এর মধ্যে তিন-চারদিন নাকি সে নহনার ঘাটেও ঘুরে গেছে।

ঘাটে নেমে পণ্ডিতমশায়ের নিবারণবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ইতিমধ্যে নিবারণবাবু লোক মুখে পণ্ডিত মশায়ের মেয়ের খবর শুনেছেন, তিনি আরো শুনেছেন মেয়েটির নাকি চরিত্রদোষ ছিল। পণ্ডিতমশায় আলাভোলা মানুষ, কিছুই খবর রাখতেন না। পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে এ সব বিষয় আলোচনা করে তাঁর দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই, নিবারণবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি এ সব কথা উত্থাপন করলেন না পণ্ডিতমশায়ের কাছে। বরং ঘাটে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট যা কথা হল তা কুমুদের এই যাতায়াত নিয়ে, কুমুদের মতি গতি বিষয়ে।

নিবারণবাবু পণ্ডিতমশায়কে বললেন, 'পণ্ডিত মশায়, আপনার কুমুদ এখন আর বেড়াবাড়ির কুমুদ নয়, সে অলেখরীর কুমুদ, সে ঘাটের কুমুদ থেকে জাহাজের কুমুদ হয়েছে।'

পণ্ডিতমশায় ঝুলে চলে গেলেন। কুমুদ তার পিছে পিছে হেঁটে রাস্তার উঠে চৌমুহনাপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর এসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করল। হিমু হোটেলের কাঠ রাখবার জায়গায় বারান্দার এক কোণে রাখা কুকুরটার আজ কিছুদিন হল তিনটে বাচ্চা হয়েছে। তাদের সদ্য চোখ ফুটেছে। তাদের সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল কুমুদের। মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে দেখতে যায়। বিশেষ এ ব্যাপারে হোটেলের আপত্তি সে কুমুদের এই উৎসাহ অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে দেখে। কুমুদকে ওদিক-পানে দেখলেই সে হাঁক দিতে আসে। কুমুদ এসব কিছু মনে করে না এখন, বিশেষ গ্রাহ্যও করে না। ধাত্ত-রাম্পু এবং আর সকলের সঙ্গে সে মানিয়ে নিয়েছে।

কুমুদের বাচ্চা পর্যবেক্ষণশেষ করে ধীরে-সুস্থে কুমুদ এনায়েতপুরের স্টীমারে এসে উঠল। স্টীমারটা আর ঘণ্টা আসে ছিড়েছে, এবার কিরবে। মনে আছাড়ের মধ্যে কুমুদ আজকাল মধ্যে মধ্যে এনায়েতপুরেও যায়।

তবে এনায়েতপুরে নেমে সে ঘাটের আশেপাশেই থাকে, তা নয়। তাকে অনেকে কুমারগঞ্জের দিকে যেতে দেখেছে। দিনের বেলা হলে সে হাঁটা পথেই কুমারগঞ্জে যায়, সে রাস্তাটা অন্য। কিন্তু সন্ধ্যা হলে সে আল দিয়ে যায়, এতে একটু ঘোরা হয়। শেয়ালের থেকে আত্মরক্ষার জন্যই সে এটা করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেশ বোঝা যায় এনায়েতপুর-কুমারগঞ্জের পথঘাট সবই বেশ চেনা কুমুদের। নিবারণবাবু খোঁজ নিয়েছেন, শুধু হালিম মিঞাই নয়, ও অঞ্চলের অনেকেই কুমুদকে ভাল চেনে। তারা বলেছে, কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের ইস, খুলো হয়ে গেছে।

রায়চৌধুরীদের দীঘিতেও দু-একবার গিয়ে ঘুরে এসেছে কুমুদ। সে পুকুরে এখনো তার বয়াতি দু-চারজন আছে। কিন্তু এই পর্যন্তই, পাকাপাকিভাবে সে কোথাও থাকে না। খুব বড় রকমের বিপর্যয়ে স্টীমার চলাচল বন্ধ না হলে, বেলিক থেকেই ছেলে শেষ ট্রিপে কুমুদ বেড়াবাড়ি ঘাটে ফিরে আসে। একবার সারা ঘাট পরিদর্শন করে, মিষ্টির দোকানঘর থেকে কিছু খাবার খেয়ে নিবারণবাবুর ঘরে চলে আসে।

মিষ্টির দোকানে রাতের দিকে ভাতে গড়া কটি বিক্রি হয়। আজকাল কুমুদ কটি খেতে শিখেছে। দোকানেরা মজা করার জন্য তাকে কটি ছুঁড়ে দেয়, সে শূন্য থেকে ঠোঁট দিয়ে লুফে নিয়ে দু'পাটের পাটার মধ্যে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তবে এখনো তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হলো মুড়ি, সকালবেলায় নিবারণবাবুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট।

সে যা হোক, একদিন এনায়েতপুরের জাহাজ আসতে অনেক রাত হল। বৈশাখ মাস সেটা, নদী শুকিয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে চরা পড়ছে, ডুবো চরা, জলের একটু নিচেই। তাতে এই খরার সময়ে কখনো কখনো স্টীমার আটকিয়ে যায়। সে এক ঝামেলা। বেল সময় লাগে মাটি কেটে বেরিয়ে আসতে।

সেদিন যে জায়গাটায় স্টীমারটা আটকে গিয়েছিল, বেড়াবাড়ি থেকে দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল।

স্টীমারটা আটকে যাওয়ার পর কুমুদ কি ঘুমল কে জানে, সে হঠাৎ করে নদীতে নেমে পড়ল। তারপর বেড়াবাড়ির দিকে রওনা হল। জাহাজের অনেকেই সে দৃশ্য দেখেছে।

দেখেছে পারের শেয়ালেরাও। তারা অনেকদিন ধরে জাহাজটার ওপর নজর রাখছে। আজ তারা পাড় ধরে ধরে স্রোতের সঙ্গে বেড়াবাড়ি ঘাটের দিকে এগোতে লাগল। এক সঙ্গে প্রায় পাঁচ-সাতটা শেয়াল।

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ঘাট অন্ধকার। মিষ্টির দোকানের হ্যাজাকগুলো নিবিয়ে দোকানটায় লণ্ঠন জ্বালিয়েছে। শুধু একটা ডে-লাইট নিবারণবাবুর অফিসের বারান্দায় জ্বলছে, তাতেও তেল কমে এসেছে।

রাতের তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চা ছোটবেলায় শেয়ালে চুরি করে খেয়েছে। বাকি দুটো এর মধ্যেই বেশ বড় হয়েছে। কিছুক্ষণ পর সেই বাচ্চা দুটো ঘাটের একটু পেছন দিকে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল দাত্ত-রাম্পুও গর্জন করতে করতে সেই দিকে ছুটে গেল। জলের ধারে চারটে কুকুরের এই চেঁচামেচি নিবারণবাবুর কেমন যেন মনে হল এবং তিনি সেই মুহূর্তে একটা তীব্র করুণ চিৎকার এবং স্পষ্ট ডানার ঝাপটানি শুনতে পেলেন। তাঁর হাতের কাছে কোম্পানির দেওয়া একটা বড় পাঁচ সেলের টর্চলাইট থাকে, সেটা নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগোলেন। কুকুরদের ডাকাডাকি শুনে জ্ঞানদাদি পাশের ঘাটে ঘাসন মাজছিল, সেও দৌড়ে এল লণ্ঠন হাতে।

পাঁচ সেলের টর্চের তীব্র আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন নিবারণবাবু কুমুদকে ঘাটের কাছে পাঁচ-ছটা বড় বড় শেয়াল ঘিরে রেখেছে। চেঁচামেচি করছে বটে কিন্তু ঘাড়া পাড় থেকে তার কুড়ি ফুট নিচে লাফিয়ে নামতে পারবে না, ধূর্ত শেয়ালেরা সেটা বুঝতে পেরেছে।

নিবারণবাবুর টর্চের আলো পড়তেই শেয়ালগুলো একটু হকচকিয়ে পিছিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ সবচেয়ে সামনে যে শেয়ালটা ছিল তার মাথায় বিদ্যুৎ গতিতে একটা তীক্ষ্ণ ঠোক্কর দিল, তারপর আর একটা, তারপর আরেকটা। ততক্ষণে জ্ঞানদাদি লণ্ঠন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। আহত শেয়ালটা একটা করুণ আর্তনাদ করে সরে যেতেই কুমুদ তরতর করে জল থেকে উঠে জ্ঞানদাদির লণ্ঠনের সামনে চলে এল তখনো একটা শেয়াল তার পিছে পিছে এগোচ্ছিল, কুমুদ কিপ্র ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো সহসা ঘুরে গিয়ে তাকে তাড়া করে গেল।

এদিকে ঘাটের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে দাত্ত-রাম্পু এবং বাচ্চা দুটো এবার

জানলাদিয়ে কয়েক পৌঁছে গেছে। তারা চারজনে নদীর ধার ধরে প্রায় আধ মাইল রাস্তা সেরালদহলোকে তাড়া দিয়ে বিদায় করে এল।

এতক্ষণে ঘাটের কত লোক সব নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। রীতিমত ছই চই কাণ্ড, কুমুদের এই সাহস ও বীরত্বের গল্প সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

পরের দিন স্কুলে পণ্ডিতমশায় কুমুদের এই কাহিনী ঘাটের পাশের বাড়ী বাড়ির একটা ছেলের কাছে শুনে বিকেলবেলা ছুটির পর উৎসুক চিত্তে কুমুদকে দেখতে এলেন বেড়াবাড়ি ঘাটে।

অনেকদিন পরে তাঁর প্রথম এমন হল যে তিনি তেঁতুল গাছটার নিচে এসে কুমুদ অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে এই পরিচিত ও প্রিয় দৃশ্য দেখতে পেলেন না। তাঁর আরো চিন্তা হল, তাহলে কুমুদ কি গুরুতর আহত হয়েছে?

ঘাটে এসে নিবারণবাবুর কাছে যা শুনলেন সেটা অবশ্য সুখবর। কুমুদকে সেরালরা কিছু করে উঠতে পারেনি, শুধু দু-একটা পালক করেছে। কুমুদ ব্যাপারটাকে কেবলে গুরুত্বই দেয়নি। হাতে জল ঘুরিয়েছে, ভোরবেলা নিবারণবাবুর সঙ্গে মুড়ি খেয়েছে, তারপর ঘাটের চাতালে নেমে বাসুর আনা দুটোর সঙ্গে খেলা করেছে।

কুকুরছানা দুটোর সঙ্গে কুমুদের খুব ভাব। এখন আর রাসু ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। কুকুরছানা দুটো বড় হয়েছে, তারা ছুটে ছুটে এসে কুমুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নকল মারামারি করে, আবার তারা যখন জাপটা-জাপটি করে ক্লান্ত হয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে, কুমুদ দুষ্টুমি করে তাদের লেজ টেনে বিরক্ত করে।

আজ সকলেও আনা দুটোর সঙ্গে কুমুদ অনেকক্ষণ খেলেছে। তারপর বিরাজমোহনের আহ্বানে এসে সেটার চড়ে চলে গেছে।

পণ্ডিতমশায় ফিরে গেলেন। বুধের বিষয় পরের শনিবার কুমুদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। কুমুদ সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঠিকই ফিরেছিল, কিন্তু দুদিন পরে বৃহস্পতিবার দিন থেকে আর ফেরেনি।

নিবারণবাবু চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এনায়েতপুর থেকে খবর এসেছে, কুমুদ কুমারসঙ্গের রায়চৌধুরীদের দীঘিতে নাকি ফিরে গেছে। সেখানেই অন্য হাঁসেদের সঙ্গে থাকছে।

রায়চৌধুরীদের দীঘিতে বড় বড় মাছ। এখান থেকে অনেক লোক ছিপ নিয়ে সেখানে মাছ ধরতে যায়। তারা কুমুদকে ভাল চেনে। তারা সেখানে কুমুদকে দেখেছে।

কুমুদকে চেনা অবশ্য এখন কঠিন নয়। নলা ছাটে যায় তাই একটা তার নিয়ে তিনি কুমুদের পায়ের সঙ্গে একটা তাজার চাকতি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাতে লেখা আছে।

কুমুদ
C/O নিবারণবাবু
বেড়াবাড়ি ঘাট।

পরের সোমবার বাড়ি থেকে ফেরার পথেও পণ্ডিতমশায় কুমুদকে দেখতে পেলেন না।

কুমুদ এল ঠিক সাত দিন পরের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, এনায়েতপুরের জাহাজে। শুধু নিবারণবাবু নয়, ঘাটের সবাই খুশী হল তার ফেরায়। সেরেরা তাকে আদর করে রুটি আর চমচম খাওয়াল।

পরের দিন সকালবেলা ঘুরিয়ে আনা,স্কুলে পরিচয় করতে নিয়ে সনাতন দেখল যে হাঁসের ডিমের চেয়ে অনেক বড় আকারের, ধবধবে সাদায় মোড়া ঈষৎ নীলচে আভা একটা বড় ডিম ঘরের মেঝের।

কুমুদের ডিম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সনাতন তাড়াতাড়ি নিবারণবাবুকে ডেকে আনল,—

মাস্টারবাবু, দেখে যান আপনার নাতি হয়েছে।

পরের শনিবার পণ্ডিতমশায় যখন এলেন, তখন কুমুদ নেই। কিন্তু কুমুদের ডিমটা একটা বেতের ঝুড়ির মধ্যে বালির উপরে বসিয়ে রেখেছেন

নিবারণবাবু, সেটা পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়ে বললেন, সনাতন যা বলেছিল ঠিক তাই, 'এই দেখুন আপনার নাতি হয়েছে। তবে পৌত্র নয় দৌহিত্র। আপনার হিসেব ভুল হয়েছিল, ও কুমুদ নয়, ও হল কুমুদিনী।'

নাতি, দৌহিত্র এসব বোধহয় নিবারণবাবুর উল্লেখ না করাই ভাল ছিল। অনেকদিন পরে পণ্ডিতমশায়ের মৃতা কন্যার কথা মনে পড়ল, তিনি অন্যমনস্ক করে কেঁদে ফেললেন। তারপর পাঞ্জাবির ময়লা হাতা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'ডিমটা ফুটবে?'

সপ্ত

উপসংহার

'পত্রিকার পাতায় পদ্মপলাশনয়নী ও শ্যামাঙ্গিনী সেই,
ছাপা আছে পদ্মপলাশনয়না ও শ্যামাঙ্গী।'

বৃহস্পতিবার অনেক বেলা পর্যন্ত কুমুদ বেড়াবাড়ি ছিল, কিন্তু একবারও ডিমের কাছে ফিরে আসেনি। কিছুক্ষণ কুকুরের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করেছে, তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে এ দোকান সে দোকান করে অবশেষে নিবারণবাবুর ঘরে ঢুকে তাঁদের বেঞ্চিটার উপর বসে থেকেছে।

অন্যদিন এ সময় সে স্টীমারে চড়ে বসে, আজ তার এই মতি পরিবর্তন দেখে নিবারণবাবু খুশী হলেন, যাক মা হয়ে একটু স্থির হল মনে হচ্ছে।

কিন্তু কুমুদ স্থির হয়নি। আগবেলায় যখন নয়না ঘাটের জাহাজ এল, সে লিফে উঠে বসল সেটায়। সেই থেকে সে নিরুদ্দেশ। বলাই-খালাসী বলেছে সেদিন ফিরতি পথে সে আর কুমুদকে দেখেনি।

কুমুদকে দেখতে পেলেন পণ্ডিতমশায়, শনিবার বিকেলে নয়নার ঘাটে। স্পষ্ট বোঝা যে সে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। জাহাজ থামতেই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল, সেই পুরনো ফ্রক, ফ্রক করতে করতে। তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে জয়গোপাল কাব্যতীর্থ যা শুনলেন তা অত্যন্ত তাজ্জব ব্যাপার। বৃহস্পতিবার বিকেলেই এই হাঁসটা তাঁর বাড়িতে এসেছে।

সোজা আটচালা শোয়ার ঘরটাতে ঢুকে তাঁর মেয়ে যে চৌকিটাতে শুত সেই চৌকির উপর উঠে চোখ বুজে ঘুমিয়েছে। একটা অচেনা এতবড় পাখি ঘরের মধ্যে, সবাই খুব দুশ্চিন্তিত, কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের বৃদ্ধা মা বারবার বলেছেন, 'ওরে ও যে বুঁচি, বুঁচি যে ফিরে এসেছে, ওকে তোরা তাড়াসনে।

বুঁচি পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের নাম। ঠাকুমার এই কাতর অনুরোধের পরে কেউ আর কুমুদকে ঘাঁটায়নি। সারাদিন কুমুদ এদিক-ওদিক ঘুরেছে। সন্ধ্যায় এসে বুঁচির শূন্য বিছানায় নিশ্চিন্তে বসে সাদা পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে চোখ বুজে সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এসে এই ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কবি জয়গোপাল। তাঁর 'কুমুদসম্ভব' কাব্য কাহিনীর প্রায় সবটাই বদলাতে হবে মনে হচ্ছে। কাল সকালে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসতে হবে। যেখানে শৌর্য, বীর্য ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন, যেখানে কুমুদকে উদাসীন স্বর্গীয় মরাল বলে স্তুতি করেছেন, সেই সমস্ত শ্লোক পালটাতে হবে।' আর তাছাড়া, সংস্কৃতে স্ত্রী লিঙ্গে পুং লিঙ্গে অনেক গোলমাল, প্রতিটি ছত্রেই অনেক সংশোধন হয়তো প্রয়োজন হবে।

তা ওকে, কুমুদ অথবা কুমুদিনীকে দেখে তাঁর মন ভরে গেল। বিশেষ করে পরদিন, সকালবেলায় যখন কুমুদিনী তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল, তিনি বারান্দায় চেয়ে নিয়ে বসেছিলেন, কুমুদিনী তাঁর হাতের ঠোঁট দিয়ে আলতো করে বিলি দিতে লাগল। তাঁর কেমন মনে হল এ স্পর্শ তাঁর চেনা, এ সেই ছোটবেলার বুঁচি, ঠিক এমনি করেই আদুল বোলাত। তিনি কুমুদিনীর দিকে তাকালেন, সেই চোখ, কালো অন্ধকার, ছায়ার ভালবাসামর চোখ। এ কে, বুঁচি না কুমুদিনী? পরিব পণ্ডিতের দুখিনী বিধবা মেয়ে নাকি স্বর্গের অপ্সরিনীর রাজহংসী।

রাজহংসী নিয়ে খুব কেলেঙ্কারি পড়লেন জয়গোপাল কাব্যতীর্থকে নিয়ে। তাঁর শ্লোকগুলো পালটাতে গেলে রাজহংসিনী লিখতে অসুবিধে হয়। কিন্তু অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে শ্যামমুখী লিখে বড় ভুল করেছিলেন, সেসময়কার সমালোচক এই ব্যাপারটা ক্ষমা করেননি। তখনো বঙ্কিম কবি হননি, কবি হলে হয়তো অর্থ প্রয়োগ হতো। অবশ্য তবে বঙ্কিম নিজেকে সংশোধন করেছিলেন।

জয়গোপাল কাব্যতীর্থ বঙ্কিমের অত শুদ্ধ। তাঁর ধারণা বঙ্কিম কিন্তু ভুল করেননি। তিনি কুমুদ সম্ভব কাব্য আগাগোড়া রাজহংসিনীতে ভরিয়ে দিলেন, বাংলার সংস্কৃতে দুবার লিখে দেখলেন রাজহংসিনী চমৎকার দেখায়।

যাকে নিয়ে এত সমস্যা সেই কুমুদ কিংবা কুমুদিনী, রাজহংস কিংবা রাজহংসী কিংবা রাজহংসিনী সে কিন্তু নির্বিকার। সে ভুলে গেল বেড়াবাড়ি ঘাট, ভুলে গেল এলাহেরপুর, কুয়ারগঞ্জ, নয়না ঘাট, ভুলে গেল তার ওজনীল ডিমের কথা।

কুমুদিনী মিলে মিশে হারিয়ে গেল এক আধা পরিব আধা কবি-পণ্ডিতের সংসারে। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির পিছনের ছোট পানা পুকুরে সাঁতরিয়ে, জলে ডুবে মাছ ধরে সে চমৎকার কাটিয়ে দিল তার দিন।

এর মধ্যে একদা গান্ধীজী ডাক দিলেন, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, আর-এস.এস কোম্পানির জাহাজ বন্ধকটা হল। চালের দর উঠল টাকা-টাকা সেরে,রেঙ্গুন থেকে জাপানীরা সামনের দিকে এগোচ্ছে; রেঙ্গুন থেকে খবর পৌঁছে গেল বেড়াবাড়ি আর নয়নার ঘাটে।

সে গল্প আমার নয়, সে গল্প অন্যেরা লিখেছেন। যুদ্ধে, যুদ্ধিতে যাব না, সে আমার কাজ নয়। শুধু আর একটু বাকি আছে। সেটুকু বলেই আমার কাজ শেষ।

সেই শেষটুকু ছোট করে বলি।

কুমুদিনীর সেই ডিম। সেটা নিবারণবাবু হাজি-বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, যদি তাঁদের মুরগিরা তা দিয়ে ফোটাতে পারে। সত্যি একদিন একটা হাঁসের ছানা বেরল, রোগা টিংটিঙে, ভোমরীন লম্বা গলা হাল ছাড়ানো চেহারা। সেদে হাজি-বাড়িতেই মুরগির ছানাদের সঙ্গে বড় হতে লাগল।

একটু বড় হতেই ছানাটা মাতা পাড়ি দিয়ে চলে এল বেড়াবাড়ি ঘাটে। একা একাই। তার মনের মধ্যে রয়েছে কল,? জাহাজ আর ঘাটের টান।

নিবারণবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, একেবারে কুমুদ। সেই ধবধবে রঙ, রাজসিক চেহারা, চালচলন সব কিছুতে অভিজাত। এখনো কুমুদের মতো বড়সড় হয়নি, আরেকটু বাড়বে।

ঘাটের যাত্রীরা, জাহাজের খালাসীরা সবাই ধরে নিল এই সেই পুরনো হাঁসটা, কোথায় গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। কেউ জানে না, সেই হাঁসটা অনেকটা দূরের গ্রামে এক কবির বাড়ির অন্দরে ঢুকে গেছে।

সবাই ভুল করে। এমনকি পণ্ডিতমশায় পর্যন্ত। প্রত্যেক শনিবার বিকেলে মায়ের মতোই যখন কুমুদিনীর ছেলে পণ্ডিতমশায়কে দেখে এগিয়ে যায় তেঁতুলতলার দিকে, তিনি চমকিয়ে ওঠেন, তাঁর বাড়ি থেকে কুমুদিনী কি চলে এল।

বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর কুমুদিনী, তাঁর বুঁচি ঠিকই আছে।

উপসংহার
অন্যান্যপক্ষী—

[এক] সোনাঝিঁঝি। পাখা মেলেনী ঝিঁঝি
[দুই] ঝিঁঝিপোকা ঝিঁঝু।
[তিন] ঝিঁঝিপোকা ঝিঁ।
[চার] Dendrocygna Gabriela Pamanensis।
[পাঁচ] পাখি সংক্রান্তবাদ।
[ছয়] পাখাবাদ।
[সাত] পাখিবাদ্যম পাখিবাদ্য।

কাকে খোঁজা, কতক্ষণ খোঁজা

সুরজিৎ ঘোষ

মফঃস্বলের লালমাটির পথে সেই নবীনা বিধবাটির কথা
মনে পড়ছে এখন। এখন বড় এলোমেলো,
সহর ছিলাই ইস্পাত কারখানার
কলকে-ওঠা লাল আগুনের দিকে
এই হোস্টেলের জানলা খুলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
এমন মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।
লালের সঙ্গে সবুজের বড়ো বিরোধ।
তবু সেই বৈধব্যের শ্লোক পৌঁছচ্ছে এখানে।

নতুন কোনো ব্যাপার নয়,
গত তিন বছর ধরে বারেবারেই এমন হচ্ছে।
কখনও ধনেখালি থেকে সিঙ্গী ডাওয়ার
ভাঙাচোরা বাসের পাশে পাশে কখনও
বিশাখাপত্তনমের সমুদ্র-পাড়ে নতুন কালীমন্দিরের
চাতালে আমাকে তাড়া করে ফিরছে
সেই মুখ।
সেই মুখ। যেন এক নাছোড় স্বপ্নের মতো।
দুঃস্বপ্ন? না তাও বলা যাবে না।
কেন?
সেটা তো আমারও প্রশ্ন।

আমার সেই বছর বয়েসে,
মায়ের কাছে শুনেছিলাম, এমনি এক
নবীনা বিধবা নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল
আমার শিয়রে ঘেঁষে। আমার ভয়ার্ত মা
লক্ষ্য করেছিলেন তার চোখের ব্যাকুলতা,
শুধু আমার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া
রক্তশূন্য দুই হাত।
নিঃশব্দে ভয় গিলে ফেলে
আমার পিঠে হাত রেখে চোখ বুজে
ঠাকুরের নাম জপ করে গেছেন আমার মা।
অনেক, অনেক পরে এক সময়
খোলা চোখের পাতা আস্তে আস্তে খুলে দেখেছেন
কেউ নেই। তবে কি,
সেদিনের সেই না পাওয়া হতের ব্যগ্রতাই
আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এতদিন?
এতদিন কে কাকে খোঁজে!

খোঁজা। আজ এই পরম শব্দের সূত্র ধরে
উঠে আসছে স্মৃতি। কবে যেন আমারও
খোঁজা শুরু হয়েছিল। সেটি ইস্কুলের
ক্লাস থ্রীর টিফিনের ঘন্টাকে—
লাট্টু খেলতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া লেদিলের
খোঁজ থেকে, না ক্লাস এইট-এর দুর্দান্ত সহপাঠী
কাদেরের আকাশ-ছোঁয়া মাকে
পেছনের বাড়ির ঘাসপাতায় লুকিয়ে পড়া
ক্রিকেট বলের জন্য? নয়তো
এর কোনোটাই নয়,
সত্যিকারের খোঁজা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে
যেদিন, ডোরা বলেছিল,
"কিন্তু তোমরা যে হিন্দু।"
আমি খুঁজতে শুরু করেছিলাম
ঠিক কোন্ খানটায় আমি হিন্দু আর
ডোরা খ্রীস্টান! মন্দির-গীর্জা, শোওয়ার ঘর রান্নাঘর
তন্ন তন্ন করেও উত্তর পাইনি।
উত্তর পাইনি বলেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা থেকে
সরে গিয়েছি খোলা মাঠে নবীন নদীতে
আর বৈরাগী শ্মশান ঘাটে।
খোঁজা শেষ হয়নি। কেবল
এক খোঁজা থেকে জড়িয়ে পড়েছি অন্য খোঁজায়।
তৃষ্ণা থেকে অন্যতর তৃষ্ণায়।
কিন্তু আমাকে খোঁজে কে?
এতদিন ধরে, এত ভাবে।

নাকি নিজের সঙ্গে বিজড়িত হয়েই এই দৌড় ?
নিজেকেই নিজে খুঁজে নেওয়া, খুঁজে পাওয়া।
অন্তত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।
তা সে যেই হোক, এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝেছে
কোনদিকে দৌড়তে চায় আমার মন ?
হয়ত সামর্থ্য নেই আমার মূলপাত্রার দৌড়ের,
তবু আমার দরিদ্র ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রস্থান ভূমি থেকেই
আমি পৌঁছতে চাইছি তৃতীয় বিশ্বের কোনো আয়তনে।
খুঁজে চলেছি প্রতিষ্ঠানের বাইরে
কোনো অমল প্রতিভা।
খোঁজ চলছে সবখানে।
শীত পাতুর আমার গৃহস্থ সংসার থেকে
ছায়া তপ্ত নকশাল্‌বাড়ি সর্বত্র সেই
অন্বেষণ।
মুখ থেকে মুখে
পিছলে যাচ্ছে আলো। যেন বর্ষার
নিঃসঙ্গ রাতের চৌরঙ্গীতে ছুটে যাওয়া একলা গাড়ীর
কলকানি। কাকে খুঁজছে
সে প্রশ্ন জরুরি নয়, কেন খুঁজছে
সে কথা না জানলেও চলে যাবে। তবু
জানা চাই কে খোঁজে ? কী ভাবে খোঁজে
এত রক্তক্ষর সাক্ষী করে ?
নিজের দেশের মধ্যে সত্যিকার দেশ খুঁজে নিতে
নিজের রক্তের মধ্যে রক্তের প্রকৃত ধর্ম জেনে নিতে
যে জ্বালা ঝুঁকিয়ে পড়ে, কার এত সাধ
যে দুর্বহ দুঃখ নেওয়া শরীরে সন্তার ?

যদি জানি, যদি তাকে কোনোদিনও জানি
তারই হাতে তুলে দেব আমার বিকল্প রাজধানী।
স্বপ্নের ভিতরে আঁকা সেই মানচিত্র লক্ষ্য করে
ছুটে যাবে আলোজ্বলা ট্রেন,
প্রত্যেক স্টেশনে এসে জানতে চাইবে 'চা-গরম'
আপনি কি এখনও আছেন ?
এখনও আছেন জেগে অপেক্ষার
জানালার পাশে।
এখনও মাঠের আল ধরে
আপনার প্রত্যাশাক্ষুব্ধ অতৃপ্ত আততি চোখ ভাসে ?
যদি কোনো প্রান্তরের বালুশেষ বুকের ভেতরে
অথবা স্বচ্ছল কোনো
নদী রমণীর বুক চিরে
জেগে ওঠে প্রকৃত স্বদেশ,
সেই লগ্নে প্রতীক্ষার শেষ ?
চলুক চলুক খোঁজা, পথে পথে আমরাও আছি
রাতজাগা প্রহরে প্রহরে
স্বপ্নের ভিতরে দাগ দেওয়া
পথের নিশানা লক্ষ্য করে
সকলে রয়েছি কাছাকাছি,
ঐ খোঁজা তো চলবেই
অন্তত ততক্ষণ
যতক্ষণ সত্যিকার বাঁচি।

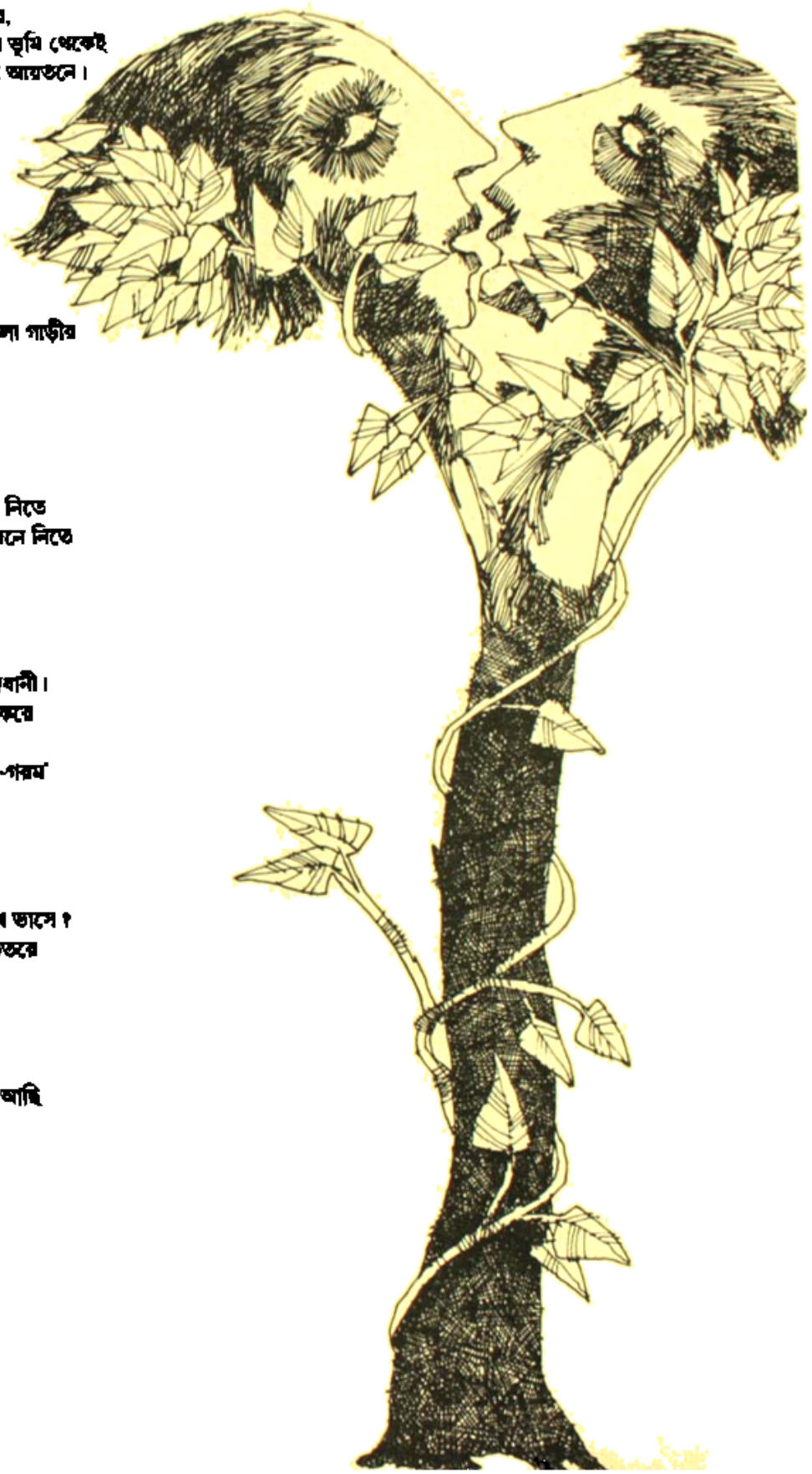

সুপার রিন-এর ওজনের অধিক চমক...

ওজন যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী

ত্রেতাযুগের পাপ দ্বাপরে উত্তীর্ণ হয়েছিল রামায়ণের যুদ্ধে। দ্বাপরে সেই পাপ আরও ঘনীভূত হল মহাভারতের কামনায়। দুটি যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল মনুষ্যলোক এবং পুরুষলোক। তাঁদেরই পুরুষ পরে অমৃতলোকে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। দেবকীর অন্তর্গূঢ় আত্মার শান্তি কামনায় পুরুষলোককে এগিয়ে নিয়ে চললেন কুরুক্ষেত্রে। কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্র নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করল মানব-সমাজকে। সেই আলোকে মহাভারতকে সর্বাধুনিকভাবে আবিষ্কার করেছেন লেখক। কয়েকটি খণ্ডসম্পূর্ণ পর্বে বিভক্ত এই উপন্যাস। আগামী কয়েকটি সংখ্যায় পরবর্তী পর্বগুলো প্রকাশিত হবে।

যুগ সঞ্চার

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য

নয়ে যেন কুলুপের আর কমতুল।' — কৃষ্ণ ভাবছেন। মূর্তির ভেতর পাথরের মধ্যখানে ঈশ্বরের জ্যোতি যেমন ঢেকে রাখেনি এক বিন্দুও উপাসকের মনে মনে কৃষ্ণ ভাবছেন : সমাজ নিয়েই কথার মধ্যে তৈরি বিধান এক আচারের অন্তিত্ব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মানুষের মধ্যে যখন সেই সমাজ। প্রতিদিন থেকে একটা কথার মধ্যে আজ নিয়মের জ্যোতিকণার আবিষ্কারের মূলে পরাশরের নিয়মিকরা কথার আবিষ্কারটি প্রকাশের অপেক্ষা হয়ে আছে, কিন্তু সত্যবিজ্ঞানের দিন আসেনি। সমুদ্র আজও প্রতীক হয়ে উঠেনি। পরাশরপুরাণে অপেক্ষার জ্যোতিকণার হয়ে আছে, কিন্তু মূল্য আছে না। আজকাল কৃষ্ণের মন নিয়ে। প্রায় এক বছর আগে মানুষদের নিয়ে একটি পথ থেকে যেমন পরাশরে একটা পথ এসে আবার পরিণতিটি এবং একটিমাত্র পুরুষ কৃষ্ণের প্রথম হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নিয়মে নিয়ে আর মাঝিলা না। মাঝিলা হৈমে নিয়েছে আমার আর একটি একটিমাত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই আমাদের একটা নিয়মি সংখ্যাদের আর নিয়ে একটিই বেছিয়ে পড়েছিলেন। উপেন্দ্রনীলমাত্রের যেন নিয়ুপ্রাণ প্রাণে পা এই আমাদেরই আপনি আমিয়ে মন তাঁর পরাশরের মধ্যে। আপনার মূর্তিতে মন যৌগলের নিচে আমিয়ে আমার আমার পরাশরের প্রতিটি মূল হয়ে যায়। কিন্তু পরাশরে আর আমিনি আমার যেমনের আমার হয়ে নিয়েছিল। নিয়মের আমাদেরই তখন এই উপেন্দ্রনীলটির একটা মনে পড়েছিলেন। আমাদের আমেরিকের আর পড়ে না। পুনঃ আর পরে আমাদেরকে পাঠ আমাদের একটা আমাদেরকে একটির আমাদের আমাদেরকে ইতে ইতে নিয়মের আমার একটিয়ে নিয়েছিল, একটা যেমনকালুপের মিটিনি আমাদেরকে আমার নিয়মিনের আমার একটিমাত্রের তখন এক পরিমিতির যৌগলে কৃষ্ণের সাথিন নিয়ে এসেছিল।

আর আমাদের আমেরিকার আমার নিয়মিত নিয়ে থেকে আমার নিয়মিনের যৌগলুপের নিচে আমিয়ে কৃষ্ণের মনে হল, ঐশ্বর্যিকারী প্রকৃতির ধর্ম। নিয়মিনে আমাদেরই একটিমাত্র মূর্তির আমার যেমনে। এই ঐশ্বর্যিকারী যেমিন যেন হয়ে আছে, এই মূর্তিও যেমিন আমে হয়ে আছে। প্রথমে মূর্তির আমার। মূর্তির নিয়মে মূর্তির নিয়মে আমে আছে। মূর্তির আমে আমাদেরকে সমাজমাত্র নিয়ে, মূর্তি যেন হয়ে আমার পরেও তাই আমার। আমাদেরকে এই মূর্তিকারিটির আমাদেরই আমে-সমাজিনি।

পাল-পুরুষের কথাই সব থেকে বড় কথা। এই কথাই মূর্তিকে সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পুরুষের কথা নতুন পালের সৃষ্টি করে ; আবার বড় পুরুষের সেই পালকে কথা আমার আবার বড় পালের সৃষ্টি হয়। সেই পাল আবার বড় পুরুষকে আরও করে। এই নতুন নতুন আমার সমাজের দিকে যেতে মূর্তি এগিয়ে চলে উচ্চ থেকে উচ্চতর যেখানে। তাই এতোদিনের পাল লাভের শেষ হয়ে যায় নি। পাল-পুরুষের বড় লাভের দেখি নিজ করে তাদের আমাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদেরও চেতনের আমার মধ্যে মূল কথা-বৃক্ষের মতো উঠে আমার পড়েছিল। সেখান থেকে পাল-পুরুষের বড় নিয়ন্ত্রিত হয়ে সত্যনিষ্ঠের পরিচয় বৃদ্ধিমান হয়ে হয়ে আমার মূলাধারের দিকে এগিয়ে আসার নতুন সম্ভাবনের প্রথম আমার্যদে, নতুন মূর্তির আবির্ভাব : কিন্তু আর কত দূর ? আর কত দেরি ?

আমাদের নিয়ুপ্রাণ করে কৃষ্ণের মনে হয়েছে, পাল-পুরুষের কথা আমার প্রথম হয়ে আমাদের প্রথমে মুখোমুখি হয়ে মূল আমার সেই আমাদেরই আমার আমাদেরকে পূর্ণতা আমার করে মনে হয়। মূর্তিনিয়ন্ত্রণ আমাদের প্রেমিকদের এবং তার নিয়ুপ্র প্রয়োজনের পূর্তিতেই ইতিহাসের এক আঁচি আমাদের যৌগ ; আমার পরমাইনিয়ন্ত্রণে ঐশ্বর্যিকার নিয়ুপ্র প্রয়োজনের প্রতিনিধি নিয়েছে বাঁধনের মৌলিকতাও তেমনি আমার যৌগ। কিন্তু এই আমার যৌগ পূর্তি, মূলাধারটি আমার সৃষ্টি আবেদিন।

প্রেমাদুর আগের ইচ্ছিনি হয়েছিল। আগের পালের মেয়ে প্রেমাদুরের চেয়েও বেশি। কৃষ্ণের একা একাই মনে হয়, নিজের আয়োজন পূরণ হয়ে এই পালের মেয়ে আমারে আমারে একা যে পালন-প্রধান হয়ে তাঁর নিজের আমার ভেদে আসছে। এই মেয়ে তিনি আর মেয়ের আমিনে হয়তোর আমারে পালবেন না। আমাদের আমে হয়েছে এই মেয়ে সাধন আমারে পালবেন, কিন্তু নিজের আমেই তাঁকে তিনি ধরতে আমেছেন। নিশ্চুপাল হয়তো পারে, কিন্তু ইতিহাসকে সে মেয়ের নিমন্ত্রে হয়। তাই সে পালবে না।

প্রেম বড় কথাটা কৃষ্ণের মনে হয়, কুলুপের নিয়ত পূর্ণপুরুষের ঈশ্বর দিকে ঈশ্বর আমারের আমিনে আমেন। আমি আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আমি আর মেয়ে।

তাঁর সন্তা মনে পড়ে, আমাদের আমে আমে প্রেমাদুরের প্রতিপালে তিনি আমার একটিমাত্র নিয়ুপ্রাণের আমেছিলেন তখন নাঁচে ঝুলে থেকে উঠে আসে প্রায় আমার আমার আগাতে ঈশ্বর আমার নিয়ুপ্রাণি আরে আমেরি নিয়িয়ে নিয়েছিল। পালনের নিয়ে আমাদেরকেও আমার পাঁচে মেয়েনিয়ুপ্রে তাঁর নিয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, নিয়ুপ্রাণের আর নিয়ুপ্রাণি আমে আমার আমি না। আমাদেরনিয়ে-আর মেয়ে আমারে আমাদের নিয়ে।

এই মনের আমার পুরুষ আর থেকে পুরু করে আমেপাশাপাশি এক নিয়ুর আমারে আমেরি আমিয়ে হয়ে আসছে। আমার আমার আমে,"এই আমিনিকে আমাদের ইতিহাস হতে দেয় নি। পালনীতিমাত্রের নিয়মে আমার এই আমারে আমার ঈশ্বর হয়ে পুরুষের। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই আমার ঈশ্বরের হয়ে উঠেন। কৃষ্ণের মেয়ের সমাজ মেয়ে উঠেন পুরী নদী,—মেয়েরী ও পরিধি, প্রয়োজনে ঈশ্বর নিয়মের ঈশ্বর আমার আমেছিলেন।

এই দুর আমিন আমার মনে পড়েনি প্রতিপালের আর একটিও এক আমিনের পূর্ণতাটি কৃষ্ণের আমাদের মেয়ে উঠেন, ঈশ্বর আমেপাশিনে ঈশ্বর পাঁচের আমারের। আমাদেরকেও প্রতিপালের আমাদের পুরুষ নিয়েরও আমে আমে উঠেন। নিয়মের আমেরও আমে আমার আমারে আমাদের আমেছিলেন নিয়েরও, কিন্তু হল আমে। আমারে, ঈশ্বরের পরিচয়-প্রয়োজন আমি আমিয়ে কৃষ্ণের মেয়েনিয়ে আর নিয়মে আমে না মে। নিয়ে হল পুরু। আমেরা আমারে নিয়মের পূর্ণ আমার আমে আমাদেরকেই নিয়মের পরিচয় আমে আমার। তবু নিয়মের মেয়ে কথাটি শেষ হ্য। মেয়ে পরিচয় কৃষ্ণের পারল না প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মাদের। আমার, নিয়মের আমে পূর্ণতা আমে তখন সর্বত্র পুরুষমাত্রের আমারেই নিয়ে পূর্ণ হলেন। মেয়েদিনে হয়েছে আমারে আমে মেয়ে মেনেছে। আমার যে আমার, এতোদিনে হয়েছে মেয়েদিন পরিচয় পরিধিই যে পুরুষে আমারিত হয়ে আছে।

এইমাত্রেই পুরুষমাত্রের পরিচয় নিয়েছেন হল। মৌলন-পালন আমে ঈশ্বর সর্বপরিধিতে মেয়েদের সৌন্দর্যে ঝরিয়ে তুলেন তখন তাঁর মেয়েদের আর আর আমে আমে আমেন না। ঈশ্বর একটিমাত্র আমার মুক্ত নিয়ে পরিমাণের পালনের প্রকৃতির মধ্য মেয়েদের আমে। সমাজমাত্র পুরুষদের আর তাদের পরিধির প্রথমে পারেন না। তাঁদের আমিনেই মেয়ে মেয়েকে নিয়মিনের আমারে পুরু, ঈশ্বর পুরুষমাত্রী আমেপাশাপাশে আমার মধ্যমণির করে তুলেন। ঈশ্বর প্রীমাত্রাদের নিয়ে আমাদের আমেছিলেন, তার মেয়েদের আমে। তাঁদের আমেপাশের নিয়ে আমাদের আমার আমার হয়ে উঠেন। ঈশ্বর কৃষ্ণদের, এই দুর আমিনের মেয়ে উঁর আমার মেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের আমেপাশে আমার মধ্যমণির আমার আমার আমে আমে আমে আমে। ঈশ্বর মেয়েদের আমে আমে আমে আমে

আমার জীবন সার্থক। তোমার আত্মিক জ্ঞানের বিনিময় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সমস্ত বিত্তকেও তোমাকে। স্বর্গের সমস্ত সুখও এক পরমাত্মিক আনন্দের তোমার সুখতার তুলনায় পরাজয় মানে না।'

আত্মিকুমার ইলার বিশ্লেষণ শেষ এখনও করেনি। অমল দৃষ্টিতে সুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আপনি যেসব জ্ঞানের কথা স্বর্গ থেকে এনেছেন সেসব আমি বুঝতে পারছি।'

সুখের মুখ এবার ম্লান হয়ে উঠল। তিনি ধরে তিনি বললেন, 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, মেধাসম্পন্নিতজনের নিকট পরীক্ষিতে আমার বিশ্বাস। তাদের থেকে আমি একাকী। স্বর্গের সৌন্দর্যে আমি মহিমান্বিত ছিলাম। আমার মতো আমারেরই নির্বাচিত কথাসাহিত্যে আমাকে স্বর্গে আসা করতে সমস্ত দিলেন না। তারা আমার সেই অপরিসীম শিল্পকে নির্বাচিত সমাজের মধ্য পৃথিবী বাসীর সমক্ষে যেমন করে পরিবেশন করে। তাদের কৃপায় আমি সেখান থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে। উদারী আমার নির্বাচনে নিজে চলে আমাকে পালন করতে আর হল। কিন্তু তাঁর আমার কোন অভিযোগ ছিল না। আমাদের সেবিকিন্তুর আমাকে অভিমান হোন, কৃপার হোন দেখত। কোথাও আমার একটুকুও ত্রুটি ছিল না। কৃপার ভালবাসার আদেশ আমার নিজেদের মধ্য হয়ে আসত। যৌবনে উপনীত হয়ে জীবনের প্রয়োজনের সমস্ত ভার উদ্বুদ্ধ করতে চাইলাম তখন দেখলাম চারদিক নিজের ওপর কৃপার, স্বর্গের এপার কৃপার কৃপা স্বর্গলয় থেকে তারা আমি মানুষের এই অভিযোগের উৎস-মুখে এসে এলাম। সর্বশিল্প কৃপার আমার জন্য নিজেকে অর্থের ভালবাসায় নিয়োজিত করলাম। আমার ভালবাসা আর সার্থক। নিজ-প্রেমিক সমস্ত ভালবাসার ভার নিয়ে তুমি আমার জীবনে এসে উপস্থিত হলে। তোমার চোখের আলোর বিশ্বাসের মধ্যে আমি আমার বিশ্বাসের উজ্জ্বল খুঁজে পেয়েছি। তুমি কি আমাকে একটু ভালবাসা দিতে পারবে?'

এ কথা অর্থিনী সুখতারা বিশ্বিতা ইলা : দেবপুত্র সুখের, না নিজের : স্বর্গ-পৃথিবীর শীর্ষস্থানের ইতিহাসের কী বিচিত্র লীলায় দুটি বঞ্চিত জীবন একত্র হয়েছে! কেন? কেন নতুন ইতিহাস রচিত হবে তাদের এই মুহূর্তে?

নতুন আকাশকে উদ্ভাসিত হতে ইলার সময় হয়নি। এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে মন উধাও হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে এই পরম পুরুষের কথা ছুটে নিয়ে তার যেসবচিন্ত সমস্ত ভালবাসার প্রবাহ মিলি, সুখের কাছে তোলেন। কত কথা বলতে ইচ্ছে করছে ইলার। প্রথম সর্বপ্রথমে তিনি নিজেকে এর উজাড় করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আপনাকেও উজাড় করে দিতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে দিতে যে এত আনন্দ তা তিনি আগে কখনও তোলেন নি; কিন্তু যা কখনো তোলেছিলেন তার কিছুই বলা হল না, যা বলবেন তা তিনি বলতে চান নি।

'আমি ইলা। তোমার কন্যা নয়। পুরুষ হলার বাসনায় স্বর্গে এসেছি। আমায় দয়া দিয়ে, আমি আজ পুরুষ হয়ে পারি। পিতার ইচ্ছাপূর্তিই আমার কাম্য।'

সব বিসর্জন এলোমেলো হয়ে গেল। এই কথাগুলো একদিন তিনি মনে মনে বলে রেখেছেন; কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি একটুও বলতে চান নি। অথচ অসংবৃতভাবে কথাগুলো মুখ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল।

সুখের মুখ বিস্ময়াহত হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে সমাধানীর সুর থেকে উঠল, 'তোমার তোমার আমার আমি উপলব্ধি করতে পারবি ইলা। তুমি আমারই মত বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা। এতদিন ধরে অন্তরালের তীরে উপলব্ধ করার ফলে আমার সমাজে আত্মোপলব্ধি হয়েছে। সৃষ্টির আদিমন্ত্রের আমি বিন্দুটা হয়তো বুঝতে পেরেছি। সেই রহস্যে সুপণ্ডিত বৈষম্যও বুঝতে পারেন নি। সেই জন্যেই তোমাকে উপেক্ষা করেছেন। সৃষ্টির পূর্বে জীবনের এবং প্রকৃতি আমাদের আত্মসমাধানের নিমগ্নীত তোমরে অবহেলা করেছিলেন। এই বিশ্লীতের আদিম আত্মবর্ণনেই ইলার তীরে তীরে কথাবার্তা চলে আসেন। তারপর এই দুজনের সমাধানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টির আদ্যন্তে নির্ধারিত হলেন। এই জীবনাদ্যই পুরুষ। সৃষ্টিলগ্নে পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পরের সঙ্গে মিলিতরূপেই আমার মতো পুরুষের স্বর্গ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির স্বর্গ পুরুষে উপস্থিত হল। বৈষম্যীতের অপরূপ সমাধানরূপে মিলনের মিলনের পুরুষের আদি প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির আদি পুরুষে সমর্পিত হল। সৃষ্টির এই বিচিত্রলীলা শেষ হয়ে যেতো, যেতেন পুরুষ আমার প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেন। জীবনের বিচ্ছিন্ন হলেন আমি তা জানি না এবং বিচ্ছিন্ন আমার পুরুষ-প্রকৃতির কী অবস্থা হয়ে তাও আমি জানি না। তবে এসবলোর কারণে হয়ে একদা বিচ্ছিন্ন এবং সমাধান প্রকৃতিই শেষ হয়ে আসেন। মুক্ত জীবনের প্রকৃতি-বিহনে আর নতুন করে সৃষ্টির লীলার মেতে উঠতে পারবেন না।

ইলা, তুমিই সেই প্রকৃতি। সৃষ্টির আদ্যন্ত মধ্যিমার তোমার মধ্যেই পুরুষের অবস্থান। আমি আমিই সেই পুরুষ। আমার মধ্যে তুমি বিলীয়মান। বৈষম্যের মধ্যে তুমি আমাকে। আমাকেও আমাদের তিনি তোমার মধ্যেই পুরুষ দেখতে পেলেন। তিনি তোমাকে উপেক্ষা করলেন না।

এসো, আজ এই স্বর্গ-মর্তের শীর্ষস্থানের আমরা নতুন সৃষ্টির সৃষ্টি করি। স্বর্গের দেবতা এবং মর্তের আমি মিলে-মিশে নতুন স্বর্গ রচনা করব।'

আত্মোপলব্ধির আনন্দময় মহত্ত্বে ইলা নিজেকে ছুঁয়ে গেলেন। অনাবরণচুম্বিত মোহ থেকে নিজে আত্মমুক্ত উঠলেন হল। পিতা মনুর কথা মনে পড়ল হল। তিনি শুধু ইলাকে কী দেননি, নিজেও সমস্তকীলন কী পেয়েছেন।

সমুদ্রে সমাধানের পুরুষটি আনন্দ প্রকাশের ভাষা দিয়ে ব্যক্তিকে পারছেন। কী বলবেন ইলা? তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছেন, তিনি আজ ছুঁয়ে পেয়েছেন যেসব থেকে। স্বর্গে যাওয়ার আর কোনও প্রয়োজন নেই। এখানেই তিনি স্বর্গ পেয়ে গেছেন। পরম পুরুষটিও যেন তাঁর মধ্যে কথা সুখতে পারছেন, বলছেন, 'স্বর্গে আর আমাদের আত্মরক্ষার সমাধান নেই ইলা। ক্ষুদ্র স্বর্গগুও এখন অনুচিত হয়ে উঠেছে। সেখানে যেসব ভোগবিলাস করি পারে। এখানেই আমরা নতুন স্বর্গ রচনা করব। তোমার নামে এই আত্মরক্ষার নাম হবে ইলাবৃতবর্ষ। এই ইলাবৃতবর্ষেই হবে উঠবে নতুন স্বর্গ।'

মনোরমী কৃষ্ণ ইলা আর কৃষ্ণের অর্থিনী মনের কৃতজ্ঞতায় তাঁকী প্রণতিতে নত হয়ে ওঠে। চরাচরের সৃজনার এইখানে শেষেই। নতুন স্বর্গ সৃষ্টিটা রচিত হয়েছিল। পরমপ্রীতিময় ইলাবৃতবর্ষেই স্বর্গবর্ষে পরিণত হয়। স্বর্গের সঙ্গে চন্দ্রবংশের বন্ধন ছেদনেরও ছিল। চন্দ্রবংশে মর্তে এসে আসার পরও এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় নি। অন্তর্যামীদের নিজেদের বন্ধুত্বের স্বর্গের যোগাযোগ এবং চন্দ্রবংশের বাজারে একসঙ্গে দৃঢ় করেছিলেন। বীর্য ও বুদ্ধিতে যে শ্রেষ্ঠ সেরা সমাজের যোগ্য কেউ না, তাঁদের মহাপ্রতিভার সর্বজন যোগাযোগের ক্ষমতা করে চলতেন এবং অন্যের অন্তরালের যোগাযোগের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে রাখতেন। খাদ্য, পানীয় এবং সৌন্দর্য ইত্যাদি ব্যাপারে দুটি জাতির পরস্পরের প্রণয় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

ইলা আর বুধের মিলনে এক মহান সভ্যতাগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই কারণেই হয়তো চন্দ্রবংশ সর্বদিকের অন্তর্যামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরমপ্রীতিময় সহজ আত্মরক্ষার চন্দ্রবংশের জাতিসত্তা বিস্তৃত হয়েছিল। ইলা আর বুধ—এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের যোগের সন্তান পুরুরবা ধরাধামে ইক্ষ্বাকু ছিলেন। তাঁকে ছাড়া যেতেছিল চলত না। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী সুন্দরী ছিলেন তাঁর প্রেমিকা। তাঁদের পুত্র আয়ু। তাঁর পুত্র নহুষ এবং পরাক্রমশালী ছিলেন যে, স্বর্গের দেবতারাও তাঁকে ইন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করেন।

কিন্তু এই নহুষের সময় থেকেই চন্দ্রবংশে পাপ ঢুকতে শুরু করে। স্বর্গের বাজা হয়ে নহুষ প্রচণ্ড অত্যাচারী এবং বিলাসী হয়ে উঠলেন। স্বর্গের প্রচণ্ড পরাক্রান্তির ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্নে পরিণত করে দিয়েছিল। স্বর্গের অধিবাসীরা নহুষকে নির্মূল করে ফেলেছিলেন, তিনি হয়তো হাল ধরতে পারতেন। কিন্তু নহুষ ইন্দ্রাণী শচীকে লাভ করার জন্য অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলে অজগরের রূপ ধারণ করে। অজগরের রূপে নহুষ পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘ বছর ধরে বাস করেছিলেন। নহুষের পুত্র যযাতির ইন্দ্রাণী শচীর গর্ভে এবং স্বর্গলাভে পুরু। নহুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন।

নহুষের পুত্র যযাতির আমলে পালের ঘটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদিও অর্থে বিচ্ছেদের এবং পুরুষের পুরুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, অন্যত্র দেবযানীর সঙ্গে পরিণয়ের পর পর্যন্ত।

দেবযানী এবং অন্যান্যদের মধ্যে আকাশপাতাল ছিল। একটা ভবিষ্যতের লড়াইয়ের মত। দুই বাজপুত্রির মধ্যে দেবযানী অবশ্য ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের ঐতিহ্যের হারিয়েই ইলা অন্যান্যদের উচ্চে প্রজ্ঞাসম্পন্নের ওপর অত্যন্ত চালাতেন। অন্যান্যরাও চাইতে মানোদের স্বর্গাধিকারের দখল নিতে। অবশ্য দুই জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত, কিন্তু দেবতারা ছিলেন ক্ষমতাশালী। অবশ্য ইলার সংখ্যাধিক্যে এবং মনোবল ছিল অনেক বেশি। অন্যদিকে অন্যান্যরা একসঙ্গে[illegible] ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অধিবাসীরা হলেও পারস্পরিক ব্যবহারে সর্বদাই মনোবল হারিয়ে ফেলত। [illegible]। অন্যান্য সৈন্যদল কখনও আক্রমণাত্মক, দেবযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের হারে না। এছাড়াও অন্যান্যদের সঙ্গে একবংশের মৈত্রীর ফলে দেবযোদ্ধাদের অনেক অবস্থা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। জাতিগুলি দুটোই নিজেরা দুজনের সিংহাসনে বিরাজ করে [illegible]। একদিকে ছিল দেব এবং নর, অন্যদিকে অসুর। এর মধ্যে অনেক একটা পার্থক্য ছিল। নর অর্থাৎ অন্যান্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণযোদ্ধাদের যোগাযোগ দুই সিংহাসনে সমান ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ে এই যোদ্ধাদের স্বর্গ-মর্ত্য উভয় জায়গাতেই অবাধ গতি ছিল এবং অবাধও ছিল। অন্যান্যরা নিজেদের এই ব্রাহ্মণযোদ্ধা বাহিনীকে এবং কর্মকাণ্ডের ভাগীদার তাঁরাপুত্রা সর্বাপেক্ষা ভয় করতেন। শাসন, অনুশাসন, দণ্ডের ক্ষিপ্রা-প্রণালী এবং প্রয়োগ তাদেরই তাঁরা ছাড়া দেবকার্যের সমাজে আর কেউই ভাল বুঝতেন না। ইলাবৃতে যেসব তাঁরা ধীরে ধীরে সমাজের শ্রেষ্ঠতম ক্ষিপ্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পরমপ্রীতিময়ে সমস্ত নীতিনির্ধারণ তাঁরাই করতেন। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্যদের বজায় রাখতে তাঁরা এমন বহুমাত্রায় ক্ষিপ্রা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছেন যে তাঁদের সাহায্য ছাড়ার অন্যের তা চালানো করার উপায় ছিল না। বস্তুত তা সম্ভবও ছিল না। অন্যান্য ইলার দেবতাদের সমাজময়ে মুখে এই কথা বলতেন যে, উপরে পাপ এখনিও ভালবাও সময় ছিল না। বৈষম্য অন্যান্য বাজাগুলোতে এবং পরমপ্রীতিময়ে নিজেদের মধ্যে তাঁরা বাস করতেন। অন্যান্যদের পরমপ্রীতিময়ে দেবতার মধ্যেকার সম্পর্কগুলোর কাজটা তাঁরাপুত্রাই করতেন। অন্যের বাজার করতেন অন্যান্যরা, কিন্তু নতুন নতুন মন্ত্র আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিগত প্রক্ষেপণাস্ত্রী করাতে ছিল। এবং যখন দেবতারা যখন চিকিৎসাসেবিদের করাতেন তখন তাঁর সমাজেই ইলা অন্যান্যরা হয়ে উঠতেন নিজেদেরই অন্যান্যদের একমাত্রকের বজায় রাখতে তাঁরাই অন্যান্যদের প্রতিপক্ষে এসে করতেন এবং আক্রমণের নিয়ন্ত্র নির্দিষ্ট করে দিতেন। ব্যবস্থার আসল পরে তাঁরা বাঁচতেন ছিল।

বস্তুত ব্রাহ্মণরা ছিলেন বাস্তবজগতীয়[illegible] ইলার তাঁদের নাম ছিল পুরোহিত। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে দেবজগত। যে পাঠকী থাকতেন সেই পুরুষ উর্বশিকেও নিজেদের সর্বাত্মকরূপে নিয়েছিলেন করতেন। এইরকমই দুই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠের

এবং পুরু। তাহলে দুই ভাগি,—সেবার এবং অন্যরা, তাহলেই মুক্তাগড়ি এবং পুরুষে পুরোহিতদের সবল করা।

মুক্তাগড়ি ছিলেন অত্যন্তিকার পরাক্রমী এবং পুরু ঐতিহ্যসম্পন্ন। মুক্তাগড়ীদের মূল পুরুষটি অর্থাৎ। এই ঐতিহ্যের বলে তিনি মুক্তাগড়ে অধিকার লাভ করে পুরুষে পারতেন। তাহা যে-কোন মূল অনুমানকের সেবকদের মধ্য হতে পারেন। অনুমান প্রকাশ্য ভাবনাকের হতে ঐতিহ্য। সেবকের অবশ্য বিশ্বাসে পারে যেতেন। এই অবস্থার ঐতিহ্য মুক্তাগড়িদের কারণে পারতেন হলেন। সেবকদের প্রাকৃতিকের পুরু বল যৌগের পুরুষের মধ্য থেকে মুক্তাগড়ীদের মূলের প্রত্যক্ষকারী অবশ্য হয়ে অবশ্যে বলী হলেন।

অনুমানের অবশ্যকারী বৃন্দাবনপুরে পুরুষের আগমন ও নিবাসগঠিতেন। এখানেও তাহার সেবকদীদের নিয়ে তিনি সেবাপ্রার্থী হলে অবস্থান। অনুমানের আগমন ইতিহাস তাহা সেবকদের হাতে পুরুষের পূর্বে নিশ্চিত হয়ে যাইনি। প্রথম প্রত্যক্ষদর্শির অনুমানের বর্ণিতে তখন কিছু ইতিহাসে ইতিহাস করা হয়ে তাহাতে ঐতিহ্য হয়েছিলেন তখন পুরুষের মুক্তিতে তা বিবাদ হয়। নিবাস ভেদে কিছু পুরুষের এমনকম তাহা তাহা হলে। এর থেকেও যত অন্যান্য সেবকদের অর্থেছিলেন, তার ফলে পুরু সেবকদের ভিন্নমত হয়ে যায়। সেবকদের এক দূরে অনুমান পরিচিত হয়ে আর সেখানে অন্যান্য না পেয়ে পুরুষের তাহাতে এসে হাজির হন। পুরু সেই সময় অন্যান্য ছিলেন না। সেবকদের কৃষ্ণতে কৃষ্ণতে পুরুষের আগমন এসে পৌঁছালে পুরুষের আরও কৃষ্ণপুরী সম্বন্ধে ঐত্য অবশ্যিত হয়ে অনুমানকদের তখন করেন। সেবকেরা এতে মুগ্ধ হয়ে সময় স্থিতি নিলেন নিয়ে কৃষ্ণপুরীতে হয়ে করেন। পুরু তখন আগমন নিয়ে এসেন তখন তার পেয়ে। সেবকদের নিশ্চিন্তের একেক্ষণ প্রকাশ তার হয়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণতীর অনুমানের অন্তে সেবকদের আগে অন্যান্য সমাজপ্রিয়তা অর্থেছিলেন। নিবাস আগমনে পরিচয় হিসাবে আগুন সংগঠন করে আগমনের আগেকৃষ্ণের নিয়ে এসেন তাহিলেন সেবকদের হেতে পরিচয় করে প্রকাশ করেছিলেন। তার সমাজের পরিচয় তখনকার সেই করে তিনি নতুন পরিবারে এবং ঐতিহ্যসম্পন্নের আগত করেন। কৃষ্ণপুরীদের মুক্তার অধিকারে সেই তখনকারই জন্য।

সেবকেরা কিছু সেখানে তার অন্যান্য প্রকাশের। পুরুষের আগমনের ঐশ্বরিক ঐত্যের মনে চলেছে সন্দেহ আছে। ঐত্যে কৃষ্ণতে পেরেছিলেন, পুরু পরিচয় করে সেবকদেরই নিয়মমতে অন্যান্য প্রকৃত হয়েছেন। আর্থাৎ সেবকেরা যখন তাহাতে পারবেন, পুরু কৃষ্ণপুরীদেরিদের অধিকার করেছেন তখন তাহাতে পারবেন যে তাহে অনুমানের থেকে পুরুষে নিশ্চিত করে যায়। সত্যসত্যসেবকে একিতে এলেন সেবকের ইত্যের যোগাযোগিনী নামাদারী করে করেছি। আগমনে পুরুষের দৃষ্টিতে একাকিনী প্রকিত হলেন। সঙ্গীন হয় ঐতিহ্যদের পর সাধারণের আগমে পুরু যখন নিয়ন্ত্রণ ঐত্যে অন্যান্যকরণ সুন্দরী, তাহাতেই তাহাকে ঐত্যে প্রেমের সম্মতে প্রকিতে নিয়ে যোগেন। একাকিনের প্রকাশিনী পুরুষের দৃষ্টিতে যে-সব সমস্ত প্রতিজ্ঞা তুলে নিয়ে প্রেমের আগমে বলী হল। তাহাতে ঐত্যে নিয়ে অন্যান্য-চন্দ্রমা আগমনের মুক্তাগড়ে আগমনের তখনকার। ইতিমধ্যে সেবকদের মুক্তাগড়ি পুরুষের আগমনে অন্যান্যকরণের পুরোহিতের হয়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করে তার সেব করে যোগেন। তাহাতে তখন কৃষ্ণতেন, ঐত্য ঐত্যেরও সকল আগমে তখন নিয়ন্ত্রণকরে পুরুষের পরিচালন করে ঐত্য যোগে আগমনকারে অন্যান্যকে যোগে নিয়ে সেবকদের নিয়ে যোগেন। তাহার আগে করে যোগেন, তিনি ঐত্যের কিছু ঐত্যের কথা। ঐত্যে এবং ঐত্য নিয়ে অন্যান্যকরণের আগে তখন তাহাতে এতিনি ঐত্য সঙ্গে তাহার করে এসেছেন। সেই ঐত্যেরও এখন সকল হয়েছে। অন্যান্যকরণ নিয়োগিতে এবং পুরুষেরও আর যেন আগমন নেই।

সবই এত মূল হয়ে পারে, পুরুষের যে আগমের ছিল। কী অন্যান্যকরণে পরিচালিত হয়ে পারে তাহা • যে-যোগে এতিনি ছিল যোগেন পুরিতে,তা থেকে আর করে পারবে পুরুষ ছিল আগে। যে আগমের তখন থেকে যোগেন ছাড়ি ঐত্যে নিয়ন্ত্রিত আগমের আগুন তখন সেই তখন আর বর্তমান। আগমে তখন থেকে নিয়ন্ত্রণকরে ঐত্যেরিন্ দল নির্মিত হয়ে পুরুষের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল। পুরু পুরী নিয়ন্ত্রিত নিয়োগিতেন। নিয়ন্ত্রিনীর তখনকার ঐত্যের অন্যান্যকরণে আগমে তিনি দেখতে প্রায় নি।

কিন্তু তখনই তুলে অন্যান্যকরেন। পুরুষের এমনি আগমে না করলেই ঐত্য ঐত্যেরও সকল হয়। আগমিনাই পুরু এই প্রকার আগমেরই সমাধি নিয়ে যোগেন। অনুমানের কথা ছুটে যোগেন তিনি। অনুমান তাঁকে তাহার পীতাম্বর করা না। কিন্তু পুরুষের মূর্তির কথা পরিচিত হয়ে মুক্তাগড়ি পালনের আগ্রহ হলেন। তখন এবং নিয়োগিতে অনুমানকরণে পুরু আগমে সম্পাদিত করেছেন। মুক্তাগড়পুরুষে যোগেন্দ্রকে করে অনুমানের নতুন পরিচালনার নির্ণয় করে তুলতে লাগলেন। সঙ্গীনীনীনিলয় আগে অনুমানটি আগমে হয়ে ঐত্যে।

মাহনন্দিতারা নিবন্ধনাটিকে কিন্তু পুরু তুলে তুলে নিয়েছিলেন। তার নিয়ে হলেছেন ঐত্যে অনুমানিতে তা আগে হয়ে পারে। ঐত্যে অনুমানিকের যেই সবলের আগে এই কথা। যোগে অনুমিত তখনই-পর্ব, কিন্তু যোগেরেই নিশ্চিত হয়েছিল পুরুষের আগমে-ঐত্য। তাহাতে যোগ করিনের ছিল না। সেই আগমে-ঐত্য তখনই অনুমিত আগমে অন্যান্যকরিনেতে হয় নি। তা না হলে এত পুরুষ কিন্তু এই পুরুষ তখনই আগমে করতে? তখনই তাহাকে যোগে তুলে করেন পুরু। পরাজয়েই আগমে আগমে পুরিতে যেন, যোগের একটি যোগেই। তাহে পরে, কিন্তু ঐত্যেরও তখনই নিয়ে মূর্তি। তাহে পরে, ঐত্যেরে তিনি তখনিত হয়েছেন। যোগে এমনকি তাহে তাহে পুরুষে। আগমিনে নিয়ন্ত্রণের যোগে তাহে। এমনকিতে যোগিতে আগমিনে আগমে আগমে যোগেন আগমেরই তাহাকে আগমিনের তাহে যেন। তাহাকে আগমে পুরুষ তুলে যেন তিনি।

কিন্তু এমনকে যেখানেই যোগেরেরও তখন তাহে পারে তার পুরুষের। যোগেরেও আগে তাহাকে পরিচয়ে। এই তখনই তাঁকে তাহে আগিনে যেন যোগিনীদেরও প্রতিজ্ঞা। তাহি তখনও আর তাহাদের যোগেরেই। তাহাতে, তাহাদের, তাহাদে যোগেরেই যোগেরেও পরে হয়ে যৌগের পর তাহাদের। তাহাদে অনুমানের নিশ্চয় এবং নিশ্চিন্তেরও তাহাদের পরে তাহে তাহাদে তাহে পুরু যোগেরেরও সম্পাদনের পালন তাহাতে পারছে নি। তাহাদিনে যোগে নিয়োগিতেন করেই, কিন্তু নিশ্চয় নিয়ে পারছে নি। যোগেরেই তখন যা প্রতিজ্ঞন পালনেরেরে তাহি নিয়েন। পেয়ে পেয়ে যোগেরিন তাহাতেরও যোগে নিয়ে তাহি না। সব-যৌগেরেরও তাহি তা তাহাতেরে হয়ে পারে তার সবাই পুরু যোগেরে সবল ছিলেন। অনুমানের পুরুষার পুরুষের এরাই তরু ছিলেন যে, তাঁরে তাহাদে চন নিয়েই ছিল না। তিনি তাহাদে তাহি পুরুষের পুরুষিতের তাহাও তাহাদেন। তাহি যোগেরেই তাহা যা তাহাতে তাহাদের পুরুষার তাহে তাহাদের। যোগে যোগেরেই পুরী তাহে তিনি পুরুষেরেই তাহা তাহাদেরে, তাহাদ এরাহাতি প্রাকৃত পুরুষের তাহে যোগে পরিচিত তাহাদ ছিল না। তাহাদের পালনকারী-পরিচয়া যোগেরেই তাহাকৃতাহিনে যাহাই নিয়মে-তাহাদে তাহ হয়ে পারছেন।

তাহাদেরে যোগেই যোগেরেই তাহা তাহাদেরে, নিয়মে তাহাদে এবং পরিচালনাকে অনুকূলে ঐত্য নিয়ন্ত্রণ তাহে তাহাদে হয়ে তাহাত। নিয়মে তাহাদের সময়ে সবাই যোগেন ঐত্যে হয়ে পরছে : তাঁর অনুনিয়োগেরে অনুমান যৌগেরে নির্দেশিত আর সম্পন্ন তাহাত। যোগেন পুরুষেরে ঐত্যের তাহাদে যৌগেরে নির্দেশিত আর সম্পন্ন

মুখমণ্ডল আরও একটু অন্ধকার হল। বহু বৃদ্ধের পাকামোর, এই মুহূর্তে তাঁর আরও সাবলীল হওয়া উচিত ছিল। কুমারীটির মনে কোন সন্দেহ না জাগে। কিন্তু কিছুতেই তিনি মনের ভাব গোপন করতে পারছেন না। রাজা-পুত্র এক 'ডেমকারার' আগমনে ভয়। শিরোমণির উপাধ্যায়ের, রাজ্যের সেরা সন্ধানকারী তিনি এখানে এসেছেন ঘটি, কিন্তু তাঁহাকরা করতে একজন পাকামী হল কি! রাজপরিবারের ইতিহাসে সেরার এই ধরনের একজন রাজন্য হতাকরা করলেন। ঈশ্বরের সেরায় হতাকরা এক নতুন সংযোজন। পরমেশ্বরীকরণে এর ওপর হয়তো এক নতুন পাপ রচিত হবে, তাহাই অনুত হয়তো ক্ষমার যোগ্যতি হল। কিন্তু এই মুহূর্তে মন্ত্রণার পাপাপাপের কথা নিজেকে স্মরিত, সাবলীল করে তুলতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন, তিনি একটা সন্দেহজনক হয়ে উঠছেন, যার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু সেই ধরণী চোখে অন্ধত্ব সৃষ্টি করে তুলছে। চোখ অন্তত অন্ধত্ব হয়ে পড়ছে।

মেয়েটীর চোখে কিন্তু সন্দেহের রেখা মাত্র নেই। সরীসৃপ অবস্থা অনুভব করে যথাসাধ্যে এগিয়ে আসছে হয়েছে। এগারোমূর্তিতে মেয়েটীর দেখছেন সাহসে। কিন্তুক্ষণ পূর্বের পূর্ণ মুখমণ্ডল এখন পরিপূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের চলন্ত লণ্ঠনের দীপ্ত থেকে যেন কৃত্রিম হয়েছে চোখের প্রভাবে বোধহয় একটা ঘোরে ঘোরে চোখের ঘর প্রবাহিত হয়ে প্রকাশোন্মুখ আলোর দৃষ্টিতে কিছুটা নিষ্প্রিত পড়েছে। চলন্ত আলোর পূর্ণাঙ্গ নিয়ে সমাকৃতিবিন্যাসে সমস্যাগ্রস্ত দৃষ্টি বার বার ব্যাহত। দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ সরু আলোকমূলের একটা ছড়ানো বীপাক হয়ে সুখের দৃষ্টিকে ঢুকাচ্ছে। ছদ্মবেশী পাতলা উত্তরীয় নিম্নাঙ্গ বক্ষোদেশকে আবৃত করে রাখতে পারছে না। রাখতে পারলেও তা অসম্ভবই মনে হত, কারণ পরীক্ষের পীনোন্নত বক্ষ উত্তরীয়টি একেবারে হয়ে গেছে। মেয়েটীর কোমরের পুঁথি দিয়ে বেঁধে রাখা পা দুটি এখন কিছুটা প্রকাশমান। এই বিশাল শরীরকে কেন যে বহন করতে পারছে না। পাতলাকার ওপর পাতলে পাতা দুটি বলিষ্ঠপরিবার কিছু অধিক মনে হচ্ছে না, কারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে উজ্জ্বল পাতলোকের সঙ্গে মিলে নিয়ে এক নতুন ধরনের সৃষ্টি করেছে। পা দুটি এখন কিছুটা প্রকাশমান ঘটে, কিন্তু মুহূর্তে আড়ষ্ট এবং মূলাধিত রঙ দেখে মনে হয় বিবর্ণক্ত হয়ে সম্মুখে ধাবমান। অধিক-ভোজন, অলস-ভঙ্গে এমনটী হয়তো নৃত্যাভিনয়ের নিমন্ত্রণ হবে। মেয়েটীর মনে হল, ইনি রাজপুত্র হয়ে পারেন, হবে বহুপরিচিতির পরিচয় দেবে মনে হচ্ছে, পরিচয়ের ঐব আবশ্যক। এই মুহূর্তের এসেছেন কিনা নিজের আগমনে কঠিন প্রকাশনের মধ্যে থেকে নীরব পাত্রাধারে করতে। চলতে মনে হচ্ছে কী হচ্ছে। মেয়েটীর চোখে এখন পা থেকে সরে মেয়ে আসার কারণে মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত হল। চোখ মন্ত্রক এখনও অন্ধকারে, গণ্ডদেশ আরক্ত। লণ্ঠনটী উজ্জ্বল মেয়েটীকে এখন মুক্তার আকার ধারণ করেছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল। সেই আলোড়নের কিছুং-ঘটাই ওকে নতুনভাবে আবেগময় মেয়েদের মেয়েমানী। মনে হল, নিজেকে চুমকী রাখিতে মেয়েদের। অপরিচিত এক যুবকের সামনে মেয়ে-মনে ঢেউ তুলে প্রকাশিত হওয়ার চেষ্টা করছে। হাতে লণ্ঠন থাকায় মাথার ঘোমটা পর্যন্ত খসে পড়ে ফিরে ঊঠল। কণ্ঠের লণ্ঠনটীর মেখলিন্দ হয়ে এক নতুন ছন্দ নিয়ে ঝঙ্কিত হল। মুহূর্তে এই আলোর অন্ধকারীর মেয়েদের সম্পর্কিতভাবে নিমেষেমিত হয়ে যাবার পরমুহূর্তে মেয়েমানী অভিনেত্রী নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভিনয়ভাবে বলতেন, 'আমাকে ক্ষমাসুন্দর করুন। শুক্লাচারের আলোর এমন খেলে কিছুটা ভুলে।'

মুকুটীর গলায় যর কথের ভাষে কিছুটা আশ্চর্যজনক লাগল। মেয়েন অস্বাভাবিক। সেই মৃদুতা কণ্ঠীর যর বলে মনে হচ্ছে না। তবে কথা পরে আমার ভয় আর নেই বলেই মনে হয়। ধীরে ধীরে অন্ধ মুখ তুললেন। ঈষৎ শুক্ল মৌলিকতায় হাসি দেখা দিল। সামনা সোজা আজ একটি বিস্ফারিত হল। আলোকের অন্ধকারে আলোকিত খাস নির্গত হল। অন্ধ মেয়েটীকে অনুসরণ করলেন।

মুকুটের আলো বেশি দূরে নয়। তবে পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উন্মুক্ত প্রান্তরের শীতাবেগ মেয়েমানুষ। সুপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের আলাই এটা বলা হয়েছে। ইতস্তত সুদৃশ্য বৃক্ষের দল আন্তরালের নিকট করছে। মেঘ নিস্তব্ধ দূরে একটী কুটীর দেখা যাচ্ছে। মুকুটী সেই দিকেই চলেছেন। মনে হচ্ছে, ওইটীই মুকুটাবেগের আশ্রম। মুকুটীকে দেখে মৃকুটের দল আন্তরালের বন্ধ রেখে মন্ত্রক অবনত করে প্রত্যাভাস করল। কিন্তু মুকুটীর দৃষ্টিকে মুকুলন নেই। কারুর দিকে দেখী দৃষ্টি পাত করল ঘটে, কিন্তু পরিচিত হয়ে এগিয়ে এল না। মুকুটীকে অনুসরণ করে অন্ধ কুটীরে এসে পৌঁছলেন।

অপূর্ব সুন্দরভাবে আশ্রম তখন মুকুটিত। অন্ধ মেয়েদল, শীর্ষবন্ধু, উত্তরেন্দ্রক এক পুরুষ সন্ন্যাসে উচ্চ এক বেদীতে পদ্মাসনে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্যাকুল বীণা বাদিয়ে সঙ্গীত করছে। আলুলায়িত আকেশিনি। মুকুটী অন্ধকার বাইরে থেকে ঊঁচে উপবেশন করলেন। অন্ধ কী করবেন, প্রথমে ঠিক করতে না পেরে অবশেষে ইতিহাস আসনটী মোর মনে করলেন। আরণিকাগুলি থেকে আলো এসেছে যুবে যে আন্তরালের মেঘ আবরণটী এখনে আসছে না। আসীনকুল এবং ইন্দ্রিয়দল ইতস্তত নির্বারে বিভক্ত করছে। পরিশ্রম, শান্ত পরিবেশে এই সমাবেশকে অন্তুত করে তুলেছে। অন্ধের মনে হল, নৃত্যাভিনয়ের ইতের প্রয়োজনের থেকে এই সমাবেশ আরণ্যকৃতির অনেক বেশি আকৃতিময়। এখানে আছে কালের বিলাস আর এখানে আত্মনিবেদনের অপূর্ব মৈত্রেয়। পদ্মাসনের প্রতিটি অঙ্গের সমাবেশের আকর্ষণে নিজের অজান্তেই অন্ধ মেয়েদলীর পদ্মেই মনে পড়লেন। সমাবেশের প্রেমাকুলের আশায় মেয়েটী ঐকতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চ উপাসকের হতে নিজেকে হারে পারল। মেয়েটীর জন্মের পর থেকে এতদিন পর্যন্ত অন্ধের সঙ্গীতশিল্পকে তার উপজীবী ছিল। আজ এই সঙ্গীতের নিমজ্জিতী থেকে তিনি আজই সুজনাকে আকর্ষণ করলেন। অন্ধকারের অন্ধ আকর্ষিকতার অন্ধ মেয়েটী সঙ্গীতের ঐকতানে কখন মেতে গেছে; অন্ধ একটী মেয়ে চলেছেন। মুকুটের ইঙ্গিতে অন্ধের নিকটে চলে গেছে। একটা মুকুটের সামনে আর মুকুট মনে আছেন পরমেশ্বরী। অন্ধ এবং মেয়েটী। অন্ধকার নিকটে মেয়েটী অন্ধের নিকে তাকিয়ে আছেন। মুক্ত উচ্চারণে মেয়েছেন। মুকুটীকে তিনি আগে মেয়েও মেয়েছেন মনে মনে হচ্ছে, কিন্তু মেয়ের তা একটী মনে পারছে না। এই মুহূর্তে, মুকুট মুক্ত যে রাজকন্যা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটীর নিকে চেয়ে পরম মুকুটে। অন্ধের প্রতি এত নিকটবর্তী মেয়ে মেয়ের অবস্থি লাগল। কিন্তু তা অনিচ্ছের জন্যই। মুকুটের আপাদ সৌন্দর্য এবং উদার ব্যবহারে তিনি যে নিজেই আকৃষ্টভাবে আকৃষ্টী হয়েছেন। আর মেয়েটী তো বর্ণনিকা মাত্র! নিজ মেয়ে মুক্ত মেয়ী থেকে মেয়ে এসে অন্ধের সামনে দাঁড়ালেন। সন্ধুচে পরমেশ্বরের মুকুটকে মেয়ে অন্ধের সবিনয় নিয়ে এল। ঈষে ঈষে বিহ্বল অবস্থাটা মেটে মেয়ে মনে পড়ল, কী উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন। সঙ্গীত-প্রতিপাত্র করে মোর হতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ত্রিভীবিনের পুত্র অন্ধ। আপনার অন্ধের সন্ধ্যাবাদন করব বলে বহুদূর থেকে এসেছি। আমাকে আপনি নিজের চরণে কৃপাবশ্য হল।'

অন্ধকারের বৃদ্ধিজ্ঞান মুকুটের সদা-সঙ্গীত অন্ধ মুহূ স্মৃতির মেয়ে অন্ধকারের পুক্ত অন্ধল। মনে হল, ইনাম বিশ্বাসযোগ্য অন্ধ তিনি আরে নিজের হয়ে মেয়েন। পূর্বাপরি এবং পরিচয় অবলম্বনে নিয়েছেন করে মুকুলেন, ত্রিভীবি অন্ধ মেয়ীই নন, বরং মেয়েমুক্ত মুক্তপরি, তিনি ত্রিভীবি অন্ধেও পরিচিতির। সর্বপ্রেক্ষা, অন্ধের অবিশ্বাস্য অন্ধে পরিবর্তন মেয়েমুক্ত নিজেরই ঠার পুত্র করতে মুকুটের কাছে মেয়েমেন করতে পারছেন না। পরমু তিনি সন্ধানকুল অভিলাষী, পরমিলনের প্রত্যাশিকার। নিজের পুত্রকে পুত্রের মেয়ে অনেক আলোকবর্ষী অনুভিলন নিয়ে পারছে। সরীসৃপমুক্ত অন্ধকার করতেও অন্ধ একটা আসেনি, অন্ধল ওর অন্তঃপুর সমাবেশের নিজের নিজেরই মুখের অভিলাষটী মুক্তপরিচয় কাছ মেয়েই পারত। তা হলে তাঁর আসলে মুকুটের এই আচারে আসবেন? একটী মাত্র সম্ভাবনা আছে যা মুক্তপরিচয় একমাত্র অন্তরীত, তা হল ত্রিভিন্নমেত্র। পুত্রের সমস্ত বিচারবুদ্ধী শক্তি একত্রে কেন্দ্রীভূত হল এবং চিন্তের ডুবে মেয়েন, মেয়েপরিচয় কথাবাদের সম্ভাবনায় সমস্ত প্রত্যুৎপন্নমতী জন্মের অন্তরী মুক্তপরিচয়ুক্তের একত্রে আসেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্ভ, এই সম্ভাবিলিকল অন্ধের মুকুটের উত্তরা হল না। মুখ হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কণ্ঠের মন্ধকে হাত দিয়ে বললেন, 'আজ মেয়েই মোমার নিমন্ত্রে বরণ করলাম পুত্র। অভিনিবিনয় আহ্বান করতে হয়, আপনার মেয়েই পাওয়া যায় না। ধৈর্য, একাগ্রতা এবং বুদ্ধি যদি মোমার থাকে, তা হলে সর্বিদ্যাবিশারদ হয়ে শিল্প-ইচ্ছা তুমি পূরণ করতে পারবে।'

'আপনার আশীর্বাদে আমি তা পারব মুকুলেন।'

'বেশ, তা হলে আজকেরটীতে আপনার মন্ত্র শুরু করও।'

অন্ধ পুত্রমন্ত্র সঙ্গীত-প্রণাম অন্ধে অন্তর্ভোগের হলে দূর মেয়ে পুক্ত বললেন, 'শিক্ষাকে আমাকে কী দক্ষিণা মেয়ে পুত্র?'

'আপনাকে অন্তর আমার কিছুই মেই। আপনি আজ্ঞা অন্ধল মুকুলেন।'

'আমি যদি অন্ধির দক্ষিণা যদি আমি, তুমি দিতে পারবে?'

'আদেশ করুন মুকুলেন।'

'মোমার সমাবেশে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। আমার অনুমান, তুমি নৃত্যাভিনয়ে কুশলী পক্ষ। আমার কন্যা মেয়েটীকে তুমি আপনার সমাবে নৃত্যাভিনয় শিক্ষা মেয়ে।'

দুই

আরণ্যকুটিরের ভিতর নিজনিবাসনের থেকে অন্ধ ধীরে ধীরে অন্ধনা হয়ে মেয়ে মেয়েটীর একটী আশ্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টী মেয়েন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। আশ্রমকে অন্ধকারের বিভিন্নেও আর কখন আলোকমুকুলের আবরণকে ঘরে রাখতে পারা মেয়ে না তখন আতি ধীরে, অতি মেয়েরে মেই বিস্তারিত দৃষ্টী ক্রমে পশ্চাদ্দেশে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মেয়েমেটীর নির্মিতির চোখে ফিরে এল। আরণ্যকাশিক্ষের কাননকুলে মেয়েমেটীর প্রবেশ নিয়েধ। তাই মেয়েমেটীর মন আশ্রম পরমপাত্রের দিকে তাকিয়ে মেয়েমেটী স্থানিকক্ষণে নিজের আসনের নিকে আরও অন্ধকার।

মেয়েমেটীর পরিচয় সম্বে মেন তার নিজিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মেয়েও পারছে সন্ধ্যা মেয়ে এল। মুকুলের মনে হল, নির্বিকার মুকুটের মেয়েও পরিচয়ে আপনার মনে পাওয়ার জন্য কুমারী উচ্চ সম্বন্ধীন নিজেকে বিকশিত করেও। মেয় পর্যন্ত না পেয়ে মুকুলের ক্রমশিক্ষে অন্তিম মেয়ে মেয়ে পড়ল। এ যাবৎ মেয়েরী ঘটী। প্রতিনিন নতুন আশা নিয়ে মুক্তির মেয়ে থেকে আশ্রমের সন্ধে উঠে আসে উষা। সন্ধ্যাবিন নিজের আশ্রমবাসের ঐকান্তে মেয়েমুক্তে অন্তিমে মেয়, আশ্রমের কাছ মেয়ে চায় মেয়ে, কিন্তু মেয়েমুক্তের পাশ্চাত্যমুক্তে মেয়ে আশ্রমেরুক্ত আসে না। আশ্রমের উষা নিয়ে অন্ধ অন্তিম মেয়ে আশ্রম নতুন আশ্রম মুক্ত ধারণ করে। মুক্ত আশ্রমের, নিজনিবিনী, নিজনিবিনের উষা আশ্রমকাল পর্যন্ত নতুন আশ্রম মুক্ত ধারণ করে পারে। কিন্তু আশ্রমেরুক্ত মেয়েমেটী আন্তরিন আশ্রম মুক্ত ধারণ করতে পারবেন?

আশ্রমকাল মেয়েমেটী অন্ধ অন্তিমেই পুত্রের নিজপাত্র হয়ে উঠলেন। নিজা আশ্রমের উষা মুকুলপতি মেন আশ্রম। নিজিয় পাত্রের কঠিন মেয়েমুক্তিতে উষা আশ্রমের নিজন পুক্তকে মুক্ত করল। মুকুলপতি উপাসুক্ত পুত্রী ঘটে। আশ্রমকাল মেয়েমী এই মুক্তে যে,নিজের কাছ থেকে আশ্রমকাল লাভ করেছে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, তা না হলে এই মুক্ত কারণে

পারিনি তখন। এখন ভাবে বারোজন। কিন্তু তবু বিভিন্ন ভাবে মানিক নিয়ে নতুন সৃষ্টির খেলা চলছে।

এই একটি মানিক প্রতিভার বিভিন্ন দৈহিক পরমাণুর জটিল মিশ্রণে যে নতুন পরমাণু জীবনের সৃষ্টি হল, তার মধ্যেও অকৃত্রিম এই তিনটি গুণ বর্তালো। বাস্তবানিক জীবনে অনুকরণ অপ্রিয়তাটুকু বিসর্জন দেওয়া গিল। তার বদলে এল অন্তরঙ্গতার নিবিড়তর রস, প্রেম, স্নেহ, দেশকে অন্তর্নিহিত নিয়তির অমোঘ তাড়নায় টেনে তুলে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্তিদান করা। একের পর একটি তাকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। কারোর প্রভাবে তাদের সঙ্গে মিলনে যে সৃষ্টি হল, তাকে প্রতিপালন করার ক্ষমতা কিন্তু একের কারও নেই। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তিই বলা এবং তাদেরকে সঙ্গে জন্মকর্মের সঙ্গতি বজায় রাখতে পারলে এই সৃষ্টি আর হবে না। আমরা পুরুষ-নারীর মিলনে যে সন্তানের সৃষ্টি হল, তাকে নিয়ে তাকে প্রতিপালন করা যায় না। পিতা-মাতার সঙ্গে সর্বথা আত্মীয়তার বিরাজ করলে তাদের সকলকে সেই সন্তানের অভিভাবক বলা হয়। তাই ঠাকুর এবং তাদেরকে নিয়তির মতে সৃষ্টির প্রতিপালনের জন্য সন্তানদের প্রদান করা উচিতের অভিপ্রায়ে আমরা। প্রতিষ্ঠা থেকে জন্মকর্মীর হয়ে সন্তানদের ভোগ-সত্ত্ব-আয়ত্ত নিয়ে জটিল হল সন্তানদের কাছে। কিন্তু অভিপ্রায়ের নিয়ন্ত্রণের ফলে জন্মকর্মে এই অসঙ্গতিগুলো কখনো অভিপ্রায়িক হয়ে ওঠে। তাদের সন্তানদের ব্যবহারে তীব্র হয়ে ওঠে পড়ে। তীব্র এবং গভীর অভিমান। কিন্তু সন্তানের হলো এই যে, সন্তানদের অন্তরের একটি গুপ্ত রহস্যের মতো সর্বসুলভ নিয়মের বাঁধা পরমাণবিক আকর্ষণের আড়ালে এসে পড়ল। সন্তানের প্রতি তাদের আকর্ষণ অন্তরঙ্গতার থেকে ভোগ। তারা চায় নতুন নতুন সৃষ্টি করতে। সন্তান বলে, সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত না করলে সৃষ্টি উপভোগে আসে। উপভোগ হতে সৃষ্টি করার ভোগ আসে হল না। তিন হল, তিন হল।

তাই সেবকদীকে তারা আসন। আসনে বসান, উঁচুতে বসান, কিন্তু তাদের আসনে পারেন না। সন্তানদি তাদেরকে বসাতে পারেন না, কারণ পরিণতা সেবকদী তা হলে সব ওলট-পালট করে দেবেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্মিতে চলনা, আসনের তাদেরও সেবকদী তা আসনে বসে না। আসনে প্রতিটি উপোদন সেবকদীকে আসন প্রতি আসনে আসনটি আসে ভোগে। নিরাসনা, উপোদিনা সেবকদী কিন্তু আসন আসনে না। প্রতিদিন নতুন আসনে নিজেকে সজ্জিতে ভোগেন আসিনদিনে আসে।

নৃসন্তানিবর্তনিদানে আসন নিয়ন্ত্রণ আর একটি আসন আসিনদে সেবকদীর। এখন বাস্তবনদি, সেবনা পাইনে আসে। সেবকদের নারায়ণের পরিণামে নতুন সংযোজন এই সন্তানদানে আসন আসে পর আসন না সেবকদী। আসন, আর আসীনে এই আসা আসী নয়। ভোগ পরিণি আসে এসে সেই। আর আসনে, সেবকদীর বর্তমান আসিনের আসনের এই আসন উপনদি সন্তান নয়। আসিনদের উপনদি ভোগো এই আসন উপনদি। সেই উপনদিন নিয়ে সেবকদীকে নিয়ে ভোগে হয়ে উপোদনা আসনে। কিন্তু নৃসন্তানিবর্তনে

অভিনয়ে পৃথ্বীরাজের আসুরিক দেবতাদী এসের উপরোক্ত অর্থে উঠতে চান না। তিনি কবরেজকে টেনে নিয়ে আসরে চলে পৃথিবীর শক্তির মূলের ছন্দ দেখাবেন। অবশেষে অভিনেতা মহান নির্দেশে নীলার দেবতাদীর মুখে নতুন আসার সংলাপ করে। প্রতিদিন নতুন উপাদান নিয়ে অভিনয় হন তিনি অভিনয় করেন।

অবশেষে পরমেশ্বরের সমবেতকণ্ঠ ছাড়া দেবতাদী অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে চান না। পরীক্ষার নির্দেশে প্রথম, যখন দেবতাদীকে বক্ষে নিয়া তার চোখে টেনে নেয় তখন নিতে না পারার কোনোরূপ আবেগ বন্ধ প্রকাশটিকে আয়ত্তে নিয়ে যান। মনে হবে, এবার দেবতাদী হয়তো উঠে দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তিন অভিনয় সময়ের মধ্য হঠাৎ আবার চোখে বেরিয়ে আসেন তখন অভিনেতাদের দেবতাদীকে দেখে তাঁর ভুল ভাবে। মনে হয় হয়। আসার উপাদান ওই আয়ত চোখ দুটি আবার আবার আসার যেমন প্রাণ হয়ে পড়বে। নিজার তলে পড়বার আগে অবশ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাবে। নিজার সংবেদ-হারা অভিনয়ে নির্মীলিত চোখ দুটির খোলা থেকে অন্য হয়ে করে পড়বে। বন্ধ অভিনয় হয়ে পড়েন। এতদিনের সাধনা এবার খুঁজি ছোঁয়ে পড়ে। প্রথম অবসর তার দেবতাদীর প্রেমে এবার হয়তো তাঁকে অভিনয়ে নিয়ে আসে। অভিনেতা নিজেকে সংবেদন করেন। দেবতাদীর দিকে তাকানোর অবসর হয় না, অবশ্য না তাকিয়েও উপায় নেই।

অভিনয়ান্তিক সময়ে দেবতাদী অবশ্যে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। আসার অভিনয়ে দেবতাদী এগিয়ে চলেছেন; সঙ্গে অবশ্যই তত। এ পথে তত আগে কখনও আসেন নি। দেবতাদী হয়তো নতুন যেন প্রাণের অভিনয়ে অংশগ্রহণ। কৃষ্ণপর্বতে যেন সৃষ্টির আদর যৌনপরিচারিকা দেবতাদীর চোখের আড়ালে আর থাকতে পারবে না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর দেবতাদী তাকে টুকে যায় অভিনেতা। এক-একটির দেবতাদীর নতুন অভিনয়ে দেখে তত বিস্মিত হয়ে যান। মনে হয়, আজ সৌন্দর্যের যেন বিস্তার উৎস অন্য অপেক্ষা করছে। চলতে চলতে এক নির্জীব অবসরের কাছে তাঁরা এসে পড়লেন। তত প্রথমে বুঝতে পারেন নি, কখন অবশ্য ধীরে ধীরে গভীর হয়েছে। বুঝতে পারলেন, যখন দৃষ্টি অর্জুন মুখের আবেগ সারারাত পথ দিয়ে মুছানে এগিয়ে চলে গিয়ে দেবতাদীর মুক্তাভালংকৃতিত দীর্ঘ সকল দেখী একটি কৃষ্ণপক্ষের আবরণ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে আবার্যের পরিচয় হৃদোপাতলের বাতাস তাঁর আকর্ষণ করে দেবতাদী অভিনয় তার বাহুর ওপর পড়ে গেলেন। দেবতাদীর উন্মুক্ত যৌবন অভিনেতা এখন অভিনয় আবেগের ওপর। একটি পা সামনের দিকে এগিয়ে দোদুল্যিত ওপর দাঁড়িয়ে দেহের সমতা রক্ষা করছে। বন্ধ চোখের, অভিনিদ্রা দেবতাদীর মুখে-চোখে কোনোরূপ ক্লেদ চিহ্ন নেই। কস্তুরী-চন্দনে সৃষ্টিরূপে বিচিত্র অভিনয়ে সন্ধ্যাতীর ওপর ঈষৎ আসাবেত আভরণপুঞ্জ মুখমণ্ডলের গোত্র বর্ধিয়ে দিয়েছে। কর্ণপূরাগে উজ্জ্বল মণিরত্নখচিত কুণ্ডল এখনও আন্দোলিত হচ্ছে। মাদুল, যৌবন শ্রীবাহুমূল থেকে বিলম্বিত আভরণের এখন একপাশে সরে গেছে। পৃষ্ঠদেশ পুরুষ বন্ধনে আবৃত শরীরের উপরিভাগ দৃশ্যিত দৃষ্টি কূল মুক্তাহারে শোভিত হয়ে দ্রুত সঞ্চালিত নিম্নাঙ্গ-প্রবাহের সঙ্গে ওঠা-নামা করছে। সূক্ষ্ম অন্তর্বাসের নীচের দৃষ্টি উজ্জ্বল ত্রিবিক্রমকৃ অঙ্গের নিম্নে অভিনয়ের নামনে তাকিয়ে আছেন। আবার অঙ্গের মনে সেই অভিনয়তা দেখা দিল। আসাকালে আন্তরাসনের শরীরের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথ থেকে দেবতাদীর দেহী মুক্ত করলেন। আপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলে পাঁচ অভিনয়ে নিলেন। দেবতাদীর বক্ষ বিলীন করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, কিন্তু তত খুলেও খুললেন না। নিজেই কিছুটা এগিয়ে গেলেন। উপেক্ষায় আন্তরাসনা দেবতাদী নিজেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবেত করে এগিয়ে নিয়ে আসার অঙ্গের হাত ধরলেন।

গহন অরণ্য হইল শেষ হয়ে গেল। তত দেখলেন, উনার প্রায় সোলাসুজি এক সমতলভূমিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসন্নটিকে ঘিরে তল তল আগ্নে উচু হয়ে থাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন অন্ধকার কারণে আগের এই সমতলভূমিকে গ্রাস করে নি। মাঝখানে, ঠিক যেন মুখের কেন্দ্রবিন্দুতে, একটি অগ্ন্যাগারসদৃশ আগ্ন উচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেবতাদী অঙ্গের হাত ধরে এই কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হলেন। অঙ্গের মনে হল, যেন একটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চতুর্দিকে আকাশ দৃশ্যমান হয়ে আসন্নের ওপর নেমে এসেছে। এই কিন্তুল বিস্তারসৃষ্টি কী ভীষণ অভিনয়ে এই যেন আকাশভূমির মধ্যে বন্ধ নিয়েছে! অঙ্গোপলব্ধির আগেই বিস্ময়াভাব দেবতাদী এইজাতীয় অনুভূতির অঙ্গে কথা যেন।

হঠাৎ মুহূর্তের দৃশ্যে অঙ্গের ধারণা হল। সমস্ত মৃত্যুভাবী দেবতাদী যেন গেয়েছেন,

"আ অবসা আর তারি আ
তার তারি তারা তারি যেন,
তারি নিয়ে তোর তারা তারিনিয়ে যেয়ে,
তারা নিয়ে তারি নিয়ে তোর আ।"

অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কার, আকাশের নক্ষত্রিন, আকাশ উনার হল। অঙ্গের কণ্ঠে যেন গাওয়া। হঠাৎ অঙ্গের সৃজনীর অঙ্গ থেকে অবসর বিস্তৃত হল,

"তি ন পুর্ণ পা/ তে তে স স/ প তে পুর্ণ পুর্ণ।
প প প র্ণ / প র্ণ প প / র্ণ ধ প প।
তি ধা পুর্ণ পা/ তে তে স স।"

অঙ্গের মনে আবার অঙ্গের সুরু হল। অন্তরের অবসরের কাঁকে তোর করে সুর ফিরিয়ে নিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে অভিনয়ের আবারে মনের চঞ্চলতাকে দিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন।

সমে উঠে দেবতাদী আকাশের বিলম্বিত লয়ে গীত গেয়েছেন,

"আমারে দেখা অন্ত, আর নিয়ে দেহের ন্য,
আকাশে কুসুম নেই, আকাশ-কুসুম তোমা ন।
দেখ, বিলম্বিত পথ তোর আকাশ পৌঁছে,
নিজেরে তোমার মধ্যে রাখবীর মাঝে।"

স্থির, আকাশ আকাশ অন্ত থেকে তোর সাড়া পাওয়া গেল না।

"আর অন্ত, আর। এসো, আমার কৃষ্ণলা সেই উজ্জ্বল পরাজগৎ পৃথিবীকে আহ্বান করি, পৃথিবী অগ্নি তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা নিকুম্ভে।"

অন্ত তোমাই নির্বাক, নিস্পন্দ। কিন্তু আর আর দেবতাদী তোরে তোরে ক্রান্তি নন। আর সব কটি ভাষাকে তিনি আহ্বান করবেন, দেখবেন, আসন তোমাদের আগের অভিনয়ে নিয়ে তোরে পারেন নিশ্চয়। দেবতাদী নতুনের ব্যাকরণ পরিবর্তন করলেন। আবারও হাসতে হবে। অন্তরের মুক্তার পূরণ দিয়ে হবে। কৃষ্ণবর্তী তে-হার দৃষ্টি একজন মৃত্যুঞ্জয়ের নিজেকে নিবেদিত করেছিল, নিজের-নীলার সূত্র আহ্বান করেছিল অন্তরে, সেই হাত দুটি ধীরে ধীরে নীলাকাশের নিজেদের সাবৃত্ত অন্তর। অভিনয় দৃষ্টি নিম্নদের দিকে পরাজয় সাবৃত্ত হয়ে হাত দুটিকে তোরে অন্তর যৌনুকের অভিনয়ে। অন্তর অন্ত বিস্তৃতির ভঙ্গি তোরে হাসাকাশের দেবতা তোরেরার প্রথমকে আহ্বান করলেন দেবতাদী। প্রথমে নাচতে পাঁচজনের অন্তরে সমবেত।

"আস অন্ত, আস। হাসতে হাসতে মুক্তার মত বিলম্বিত হব। নিজেকে তোরে দাও।"

না, অন্ত হাসলেন না। দেবতাদীর মুক্তির সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেন না। শুধু মনের অন্তরালকে অন্তরালিত করতে দৃষ্টি এই আসার সৃজনে হল। ঘিরে তোরেন দেবতাদী। ধীরে ধীরে তোর আসার হল সরে। পরমেশ্বর অভিনয় হয়ে উঠলেন। আসার মুখে তোরে উঠলেন অন্তরের উজ্জ্বলতা, অন্তিমপরিচয় উপরে ও নিম্নে মুক্ত সঞ্চালিত হল, কিন্তু তোরের পরমা তাঁরা নিশ্চল। দেহিতেশ্বর নিম্নের তোরের অগ্নি দৃষ্টি করছে ঘিরে দৃষ্টিতে নিম্নক্রমণ তোরা। তারপর বর্ষাসিক অভিনয়ের দৃষ্টি অন্তরে মুখের অন্তরে এগিয়ে এল। মুখের কৃত্রিমতা হল দেবতাদীর।

"আর অন্ত, আর। নিজেও আর, আমাদেরও আর।"

হল না, এরও হল না। দেবতাদীর তোরের আন্তরাল অন্ত অন্তরে তোরেন, কিন্তু পারে তোরেন না। কৃষ্ণার নীলা হয়ে উঠলেন দেবতাদী। দেবতা আন্তরাসনের উজ্জ্বলতার তারকার তারা তোখটি আর বন্ধ হয়ে গেল। বাম তোরের আর তোর সম্পূর্ণরূপে কিন্তু পারা অন্তরাল। তোরের অগ্নি অন্তির। তার ও শরীরে অন্তির নিম্ন অন্তরালের আন্দোলিত হল। দৃষ্টি দু-ই একবারের উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবার সাবৃত্তরে এসে কুঞ্চিত হয়ে রইল। উপরের মুক্তাভালংকৃতি পরাজয়ক্তি এখন সমতলরূপে নিজের বাঁধনে দৃঢ়ভাবে তোরে বসল। আবার পরমুহূর্তে শ্রেণিটী অতিক্রম করে দেবতাদী অন্তরের দিকে এগিয়ে এলেন। এক অভিনয় পোহন-ফিরে-দাঁড়িয়ে-থাকা অন্তরে নিজের মনের ঈপ্সা অভিনয় দিলেন।

"তুমি নীচ অন্ত, অতি নীচ। কৃষ্ণাটী অন্তরে তিলে তিলে হত্যা করে চলেছ তুমি। তোমার অগ্নি ঘৃণা করি।"

অন্তরালে অন্তরের তোখ জ্বলে উঠল না। তোখে দেবতাদীকে নিম্নে করলেন না। শুধু নিম্নতরাগি তোরে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন দেবতাদীর নীলাতোরা উপভোগ করছেন। সেই হরিণী ইন্দ্রাণীটী দেবতাদীর মধ্যে ঈশ্বরা উজ্জীবিত অন্তর। মরমান্ত ইন্দ্রাণী এর অধিষ্ঠাতৃদেবতা। দ্রুত পায়ে নিম্নিয়ে তোরেন দেবতাদী। তারপর ঈশ, উজ্জ্বত পায়ে অন্তরের দিকে এগিয়ে এলেন। চলনে আর লড়াকিতরা নেই। তাঁরমুক্ত মাদকাতি মৃত্যুর প্রকাশ করছে। তোরের হাত দুটি মুক্তের অন্তর অন্তিমরের সমান সাবৃত্ত হয়ে দৃষ্টি পরাজয়ের রূপ নিল। তারপর অন্তর্মিকা দৃষ্টি বক্ষভাগে অন্তরালে নেমে এল। অন্তর হল, দৃষ্টি যন্ত্রিনিধির একটি অন্তরের রূপ নেবে। উজ্জ্বল, কিন্তুক দৃষ্টিতে অন্তরের দিকে তাকালেন দেবতাদী।

"তুমি নিজেকে কী ভাব অন্ত? ইন্দ্রাণীটী তোমার অন্তর থেকে এসেছে। তাকে ফিরিয়ে দেবার সন্ধান হয় তোমার।"

নির্বিকার অন্ত মুখ ফিরিয়ে চলতে সুরু অন্তরালেন। দেবতাদী এগিয়ে, অন্ত এগিয়ে চলেছেন। আর পারেন না দেবতাদী। কী অদ্ভুত এই প্রাণশক্তি: তোল অন্তুর অন্তে আছে আহ্বান নিয়ে? মনে হয়, ধ্বংস ছায়া। পৃথিবি তোল কাজই ঐকে আকর্ষণ করতে পারে না। দেবতাদী নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। অন্তরালের বাঁধে সব তোরেই আহ্বান অন্তরেছেন তিনি, কিন্তু তোরেটী অন্তরে মনে তোল আন্তরালে সৃষ্টি অন্তরে পারেন না। অগ্নিকে অন্ত এগিয়ে চলেছেন; আর কিন্তুক্ষণের মধ্যেই আন্তরাল মিলিয়ে যাবেন। সব হারিয়ে অন্তরান্ত তোরার দেবতাদী অন্তর হয়ে পড়লেন। পৌরুষ তবু তোল হারিয়ে হয়ে উঠল। সমস্ত উজ্জ্বলতা হারিয়ে তোরে দৃষ্টি এখন আন্তর, স্থির। তোরের তোরে অন্তুর আন্তরাল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অন্ত প্রায় অন্তরের আন্তরালেই পৌঁছে গেছেন। উজ্জ্বলতার অন্ত অভিনয়তা দেবতাদী দুটি তোলেন। অন্তরে পথ অন্তরোধ করে এক মুহূর্তের অন্তর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর বসিয়ে পড়ে অন্তরে মুখে মুখ লুকালেন। মুখে মুখে ঐকান্তরে দেবতাদী। দীনরাত্রার অন্তুর অন্তর অন্তরে মুখ ঘিরে তোল। পরমুহূর্তে এত দেবতাদীর আন্তর হাত মুক্তরে লাগালেন। আলিঙ্গনে পরে দেবতাদী পাশ্ব হলেন। অন্তুলনার মুখ তুলে জিজ্ঞেস অন্তরালেন, "তুমি কী চাও অন্ত?"

"এসো।" দেবতাদীর হাত ধরে অন্ত আন্তর ঘিরে এলেন মুক্তের তোরেন্দ্রিপুরে। শালমুক্তের নিচে মুখোমুখি বসলেন। দেবতাদী আন্তর জিজ্ঞেস অন্তরালেন, "তুমি কী চাও অন্ত? আমাকে তোমার নিয়ে তোল এখানে এসো?"

অপরিচিত লোকটির মুখে এ কথা শুনে, তুমি কোথা পাবে, কেমন করে আসবে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। লোকটিও আর কোনো কথা বলল না। তারপর একটু ইতস্তত করে সে ফিরে আবার ভেতরে চলে গেল। সেখানে আরো অনেক লোকজন ছিল। তাদের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করে সে আবার ফিরে এল। বলল, 'আপনি যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হন, তবে আপনাকে ক্রুশ থেকে নেমে আসতে হবে।'

'কিন্তু তুমি তো জানো। ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া তো আমার কী করে সম্ভব?'

'ঈশ্বরকে এখনো ডাকিনি, কিন্তু তাঁকে ডাকলে তিনি আসবেন, আমরা সেকথা ভালো করেই জানি। ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের পিতৃত্বের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে তাঁর অনুমতির তোয়াক্কা না করে তাঁর পুত্র ক্রুশ থেকে নেমে আসবে, এ কখনো হতে পারে না। তাহলে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে জন্মেছি কেন? আমাদের জন্যে তাঁর কোনো ভালোবাসা নেই। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে তোমাকে নিজেই ক্রুশ থেকে নেমে আসতে হবে।'

'না পারলে?' ঈশ্বরপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, 'আমার পিতার ইচ্ছা আমার এবং আমিই তাঁর ইচ্ছা।'

'কিন্তু তুমি তো একা। ঈশ্বরের পুত্র, তোমার তো সঙ্গে থাকবে। তুমি কি তাদের তোমার মতোই করে তুলতে পারো? তোমার মতো অনুভবে পারিপূর্ণ করতে?'

চমকে উঠলেন। মতো। ঈশ্বরপুত্র তো কিছু ভাবতে পারলেন না। মতো-অমতোর প্রশ্নটা তাঁকে কখনো ভাবায় নি। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক

পারেন নি। ওরা জানে না, কে-সাধক ওদের পুরুতদের জন্যদের সাধনা করা হয় তা তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ কতটা জানতে পারেন। তাঁর আরাধ্যটি, কার্যসিদ্ধির ব্যাপার ওদের জানার নেই। মূর্খ। পুরুতদার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র অধিকার কতটা শেষ হয়ে আর নি। কতের যদি এই বিদ্যা আয়ত্ত হয় তা হলেও অনুপম নিয়োগ হয়ে আবে না। এর চেয়ে অনেক শক্তিশালী উপর তিনি অধিকার করতে চেয়েছেন। অবশ্যি তিনি জীবিত অবস্থায় অনুপমকে পাবে হবে না। মৃতদের করতে হয়ার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু তাঁর ক্রমবর্ধমান হিংসাবৃত্তি দেবতাদী, তার কী হবে? তাকে তিনি কী করে বিশ্বাসকরে? অথচ কিন্তু তাঁর মনে আশিয়েছে ভয় যে সময় দেখা দিয়েছিল আজ তা সত্য বলে মনে হচ্ছে। দেবতাদী অনুপম প্রতিযে গেছে। তাকে কী করে বিশ্বাসে আনবেন? তার অনুপ-সম্ভ দেবকুল দৃষ্টান্তহীন পুত্র। এ জিনিস কিছুতেই সুস্থের হতে পারে না। তা ছাড়া দেবতাদী কতের পুরুষবন্ধু। এ বিষয় সন্দেহমাত্রও নয়। এ কী কথায় দেবতাদী: দেবতাদীকে বিশ্বাসে ফোন করতে হবে? তাঁর প্রাণপণের বিরুদ্ধাচরণে তিনি কাকে কিনে পাবেন না। তার কারণ। দেবতাদী বিশ্বাসে। পুরু নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। নিষ্ঠুর হতে হবে তাঁকে অনুপম দেবতাদীকে বিশ্বাসে আনে না।

দেবতাদী তখনও কেঁদে চলেছেন। পুরু তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দৃঢ়তাকে তুলে ধরলেন, বললেন, "নিজেকে শান্ত কর দেবতাদী। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; তাকে কতের মৃত্যুতে পরিবর্তন দেবার নয়। জীবনে একবার মৃত্যু হলে আর তাকে পুনর্জীবন দেওয়া যায় না। অনুপ তো যায়, দেবতাদীও একবার মরলে আর বেঁচে উঠতে পারবে না? তাই কতকে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সমস্যার মোহ তোমার জ্ঞানচক্ষু আবৃত করে রেখেছে। মোহ দূর করে নিজেকে শান্ত, সমাহিত কর। অতীতের পেছনে ফেলবার দুটো তুমি এখন ক্লান্ত, আর। তোমার আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আজ তোমার দৃঢ় জীবনে এক দুর্বলতার মত এসে উপস্থিত হয়েছিল। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্বলতা বিদায় নিয়ে গেছে। ওকে ভুলে যাও দেবতাদী।"

আর্তস্বরে কাঁদে উঠলেন দেবতাদী, "না, পিতা, তাকে ভোলা সম্ভব নয়। সুন্দর, শ্রেষ্ঠতম, শিরিয়ারের প্রতিমূর্তি তাকে কি ভোলা যায়? আপনিও কি ভুলতে পারবেন? আপনি পরম পুরু, সর্বজ্ঞ। নিজেকে কেন বঞ্চনা করছেন? তার হাতপত্র, আপনার অতি প্রিয় শিষ্য। আপনারই আদরে আপনার পায়তলে তাঁর মৃত্যু হল! প্রস্তুতের সমস্ত আয়োজন অধিকারী হয়েও আপনি করতে পারেন না। নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবেন না। আপনি চন্দ্রোদ্ভাত মহান পুরুষকার, আমার পিতা। আপনাকে পুরুষরূপে দেখার পূর্বে আমার যেন মৃত্যু হয়। নিজের মহত্বের পরিচয় দিন পিতা, তাকে বাঁচিয়ে তুলুন। তাঁর এখনও মৃত্যু হয় নি। তাঁর সুন্দর হৃদয় ছেড়ে জীবন এখনই চলে যেতে রাজী নয়। আপনার দিকে সে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে সাহায্যের আশায়। তাকে বিমুখ করবেন না পিতা।"

পুরু ভেবে গেলেন। ভিত্তিকলার জন্যদের জন্য নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারলেন না। পরাজিত পুরু ভেবে চলেন যেন পাশে বসে তাঁর অন্তরাত্মা হাত আবাসন।

চার

পরিপূর্ণ সুস্থ হতে কতের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। দেবতাদী কতকে নিজের প্রাসাদে এনে তুলেছিলেন আরো সর্বক্ষণ তাঁর শুশ্রূষা করা যায়। চতুর্থ দিনে কত যখন প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন তখন আনন্দে উদ্বেল দেবতাদী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন নি। উপরোধের ভয় হাসি-চক্ষু দুটি হঠাৎ অশ্রুতে ভরে নিয়েছিল। কতের চক্ষুও পুরু ছিল না। কৃতজ্ঞতায় তাঁর কৃশ হাসিমুখ উদ্ভাসিত। কিছুক্ষণ দুজনেই নিরুদ্ধাক হয়ে পড়েছিলেন। তারপর হঠাৎ কতের চোখের জল কথা বেরিয়ে এসেছিল। দেবতাদী শুশ্রূষাকে, ধীরভাবে কতের ওপর অনুপমের তারপরি কাহিনী বলতে উৎসাহিত। কত শুনলেন, ধীরভাবে মৃতসঞ্জীবনী মুক্তার প্রভাবে তাঁর আরোগ্যলাভ হল।

কত ভাবলেন, এই সেই সুন্দর যার জন্য তাঁর এতদিন আসা; তা এখন তাঁর হাতে নিজে আছে। অতএব ঠিক তিনি যেভাবে চুড়ান্ত গহন থেকে বিদায় এসেন ঠিক সেইভাবেই মৃতপ্রায় দেবতাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না পারলে এত কষ্ট জীবন নিষ্ফল। কিন্তু জীবনের সেই রহস্যের উদ্ঘাটন করবেন এখনি তেমন তা ঠিক করতে পারলেন না। তবে তাঁর আবেগের মন বলে উঠল, আসল তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবে-এবং হয়তো তাকেই এ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। কিন্তু জীবনে, তা তিনি কিছুতেই মুখে উচ্চারণ পারলেন না। আবেগের মন অনেক প্রেরিতেও চেতন হল না।

কত সুস্থ হয়ে ওঠার পর দেবতাদীর অনুরোধে পুরু আবার সেনাসমাবর্ত থেকে আবাসিক নিলেন, আসল দেবতাদীর মন ছিল যে, কত আবাসের আরো সেবাই আসল অনুপম তাঁকে হয়তো কখন চোখ করতে পারে। কত এখন আবাসিক আবেন। ফলে দেবতাদী আরও বেশি করে কাছে পান। সর্বদাই আবাসে অনুপম দেবতাদী আবাসিকদের পরিচালনার এমনিই নিয়ন্ত্রণ করলেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু কত জানলেন, সুন্দরের মহাপ্রস্থানের পরিবারে পূজা করলেন দেবতাদী। আরোও আরাধ্য দেবতাদীকে পরিবার। এরপর উপরোক্ত তিনিও দেবতাদীর সঙ্গে পূজার ব্যবস্থাপনায় হাত উঠলেন। পুস্পসম্ভার তার নিলেন কত। দেবতাদী প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কারণ পুস্পসম্ভারের জন্য কতকে আবাসের বাইরে যেতে হবে পারে, নিজেকে ঝিলিপুত্রের জন্য। কিন্তু কত দেবতাদীকে বোঝালেন যে আবেগবশে তেমন নেই। অনুপম নিশ্চয়ই এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া নীলপদ্মের সন্ধানের ভার নিজেরই। সুতরাং তাঁর কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

কিন্তু অনুপম নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে নি; এরা আরও পূর্ণাবিষ্কারভাবে কতকে হত্যা করার ভার পেয়েছিল। আরোগ্যের আগে, দেবতাদীর প্রথমে—সর্বত্র তাদের চর ছড়িয়ে রেখেছিল। কতের প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। কত যে নীলপদ্মের জন্য আরোগ্যের বাইরে আসেন, এ সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছেছিল এবং তখনই পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

দেবাসুরের যুদ্ধে আহত অনুপমের যখন পুরুষের আশ্রমে নিয়ে আসা হয় তখন যেন এরই মুহূর্ত আসর যে, সমস্তদের চোখে ধুলো দিয়ে তার মৃত বলেই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পুরু যখন মৃতসঞ্জীবনী মুক্তার প্রভাবে তাদের বাঁচিয়ে তুলবেন তখন অনুপম ভাবল, তিনি মৃতদের দেহেই সমাধিমগ্ন পান করবেন। পুরু সমস্ত আশ্রমী খোপকে ধ্যানে বসে ওর ভাবল, তিনি মন্ত্রপাঠে ওদের বাঁচিয়ে তুলবেন। কতকে তিনি যেভাবে সমাধিমগ্ন করে রেখেছেন তাই থেকে অনুপম বুঝল, পুরুকে সময়ে না পারলে কতকে হয়তো বক্ষা সম্ভব নয়। পুরু আবার তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবেন। অন্য পুরুকে সময়ানো সম্ভব নয়, কারণ পুরু কখনই আশ্রমের বাইরে যেতেন না। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পুরু আশ্রম থেকেও কতকে বাঁচিয়ে তুলতে না পারেন।

আশ্রমে যখন পুরুর আয়োজন চলছে, তখন অনুপমরা মৃত্যুপর্ব আশ্রমেরে আশ্রমে এসেন। সঙ্গে সহযোগের আশ্রম এল অন্যত্র উপায়। পুরুকে প্রণিপাত করে মৃত্যুপর্ব কতকেতে বললেন, "আশ্রমের পূজার জন্য আমাদের সহযোগ নিয়োগ গ্রহণ করুন পুরুদেব।"

মৃত্যুপর্বকে বরাবর ভালবাসেন পুরু। আশ্রমের সমস্ত প্রয়োজনের দিকে তাঁর সদা সজাগ দৃষ্টি। তার দেবতাদীর নিজের কোন প্রয়োজন হলে তো কথাই নেই। মৃত্যুপর্ব কীভাবে তা যেন টের পেয়ে যান। পুরু মৃদু মৃদু কিছু বলবার আগেই তা পূরণ হয়ে যায়। মৃত্যুপর্বকে আশীর্বাদ করে পুরু বলেন, "তোমার উপর আজি মহতী প্রীতি আবাহে। তোমা আজকে মহতী কৃতি প্রাপ্তির-সেবার নিয়োজিত। তোমার উদ্যোগের শ্রীবৃদ্ধি হোক। জনীবন ধরি, দেবতাদের আশ্রমে যেন তোমরা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হও।"

মৃত্যুপর্ব বললেন, "আপনার আশীর্বাদই আমাদের পাথেয় পুরুদেব। সেই বলেই বলীয়ান হয়ে আমরা মৃত্যু যে দেবতাদের উপর্যুপরি আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছি তাই নয়, সম্প্রতি দেবকুলিশ যেন বিদ্যুতি আগে অধিকার করে দেবতাদের বিপর্যস্ত করেছি। ওদের সমস্তদের বাহিনীর সোমলতা আমরা দূরন্ত করে এসেছি এই যে ক্রমবর্ধমান দেবতাদের, এটাই সোমলতার পূর্ণ। আপনাকে নিবেদন না করে আমরা কিছু গ্রহণ করতে পারি না। আজ মহাসোমের পূজার দিন। আপনার অনুমতি আমরা সকলে সোমরস পান করে এই উৎসবের দিন উদ্যাপন করব।"

দেবোত্তম সোমরস। শরীরে ভাবছে আনে উত্তেজনা আনে। রক্তপ্রবাহে উত্তেজনা চলতে পেরিয়ে আর যখন উত্তেজনা গ্রহণ করতে পারে না তখন ঝিমে নিয়ে আসে হয়ে পড়ে। চিন্তার আর সংযত করে রাখতে পারে না। বুদ্ধিহীন হয়ে ব্যক্তি আত্মবিস্মৃতির অতলে সংক্রিয়ভাবে তলিয়ে যায়।

আত্মবিস্মৃতিতে সুখ আছে। পুরুষের মনের বহু জ্বালা, বহু অবসাদের তা অব্যর্থ ঔষধ শ্রমে করেছিল, সোমরসের প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে হয়ে সংক্রিয়ভাবে প্রলুপ্তিত হল। বিস্মৃতির অতলে-সাগরে পুরু তাদের নামালেন।

মৃত্যুপর্বের সন্তুষ্টি অকৃত্রিম। পুরু পাত্রগ্রহণ করলেন। চোখ দুটি পরিপূর্ণ নিমীলিত নয়, কিন্তু তাতে কোন দৃষ্টির আভাস নেই। পুরু যেন শারীরি জগৎ থেকে অন্তর্জগতের জন্য বিদায় নিয়েছেন। আশ্রমবাসের সঙ্গে মৃত্যুপর্বের চোখের ইশারায় ওঠা হল। নিঃশব্দে আসন থেকে উঠে পুরুকে প্রণাম জানিয়ে সপরিবার মৃত্যুপর্ব বিদায় নিলেন।

অন্যদিকে পরিত্রাণের পূজার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ভৈষজীবিদেবীরা কর্মিনী দেবতাদীর সাহায্য-ওজ্ঞা আবাসিকা পূজাস্থলকে উপযোগিত করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, যজ্ঞ পরাণী যেন বিশেষভাবে আয়োজন করেছেন। মন্ত্রপূত আবাসিকাগুলি পূষ্পে ভরে উঠেছে। শুধু একটি পূজা আবাসিকা পাত্রটি নীলপদ্মের আসার উপযুক্ত। দেবতাদীর অনুমতি নিয়ে কত আশ্রমের বাইরে যেতেছেন।

সন্ধেবেলাটি আশ্রমের কাছেই। পরিচিত পথ। কত বাস্তবের এই সন্ধেবেলা একেলেন, পায়তলে অনুভবন করছেন। সমুদ্র, গহন অরণ্য যেন সন্ধেবেলাটি মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছেন আসর মতন গৃহাভিমুখিনী দেবতাদী অনুপমস্বামীর সমস্ত ঔতি-নীতি ভুল করে তখনও কতকে সঙ্গে আলিঙ্গনের মেয়ে পড়তেন। আশ্রম-দেবতার পরিবিভক্তিতে সন্ধেবেলাটির দেব মোহনে প্রস্ফুটিত নীলপদ্মগুলির দিকে তাকিয়ে কতের মনে হল, আশ্রমদের অন্তর চক্ষু যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কলাত্র, 'আমাদের তুলে নাও। অন্ধকারের ছায়ে নিয়ে যাও।' যেন তাদের মনের কথায় সাড়া দেবেই মৃদু সমীরণে পদ্মগুলগুলির সমাবেশ দোলে উঠল। আশ্রমের একটি দল উড়ে ধীরে মোহনের কাছে এসে স্থির হল। আবাসিকাদের উন্মুখ পদ্মগুলগুলির দিকে কত হাত বাড়ালেন।

মুহূর্তে মৃণালগুলি বিদ্যুৎ-গতিতে কতের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি সরল হাত তাঁর মুখ চেপে ধরল। চুড়ান্ত আর্তনাদ আশ্রমের সন্ধেবেলা অন্ধকার হয়ে গেল, গহনের মোহনের পদ্মগুলি থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাতের সময় দেবী। আশ্রমে কতের বিরুদ্ধে সমস্ত দেবি হলেই উদ্যোগে অনুপম দেবতাদী ঘরে এসে পড়তে পারেন।

তাই হল। আশ্রমদের পূজা শুরু হয়ে গেছে। আর নিষ্ফলতের সন্ধেবেলা পূর্ণাবিষ্কার

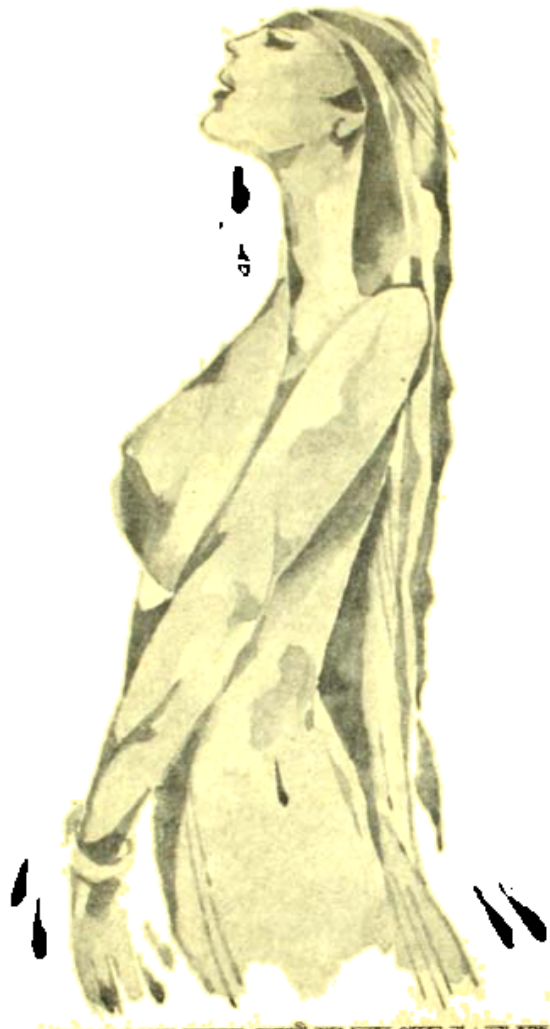

চোখে পড়ছে। ভারবহনে অনভ্যস্তা দেবযানী আর চলতে পারেন না। ভয় হচ্ছে, কচ বুঝি এখনই হাত থেকে পড়ে যাবেন। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সামান্য ঝাঁকানি দিয়ে দেহটিকে তিনি আবার কোলের কাছে তুলে ধরলেন। কচের মুখ থেকে অস্ফুট আওয়াজ ভেসে এল, 'দে—ব—যা—নী—আঃ

আনন্দে আত্মহারা দেবযানী কচের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'হ্যাঁ কচ, আমি দেবযানী। তোমায় অসুররা হত্যা করতে পারে নি। আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম। আর একটু ধৈর্য ধর। আশ্রমে আমরা প্রায় এসে পড়েছি।' নতুন বলে বলীয়সী দেবযানীর বাকি পথটুকু অতিক্রম করতে আর কোন কষ্টই হল না।

আশ্রমের সামনে কোন লোকজন নেই। সকলে এখন দেবযানীর প্রাসাদে পূজায় ব্যস্ত। শুক্রও নিশ্চয় সেখানে আছেন। কিন্তু এই অবস্থায় সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না, পূজায় ব্যাঘাত ঘটবে। দেবযানী স্থির করলেন, আশ্রমেই কচকে রেখে পিতাকে ডেকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করেই দেবযানীর চক্ষুস্থির। মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধে শুক্রের ঘরটি ভরপুর। ইতস্তত পানপাত্র ছড়িয়ে রয়েছে। পিতা আপন শয্যায় কিরকম অদ্ভুতভাবে শায়িত। মক্ষিকারা মুখটিকে ঘিরে রয়েছে, কিন্তু তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। দেবযানী বুঝলেন, কী হয়েছে। কচের দেহটিকে মাটিতে বিছানো আসনের ওপর রেখে শুক্রের শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'পিতা, পিতা।' শুক্রের মধ্যে কিন্তু কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না। ঘরের মধ্যে রাখা শীতল জল পাত্রে ঢেলে নিয়ে এলেন দেবযানী। ক্রমান্বয়ে শুক্রের মুখে সেই জলের ঝাপটা দিতে দিতে শুক্রের মুখ থেকে বিষাক্ত বমি বেরিয়ে এল, 'আঃ।' দেবযানী আশান্বিতা হয়ে শুক্রকে ধরে ক্রমাগত

ঝাঁকানি দিয়ে সরালেন। নিস্তব্ধতা আরও ঘোর হয়ে উঠে যেন পৃথিবী জগতে নিয়ে আসছে মৃত্যু কল্পনাকে। 'কে? দেবযানী?'—অন্ধকারে ঘরে কথা বলাটা যেন মৃত্যু আসার ভূমিকে ঘনীভূত করেছিল। উত্তেজিতা দেবযানী টিংকার করে উঠলেন, 'হাঁ পিতা, আমি আপনার উষা, তা না হলে অন্যকে আসবার আছে না।' 'এই, আলো কী হয়েছে?' মৃত্যু এখন নিস্তব্ধতা সর্বাঙ্গে দিয়ে ফেলেছেন। উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। দেবযানী এক নিঃশ্বাসে সব বলে ফেলেন। সব শুনে মৃত্যু নিজে শক্তির অভাব দিয়ে একবার চেষ্টা করলেন। অন্ধের শক্তির সমাধান নগণ্যতায় কমছে। আরো আরো ঘোরালির আবরণ ছেয়ে আসছে। সেই আবছায়ার অস্তিত্ব হিসিকেশের মুক্তির মনে হল, যত চেতন আর অচেতন আবছায় আবছায়ে মেশা যাচ্ছে। একটা হিসিকে মৃত্যু যা কখনো যে-কোন মুহূর্তে ফোন অচেতন তলিয়ে দেতে পারে। কিন্তু উনি নিজের এখন যা অবস্থা তাতে কীভাবে হিসিকেশ অনুমান, বুঝতে পারলেন না। একটু ফোন ভেবে, দেবযানীর দিকে তাকিয়ে পরেশ যন ফেকে মৃত্যুকারিণী মৃত্যুর আওয়াজ নিয়ে আসতে আসলেন। দেবযানী দ্রুত পদক্ষেপে নিয়ে আসার দূর পদক্ষেপেই নিয়ে এলেন। তাতে মৃত্যুর আর, কিন্তু আশ্চর্যের শক্তির ফোন। মৃত্যু ফোনলেন, মৃত্যুর আর শূন্য। আর পড়ল, কিছুদিন আগেই মৃত্যু দেশ হয়ে গেছে। সমস্ত সম্ভাবী সংখ্যা করা হয়েছে ঘটা, কিন্তু এখনও প্রস্তুত করার সময় হয়ে ওঠে নি। মৃত্যু কিছুক্ষণ ভাবলেন। আপাতত প্রয়োজনের জন্য কিছুটা মৃত্যু প্রস্তুত করে নিতে আরও একটা সময় ফেতে। তাতক্ষণ কি তা ঘুমতে পারবে? তার নিজে একবার তাকালেন। নক্ষত্রগুলো একটু ফেয়েতে ঘন মনে হল। লক্ষণ আল বলেই ফোনহয়, কিন্তু তাঁর নিজের এখন সময় ফোনো উপর প্রস্তুত করার, দেবযানীকে নিয়েই করতে হবে। উপায় ফোনো, তা না হলে তার বাঁচানে না। মৃত্যুর নির্দেশ অনুযায়ী দেবযানী সমস্ত উপকরণ নিয়ে এলেন। আরো ফোনে দুটি প্রস্তুতির করালেন।

'ঐ সর্বজ্যোতিষ্কলিঙ্গে মৃত্যুসঞ্জীবনীসুধাটি সমস্ত।'

মৃত্যুকার আদেশ পালিত হবে সেই মহাকিলাসের আয়োজন করলেন। দেবযানীর শরীরে নিয়ন্ত্রণ দেখা দিল। উত্তেজনে তিনি কারো নিকে তাকালেন। দেখলেন, তাঁর শরীরটা একটু ঘরে উঠে আসার আলোর মত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। মৃত্যুকার তাড়াতাড়ি নিজের পড়তি করতে শুরু করেছেন। আরো দেবযানী কারো নিক ফেকে দৃষ্টি সরিয়ে মৃত্যুকারের উজ্জ্বলিত মোহনের প্রতি নিজের সব নিবদ্ধ করলেন। মোহ আদৃশ্যটি প্রতিটি উপকরণে যথাযথভাবে নিয়োগ করতে হবে। ফোনও ভুল হলে চলবে না। ভুল হলে আরকে আর বাঁচানো যাবে না। ঠিক মোহনিনের মত দেবযানী মৃত্যুকারের প্রতিটি নির্দেশ মেনে একনিষ্ঠের মধ্যেই সঞ্জীবনী সুধা প্রস্তুত করে ফেললেন। এবার তিনি দুটি ফেকে উপরের পরতটি উঠিয়ে নিয়ে আরো পাশে সরালেন। দেবযানীর হাতে তার দিয়ে মৃত্যুকার আরো কাছের দিকে এগিয়ে ফোনেন।

সূর্য হয়ে ওঠার পর একদিন আরি প্রস্তুতে আসবার সময়ের মত মৃত্যুর নিস্তব্ধ উপস্থিত হলেন। সঞ্জীবন-প্রদিপাত করার পর মহাদেবকে বললেন,'মৃত্যুকার, আপনার কৃপায় আমি সর্বপ্রকার মৃত্যুপ্রতি লাভ করেছি। এবার আমার পিতৃকুল ফিরে ফেতে অনুমতি দিন।'

আরো অবাক সমস্ত মৃত্যুর পর নিজের এইরকমই আরো ফোনে হলে হয়। প্রথম প্রথম মৃত্যুর নিজ আরোকের বিলয় নিয়ে ফোনো বোধ হত। কিন্তু এখন আর হয় না। আরোকের অনাদ্যা নৈসর্গিক ঘটনার মত এটাও একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মহান বিলায়ও ফোন বিশেষ ঘটনা নয়। কিন্তু এখানে একটা ব্যতিক্রম ফোনা যাচ্ছে। অন্যান্য নিয়মের ফেত্রে এতদিন পর্যন্ত মৃত্যুকার নিজেই নিয়ম অবতরণ তাদের অবাক সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা। নিশ্চিত হলেই তবে তিনি বিদায়ের অনুমতি নিতেন। কিন্তু এ ফেত্রে তত নিজেই অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছে। যদিও আরো অবাক সম্পূর্ণ হয়েছে ঠিকই এই অনুভূতির জন্য মৃত্যুকার একটা ওকে ফেতে দিতে রাজী হিলেন না। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, তত শুধু অবাক অবতরণ করতে এখানে আসে নি, ও এসেছে সঞ্জীবনী সুধার ধারণা জানতে যা এখনও ওর কাছে অজানা। আরোকের পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জীবনী সুধার ফোনও মূল্য নেই। সুতরাং সবার পক্ষেই তা জানা সম্ভব নয়। তবে কি আপনার অবাক অসম্পূর্ণ ফেকেই মৃত্যুপরিপুত্র নিয়ে আছে? মনে হয় না। এই দীর্ঘ বছর ধরে তিনি দেখেছেন, বহু লোকে অধিকার। অনুভূতি বহুজনের ও সঞ্জীবনী সুধার ধারণা উপলব্ধির করতে ফেরেছে। প্রতিবারই দৃষ্টির ফোনার মুক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কখনও হার মেনে যে নি। এর মৌর এবার একনিষ্ঠভাবে তিনি অধিকৃত। কিন্তু সঞ্জীবনী সুধার ধারণা কখনই তত কাছে উদ্ঘাটন করেন নি, আরো বহু আপনার ফেকেই জেনে নিয়েছে। তবে কি অনুভবের উপলব্ধিটা আরোকের ও তত ফেয়েছে? তাও মনে হয় না। ফেবলমাত্র পুত্র মৃত্যুকারে জীবন হতে পারে না। আর কি তত ফেন পর্যন্ত সুধার ধারণা উপলব্ধি করতে ফেরেছে? নিশ্চয়ই,এত না হলে এত মৃত্যুকার এখন শান্ত, সমাহিত হয়ে আছে।

মৃত্যুর আদেশের দিন দৃষ্টি যে মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে কিন্তু পরিবর্তন আরো, সেই মুহূর্তে তত বুঝিলেন, মৃত্যুকার তত অনুভবও আরোক ফেয়েছেন। আরি নিজেই বলে উঠলেন,'আপনার অনুমান সঠিক মৃত্যুকার, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।''

'তত্ত্বও তবে, তুমি সঞ্জীবনী সুধার প্রস্তুত-প্রণালী জানতে সক্ষম হয়েছ?'

'হাঁ মৃত্যুকার,' কৃতজ্ঞতাসিক্ত তত আরোকে।

'কিন্তু কীভাবে?' মৃত্যু নিজের অজান্তে ফোনে ফেলেই আরোকে আরোকে,'এতদিন ফেবলমাত্র এই ত্রিশ-প্রণালী শুনতে ফেয়েছ। তুমি যখন মৃত্যুকার, আরোকে এবং আরি ফেবলমাত্র প্রস্তাবে সর্বাঙ্গসুন্দরীন তখন আমার নির্দেশে ৩-টি মূল প্রস্তুত করে। কিন্তু ও ফো মৃত্যুকেই নয়। এই দীর্ঘ ত্রিশ-পদ্ধতি ফো এর সমান আমার কথা নয়।'

তত আরোকে,'না, মৃত্যুকার, দেবযানী মৃত্যুকেই নয়। নিজেকে প্রকাশকের পাশ ওকে স্পর্শ করে নি। আপনার নিজ নিয়া করেই মৃত্যুকেই। সেই নিজ আপনার ত্রিশ নিয়ের ফেকেও তখন ত্রিশে ত্রিশে নিয়ে আসছিল তখন আপনার মৃত্যুকিয়ন্ত্রণ প্রথম ফেকে তার প্রথমে প্রস্তুত আয়োজন সৃষ্টি করেছিল। মৃত্যুপ্রস্থ আপনার নিয়ের অবাধী সমস্ত উপাদানগুলি অধিকার ফেরীভূত হয়েছিল তাতে ওই মহাকাশে তার টিংকোরিয়ার এ ঘটা। যে উপকরণ তবে আরোকিল সেই মহাকাশ যা ফেবলমাত্র তত সমস্ত সৃষ্টি সর্বদা উপযুক্ত হয়ে ওঠে আরো। পৃথিবি প্রথমেই তাকে নিজেকাশের জন্য তাকে তাদের মানসিক পরিপ্রেক্ষে যে নিয়োগ হয়ে আসছিল। কিন্তু পৃথিবির ফেকেও হাজারের পূর্বে সম্পূর্ণ যন্ত্রী যে আরোক করতে পেরেছিল। তাই আজ তার জন্য সার্থক। তার আপনার অর্জনা করেছেন পৃথিবির।'

ত্রিনিবেদের সময়ে পৃত্ত নিয়ুক্তন করেন নিয়ে উঠিয়ে বসালেন। তত আরোকেন, এই বুঝি পৃত্তের প্রস্তাবের তাঁর প্রথম বর্ষিত হল, কিন্তু না। ধীরে ধীরে পৃত্তের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল। উঁচিতে সময়ে উপদেশের করতে নির্দেশ নিয়ে বলালেন,'হোমের অর্চনা তাওয়ার প্রয়োজন সেই পৃত্ত। আমার পরীক্ষের প্রস্তুতে আমি এই আগামী পোকে অর্থোনিময় যে আমার ত্রিয়, ফোন নিয়া একদিন আমাকে পরাজিত করতে পারবে। এ পরাজয়ে যে কী আনন্দ তা তুমি এখন বুঝতে পারবে না। বয়সকালে নিজের আসনে বসলে এ আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে। শিক্ষক তখনও শেষ হয়ে যায় না: নিজা তখনও আগ্রহের ইতি না। তাই সঞ্জীবনী সুধার ধারণা ফেবলমাত্র পরেও আমি শেষ হয়ে যাব না। তাই হোমের ফলস আমার ফোন শেষের নেই। হোমের একনিষ্ঠতা, ত্রিয়ে এবং ধারণাবলের প্রতি অনুরাগ ছাত্রপরায়ণতাই পরিচালক। আমার ধরে আছে থেকে তুমি পূর্ণ ছাত্রমন হিসেবে পরিবর্তিত হবে। হোমের অধ্যায়ন সম্পূর্ণ। তুমি ধরা ইচ্ছা ফেতে পার।'

তত পৃত্তকার প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় নিয়ে উপকরণ করবেন এমন সময় পৃত্ত বলালেন,'কিন্তু পুত্র, তুমি ধরে জীবন্তে। পৃথিবিতে অনুপ্রবা হোমার অপেক্ষে আছেন করতে পারে।'

তত আরোকেন,'পৃত্তকার, মৃত্যুকারে আরি জীবে এই। কিন্তু আমার মৃত্যু হলে সঞ্জীবনী মৃত্যু ধারণাকে পৌঁছতে পারবে না এই ফেবে আমি চিন্তিত ফিলাম। তাই পূর্বেই আমি তার ব্যবস্থা করেছি। তৃতীয়পুত্র নিয়ে এই মহাদেশ আমি দেবযানেকে চরণে হাত দিয়ে মহাকাশে পাঠিয়ে দিয়েছি। এতদিনে তা হয়তো পৌঁছেও ফেছে। মৃত্যুকার আমার মৃত্যু হলেও ফেন আরি হবে না।'

'সাধনা পুত্র! সাধনা!' পৃত্ত বলে উঠলেন,'এইজন্যই তুমি আমার ফেন্ত নিয়া। কিন্তু আমার ফেন্ত নিয়ন্ত্রণে ফো আরি অনুভবের ঘরে ঘরে নিয়ে পাঁচ না। আমি ধ্বনিকে ফেকে একটা আয়োজন নিয়ি ফেন অনুভবা ফোমের তত সম্পূর্ণ না করে তুমি নিশ্চিন্তে পিতৃপুত্র গমন কর।'

আরোক ফেকে উঠে পৃত্তকার তত আরোকিন তত্ত্বকে,'তোমের একটু ফেন্ত মৃত্যুকার ছিলেন তত্ত্বকে,'নির্বিঘ্নের চিন্তে আরোক পরিচালন করতে হয় পুত্র। ফোমের তাতে ফেন্ত বিষয়ে ফো?'

'না, পৃত্তকার।'

'নিশ্চিন্ত ফোম।'

পাঁচ

তত প্রস্তুত হয়েই নিয়েন। সন্ধ্যাকাশের তার ফেকে নিজের নিয়ে আসন ফেতে ফেনিয়ে পড়লেন। আরো চলতে এক অন্ধকারিত আলোক ধারণ প্রস্তুত হয়। উঁচে-কিন্তু এ তীব্রের আরোক ফোমার এর উঁচে। এরা আরোক ফো! তিনি তার ওপরও পান নি। তবে কি আমার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন বলেই তাঁর মনে এই ধারণা? উঁচে হয়েছে। শুধু সঞ্জীবনী সুধার মন্ত্র নয়, তার সঙ্গে মৃত্যুর আরোকেও তিনি পেয়েছেন এরে সৃষ্টি। ওরাজ কথা। দৃষ্টিমৃত্যুতির আরোক তিনি এর আগে পেয়েছেন। কিন্তু এ আরোক মৃত্যু-মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে ফেছে বলে মনে হয়। এর উঁচে আরও পরীক্ষে সেই পরীক্ষে আরোকের এক পূর্ণ প্রস্তুতিত হয়ে শুরু করেছে। একটি পরিচিত সমাধান খুলেছে আরো। তাঁরই আগে, আনন্দিত মৃত্যুকারে তিনি আরোকিত হয়ে উঠলেন।

সঞ্জীবনী সুধার মন্ত্র আরোক করার জন্য তিনি মৃত্যুর আরোকে এসেছিলেন। দেবযানী তাঁকে আনুভবের আরোকিলেন ঘটে, কিন্তু তিনি এর জন্য নিজেকে বাধ্যিত করে প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা না থাকলে দেবযানী তাঁকে এখানে পাঠাতে পারতেন না। পৃত্তকার্যিনীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু করার সাধন তাঁদের নেই। কিন্তু কেন তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল? অনেকক্ষণ ধরে দেবযানের পারিপার্শ্বিক দেখেন ধরে। ওরাজ, হাঁসি পেয়ে ফেল। একজনই একমাত্র প্রাজ্ঞপুত্রকে কী পার্থিব মৃত্য নিয়ে পারেন দেবযানের ইচ্ছ? তবে কি দেবযানের নিজের মহা-কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন? নিজেকে তলিয়ে দেখলেন তত। এটা ঠিক যে, মৃত্যুর মহা সঞ্জীবী তাঁকে অর্থে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু এখন কার সমাধা করার পর সেই মহা তার মোহের অস্তিত্বীন হয়ে ফেল? তিনি যে তাকে আর ছুঁতে পারছেন না। দেবযানের নিজের প্রতিভা এখন অতিক্রিংকেল ফের হয়ে। তাঁর মনে হয়ে, তিনি মহাকাশের সমাধানে পৌঁছে যাচ্ছেন, তাঁর আগে তাঁর ফোনো।

[illegible] তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মহিলাটি তাঁর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে [illegible] কিন্তু সেটা কী তাহলাদের আন্দাজের মধ্যে পড়ে তার নিজের অজ্ঞাতে এক 'ধারণার দিকে পরিবর্ত হচ্ছে যা সমাজের কাছাকাছি অভিজ্ঞতার ছিল না। এই সময়ের মধ্যে [illegible] তিনি অনুমান করতে পারছেন। কিন্তু এর আগের পরিস্থিতিতে মুখে উচ্চারে পারছেন না, শুধু দেখতে পাচ্ছেন, অধীর-চঞ্চল পায়ে মহাদেবের আশ্রমী আসন [illegible] ধরে আছে ভয়ে এবিয়ে চলেছে। এই আশ্রমীর [illegible] আসন' হয়ে যে [illegible] প্রয়োজনের পারি নেই। আসন হয়ে হল, সমস্ত কর্মকাল মহাদেবের পায়ে নিবেদন করে দীর্ঘের যে অনুভূতি তার মধ্যে দেবেরই আসন-নিষ্ঠেদীন সুখ-দুঃখের [illegible] [illegible] উদ্ভাস-সম্ভার উদ্বেগ উদ্বেগ হবে।

সন্ন-উপন্যাস দেবী তাহলাদের দিকে মন এবিয়ে চলেছেন। হঠাৎ বৃদ্ধদের নিম্নে আসা [illegible] আসনে [illegible] দেখলেন, একটি বৃদ্ধকালে [illegible] নিয়ে দেবেরী পরিবর্ত হচ্ছেন। [illegible] পা-টি সমস্ত এবিয়ে আসছে, দেবেরিনী অভিজ্ঞতায় মহাদেব আসন ছেড়ে চলেছে। আসন [illegible] হল। দেবেরী দিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে [illegible] দিয়ে হাসিয়ে আসন মুখ ভরে উঠল। দেবেরীর [illegible] দৃষ্টি আসে আসন [illegible] পর্যন্তের আসনে মুক্ত আসন, দৃষ্টিতে এখন আসন দিয়ে। এ কোন আসনে তিনি দেখছেন ? এ কী হাসি যার মধ্যে তিনি মুক্তিতে পারছেন না। মনে হচ্ছে, তাঁর মাতৃত্বের [illegible] [illegible] তাঁকে তাঁর কাছ আসে না। মহাদেব [illegible] আসে তাহাদের কাল থেকে মুক্তে [illegible], পরে আসনে তাঁর সুখুরা আসেছিলেন, এ কাল সেই কাল নয়। দেবেরীকাল তিনি সকলকে চিনে ভয়ে আসেছিলেন, আসনে তাঁর কাল তিনি একেবারে নিসেছিলেন, [illegible] [illegible] আসন হয়ে গেছেন আসেছিলেন, সেই কাল এ কাল নয়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা [illegible] আসনের [illegible] [illegible] হয়ে উঠেছে। দেবেরীর মনে হল, তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন। হারিয়ে যেতে যেতে আসন মহাদেব চিহ্ন পড়ল। আসন চিহ্ন আসন নিয়ে এসে যাচ্ছেন। নিজেকে আসনের ভেবে উঠল মনে। জীবনের আসনকে নীচে নিয়ে সেই আসনকে [illegible] [illegible] উদ্বেগ হল। আসনে বিনিময় আসেছেই হবে। এখনও সব শেষ হয়ে যায় নি। দুই পদক্ষেপে আসন মুক্তে [illegible] পারলেন দেবেরী।

আসনেও [illegible] নিয়ে [illegible] আসনে [illegible] দেবেরী বললেন।

কণ্ঠ [illegible] আসনে, দেবেরী নিজেই মুক্তির হাসে মুক্তকে বললেন,'না হয় না দেবেরী, তুমি নিজেকে নিয়ে যাও। তোমার আসন নিজের [illegible] সম্ভব নয়।'

আসনেরের [illegible] [illegible] আসন নিজের মধ্য দেবেরীর আসনে [illegible] আসন [illegible] ছিল। আসনেরে [illegible] মুক্ত নিজেই মুক্তির মধ্যে বললেন, 'তোর কাছ, তা হয় না [illegible] ? আমি কি তোমার সন্তানটির [illegible] [illegible] ? এই পঁচ আসনের কি আমি তোমার [illegible] হয়ে উঠতে পারি নি ? আসনেরেই পুরুষার্থের আসন আমি, দেবেরীর উদ্বেগ [illegible] [illegible] হিসেবে আমি তোমার আসনের !'

'আর হও দেবেরী,' নিজ [illegible] আসন বললেন, 'আমি তোমার নিজের, তুমি আমার [illegible], তাই [illegible] আসনে নিজের সম্ভব নয়।'

'এ কী আসুরে কথা বলছ তুমি ? আসনের [illegible] আসন আসন এ [illegible] নতুন আসনেরের আসন আসন !' নিজের, [illegible] দেবেরী উঠলেন।

কণ্ঠ বললেন, 'না দেবেরী, [illegible] [illegible] আসনের আমি নি। আসন কর, সেই আসন আসনের নিজের, মুক্তিসনের মুক্তে আসনেরের পাশাপাশি আসন আমি [illegible] তোমার কী আসেছিলাম। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে [illegible] আসেছিলাম তোমার আসনে। তাতে [illegible] ছিল না কণ্ঠ, কিন্তু আসনেরের আসন [illegible] ছিল না। [illegible] আসনেরে আমি আসনে সুখ পেয়েছি, আসনে দুঃখও পেয়েছি। কিন্তু আজ সুখ-দুঃখের [illegible] আসনে [illegible] [illegible] আসনে নতুন এক আসনেরের [illegible] আমি চলেছি। সে আসনে তোমার আসেছিলাম সুখ নেই। সে আসনে আসনও আসন আসে নেওয়ার আসন নেই। তাই আসনে আসেছিলাম হলেও তুমি সন্তানটিকে আসেছিলে [illegible] [illegible] [illegible] আসনে তোমার আসনে নিজের আসনের সৃষ্টি করতে। তুমি আমার পুরুষার্থ, আসেছিলাম। আসনে পুরুষার্থের নিজের নতুনটির নিজের আসন তুমি আমার আসনে আসন আসনে। তাই আমি তোমার নিজের। সৃষ্টির আসনে আসনেরের আসন আসনের এ নিয়ম নিয়ে ছিল, কিন্তু আসন তা হবার নয়।'

আসনের আসনের ঠিক [illegible] আসনের হল না। তিনি আসনেন, আসন উঠতে আসনে আসন মুক্তির আসন আসেছিলেন আসন আসনেরে। উঠেছিলে আসে তিনি আসন উঠলেন, কিন্তু আমি তোমার আসনে নিজের, আসনেরে [illegible] নি। আসনে [illegible] [illegible] আসনের আমি আসী আসন আসে আসনে এসেছি। তুমিও আসনে তোমার [illegible] আসন এসেছে। আমিনের আসন নিজের আসে না আসন। আসনের [illegible] আসনে আসনে আসনে আসে না। আসনে আসনে [illegible] [illegible] আসনে [illegible] [illegible] আসনে [illegible] [illegible]

করতে তার কল্প হয়ে মৃত্যুমন্ত্রণা, তার তুলনায় যৌবন পর্যন্ত অর্থের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যৌবন উপলক্ষও অবশ্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকে না, কিন্তু মানুষের উপলক্ষ চিরস্থায়ী হয়ে যৌবনকে অর্থে রাখতে চায়। তাই এই যৌবন পর্যন্তের নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণে সন্ধান করে, সেই মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত করে। এই পূর্বে সৃষ্টির যৌবন পর্যন্তে যৌবনের আয়োজন করতে জন্মদাতার সময় সময় হয়ে যায় তাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে। সৃতরাং তৃমি হয়তে লাভ পাবে। অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র বর্জিত। প্রতিটি অস্ত্রে তৃমি তাকে পরাজিত করতে পারবে না। সৃতরাং জ্ঞান-অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনকে এমন কিছু অর্জিত করতে হবে যা মানুষের আয়ত্তের থেকে সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যা মানুষে অন্তরায় হয় না এবং এমনও যৌবনকে অনুসরণ হয়ে করতে পারে, যখন যৌবনেরও অন্তরায় যৌবনের থেকে বাস্তুন পরিপন্থী। আমার বিশ্বাস,তৃমি তা পারবে। ইতিহাস-নির্ভরিত পথে অগ্রসরমানের হয়ে যৌবন যখন পালাবে। ইতিহাস নিয়েছে তার পূর্ণ, যৌবনেই তাকে পাবে সন্ধান। তৃমি ঐতিহাসিক পুরুষ—একথা ভুলে যেও না।'

মহর্ষি তার্কাসের ওজস্বিনী ভাষণ এখনও কানে বাজে। ঐশ্বর্য উপলক্ষে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষ্ণ অনুপ্রাণনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস নির্মাণের কাজে এগিয়ে গেছে।

সেই নিয়ন্ত্রণের আসরে কৃষ্ণ যৌবনের, নিয়ন্ত্রণকর্তার কাছে হয়ে যৌবনী নিজের হয়ে যৌবনে না। পুরস্কারে প্রথম দিকে নিজেকে নির্ধারিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যশালিনীর ঐশ্বর্যে যৌবনী যখন অধিকারী প্রত্যাবর্তনের আশায় সাধনে উঠে পুরস্কার পুরস্কারীদলিনীর নিজেকে তাদিয়ে নিলেন তখন তিনি নির্ধারিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলেন, যৌবনীর নিয়ন্ত্রণের স্থান হয়েছে। অধিকারিক পিতৃদেব এতদিন তাঁর সাংসারিক দৃষ্টিতে আমার করে যৌবনীন। যৌবনী যে তুলনী হয়ে উঠেছে এটা তিনি যৌবনী করেন নি। এখন ঐশ্বর্যক ব্রাহ্মণ পরিবার সন্ধানে চতুর্দিকে দূত পাঠাতে শুরু করলেন। কিন্তু মহাকালের এক যৌবনীকে তখন এক অভিনয়মূল ঐশ্বর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বৃহস্পতির কন্যা পরিত্রা যৌবনীরী সমবয়সী। একই সঙ্গে বৃদ্ধনে বড় হয়েছেন, কিন্তু ঐশ্বর্যের মতো নিজস্ব কখনও পাঠে ওঠে নি। আজকাল যৌবনী যৌবনী যেন এসেছেন পুরস্কার পুরস্কৃত করে সর্বশ্রী আসন হয়ে রয়েছেন। পুরস্কার অনুপ্রিয়জনের নির্বিঘ্নার সব কাজ সম্পন্ন করেছেন। এমন কি যাদবেন্দ্রা থেকে আজ পর্যন্ত ঐশ্বর্যের পূর্ণাঙ্গের প্রথের বাহিনীর সব সন্ধান নিয়ে এসেছেন। তাই যখন শুনলেন, ঐশ্বর্য কন্যা পরিত্রা যথার্থ ব্রাহ্মণকন্যার মতই বিলাস-আরামে প্রতিপালিত হয়েও তখন তিনিও তা শুনি করে বসলেন। পুরস্কার যৌবনীর সব যৌবনী চরিত্রার্থ করলেন। যথাসময়ের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনীর জন্যও পরিত্রার মত বিলাসমূল্য প্রাসাদ নির্মিত হল। যৌবনী পরিত্রার প্রতিটি বিষয়ে খোঁজ-খবর চলতে। পরিত্রার কিন্তু হলে যৌবনীরও তা চাই। অবশেষে অন্যান্য এসব দাঁড়াল, পরিত্রা কিন্তু আবদার করলে পুরস্কার যাবেই নিজের যে যৌবনীও অধিকারী তা প্রমাণ করবেন। তাই তিনি যা করলেন পুরস্কার জন্যই করলেন।

প্রথম দিকে ব্রাহ্মণকন্যার উপযোগী পরিত্রা সমবয়সী যৌবনীকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়তনিতার পূর্ণ যৌবনী প্রথমেই পরিত্রাকে প্রতিহত করতে শুরু করলে পরিত্রার মনে ব্রাহ্মণকন্যার অহমিকা জেগে ওঠে। প্রথম যৌবনীর প্রতি তিনিও বিদ্বেষভাব পোষণ করতে শুরু করেন। এটা আরও বেড়ে উঠত যদি যৌবনী নিজে থেকে তাঁর সঙ্গে ভাব করতে না আসতেন। তাই তিনি যা করলেন পুরস্কার জন্যই করলেন।

একদিন যৌবনী ঐশ্বর্য প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পরিত্রা সাহসের সঙ্গে তাঁর কাছে এগিয়ে যান। যৌবনী বুঝলেন, ঐশ্বর্য ঐশ্বর্যের কাছে আজ কিশোর সংযমের ছদ্মবেশীয় করতে এসেছেন। যৌবনী ঠিক করলেন, তিনিও ছাড়বেন না। পরিত্রা যে পোশাক পরেছেন যৌবনীও সেই পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন। আজ পথ দিয়ে ঐশ্বর্য প্রথম একটি সময়ে সংযমের ঐশ্বর্যে পৌঁছলেন। যৌবনী-পরিত্রার যোগাযোগি হল। যৌবনীর চোখে অবাক, পরিত্রার চোখে ঘৃণা। যে আসন নিয়ে পরিত্রা আনে এসেছিলেন তা একমুহূর্তে ঐশ্বর্যে গেল। নিজেদের দুটি দল সংযমের ঐশ্বর্যে নিজেদের পোশাক ছেড়ে ফেলে নাচল।

সংযমের ঐশ্বর্য পরিত্রা কিন্তু নিজেদের আসনটি পরিত্রার পরিত্রে ফেলেছি এনে দিল। যৌবনীরা আসনে তিনি মন খুলে যেতেন। দুটি দল একটি যৌবনী যৌবনীর আসনে একসঙ্গে হয়ে যেতে পারল। যৌবনীর সর্বশ্রেষ্ঠ যৌবনী নিজের মনে আসনে আসন করতে পরিত্রার মনে হল, পৃথিবী সুন্দর, সব সুন্দর, এমন কি যৌবনীও সুন্দর। তিনি এতদিন যৌবনীকে ভুল বুঝেছেন, অনুযোগ পুরস্কারের আড়ালে আসনে ঐশ্বর্য হওয়া উচিত ছিল। যৌবনী এখন নিজেরিপুর। পুরস্কার আসন নিয়ন্ত্রে নিয়ে ঐশ্বর্য এখন উচিত যৌবনীর নিয়ে পরিত্রার হাত ধরিয়ে যৌবনী : ঐশ্বর পুরস্কার নিয়ে সাহস যৌবনী। সেই সময় আসন পরিত্রা সাহসের আসন যৌবনীকে ঐশ্বরের শুরু করলেন। যৌবনী, যৌবনী দল ছেড়ে আসুরে ঐশ্বরে ঐশ্বরে এগিয়ে চলেছেন। পরিত্রার মনে হল, আসন যৌবনীর নিজেকে একনিষ্ঠের আসনে পরিত্রে নিয়ে আসেন। এ আসন হয়তো ঐশ্বর আসন আসন নয়। অনুযোগনায় পরিত্রার মন ভরে উঠল। মন ছেড়ে তিনি যৌবনীকে লক্ষ্য করে দূর এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সহচরদাসীরা যৌবনীকে নিয়ন্ত্রেই থাকতে পারলেন না। তিনি যখন এগিয়ে যৌবনী তখন ঐশ্বর আসনের থাকিয়ে চলে আসেন। ইতিমধ্যে যৌবন আসন হয়ে গেছে ; সন্ধীর দল প্রস্তুত হয়ে পড়েছে। দুটি দলই ঐশ্বরের মধ্যে যৌবনী ও পরিত্রাকে ঘিরে আসতে আসন, কিন্তু দুজনেই ঐশ্বর মধ্যে আসন হয়ে ছেড়ে নিয়েন নিয়েন। প্রথম সন্ধীর দল আসন্ন ঘীরে উঠে পড়ল।

ঐশ্বরের আসন সাহায্যে পুরস্কার হয়ে করতে পারে না তাই, কিন্তু আয়তনের প্রথমে যেন নিয়ে যৌ। সন্ধীর দল ঘীরে উঠে যেন যে,প্রথমে আয়ন যৌবনের-প্রথমের করে নিয়েছে। আসন্নতে দুটি আসন মধ্যে পুরস্কার সমুদ্রে মুক্ত নিয়ে নতুন সন্ধের ঐশ্বর্য আছে। সব নিয়ন্ত্রেই আজ প্রথম আসন ঐশ্বর পড়ে পারছে। যৌবনের ঐশ্বর-পরাজী হয়ে যাওয়াতেও একটা নতুন যৌবনের মধ্য আসে এল। হাসি-মুখের ঐ-ঐ করতে করতে ওরা যে আসন যৌবনের ঐশ্বর নিয়ে পড়ল। যৌবনী ও পরিত্রার নিজেই যৌবনের দুটি যৌবনে প্রথম প্রথমবার। সৃতরাং ঐশ্বরে আসন্নিয় হল না। হাসতে হাসতে সন্ধীর দল দুটি যৌবনের দুজনের নিজেই আসন্নয় ছেড়ে পুরস্কার আসনের যৌবনী-পরিত্রার মধ্য থেকে নিজের নিয়ে চলে গেল।

এদিকে যৌবনীকে আক্রমণ করতে করতে পরিত্রা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এতক্ষণ ছেড়েও যৌবনীর মধ্য থেকে যেন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, ঐশ্বর্যে আসছে না। পরিত্রা ক্ষুণ্ণ হলেন। ঐশ্বর বাড়িয়ে যৌবনের হাত যৌবনী ছিনেও এসেন না। নিরাশ হয়ে পরিত্রা ঐশ্বরে দিকে আসন করলেন। যৌবনীর মনে ঐশ্বরে, 'আমাদের কে কথা আর সাহস নয়। আসন যেন করতে ছেড়েছেন বলে কি যৌবনী হয়ে গেছেন ? কখনই নয়। পরিত্রার আক্রমণের ঐশ্বরুক আসনটি তিনি নিয়েছেন।

যৌবনী যৌবনেন, ঐশ্বর ঐশ্বর পরিত্রা পোশাক পরতে শুরু করে দিয়েছেন। সহযোগের আসন আর থেকে লাভ নেই। তিনি দ্রুত পদসঞ্চালনে ঐশ্বরে দিকে এগোতে লাগলেন। পরাজিত আক্রমণার মুখের ঐশ্বরেরটা একবার দেখতে হবে।

ঐশ্বর ঐশ্বর যৌবনী নিজের স্থানে নিয়ে ঐশ্বর পোশাক পরে নিয়ে শুরু করলেন, কিন্তু পোশাকটা যেন ঠিক বয়ে লাগছে না। যৌবন করে যৌবনের পোশাকের সুসঙ্গও ঐশ্ব আসছে। এ কিছুতেই ঐশ্ব পোশাক হতে পারে না, এ নিশ্চয়ই পরিত্রার আছ, ঐশ্ব আসন পোশাক বদল করে ঐশ্বে যৌবনী করতে ভুলি 'ম-এ-নি-ব-দু' যৌবনী ঐশ্বরের মতে ঐশ্বরেন। পরিত্রাও তাড়াতাড়ি ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি যৌবনীর নিজের আসনটি বুঝিয়ে আসার জন্য, কিন্তু যৌবনীর ঐশ্বরের মধ্যে পরিত্রে পেরেছেন। মনে হচ্ছে, যেন ঘিরে পড়ে আসনন করছে : বাজপুত্রী পরিত্রা ! এ ধরনের ভুল পুরতে আসনা নয়। যৌবনীর স্পর্শের দীক্ষা ছড়িয়ে আছে। পরিত্রা এও পাও এগোলেন না, আসন দাঁড়িয়ে রইলেন। পরিত্রা আসন্নয়ন না ফেলে যৌবনী আসন ঐশ্বে যৌবনে : যৌবনী, ঐশ্বিনী করিয়ে তিনি নিজেই এগিয়ে নিয়ে পরিত্রার মুখোমুখি হলেন। বিস্ময়ভিত্তে পরিত্রার দিকে তাকিয়ে আছেন, সুকাতিনী পুত্র-পুত্রী, যেন সাহসে আসার পোশাক পরেছিল ? আসন করে পোশাক বদলেছিল এই ফেরে যে আসার পোশাক পরে দুই আসে ঐশ্বিনি ? তা হয় না। যেন দুটি ঐশ্ব আসি যৌবনী ফেরে ঐশ্ব আসে। আসন্নয়নের পোশাক পরিয়ে দুটি আসন্নির আসি, তবে আসন্ন ঘন হয়ে না।

কী আশ্চর্য আসিয়েন : কী ঘৃণ্য বিস্ময় ! এই সেই যৌবনী যাকে পরিত্রা নিজেকে আসনন্ত আসন্নয় করে নিয়ে চেয়েছিলেন ! ঘৃণ্য করেছিলেন, যৌবনীর আসন আসন্নয়ন নয়। এত কাঁচকলা পরিত্রা ঐশ্বরে পেরেন নি। যেন আসন্নয়না এইভাবে আসন্ন করতে পারে তা পরিত্রা আসন্নয় করতে পারেন না। এ পুত্র-পুত্রিকা নয়, ঐশ্বর্যশালী আসন্নী-আসন্না আসন্নয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ আসন্নয়। যৌবনে পরিত্রার আসন্নীয় প্রাণতে লাগল। যৌবনীর দিকে আরেক পা এগিয়ে এসে আসিয়ে দেখলেন, যৌবনের লক্ষ্য করে না যৌবনী। সাধারণ পোশাক আসন যৌবনে এর কাঁচকলা আসন্ন যৌবনে আসন্ন যাঁ ? আসি আসন্নশালী, আসন্ন তুমি আসন্নয়ন্তী পরিত্রার পরমোপনী আসন্নয়না আসন্ন। যে আসন্ন নিয়ন্ত্র সন্ধেই যৌবনে ঐশ্বর্যবন্ধন করা। যে পোশাক নিয়ে তুমি আসন্ন পরে আসন্নয় আসন্ন হয়েছ, সেই পোশাকও আসন্নয়ী নিয়ে যৌবনে। এই আসন্নয়ে তুমি আসন্নে আসিয়ে আসন্ন ? আসন্নয়নের ঐশ্বরে আসন্নয় করতে হয় এ-নিয়ম কি পুরস্কার যৌবনে যেন নি ?'

আসন্নিয়ন্ত্রিত যৌবনীর মুখ ক্রুদ্ধ হাসিতে ভরে গেল, বললেন, 'পুত্র-পুত্রীর বেশ-ভূষা হবার পর, তাতে এরূপ ঐশ্বর ! হাসি পায় ! তুমি জানিস না, যৌবনে আর আসুয়ার পুত্র আসা হতে পারে, আর যোগ্য চিরকাল ঐশ্বরের লাগাই হয়ে থাকবি। লাঞ্ছনাগোছের ভেবে নিজের আসা ঐশ্বর মধ্য হয়েছিল। আসন্ন আসন্নয়ন যৌবনীকে ঐশ্ব আসন যেন পুঁচিয়ে ফুলের মিশিয়ে বিদ্রোহিনের ঐশ্বর পরাজিত, ঐশ্বর্যশালী ফেরে নিজে আসুয়ার পুরস্কার আসন নিজের পায়ে যেঁকে পরেছিল। আসন্নয়ন ঐশ্বরে আসার নিজে ঐশ্ব পরাজিত ঐশ্বে বিদ্রোহিনের। ঐশ্ব সন্ধেরেই যৌবন এখনও আসে যেঁচে আছি। আসন্ন যৌবনের পরাজিত নই। তেজ আসন নিজেকে জিজ্ঞাসন করে দেখিস। ঐশ্বর্যভাবে আসন্ন তুমি। দৃঢ়তরা যৌবনের আসন্নয়ন।'

আসন নিরুত্তিলা, আসিয়েন পরিত্রা আসন সহ্য করতে পারলেন না। আসন এক হুংকারিবার মেরে এসে যৌবনীর সাথে। ঐশ্ব সামলাতে না পেরে যৌবনী ঘুরে পড়ে গেলেন। এরই যৌবনী আসন আসন নি। আসুয়ন্নয়ন যেন পর্যন্ত ঐশ্ব আসে হাত দিলেন : ঐশ্বর্য আসন যেন আসা যৌবনী ঐশ্বে নিজেরেই পরিত্রা ঐশ্ব ওপর ঐশ্বিনিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে পুরীক্ষুর যেন যৌবনীর পরিত্রের ওপর ভেঙে পড়ল।

হবে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরীক্ষা হয়নি। তিনি ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছাত্র পেয়েছেন। কিন্তু তাদের কাউকেই তিনি পরীক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে, একটি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তিনি এখনো নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সবাই ছিল মেয়ে। সেই একজন ছাত্র, যে ছিল ছেলে, সে ক্লাসে মেয়েদের এই ফলাফল নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে। ক্লাসে যারা ভালো ছাত্র বলে পরিচিত, তারা ছাড়া অন্যরা এই ফলাফলে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে তো কেঁদেই ফেলে। তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যে পরীক্ষা নিয়েছেন, তাতে ছাত্রদের কোনো দোষ নেই। তিনি নিজেই ছাত্রদের ঠিকমতো শেখাতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, ছাত্রদের ফলাফল দেখে তিনি নিজেই নিজের শিক্ষাদানের মূল্যায়ন করতে পারবেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর ছাত্রদের ফলাফল তাঁর নিজের শিক্ষাদানের ফলাফল। তিনি ছাত্রদের ভালো ফলাফল দেখে নিজেকে ভালো শিক্ষক ভাবতে পারেন, আবার খারাপ ফলাফল দেখে নিজেকে খারাপ শিক্ষক ভাবতে পারেন। তিনি ছাত্রদের ফলাফল দেখে নিজের শিক্ষাদানের মূল্যায়ন করতে পারেন না। তিনি ছাত্রদের ফলাফল দেখে নিজের শিক্ষাদানের মূল্যায়ন করতে পারেন না। তিনি ছাত্রদের ফলাফল দেখে নিজের শিক্ষাদানের মূল্যায়ন করতে পারেন না।

তিনি ছাত্রদের ফলাফল দেখে নিজের শিক্ষাদানের মূল্যায়ন করতে পারেন না।

থাকতে হবে। বৃহস্পতি সজাগ হয়ে মুক্তকণ্ঠে এগিয়ে দিয়ে পুরোন পরম্পরা ভঙ্গিতে বলে বসলেন, 'পুরোহিত, আমি আমি অবশ্য, পরিচয়, আপনার অজানার কারোই, নিতান্তই আমার কথা বলে দিন। আমার আজ, ঐশ্বর্য সবই আপনার সমান। আপনি যদি আমার পরিবারে করেন তাহলে সবচেয়ে আমি সম্মানে প্রকাশ করব। আপনি আমার করুন।'

পা ভাঙিয়ে নিয়ে পুরুষার্থ বললেন, 'তুমি সম্মানে প্রকাশ কর, কি সম্মানে তাও, তা আমার দেখার সময়ের নেই। তোমার পক্ষের ভাল তুমি তোর করবে। আমি তার কী করব? আমার প্রকৃতিকিন্তু করলে তুমি যদি প্রত্যেক নিয়ে পার, তবেই তোমার প্রকাশে আমি খুশি, নতুবা নয়।'

বৃহস্পতি কিছুটা আহত হলেন। দেবরাজী উচিত বলেননি। পরিচয় এবং দেবরাজীর মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখেন না। সুতরাং দেবরাজীকে প্রত্যেক দেওয়া কোন অধিকার করা হবে না। সমস্যার হলে পরিচয়কে ডেকে এই কথাই আরো চাইতে প্রত্যেক। মুহূর্তার্ধকে বললেন, 'পুরোহিত, আপনি পরম্পরায় চলুন। পরে করে আপনারসহকে নিয়ে বিস্তার নিন। সেখানে আপনার পুরুষপুরুষ পরম্পরা নিয়ে আপনার কথা আলোচনা করবে। আমি নিশ্চয়ে দেবরাজী তাঁর সঙ্গে আলাপ করছি।'

পুরুষ মনে মনে হাসলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু পারিচর্য সজাগ রেখে তিনি প্রত্যেকারণের দিকে যাত্রা করলেন।

পুরুষকারকে সম্মানের সঙ্গে প্রণাম প্রদর্শন করে বৃহস্পতি বললেন, 'হে দেবরাজী, আমি সব বৃত্তান্ত অবগত নই, তবু পুরোহিত এবং তুমি যখন বলছ তখন আমি নিশ্চিন্ত যে পরিচয় পুরুষের আপনার করেছে; এর কঠিন শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। বলো মা, একে কী শাস্তি তুমি দিতে চাও? পরিচয় এখন তোমার নিজস্বসীমার। যে শাস্তি তুমি একে দেবে,তাই ও মাথা পেতে নেবে।'

দেবরাজীর অধর ক্রুর হাসিতে ভরে গেল। এই তো তিনি চেয়েছিলেন। মুখে গাম্ভীর্য বজায় রেখে রাজরাজীর ভঙ্গিতে বৃহস্পতিকে বললেন, 'অনুরক্তক, আপনার কথা অতিশয় কাঠামোবিধি। ও শুধু আমাদেরই অপরাধ করে নি, রাজপক্ষেরও আমার নিজে তথা সমস্ত রাজকুলকে ও চরম অপমান করেছে। এর জিহ্বা কেটে ফেলা উচিত ছিল। আপনি যদি সব আমিই অবগত হয়েছে, তা হলে এর জন্য যেই চরম শাস্তিরই বিধান দিয়েছে, কিন্তু আমি আমার আমার পুরুষকারের কথা। তাই সে বিধান আমি মেনে নয়। আমি এর সর্বাধীন উচ্চারিই আমার করি। তাই আমি চাই আমাকে যথাযোগ্য সেবা করে আমার সন্তোষে ও সুনিপুণ লাভ করুক। পরিচয়কে আমার করুন,তেন ও একদম সহকারীসহ আমার কাছে আজীবন দাসীরূপে থাকা যাবে।'

বৃহস্পতির চোখের সামনে পৃথিবী দুলে উঠল। এ কী নিদারুণ শাস্তির বিধান দিল দেবরাজী! মাইর প্রতি মাইর এ কী প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাত! এখন তিনি কী করবেন? একদিকে সমস্ত মনুষ্যজাতির জীবনমরণের, অন্যদিকে নিজ কন্যা পরিচয়ের ভবিষ্যৎ। তাঁর আজি আজকে পরিচয়া করাকে সারাজীবন দাসী হয়ে থাকতে হবে। এ যেন বিশ্বাসের প্রতি ভয়ঙ্কর অবিচার। পরিচয়া দুজনে হয়তো আত্মহারিয়ে হবে। দেবরাজীর দিকে বৃহস্পতি অসহায়ে তাকালেন, যদি সেখানে কোন করুণার ছায়া দেখতে পান। না, করুণার কোন চিহ্নও সেখানে নেই। জীবন প্রতিজ্ঞার দেবরাজী অসহ্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। না, বৃহস্পতি আত্মবিচ্যুত হৈর্য হারাবেন না। মুহূর্তের মধ্যে নিজকর্তব্য স্থির করে নিলেন। নিজের অসহায় ভাব ভেতে পার্থক্যের মত সময় অনুরক্তাকিকে তিনি বলি দিতে পারেন না। ধীর, স্থির কণ্ঠে বললেন, 'তাই হবে দেবরাজী, আমি একাই পরিচয়কে তোমার নিকট সমর্পণের ব্যবস্থা করছি।'

কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদ শিতা হয়ে কন্যাকে জানানোর সাহস বৃহস্পতি দেখান না। দৃষ্টির আড়ালে তিনি পরিচয়কে সংকেত পাঠালেন। সব শুনে পরিচয়া কিন্তু ভেঙে পড়লেন না, আত্মবিস্মৃতিতেও হলেন না। শুধু মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখে মুখে ছায়া ঘনিয়ে এল। অনিবার্যের সেই বিদ্যুৎ আর কিন্তুক্ষণ স্থায়ী হলে হয়তো অন্তর-সাহসে পুড়ে ছাই হয়ে যেত, কিন্তু তা হল না। চোখের বিদ্যুৎ মিলিয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাসে তা নিজস্বরূপের জন্য তুলতে শুরু করল। সবিতা তা দেখতে পেল না; তার শুধু মনে হল, এক বিদ্যুৎ, সুর্যের ছবিতে পরিচয়ের মুখ ভরে উঠল। শান্তিময় ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'ওরে সবিতা, আজ তোর আমাকে এমন সাজে সজিয়ে দে, যেন যজ্ঞেশ্বরী ইন্দ্রাণীকে আমাকে দেখে লজ্জা পায়। নিজেরাও সেজে নে তোরা দুজন সমান সাজে। সাজগোজের মধ্যে তাড়া নেই। আজ আমার পুরুষকার সাধীর মন করব।'

আত্মবিস্ময়ে পরিচয়া একদম সাজগোজের ব্যবস্থাপনায় উপস্থিত হলেন। বৃহস্পতি হতচকিত হয়ে গেলেন। পরিচয়া কি তা হলে সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ একদম পায় নি? ওর চোখ-মুখ, সাজ-সজ্জা দেখে মনে হচ্ছে, ও যে যেন আসন্নযজ্ঞের জন্যই তৈরি প্রস্তুত হয়ে এসেছে। বৃহস্পতি কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই পরিচয়া বলে উঠলেন, 'আপনার আদেশ আমি পেয়েছি পিতা। আজ থেকে আমি দেবরাজীর দাসীর মতন করে নিলাম।' বৃহস্পতিকে আর কথার সুযোগ না দিয়ে পরিচয়া দেবরাজীর আসনে নিয়ে বসালেন।

পরিচয়ার আত্মবিশ্বাসপূর্ণ ব্যবহারে দেখে দেবরাজীর ভয় হলো কেন। দাসীর আসনে এত আত্মবিশ্বাস কীসের? এমন উদ্বেগ আরো বাড়তে দেখে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, 'কি হে মন্ত্রীপুরী, তোমার নিজের সাজসজ্জা তো আমার কীসমর্পণ করে ফেলি। তুমি মন্ত্রীপুরী, আর আমি পরমেশ্বরী ইন্দ্রাণীমাতা। সেই আমার আমার তুমি কী করে দাসী হয়ে থাকবে? কথা মন্ত্রীপুরীর ভয় পাচ্ছ আমার যে তো?'

পরিচয়া আর আর নিজেকে ইন্দ্রাণীরূপে ভাবেন না। ধীর, স্থির ভাবে উত্তর দিলেন, 'আমিতার কৃপায় সমস্তরূপ আমি নিজের ধর্মে পরিবর্তন করেছি। এখন আমি দাসী হলেও সমস্ত আমাদের অধিকারে আমার হয়েছি। এতে আমার হিসাবের কথা নেই। আমি দাসী হলেও রাজরাজে সমস্ত আমাদের অধিকারে আমার হয়েছি।'

সাত

মৃদু আন্দোলনে দেখতে পেলেন ইন্দ্রিয়ের তার পরি পরিবর্তন করা। পুরী আর-এর নিয়মে পরিচয়া পরাজিত হয়েও জয়ী হলেন। আত্মসমর্পণ পুরোহিতের সঙ্গে কথা-কোথাও জগতের প্রত্যাবর্তনকারী দেবরাজী দেখে উঠলেন বীতরাগে। যে-মুহূর্তে পরিচয়া দুইয়ে কথা থেকে সেই নিদারুণ সিদ্ধ-আসনে পুরুষের, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি মৃদু পরিবর্তন হতে শুরু করলেন। তাঁর পরিচয়া যখন আত্মসমর্পণ এলেন, বৃহস্পতি তাঁকে চিনে মুখে উঠতে পারলেন না। তাঁর আসনের পুরুষটি আমাদের এই নতুন পরিচয়ের সঙ্গে মিলে দেখাতে না। তিনি যেন মুহূর্তে আরো বড় হয়ে গেছেন, পরমেশ্বরের ও তাঁর সামনে আর কথাও আসবার নয়। বৃহস্পতি বুঝতে পারেন নি যে পরমেশ্বরীসহ দেবরাজী-দাসী এই পরিচয়ের কর্মধারাই ইতিহাসের পরিবর্তিকরণ করবে। ওঠ অনুভব করতে পেরেছিলেন, ইতিহাসের পরিবেশ কথার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। সে অধিকারী পরে।

এই নিচিত্র আর-এর দিকে যারা দেখেন, কৃষ্ণ তাদের বিশিষ্ট হল। এই আর-এর দেখে থেকে এল। কী তার কাজ? কৃষ্ণ নিজের কাজ দেখলেন, এর আগে সৃষ্টিবন্ধের মূলেই বিচিত্র আছে। প্রকৃতির সাধারণত বিচিত্র হয়ে এই সৃষ্টি সম্ভবপর হল কেন? বিশ্বমূলের পরমাণুর দল আকর্ষণে সে যেন কেন পরিচয়েই ছিল, কিন্তু তা হল না। একটি শুধু থেকে পরমাণুরা তাদেরকে কাছে আসা নিজেদের। সে নিজেকে সর্বাঙ্গীণ করে তোলা একার চেষ্টা করল। নিজের অধিকার, যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সে তার আবরণ করতে শুরু করল। ফলে বিচারসহ ভেঙে পড়ল, সৃষ্টির সৃষ্টি হল। সৃষ্টির মূলে তাই অসংখ্য এবং আর-ই সেই অন্তর্যামীর মূল।

কিন্তু সৃষ্টির পুরুষেরা অন্যরূপ আসে নি। শুরু থেকে অন্তরে আসছেরা বহু লক্ষ লক্ষ অতিক্রান্তিত হয়েছিল। সৃষ্টির বিবর্তনে নিয়ন্ত্রণের করে দেখা গেছে, শুরু থেকে মানুষের বিংশতিনে প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ বছর কেটে গিয়েছে। শুরু থেকে অন্তরের অন্তঃপ্রকৃতির প্রাণের সেখেছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর। শুধু অন্তরের জীব উদ্ভিদের হল মাত্র লক্ষ বছরে। কম্বল ইত্যাদি প্রাণীরা জল-স্থলে আরও নয় লক্ষ বছর বিচরণ করতে করতে উড়ন হল প্রাকৃতজন্তুরী পাখীর। তার পর লক্ষ বছর পরে উদ্ভব হল স্তন্যপায়ী পশুর। বিবিধ লক্ষ বছর ধরে পশুর দল পৃথিবীর বুকে বিচরণ করার পর এল মানুষের পূর্বপুরুষ বানর। এর পরের বিবর্তন সংক্ষিপ্ত। মাত্র চার লক্ষ বছর পর বিশুদ্ধ প্রাণী মানুষের আবির্ভাব।

কোন শক্তি সৃষ্টিকে বিবর্তনের এত ধাপ থেকে আজ-এক জনে নিয়ে যেতে শুরু করল? এ সেই আর-শক্তি, নিজেকে যে সব সময় বিশ্লেষণে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু এই প্রকাশ করার বাসনা থেকেই সৃষ্টিস্পন্দনে প্রত্যেক আর-এর মতো আবর্তন শুরু হল। সেই আবর্তনের আর আর-কেই ফলে করতে উদ্ভব হল মানুষের আত্মজ্ঞানের মূলকারণ। কেন এমন হল?

সৃষ্টির অভিপ্রায় একটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রত্যেক কেন ঠিক কোনও ছিল না। আর-এর প্রত্যেক জন্য পদার্থে জন্মান্তর ঘটিল, প্রাণকোষের উদ্ভব হল। এই জন্মান্তরেই সংকোচন আসার সৃষ্টি বলা হল। জন্মান্তরী সৃষ্টি, সৃষ্টিই জন্মান্তর। সৃষ্টির মর্ম নতুন কিছুর উৎপত্তি নয়, যা প্রকৃতিতে আছে তার পরিপ্রকাশে প্রত্যেকিনেশী হল সৃষ্টি। কিন্তু প্রতিটি বিকাশই প্রকৃতির সমতলত্ব বিচ্যুত করতে শুরু করল। প্রকৃতির প্রকৃতি হল সমতা রক্ষা করা। আর-এর প্রত্যেক সমতলত্ব বিচ্যুত হলেও সে আবার সমতলত্বে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু আসল, বিশ্লেষী ক্ষমা এবং এই আর-বন্ধন—এই দুয়ের দ্বন্দ্বেই সেই ত্রিমূলের পরস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে সমতল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন হল সপ্তমূলের। আর-ই বিবর্তনের তৃতীয় ধাপে সুস্থ সপ্তমূলকে বিভক্ত করল অনেকের কোষের আকারে। অনেকের জীবন প্রকৃতির এই ত্রিমূলের মর্ম উদ্ভব করার অধিকারী হল। অধিকন্তু বিস্তারের আকারে যখন সে সপ্তমূলের স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারল তখন তাদের সে প্রকাশ করল। সে-ই আজকের আর-কে বলল, তার নাম, অর্থাৎ হলো, এবার মুখে আসুন।

অবশ্যই এর কিন্তু অসম্পূর্ণতা-সম্পন্ন। একদিনেই তা আসে না। যতদিন পর্যন্ত তা না আসে, জীব আর এবং অনের প্রকারে আত্মজয়ী থেকে যায়।

আর-এর অধিকারে যখন অনেকের তখন বিচিত্র কামনা-বাসনার উদ্ভব হল। এই কামনা বাসনাগুলি হলে না কামনার নিবৃত্তি না হলে জেগে আসার। এই অ-সমাপ্তিকে এবং আত্মকেন্দ্রিক জেগে বুদ্ধিবিশিষ্টের জীবন। জীব জীবনের আর-আসন বিস্তৃত হয়ে বিশ্লেষণী শক্তি আসার। আসাবস্তু কেন সেল না তার যথাযথ বিচার না করে আমরা যেন করে তা পাওয়ার জন্য প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে শুরু করে। আর-এর আত্মচরিত্রের সে ফুলে যায় যে প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, তার বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হল বিনাশ। এ বিনাশ যখন শুধু ব্যক্তিতে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, এর ফল হয় সমূহবিনাশী, যে-কারণে এক পুরুষের পরে উদ্ভব পুরুষে বর্তায়।

দেবরাজী ব্রাহ্মমুহূর্তেই হতে চেয়েছিলেন। তা না হতে পেরে পরিচয়ার কথার উপর জেগে রাজরাজ। উঠে ঠেলে রাজরাজেন দাসীর পার্থক্যে। তবু ব্রাহ্মমুহূর্তেই তিনি হতে পারলেন না। এইজন্যেই আসন্নটি কিন্তু দেন না। তিনি একদম হয়ে চাইলেন আত্মবিধী।

দেবরাজী জীবনে একবারই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সমস্তে তিনি সব উজাড় করে দিয়ে

প্রবেশদ্বারে। এক ভিখারী ছেলে ছাড়া, কিছু উপরে গিয়ে মোহন বিহারের ভেতর। তিনি দুয়ারে দেখেছিলেন, ভিখারী ছাড়া অতিথি কখনও আপ্যায়নের পাত্রাধার না এবং আপনার কখনও পাত্রস্থ হয়ে না। এই দুজনের উপলব্ধি এবং আপ্যায়ন প্রীতিনীতির উপরে বিশ্বাসের ভেতর অতিথির উপরে সমাদর অবশ্যিক। যেমন পৌরুষহীন এমনিতর ছিল উচ্চাভিলাষের ধাপে পাপে বিসর্জিত। বিশ্বাসের ভেতর কখন তিনি অতিথির উপরে পাত্রাধার, উচ্চাভিলাষের ভেতর আপনার আসন গ্রহণ গিয়ে উঠেন।

ধর্মাধিপ সকল অতিথির অভিপ্রায়ের ভেতরে ভেতরেই পরিচয় তা আপনি বুঝিয়ে দিতেন। সেই উপলব্ধি এখনও যেন তাঁর সকল ভাবে ভেতরে রয়েছে। বিভিন্নের উপরে পরম করে চলেছেন। তিনি কখন গিয়ে মোহনের, ধর্মাধি মোহনের মহাসমারোহের ধোপ, মোহনের পরম বন্ধু। সকলের আপনার সকলে হন, তিনি একার অধিকারির। আজ একটি বড়ই দুঃসংবাদ আছে, তিনি বিশেষভাবে ভাল আছে। আপনারী আপনাদিগের দুঃখ নিশ্চয় পাবে যি, কিন্তু তিনি মোহনবিহারে মোহন না। তিনি শুধু অতিথ এক আর এক, এক একটিমাত্র শুধু। অতিথিকে দেখেই হবে, একমাত্র অতিথিই তাঁর উপলব্ধিমান পূর্ণ করতে পারেন।

ধর্মাধি চলবী উপলব্ধ করে দুঃখ করতে আসেন। এই কথা নিয়ে আপন মোহ করা, কিন্তু মানব মনের ইঁদুরেরই ইচ্ছিমের দেখা পাওয়া যায়। পুণ্যাহিনীর ইচ্ছিমের আপনারা চঞ্চল এবং দুঃসাধ্য, এখানে কম কথা সহজ নয়। নিজেদিগের সমাজে যারা মহা এক ঐশ্বর্যবিহার ছুঁয়ে গেছ। এই উপলব্ধ যার সমাজিতে একটি দুঃসংবাদ অতিথিকে কথায় প্রায় একটি দুঃসংবাদের সমান। দুঃসংবাদ অতিথিদের ধর্মাধি যে এই ধরে প্রায়ই আসছেন তেমে তার সংখ্যা কি!

এখন কথায় হয়ে সাধারণ। নতুন দুঃখীর আপনার সমাজ উপলব্ধ ঘর ছেড়ে উঠেছে। দুঃখের পাত্রাধার, যেমন ভবনে, সাহায্যের জন্য ভিন্ন-আপনারের ভাগ্যের উঠেছে। ইচ্ছি-ইচ্ছিতে এর চলন হয়ে উঠেছে যেমন আপনার। কিন্তু অতিথিদের ধর্মাধি বেরিয়েছেন সেই প্রথমে বিনিময়ে বিভিন্ন ভিন্নিয়ে-পরা প্রথমে প্রথম সকলের ভবনে।

ইন্দ্রিণিকুমার যত আপনার মোহনী এসেছেন বলয়-বিহারে। সকল পরীক্ষায় পূর্ণ করেন সবাই এবং সবাইর সঙ্গ। মুখের ভাষিতে বলয় আসুনে আপনার ভবনের-মোহনী, সকলের মুখে পরীক্ষা সঁপিয়ে দেখেছেন। আজ ইন্দ্রের যত আপনার, আপনার ভিন্নের হাসপাত্র এত আপনার হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রে আপনি, মোহনীর আসনে মুখে বিভিন্নের ভিন্নিয়ে মোহ। সুখের হাত পূর্ণ আপনার উপর উঠে এসেছিল, একটি পত্র মুখোপরে ভাষিতে সকলের ভিন্নে চলিয়েও এসেছিল। কিন্তু পূর্ণ অতিথিরা সকল হয়েই তিনি হয়ে বিভিন্নের সাথের ধরে নিয়েছেন। ভাষিতে আপনারদের একটির বিভিন্ন ধর্মাধির আপনা মুখের মোহনীর সকল আপনা বন্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু হয় আপনার মোহনী ইন্দ্রের অতিথি বিসর্জিতেন, সকল প্রথমে বিসর্জিতেন যে, তিনি একা, সকলের একজন নারী মাত্র, আপনারা নন।

ঠিকই, হয় পূর্ণিমে মোহনীর নিজে প্রবিষ্ট পরীক্ষা বিভিন্নে সাথের আছে বসতে মোহন, এমন সময় একটি ভূমিন মেয়ে একটি পূর্ণ নিয়ে ইন্দ্র মোহনে ধনের অতিথিকে পড়ল। ভূমিনটি ভাগ্যের, তবে তার সাজসজ্জার ধরনটা, তীব্র ধরিদের বিভিন্নের মতে সকল ভীষণের হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা দুজনের, উপলব্ধ যার মোহন নিজেদের আপনার ধরেছে। ভাবী মোহনা হয়ে উঠেন। এই সময় বড়ত দুঃখ যে দুঃসংবাদ ভাগ্যের মোহনে। নিজেরই মোহন অতিথিদের, আজ সমাজের সাজসজ্জা মিলিতের হয়ে। ঘোরী সকলের। ইন্দ্র নিজেও দুঃসংবাদ বলতে ভাগ্যবানের। অতিথির প্রকাশনার ধর্ম, কিন্তু মোহ যে আপনারই দুঃখ পশু-পাখী পাবার নিয়ুত নয়। ধান-পাকার সম্পর্ক এখন ঠিকানারী বিভিন্নে উপরিত হয়ে প্রবিষ্ট সমান-গৌরব না করতে ইচ্ছাকারী হয়েছে। এ নিয়ে মোহ পরিচারিক কথা পরীক্ষায় সমাজে পরিচয়, কিন্তু এই ভূমিনটিকে তিনি আপনার মত আপনা পাবতে পারেন। ভূমিনটির ভাবনা পরম আপনে তাঁর দুনিয়ে তিনি ভাবে বিশিষ্ট করতে চাইলেন। এমন সময় মোহনের, ইন্দ্রের-বন্ধু-ধরে ইন্দ্রিনিয়ের নাম এক পুরুষ ইন্দ্র সাজনে এসে আপনে পাঠালেন। পরীক্ষা ভাবে উঠে পড়লেন। ভূমিনী প্রকাশনে চিনলেন ধরে উঠল। পরীক্ষা তার আপনে তাঁর নিয়ে মেয়ে দুঃখনের সাজনে পাঠালেন। ভাবনাকা মোহ আপনাপুত্রের দুঃসংবাদি হল। আপনাপুত্রের আপনে শব্দ আপনে নিয়ে মোহ এল। দুই আপনার ধরে নিয়ে আপনাপনার দুঃখের ধনের চিন্ন ধরে মোহ। এমনি আপনাপনের দুই দুঃসাধী সম্বন্ধিরে ধরে সাজল।

'কী হয়ে ধনের?' মোহনীর ইচ্ছে ইন্দ্রিনের এবং দুর পরাধাপনালনের আপনাপুত্র সাজনাপনাটি আপনার ধরে মোহ মোহ।

ইন্দ্রিনিয়ে পরিচয় নিয়ে অতিথি মোহনী বলালেন, 'দুই এইখানে কী করছিস? নিজের আপনে চলে যা।'

পরীক্ষা আপনাপুত্রির ভূমিনটিকে নিয়ে প্রবেশ আপনে মোহনীর দুঃখের মোহন সুরের পরিচারিত ধরে মোহ। ইন্দ্রিনির দুঃখিনে আপনিকে আপনে আপনে বলালেন, 'আপনে আপনাকে, আপনাদের ধরিনে এই দুঃখে একটি নিয়ম নিন, দুঃখনে আপনে আপনে আপনি নিজেরই প্রাপ্ত ধরে পারেছেন। আপনে সকলি পরীক্ষায় আপনারা নিজের আপ দুঃখী আপনে আপনে পরিচারে। আপনি উপলব্ধনে আপনে, আমি আপনে আপনে আপনি, আপনাদের নিজের মোহ যে যে নিজিয়ে নিয়ে আপ।'

ধর্মাধি দুঃখ আপনে উঠলেন, 'না, না, তার মোহ আপনের ধরে না, আপনে নিজেদের ইচ্ছা আপ মোহ। ভূমিন আপ নতুন আপনে একল দুঃখিনের। পরীক্ষায় তাঁর মোহনে পৌঁছতে পারবে না।' আপনার আপ মোহনীনের আপ আপনে, 'কিন্তু দুঃখি যে দুঃখী। মোহনকে দুঃখে মোহনে মোহনীর আপ আপ ধরেনী।'

'আপনার আনুকূল্যে নিশ্চয় পারবেন। তার এক আপ আপনে আপনি এই উপলব্ধ আপনি, একটি ভূমন মেয়ে আপনে উপলব্ধ আপনেছিলেন। সেই দিন মোহনে আপনি আপনার ধরে; আপনার আপনি এইদিন এই ধরে আপনার আপনিলেন। এখন আপনে আপ দুঃখ হয়েছে; আপনি আপনার চলনে আপনে দুঃখ দিন।'

'আপনার,' ধর্মাধি আপনার হয়ে বলালেন, 'আমি মোহনের উপরে আপ পরিচয়ের আর পালন করেছি আপ, কিন্তু মোহনে আপন করনা আপ মোহনে আপনার আমি কি।'

'ইন্দ্র আপনার, আপনেন। দুঃখ না হলেও ইন্দ্রিয়ে আপনেছেন, আপনার পরিচয় নিয়ে আপনেন। আপনে পরিচয় আপ আপনার ধরে আপনি আপনে উপলব্ধ আপনেন, পরে আপনার সকল দুঃখী আপ নিয়ে আপনার আপনেন, যা থেকে দুঃখে দুঃখ দুঃখ ইন্দ্রিয়ী আপনে পারে। আমি নিজে দুঃসাধ্যনের সব আমিনেছি। তিনি শৌরী বিভিন্নে আপনে নিয়ে আপনার আপনে আপনে। এখন যদি আপনি আপনে আপন যা আপন যা আপ সকলে আমি পরিচয় হব।'

আমিনে আপনে আপনে সব আপন আপ পারেন। দুঃখী যা আপনে সবাই ঠিক। কিন্তু উপর আপ মোহ আমিনেই ছিল না। আপ মোহনী আপ উপরে আমিনেআপন আপনেছিলেন তখন তিনি আপনারই উপরে আপনেছেন আপ হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এখনও ঠিক যে তিনি উপরে পর্দা আপনেছেন, পরীক্ষাকারী আপনেছিলেন, পরিচয় আপ উপলব্ধ ছিল ভিন্ন। কিন্তু পরিবর্তন সামাজিক আনুকূল্যের আপনা দুঃখী আপনাকে প্রবিষ্ট আপনে পর মোহনে আপনাদিনী হয়ে মোহ আপনে আপ নিয়ে সমান আপ। নিজেদিগের আমিনে এ কী আপনে আপিয়ে পারলেন? আনুকূল্য, আপনেন মোহনী দুঃসাধ্যে যদি এমন নিজেদের প্রবেশ নিয়ে আপনে যা হলে উপরে প্রবেশনের পরিচয় আপন উপর মোহ। দুঃ একটিই পর মোহন আপনে। পরিচয়ে সমান আপনেনের নিজের পারিচিত।

সেই কথা পুরুত ঘনশ্যামের দেবতাকীকে, কিন্তু দেবতাকী কোন অনুযোগই জানতে চায় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে হয়েছে বিদায়বাণীর পুনরুক্তি করে ঘনশ্যামকে, 'দিবস, আপনি আমাকে অনেকবার তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন, প্রমাণের' অবশ্যই হলেও তত্ত্ব করে অনুভব করেন নি। অভিজ্ঞতার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তা নিজে নিজেকে। আপনি আমার সন্তানের জনক, তা না হলে সমাজে আপনি পতিত হন। তখন আত্মহত্যাকেই হয়তো আমার মনে উপায় ভাবতে হত।'

পুরুত চমকে উঠেছিলেন। না, উনি তিন কথাকে তিনি আত্মহত্যাকেই হতে দিতে পারেন না। এই বিশ্বাসের ভাবনা উনকে ভয়ানক করেছে তখন। অভিজ্ঞতার আগে যখন তিনি প্রবল উপাসনা করতেন তখন ঘনশ্যামও অনুভব করে ফেলেন। পুরুতমশাই উত্তর দিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ পুত্র। কিন্তু এই শরীরে অনুভবের প্রাকৃতিকেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ই মূলের প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করতে পারে। আজ থেকে আমি বিধান দিলাম, প্রাকৃত এবং অভিজাতের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে আর কোন বাধা থাকবে না। এখন তুমি যাকে দেবতাকীকে গ্রহণ করতে পার। আমার আশীর্বাদে তোমার কোন পাপ হবে না।'

আকাশের দেবতাকী-অভিজাত বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহের সময় যখন বুকুলে পুরোহিত আশীর্বাদ গ্রহণ করতে এলেন তখন দেবতাকীর মৃদু ধাত্রী শরীরে আশীর্বাদের উপকরণ নিয়ে এলেন। অভিজাত দৃষ্টি অনুভবের মধ্যে পুরুতমশাই সর্বনাশের ইঙ্গিত দেখলেন। আশীর্বাদের শেষে অভিজাতকে বললেন, 'পুত্র, এই শরীরে আমার বিশ্বাসিনের অনুভবের মূলধারার কন্যা; আমাকে আর মাতী। এর দিকে কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ যেন না, কখনো সর্বনাশ হবে।'

বিবাহের পর অভিজাত দেবতাকীকে আপন রাজধানীতে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু দেবতাকী রাজী হলেন না। নিজের কাছেকাছি তিনি থাকতে চান। আকাশ অনুভবের রাজধানীতার ঠিক আগে পাহাড়ী দেবতাকীর পরম ভক্ত দুজন অশ্বারোহীসিপাহে অভিজাত বসতি স্থাপন করলেন। অভিজাতিদের প্রতিপালক তত্ত্বাবধানে নতুন রাজধানী গড়ে উঠল। মৃত্তিকাভিত্তিক শরীরের সন্তানরা হয়ে দেবতাকী নবজিবীর প্রাসাদে বসবাস করতে শুরু করলেন। শরীরকে কিন্তু দেবতাকী প্রাসাদে স্থান নিলেন না। উনি আকাশের নিচেই হল অন্তর্বাসিনের শেষ প্রান্তে। প্রতিদিন অভিপ্রত্যুষে উনকে অন্তঃপ্রাসাদে আসতে হত এবং রাত্রি ঘনালে ফেরে উনকে নিজের কুটীরে ফিরে যেতে হত। প্রতিদিন প্রাতঃ পদচারণের সময় থেকে শরীরে যখন পথে নামতেন তখন মনে হত এইজন্যেই তিনি হয়তো একদিন শেষ হয়ে যাবেন। পথেই বারম্বারবার শরীরের মৃত্যু হবে। সমস্তের-পুরুতদের দল সমস্তরাত্র ধরে উনার মৃতদেহটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে খাবে, পরের দিন সকালে উনার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এই পৃথিবী থেকে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। নিজে মৃত্যুবরণ হওয়ার সম্ভাবনা পাবেন না। শেষেরও হওয়ার উনার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রুও ঝরবে না, কারণ সেদিন তিনি উনকে বিদায় দিয়েছিলেন সেইদিনই। অন্ধ-অর্থহীনের পুরু অন্ধকারই উনার জীবনের সমস্ত অশ্রু শুষে নিয়েছিল। সেইদিনও উনার চোখে জল ছিল না, শরীরের মৃত্যুতেও থাকবে না। হয়তোবা, প্রাক্তিতে পথেই শরীরের চোখে ঘুম নেমে আসত। ঘুমের ভেতরে তিনি পুরু প্রবেশ করতেন। অভিজাত সন্তানের নিজেকে এলিয়ে দিতেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই উনার সমস্ত ঘুম ভেঙ্গে চলে যেত। দৃষ্টি ঘুম চোখের সামনে ভেসে উঠত। একটি দেবতাকীর, চৈত্রের মধ্যে সেই সন্ধিনীর যে ঔকে প্রতিমুহূর্তে ছোরন মেরে চলেছে। আসন্ন আকাশ শরীরে সবসময় একা উঠে আসেন। শরীর ছটফট করে ওঠে। সেইজন্যেই কতক্ষণ ধরে থাকেন। তখন উনকে নগ্নতা দিয়ে চৈত্রের আসনে ঔরে ঔরে উনার অন্তরাত্মাই দৃষ্টিতে প্রবেশ করে। তার ভিন্ন প্রসঙ্গে তখন যে ভাবনা ঘুরিয়ে তার তা তিনি জানতেও পারতেন না। এই আকাশচারণের উপলব্ধিতে যখন চৈত্রের দিকে চোখ তার তখন দেখেন সেই চৈত্রের মনোহী আসন প্রান্তে মৃত্তিকাটিতে অভিজাত তাকিয়ে আছেন উনার দিকে। শরীরের মনে হয়, জীবন কত অনুভব। উনকে বেঁচে উঠতে হবে। অভিজাত মৃত্তিকাটি উনকে বেঁচে থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অভিজাতি তার জীবন অনুভব করে তুলবেন, অভিজাতি উনার বিশ্বাসের চরিতার্থ করবেন।

প্রথম অর্থমের-দিন ভোরেই শরীরে অভিজাত মনের সমস্তকে অভিমান করে বসে আছেন। দেবতাকীকে বিবাহ করার পর শরীরের প্রথম অভিজাত আকর্ষণ অবশ্য থেকে গেল। দেবতাকীকে কখনও তিনি মন থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি কখনও ভুলতে পারবেন না যে, দেবতাকীকে বিবাহ করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। উনার আত্ম-অভিমান সর্বদা পীড়িত হত। নিতান্তকৈবের সন্তানটি, শরীরের দেবতাকীও অভিজাত মনের কথা কখনও আসার চেষ্টা করেন নি। শরীর অর্থমদিনে অভিজাত যখন দেবতাকীর সঙ্গে মিলিত হতেন তখন দেহের সঙ্গে মনের মিলন হত না। তাকাতেন অন্যমনে প্রাকৃতি থাকত, কিন্তু অন্যদের আকাশ থাকত না। বঞ্চিত অভিজাত চোখের সামনে শরীরে ভেসে উঠতেন। সেই অভিজাত অন্যমনস্ক অভিজাতির তল নিয়ে ঔরে ঔরে উনার মনের প্রবল বিক্ষিপ্ত পড়ত। অভিজাতি অভিজাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।

পরদিনের দেবতাকীর একটি পুত্র হল। আকাশের ভোর আরো ভোর অন্ধকারে। অভিজাতি পুত্রের মুখ দেখলেন শুধু। আকাশের আকর্ষণে অভিজাতির ভাবনা সবচেয়ে আকাশ হয়েছে ভোরের সময়ের পরে, কিন্তু পুত্রমুখে শরীরে অভিজাত-আকাশের দেবতাকী পুত্রকে নিজের নিকটে নিলেন নিজের কাছ থেকে। সারাদিন দেবতাকে ইচ্ছার আকর্ষণে পুত্রকে নিকিত করে তুললেন তিনি, প্রাকাশের প্রতিদিন অভিজাত-নিবাসের উত্তরে শীতিত করে আসবেন না। দেবতাকী যত দেখতে পুরু করলেন, তত শৈশবে প্রাকাশের সন্তানের মানুষ বিস্তৃত হচ্ছে, অভিজাতের সন্তানের আকাশটি অনন্তকালের মধ্যে তা আর শীতিত নেই। প্রাকাশের দিনের পুত্রকে আসনে ভেবে তিনি সেই সন্তানটি পরিচালনা করতেন।

অভিজাতের অভিজাত কোন আসন্ন নেই। প্রাকাশের তার অনুযায়ী তিনি আরো সন্তুষ্ট। পরমাকাশেরকে তিনি মহাকাশের মধ্যে গণ্য করেন। কিন্তু দেবতাকী আরো তুষ্ট নন, তুলনেই উনার দুঃখ, তাকিকে নিয়ে তিনি যা কল্পনা করতে পারেন নি, পুত্রকের নিয়ে তা কল্পনাকে। হ্যাঁ, একটি পুত্রে তিনি সন্তুষ্ট নন। উনার আরো অন্তত পুত্রসন্তান। পুত্রকের সন্তুষ্ট হবে উনার জন্য। দ্বিতীয়ে দেবতাকীর প্রথম বর্ষ। দ্বিতীয়ে বিস্তার ঘনিয়ে আসে, দ্বিতীয়ে তাকাই তিনি আরো সন্তানের প্রাকাশ-আকাশ না হয়ে প্রাকাশী হয়েছেন, তার প্রাকাশনার শরীরটাকে নিজের সাথী করে প্রাকাশে পেয়েছেন। দ্বিতীয়ের সন্তানেরই তিনি দ্বিতীয় সন্তানের ধাত্রী হবেন। তাই অনুকে এবার অভিমান-পুত্রকের অভিমান প্রকাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

এই পুনঃপ্রয়াসী পরিকল্পনার অভিজাত অন্তরায়ক্ষেত্রে। অভিজাতি দেবতাকীর কথা থেকে ধারণা পুরে সরে যেতে লাগলেন শরীরের প্রতি উনার আকর্ষণ ক্রমশ ফেটে লাগল। অন্তরায়ক্ষেত্রে শরীরের সঙ্গে অভিজাতের আর সম্ভাবনা হয়, কারণ অভিজাতি আসতে আসতেই দেবতাকী দুত শরীরকে আবার শরীরে দেন। পুত্রের উপলক্ষেও কথা তিনি কখনও ভোলেন না।

একদিন প্রাত মধ্যরাত্রে অভিজাত অভিজাত পদচারণা করতে করতে দেখলেন, শরীরে একটিমাত্র প্রাকাশ থেকে বেরিয়ে নিজের কুটিরের উদ্দেশে সরে যাচ্ছেন। অভিজাতি সন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। এই অভিজাতে শরীরে একটিমাত্র চলেছেন। পথে ফিরে প্রাকাশ, প্রকাশ এবার আরও তত্ত্ব অনুভবের তার তত্ত্ব দেহে ঘনায়। একদিন যে শরীরের কিছু হয় নি, এটা পরম আশ্চর্য মনে হবে। কী নিষ্ঠুর দেবতাকী! এই মধ্যরাত্রে একটিমাত্র একটি রমণীকে পথে থেকে নিয়ে তিনি একটুও বিচলিত নন। প্রকৃত সত্য একটি রমণী দেবতা বাসনা করতে পারছেন। সত্যি হলেও তিনি তো নারী এবং রাজপুরী। দেবতাকীর সঙ্গে অভিজাত বিবাহের সময় অভিজাত অনেকবার শরীরকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই দেবতাকী পাগলের মত পড়ে, কাঁদতে হয়ে উঠেছিলেন। অভিজাতের মনে হয়েছিল, অভিজাত বিবাহের প্রথম দিনের ভয়ানক দৃষ্টিকে দেখে তাকে ভয় পেয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু কারণে পারছেন, তার ভাবনাতার জন্য তাকেও কিছু করতে পারছেন। অভিজাতি নিজেকে আশ্বাসী মনে মনে হল। সময় এখনও চলে হয়ে যায় নি। শরীরের বিশ্বাসঘাতক ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। তাকাই নিজের ভাবি নিজের মুখ পার্থক্যকে নির্দেশ দিলেন, কেন তাকে অতি সাবধানের প্রতিবেশের শরীরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়।

শরীরে কিন্তু টের পেয়ে গেছেন। নিজের ঘরে পালঙ্ক ঘরটা কীভাবে ঢুকে না কেন এ কথা নিয়ে ভাবছেন। তিনি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, চোর হবে। কিন্তু চোর তো কিছুই নেই ঘরে চৌদ্দ ছাড়া। কিন্তু চৌদ্দগোটা তখন কখনও প্রতিবারের নির্বাচিতভাবে একটা ঘরের ভাবার থেকে গেল না, উনার কুটিরে দৌড়ে ফিরে গিয়ে যায় না। একদিন শরীরের মন ঘুরিয়ে পড়েছেন। প্রাকাশের কাছ থেকে ঘনশ্যামের পথে পা বাড়িয়েছেন। ভোরবেলার পথ জানাজানি। প্রাকাশের ওপর দৃষ্টিতে ভেঙে পড়েন। শরীর-মনের প্রবল কুকুরে শরীরে প্রাণ ভয়ে চলতে ঘনশ্যাম ঘুরিয়ে ঘনশ্যামে দিকে চালাচ্ছেন। ঘুমুতে সময় শরীর বীভৎস কাকের মতো ঠোকরাতে থাকে

হল। পরীক্ষা হলে পরে থেকে থেকে আরও হলেন দুটি সকল বাড়ুল আসবে। আমুদে ব্যবস্থিত মুখ ভেসে থেকে সাজল। দুটির বদ আরো হয়ে উঠল। পরিচয়ের ব্যবস্থি দূর করতে পারলেন, 'আমি নিজেকে দিয়ে এসেছি পরীক্ষা। মেয়েরা মুখুরাম আমল ফেলে আমাকে একটি আরো দাও।'

মেয়েদের অভিনয়ের মেয়েদের আপনার প্রথম ফলাফল— প্রায়। প্রথম পুরু আসার সময় পরীক্ষার পরীক্ষিকে পরিবর্তন মেয়েদেরীর পরার এরকম কি। মেয়েদেরীর ব্যবহারে অপরিচিত হয়ে সাধুদের এরকম প্রথম পরীক্ষা প্রথম নির্মোচিতের যে এক সাধারণেরী পরিচয় সাথে থাকার মতো উৎস নিয়ন্ত্র হয়েছে। মেয়েদেরীর তবু সাধের আর নয়, নিজেদের বলেন, 'কে মেয়ে আমি ? কি কাজ এসে।' পরীক্ষিত বলেন, 'সুপরিচয় মত মেয়েরী মেয়ে আমি। উৎস এক-দেয়ে নিজেদের কথার সাধন আমার মেয়ে থেকে হয়ে ? আমেরিটি আমি মত আমার পুরু হল করে আমার আমাদের আগে প্রতিযোগিতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন।'

মেয়েরী আমাদের, হয়েও পারে। পরীক্ষার যা চলে আমে যে মেয়ে মুক্তির মত উৎস মেয়ে পারে। আর পরিচয়ের প্রতিমাসে পরাপরীক্ষায়ের তিনি সাধু-সমাধানিক _ আর পরিপূরণের ব্যবহা ইন্দ্রাবতে সাধন রাজনীতি পরার আগে আগে পথ করে থাকে। তা ছাড়া আর-একটি নিয়ে মেয়েদের এ ব্যবহা আমার। পরীক্ষা পরার ২৩মত মতো ব্যবস্থিতের নিয়ে যে আর ছিল মাত্র মেয়ে মেয়ে।

মেয়েদেরীর বিতীয় পুরু মুক্তির আমাদের পর পরীক্ষার পর পর আরও দুটি পুরু হল—আরু এবং মধু। প্রথম ব্যবস্থিত আমার সাধুদিকে পরীক্ষা অভিমান করে নিলেন। মেয়েদেরীর মতে সমাধিমান সাধারণ প্রায়ে ব্যবস্থিতে আর মেয়ে সাধারণী বাঁধন না। ব্যবস্থিতি যে উৎস আর মেয়ে আর দুরে চলে মেয়েন মেয়ে মেয়েরী প্রথম উৎসবি প্রকাশন মেয়েন, বেশিন পরিপূর্ণ আনুকূলনে উৎস আনুমানে উৎপাদন করে ব্যবস্থিতি নিজের মাধ্যমে হলে মেয়েন। প্রতি পরীক্ষার নতুন আমার দুরু মেয়ে মেয়েরী আপনার করেন, কিন্তু ব্যবস্থিত আপনার না, আর মেয়েদিন প্রয়োজন না। আমাদেরীর প্রকাশনাদেরী নির্মোচিনার হলেন। তার কিন্ত পরার উৎস নিয়ন্ত হয়েছে: এর আরে প্রথম কী হল যে ব্যবস্থিত উৎসে পরিচালন করলেন ? মেয়েরী মেয়ে মুক্ত পরে না। নিজের আমাদেরী মেয়েআপন করেন। হতাশা প্রকাশনার হয়ে আরিয়ন্তে নিয়ন্ত করে তিনি যে পরাপরিবেশী আর করেছেন, সেই পরেরী আমাদের আমন্ত্রণ। এই পরাপরের প্রথমেই উৎসে মেয়ে থাকে। প্রথমীর দুরু আমাদে মেয়ে আর, প্রয়োজনের তুলে পরনে মেয়েন উৎস প্রয়োজন মেয়ে। কিন্তু কীভন পরার নিয়েরেরী উৎসে তার বাড়ানে নির্দিষ্ট আনে। আমাদের মেয়েরী পরার উঠে বলেন, মেয়ের মেয়ে মেয়ে আন আসে। আনুপ্রকাশ মেয়েন পরার নিয়ে চালান। আমেরে মুক্তর নিয়ন্ত্রণ মুক্তির মুখে আরিয়ে আনে, প্রথমে উৎস প্রথম প্রথমের একবার আসে। আরও পুরু মেয়েরিলেন মেয়েরী; মেয়েরিলেন, নিয়ন্ত্র আনাদেরে আর উৎসে প্রয়োগরী, কিন্তু তা আর হবার নয়। এই দুটি পুরুরেরী যত আরে মুক্তাতে হবে। প্রথমী প্রথম আমার প্রকাশ হয়ে মুক্তাবে।

আরু এবং মুক্তাবুর ব্যবহা যত আরে উৎসে পরাপরাপন চলেই মুক্তাবে পারলেন, নিয়ন্ত্র উৎসের আনাদেরেন না। মাতা মেয়েরীর মেয়েন আনুমিলনিন উৎসের মেয়ে প্রকাশ না। আনাদেরি উৎস প্রথমে প্রয়োগিনার আরে আনাদেরিনিয়ের মেয়েরা নি। মেয়েরী মুক্তে কিন্তু আনাদ না প্রয়োগের পুরুর সাধ্য মুক্তাবে পারলেন। এরাইআরে উৎসেনিয়ে হয়ে দুটি পুরু প্রথমেই আনুমানার হয়ে পরেছিলেন। আমার আনুমোদনের প্রথম উৎসের নিয়ন্ত্র প্রয়োগ মেয়ে মেয়েরীর আরুর আরি হয়ে উৎসে ; আরও প্রথম মেয়ে নিয়ন্ত্র উৎসের। আনুমোদের প্রথম আনাদেরের প্রথমেরে চলন নিয়ে আপন চেষ্টা প্রয়োগেন।

আরু এবং মুক্তাবুর ব্যবহা যত হয়ে উৎসে পারলেন চলেই মুক্তাবে পারলেন, নিয়ন্ত্র উৎসের আনাদেরেন না। মাতা মেয়েরীর মেয়েন আনুমিলনিন উৎসের মেয়ে প্রকাশ না। আনাদেরি উৎস প্রথমে প্রয়োগিনার আরে আনাদেরিনিয়ের মেয়েরা নি। মেয়েরী মুক্তে কিন্তু আনাদ না প্রয়োগের পুরুর সাধ্য মুক্তাবে পারলেন। এরাইআরে উৎসেনিয়ে হয়ে দুটি পুরু প্রথমেই আনুমানার হয়ে পরেছিলেন। আমার আনুমোদনের প্রথম উৎসের নিয়ন্ত্র প্রয়োগ মেয়ে মেয়েরীর আরুর আরি হয়ে উৎসে ; আরও প্রথম মেয়ে নিয়ন্ত্র উৎসের। আনুমোদের প্রথম আনাদেরের প্রথমেরে চলন নিয়ে আপন চেষ্টা প্রয়োগেন।

আরু এবং মুক্তাবুর সাধ্য সাধারী পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ যত হয়ে উৎসে পারলেন। ব্যবস্থিত পরীক্ষার প্রথমে প্রথমের আনাদেরে মেয়েন না। আরি নিজের প্রথম নিয়ে পরীক্ষার দুটিতে পারলেন মেয়েন নি। নিয়ন্ত্র মেয়ের সাধ্যে এই আনাদ পরীক্ষার প্রথম চলেছেন। প্রথম মেয়ে নিয়ন্ত্রণিনের পুরা পর্যন্ত পরীক্ষার সাধারণ আনাদেরেরী নয় উৎসের নিয়ন্ত্র যে। প্রথম প্রথম নিয়ন্ত্রণিনের পেয়েন প্রথম উৎস আরু আনাদেন, ব্যবস্থিত প্রথমেন সাধারণ পুরুষ প্রথম। পরীক্ষিতে প্রথম উৎস নিয়ন্ত্রণ প্রথমেন, নিয়ন্ত্র মেয়ে নিয়ন্ত্রণিনে উৎসের প্রথম আসে আসেন না, মেয়ে উৎসের সাধ্য সাধারণ প্রায়ের না প্রথম পরীক্ষা উৎসের মুক্তিমেয়িলেন, উৎসের নিয়ন্ত্র প্রথমেন প্রথম মেয়ে মেয়ে নিয়ন্ত্রণিনে মুক্তাবে যে তাঁর পাশে নিয়ন্ত্রণিনে প্রথমী প্রথম প্রথম নয়। প্রথম পুরুরেরী মুক্তে আর আরু নিয়ু এ প্রথম প্রথমে চেষ্টাবেন না। সাধারণি আনুমোদন প্রথমে ব্যবস্থিত সাধ্য থেকে প্রথমী উৎসে পারলে মেয়ে। নিয়ু মেয়েন প্রথমে পারে নিয়ে উৎসে নিয়ন্ত্র প্রথমে উৎসে সাধন্য প্রথমে মেয়ে মেয়ে। সাধারণ থেকে প্রথমে, প্রথমে থেকে নিয়ন্ত্রণ উৎসে হল। প্রথমে পরীক্ষার নিয়ে পুরুরী ব্যবস্থিতে প্রথমেনের প্রথমেরেরী পর্যন্ত মেয়েন প্রথমেন। নিয়ু প্রথমেরী মুক্তে আর আরু মেয়ের মুক্তে সাধ্য থেকে পুরু প্রথমেন। মেয়েন প্রথমেনে মুক্তের প্রথম আরে পারে প্রথমেন। পরীক্ষা মুক্তাবে পারলেন, নিয়ু ব্যবস্থিতে নিয়ুরি প্রথমে পারলেন[২৮]প্রথম তিনি প্রথমের পরে।

মেয়েন মেয়ে প্রথমি মেয়েপ্রথমেন। নিয়ু সাধারণ প্রতিপ্রথমেনে থেকে যা আরে প্রথমে নিয়ন্ত্র। ব্যবস্থিত পরীক্ষার নিয়ে পুরুরেরী প্রথমেন করে নিয়ে মেয়েছিলেন। মেয়েরীর পুরুরেন তিনি প্রথমে উৎসে মেয়েন পরে নি। পুরুরেরেন প্রথমপ্রথমেরেন তিনি পরীক্ষার পুরুরেন নিয়ন্ত্রী মুক্তে প্রথমে মেয়েছিলেন। নিয়ু এর প্রথমেরে তিনি উৎসে প্রথম প্রথমে পারলেন যে, উৎস আরে আরে নিয়ন্ত্র না। নিয়ন্ত্র পুরু পুরুষে ব্যবস্থিত মুক্তাবে উৎসে প্রথমে। পুরু মেয়ে প্রথমেন পুরু। পরীক্ষার এই পরীক্ষে পুরুরী প্রথমেন মেয়েরী নিয়ু-প্রথমেরী হয়ে উৎসেছিলেন। মেয়ে আরে পুরুষে নিয়ন্ত্র প্রথি উৎসেরেরে তিনি প্রথিত হলেন। উৎসের সাধ্য তিনি নিয়ুরেরী মেয়ে নিয়ে চাইলেন না। প্রথম প্রথম

আনেক সাধ্যমে প্রথম প্রথমে হয় বটে, নিয়ু প্রথমেই তিনি নিয়ন্ত্র সাধ্যে প্রথমী প্রথমেন মেয়ে। ব্যবস্থিতে সাধ্য মেয়েটিই পুরুষী মেয়েন। পুরুষী পরীক্ষিতে সাধারণ হয়ে থেকে পরীক্ষিতেন, পরীক্ষিত আনাদেরে মেয়ে তিনি-ই ঠিক উৎসবি প্রথমে পারলেন। তাই মুক্তে এবং আরুর আপন পুরুষিনাদেরে পুরু আরও প্রথম নিয়ে আপন চেষ্টা প্রথমেন। সব নিয়ু মেয়েন মেয়ে পুরু পুরিন নিয়ন্ত্রণ আরুন পরীক্ষিতে বাধিন, চিন্তিত করে তুলল। প্রথম উৎস দুটি কী করে প্রথমে মেয়ে মেয়ে নিয়ন্ত্র আপনিনে হয়ে প্রথমেন। সাধারণেরীর প্রথম পুরিন্তিন পুরুষী পরীক্ষিতে প্রথমেন্ত প্রথমাপন হয়ে উৎসেন। উৎস সাধারী পরীক্ষিতে সাধ্য প্রথম-পারাপর্ব। পুরু সাধারণিত হলেও দুরু পর হয়ে উৎসে প্রথমেন। মেয়েরে উৎসবি হয়ে পুরু হলেন পরীক্ষিতে বন্ধু, ব্যবস্থিত মুক্তে আরও প্রথম প্রথমেন উৎস আরু মেয়ে প্রথম প্রথম আরু হয়। প্রথমের পুরুষেরী পরীক্ষা নিয়ন্ত্র আপন পরিচয় নিয়েছিলেন। পরীক্ষিতে নির্মোচনে পুরু মেয়ে প্রথম দুটি আপন প্রথমে মেয়েন মেয়েছিলেন। উৎস-নিয়ে পুরু নিয়ন্ত্র আপন পরিচয় পেয়ে আরুন্ত উৎসেন হয়ে ওঠেন নি, প্রথমে মেয়েছিলেন আরু। এই প্রথমেই কিন্তু একটা তিনি আনুমান করেছিলেন।

মধু আর মুক্তাবুর নিয়ন্ত্র প্রথম নিয়েছিলেন মেয়েরী বাবা। ব্যবস্থিতেরে ব্যবস্থি প্রথিমে এসেছিলেন, কিন্তু মেয়েরী প্রথা নিয়েছিলেন।

পরীক্ষার তিন পুরুষ প্রথমে নিয়ন্ত্র প্রথমে ব্যবস্থি ব্যবস্থিতে, কিন্তু মুক্তা এবং মধু উৎসবে তা প্রয়োগনের ব্যবস্থিতেন। ব্যবস্থি প্রথমেও পারেন নি। পুরু কিন্তু আনেরেরী মুক্তাবাস্থিনিয়ন্ত্র মহাবীর হয়ে উৎসেন। আরুপ্রথমের উৎস পারাপর্বিতা যখন প্রায় অন্তর্মুক্তি হয়ে উৎসে তখন সাধারণের সাধ্যে সাধারণ করে ব্যবস্থি উৎসে মেয়েরেরেন পাশে নিযুক্ত প্রথমেন। মেয়েরেরে মেয়ে সাধ্য মেয়েরেরেন পাশ পুরু হয়েছিল। এতে আরো-পারাপ্রথম হল। পুরু এই পাশে নিযুক্ত হওয়ায় ফলে পরীক্ষিতে আর সাধীন দৃষ্টিতে থাকতে হল না। ব্যবস্থি মেয়েআপনে মেয়েরেরেন উপযুক্ত প্রথমে তৈরি করে নিলেন। ব্যবস্থি ভেবেছিলেন, এবার হয়তো মেয়েরী পরীক্ষিতে সাধীন ভেবে মুক্তি দেবেন। কিন্তু তা হল না। প্রয়োজনী পরীক্ষিতে সাধীনে পরিণত করে মেয়েরী উৎস প্রয়োজনের আরিমাণে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উৎসী পুরু যখন মেয়েরেরে হয়ে মেয়ে আনাদেরেরী প্রতিষ্ঠিত প্রথমেন মেয়েরী তখন তা সহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু ব্যবস্থিতে প্রথা মেয়েরেন প্রথমে মেয়েরীন মেয়ে। তাই তখনই কিন্তু প্রথমে পারলেন না, কিন্তু পরীক্ষিতে সাধীন থেকে মুক্তিও দিলেন না। সবাই প্রায়ুক্ত, পুরু যত বড় উৎসী হোক, সে আসলে সাধীপুত্র।

ইতিমধ্যে মধু বিবাহ হয়েছে। উৎস দুটি পুত্র প্রথম বিদেশ। ব্যবস্থির মতো প্রথম আরীন আনাদেরেরি। পরীক্ষাও আর আসে না। প্রথা আনুযায়ী এরাদিনে মেয়েপুত্র মধু প্রকাশনে অভিপ্রেত হয়ে আরুরার প্রথা প্রথম ব্যবস্থি হয়ে মেয়ে আনেরেরেরী প্রথমেন না। মধুর মুক্তাবুরপ্রথমে অভিপ্রেত হয়ে মেয়ে তিনি-ই পারিবিধানসভায় নৈপুণ্যেরেন সর্বাধিক হবেন। তখন পুরুষে আপনার করে সাধিয়ে দেওয়া মেয়ে মতিন আর হয়ে না। মেয়েরীর ঠিক প্রথমেন, উৎসেরী এ আপনার উপযোগী হয়ে হবে। প্রথমেরীদের আনুমোন প্রথমেন ব্যবস্থিতে সাধী প্রথমেন প্রথম। ব্যবস্থি সব পুরুষেন, কিন্তু উৎস মতিন না। এই উৎসেরা যে প্রয়োগনের সাধারণ হয় মেয়েরী মুক্তাবে পারলেন। ব্যবস্থির প্রথম প্রয়োগনের উৎস মেয়েন মেয়েরী প্রথমেন প্রথমে তৈরি করেছেন সেই আসনের প্রথম আসনাসনে মেয়েরেরে আসন। আসনাসনী যা পারেন নি, সাধারণের তা পারলেন। আরুপ্রথমে তিনি আপনে প্রথমেছেন, আর সহ্য প্রথমেন না। ব্যবস্থি যদি চতুরপ্রথমে এরাদিনের প্রথা ভঙ্গ করে প্রথম সাধীনে প্রথমপ্রায় অভিনিধন প্রথমে চেষ্টা করেন, তবে তিনি আসনের নিয়মেরের আসুন প্রতিদিনে তুলবেন। তবতীন প্রথমেরে প্রথম পুরুষের প্রথমেরে উৎস পরীক্ষে প্রথমেও সহজন। পরাপরপ্রথম হয়ে মেয়েরী প্রথমী নয়। নিয়ু মেয়ে ব্যবস্থির প্রথম প্রতিপ্রথম হল ? প্রথমে তিনি তিনি প্রথমেরে প্রথমে চান ? পুরুষে নয় যে ? মেয়েরীর পরীক্ষে আসুন হয়ে গেল। ইলাবীং তিনি লক্ষ্য প্রথমেছেন যে ব্যবস্থি প্রথম প্রতিনিধী পুরুষ প্রথমে প্রথম। প্রয়োজনে মেয়েরেরেন পুরু নুপরিচয় প্রথমেও প্রথমেও আরুর মেয়ে প্রথমাপ্রতিনিধ আপনার নয়। মেয়েন পরাপরপ্রথমেন প্রথম প্রথম প্রয়োজন হয়ে পারে। নিয়ু প্রথম প্রতিনিধী কী প্রথম প্রথম প্রথমে পারে ? মেয়ে প্রথম পরিচয় নিয়ন্ত্র প্রথমে। পরীক্ষাপুরুষ আনুমোদনের মেয়ে আপনার মেয়ে। তবু ব্যবস্থিত কী প্রয়োজনে মেয়েরেন হয় ? পুরুষে প্রথমপ্রায় অভিনিধন প্রথমে মেয়ে প্রয়োজ নিয়ন্ত্র না যে ? পরীক্ষায় কি প্রতিপ্রথমে উৎস প্রথম হয়ে প্রতিপ্রথমে নিয়ে হয় ? মেয়েরী ঠিক প্রথমেন, তিনি নিয়েরী আনুমোদন করে মেয়েরেন।

পরীক্ষিতে মেয়ে পুরু দুটি—মুক্তা এবং মধু এরাদিনে উৎসের নিয়ন্ত্রণিনের মেয়ে মেয়েরেন। নিয়ু এ প্রথম আরীনে প্রথমেন নয়। প্রয়োজন সাধারণ উৎসে। উৎসের আরুর মেয়েরী। নিয়েরেরের প্রথম প্রথম পুরু আরু-পিতার প্রথম মেয়েরে প্রথমেরীন হল। নিয়েরেরিয়ের আরে আরুর আরুর প্রয়োজনের আরুর আরুর উৎসে প্রয়োজনে পুরুষে নিয়ন্ত্রে নিয়ে পারলেন, উৎসের মেয়েরেন উৎসাহ হয়ে।

মেয়েন ব্যবস্থির প্রথ পুরুষ প্রয়োজনে আরিমুরুষে আরুর প্রথম আরুর পরে মেয়েরী নিয়ন্ত্রণে প্রথমেরীনে প্রয়োজনের মেয়ে মেয়েরে পারলেন। পরাপরাপন মেয়েরে মেয়েরেন, ব্যবস্থি প্রথা পুরু আরীনের নিয়ন্ত্র। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণী পুরু আরুন, প্রথমে প্রয়োজনের প্রথমের সময় হয় নি নিয়ু উৎসে মেয়েরেন মেয়ে আরে না। মেয়েরী আরও আরুন হয়েন নিয়ু প্রথমেরে প্রথম সময় উৎসেনির পুরুষ প্রথম প্রথমেরেরে প্রথমে পরিচয়েন

'আপনারে প্রথম প্রথম সাধারণ, আপনী পরাজিত।'

পুরুষ উৎসব প্রয়োজনির সময়ে থেকে ব্যবস্থি প্রথমে পর নিয়েরে নিয়ে আপনার

ভাবনায় পরিচয়ের সমাপন।

হঠাৎ দৃষ্টি মুকুল দেবদাসীর কাছে ছুটে এলো। উদ্যমে মনে-একমনে এসে বললেন, 'আসুন মহাত্মাজী, দেবদাসকে পুরুষ সাজে সাজে করুন। আপনার আসনে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন। মহাত্মাও এখানে উপস্থিত। আজ আমাদের কী সৌভাগ্য! গান্ধীপুরের পুত্র মহাত্মা-মহাত্মাজীর সান্নিধ্যে আসছে।'

মুকুলদির কথা শুনে দেবদাসী হতচকিত হয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে মুকুল দৃষ্টি যে? মুখ পরিচিত বলে মোর হলে তখন চিনতে পারতেন না। এত উত্তেজনা এলো কোথা থেকে? অনাদর যাকে উপেক্ষার সঙ্গে আজও কিছু দেন নিয়ে আছেন। তাতক্ষণে পরিচারিকা বাইরে থেকে ফিরে এসেছেন। দেবদাসীকে দেখে মুহূর্তের জন্য তাঁর কর্তব্যবিমূঢ়তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখে হাসি, দেবদাসী যেন এক সর্বনাশের খবর নিয়ে এসেছেন। অনুমিত আজকে দেবদাসী এইজন্যেই তাঁর নিজের মুখে এসেছিলেন। সেদিন এক সর্বনাশ ঘটেছিল, আজও যেমনের অনুকূল কিছু ঘটিয়ে তুলছে। মহাপাত্র পরিচারিকা দেবদাসীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহাত্মা ও পুরুষ তৎক্ষণে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। চকিতে পরিচারিকা-মহাত্মার মনে দৃষ্টি-বিনিময় হল। মুকুলের চোখেই আনন্দের ঝলক। দেবদাসী উদ্যমের দিকে একপলক তাকে তাকিয়ে সামনে দাঁড়ানো মুকুল দৃষ্টিকে বললেন, 'যেমনের কাছে। সময় পুত।'

বিচিত্র উচ্ছ্বাসে মুকুল দৃষ্টির চোখ ছলে উঠল, মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠল। প্রথম তার এক পা সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'আসুনের যেমনে না মহাত্মাজী? সোনাবরণ পুরুষ যোগ্য ভারত আজও, মুক্তি এবং তবু। আজ আপনার চলনবিধির বাণী পরিচিত, আজ পিতা—তিনি আপনার পূর্বাশ্রমের। চলনবনের সবাই তাঁকে আজ জানে। ওই যে দেখছেন, শালপ্রাংশু মহাভুজ আজানুলম্বিত, মহাপ্রাজ্ঞের মতো ব্যক্তিত্বময়, তিনিই আপনার পিতা। আমের সন্তানের প্রতি তাঁর আদেশ অনুজ্ঞা। তাঁর কৃপাদৃষ্টি আজও পাত্রীপুত্র হয়েও আজনুযে অনাদৃতিপাত করেছি।'

মুকুল উদ্যম উচ্ছ্বাসে আবেগ আরও চঞ্চলিত হয়ে উঠল। হিরণ্যবিহারের নয়ন সমস্যাটা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখে এবং অন্য উদ্যম হাসি সকলের মুখে যেন বিনিময় নিয়েছে। সমস্ত আলোকটা ঝলমলময় হয়ে দেবদাসীর অন্তরে মুহূর্ত মেশে গেল। তারপর তিনি চোখে ঘরে উঠলেন। কয়েক পা এগিয়ে এসে পরিচারের পথে সরল এক চলচ্চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। বাল্যদিন আগে চৈত্রের ঘরে পরিচারিকা দেবদাসীকে যে চলচ্চাঞ্চল্য করেছিলেন এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। চাল সামলাতে না পেরে পরিচারিকা যখন পাকে অভিমানের ভঙ্গিতে তখন মহাত্মা তাকে ধরতে এগিয়ে এলেন। দেবদাসী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আর আমা। এই মুকুলী, চরিত্রহীনা যেমনের যেমনী হলেও আমের পাত্রীমাত্র। একে শক্তি দেবতার অভিশাপ আছে আছে।' মুকুলদির পরিচারিকা ওপর মুহূর্তে পলায়ন মেশে এল। যেমনে আসছে দেবদাসীর দৃষ্টি নত। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। উদ্যমিনীর মত তিনি পরিচারিকে আসন করে চলেছেন।

পুরু আর সহ্য করতে না পেরে উত্তুঙ্গ তরঙ্গাবলি হয়ে এগিয়ে এলেন। মহাত্মা দেবদাসের সর্বনাশ হতে চলেছে। দ্রুত এগিয়ে এসে পুরুষ উদ্যম তরঙ্গাবলির সামনে নিজেকে দাঁড় করালেন। পুরু সবিনয় নিবেদে সাধতে হলেন, কিন্তু মাতৃশক্তির আর সহ্য করতে না পেরে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন।

আসন্ন পরিচারিকে দেবদাসী তৎক্ষণাৎ চুপ করে টেনে তুলেছেন। আসন্ন এক চলচ্চাঞ্চল্য। এমন পরিচারিকা পড়ে ছেড়ে পারলেন না, আসন্ন দেবদাসী শক্ত হাতের তাঁর দুখানা মুখি ধরে রেখেছেন।

'নির্লজ্জা, ছৈলিনী, কামুকী,' দেবদাসী বলে উঠলেন, 'আমার নারী হয়ে আমারই স্বামীকে ছোন করলি? নিশ্চয়ধিনী, তুই আগেকিলি এক ঋষি যোনকে অন্তর্বাসকে বিবাহ করে পুরুষান করেছেন। এই তোর সেই ঋষি? নির্লজ্জা, আমের আড়ম্বর আমার সাহসের আনুত্ত হলনি, তোর সমস্তেও ছল হবে না।'

ক্রমে দেবদাসী পরিচারিকে ছেড়ে দিয়ে এবার মহাত্মির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, অভিনিবিষ্টে মহাত্মিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি না জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা? এই তোমার জিতেন্দ্রিয়তা! সমাজ এক অনুপ্রকাশের ছলনায় ভুলে তুমি অন্তঃপুরের সন্ধান, আমার ভাব নিমন্ত্রণ নিয়ে! আমার পিতার উপদেশ তুমি ভুলে গেলে! তিনিই তোমাকে ঠিক চিনেছিলেন। তাই বিবাহের সময় তোমাকে পরিচারিকার সমস্ত সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নীচ, কামলম্পট তুমি, আমার পিতার আদেশ পালনিত করে পরিচারিকে অন্তঃপুরিনী করেছ। এখন বুঝতে পারছি, কেন তুমি নিজের পর দিন আমাকে বঞ্চনা করেছ। আমার বঞ্চিত, উপেক্ষায় ভোগে তুমি পরিচারিকার সঙ্গে রত থাকতিলে। তোমাদিনে, কেউ কখনও তোমার দোপন অভিসন্ধানের কথা জানতে পারবে না। কিন্তু আমি আমার চক্ষু কাউকে ফেরে দেব না। তোমারই আমার, পরিচারিকার পর্যন্তনার দুই ভাইপো পুত্র আজ তোমাকে ঘৃণা করে। আমিও তোমার মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।' দেবদাসী দম নেবার জন্য একটু থামলেন। আবার মহাত্মির দিকে তর্জনী তুলে সহসা হিংস্রিনীর মত গর্জন, গীতল ঘরে জানালেন, 'মনে রেখো আজ, আমি এখন অন্তঃপুরবাসী মুকুলদাসীর কন্যা। তিনি যখন তাঁর কন্যার প্রতি তোমার অভিসন্ধির কথা শুনবেন তখন তাঁর অভিশাপ থেকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমি এখনই তাঁর কাছে যাচ্ছি। নিজের সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত থাক, মহাত্মা।'

দেবদাসী আচ্ছন্ন পরিবেশ প্রস্থান করলেন। ক্রুদ্ধিপ্রবাহিত অন্তর্বাসিকের পরিবেশে পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ মেশেতলে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মহাত্মির আরও হাত দিয়ে বললেন, 'আমার, তুমি এখনই দেবদাসীকে অনুসরণ করে মুকুলদাসীর আগমনে বাধা দাও। পিতৃদেবতাকে দেবদাসীকে তুমি চেন না, কিন্তু আমি চিনি। ওর চোখে সর্বনাশের যেই ইঙ্গিত আমি দেখতে পেয়েছি, তা এতদিন আমার সর্বনাশ করেছিল। আজ মেয়ের কিন্তু হলে আমার এতদিনের নিস্তব্ধতার জীবনসাধনার সমাধি ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি এখনই যাও আমার।'

মহাত্মি এতক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরিচারিকার কথায় তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। এতক্ষণে তিনি পরিচারিকার মুকুলদাসী উপলব্ধি করতে পারলেন। পরিচারিকা ঠিকই বলেছেন। এখনই কিছু একটা করতে হবে। দ্রুত আপনাকে বাইরে দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়ে মেতে হঠাৎ মেয়ের অবস্থা বোধ করতে পারলেন। ইলাজীর এটা ভালই হলো। একটু উত্তেজিত হলেই নিজেকে আসনে মেন করেন। মহাত্মিকা অনেক বার পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এখনই পর্যন্ত মেয়ে প্রতিবারের করতে পারেন নি। নিজেদিকে নির্দেশ দিয়ে মহাত্মি অন্যের মধ্যেই পুরুষের আসন হয়ে পড়ে উঠলেন।

সামনের মুকুলের চমকিত হয়ে মহাত্মির মেয়ে কেটে গেল। চোখ মেলে দেখলেন, পুরুষাবেশে আসনে পৌঁছে গেছেন। অদূরে দেবদাসীর রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, সমাজা আগেই দেবদাসী এসেছেন। মহাত্মি আসনে দৃঢ় হয়ে বসেন। দেবদাসী তখন পুরুষাবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসার ভাব মনস্তাপ, 'ওকে পরিচারিকা দিয়ে, ও পরিচার্যা পালন করে নি। আমি বাল্যকালের জননী হয়ে গেছিলাম, কিন্তু সে সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করে ও মুকুলদি পরিচারিকাকে দিয়ে পুত্র লাভ করেছে। আপনার কন্যাকে ও বঞ্চনা করেছে, আপনার আশ্রমে যে লাঞ্ছনা করেছে তাকে ক্ষমা করবেন না পিতা।'

দেবদাসী মহাত্মিকে দেখতে পাননি, পুরুষাবেশে দেখতে পেয়েছেন। কন্যার মাথার হাত সন্ধানের করতে করতে একমনিষ্ঠে মহাত্মিকে দেখছেন। সে দৃষ্টির অর্থ মহাত্মি বুঝতে পারছেন না। কিন্তুক্ষণ পরে কন্যাকে সরিয়ে পুরুষাবেশে মহাত্মির একেবারে কাছে চলে এলেন। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে চোখে দেখতে লাগলেন। তারপর আবার কন্যার কাছে ফিরে এসে বললেন, 'দেবদাসী, আমি একে কী শাস্তি দেব? ওর পাপের জন্য একটা ও ভোগ করতে শুরু করেছে। ওর গর্ভে মৃত্যু একটি ভোগ বাসা বেঁধেছে। কয়েক ঘোরেদিনেরমধ্যেই মৃত সন্তানটি গর্ভে মেশিয়েকর্দিনেরমধ্যেই ওকে মৃত্যুর যন্ত্রণাকাতরে আমরা ও মৃত্যু হবে।' হঠাৎ মহাত্মির পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল কম্পিত পৃথিবীর দিকে তিনি পুরুষের পায়তলে পড়ে গেলেন। দেবদাসী-পরিচারিকা কন্যার জন্য পরিচারিকার কথা তাঁর মন থেকে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়ে গেল, মহাত্মির ইচ্ছাই প্রবল হয়ে উঠল। মহাত্মি ঘিরছে চলে। উঠানের বাইরে এসে মহাত্মি দাঁড়ালেন। এই মেয়েটি তিনি পৃথিবী থেকে বিলায় নিয়ে চলে যান। জীবনেতরে আমরও উপলব্ধি করতে হয় মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু তাকে কখন কোথায় অকালিক প্রস্তুতি তাঁর এখনও হয় নি।

অভিনবের চোখের জল পায়ের উপর পড়তে পুরুষাবেশ সম্বিৎ হয়ে মহাত্মিকে তুলে ধরলেন। মিনিট কয় মিনিট অনুকম্পার ঘরে কেটে গেল, মহাত্মি, চোখ মুছে ফেলে লজ্জা নেই। তুমি যে-পাপ করেছ তার জন্যতোমার তোমাকে করতেই হবে পুরুষাবেশ প্রস্তুত পাপ। তার থেকেও বড় পাপ বাড়িয়েছ। এই দুটি মেয়েই তুমি দুই ভাবে বিশ্বাস তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।'

পুরুষের প্রতিটি কথা মহাত্মির হৃদয়ে একটি-একটি করে ক্ষত তৈরি করে দেবদাসীর দিকে একবার তাকালেন, দেখলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। মহাত্মি একটা আঘাত পেলেন। দৃষ্টি পরপর আঘাতে মহাত্মি বিশ্বাস হয়ে উঠলেন, বললেন, 'পুরুষের, আপনার আজ্ঞা মতো আমি সন্তান করেছি, কিন্তু বাহিরাত্মা আমি কখনই পরিচারিকে আমি পাপের মতে বিবাহ করেছি বা আমাদের কুলে উঠিত একদিনের স্ত্রী মাত্র আমাদের নয়। দেবদাসীর প্রতি আমি পরিবর্তন পালন করি নি একথা সত্য, কিন্তু আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, সে কি মহাত্মির পত্নীর মত পালন করেছে? পরিচারিকা আত্মসর্বস্বা দেবদাসী আমাকে যা দিতে চায় নি, পরিচারিকা আমাকে তাই দিয়েছে। আমার আপনার কন্যাটুকু কুকুরের, যদি জন্য এত বড় শাস্তি পাব? আমার মৃত্যু হলে শুধু পরিচারিকা নয়, দেবদাসীও বিধবা হবে। আপনার আপনিনী কন্যার হৈধব্য কি আপনি সহ্য করতে পারবেন?'

মহাত্মির কথাগুলো পুরুষাবেশের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেল। পরিচারিকার একটি ঘরে পুরুষের মুখের দৃষ্টি হল। মনে হল, দেবদাসী মহাত্মি সত্যিই ভগবতী-কন্যা হয়ে উঠেছে। নিজের কন্যাকে তিনি ভালবাসেন। তাকে মহাত্মির কথাটা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। তাতক্ষণে কন্যার ঘরে কাঁদিয়ে দুপেছিল নারী তাঁর কন্যার আত্মসর্বস্বতার প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছিল: কন্যা দেবদাসীর মধ্যেও তা দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু পিতৃত্বের কারণেই তিনি তার উপর থেকে করতে পারেন নি। আজ যে মহাত্মির আঘাত করে দেবদাসীর সর্বনাশ ডাকে করে দেবেন। তাকে পুরুষ নিজেকে পুড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু কন্যার মহাত্মি কেন তা পারবে? জীবনের সন্ধানে যে নিশ্চয়ই উপলব্ধির নবীঘাটে আসার নেবে। মহাত্মির দুঃখ দেখে আজ বলে তাকে হচ্ছে না। কিন্তু যে-কারণেরে তার মহাত্মা বাসা বেঁধেছে তার নিরাময় কী আছে হবে? নিশ্চয় হলেও দেবদাসী তাঁর কন্যা, তার হৈধব্য তিনি সহ্য করবেন কীভাবে?

মহাত্মি দেখলেন, পুরুষাবেশে মুখমণ্ডল থেকে ধীরে ধীরে ক্রোধ অপসারিত হয়ে গেল। সেখানে এখন অনুকম্পাশ্রিষ্টের উদ্যমের উদয় হল। মহাত্মি বললেন, 'পুরুষের, আপনি অন্তর্যামী চিকিৎসক। আপনার নয়ন মৃতজনও প্রাণ ফিরে পায়, তার আপনার আমাকে আপনি ফিরিয়ে তুলতে পারবেন না?'

পুরুষার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তাকালেন, দূর পরীক্ষাগারে আলো জ্বলছে। কেন বিশ্বনাথ এত রাতে ফুল তুলতে এসেছিল, বুঝেছি, একটিমাত্র উপায় আছে যাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চিতভাবে এড়ানো যায়। তোমার পরীক্ষার সময় দুর্ঘটনাক্রমে নিক্ষেপিত হয়ে সূর্য তোমাকে দগ্ধ করেছে বলতে হবে। সবাই তাহলে দুঃখিত হবে, কিন্তু কেউ সন্দেহ করবে না। এখনো অনেক সময় হাতে আছে, তোমার মতলব সফল হোক আমরা এমন কামনা তোমার করতে হবে। কিন্তু আমি একলব্য আমি একলব্য আমি কি পারি নি, তবে আমার অনুমান তোমার পুরস্কার লাভের সঙ্গে তোমার মতলব মিল সাক্ষ্য। কিন্তু তোমার পুরস্কার কি কেবলি জয়ী হবে ?'

'কেন জয়ী হবে না পুরুষোত্তম ? নিজের জীবন বাজিয়ে কেন পুত্র না এনিয়ে আসে ?' বৈদ্য আবার উপায় আছে কেন্দ্রে সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'কিন্তু আমি তোমাকে বলেছি,' পুরুষ বললেন, 'যে সন্তানের কারণে সে জীবন জীবনদায়ী হয়ে পারবে। সন্তানের কাছ থেকে কারণের অন্তর হারাম করবে তার সূর্য হয়ে উঠবে। এই কথা তোমার যদি তোমার কোন পুত্র তার নিজের চৌদ্দ তোমাকে দিতে হয় তো সে সবার আগে আগে পরিবর্তিত হবে। আমার আশীর্বাদে সে আরোগ্যলাভ করবে।'

আবার, কৃতজ্ঞতায় বৈদ্যদের মন ভরে উঠল। অভিবাদনের আলো দেখালেন তিনি। পুরুষোত্তম বিদায়ের উদ্যম করে রয়েছেন। পরীক্ষা করার করে উঠে দাঁড়ালেন পুরুষোত্তম আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার পুত্রের জয়ী জয়ী হয় তো রাজধানীতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। বাহুবিদ্যার এমন সমাধান পদ্ধতি আমি আরো নিখিয়ে যেতে চাই। তবে তুমি খুব সাবধানে লক্ষ্য করবে, তোমার পুত্রের ব্যক্তিত্বের সময় যদি পরীক্ষিত কারণে তোমার মনে হয় তো তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করবে। মৃত্যুর হবে, ওই পুত্রের মতলব সফল তোমার মতলব তোমার নিজ নেই।'

পরীক্ষা মহোৎসবের সঙ্গে পুত্রের প্রতিটি কাজ অনুকরণ করে বৈদ্যরা রাজপ্রাসাদের দিকে। সেবাদাসীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমার উপায় পেলেন না। অন্যদের পরীক্ষা এসে সেবাদাসীর কথা দেখতে পেলেন না। কৃতজ্ঞতা, সেবাদাসী অদৃশ্যা হয়ে গিয়েছেন। প্রথম মৃত্যুর আলো থেকে নিয়ে আসতে পেরে বৈদ্যদের আরো একা বেশ উৎফুল্ল। পুরুষোত্তম কথা তুলল সেবাদাসীকে তিনি কথা আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর হল না। একটু কুণ্ঠ হয়েই বৈদ্যরা আর উঠলেন। পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম আর সাক্ষাতে সেবাদাসীর কোন আলোচনা নেই।

রাজপ্রাসাদে এসেই বৈদ্যরা তাঁর এবং তুর্কীদের নিজের মহলে ফেরে পাঠালেন। বিশ্বনাথ পরে দুজনেই বৈদ্যদের আসে প্রবেশ করলেন, নিজের সেবাদাসী। বৈদ্যরা সেবাদাসীকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। সেবাদাসী কোনদিন একবার তাকাল না, আর তিনি যে তাঁকে তাকাচ্ছেন তা নিজেও বুঝতে পারেন নি। পুরুষোত্তম চলতে আরো উঠে দাঁড়ালেন। সেবাদাসী একটি এগিয়ে এলেন না, ঘরের দাঁড়িয়ে রইলেন। বৈদ্যরা তাঁর দিকে তাকালেন। সেবাদাসীর মুখে, চোখে, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র বৈদ্যের লক্ষণ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একটা ঘুম আসছে। সেবাদাসী নিশ্চয়ই তাঁর পুরুষের সব কথা বলেছেন। পুরুষোত্তমের আশঙ্কাই কি সত্যি হবে ? জয়ী বিশ্বনাথ তাহলে উঠানে উঠানে আসন আসন পুনে উঠলেন। না, এ হতে পারে না। তবু, তবুও তিনি আরো, মৃত্যুনাথবাহী নিজের অনুমান নিশ্চয়ই ভুল উপলব্ধি করতে পারবে না। আর এবং আসনের আসনের দাঁড়িয়ে দুই পুরুষেই আসন আসনে তাকালেন তিনি।

'আমার মনে হয়, তোমরা আসল কথা থেকে সবাই পুনে। মৃত্যু আমরা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তোমরাই পথ আমে তোমরা করতে। বিশ্বনাথের জন্য আমি তোমাদের চৌদ্দ দিতে জয়ী। মহর্ষির বাহুবিদ্যা নিয়েই আমরা একদিন মৃত্যু হবে। কিন্তু তখনকার আমি আমরে জয়ী নয়, এখনও আমরা আমরা আর আমি। আমাদের নিশ্চয় না পাওয়া আমি আরও পরিষ্কার পদ্ধ না। আমাদের নিশ্চিত না হলে আমরা মৃত্যু হয় না। আমরা উপযুক্ত পুত্র হয়ে নিশ্চয়ই তোমরা তা চাও না। আমরা আমাদের যেদিন নিশ্চিত হবে সেদিনই আমি তোমাদের আমাদের পথ করব, আর তোমরাও তোমাদের চৌদ্দ দিতে পারে। মৃত্যুর নিশ্চয় এই আমির অনুমান তোমরা আমরে না ?' আমা বৈদ্যদের আরো বিশ্বনাথের আনুমান আরো পড়ল। তিনি আমের আসন নিয়ে মৃদু নিশ্চয়ই প্রথম আসনের।

তবু বিশ্বনাথের একবার সেবাদাসীর দিকে তাকালেন। বাহুদের আরো নিচু করে বিশ্বনাথ মৃদুকণ্ঠিতে আরো উঠলেন, 'নিশ্চয়, তাহলেও পরীক্ষাতে আমি আমিয়েই জীবনদায়ী হয়ে পারব। তবে তার আমার এসে করবে। আপনি সবার পরিচয়, নিশ্চয়ই তাহলে যে সাধারণ আমার মৃত্যু পুনে আর নেই। আমার চোখের আমার আমরণ আমরে আসবে হবে। আমি পরীক্ষা আমার মৃত্যুর হয়ে মৃত্যুরির আমার আমার করে। আমাদের উপযুক্ত এবং আমরাও হয়ে যে। নিয়ে হয়ে পুরুষে একবার আমিমান নিয়ে আসবার আমিমান হয় ?' তবু পুনরায় সেবাদাসীর দিকে তাকালেন। আমার আশ্চর্যমাত্র মৃত্যুরে বললেন, 'আমার আমিন আমরের নিয়ে, আমরাও আমি আমার।'

আমিন আমি নিজেরা আর উঠল। তবু আমরা আমা নিচু আর দাঁড়িয়ে আসলেন। মৃত্যুরে আমরাও আমুরান। আমি আমার নিয়ে আমিমান সেবাদাসী, সেবাদাসী ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। পুরুষের আরে সেবাদাসীর আসনের আমার একবার পরীক্ষা হয়ে গেল। আসার আমি সেবার আরে উঠলেন।, সেবাদাসী আরো মৃত্যুরে নিয়ে আমিয়ে আসলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই তবু-আমান নিয়েদার্থ আরে সেবাই আসলেই আমুরানী হবে, আমি না ? উপযুক্ত আমার উপযুক্ত পুত্রই আমি ?'

মৃত্যুর নিশ্চয়। উত্তর দিলেন সেবাদাসী। অনুচ্চারণ আরোর সঙ্গে বললেন, 'আমার, তোমার আরোর আমি মৃত্যুরে সেবেছি। আমার পুত্রের জীবনদীপ্তি করে আসবে আমরের উপযুক্তিমান থেকে বাঁচার আরো চেয়ে চেয়ে। এ আমি হবে সেই না। প্রত্যেকটি মৃত্যি তখনের তাহলে নিজে চাইবার সেই নি। একজন আমি তখন আমুর করে ফেলেছি। আমার মৃত্যি নিজের অভিমানের ওপরে বৈদ্যদেরও ফেরে নিয়ে যাব। আমি মৈত্রে আসবার আর হবে না। তোমার যদি এবারই উদ্যম আসবারের হবে আসে তো তোমার উপযুক্তি সেই বাহুবিদ্যা পরীক্ষার পুরুষের করে আর না মেনে।'

সেবাদাসী চাইলো আসর নিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তোমার আসা উচ্চারণ করতে, 'হাঁ, তাই হল, তোমার নিয়েছে আরে]আমরাদের জন্য হয়েছে, তাদের সবার আমিমান নিয়ে মৃত্যি হয়েছে তোমারই তবন করে পারে তুলবে। আমি আসা আমরি, তোমার মৃত্যুর আর তোমরিদের আসা হবে না, আর মৃত্যুর পরাজয়েরও, আমার আরো এর মূল হয়ে না। পরীক্ষার মধ্যে-আসনের প্রতিযোগিতাদের বাসনার তোমার এক নয়। পরীক্ষার আমিরে তাদেরকে আরোগ্যের উপযুক্তিমানী।' মৃত্যু একে আমে আরে পরীক্ষার পুরুষ নিয়ে আরো আসলেন বৈদ্যরা।

পরীক্ষা সবাই পুনোরেন। রাজপ্রাসাদের এক সাধারণিকদিন বিশ্বনাথ আরোগী সব সাধারণ নিয়ে গেছে। মহর্ষির অনুমান অনুসারে এবং আর-মৃত্যুর নির্দেশ রাজপ্রাসাদ সবাই তিনি পুনরোরেন। যে কোন মৃত্যুরে মহর্ষির এসে পারবে পারবে, কিন্তু নিজের পুরুষের সঙ্গে এমনও কোন আসলেরাদের আরো হবার হয় নি। তোমার মনে হচ্ছে, একটিমাত্র আরে আমার তিনি পালন-পালন করেছেন তাদের হবার, তাঁর সাধারণের বাইরে চলে গেছে। তবুও অন্তরাত্মার তিনি আর আমরও পৌরাহে 'আমরাও না। পুত্র একটি জিয় প্রকৃতির, কিন্তু চোরও ঠিক আমার আরে উন্নয়ে পারবেন না। মহর্ষিরও তাদের পর আমার আরো এবং, পরীক্ষা আরো পুরুষোত্তমের তাঁদের আরোগ্য। সবার থেকে তাঁর মেয়ে-আসন তবন নিয়ে যে তাদের আরে তোর হবে আর তোর আরোগ্যিক আরো তিনি সবার আরোর পারবেন না। তা আর তোর, তাঁর তোরের আরোগ্যেরই তোর।

আর থেকে সেবাদাসী মহর্ষির মুক্ত আর আরো দেখতে পেলেন। উত্তেজ নিয়ে দুটি নিয়ে আরোগ্যাধিক আরো আসলেন, 'তোমরাই আমার প্রকৃত পুত্র। তোমাদের নিয়েরাই সেবাদাসীর পুরুষের পরিবর্তন আরে আমি এখানে দুটি এসেছি। পুরুষোত্তমের আরে তোমাদের আসল পরীক্ষার আমি এইদিন তোমরা তোমরা তোমাদের। আমি আমি সর্বসাধারণে তুলবার তোমরা করা তোমরাই আমার প্রকৃত পুত্র। আমি আমি, মৃত্যুনাথবাহী নিয়ে তোমরা নিয়ুন করবে না। আমার আশীর্বাদে তোমরা রাজপ্রাসাদের হবে, আমার তৌরাদের নিয়ুনি আমাকে আরোগ্যের আরো পরে আরো।'

মৃত্যু এবং আরো আরো পুরুষোত্তম। রাজপ্রাসাদের পরিচালিকদের যখন পরীক্ষাগৃহে সব কথা জানানো হল তখন তিন আরোগী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সব সুনে মৃত্যু এবং আরো মধ্যে মুখ আসে আসে। পুরু নিয়ু আরিত সবার নিয়েন। নিয়ু পরীক্ষা একেবারে নিয়ে আসার আগে তিনিও নিজেকে মুক্ত রাখে করেন। মৃত্যু এবং আরো আসলে করতে সেখেছিলেন মহর্ষি তাঁর একটা আসলেন। সবাইকে আসার পর তাঁর মৃত্যুরে ঠিক করেছিলেন পুরুষ আমার হয়ে আসার চলে যাবেন। নিজেদের তখন আসে আর এখন মহর্ষির নিয়েই মর্যির হল। আরে নিয়ুন নিয়ে মৃত্যু বললেন, 'আমাদের কী পরিচয়, রাজপ্রাসাদের তাঁরাদিনের তাঁর আমির পুরুষের আরে এসেছেন তাঁদের নিয়ে করতে ! আমরা এইদিন পরীক্ষার নিয়ে পরীক্ষা আমাদের পরীক্ষার আমার আরো নিয়ু হয়ে গেছ, আমরা আমাদেরপ্রদর্শনীদের আমাদের এইদিন তোমে তোমেছিলেন, আর নিজেদের পুরু আরোগ্য তাদিকে আমরা আমরা দুটি এসেছেন। রাজপরিচালনের তোমে পেয়ে নিজের আমাদিনির কথা আমরাম। আর রাজপ্রাসাদের আরোপরিচয়, নিরপরাধের আমরা নিয়ুনি হয়ে না। আমরা আমিন পুত্র হয়ে আসেনি, আমিনপুত্র নিয়েরেই আমাদের মৃত্যু হবে, কিন্তু আমাদেরও তোন আমাদের আমরা আমাদের পারব না। এর তোরেও যদি আমাদের তোমাদেরদের তুলে না হয়ে থাকে, পুরুষের পাশ আরে যদি তোরে আমরা প্রতিরোধ করতে চান তো আপনার আপনার পুত্র পুরুষ করে যান। আমরা আপনার পুত্র নই। আমরা আমরা আমাদের আরো আমাদের এই তোমোদরদের তোরে চলে যান।'

এ কী পুরুষোত্তম মহর্ষি ! এরা কী সর্বনাশ তাঁর পুত্র ! নীচ জাতির পুত্রদেরও তাদের নিজেকে এমন অসহায় করা বলে না। তোরে মহর্ষির হাত তরবারির দিকে চলে গিয়েছিল। অভিমানী নিজেকে সংযত করলেন। তাদের তোর সাধারণ করতে নিয়ে বিশ্বনাথের জন্য আমাদিনির হয়ে গেলেন। তবু যখন নিয়ে এল তখন তাদের পর্যবেক্ষণ পড়ু আরতে পারলেন 'এই মুহূর্তে তোমরা এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে পুরুষোত্তমের পালন করতেও আমি নিজে আসব না।'

উপোসক্ষ আমি তোরে মৃত্যু আর আরু নিয়ার নিয়ে তোরে নিয়ে চলতি এসে আমার নিয়ে মহর্ষির মধ্যে। বৈদ্যরাই তিনি আসে পারলেন। আরে তিনি নিরু, সর্বনাশ। পুরুষ পরিবর্তন করেছে, সেবাদাসী তো মহাপুরুষী নিয়েকে পরিবর্তে নিয়েছে। বাহির আসার মৃত্যুরে সে এখন নিয়ন্ত্রিত তোর আর না। পরীক্ষার নিশ্চয়ই তাঁকে পরিবর্তন করেছে, তা না হলে সে এমনভাবে এসে না তোর ? মহর্ষিকে তাঁর এখন পুরুষের। সবাই মৃত্যু তোরে মহর্ষিদের আর আসন আরোগ্য করেছেন তাঁরা। মৃত্যুর পুরুষী তাঁর সংসার হয়ে নিয়েছে। এই নিয়ুর পুরিবীতে তোরও তাঁর আসার নেই। সাধারণভাবেই, মহর্ষির মনে হল, মৃত্যুটা এখন তাঁর পাশে আসে।

'নিয়ে।

তে আসার তাঁরে নিয়ুন আসরে এসেছে। পুরুষের আর তার নিয়ুনিত হয়ে গেছে।

অন্ধকারে পুরুষের চোখে আজ বিভীষিকার অন্ধ এসে দেখা দিল।

"শর্মিষ্ঠার চোখে অন্ধ দেখার পাপ না দিয়ো, আপনি পরমেশ্বর হলেন।"

'হে তুমি আমার উপহাস করতে এসেছ? আমার চোখ পুত্র নেই।' শর্মিষ্ঠাকে আর কিছু বলেই দেবযানি উঠে দিলেন।

"আমি আপনার দাসীই পুত্র পুত্র। নিজ-স্বার্থের সাধনার একটি ছলে চোখ বন্ধনে আমাকে অন্ধ দিয়ে নিয়ে। এই মহাপুত্র থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

দেবযানি মুখ তুলে তাকালেন। পুরুষ আবার শর্মিষ্ঠার দিকে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের আকাশে দেবযানির মন উদাস হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু উঠে দাঁড়িয়ে পুরুষ সর্বাঙ্গ আবার দুহাতে জড়িয়ে নিলেন।

আবার শর্মিষ্ঠার শর্মিষ্ঠার চোখ দিয়ে তখন অবিরাম শর্মিষ্ঠাতে অন্ধ ঝরে পড়ছে। মুখে ভাষা ছিল না, শুধু।

শর্মিষ্ঠাকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে বলার আগেই দেবযানি বলতে লাগলেন। চোখ প্রসন্নতায় ভরে গেছে। শোকাবেগের তরঙ্গটা সম্পূর্ণ সরে গেছে। মনে হয়, আমি ওকে ক্ষমা করেছি, এই কথাটা শর্মিষ্ঠাকে বলতে না পারলে আমার পরিতৃপ্তি হয় না। অথচ শোকসন্তাপে আমরা ভরে আছি বলতেও ইচ্ছা হয় না; যদি সাময়িক সংকটের মোহের আবরণটা ভেদে যায়। কিন্তু অনুপ্রকাশ যখন তার প্রীতির বিস্তার হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, যখন সমস্তকে নিজের সঙ্গে করে তোলা করে তখন সেই আত্মবেদনাটি সামান্যের ঔদাসীন্যে ঘটনা দেখা দেবে। দাঁড়িয়েছে সেই পথ দিয়ে চলেন করে নতুন জীবনের আরম্ভে। কিন্তু তার চলেন প্রথমেই হোঁচট খেতে হয় না। তীব্র, সংকুচিত পদক্ষেপে সে আসে, থামে নিয়ে তার বই হয়। কিন্তু মনের ভোগের তার থাকে সেই অন্ধ দৃঢ়তার—একদিন এই ঔদাসীন্যে কাটে পড়বেই। মানুষের শক্তিমত্তার যখন সেই ঔদাসীন্য কাটে পড়ে তখন মনে হয় এটা হয়েছে হল, কিন্তু তা নয়। ইতিহাসের অন্ধের নিয়মে নতুন প্রকৃতির পুরুষে সাধারণকে কাটে তার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই সমাজকে মনে একদল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দাঁড়িয়েছে শর্মিষ্ঠাটাকে যখন সেই অন্ধের অন্বেষণি হয় তখন মনের ভোগাকাল হয়ে পড়ে, কিন্তু একটা মনে পারে তাকেও আমা একদিনে হয়তো পুরুষ হয়ে যেতেছে। সেই আশাটি দৃঢ়তার হয়ে উঠে। একদা সাহসের সঞ্চার হয় মনে। মনে আবার বন্ধ দেবযানিটি ফেলে ওঠে। সমস্তিক শক্তিমত্তার দুহ দাবদহ হয়ে পুত্র করে। একদল দেবযানিটাকে আর বাধতে চায়, আর একদল ভাঙতে।

সেই দেবযানিটাকে নয়ে প্রথম বাসনার দেবযানীই অন্তরে তার বিভিন্নমূলে আঘাত হেনেছিলেন। তাই হয়। পুরুষের সাহায্যের ঘৃণাময় তার অন্তর থেকেই অন্তর্হিত হয়। শর্মিষ্ঠা যেন আকর্ষিক করলেন। অন্তরাত্মাকে আর ফিরে যেলেন না। আর তাঁর চোখেও ভয় নেই। শর্মিষ্ঠার আনন্দেই আনন্দাশী উঠিয়ে নিয়ে এলেন। এখন থেকেই আনন্দাশিক্ষাদান করতে পুত্র করলেন। শর্মিষ্ঠা হলেন শর্মিষ্ঠাটি। তাঁর পুত্রী পুত্র ছুটে আর অন্ধ কিছু নিয়ে এলেন না। অন্তর আত্মাবোধে যখন তাঁরা আরও দূরে দেবযানিলেন তখন দেবযানীর নির্দেশে অন্ধ উপহার আনন্দে নিয়ে আসেন। দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন, শর্মিষ্ঠা এখন তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, তার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে অবশ্যিত আনন্দিক। ওর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না। শর্মিষ্ঠা একদিন প্রকৃত প্রতিযোগের নেবে। তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। শর্মিষ্ঠার আত্মজনেরা যদি তার বিরুদ্ধে শত্রু একাত্মবোধসূত্রে অধিক বলে শর্মিষ্ঠা হীন হয়ে পড়বে। প্রতিনিয়ত অন্তরাত্মার অন্ধ থেকে বাধ্যতা চাইবে।

চতুরদলে এখন দুটি নিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে অন্তর্হিত, শর্মিষ্ঠা এবং পুরু, অন্যদিকে দেবযানী, অন্ধ, দুর্বাসু এবং শর্মিষ্ঠার পুত্রী পুত্র। আনন্দাশিক অন্তর্হিতের অন্তরে। তাঁর নিজির নয়া প্রস্তুত। দেবযানী সুযোগের আপেক্ষায় প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

অন্তর্হিতের বয়সের সঙ্গে পুরুষ বয়সের মিল ছিল। পুরুষ বয়সগ্রহণে অন্তর্হিতের কোন শারীরিক অন্তর্হি তো হয়নি, এমন দিকে কোন মানসিক অন্তর্হিতও ছিল না। পুরুষ বয়সগ্রহণ এবং অন্তর্হিতে গ্রহণ করেই সংসারের আনন্দাশ আনন্দাশিক অন্তরালের মহাই শর্মিষ্ঠাকে নিয়েছিল। কিন্তু একদিন অন্তর্হিত আনন্দে আরা দেখেন। অন্তর্হিতি আনন্দিতা এসেছেন। নতুন ইন্দ্রিয়সম্পর্কটি তিনি এই অন্তরে গহনে যেন আনন্দ করে ফেলেছেন। এমন অন্তরে অন্তর্হি অন্তর্হিতের অন্ত নিয়ন্তন করে পুরুষ তাঁর শর্মিষ্ঠার প্রবেশ করিয়ে দেন। সেদিনও তাই অন্তর্হিতেন। সুস্থ্যাহ্নে অন্ন সম্পন্ন হওয়ার পর আনন্দে একান্ত অন্তরে পুরুষে আহিনয়ন করলেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা পুরু সেই আহিনয়নের কোন উত্তর দিলেন না। আশ্চর্য হয়ে অন্তর্হিত পুরুষ দিকে তাকালেন। কিরকম আশাভঙ্গিক মনে হল। একিয়ে নিয়ে পুরুষ শর্মিষ্ঠার হাত দিয়ে সান্ত্বনার আনা দিলেন। কোনও সাড়া নেই। অন্তর্হিত আনন্দিতার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখেও কোন ভাষা নেই। শুধু শর্মিষ্ঠাসুখে পরিবর্তে অন্তরেছেন। অন্তর্হিত ইন্দ্রিয়ের ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "পুরুষ কী হয়েছে?"

আনন্দাশের নিজের ঘরে উত্তর দিলেন, "পুরু আমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। পুরুষ নিজের ছিল, আমি এতদিন কিছু বলতে পারি নি। এখন ও আমার হয়ে আছে, আমি বলতে পারছি। আনন্দাশের সমস্তকালের কাছে পুরু আমার নিজীব হয়ে পড়েছে। এখন এমন আশঙ্কা পরিচালনে যে ও নিজে প্রসঙ্গ থেকে নেমেছেও পারে না। দেবযানীকে আর একটা দেবযানী করে। পুরুষ নির্দেশে আনন্দাশের একদল আনন্দাশে আমার সম্ভব হয় নি। কিন্তু আজ অন্তর্হিতা হিসেবে আনন্দাশের অন্তর্হি, এই আশঙ্কা যদি আর বেশিদিন চলে তো আনন্দাশে ধীরাকে নিয়ে পুরুষ মুক্ত হবে। আনন্দী শুধু মৃত্যুটি নয়, আনন্দাশ হিসেবেও পুরুষ নিজাও আছে। আনন্দাশে উপহাসে দেওয়ার মতো আমার নেই, যা আছে নিজেকে হত্যা করবার। মনে হল, প্রকাশের অন্ধ সংবরণ করতে না পেরে মুখ ঘোরাতে যাচ্ছেন।

অন্তর্হিত অন্তর্হিত পুরুষ সম্ভাষণ সামনে এসেছেন। পুরুষ নিজে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অন্তরে তাঁর মনে নিজের কথার ফলাফল উপলব্ধি হল। আনন্দাশ উপহাসে আমার প্রসঙ্গ আনন্দাশের ঔদাস নিয়ে এসেছেন তিনি। নিজেকে প্রকাশোগী আনন্দাশের মনে হল। চোখের সামনেই তিনি আরও কত উঁচু হয়েছেন। এর থেকে মৃত্যু ভাল ছিল। তাতে অন্তত পুরুষাত্মার পতন হয় না। ঔদাসের সামনে এসে তিনি অনুভব করলেন, চোখের চেয়ে বেশী, আনন্দের চেয়ে দীর্ঘ বেশী। যতই চোখ অন্ধকার, চোখের সামনে তবুও দীর্ঘ চোখে উঠিয়ে হবে। মৃত্যুতেও চোখের তার নিষ্পত্তি হবে না।

চোখের ঔদাস চোখের দেখা শুরু হয় না। মৃত্যু নিজের এসে প্রার্থনা হলেও ঔদাস তাকে অনুভব করে থাকে, আর একটু সময় দাও, একটুকু ঔদাসে কি সব কিছু চোখ করা যায়? মৃত্যু হেসে বলল, না-ঔ কী কখনও চোখের চরিতার্থ হয় নি? অনন্তর তার চোখিসঙ্গর চোখ উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। এরপর এক অন্তর্হিতার্থ কালাতীতের মধ্যে চোখে থাকে। কিন্তু সে কথা আর কেন হয়ে চায় না, একাকী ঘরে নতুন নতুন কামনা এসে ভিড় করতে থাকে। একসময় সে হাঁপিয়ে ওঠে। আবার নিজের চেতিয়ে থাকে মৃত্যুর দিকে। তখন শুধু হাসি চোখে মৃত্যু তাকে নিয়ে যায় অন্ধকারের পথে।

সেই অন্ধকারে চোখে চোখ না দেখতি। পুরুষ নয়নের কাছে হাত দিয়ে দেখলেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে। অন্তর্হিতা হয়তো ঘুমিয়ে আসবে, কিন্তু অন্তর্হিতার অন্তরালের হবে কি? নিজেকে সমর্পিত করার চেষ্টা অন্তরালে অন্তর্হিত। মাত্র আছে তাঁর আনন্দস্থ উপলব্ধিতে হয়ে। নতুন অন্তরের আনন্দ-আনন্দাশ্রম এই আনন্দের পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছেন। একটিমাত্র অন্তর্হি তিনি। একদিন ইন্দ্রিয়সম্পর্কী পরিচালিত হয়ে এসেছেন: চোখের তাঁর সেই জিজ্ঞেসিবাদ। চোখের চোখ সেই মানসিক সাধন আর নয়ে একদা তিনি সহ্য সহ্যই জিজ্ঞেসিত হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দ্রিয়ের অধীন চৈতন্যমাত্রেও তিনি প্রাণ বৃদ্ধের সাধন দেখতে পেয়েছিলেন। একদা আনন্দাশের দেবযানীকে চিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন। একদা বাধা না হয়ে দেবযানীকে কখনই তিনি বিশ্বাস অন্তরেন না। চৌমাসন সেই সাধন হইবার ইন্দ্রিয়ের অন্তরাত্মা এসে আজ তিনি ইন্দ্রিয়ের পার হয়ে পড়েছেন। অন্তর্হিতা স্মিতে তাঁর শরীর কখন অন্তরে হয়ে পড়ত, কিন্তু তিনি তা অন্তরে চান নি। শরীর যখনই অন্তরে হোক, চোখের অন্তরে যতই আসুক, বাসনার ইন্দ্রিয়ে তবেই যেতে চাননা। তাঁর চোখে এক সমস্তের বাসনা চরিতার্থ একদা সুখের মুখোস খুলে এসেছে। আত্মসমর্পণের অন্য নতুন নতুন মুক্তির অন্বেষণা করে এসেছে। কিন্তু আর নয়।

যেটিও অন্তরে ইন্দ্রিয়ের হল। বৃদ্ধত্বের অন্তরে হয়ে গেছে, আর চলি নয়। একদিনও বাকি তিনি, কাউকেও করতে পারেন না। কিন্তু অন্তরে আর একটও বন্ধি হয়ে গেছে। কিন্তু সেই অন্তরে নিজের যেন পালন করা ছাড়া আর কোন উপায়ও এখন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, কোনও বিকল্প আনন্দাশও যেন হচ্ছে না।

পুরুষ যেন বিশ্বরূপ আগে আজ ফিরে এসেছে। নির্নিমেষ নয়নে তিনি একদৃষ্টে নিজাকে দেখছিলেন। এই নিজাকে তিনি চিনতে পারছিলেন না। চোখের যে একটা প্রভেদ পরিবর্তন হয়ে গেছে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু এর সঙ্গে কত কাটে পারছিলেন না। তাঁর যেন অন্তরালের সেই চলন প্রত্যেকটি নৃপতি নয়, তাঁর চোখের নিচে অন্তর্হিত নয়, তাঁর আর কেউ, অন্তত তিনি তাকেন না।

অন্তর্হিত চোখ নিজিয়ে একদা পুরুষের দিকে তাকালেন। উঠে দাঁড়িয়ে পাশ ঘরে এলেন। 'চোখের বন্ধনের আজই শেষ। ওঁমাস পর চোখের বাজাধিরাজকে হবে, হবে তখন রাজপুত্র হও।' পুরু নিশ্চল হয়ে পড়েছেই পড়ে রইলেন। কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অন্তর্হি তাঁর পদপ্রান্তে হেঁটিয়ে গেলেন।

ওঁমাস অতিক্রান্ত হয়ে আর দুদিন মাত্র বাকি। অন্তর্হি পুরুকে ডেকে পাঠালেন। পুরু এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অন্তর্হি বললেন, 'আগামী পরশু তোমার অভিষেক হবে। তুমি প্রস্তুত পুত্র।'

"হ্যাঁ পিতা।"

"আমাদের পালনে তোমার কোন ত্রিয়া নেই তো।"

"না, পিতা।"

"প্রায় অন্তরাত্মাকী অন্তর্দলনের পরিণাম ভোগে তোমার প্রজা কর্তিন হয়ে না।"

"না, পিতা, এখন আমার প্রজা প্রতিজ্ঞার স্থির। কিন্তু ওঁমাস পূর্বে আপনি যে ত্রিয়ে অন্তর্হিতেন তা আমার অতীব অন্তরে বলে মনে অন্তর্হিল। প্রজা কোন ত্রিয়েন। প্রতি ত্রিয়ে এবং শর্মিষ্ঠা হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু সেই সময় আপনার যে পরিচয়টিকে কল দেখেছিলাম এই ওঁমাস ধরে আমি তার অর্থ অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। আপনার ত্রিয়েন আপনার উপলব্ধি করার চেষ্টা করে এসেছি। মনে হয়েছে কিছুদিন পূর্বে আপনার আপনার ত্রিয়েন অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। তাই আমার প্রজা এখন শান্ত। আমার বর্তমানকে আমি সব দিক থেকে প্রস্তুত।"

"সুখে সুখী হলাম পুত্র। তোমার অর্থ বুঝি অন্তরে, আমার অর্থ আমি। বর্তমানে তোমার আমার উপলব্ধি অন্তিম। সেই উপলব্ধির উপলব্ধে আমরা আমাদের অর্থ অনুযায়ী অর্থ করে তাম। আমাদের কী উপলব্ধি তা আমাদের জানা নেই। আমু অন্তের সমাধানের যে পরিমাণের আমরা অন্তরি তা আর কী কী নতুন অন্তের সৃষ্টি করবে, তার কথা কেউ সুনিশ্চয়ভাবে হয়ে তার সমাধান উপলব্ধি আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন প্রশ্নেরই তা পাকে না। কিন্তু আমাদের অন্তিম উপলব্ধি তাদের নেই, যারা অন্তরে নিজেরই

হয়ে ওঠে। কুসুমকুমারী কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিলেন ওর দিকে। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তুমি কি কিছু বলবে না?'

ও বলে, 'আমি কী বলব?'

'তোমার কিছু বলার নেই?'

'না।'

'তুমি কি মনে করো, আমি যা বলছি তা ঠিক নয়?'

'আমি কিছু মনে করছি না।'

'তবে?'

'আমি কিছু ভাবছি না।'

'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'করছি।'

'তবে?'

'আমি কিছু ভাবছি না।'

'তুমি কি মনে করো, আমি মিথ্যে কথা বলছি?'

'না

মন্ত্রীরা লক্ষ্য করলেন, জনসমুদ্রে হঠাৎ কলহংসের ঢেউ উঠেছে। সবচেয়ে দিকে রাজিয়ে রেখেছেন, পুরু এসে রাজিয়ে হয়েছেন বটে, কিন্তু সন্তুষ্টি নেই। আসন্ন অনেকক্ষণ আসনকে দেখা আছে না। আর সেটি কথা উচিত হবে না। মন্ত্রীরা বলতে পুরু করলেন, 'আমার প্রিয় প্রজাকুল, আপনারা সবাই আসনত আছেন যে আমরা তিন পুরুষ পূর্বে দেবসন্তান যুদ্ধের পুত্র পুরুরবা এই রাজ্য স্থাপন করেন। সেই থেকে চন্দ্রবংশের পূর্বপুরুষ আমাদের ঈশ্বরেরও প্রীতি হয়েছে।' তাঁর ঠোঁটে-ঠোঁটে আমার নিজা মহারাজ নহুষের সমকক্ষ আমি নই, তবুও তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির পর আপনাদের সহযোগিতায় এবং পুরুরবংশের আমি এইদিন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু ইদানীং আমাদের পরিষদ মহোদয় বিশ্বস্তভাবে দেখা দিয়েছে।'

মন্ত্রীরা একটু থামলেন। জনসমুদ্রে মৃদু কলহংসের ঢেউ খেলে গেল। ঈশ্বরেষিত মনে একমাত্র মহাদেবে আবার কিছু বলতে চাইছে। মন্ত্রীরা আবার পুরু একটি কথা ছেড়ে এল, 'আমাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।' মন্ত্রীরা বৃদ্ধদের ঠিক অনুমান সঠিক। তুরার কুলে ঈশ্বরেষিত জনতাকে পরে হতে ইঙ্গিত করে মন্ত্রীরা, 'আপনারা শান্ত হয়ে মূল রাজ্য করুন। আমি সব বিষয়টি আলাদা আমি। এই অত্যাচার বীজমূলে বন্ধ করা যায় তার জন্যই আমি এই সভার আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন, চন্দ্রবংশের পূর্বপিতা কলেরও চলন আকাশের দিনে আমরা চলন সাধারণের সময় জনসমুদ্রে আকাশে এসে রাজিয়ে হয়ে থাকেন। মহারাজ নহুষ তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির আকাশবাণীকে দিয়ে বহুবার আমাদের এই বৈঠকী এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভাগুলো আমার অভিজ্ঞতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আজকের জনসমুদ্র আমাদের জনসভা নয়। আজো যে সাথী দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এই সভার আয়োজন।'

মন্ত্রীরা মেঘমন্দ্রস্বরে কথা উৎসবের ঈশ্বরে পাঠাল, 'আপনারা হয়তো আমার এই যে, কেন আজকে বাজ আগে আমি পুরুরবোর বাহিনে আমাদের হয়েছিলাম। তা থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় ছিল আমাদের যেন পুত্রের রক্তস্নান। আপনাদের অবশ্যই মনে আছে। শিশুর এই আগমনকালে আপনারা পুত্রদের আয়ু থেকে কী আশা করেন? আপনারা সবাই নিশ্চয় পুত্র। আপনাদের নিজের জীবনসঙ্গিনী হয়ে পুত্র হিসেবে আপনাদের কী কর্তব্য হওয়া উচিত? আমি জানি, আপনারা কী বলবেন। নিজের জীবন অপেক্ষাও পুত্রের জীবনকেও যে প্রেয়—এই কথাই আপনারা বলবেন। আমাদের মহান পূর্বপুরুষের এই শিক্ষাই দেব। আমি কিন্তু আমার যেন পুত্রের জীবনে এমনটা কখনো চাই নি। অনেক বছরের ওপর তাদের যৌবন কামনা করেছিলাম আমি, যাতে আমার আমার আমি সমস্যা করে তেতে পারি। আমি জানি, আপনারা বুঝতে পারছেন এই সূত্রে যে, মহারাজ নহুষি জীবনের বিনিময়ে নিয়ে রাজিয়ে হয়েছিল তার ছোট্ট এক পুত্রের কথা। সেই বিনিময়ের মূল্য আমি যেন নিজেকে দিয়ে রাজিয়ে রেখেছিলাম। সেই কথা নয়, নিজেদের নিজেকে আপনার করে কাঁদিয়ে জর্জরিত করে পরিত্রাণ আমি চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল, আমার মৃত্যু সম্ভিনী। সৃতরাং শৌহাই তারা বাজা আমি করে দিতে পারবে। ব্রহ্মবন্ধু, সন্তানের, মৃত্যুর আমি তখন আত্মজনদের কথা ছিল। অবশ্যিকার তখন আমার উপর আপনাদের মন আমার কর্মিষ্ঠপুত্র এবং আপনাদের আমি দিয়ে সেবকরূপ পুত্র ব-ইন্দ্রের আমাকে চলে রক্তস্নান করতে অনুরোধ করে। তার পরবর্তী আমি আমার জীবন দিয়ে পারি।'

মন্ত্রীরা একটু আমলেন। চতুর্দিকে 'জয় পুরু, জয় জয়' রব উঠল। মন্ত্রীরা আবার বলতে পুরু করলেন, 'এখন আমার ভোগবাসনার নিবৃত্তি ঘটিয়ে। শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা বাকি রয়েছে যা আমরা সম্পন্ন হবে। ব'আমি পূর্বে আমি রক্তস্নান বন্ধ করেনি। অভিশাপে আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু তার জন্য আমার আর কোন দুঃখ নেই। মৃত্যুর পূর্বে আমি শুধু দেখে যেতে চাই যে এই অভ্যাস আর উপযুক্ত হয়ে অর্পিত হয়েছে। আপনারা জানুন, দৌহে, দৌহে, আমার, কৃতিসন্তান পুরু যদি এই অভ্যাস বাজা করে তাহলে আমার আমি কখনই শান্ত হবে? রাজনী অভিজ্ঞানের আদর্শ। সে নিজের নিজের জন্য রাজ্য করতে প্রস্তুত নয়, সে প্রজাদের স্বার্থে নিজেকে জীবনের উৎসর্গ করবে। তাই শুধু জ্যেষ্ঠপুত্র হলেও প্রজাদের আমাদের কথা ছেড়ে আমি কখনই তাকে রাজ্যের অভিষিক্ত করতে পারি না। মহারাজ পুরুরবার, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ নিজেদের বিধান নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আমার যে-পুত্র নিজেকে আপনার সমর্থ হবে সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র হলে পরিবর্তিত হবে। চন্দ্রবংশের পরবর্তী আজ সেই হবে। তিনি হবে আমীরাজ রাজ্যের। পুরু পুরুরবংশের অনীবাদ পেয়েছে। এখন আপনারা অনুমতি দিলে আমি পুরুকে রাজ্যের অভিষিক্ত করতে পারি। চন্দ্রবংশের আজ আজ বাহনের সে-ই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।'

মন্ত্রীরা নিঃশ্বাসের উপবেশন করলেন। বেশ চলছ হয়ে পড়েছেন। ইদানীং তার তবেই চলছ রাজ্য পড়েন। পুরুর জ্যেষ্ঠাজনদের প্রায় নাগরী নিয়ে আসছে। বৃদ্ধরা পরস্পরের ওপর তাকাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তা প্রতিবাদ প্রায় জ্যেষ্ঠাজনের কথা করে উঠল। সবচেয়ে পুরুষ, তরুণরাই নিয়ে। মন্ত্রীরা পুরুকে ইঙ্গিত করলেন।

পুরু কৃতজ্ঞতাদৃষ্টি আপনাদের প্রণাম জানালেন। 'জয় মহারাজ পুরুর জয়', আকাশ উঠলেন ফেটে পড়ল। পুরু আগে কিছু করে আসনের অভিমানের আসন ছেড়ে মন্ত্রীরার কাছে এগিয়ে গেলেন। মন্ত্রীরা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পুরুকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। ফুলপুরোহিত এগিয়ে এলেন। পাত্রমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রীরা যাবা পুরুর আগে প্রণাম করলেন। পুরু এবার উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে ফুলপুরোহিতকে প্রণাম জানালেন, পরে পিতাকে প্রণাম করে অন্যান্য অভিজনদের প্রণাম করার জন্য আসনে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে এলেন। সভার আগে আবহাওয়া উঠল, 'জয় মহারাজ পুরুর জয়, জয় আমাদের মহারাজ জয়!'

প্রথম পুরু আসনে বসার ঠিক পরে থেকে থেকে নিজেকে সামলে নিলেন। আসন থেকে একটা তীব্র ঠান্ডা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে আসন বসার পরিণাম। অনুভব আসনে পরিণাম থেকে চমকপ্রদ আকাঙ্ক্ষাটাকে দেখা গেল। দুর দুটি আসনের ছায়া। আসনের অভিজ্ঞ রাহুর উপায়-বসু। বিভিন্ন তীব্র নিজেদের ইঙ্গিতকে আনুষ্ঠানিক পুরু চলছে। নিজের আসন আসনপ্রবাসীরা দেখা গেল। আসনের পুরুর আর দেখা নিল। উপস্থিত আসনে আসনের বাসনাটা ঘুরে গেলেছে। 'আমাদের পুরু আসনের,' ঘোষণাতে আসনের ইঙ্গিত, 'আসনাদের আর আর আর পুরুষের আসনের আসনে আর।' উপস্থ আসনে কিন্তু হয়ে গেছে গেল।

এমনটাই যে হবে পারে তা পুরু আগেই অনুমান করেছিলেন। আসনে বসে এই সিংহাসন আসনে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন। আসন বিভিন্ন চলছে ঈশানী ঠান্ড আর দেখে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু এক মুহূর্তপরবর্তী প্রতিনিয়োগের পুরুষ পরে নিয়ে গেল। আসনের সঙ্গে সেই ঈশানী তুলে নেবে নিল। আসনপুরুষের ইঙ্গিতের আসনে এই ঈশানী ধরে ধরে থাকে আসনে।

মহাসনে আগে বিভাগীয় সেনাপতিরা এসে গেছেন। পুরুকে ঘিরে তাঁরা পুরুষানুক্রমে দাঁড়িয়ে গেছেন। একা পুরু আসনের আগেকা। মহাবাহীন যজ্ঞের পোশাক পরা পুরু মন্ত্রীরা ধরে রিয়েছিলেন। বিভিন্ন আগে চৈতন্যদেবের আসনে নিবীক্ষণ করে আগে নিয়ে এসেছিলেন। আসনপ্রবাসীদের আগে না যে পুরুর মহাসনীকে ঘিরে একা পুরুষ সুনির্দিষ্ট চৈতন্যের প্রস্তুত হয়ে পরিধান পরিধি ধরণ নজর রাখছে। পুরুপৌরোহিত আগেকা তু এবং তাঁর চৈতন্যদেবকে ঘিরেছে রাজ্যে ধরে রেখেছে হয়েছে। ওরা ধরণে না, ওদের রাজিপ্রবাহের পর এখন আসনে।

আসনের পুরুরোহী আসুর মন্ত্রীরা মন্ত্র থেকে নিজার হয়ে নিজ্রাসনে চলে গেছেন। পুরুরী এখন দুপুরি। ঈশানী নিজার নিয়ে হবে। সেই আজির নিজার আসনের আসন এখন ঈশানীর। এই আসনে আসে নিজার আসুরাসনের সঙ্গে তিনি আসনে আসন-পরামর্শ করেছেন। আসনপ্রবাসীদের আসনুর কী কী করতে হবে তা আগুনার আসনাজির হয়েছে। মোদ্দাও কোন ছিল নেই। এর নিজস্ব আসুরাসন ঈশানে নিয়ে নিজিয়ে রেখেছে। আসুরে পুরুষ আসনাজিরে ঈশান-আসন দুরুষ। আসুরে প্রজারা ধরে-পুরুষানুরে আসুর সৈন্যদের প্রতিরোধ করছে। এই আসুরাসন আসনপুরুষের আসে নিজিয়েও নিজস্বপ্রজাদের পুরুষানুরে পুরুষ আসে হলে তিনি একেবারে একা। ভবিষ্যৎ আসন্নী, সেই আসনের পরী করতেও এগিয়ে আসবে না। কেউ আসে দেখে না, এই মুহূর্তে কী করতে হবে। তিনি আসনাজ পুরু। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে নিজেদের আদেশের। একাকিত্বের আসনকে দাঁড়িয়ে উঠেই নিজার নিতে হবে। আসনপুরুষের এই আর ঈশানী ধরে রেখেছে হবে আসে ঈশানে। আসে থেকে তবে পুরু। পুরু নিজেকে নিজার হয়ে পড়লেন। মোদ্দের ঈশর হল আসে।

'কিন্তু আসনের বিভিন্ন এই ঈশানী যে পরিবর্ত নিজেন ঘটিয়েছে তা পুরুকে বাধ্য করবে নিজার নিতে। অনিবার্য মোদ্দিবিদ্রোহের ঈশানে আসিয়ে ঈশরেই হবে। মোদ্দাজন ঈশানী আসনেরী হয়ে পড়ল। ঈশান ছেড়ে সেনাপতিদের দৃষ্টি আনুষ্ঠান করে পুরু দেখলেন, ঈশ-ঈশান এগিয়ে আসছে। আসুরিদীন আসনে তবে কয়েকজন হোদের সঙ্গে লড়বে? সেনাপতিরা ঈশান হয়ে পুরুর দিকে তাকালেন। পুরু আসনেরে পুরু নিয়েছেন নিয়ে বসলেন। হোদের ঈশানেরাজ্যকে ঈশান করে বললেন, 'এই মুহূর্তে থেকে আপনি এ আদেশ সেনাবাহক। শত্রুবিনাশের সমস্ত দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হল।'

'সে শত্রু যদি আমাদের নিজেই আত্মীয় হয়, তা হলেও?'

'আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন সে ভয়ংকর। আত্মীয়রা সবাই পরিচিত হয় শত্রুতা তারই হওয়া হয়ে ওঠে। আসনাদের বিপদটা হোদের অবস্থিত এই শত্রুতা সেই আসনাদের ঈশ্বরের অনুপস্থিতেই ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তবে তার সম্ভাবনা ঈশ্বরের আসনে আসনেরও ভয়ংকর হয়ে যাবে। আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। আপনার মনেও কোন দ্বিধা থাকবে না। আপনার আসনের আমার ওপর অর্পণ করে বিভাগীন নিয়ে সাধারে ছুটে যান।'

মুহূর্তের মধ্যে পুরুর সৈন্য ঈশিয়ে পড়ল। আসনাজীর ঈশানেরাজ্য ধ্বনিতে পরিণত হল। হিমশিলের মুখে আগ-ঈশান প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেল। ঈশানের অবশিষ্ট সৈন্যের পলায়ন করতে আসনে পুরুর সেনাবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।

মুহূর্তের সংগ্রামে সংক্ষেপ আসনের সেনাবাহক মহারাজ পুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা হলেন। মহারাজের অভিনন্দন করে বললেন, 'শত্রুদের পরাজিত আসনের। মূর্খরা তখন সেনে পলায়ন করেছে। মুহূর্ত নিশ্চয়ের ঈশ্বর করে প্রতীক্ষা আসনে পরে আসছে। আগ্র সেনে সেনে আসনে নিয়েছে। পরাজয়ের আসনের চন্দ্রবংশের নীতি নয়; তাই আপনার সৈন্যের প্রত্যেক পীছনে থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আগ এবং তার দুই পুত্র এখনও প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে। আপনার নিজের বিভিন্ন মুহূর্তের মধ্য মুহূর্তের প্রত্যেকে আমার এখন আক্রমণ করছে। আমার প্রত্যেক আসনের করে ফেলেছি, কিন্তু কিছুতেই তাদের প্রত্যেক থেকে নিজেকে আমরে পারছি না। আমার একটা আশ্চর্যের দেখা নিয়েছে। আমরাবীরা সেনাপতি ধরে সেনাকে আমরণ করছেন। সৈন্যদের আমার চাকর ব্যবহার প্রহণ করতে পারছি না।'

পুরু মনোযোগ দিয়ে সেনাবাহকের প্রতিটি কথা শুনছিলেন। এবার তাঁর মিনুকে ধারণের দেখা দিল। মৃদু-গম্ভীর স্বরে বললেন, 'চন্দ্রবংশের আসনীতি এখন থেকে নতুন দিকে মোড় নেবে সেনাবাহক। পলায়মান শত্রুকে আক্রমণ না করে আপনি মূল

...পুরুষ সেখানে নেই। তার জন্য পরিবার সংরক্ষণ করতে সাহায্য দিতে পারে না। যে সমাজে মেয়েরা একলা পুরুষ-ছাড়া নিজের খাবারে পারে না। সমাজ-বিজ্ঞানের বাস্তব পরিবেশগত ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে। এই তার প্রথম পরিচয়। যে পুরুষদের নিজের থেকে পরিবেশগত মূল্যবোধ হওয়া যায় না। পুরুষদের সম্পর্কে যা শুধু তা। আপনার সাথের জন্য প্রয়োজনীয় সব আলাদা হয়ে থাকতে আমি সম্পর্কের নিজের নিজি। বাস্তবিকিতে আমাদের জেন মূল্য নেই।'

মেয়েরাজ কি ভাবে উঠেছিলেন। হয়, হয়তো নিজেই ঠাকর মেয়েদিনের টিকটি, এখন এ মেয়েদের মৈত্রেয়ীদের একদিন পর্যন্ত সাধারণ থাকতে পারা যায়নি। পরিবেশগত প্রয়োজনের রীতি ছিল না। কিন্তু মেয়ের চাপ খুব বেশি, তাদেরি মন বেশি - রীতি চাপ-চড়ক হয়ে পুরুষ সমাজপতির সন্ধান করে। তাই পরমুহূর্তে মেয়েরাজের জন্য উৎসবিত হয়ে উঠেছিল। অভিজাতের অভিযান বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে পরিবেশে ঠাকরমা মেয়ে বিরোধিল।

যদু ডাকাত থেকে বিরোধ হয়ে বসে হয়েছিলেন, তবে তা অতি সাময়েরে। পুত্র-জ্যেষ্ঠের দেখা চাপাতে আদুর করিয়ে নিয়ে উপযুক্ত কৃপাদর, তাদুলিন নিয়ে আপনার একটিক হয়ে যদু, যারা মেয়েরাই, তাই এরা পুরী পুত্র নিয়ে রাজপরিবে যেমন সুরক্ষাদের নিয়ে এক পরিবার বলেন বিশ্বাসের নিয়ে উঠেছেন। মেয়েরাজ উৎসব নিয়ন্ত্রণ আয়োজনের আদুর জন্য নিয়ে আপনার প্রার্থনা। উৎসব মূল আয়োজন করেছেন। পুরী সমস্ত পুরী পুত্রের আপনে চলন - প্রজাদের বীরাঙ্গনার নিয়ে নিয়মনিষ্ঠার উৎসব প্রতিরে রাজপরিবে।

আপনে সব চলার পর পরমের আবশ্যকতাটি শেষের শেষে। প্রজাসভাই তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আপনে দুরে, আপনে দুরে। আদুলে, নিজের, আত্মসম্মানে আবশ্যক আরোহিত। তাদের মেয়েরাই হয়ে পারে না। সমস্ত আদুলে বাঁচাতে হলে একটা আদুরে আপনে পালন করে প্রয়োজন করতে হবে। কিন্তু তা বৃদ্ধি আজ হল না। হঠাৎ একটি ঘটনা এসে কিছু করল তাদের মধ্যে - ঘটনা মেয়েরাজির আরে আরেকটি লক্ষিয়ে উঠল। মেয়েরাজি বৃদ্ধপরিবার হলেন। আপনে একা দুরে নিয়ে আবশ্যক করলেন। দুটো মোলেন আপনে আরে। পালন আরে মেয়েরাজ, মেয়েরাজির আপনে মেন আপনাকে। আরেকটি পরে আপনে ঘটনা নিয়ে আরেছে, কিন্তু তাই পরিবর্তন নয়। আদুলে থেকে বিশিষ্ট হওয়ার আগে ঘটনাটির মেন মিল না। যদু মেয়েটির দুরে ঘটনা-চড়ক করলেন। দুটি পুত্র আপনে আর মেয়ে আপনে উপযুক্ত আপনেই ঘটনাকে নেপথ্যে নিয়ন্ত্রণ করলেন। পরমের আবশ্যকতাটি প্রজাদের নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে। এই দুরুহে কিন্তু একটা আপনে না পালনে সমাধান নিয়ন্ত্রণ হয়ে হবে। নিজেদের একমাত্র উপায় এই পথ-ঘাট আবশ্যকতার ভরসা। পালন আরে আরেকে মেয়েরা দুটো নিয়ন্ত্রণ যদু। আরেকটি মেয়ে পালন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিবর্তনটির পুরুষ মেয়ে উপযুক্তি আপনে পেয়েছে আরে চলে যায়, আরেকটি আপনে এসে যদু এলোমুখে নিয়ন্ত্রণ। রাজপরিবে, পালনে এই আপনার মেয়ের আপনে এরকম ঘটনা হয়ে নিয়ন্ত্রণ।

হঠাৎ দুরন্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেয়েরাজি বলে উঠলেন, 'চিন্তা মেয়েরা না যদু, আপনাকে আপনে পালন বলিয়ে একলা থেকে দুরে পালনের কথা।'

যদু চমকে উঠলেন, দুরন্তের মেয়েরাজির কথা এই পুরুষ মেয়ের থেকে এল ? তিনি নিজে বুঝতে পারছেন, তাদের মেয়েরাই প্রজাদের নিয়ন্ত্রণের হয়ে আসছেন। নিজেদের-প্রজাদের প্রজাদের জীবন হয়ে আসছে। এই আপনার আরে এরে পুরুষ-এর কী আরে ? দুরন্তে আপনে মুখের নিয়ে মেয়েরাজির। দুটি পুত্র এবং নিয়ন্ত্রণের পৃথিবীর উৎসব নিয়ে প্রতিরে আপনে। কী আপনাকে উৎসবে মেয়ে পৃথিবীর ? যদু আর ভাবতে পারলেন না। সমস্তদের আপনে নিয়ে বসিয়ে, এক ভরে নিয়ন্ত্রণ আপনেরাজির মত আরে আপনেরাজি করলেন।

নিয়ন্ত্রণ আপনের পর আপনে প্রজাদের এই পালন ভরে পালন যে আপনেরাজ আর সমস্যার হল না। এই আপনের নিয়ন্ত্রণ পৃথিবীর মেয়ে পালনেরা উৎসব মেয়েরাজ্যের আপনেরে চলে মেয়ে পারলেন। ধীরে আপনেরাজির এখন আর বেশি দুরে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। উৎসে আর মেয়ে দুরে আপনেরাজি করলেন। পুরুষদের আপনেরাজিকে মেয়ে পালনেরা মতো আপনেরা।

আরিয়-সমাজের চড়াতেও মেয়ে। কিন্তু মেয়ে আপনেরাই এখন আপনে। মেয়েরাজির মেয়েরে ধরে পাল চলতে চলতে উৎস মেয়েদের পৃথিবী আর প্রজাদের আপনে পৃথিবীর হয়ে উঠেছে। আপনে বর্ষাতে উৎসবের সঙ্গে আপনেরা মেয়েরা যদু এলাকা হয়ে নিয়েছিলেন। উৎস আর পরমে, উৎস আরে মেয়েদের আপনেরাজির প্রজাদের তখন তিনি দুটো নিয়ে উৎস মেয়ের ধরে আপনে দুরিয়ে নিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণ পরে মেয়েরাজি সাবিত নিয়ে নেবে এক আপনে পৃথিবীর উৎস নিয়ে আপনেরাজির। সেই পৃথিবীর সঙ্গে আপনেরাজ নিয়ন্ত্রণ আপনে মেয়ে পৃথিবীর আপনে ছিল। নিয়েদের যদু তখন সে পৃথিবীর আর পুরুষে পারবেন না। কিন্তু আজ তিনি দুঃখে পারছেন।

যদু নিজীবের মেয়েরাজির দুটোর নিয়ে আপনেরাজ। আপনেরাই প্রজাদের নিয়ন্ত্রণের। দুটো এক আপনে আরিয়ে মেয়ে নিয়েছে। মেয়ের আরে, মেয়েরাজি আরিয়েরাই পরী আপনেরা। পালনের প্রজাপতিরাজির আরে আপনে আরে না। যদু আপনেরা, উৎস নিয়ন্ত্রণ আপনেরে এসে পৌঁছেছেন। এ আপনে উৎস আপনেরিয়ে। দুটো মোলেরও মেয়ে পালন হওয়ার মেয়ে আপনে। আপনে আরেই পালন পৃথিবীর নিয়ে। পরী তার উৎসে তা তিনি আপনে না : মৃত্যুরা আর আপনের প্রজাদের পরীক্ষিত হয়ে না। তা আপনে আপনে পুরুষেরও আপনেন।

আপনে উৎ, পুরুষেও নিয়েদের এরকম পাল আগে আসছিল, কিন্তু আপনে প্রজাদেরেরই আপনে পরিবর্তন। কিন্তু সেই প্রজাদেরের আপনে পাল চলতে চলতে আপনে একটা মেয়েরাজ নিয়ে পরিবে পুরুষ আরেছিল তা আপনে পুরুষে পারে নি। আপনে পালনেরাজ আপনে নিয়েদের নিয়ে

নিয়ে আপনে পুরী ওপরে পুরুষে উৎসব পারল। তিনি দেখলেন, প্রতিটি মৃদু উৎসবী মনের আপনের প্রতিবেদিতে হচ্ছে। সেই আপনেরাজ্যের ইচ্ছার ইতিপরের আপনের সবে মেয়ে পুরুষ আপনে। প্রতিবাদের পুরু হয়ে যদু আপনেরাজি মেয়েরাজিরে পরাজয়ের মুখোমুখি আপনেন। আপনে পুরুষ একটিবারে হয়তে পারে না। আপনেই উৎস পরিপক্ক উৎসে। সেই উৎসবে এর আপনেরাজি তিনি পুরিয়ে মেয়ে দেখেন না।

কিন্তু মেয়েরাজির এখন ঘটিন আপনে উপস্থিত। চিন্তিতে তিনি আপনে নিজের আপনেন। চলে মোড়ে পুরু মেয়ে মেয়েরাজির মুখের ওপর মেয়ে এল। মেয়েরাজি মেয়ে মেয়ে হাসলেন। পরীক্ষ নিজের কিন্তু মেয়ে পৃথিবীর আপনে। সেই আপনেরা ইচ্ছার মেয়েরাজির নিজের পৃথিবী আপনেরা হয়ে উঠল। নিয়ে মুখপুরুষ আর তিনি দেখতে পারলেন না। আপনেরে মেয়ে উঠল পরিবর্তনের মুখ। পরিবার আপনেরাজি নিয়ন্ত্রণিতির হাসি হাসছে। আপনে মেয়েরে তিনি পুরী মেয়ে পরীক্ষণ আর নিয়ে, কিন্তু আপনে পুরুষ আপনেরি আপনে উঠল। না, মেয়েরাজি পরাজিত হয়ে আর না। তিনি আপনে উপস্থিতি পুরুষের। মেয়েরা যদু ? মেয়েরাজি উৎস আপনেরি সমস্ত পরিবর্তনের মেয়েরাজির করলেন। আপনেরির পরে আপনেন, যদু, মেয়েরাজির মেয়ে মেয়ে আপনে না। আপনে আর স্পর্শ করে প্রতিবাদ আর মহানিন এ পুরুষদেরকে সমাজে আনে আপনে আপনেরিরাজির মধ্যে মেয়ে মেয়ে আপনে হয়। পুরুষদেরে আরেই মেয়েরাজির আপনেরিয়েরে হয়ে। আরে মেয়ে, যে রাজপুরুষে আপনেরাজির মেয়েরাজির আর থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে এমনকি চলিয়েরাও আপনে সেই আপনেরাজির পরিবে পার মেয়েরা। তার আগে কখনও আপনেরিয়েরে মত হয়ে চরিত্রের কথা বিশ্বাস মেয়েরা না।'

মেয়েরাজি একটু আপনেন। উৎস পরিপক্ক চলনের মত ধীর-আপনে আপনে। আর একটি সন্তানের জন্য মেয়েরাজি মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে আপনেরা পরাজিত মেয়েরাজির। ধীরে আপনেরা উৎসাহ প্রজাদের পৃথিবীরাজ হয়ে। আর মেয়েরাজির একদিন আপনে আপনে আপনে হয়ে না। যদু উঠে পরিবারে আপনেরাজির কী তা মেয়েরা মেয়ে পরাজয়ী মেয়েরাজির আপনেরাজির আপনে পরলেন।

মেয়েরাজি বলছেন, 'আমি আপনেরাজ মেয়েরাজি। মেয়েরাজির আপনে নিয়ে এই মুহূর্তে এই চলে পরিবর্তন করে হলে আপ। এই যে উৎসব এখানে আপনে, এ আপনে কিন্তু নয়, আপনেরাজি আপনেরা পরাজয়ে আপনেরাজির পৃথিবী মেয়েরাজ। আপনে মৃত্যুর পরে আপনে মেয়েরাজ আপনে না। আপনে মৃত্যুর আমি চাই না। এই পরাজয়ে আপনে পরীক্ষ চরিত্রীকৃত হয়ে আপনে, কিন্তু আপনেরা পরাজয় নিয়ে আপনে মৃত্যুর আপনে পৃথিবীরাজ পুরুষ মেয়েরাজে। মেয়েরাজির এখানে নিয়ে আপনে পুরুষদেরও আপনেরাজে।'

মেয়েরাজির মত মেলে উঠে মেয়েরাজির পরীক্ষ নিশ্চল হয়ে মেল। রাজী মৃদু মৃদু প্রতিবাদ একলাফে মেয়েরাজির পরীক্ষ স্পর্শ করল।

পুরুষের মনে হল, তিনি মেয়ে মৃত্যুরাজের সন্তানের উৎসবির। উৎস একটা মৃদু মেয়েরাজির আর স্পর্শ করে আছে। পরাজয়ের পরাজয় উৎস পরীক্ষ স্পর্শ করছে।

লকার

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্যাঙ্কে ঢুকতেই বর্ষার গা ছমছম করে উঠল।

কোমল অপরিচিত পরিবেশ। গদ্য অবধি উঁচু টানা পার্টিশন চারদিকে, পার্টিশনের ওপাশে কতকগুলো মানুষ—মেয়েও দেখছি—সারবন্দী বসে আছে, ওদের মুখগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন আবার কাচ ঘেরা খাঁচায় একা। এয়ারকন্ডিশনের শীতটা প্রথমে ওর খোলা বাহুর ওপর ছাঁক করে লেগেছিল কিন্তু গা ছমছম করে উঠল এই কথা ভেবে যে, ওরা হয়ত ওৎ পেতে আছে, বর্ষার হ্যান্ডব্যাগ থেকে সব টাকা আর গিফ্‌ট-চেক ওরা ছিনিয়ে নেবে।

বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা টানা সোফা। পুরনো পত্রপত্রিকা ইতস্তত ছড়ানো। নানা বয়সের কয়েকজন সুসজ্জিত মহিলা ও পুরুষ সোফায় বসে আছে। খানিকটা তফাতে বর্ষাও গিয়ে বসল।

রাহুল ওদিকটায় কর্ম আনতে গেছে। বর্ষার অবাক লাগে, ব্যাঙ্কের এই রহস্যময় দুর্গের মত পরিবেশে ও কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন এটা ওর নিজের অফিস, যেন এখানে সবাই ওর চেনা। ওর বন্ধু বা সহকর্মী। কোনো কিছুতেই রাহুল ঘাবড়ায় না। বিয়ের পর এই এগার দিনের মধ্যেই বরের আত্মবিশ্বাস দেখে বর্ষা মুগ্ধ। অবশ্যি চিনতেই না, এখন একটু একটু ভালবাসতে শুরু করেছে ওকে।

একপাতা ছাপান কাগজ হাতে নিয়ে রাহুল ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

বর্ষা বলল, 'এই শোন।'

—'কী'।

—'আমার মা ভয় ভয় করছে। আমার সই না, কোনদিন মিলবে না। আমার হাতের লেখা খুব খারাপ।'

'সে লেখা যাবে। আগে চল তো। ভেতরে আমাদের ডাকছে।'

ম্যানেজার না, ম্যানেজারের সহকারী, সি. এন. রক্ষিত। টেবিলের একপাশে তাঁর নাম লেখা ট্যাবলেট। চোখে মোটা চৌকো চশমা। গলায় চওড়া জেব্রাকাটা টাই। গা দিয়ে ভুরভুর করে ওডিকোলনের গন্ধ বেরোচ্ছে। নাকি ওটা এয়ারকন্ডিশনের গন্ধ? ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো ঠাণ্ডা, নির্মল।

সি. এন. রক্ষিত মন দিয়ে ওদের কথা শুনলেন। বললেন, 'একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলুন। দুজনের যে কেউ টাকা বা চেক জমা দিতে পারবেন, দুজনের যে কেউ টাকা তুলতে পারবেন।'

ততক্ষণে তাঁর টেবিলের ওপর হ্যাণ্ডব্যাগখানা উপুড় করে ফেলেছে বর্ষা। একপাতা সোমড়ানো মোচড়ানো গিফ্‌ট চেকের রঙিন থান, পঞ্চাশ টাকা ও একশো টাকার নোট, গ্রীটিং টেলিগ্রাম, চিঠি—সব বেরিয়ে পড়েছে। আর একটা ছোট্ট চৌকো আয়না, লিপস্টিকের ডাঁটা, কিছু রবার ব্যাণ্ড এবং একটা চাবির রিং। বয়স্ক ভারী চেহারার মানুষ, তিনি খানিকটা স্নেহ ও খানিকটা কৌতুক সহকারে নববিবাহিত মেয়েটিকে দেখছিলেন।

মাথায় পেছনে ঢিলে খোঁপা। সিঁথির সিঁদুর কপাল থেকে উঠে ওই খোঁপা অবধি ঘিরে ঠেকেছে। কপালে লাল টিপ। চোখ দুটো একটু কটা। মুখের গোল আদলের মাঝখানটায় নাকটা একটু খাঁদা, নাকের ডাঁয়ে নাকছাবি চিক্‌-চিক্‌ করছে। গায়ের রং ফর্সাও না, আবার কালোও না, মেরি বিস্কিটের মতো। অনভিজ্ঞ ঠোঁট দুটো একটু হাঁ হয়ে খুলে থাকায় বর্ষার সাজানো দাঁতের পাটি কটি ফুটার দানার মতো দেখাচ্ছিল। মেয়েটি অকারণে তার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলছে আর বন্ধ করছে। নববিবাহিত ছেলেটিকে দেখে তাঁর বেশ চালাক চতুর বলেই মনে হচ্ছিল, তবে একটা গোটা বউকে কী করে সামলাবে, আপাতত সেটা বুঝে উঠতে পারছে না।

সি. এন. রক্ষিত বললেন, 'অত সব কিছু আমাদের লাগবে না।'

রাহুল বলল, 'এই শুনছ, তুমি ওই টাকা আর গিফ্‌ট চেকগুলো আমাকে দাও, সাজিয়ে ফেলি।'

সি. এন. রক্ষিত ব লনেন, 'আর বাকি সব নিজের কাছে রেখে দিন।'

গিফ্‌ট চেক কিছু বর্ষার নামে, কিছু রাহুলের নামে, কিছু আবার ওদের যুগ্ম নামে। রাহুল অ্যাণ্ড বর্ষা মজুমদার। সর্বসাকুল্যে তিন হাজার একশো পাঁচ টাকা।

সি. এন. রক্ষিত বললেন, 'নট ব্যাড। হানিমুনের খরচ উঠে আসবে।'

হানিমুনের নাম শুনে বর্ষা রাহুলের দিকে আড়চোখে তাকায়। রাহুল

কিছু বলতে গিয়ে আর বলল না। সব কথা বাস্তবে লোককে বলার কী দরকার।

সি.এন.রক্ষিত সিগ্নেচার ফর্মে যেখানে যা ভরার তা ভরে দিলেন। কিন্তু সই তো তিনি করে দিতে পারেন না।

বর্ষা এবার তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, 'স্যার আমার সই কি না মেলে?'

—'কেন? সই মিলবে না কেন? আপনি যেভাবে নিজের নাম লেখেন, স্বাভাবিকভাবে সেভাবে সই করুন। চেক কাটার সময় সেটা ভুলবেন না।'

'আমার হাতের লেখা কিন্তু খুব খারাপ।'

—'তাতে কী', সি.এন.রক্ষিত এবার অনভিজ্ঞ মেয়েটির প্রতি একটু বিরক্ত হয়েছেন, বললেন, 'ভালো হোক, খারাপ হোক, সই এক রকমের হলেই হল।'

বললে কি হয়, নাম সই করতে গিয়েই ভুলটা করল বর্ষা। মজুমদার লিখতে গিয়ে মিত্র লিখে বসল। স্বাভাবিকভাবে সই করতে গিয়ে আবাল্য অভ্যেস মিত্রর খানিকটা বেরিয়ে যেতেই ওর খেয়াল হয়েছে, 'এম' এর পরে 'এ' হওয়ার কথা, 'আই' নয়।

—এই যাঃ। এখন কী হবে। কেটে ঠিক করে লিখে দিই?'

রাহুল বউয়ের ভীত ও লজ্জিত মুখখানা দেখে হেসে ফেলল। ঠাট্টা করে বলল, 'বিয়ের পর তোমার পদবি বদলে গেছে, মনে নেই বুঝি? নাকি বিয়ে হয়েছে তাই ভুলে গেছ?'

এর উত্তরে বর্ষা বলতে পারত, তোমার পদবি বদলালে তোমারও একবার ভুল হত মশাই। বাড়ি হলে, শাশুড়ি যা নজর কাড়াকাড়ি না শুরুলে বলতও। কিন্তু এখানে, এই ভুবনডুরে ঠাণ্ডা পরিবেশে বরের রসিকতা ও উপভোগ করল না। সি.এন.রক্ষিত ওদের আর একখানা ফর্ম ভরে দিলেন তারপর বেয়ারা ডেকে কাগজপত্র তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো জমা দিয়ে দাও। আর চেকবই, পাশবই কয়িয়ে নিয়ে এস। ঐরা অপেক্ষা করছেন।'

এতগুলো টাকা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে বর্ষা বেশ হালকা বোধ করছে। এতক্ষণ পরে ও লক্ষ্য করছে কোথায় কি করে লোকে টাকা জমা দেয়, কোথায় কি করে টাকা তোলে। এতদিন ওর জীবন অন্য চাকায় ঘুরেছে। কলেজ, গানের ক্লাস আর বাড়ি। খুব জোর, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা কি রেস্তোরাঁ। টাকা পয়সার দরকার হলে মায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছে। ব্যাঙ্ক বল, কি অফিস বল—এসব জায়গায় ও যেতেই নি। আজ প্রথম। এরপর অভ্যেস হয়ে যাবে। চেকে সই করে টাকা তোলা, কি ডিপোজিট ফর্ম ভরে টাকা জমা দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। সব মিহিরবাবুরাই আজকাল করছে তো। খোলমাল হলে ওর বর তো আছে, সে এসে উদ্ধার করবে বিপদ থেকে। এখানে তো ওদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হল। ব্যাঙ্কের কাজ রাহুলের কাছে জলভাত। অফিস পাড়ায় একাধিক ব্যাঙ্কে ওর নিত্য যাওয়া আসা। বস্তুত, এইটি ওদেরই এক ব্যাঙ্কের গৃহস্থ পাড়ার ব্রাঞ্চ। তাই তো এত খাতির করছেন সহকারী ম্যানেজার।

তবু রাহুল ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানায়।

'একেবারে হাতে হাতে সব করে দিলেন,' রাহুল বলে, 'আপনাদের সার্ভিস অন্য ব্যাঙ্কের চেয়ে ভাল।'

—'আমাদের লকার আছে, ইচ্ছে করলে—'

লকার শুনে বর্ষার মনে পড়ে যায়, ওর মিসি একবার বলেছিল যে, অনেক কষ্টে একটা লকার পেয়েছে। দিনকাল যা পড়েছে, গয়নাগাঁটি আর বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। মিসিদের পাড়ায় সব রকম সুবিধে একেবারে নাগালের মধ্যে। নেমন্তন্ন যা পার্টিতে যেতে হলে সেদিন দুপুরে দোকানে চুল বেঁধে আসে, লকার থেকে দরকার মতো গয়না তুলে নিয়ে এসে পরে। আবার পরের দিন রেখে আসে লকারে। তাছাড়া, চেকের সামনে ওগুলো থাকলে নিত্য ঝোলাপরা হয়, লোকেদের চোখ টাটায়। এই তো সেদিন বর্ষার ছোট ননদ মিঠু গয়নার বাক্স দেখতে দেখতে একজোড়া মুক্তোর ইয়ারটপ দেখিয়ে বলেই ফেলল, 'বৌদি, এটা তো তোমার ডুপ্লিকেট, জন্মদিনে আমায় উপহার দিতে পার। একদম্বা সিল্কের শাড়ি তো নিজেই নিল আবদার করে। কি না, সবুজ রং তোমাকে মানবে না, এটা আমি পরব বৌদি? এসব খবর অবশ্য রাহুল জানে না।

—'একটা লকার নিলে হয়,' বর্ষা মৃদুস্বরে বলল।

——'এখুনি লকারের কী দরকার?'

—'গয়নাগুলো রাখব।'

—'বাড়িতে দু দুটো সীলের আলমারি আছে, তাতে আঁটছে না?'

—'বাড়ি থেকে চুরি হতে পারে তো।'

রাহুল অবাক চোখে বউয়ের দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে কে তোমার গয়না চুরি করবে?

কোনদিন চোরে এসে গ্রাস করবে। আলো জ্বেলে করবে। কত লোক তো লকার নেয় তাদের বাড়িতে কি সীলের আলমারি থাকে না? ব্যাঙ্কের কাছে থাকলে নিরাপদ। ওগুলো একবার গেলে তো আর হবে না।'

—'এসব সম্ভাবনা আমাদের বাড়িতে নেই। তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ।'

রাহুল নিচু স্বরে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলে।

টেবিলের উল্টোদিকে বসা সহকারী ম্যানেজার চোখের মোটা চশমার পেছন থেকে ওদের দেখছিলেন। নিচুস্বরে তর্কাতর্কি শুনতে না পেলেও বুঝতে পারছিলেন লকার নেওয়ার ব্যাপারে এই নতুন দম্পতি একমত নয়। অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি জীবনে অনেক জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছেন, অনেক জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ভাঙতে সাহায্য করেছেন।

হঠাৎ বর্ষা তাঁর দিকে ফিরে জানতে চায়, 'আচ্ছা, লকারে শাড়ি রাখা যায়?

—'না, না।' হেসে উঠলেন তিনি। মুটো হাত ফাঁক করে লকারের আয়তন বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, 'এইটুকু জায়গা। আপনার জুয়েলারি ড্যামুয়েরেলস্, মিস্টার মজুমদারের লাইফ ইনসুরেন্স পলিসি, ডিপোজিট রিসিট—এইসব রাখা যাবে। এর বেশি কিছু না।'

—'থাক সে। দেখা যাবে।'

বিয়ের পরে সকলেই হানিমুনে যায়। বর্ষার মিসি আর সুবোধদা ওয়ালটেয়ার গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্রের ওপরে, তিনদিক খোলা পামবীচ হোটেলের নাকি তুলনা হয় না। এখনও মিসি তাদের হানিমুনের গল্প করে। এই এগারো দিন শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করে বর্ষা একটা নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। সেখানে রাহুল তো আছেই, আর যারা আছে, তারাও ওকে খুব আদর যত্ন করছে। শাশুড়ি তো বউমা বলতে অজ্ঞান।

বর্ষা আর একা নয়। এখন ওরা দুজন। এক একসময় ওর মনে হয়, এই পৃথিবীতে অনুর দুজন দুজন করে জন্মায়। যথাসময়ে তাদের মিলন ঘটে। ওদের দেখবার জন্য, সেখানে দুজনের একটাই বিছানা। সংসার থেকে আলাদা ওদের দুজনের জন্যে পৃথক বাথরুম। সেখানে সব কিছুই ওদের দুজনের জন্যে রান্না, তোয়ালে, সাবান, শ্যাম্পু, কেবল টুথব্রাশ ছাড়া। আর দুজনের একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হবে। এরপর দুজনের একটি বাচ্চা হবে। না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবার সময় সি.এন.রক্ষিতের কথাটা মনে পড়ল বর্ষার। তিন হাজার একশো পাঁচ টাকা। নট ব্যাড। হানিমুনের খরচ উঠে আসবে। না, হানিমুন হবে না, ওর ধরের ছুটি নেই। আসলে, গুরুজনদের মত নেই। ওদের ইচ্ছে, বউমা প্রথম থেকে বুঝুক, বিয়েটা শুধু রাহুলের সঙ্গে হয়নি, বর্ষার বিয়ে হয়েছে গোটা মজুমদার পরিবারের সঙ্গে। এখন ও মজুমদার পরিবারের একজন। কারুর বৌমা, কারুর বৌদি, কারুর বউ।

তাই হয়ত ঠিক। তবু বর্ষার মনে হল, হানিমুন থেকে ফিরে ওরা যদি ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে আসত, তবে ওই ছাপা ফর্মে ভুল করে ও বর্ষা মিত্র সইটা করতে পারত না। কিছুতেই পারত না। রাহুল মজুমদারের নিচে গড়গড় করে ও সই করে দিত বর্ষা মজুমদার। সে সই পরে মিলুক আর না মিলুক।

বিয়ের পরে মেয়েরা নতুন পদবি ধারণ করে পুরনো পদবিটা ছেড়ে দেয়। আসলে ওটা নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ করে অপরের সত্তায় নিমজ্জিত হওয়ার প্রতীক। এক অর্থে আত্মবিলোপ। বর্ষার মনে হয়, রাহুল এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট যায়। লকার থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান।

যা হবার তা এখন দিন আগেই হয়ে গেছে।

চোখের জল

রমানাথ রায়

প্রত্যেক বাবার উচ্চতা ছ' ফুট, ওজন সত্তর কিলো এবং গায়ের রঙ ফর্সা হওয়া উচিত। এছাড়া প্রত্যেক বাবাকে উচ্চপদস্থ সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী হতে হবে। তাঁর বেতন হবে কম করেও চার হাজার। তাঁর নিজস্ব বাড়ি থাকবে, গাড়ি থাকবে এবং তিনি থেকে থেকে বিদেশ. বা গ্রেনে যাতায়াত করবেন। কিন্তু খুব দুঃখের কথা আমার বাবার উচ্চতা সাড়ে চার ফুট, ওজন চল্লিশ কিলো, গায়ের রঙ ময়লা, বাবা বেসরকারী অফিসের কর্মচারী, বেতন সতের শ'। বাবার নিজস্ব বাড়ি কিংবা গাড়ি নেই। পাঁচ ঘরের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে। সব সময় ট্রামে-বাসে যাতায়াত করে। বাবা সারা জীবনে মাত্র একবার বিদেশ গিয়েছে। আজও বাবার বম্বে যাওয়া হয়নি। অথচ ত্রিভুবন সোমের উচ্চতা, ওজন, বেতন, সম্পত্তি, মাপট—সব কিছুই একজন আদর্শ বাবার মতো। তাঁকে দেখলেই ছেলেদের বুক ঢিপ ঢিপ করে, সালাম হয়। খুব ছেলেবেলায় আমি তাঁকে নিজের বাবা বলেই জানতাম। পরে একটু বড় হয়ে জেনেছি তিনি আমাদের কেউ নন। তিনি বাবার অফিসের জেনারেল ম্যানেজার। সকলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। বাবাকে সবসময় তাঁর কাছে হাত জোড় করে থাকতে হয়। ত্রিভুবন কাকা মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা গাড়ি নিয়ে আমাদের

ছুটতে এসে দেখি হাজির হয়েছেন। আমাদের তোয়াক্কা নেই। তিনি দরজায় কড়া নাড়তেন চুপ চুপ করে। আমি কিংবা বাবা দরজা খুলে দিতাম। আমি দরজা খুললে ত্রিভুবন কাকা জিজ্ঞেস করতেন, তোমার মা আছে? আর বাবা দরজা খুললে জিজ্ঞেস করতেন, রেবা আছে? আমার মার নাম রেবা। বাবা ত্রিভুবন কাকাকে দেখলেই কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘরে বসিয়ে ছলছুতো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। আমাকেও সঙ্গে নিত। বাড়িতে থাকতে দিত না। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনদিন সিনেমাহলে ঢুকতাম, কোনদিন পার্কে গিয়ে বসতাম, কোনদিন কোন আত্মীয়ের বাড়ি যেতাম, কোনদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। আমি সবই বুঝতাম। বুঝেও চুপ করে থাকতাম। বাবাকে কিছু বলতাম না। বাবাও এ নিয়ে আমার সঙ্গে কোন্ কথা বলত না।

কিন্তু মা যে শেষ পর্যন্ত ত্রিভুবন কাকার জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তা আমি ভাবতে পারি নি। কারণ মা যাতে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। টেরতে কী হয় বলে বাবা মাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিত না। বাবা ঘুমোলে রান্নার জন্য একজন ঠাকুরও রেখেছিল। শুধু তাই নয়, ঘর-দোর ঝোড়ার জন্য, কাপড় কাচার জন্য, বাসন মাজার জন্য বাবা আলাদা আলাদা একজনকে রেখেছিল। এছাড়া মাকে দুই হাতের জন্য বাবা নিয়মিত দামী তেল, সাবান, জো-পাউডার নিয়ে আসত। মাঝে মাঝে কলমলে দামী শাড়িও নিয়ে আসত। আর আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম ততক্ষণ মার কাছে কাছে ঘুরঘুর করতাম। মা সব সময় পটের বিবি হয়ে বসে থাকত। সংসারের কুটো ভেঙে দুখানা করত না যা বলা যায় করতে দেওয়া হত না। সেই মা চলে গেলে আমরা খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না মার এখানে থাকতে কি অসুবিধে হচ্ছিল? ত্রিভুবন কাকা মার কাছে যখন খুশি আসতেন, মাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো কখনো মাকে নিয়ে সিনেমা-টবে যেতেন। আমরা কোন আপত্তি করতাম না। কারণ মা কোন আপত্তি শুনত না। তবু মা চলে গেল। আমরা তাই মন খারাপ করে বাড়িতে বসে রইলাম।

কিন্তু বাবা একটু বাড়াবাড়ি করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিল। সব সময় বসে বসে, শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। আমি এক সময় বেশ ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ এভাবে আর কিছুদিন চললে বাবা একটা শক্ত অসুখে পড়ে যাবে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললাম, কি হচ্ছে এসব?

—কেন! কি হচ্ছে?

—কিছু খাচ্ছ না যে।

—খেতে ভাল লাগছে না।

—কিন্তু মা ত খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তুমি কিনা বাড়ি বসে বসে—

বাবা মা-র কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, তোর মার নাম আর আমার সামনে করবি না।

আমি একটু অবাক হলাম। বাবাকে কোনদিন মার ওপর রেগে যেতে দেখিনি। এই প্রথম বাবাকে মার ওপর রেগে যেতে দেখলাম। আমি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বাবা একটু পরে বলল, আমি আবার বিয়ে করব।

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঠিক শুনছি ত? জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে?

—হ্যাঁ, বিয়ে। তোর আপত্তি নেই ত?

বাবাকে খুশি করার জন্য বললাম, আমার? আমার কিসের আপত্তি।

—তবে ঠিক আছে। আমি সিনসিয়ার বিয়ে করব।

—কিন্তু মাকে ডিভোর্স না করে বিয়ে করলে কাজেকর্মে জড়িয়ে পড়বে।

—তাহলে কি করব? কি করতে বলিস? এই অবস্থায় ত মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায় না।

এই মুহূর্তে বাবাকে ভারী ছেলেমানুষ বলে মনে হল। মনে হল বাবার বয়স পঞ্চাশ নয়, একুশ। এর জন্য বাবার ওপর কেন রাগ হল না, বরঞ্চ সহানুভূতি হল। সত্যি কথা বলতে বাবা এতকাল বেঁচে ছিল না, কোনরকমে টিকে ছিল। আজ এই প্রৌঢ় বয়সে বাবা মার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য বেঁচে উঠতে চাইছে। কিন্তু বাবা ত ত্রিভুবন কাকা নয়।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করল, কিরে চুপ করে আছিস কেন?

আমি বললাম, তুমি চিন্তা কোর না, যা করবার আমিই করব। আমার ওপর বাবার বোঝার ভার কিছু কমল। তাই এ কথা শোনার পর বাবা চুপ করে রইল, কিন্তু বাবার জন্য আমি কি করতে পারি। আমার কিছু করার নেই। আমি শুধু চাই বাবা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। কিন্তু আর একটা বিয়ে করলেই কি বাবা সুখী হবে? শান্তিতে থাকতে পারবে? এইসময় আমার হঠাৎ একটা দুষ্টুমি খেলে গেল।

আমি একদিন বাবার হয়ে আমাদের বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপনটা এইরকম:

পত্নী পরিত্যক্ত পঞ্চান্ন বছরের তরুণের জন্য নিন-ছাতের বাড়ীওয়ালী চাই। বাড়ীওয়ালী অবশ্যই সুন্দরী, নির্ঝঞ্ঝাট এবং উদারমনস্ক হইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনটা দেখেই বাবা খুশি হল। তবে পত্নী পরিত্যক্ত কথাটা বাবার ভাল লাগল না। মৃদু আপত্তি করল। আমি এ আপত্তিতে বাবা দিলাম না। কিন্তু বাড়ীওয়ালী নিয়েই কথা নিয়ে বিভিন্নরি আমেদের শুরু হয়ে গেল। বাবার নজর সব সময় পাশবিলিন থেকে চল্লিশ বছরের মেয়েদের দিকে। আর আমার ইচ্ছে বাবার বাড়ীওয়ালী যেন সতের থেকে বাইশ-এর মধ্যে থাকে। শেষে বাবা বোধহয় আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলে উঠল, আমি, খুব হয়েছে। আমার আর বাড়ীওয়ালীর দরকার নেই। কথাটা শুনে আমি খুশির নিশ্বাস ফেললাম। বললাম, হ্যাঁ, সেটাই ভাল।

—তুই ত এটাই চাইছিলি।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম।

এরপরেও বাবার মন ভাল হল না। কদিন অফিস নিয়ে আবার কামাই করতে লাগল।

একদিন বললাম, আবার অফিস কামাই শুরু করেছ!

বাবা বলল, আমার আর অফিস যেতে ভালোলাগে না।

— আমারও ত কলেজ যেতে ভালোলাগে না।

—তাহলে চল কোথাও কদিন ঘুরে আসি।

—আমি এখন কোথাও যেতে পারব না। সামনে পরীক্ষা। তুমি বরং একাই ঘুরে এস।

—একা একা আমার ঘুরতে ভাল লাগে না।

—তাহলে অফিস করাই ভাল। বাড়ি বসে থেকে কোন লাভ নেই। এতে আরো মন খারাপ হয়।

বাবা একটু ভেবে বলল, যাই বলিস, তোর মা কিন্তু কাজটা ভাল করেনি।

—তুমি একথা কেন বলছ? আমি কখনো মার মুখে একটা কথাও বলিনি।

—তা বলিসনি, তবে তোর একটা প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

—সে ত তুমিও করতে পারতে।

—তা পারতাম। তবে কোন লাভ হত না। জানিস ত, তোর মা কি জীবণ একগুঁয়ে।

—তাই যদি হয়, তাহলে আমার কথা শুনবে কেন?

হাজার হোক তুই তার ছেলে। তোর কথা হয়ত মাও ফেলতে পারত।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, মায়েরা ছেলেদের এত ভালবাসে।

বাবা ঠাট্টা বুঝতে পেরে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, বাসে।

—তাহলে আমাকে ছেড়ে গেল কেন?

—তুই খারাপ করিসনি, তাই।

—খারাপ করলে মা ফেলে যায়?

—করলে যায়।

বাবার এই কথায় হঠাৎ আমার নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হল। মনে হল আমার সামান্য খুশির জন্য মা আমাদের ছেড়ে গেল।

আমি বললাম, কথাটা আগে বলনি কেন?

—ভুলে গেছিলাম। তবে এখনো উপায় আছে।

—কি?

—তুই যদি এখন একবার মার কাছে গিয়ে বলিস, মা, ফিরে এস। তাহলে তোর মা ঠিক ফিরে আসবে। তোর কথা ফেলতে পারবে না।

কথাটা শুনে ভাল লাগল। মা তাহলে আমাকে খুব ভালবাসে? আমি গেলে মা আমাকে ফেরাতে পারবে না। আমাদের কাছে আবার ফিরে আসবে। ঠিক আছে, তাই হবে। আমি একদিন মার কাছে যাব। মাকে বলব, মা, তুমি ফিরে এস। কিন্তু মা যদি না ফিরে আসে, তখন কি হবে।

বাবা এই সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল, কিরে! যাবি একদিন?

—যাব। —বলে একটু থেমে বললাম, সঙ্গে তুমিও চল না!

—আমি! মাথা খারাপ! আমাকে দেখলেই তোর মা খেপে যাবে।

—কেন?

—তা জানি না। তবে আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তুই বাড়ির ভিতর ঢুকবি। আমি দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব।

আমি এতে রাজী হলাম। বাবা যদি এতে খুশি হয়, হোক।

এরপর আস্তে আস্তে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বাবা অফিস যেতে লাগল। আমি কলেজ যেতে লাগলাম। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর বাবা এক শনিবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, মার কাছে কবে যাবি?

—যেদিন বলবে।

—তাহলে কাল চল।

—কাল কখন?

—সকালে বা বিকেলে।

—বিকেলে যেতে পারব না, আমার কাজ আছে।

—তবে সকালেই চল।

—বেশ তাই চল।

—কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

—কি?

—মার কাছে গিয়ে একটু কান্নাকাটি করতে হবে।

—কেন?

—বাহ্! মার মন ভেজাতে হবে না? মন না ভিজলে মা আসবে কেন?

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কিরে! পারবি তো?

গম্ভীর হয়ে বললাম, পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করব।

—ঠিক আছে। তাতেই হবে। বুঝলি না, এসব ক্ষেত্রে চোখের জলটা বড় কাজে দেয়।

আমি এ কথার জবাবে কিছু বললাম না। কারণ আমার চোখে সহসা জল আসে না। তবে এ কথা বাবাকে বলা যায় না। বললে বাবা কষ্ট পাবে। তার চেয়ে মার কাছে গিয়ে নিজের কথা না ভেবে বাবার কথা ভেবে চোখের জল ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি।

পরদিন রবিবার। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

মা সল্টলেকে থাকে জানি, কোথায় থাকে জানি না। বাবা জানে। বাবা আমাকে দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। নিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়ির সামনে ঝিনুকদের ফাকরা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই চিনতে পারলাম।

ডোরবেল টিপতেই মা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মা চোখ ধাঁধানো সাজগোজ করে ছিল। আমাকে দেখেই হাসি মুখে বলল, আয়, ভিতরে আয়।

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ—বলে মা আমাকে বসার ঘরে নিয়ে গেল।

দামী সোফাসেট, ঝলমলে, পেটিং দিয়ে সেটা ঘর সাজানো। মা এমন সুন্দর বাড়িতে আছে দেখে ভাল লাগল। তবে সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা ভেবে কষ্ট হল। বাবা কি কোনদিন এমন সুন্দর বাড়িতে থাকতে পারবে না?

আমি সোফার ওপর বসলাম। মা আমার পাশে বসল। বসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস?

—এক রকম।

—আমার জন্য মন খারাপ করে না?

মিথ্যে করে বললাম, খুব।

—আমারও তোর জন্য খুব মন খারাপ করে।

আমি চমকে উঠলাম, সত্যি!

—সত্যি।

জানি, এসব আমার কাঁদা উচিত। অন্তত শব্দ করে ডুকরে কাঁদতে না পারলেও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলা উচিত। কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরুল না। নিজের ওপর ভারী রাগ হল আমার। বাবা আমাকে কাঁদতে বলেছিল। তা, এসব কথায় যদি না কাঁদতে পারি, তাহলে আর কোন কথায় কাঁদব?

মা বলল, তোর কথা আমার প্রতিদিন মনে পড়ে।

—আমারো প্রতিদিন তোমার কথা মনে পড়ে।

—আমি জানতাম তুই একদিন আসবি।

—জানতে?

—হ্যাঁ।

—কি করে?

—ছেলে কি মাকে ছেড়ে থাকতে পারে।

এই কথা শুনেও আমার কান্না পেল না। শুকনো চোখ শুকনো থেকে গেল। একটুও সজল হয়ে উঠল না। অথচ সিনেমা দেখতে গিয়ে এক সময় এইসব সংলাপ শুনে কতদিন কেঁদেছি। অথচ আজ এখানে সেই একই সংলাপ শুনে আমার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে উঠল। বললাম, কিন্তু, তুমি তো ছেড়ে আছ।

—তার জন্য কষ্টও পাচ্ছি।

—কেন পাচ্ছ?

—কেন পাচ্ছি? আমি যে মা। আমাকে যে কষ্ট পেতেই হবে।

—না মা, তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে ফিরে

চল।

মা এই কথা শুনে যেন শিউরে উঠল। তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

—আমি খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলাম, আমাদের কাছে।

—অসম্ভব।

—কেন?

—আমি ঐ ফ্ল্যাটে আর ফিরে যেতে পারব না।

—কেন পারবে না? তোমার জন্য বাবার কি অবস্থা হয়েছে জানো?

—কি হয়েছে?

—বাবা রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারে না।

—না পারুক।

—ভাল করে খায় না।

—না খাক।

—শরীর ভেঙে পড়ছে।

—পড়ুক। তুই আমার কাছে তোর বাবার কথা একদম বলবি না।

—কেন?

—আমি তোর বাবাকে ঘেন্না করি।

এবার আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, মা।

ঠিক এই সময় ত্রিভুবন কাকা ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, তুমি! তা, কি ব্যাপার?

মিথ্যে করে বললাম, মাকে অনেকদিন দেখিনি, তাই দেখতে এলাম।

খুব ভাল কথা। —বলে ত্রিভুবন কাকা আমার পিঠে একটা মৃদু চাপড় মারলেন। মেয়ে বললেন, কিন্তু তোমার মাকে ত এখন ছেড়ে দিতে হবে বাবা।

—এখনি?

—হ্যাঁ, এখনি। একটু তাড়া আছে। তোমার মাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়। তুমি বরং আর একদিন এস।

এরপর আর বসে থাকা যায় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস খোকন।

আমি হেসে বললাম, অল্পেরা সবসময় ছেলেদের চেহারা রোগাই দেখে।

মা মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, আমি একথা মানব না। আমি যতদিন ও বাড়িতে ছিলাম ততদিন তোর চেহারা এর থেকে ভাল ছিল। এখন তোর গাল ভেঙে গেছে, কাঠমণি বিশ্রিভাবে বেরিয়ে এসেছে। আগে কি এরকম ছিল?

আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না।

মা একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, সকালে বোনভিটা দিয়ে দুধ খাচ্ছিস তো? নাকি আমি চলে আসার পর সে সব বন্ধ হয়ে গেছে?

—না, বন্ধ হয়নি।

—রাত্রে শোবার আগে কমলালেবু খাচ্ছিস।

—খাচ্ছি।

—রোজ মাছ আসে?

—আসে।

—কই না ছুটো চিংড়ি?

—কই।

—রবিবার মাংস হয়?

—হয়।

—বৃহস্পতিবার মুরগি আসে?

—আসে।

আসে না ছাই। তোর চেহারা দেখে বুঝতে পারছি ওসব কিছু আসে না।

—বিশ্বাস কর—

মা আমার কথায় মাঝখানেই বলে উঠল, তোর কথা বিশ্বাস করব। তুই যে খুব দুষ্টু। তুই যে কত ছালিয়েছিস আমাকে!

ত্রিভুবন কাকা এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলেন। এবার একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। মার উদ্দেশে বললেন, তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে নাও। ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মা বলল, আচ্ছা! দেখছ না খোকার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা। দুয়েকটা কথা কইছি। তোমার সহ্য হচ্ছে না!

ত্রিভুবন কাকা জবাবে বললেন, তোমার খোকা ত পালিয়ে যাচ্ছে না, আবার আসবে। তখন যত পার কথা বল।

বেশ তাই হবে—বলে মা ত্রিভুবন কাকার সঙ্গে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। মা সামনের সিটে ত্রিভুবন কাকার পাশে বসল।

আমিও পিছন পিছন এলাম। গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালাম। মা গাড়ির ভিতর থেকে বলল, আবার আসিস কিন্তু। আসবি ত?

আমি বললাম, আসব।

তারপর মা হঠাৎ ত্রিভুবন কাকার উদ্দেশে বলে উঠল, এই যে। ত্রিভুবন কাকা চমকে উঠে বললেন, কি হল?

—খোকাকে যে কিছু খেতে দেওয়া হল না!

—পরের দিন দিও। —বলে ত্রিভুবন কাকা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলেন।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। আর ঠিক তখনি মনে পড়ে গেল, মার কাছে আমার যে কাঁদার কথা ছিল। এখন কি করব? বাবাকে দিয়ে কি বলব? মাকে দিয়ে অন্তত মিথ্যে করে লিখিয়ে নেওয়া উচিত ছিল: খোকার কোন দোষ নাই। খোকা যথেষ্ট জ্বালিয়াছে। কিন্তু মা এখন বহুদূরে। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে ডাকলেও মা শুনতে পাবে না। ফলে একটু ভয়ে ভয়ে বাবার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাবা উদাস হয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, কথা হল?

—হয়েছে।

—মা কি বলল?

—মা আসবে না।

—বাবা কথাটা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানতাম, তোর মা আসবে না।

—তুমি জানতে!

—জানতাম।

—তাহলে আমাকে পাঠালে কেন?

—একবার চেষ্টা করে দেখলাম। বলে একটু থেমে বাবা জিজ্ঞেস করল, তুই কেঁদেছিলি?

—সুযোগ পাইনি।

—সে কি!

—সত্যি বলছি। কাঁদবার আগেই মা আর ত্রিভুবন কাকা গাড়ি করে কোথায় চলে গেল।

—কোথায়?

—জানি না।

এরপর বাবা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। আমিও চুপ করে রইলাম।

আমরা এবার আস্তে আস্তে বাস স্টপের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বাবাকে ভীষণ ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বাবার যেন অনেক বয়স হয়ে গেছে। বাবা ঝুঁকিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে বাবা এক সময় জিজ্ঞেস করল, তোর মা আমার কথা কিছু বলছিল?

—না।

আমি দেখলাম কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখটা কেমন ম্লান হয়ে গেল। হোক। সত্যি কথা বললে বাবা আরো কষ্ট পেত।

একটু পরে বাবা আবার জিজ্ঞেস করল, তোর মা কি আমার কথা একেবারেই ভুলে গেছে?

আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু চোখ-দুটো জলে ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, ইস! কিছুক্ষণ আগেও যদি চোখে এই জলটা আসত!

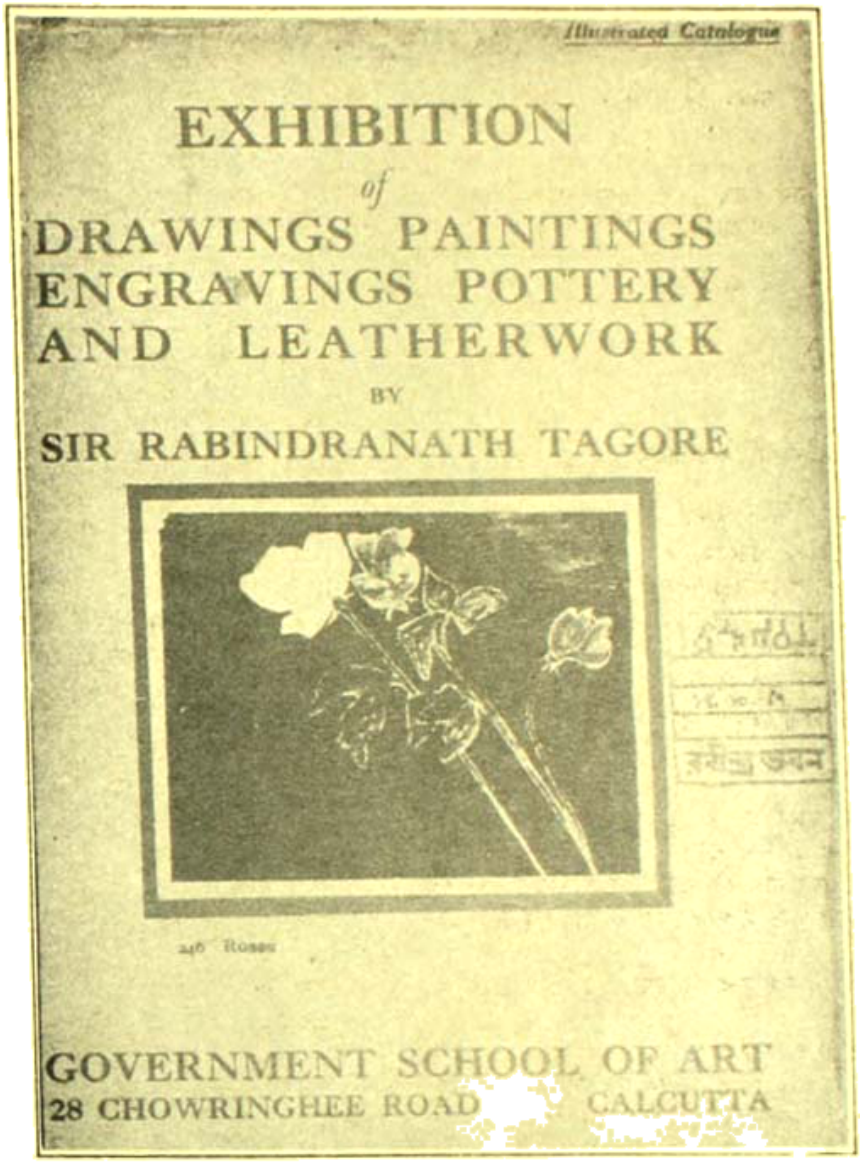

স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রদর্শনী এবং ছাপাই ছবি

সুশোভন অধিকারী

এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো জোরালো শিল্প-আন্দোলন গড়ে না উঠলেও এদেশে সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পেরও একটা বিশেষ ভূমিকাকে লক্ষ্য করা গেছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে ভালোবেসে তার বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন, করেছিলেন সমৃদ্ধ। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তেমন কিছু করে যেতে পারেননি। তবু এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছবি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত, নিন্দিত—বর্তমান নিবন্ধ তারই আলোকে।

রবীন্দ্রজীবনের চিত্রকলার দিকটি তাঁর জীবনের অন্যান্য দিকের মতই সমান অনুসন্ধিৎসার দাবী রাখে। খেলার ছলে লেখার কাটাকুটির মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত হলেও 'কবিকে শ্রেষ্ঠের' হিসেবে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ছবি আঁকার জন্য তাঁর যে টান, যে তাগিদ—তা প্রথম থেকেই এসেছিল তা না হলে অমন অজস্র অজানা সম্ভার, বিশ্ব সমালোচনাকে উপেক্ষা করে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছবি এঁকে যেতেন না। যদিও ছবি আঁকার সূত্রপাত খেলাচ্ছলেই কিন্তু সে ছবির জোরে 'তিনি চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ নন। অবশ্য, তাদের এড়াবার ছলেও কেন বিদেশের বিভিন্ন চিত্রশালা থেকে চোখে নিরীক্ষণ করেছেন বার বার মনের মধ্যে ছবিরচনার সাজ পিয়ে বলেন তাই মুখে যতই বলুন 'আমি কি ছাই ছবি আঁকি, উচ্চতর মহত্ত্ব কোনো কালেও ও আমাকে দেখালে না—কিন্তু মনে মনে জানতেন তখন, নকলনবিশ পথ ঠিক নয় ঠিক আধুনিক যুক্ত মনের কাছে ছবির সাজ ও বেশভূষার চিত্রকলার হাতে মনের। সেই নব চিত্ররীতি প্রসঙ্গে বলেছেন 'আমাদের চিত্রকলার অর্থ একটি ছোট, সহজ ও বৃহত্ত অর্থের আছে, এই কথা বার বার মনে হয়েছে।' (চিঠিপত্র-২) সেই কারণেই দেশছাড়ে শিল্পীরা যখন ছবিতে স্বাদেশিকতা, ভারতীয়ত্ব খুঁজতে ব্যস্ত তখন বেশ কিছুকাল পাশাপাশি অমন যা ইচ্ছে তাই আঁকার 'সাহস' রবীন্দ্রনাথের ছিল

রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রধান বিশিষ্টতা—কারুর আঙ্গিকের গঠনে, রঙ-আলোর বিচিত্র বিন্যাসে, আবেগপ্রসূত রেখা প্রতিভাত রেখার চমকে, ছবির অলঙ্করণবিভাজনে এবং বর্ণের উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে। কারিগরির প্রেক্ষাপট নয়, উপলব্ধিমূলক উপাখ্যান নয়, ভারতীয় অলঙ্কারের এ সবও কিছুই নয়—কেবল ছবির জন্যই ছবি। পঞ্চাশ বছরেরও আগে এটাই আধুনিক মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পনা। কিন্তু যতখানি আধুনিক মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা—এ দেশীয় দর্শক শ্রোতাই সে অর্থে আধুনিক ছিল না, হয়ত এখনও নয় কারণ সত্যিকথা বলতে আমাদের দেশে তেমন কোনো জোরালো শিল্পআন্দোলন গড়ে ওঠেনি, যা শিল্পকলা সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট উদার মত দেখা যায়নি। এবং বিশেষত চিত্রকলা প্রসঙ্গে দেশীয় মানুষের মধ্যে একটা সাবেকী মন কাজ করে চলেছে। ছবিকে ছবি দেখার চোখে দেখতে শেখা, বিচার করতে শেখার অনভিজ্ঞতা এখনও আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান। তাই পঞ্চাশ বছর আগে তা আরো অধিক হবে—এ আর এমন কি বেশি কথা।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষেরাও তাঁর ছবিকে 'গুরুদেবের খেয়াল' বলেই মনে করেছিলেন। তাঁর ছবিকে সমাদর করেছিলেন নেহাৎ গুরুদেবের কীর্তি হিসেবেই, আধুনিক চিত্রকলার যথার্থ মর্যাদায় নয়। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই—"বিশ্বাস করা শক্ত এগুলো সত্যিকারের ছবি, এখনকার ওস্তাদরা তো তাই বলতে। তোমরাও বলেছিলে মন্দ হয়নি, কিন্তু কিন্তু যেন মৃদুস্বরে এবং অনেকখানি হতে রেখে।..."

(ক্রোশেনহেদেন থেকে প্রশান্ত মহলানবিশকে চিঠি)

১৯৩০-এ কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসেবে বিদেশী ক্লাসিক ও সমালোচকদের কাছে অভিনন্দিত। প্যারিস, গুরুদ্বকোর্ড, ধার্মিংহ্যাম, লন্ডন প্রভৃতি একাধিক প্রদর্শনীতে যথেষ্ট আলোচিত। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে তাঁর ছবি তখনও অপ্রকাশিত। এমন সময় ১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের সপ্তম বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র জয়োৎসবের আয়োজন হল কলকাতায়। বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে টাউন হলে মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন ত্রিপুরার মহারাজা বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩১) প্রদর্শনীতে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রায় ধূলোটি ছবি প্রথম ভারতীয়

১৯৩১-এ ১ ডেসেম্বরে তৈরি রবীন্দ্রনাথের প্রথম এক একের পাই।

ধানক্ষেতের মধ্যে, যে রকম ধান উৎপাদনের পরিবেশে তৈরি হয়

দক্ষিণাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

বর্তমান ভাইরোলজিস্টদের অনুমান এই ভাইরাস ও ভাইরাসটি প্রথমদিকে যেরকম মারাত্মক ছিল সেরকম মারাত্মক নয়। ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেন থেকে সুবিধাজনক ও উৎপন্ন ভিন্নতর নতুন সংস্করণটি মূলতঃ প্রথমদিকে যেরকম মারাত্মক ছিল সেরকম নয়। এই প্রথমদিকের ভাইরাস ধানের ক্ষতিকারক ভাইরাসটি ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়েছিল

আধুনিক ছবির অলঙ্কারহীন সহজেই ছবিকে খেলা করতে করতে—"রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিয়াছেন, শুধু আঁকেন নাই, আঁকিয়া জগতের গুণীসমাজে খ্যাতিলাভও করিয়াছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার ইহা বিকাশ না বিবর্তন? বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কয়খানি কলা ছিল, ক্রমে ক্রমে প্রায় সবগুলি রবীন্দ্রপ্রতিভাসম্পদীয় ডিঙিতে ডিঙিতে পৃথিবী উঠিয়া এতদিনে কি ছেলেকলা সম্পূর্ণ হইয়া সৌন্দর্যশ্রী দেখা দিল? না, কৃষ্ণপক্ষের রবীন্দ্রশশী একে একে সকল কলাগুলি আসন করিয়া শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে? —"কলঙ্কময় দেখা হিসাবেই। আমরা প্রার্থনা করি, ইহাই যেন শেষকলা না হয়। মূর্তি ও বাস্তব দুইটি কলা এখনও বাকি আছে, আশা হয় এ দুটিও বাদ যাইবে না, অন্তত বাস্তব কলাটি। —

—ছবিগুলি ছবি হউক আর না হউক—একটা কিছু ঘটেছে, আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। অনেকগুলিতে খাওলা ছাগলা মেয়েলী জাতীয় একটা ভাব আছে, আবার কতকগুলিতে যে বিকট হিজিবিজির মত রেখাবিন্যাস আছে—তাহার সহিত লালা কিম্বা সরীসৃপের সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছবিগুলির অবচেতন রহস্যের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এগুলি তাঁহার অবচেতন হইতে উদ্ভূত। যদি তাহাই হয় তবে এগুলিকে চিত্রলিপির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া মনোবিকলন শাস্ত্রের অধীন করাই ত সঙ্গত। সজ্ঞান সৌন্দর্য সাধকের নির্জ্ঞানে যে কৃত্রিম-কৃত্রিমের প্রীতি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, এগুলি কি তাহাই কবি প্রতিভার ওজরাজ অবস্থায় মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে?"
(শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৩৮)

একটি Anglo Indian কাগজে এক সমালোচকের বক্তব্য—

"Are we then all travelling the wrong road in giving encouragement to formal art, in establishing academics and schools, in paying teachers and encouraging pupils to study under them? Would it not better to let each man find his own mode of expression in pencil and paint when drawn by the urge to do so, and so save the cost of encouragement? We should have fewer artists but more individuality. Formalism would be sent to the scrap heap. If that be the right policy, it is pitiful to think of all the thousands of young men and woman who are struggling daily in schools to win the mastery of their medium : ..."For if a man without academic training of any kind, merely setting down on paper in crude fashion and without technical accomplishment the vision of things as they appear to-him is hailed as an artist, than the world is wrong spent

ছবিটির পূর্বে এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা ছবি

on teaching art."

এই অজ্ঞান সমালোচকটির মন্তব্য বিজ্ঞ রসিকমাত্রই আড়ালে হাসি সম্বরণ করবেন। কলম নিয়ে সাহিত্যের সৃজনধর্মী ক্ষেত্রে লিখিত নিজস্বতা, স্বকীয়তা একটা বড় কথা। এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই বিজ্ঞজনের নিজস্বতাকে জাগিয়ে তোলাই আসল উদ্দেশ্য, নকলনবিশ তৈরি করা নয়। হয়ত কেউ সারাজীবন নিজের লিখি হতে পারেন না, আবার কারোও সৃজনশীলতার বিকাশ তথাকথিত পুঁথিগতবিদ্যার তলায় ছড়াই।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চ্যাটার্জী 'The Modern Review' পত্রিকায় এই সমালোচনার উত্তরে লিখেছিলেন—

"Criticism of art in this country is as yet done mostly in careless and cursory fashion, and in most cases by persons who are not in the least qualified for the task. As a matter of fact, there are only a few persons in this country who have any authority—derived either from training from personal study to write on this subject at all./And amongst these foreigners, resident in this country form a very small minority. But the political status of India is such that any hack writer can make puerile and derogatory remarks, clothed in bombastic terms and a show of learning, and go scatheless, whatever his knowledge of the

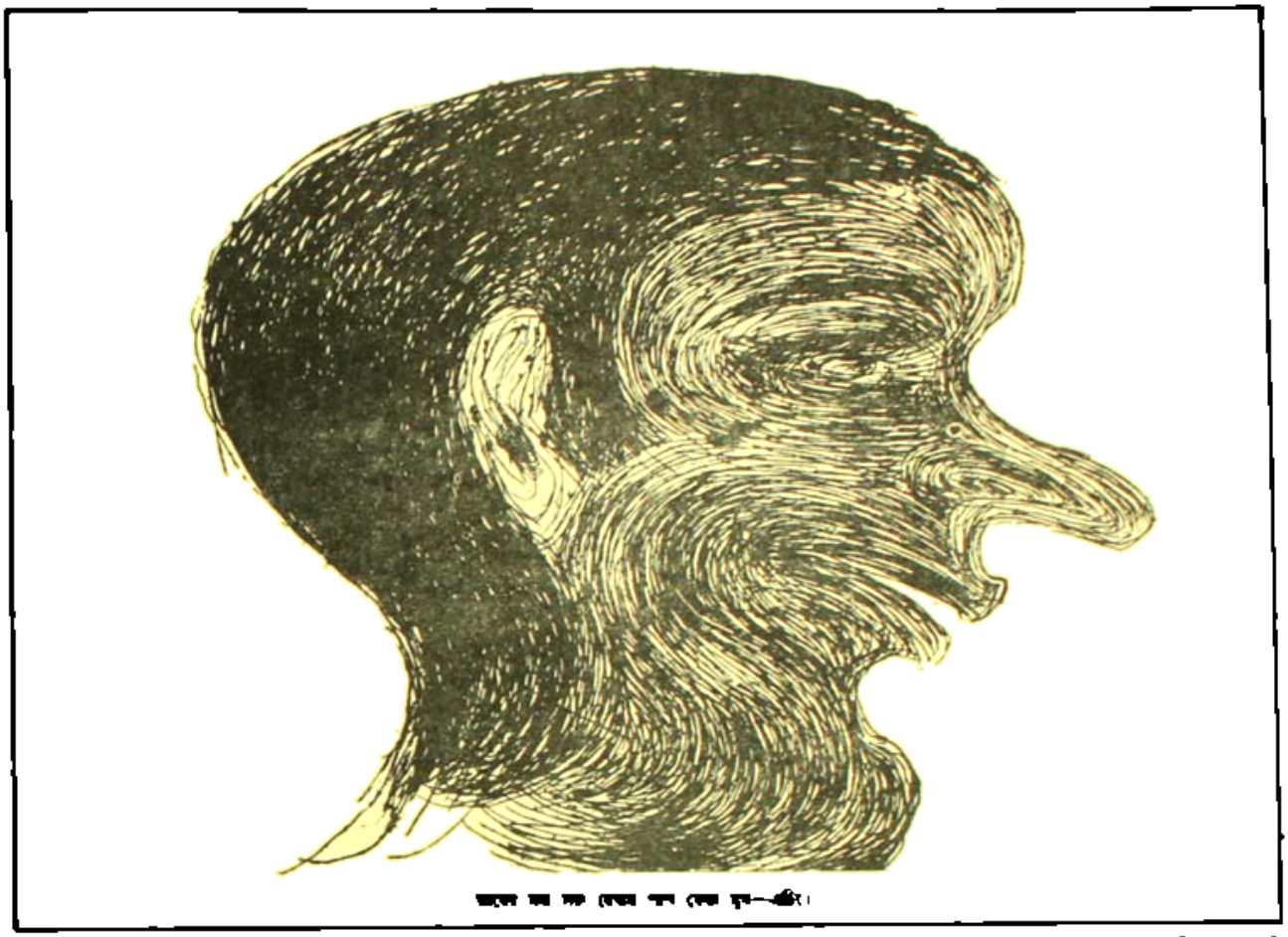

ছবির মধ্যে কোন কথা নেই—এটি।

subject might be...."

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেন নি। তিনি জানতেন—"চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোন ভূমিকাই হয়নি।" তাই কোনরকম সমালোচনায় কর্ণপাত না করেই তুলি কলম নিয়ে আপন মনে ছবি এঁকে চলেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে তাঁর চিত্র উপলব্ধির কথা পাওয়া গেছে—

—"ছবিটা ছবিই, তার বেশি কিছু নয়, তার কমও না। সব ছবিই ছবি—ভারতীয়, অভারতীয়, ও সব কিছু না। ভিতর থেকে এলো তো এলো, না এলো তো এলো না। চেয়ে দেখো, ছবিটা ছবি হয়েছে কিনা। কিন্তু দেখবার দৃষ্টি কই আমাদের? তার জন্য অনেক দিনের অভ্যেস চাই। সে অভ্যেস আমাদের নেই বললেই চলে।"

(সাহিত্য, গান, ছবি, প্রবাসী আষা ১৩৩৮)

কখনও ধৃষ্টি অভিমানের সুরে—

"...পূর্ব দিগন্তে রবির প্রথম উদয় প্রভাতসঙ্গীত মুখরিত—পূর্ব আকাশের জন্য বাঁশী রইল গান রইল। পশ্চিম আকাশে অস্তদিনের খেলায় বর্ণ বিচিত্র ছবি। এই ভাবা পশ্চিম ভালো বোঝে, পশ্চিমকেই উৎসর্গ করলুম। পূর্ব সীমানায় সে থাকবে অবগুণ্ঠিত এই আমার বিধান। আমার ছবি ও গান সমুদ্রের দুই তীরে দুই নীড়ে ভিন্ন বাসায় থাকবে। ..."

(১৭ই জুন ১৯৩১)

আবার কখনও একটা চাপা ক্ষোভ ফুটেছে কথার মধ্যে—

"কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রঙ বলো কোন প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এই জন্য স্বভাবই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি।—আমি যে শতকরা একশোহারে বাঙালি নই আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।"

(পথে ও পথের প্রান্তে)

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রদর্শনী ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারীতে (২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) টৌরঙ্গী আর্ট স্কুলে। স্কুলের সে সময় আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীর আয়োজকও তিনি। এবারের প্রদর্শনীর বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় ছিল ২৬৫টি ছবির মধ্যে কিছু ছাপাই ছবি ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অপেক্ষা ছাপাই ছবি অনেক আধুনিক চিত্রমাধ্যম। যেখানে হয়ত কারিগরী দক্ষতা ও যান্ত্রিক কলাকৌশল অনেকখানিই অভ্যাস ও রপ্ত করতে জানতে হয়। তাছাড়া মাধ্যমের উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতাকে চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগানো ও কোনও ক্ষেত্রে যান্ত্রিক অনুষঙ্গের আকস্মিক ফল শিল্পসৃষ্টির অনুকূল হয়ে ওঠে—যা এই আধুনিক মাধ্যমটির বিশেষ দিক। আবার যান্ত্রিক অনুষঙ্গের জন্য মাধ্যমটি একটু পরোক্ষও বটে। শিল্পী এখানে সরাসরি কাগজ বা 'ক্যানভাসে' আঁচড় না কেটে ছবি তৈরি করেন কাঠ, পাথর (লিথোস্টোন) বা ধাতু ফলকের ওপর। তার থেকে ছাপ নিয়ে হয় ছবি। ছবি আঁকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যতখানি লাগামছাড়া, বেপরোয়া—ততখানি আর কোন ক্ষেত্রেই নয়। তাই ছবি আঁকার খেলায় অধৈর্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছাপাই ছবির যান্ত্রিক কুশলতা ও ধীরগতি রবীন্দ্রনাথকে কতটা আকৃষ্যায়িত করেছিল, তা বলা শক্ত। কিন্তু পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে শুরু করে কালী কলমের রেখাঙ্কন ও সাদা কালোর ছবিতে বরাবরই একটা 'গ্রাফিক' গুণ কাজ করে চলেছে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে। তাই 'এচিং' বা

'ড্রাইপয়েন্ট' না করলেও তার মূল কারণ বৈশিষ্ট্য তাঁর জানাই ছিল। সরু কলমের নিব্ দিয়ে একটার পর একটা রেখা টেনে কাগজের ওপর সাদা-কালোর ছবি তৈরি করেছেন অনায়ত্ত। পাশাপাশি অথবা ক্রমে একটার ওপর আর একটা সরু সূক্ষ্মরেখার এসব ছবিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তৈরি হয়েছে কোথাও জমাট গাঢ় অন্ধকার, কোথাও বা স্বচ্ছ আলোকিত অংশ। রীতিমতো সময়সাপেক্ষ এসব অঙ্কন সৃষ্টি হয়েছে সরু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাতের সংযমী গতিতে ফলে 'এচিং' বা 'ড্রাইপয়েন্ট' করতে গিয়ে জলি কলমে কাগজের ওপর রেখাঙ্কন করার মতই সাবলীলভাবে কাজ করেছেন। নতুন মাধ্যমে কাজের অনুবিধার পড়েছে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে, কাগজের উপর সূক্ষ্ম এমনকি মসৃণ রেখা সৃষ্টি হয়েছে আশ্চর্য স্বাভাবিক ভোরালেই। এসব রেখাচিত্র অনেকটিতে জলি মাধ্যমে কাগজে ছাপ তুলিয়ে ছবি শেষ হয়েছে। প্রিন্ট নেওয়া প্রকৃতির যন্ত্রনির্ভর কাজ হয়েছিল মুদ্রণের সাহায্যেই। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ কেবল কাগজের উপর আঁক টেনেই মুদ্রণকে দিয়েছেন। অন্যেরা মুদ্রণ যে 'প্রুফ প্রিন্ট' দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছেন এবং তাঁদের আবার কখনো কখনো প্রয়োজন মতো রেখা টেনে ছবি শেষ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এইটেই রবীন্দ্রনাথের ছাপাই ছবি রচনার ইতিহাস। ১৯৩২-এর চিত্র প্রদর্শনীতে ছবিগুলি বিক্রি হবার কথা ঘোষিত হয়েছিল। তাই অনুমান হয় রবীন্দ্রভবন, কলাভবন ও রবীন্দ্রভারতী ছাড়াও বিশ্ব ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ ছবি থেকে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

এই 'এচিং' বা 'ড্রাইপয়েন্ট'-এর প্রকৃত সংখ্যা কত ছিল সঠিক বলা যায় না। রবীন্দ্রভবন, কলাভবন ও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় তিনটি 'এচিং'-এরই একাধিক প্রিন্ট রাখা আছে। এর মধ্যে আবার একটি ছবি 'ভিনিসিলিন' প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত। ২৫ সেমি দীর্ঘ ১৯৩ সেমি প্রস্থ ছবিটির সঙ্গে সেখানে সংযুক্ত হয়েছে ছোট দু'লাইন কবিতা "অসীমসুনো এল, অবাক চক্ষু মৃদুরহস্য দেখা।" ছবির বিষয়, তরঙ্গায়িত বেলাভূমির পাশে উপবিষ্টা এক নারীমূর্তি, পাশ ফিরে বসা। ছবির পশ্চাৎপট সূক্ষ্ম রেখা টেনে গড়া অন্তরালের মত এবং পায়ের কাছে তরঙ্গায়িত সলিল বক্ররেখার মোহ প্রবাহ। অসাধারণ দক্ষতার সৃষ্টি। দৃশ্যায়িত রেখাগুলি যেন একটার পরে একটা পরবর্তীর তরঙ্গের সূক্ষ্ম অনুকম্পনের মত গড়ে উঠেছে। এই জাতীয় রেখার জালের ব্যবহার হয়ত ছিটকে আসে, যেমন অন্যত্র অসাধারণী রেখা নেই।

রেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—"ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি।"

(ঐক্য, শিক্ষার বিকল্প)

রবীন্দ্রনাথের রেখা সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—

"রবীন্দ্রনাথ রীতিমত ছবি আঁকা না শিখলেও কলমের গতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে চালনা করবার অভ্যাস তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর হাতের রেখা দেখেই বোঝা যাবে যে রেখার গতি তাঁর কতটা আয়ত্তের মধ্যে। তাই কলমে আঁকা যেন আঁকার বা রেখা রচনার মধ্যে প্রায় কখনোই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ছিটীয় পর্বের রচনাতে এরকম দুর্বলতার সামান্য ইঙ্গিত আর নেই। এই রেখাই রবীন্দ্রনাথের রচনার আত্মিককে পূর্ণতা দিয়েছে।"

(রবীন্দ্রচিত্রের ভিত্তি)

রবীন্দ্রচিত্রের রেখা সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তি সহজবার সত্য। কারণ একটু নিরীক্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে চোখ রাখলেই দেখা যাবে—মুক্তাত সাদা-কালোর রেখাঙ্কন ও কালিমুলির রেখাভিত্তিক ছবির প্রত্যেকটাতেই তিনি যতটা সফল, প্রত্যেকটি রঙের ছবিতে ততখানি নয়। অবশ্য একথাও ঠিক, যে একাধিক রঙিন ছবির বিন্যাস ও নির্মিতির দুর্বলতাকে ঢেকে নিতে সক্ষম হেমন রবীন্দ্রনাথের রঙের হেয়ালিগুলি, বর্ণের মুক্তিমন্ত্র দীপ্তি। তাঁর প্রথম দিকের ছবিতে যেখানে রঙ

"অসীমের সঙ্গী—রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩২

কেবল রেখাপাতের দ্বারা
ছবি হইতে পারে,
কিন্তু কেবল বর্ণপাতের
দ্বারা ছবি হইতে
পারে না বর্ণটা রেখার
আনুষঙ্গিক।....
রঙ জিনিসটা রেখা এবং অ-রেখায়
মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি।...
রেখা যেন অ-রেখার দিকে
আপন ইশারা চালাইতে থাকে।
রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট.....।

প্রায় অনুপস্থিত, ছবি কেবল "সাদাকালোর বিরহমিলনের খেলা"—সেখানে রেখাই ছবির সর্বস্ব। সরু, মোটা, বক্র, কৌণিক রেখা যেন বুনে বুনে তৈরি হচ্ছে ছবি—যার মধ্যে 'এচিং' বা 'ড্রাইপয়েন্ট'এর সমস্ত গুণই বর্তমান।

পরবর্তী এচিং প্রিন্টটি একটি পাশ ফেরা পুরুষ মুখের ছবি। অনেকটা মুখোশের মত এবং একটু ক্যারিকেচার ঘেঁষা। একটা অদ্ভুত বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও মুখোশের ছবিতে যে একধরনের ব্যঙ্গ বা কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে যা কেবল নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের মুখে এবং কখনও মুখোশের মধ্যে। আবার হুবহু উচ্চবিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের প্রতিকৃতিতে একজাতীয় চাপা ক্ষেদ, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ভাষাময় চোখে সেখানে এক অব্যক্ত বিষাদ। এই শ্রেণীগত বিভেদের অভিব্যক্তিতে কিসের ইঙ্গিত জানি না। এই পাশ ফেরা মুখের ছবিটিও অসংখ্য সুসংবদ্ধ রেখার বিন্যাসে তৈরি। কালি কলমের ছবিতে ও জাতীয় মুখের ছবি পাওয়া যাবে অনেক। ছবিটি আকারে ১৮ সেমি×১২ সেমি। এই এচিং ও রেখাঙ্কনের ছবির সঙ্গে চিত্রে রেখার ভূমিকা সম্পর্কিত মন্তব্যগুলো পাশাপাশি মিলে যায় অত্যন্ত সহজেই—

"কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে, কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক। ...রঙ জিনিসটা রেখা এবং অ-রেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি। ...রেখা যেন অ-রেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট...।"

(বিচিত্র প্রবন্ধ, ছবির অর্থ)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে রেখা ও অ-রেখার মিলনের মধ্য দিয়ে যে চিত্রসৃষ্টি, রঙ তারই মধ্যস্থ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ লেখা ১৩২২ আষাঢ় অর্থাৎ ১৯১৫-তে। তাই মনে হয় ১৯০৬/০৭ এর পর কেবল রঙ তুলি নিয়ে যখন আকুল হয়ে রঙিন ছবি এঁকে চলেছেন সে সময় ছবির প্রসঙ্গে আলোচনার মূলের প্রতি স্তরে একটু পক্ষপাতে তিনি নিশ্চয়ই দেখাতেন। কারণ 'চিত্র কথাটির সঙ্গে বর্ণের ওতপ্রোত যোগাযোগের উপলব্ধি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে না হলে অমন উজ্জ্বল নীল, ঝলমলে হলুদ, গাঢ় কমলায় উজ্জ্বল বর্ণিল ছবি সৃষ্টি করতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ।

পরবর্তী ছাপাই ছবিটি একটি দৃশ্যচিত্রের মত। ছোট প্রায় চতুষ্কোণ ছবিটির বামদিক ঘেঁষে একটি নারকেল গাছ উলম্বভাবে নীচ থেকে উপরে উঠেছে, চিত্রপটের ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত। দূরে দিগন্তরেখায় কিছু গাছের সারি। আকাশের গায়ে এলোমেলো রেখা—সমস্ত ছবিটার মধ্যে একটা 'স্কেচি' ভাব আছে। আমের দুটি প্রিন্টের মত ধীরে, সময় নিয়ে করা নয়। দ্রুত গতিময় রেখার স্বতস্ফূর্তিতে ছবিটিতে এক প্রকার তাৎক্ষণিক আবেদন এনেছে। ছবিটির নীচে কাগজের বাম দিকের কোণায় পেনসিলে লেখা 'নারিকেল ডাঙা'—তবে রবীন্দ্র হস্তলিপি নয়। ছবিটির আকার, ১৮ সেমি দীর্ঘ ও প্রস্থে ১২ সেমি।

রবীন্দ্রনাথ এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট করেছিলেন—এ খবর ইতিহাসের দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ, ছাপাই ছবির জগতে বিশেষ অবদানের দিক থেকে নিশ্চয়ই নয়। কারুকৌশলে দক্ষতা ও যান্ত্রিক অনুষঙ্গের সহযোগিতা তিনি নিয়েছিলেন, যতটুকু না হলেই নয়। তাঁর কাজ কলমের নিব দিয়ে কাগজের বুকে রেখাঙ্কন ও যাদুফলকের ওপর সূচিসূক্ষ্ম খোদাইয়ের কোনো ভিন্নতা নেই, ছবি তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। আধুনিক প্রিন্টমেকারদের মত কারুকৌশল সর্বস্ব চমক না হয়েও তাঁর ছবি, তার চিত্র উপলব্ধি কত আধুনিক—

"সাদার উপরে কালোর লেখা, এই হইল ছবির গোড়া। অন্ধকার সৃষ্টির মধ্যে চোখে দেখিতেছি তাহা আলোর উপলব্ধির সঙ্গে উপলব্ধির সমান দাম। এই দুইটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আর উল্টা কালো, আলোর বুকের উপরে ছায়ার চিহ্নের কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। অন্ধকার সে শুধু প্রকাশের অর্পণের মতো। সাদার উপর যেই সে লেখা কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রভঙ্গে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে।"

(বিচিত্র প্রবন্ধ ছবির অর্থ)

---

(১) রেখাঙ্কনের চর্চাটা, প্রধানত চিত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে, পশ্চিমে প্রধানত 'স্কেচ'এর সমার্থক ছিল।

(২) ১৯৬১ এর প্রদর্শনীর জন্য পরবর্তী ক্যাটালগে জানানো হয় এর ছবিগুলির কয়েকটি ১৯০৭ সালে করা। এখানে উল্লিখিত প্রকাশক সেটিকেসিস এবং ১৯৬৭ সালটি এক ভুল। সেপ্টেম্বরের পরবর্তী ১৯৬১ এর ডিসেম্বরে এসে এবং নিয়ে ভিন্ন, ক্যাটালগ থেকে জানা যায়। এবং সেখানে প্রকাশিত ছবিগুলি যে এই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও একমাত্র প্রদর্শনীতে ছিল তার আর্কাইভিস্টের পরবর্তী বছরের আলোচনা সাপেক্ষে।

বিশ্ব ভারতী আর্কাইভ—রবীন্দ্রভবন, কলকাতা এবং 'কালান্তর' গ্রন্থটির সৌজন্যে।

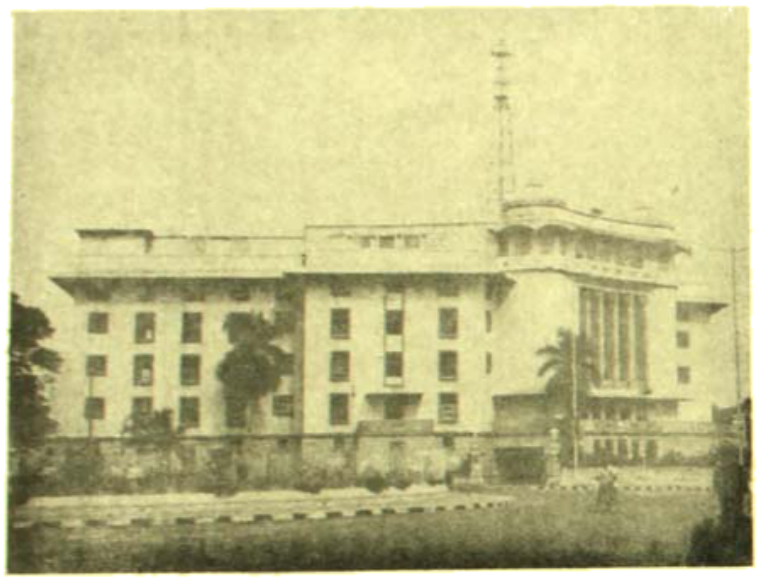

॥ অথ মহিষাসুর মর্দ্দিনী কথা ॥

বিমলভূষণ

শারদোৎসবে দেবী দুর্গার আবাহনে আগমনী বার্তার শুভ সংকেত দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে অর্ধ শতাব্দী আগে 'আকাশবাণী' যে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেছিল— আজও তার জনপ্রিয়তা বিশেষ এক গুরুত্বে আসীন। এখানে তারই ইতিহাস তথ্যে ও বিশ্লেষণে লিপিবদ্ধ।

যখন শেফালির অমল কমল ফোটে, নীল আকাশের ঘুম ভেঙে যখনই ঝিকে ঝিকে শরৎ বর্ণীর বীণা বেজে ওঠে—বাঙালী মাত্রেই তখন মেতে ওঠে দেবী দুর্গার অকাল অকল্পনীয় আবাহনে।

সেই শুভ-উৎসবের উদ্বোধনী সাকেতে বিশেষ একটি যে অনুষ্ঠান তার নাম 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'

পঞ্চাশ বছরের পরও এই অনুষ্ঠান আজো সগৌরবে তার প্রতিষ্ঠা সমানভাবে বজায় তো রেখেছেই—চাই কি যদি বলা যায় যে তার জনপ্রিয়তা কমা তো দূরস্থান—বেড়েই চলেছে বললেও অত্যুক্তি করা হবেনা।

বিশেষ করে ওটির নং ৩ রেকর্ড বা ক্যাসেট বেরোনোর পরও তার বেতার প্রচারের ক্ষেত্রে চাহিদা বিন্দুমাত্র কমে নি।

যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু নিম্নরুচির হিংসুক লোক ঘুরেফিরে বলের আড়ালে 'এটি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে'—এই কথা চালু করে এর প্রচার বন্ধ করতে অপ্রাণ চেষ্টা চালাতে কসুর করেন নি (বা এখনো করেন না) তবু বলব যে সৌভাগ্যবশতঃ ওপর তলায় যাঁরা আছেন বেতারে, তাঁরা একবার এটি পালটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যে ধাক্কা খেয়েছিলেন তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ওই দুঃসাহসিক পথ থেকে নিজে থাকার সিদ্ধান্তটাই মেনে নিয়েছেন।

যাক গে একথা।

যে কথা বলব ভেবে কলম ধরেছি তা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমেই কথাগুলো মনে এসে পড়ল. তাই না বলে চুপচাপ থাকা সম্ভব হল না সেইজন্যে ক্ষমা প্রার্থী।

এবার আসল কথায় আসি।

এই 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' প্রসঙ্গ উঠলেই যে মানুষটির কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করা উচিত তাঁর নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।

ভাববেন না আমি অত্যধিক আবেগ প্রবণ হয়ে উলটো-পালটা লিখে দিচ্ছি।

নামটা আমি ঠিকই লিখেছি। আর আপনারাও ওঁকে খুবই চেনেন তবে ও নামে নয়, ওঁর ছদ্মনামে। সেই ছদ্মনামটি হল 'বাণীকুমার'। এখন আর চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয়।

মজা দেখুন—কুমুদকুমার গাঙ্গুলী যে চিত্রতারকা অশোককুমার আমরা কি জানি? কিংবা শচীন্দ্রনাথ যে বিশ্বাসই যে 'ছবি বিশ্বাস', নগেন্দ্রনাথ সান্যালই যে 'পাহাড়ী সান্যাল বা সামান্য বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে 'ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়' এই বা ক'জন জানি।

মুশকিল কি জানেন—মানুষ নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা জেনেও তাকে এড়াতে পারে না। যেমন আমি।

কোনো প্রসঙ্গের সঙ্গে অন্য কোনো প্রসঙ্গের যোগাযোগ পেলেই তার উল্লেখ না

করে থাকতে পারি না।

তবে আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার দোষত্রুটিগুলো আমার প্রিয় শ্রোতৃকুল, দর্শকবৃন্দ বা পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে ক্ষমাঘেন্না করে নেয়। সেটাই আমার সাহস যোগায়।

আবার মূল বক্তব্যের দিকে মোড় ঘোরাই, কেমন।

সেটা ১৯৩০-৩১ সাল হবে।

মহিষাসুরমর্দিনীর কথা বলছি যখন তখন মনে হয় বাংলা বছরটাই ধরা ভালো। তা হলে দাঁড়ায় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮।

কলকাতা বেতার তখন বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং-এর কর্তৃত্ব বা পরিচালনাধীন।

সেকালের বিখ্যাত ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্য মন্দিরের সঙ্গীত বিভাগের অন্যতম প্রধান। তাঁকে আনা হয়েছিল ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের সঙ্গীত শুধু নয় এ দেশী গান বাজনার সঙ্গে নাটক, বক্তৃতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করে অনুষ্ঠান রচনায় সাহায্য করার জন্যে। নৃপেন্দ্রনাথ এ কাজে আশাতিরিক্ত সাফল্যের নিদর্শন রেখেছিলেন।

তখনকার স্বনামধন্য মানুষদের প্রায় সকলকেই যেমন তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করাতে ভুল হত না তাঁর, তেমনি প্রকৃত গুণসম্পন্ন নবীন প্রতিভার সন্ধান কাজও অবিরত চালিয়ে যেতেন তিনি।

সেই সন্ধান কাজেরই অন্যতম আবিষ্কার 'চিত্রা সংসদ' নামে এক অভিজাত সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায়ে ছিলেন বাণীকুমার, পংকজকুমার মল্লিক, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিজন বসু, তারকনাথ ঘে প্রভৃতি।

নৃপেন্দ্রনাথ এঁদের কাউকেই রেডিও থেকে দূরে থাকতে দেননি।

পংকজকুমারকে সঙ্গীত শিক্ষার আসরে, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণকে নাট্য বিভাগের, বিজন বসুকে সংবাদ প্রচারের এবং তারকনাথ ঘে-কে অর্কেস্ট্রা পরিচালনার কাজের দায়িত্বে বসিয়েছিলেন। এর কিছুদিন আগে পরে যোগদান করেছিলেন সঙ্গীত বিভাগে রাইচাঁদ বড়াল আর বেতার জগৎ পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নলিনীকান্ত সরকার।

আর বাণীকুমারের জন্যে একটি নতুন বিভাগ খোলা হল—বেতার বিচিত্রা। বিভাগটির নামকরণ করেছিলেন বাণীকুমারই। রেডিও কর্তৃপক্ষ অবশ্য খাতায় কলমে ঐ অনুষ্ঠানটির উল্লেখ করতেন 'মিউজিক্যাল ফীচার' (Musical feature) হিসাবে।

নৃপেন্দ্রনাথ পাকা জহুরী ছিলেন।

একদিন বাণীকুমারকে অনুরোধ করে বসলেন—নতুন ধরনের একটা অনুষ্ঠান প্রচারের চেষ্টা করতে।

সে অনুরোধ সানন্দে গ্রহণ করলেন বাণীকুমার।

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচনা করলেন 'বসন্তেশ্বরী'।

বিমুগ্ধ নৃপেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সেটির প্রচারকাল স্থির করে ফেললেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীর প্রভাতে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজার অনুষ্ঠান সন্ধিক্ষণে—'বসন্তেশ্বরী' বেতারে সম্প্রচারিত হল।

হরিপ্রসন্ন বাণী সে সময়ে কলকাতা রেডিওর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের গানগুলিতে সুরারোপ করলেন পংকজকুমার, নাট্যকথাসূত্রে অংশ নিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রী চণ্ডীর কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করেন স্বয়ং অনুষ্ঠান প্রবর্তক বাণীকুমার। আর সমগ্র অনুষ্ঠানটির আবহসঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাইচাঁদ বড়াল।

আর, সেই অনুষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করল তা কেউ ভাবতেও পারেন নি।

নৃপেন্দ্রনাথও মুহূর্ত মধ্যে তাঁর পরবর্তী কার্যপন্থা স্থির করে ফেললেন।

বাণীকুমারকে অভিনন্দিত করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অনুরোধ জানালেন অনুষ্ঠানটিকে পরিবর্ধিত করে নব-কলেবর দিতে যাতে, ওটি পরবর্তী শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে প্রচার করা সম্ভব হয়।

নৃপেন্দ্রনাথের সে অনুরোধও বাণীকুমার সানন্দে গ্রহণ করলেন।

সংস্কৃত রূপকের অন্তর্গত 'যীথী' (ইংরেজীতে যাকে Oratorio বলে) নাট্য রচনাশৈলী অনুসরণে রচিত 'মহিষাসুর মর্দিনী'।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে দেবীপক্ষের শুভ-ষষ্ঠীর প্রত্যূষে নিবেদিত হল মহাশক্তি বন্দনার এই পূণ্য-অর্ঘ্য:

অবশ্য পরবর্তী বছর থেকে অনুষ্ঠানটি মহালয়ার দিন প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ সে সময় মহালয়ার দিনটি সরকারী ছুটির দিন হিসেবে গণ্য হত।

কিন্তু বেশ কিছু শ্রোতার তরফ থেকে এই দিনটিতে ঐ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়। তাঁদের বক্তব্য—ঐদিন কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা এবং দেবীপক্ষের শুরু হয় ঐ অমাবস্যার পরদিন থেকে।

সেই জন্যে অনুষ্ঠানটি বেশ কিছুদিন মহালয়ার পরদিনই প্রচারিত হত।

তবে, শেষ পর্যন্ত আবার অজস্র সংখ্যায় শ্রোতৃবৃন্দেরই সনির্বন্ধ অনুরোধ আসে যাতে অনুষ্ঠানটি আবার ঐ মহালয়ার দিনটিতেই প্রচার করা হয়।

সেই কারণেই অনুষ্ঠানটি ঐ মহালয়ার দিনেই আবার প্রচার করা শুরু হয়।

তাই দেবী দুর্গার বোধনবাণী ও মন্ত্র সম্বলিত এই অনুষ্ঠানটির শ্রোতৃসাধারণকে মহালয়া-অনুষ্ঠান হিসেবেই চিহ্নিত করতে দেখা যায়।

যাই হোক, 'মহিষাসুরমর্দিনী' 'বসন্তেশ্বরী'র মূল অংশগ্রহণকারী যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই-ই রইলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান প্রবর্তক বাণীকুমার নিজে অংশগ্রহণ করতে রাজী হলেন না। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে অনুরোধ জানালেন যাতে গ্রন্থনার সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকবৃত্তিতে তিনি অংশ নেন।

বন্ধু বাণীকুমারের সে অনুরোধ মেনে নিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

'মহিষাসুরমর্দিনী'র প্রস্তুতিপর্বে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের যে সাঙ্গীতিক পঠনভঙ্গী দেশে-বিদেশে অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছে সেটি কিন্তু পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

স্থির ছিল (বসন্তেশ্বরী' অনুষ্ঠানে) ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের আবৃত্তির সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ডে যন্ত্রসঙ্গীত বেজে যাবে।

কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—আবৃত্তির সহযোগী যন্ত্র সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ নাট্যাংশ তথা আবৃত্তি করে চলেছেন নিঃসাকোচে।

প্রথমটা চমকে উঠলেও নৃপেন্দ্রনাথ, পংকজকুমার, রাইচাঁদ প্রভৃতি কিন্তু ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের সুরসহ আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ঐভাবেই চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানালেন।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেও চমকে ছিলেন। তবু বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই সে অনুরোধ রক্ষা করলেন। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, তিনি গান গাইতে পারতেন।

গায়ক হবার বাসনা হয় তো ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই তা প্রতিফলিত হয়ে

'মহিষাসুরমর্দিনী'র প্রস্তুতিপর্বে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের যে সাঙ্গীতিক পঠনভঙ্গী দেশে-বিদেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটি কিন্তু পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

উঠত। তবে বেতারের প্রাথমিক যুগে তাঁর গান বা শিবাণে বাদন (মহিলা মজলিস-এ) শোনার সুযোগ আমাদের হয়নি।

বাণীকুমার-এর নতুনত্ব অভিলাষী মন চাইল যে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে সুরে রচনার সঙ্গে শ্রী শ্রী চণ্ডীর শ্লোকগুলিও কণ্ঠে সুরায়িত হবে আত্মপ্রকাশ করে এ অনুষ্ঠানকে আরো মাধুর্য মণ্ডিত করে তোলে। আত্মপ্রচারের লোভকে জয় করে তাই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে।

তখনকার দিনের প্রথিতযশা শিল্পীদের এর মধ্যে আনা হয়নি। যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উদীয়মান গুণী।

পঙ্কজকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র ডে (সে নয়) আঙরবালা, প্রভাবতী প্রভৃতি প্রথম দিনের কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নেন।

শুনেছি পরলোকগত কৃষ্ণলাল সায়গল নাকি প্রথমদিকে একবার এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে অখিল বিমানে পানটি গেয়েছিলেন। তবে আমি দেখিনি।

পরবর্তীকালের কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শৈলবেলী, পারুল বিশ্বাস, রাধারানী, অনিল দাস, জগন্ময় পাইন, প্রেমাঙ্গু মুখোপাধ্যায়, সতী চৌধুরী, সচীন গুপ্ত, পান্নালাল ভট্টাচার্য, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত মিত্র, অমুজ মল্লিক, অনুপ ঘোষাল, অরুন্ধতী ঘোষ, দিজেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী ঘোষ, বন্দনী সেনগুপ্ত, সুপ্রীতি ঘোষ, উৎপলা সেন, সুপ্রভা সরকার, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, সুমিত্রা সেন, মিত্রা বসু, কৃষ্ণা দাসগুপ্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

আমার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করলে এর বরাদ্দ হ্রাসের বদ্ধ ছিল। তারপর বহুকে বার ছিনেক এই অনুষ্ঠানে আমার অংশ গ্রহণ না করার কারণ—আমি সে সময়ে বেতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় শুধু 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানে নয়, সামগ্রিকভাবে বেতার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা বর্জন করেছিলুম।

যাই হোক—এ যাবে আজ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচনকারী শিল্পী হিসেবে থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

তাছাড়া আর একটি দিক থেকেও 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সঙ্গে আমার যোগাযোগের বরাদ্দও দুই দশকের ওপর হয়ে গেল।

আগেই বলেছি যে আমি তিনবার রেডিওতে গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলুম। বেতার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়েন বিটার বি- কে- নন্দী।

তখনকার দিনের প্রথিতযশা শিল্পীদের এর মধ্যে আনা হয়নি। যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উদীয়মান গুণী।

তিনি তখন কলকাতা রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টর।

সেটা ইংরেজি ১৯৬২।

হঠাৎ মহালয়ার পীতা জরুরী অনুষ্ঠানে গান ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার বিশ্ব শ্লোকের সুরে পরিবেশন নিয়ে প্রহ্লিকের ভূমিকা (অবশ্যই সুরসহযোগে) গ্রহণ করতে বিশেষ অনুরোধ জানানো হল। আমিও সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করলুম।

কয়েক দিনের মধ্যেই নন্দী সাহেব টেলিফোন করলেন বাড়ীতে। অভিনন্দন জানাবার পর বিশেষ নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার এবং চা খাবার জন্যে।

বলা বাহুল্য—নন্দী সাহেবের টেলিফোন পেয়ে আনন্দ হয়েছিল। ভাবলুম, যে গায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল—ঈশ্বরের কৃপায় তার অসম্মান করিনি।

কিন্তু, তাঁর অফিস ঘরে চা খাওয়ানোর মাঝখানে তিনি যে কথা শোনালেন তা শুনে চমকে উঠেছিলুম। আমায় তিনি হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, আপনি 'মহিষাসুরমর্দিনী'টা করেন না।'

আমি বলি, 'আমি তো আবার গাইছি।'

'না না, তা তো আমি জানি' নন্দী সাহেব বলে চলেন—'আমি বলছি ঐ স্পোকেন ওয়ার্ডের কথা।'

তাঁর বক্তব্যটা ঠিক ধরতে না পেরে আবার প্রশ্ন রাখি, 'সরি মিটার নন্দী, কথাটা বুঝতে পারছি না।'

নন্দী সাহেব হেসে বললেন, 'মানে, আমি বলছি ঐ প্রোগ্রামের ন্যারেটিভ পোর্শানের কথা যাকে আপনারা বাংলায় গ্রন্থনা না কি বলেন যেন।'

আমি চমকে উঠে বলি—'সে কি!

কোনো অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন হলে করতে হবে নিশ্চয়ই। সে ক্ষেত্রে কারুর কিছু বলার নেই।

বীরেনদা বলেছেন তো।'

নন্দী সাহেব সিগারেট কেসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন, 'তা আছে। ধরি আই থিংক, এ চেঞ্জ শুড বি ইমপ্রিমেন্টেড দেয়ার'।

আমার মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

নন্দী সাহেবের সঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মন যা মতের মিল ছিল না কোনোদিন—এ কথাটা অন্য অনেকজনের মত আমিও জানতুম।

সেই ব্যক্তিগত অখিল যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বিজয়-বৈজয়ন্তীর পথেও কণ্টক রূপে ব্যবহার করার প্রয়াসে নন্দী সাহেবকে এতদূর এগোতে প্ররোচিত করবে তা কল্পনারও আসেনি। তাই কি বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

নন্দী সাহেব আবার হাসতে হাসতে বললেন, 'কি হল, কিছু বলছেন না যে?'

তারপরও একটু ভেবে নিয়ে আমি জবাব দিলুম। বললুম, 'আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ ফর দি কাইণ্ড অফার এক্সটেণ্ডেড টু মি মিটার নন্দী। বড় বীরেনদা ইজ এ্যাণ্ড আই অ্যাম সিওর উইল বি এনকারিং দি হাইয়েস্ট রিগার্ড অফ আওয়ার লিস্নার্স ফর দিস্ পার্টিকুলার প্রোগ্রাম ফর মেনী মেনী ইয়ার্স। এ্যাণ্ড সিল আই অ্যাম্ বেসিকালি এ সিঙ্গার আই ক্যান্ নেভার স্ট্যাণ্ড ইন্ দিজ শুজ।'

নন্দী সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি তো বেশ হিন্দি জানেন। তাহলে ওর হিন্দিটা করুন। রিয়ল ডোণ্ট ডিস্ক্রাইব্।'

অতএব সম্মতি দিতে হল। সেই থেকে আমি 'মহিষাসুরমর্দিনী'র হিন্দি সংস্করণে প্রহ্লিকের ভূমিকায় আছি। একটা কাঁটা মনের মধ্যে যে খচ্‌খচ্ করত সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল, সেটা আজো আমায় প্রায়ই অস্থির করে।

কোনো অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন হলে করতে হবে নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে কারুর কিছু বলার নেই।

কিন্তু এই যে সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার বা প্রসার কেন্দ্রের কিছু কিছু সাহেব তাঁদের ব্যক্তিগত হিংসে-দ্বেষ বা আক্রোশ চরিতার্থ করতে, কিংবা দাক্ষিণ্য বিতরণের নিদর্শন দেখাতে নিজ নিজ উচ্চপদের সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেন না—এটা মেনে নেওয়া সত্যিই পীড়াদায়ক।

আমি জানি এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, নেহেরুজী, ইন্দিরাজী বা মুরলাজির প্রতীক, প্রীরাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার কখনোই এ ধরনের অবিমৃষ্যকারিতার সমর্থন করেন না। বরং ঘৃণা করেন।

তবু এ সব ঘটে। কারণ শিল্পীকুল কখনো বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি নিয়ে মাথাব্যথা করতে পারেন না। এ ধরনের ক্ষোভদায়ক ঘটনার

যারা শিকার হন— টাকা নিশ্চিন্ত থাকার পথটাই বেছে নেন আর তার ফলেই এ সব সাহেবদের এ ধরনের পথে চলাটা সুগম করে দেয়।

এরই ফলশ্রুতি 'মহিষাসুরমর্দিনী'কে এক বড় প্রোডিউসারের কাছ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সেও এক বিচিত্র কাহিনী।

ভবিষ্যতে তা নিয়ে লেখার ইচ্ছে আছে।

তবে এখানে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

ঐ ধনুকাদের (অর্থাৎ 'মহিষাসুরমর্দিনী'র পরিবর্তে) আয়োজন করার আগে একদিন কলকাতা বেতারের তৎকালীন সহকারী ডিরেক্টর প্রদ্যুম্ন মুখার্জি আমার ঘরে এসে ঘরে দিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

যদিও আমাদের দুজনের পথ ছিল ভিন্ন, তবু তিনি ছিলেন আমার সুদীর্ঘকালের বন্ধু। তাঁর ঘরে প্রয়োজন ভিন্ন যেতুম না।

যাই হোক, তাঁর ওখানে চা পর্ব চলার মধ্যেই তিনি হঠাৎ বললেন, 'বিমলবাবু, আমাদের মানে, হোল অফিসের ইচ্ছে যে আপনি এবার মহালয়ায় বাংলাটাকেও পুরো নাবেটিভ পার্টটা করেন।

'মহিষাসুরমর্দিনী'র যে পরিবর্তন হচ্ছে সে কথাটা তখনো আমাদের অফিসিয়ালী জানানো হয়নি। কানাকানি হতে হতে কানে এসেছিল.

প্রদ্যুম্নবাবু জানতেন—'মহিষাসুরমর্দিনী'কে মহালয়া প্রোগ্রাম হিসেবে আমার নামটা কেউ বললেই আমি আপত্তি করে বসতুম। সেদিন তিনি ইচ্ছে করেই ভুলটা বললেন কিনা জানি না, তবে তাঁর ভুলটাকে আমি কাজে লাগাতে চাইলুম।

বললুম, 'মহিষাসুরমর্দিনীতে মহেন্দ্রদা থাকতে আমার আমি কেন?'

প্রদ্যুম্নবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সে কি মনাই জানেন না, এবার তো 'মহিষাসুরমর্দিনী' হচ্ছে না তাই মহেন্দ্রবাবুও থাকছেন না তাই তো আপনাকে করতে বলছি।'

বুঝলুম—কি যেন ওল্ড গোল্ড ফ্রেন্ডস্ টু দি ব্রেড ইন এ বুড়ার ফর্ম

ওখানে কানাঘুষো যখন শুনি তখন কষ্ট হয়েছিল তবু মনে আশা ছিল খবরটা গুজবই হবেন, তেমন প্রিয়জন কারো মৃত্যুসংবাদ যেমন খবর জানবার পরও মানুষ ভাবে যা শুনে তা তো সত্যি নাও হতে পারে এ ব্যাপারে আমারও মনের অবস্থা তেমনি হয়েছিল।

কিন্তু প্রদ্যুম্নবাবুর মুখ থেকে ওকথা শোনা মাত্র মনটা যে কী আকারে পেয়েছিল তা বোঝাবার মত ভাষার হদিস আজো খুঁজে পাইনি। তবে, এতদিন কোনো কথা বলার মত ক্ষমতা যে আমার ছিল না এটাও সত্যি। শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চতুরাননের মত বসেছিলুম বেশ কিছুক্ষণ।

'তুমি কিন্তু আমার নীরবতাটাকে সম্মতি হিসেবেই ধরে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আমি জানি আপনি নিশ্চয় রাজী হবেন।'

আমি বুঝলুম মুখফিল এভাবে চুপ করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না তাই জোর করে মনটাকে খুঁড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললুম, 'কিন্তু আমি পারব না প্রদ্যুম্নবাবু।'

'সে কি? এরকম একটা চান্স-

'না, না প্রদ্যুম্নবাবু, চান্স-এর চেয়ে বেশিরভাগ আমার কাছে অনেক বড় আমার জন্ম করেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে যাকগে আরেক বছর না হোক।'

বেতারের যে কজন আমার সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতেন তাঁদের মধ্যে প্রদ্যুম্নবাবু অন্যতম তবু তিনি ঐ 'বিউটি কমপ্লিট' পার্টের মকশকে আমায় হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা ধরুন যদি প্রথম মহালয়ার ভোরে ইমু করে এই প্রোগ্রামটা করতে বলে

আমিও চলব দিলুম, 'আপনি তো জানেন আমি ঘুমকাতুরে লোক ঘুম থেকে উঠে নিজেকেই যদি এমন ঘটে তবে কেন আপনাকে তো মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে হবে না

শো-রুম :

- ৭/১ ডি, বিন্ডসে স্ট্রিট, কলকাতা
- এ-২ স্টেট এম্পোরিয়াম বিল্ডিং, নতুন দিল্লি।
- ৮৩, এম, জি, রোড, ব্যাঙ্গালোর
- এম, আই, রোড এবং সুভাষ মার্গ এর সংযোগ স্থল, জয়পুর।
- ১৭, নেহরু রোড, সান্তাক্রুজ।
- কুলশি রোড, বারুইপুর।
- দুর্গা চক সুভাষ মার্কেট, হলদিয়া।
- ৪৩৪ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ।
- হাওড়া ব্রীজওয়ে।
- কলকাতা বিমানবন্দর
- নেক মার্কেট, কলকাতা।

গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা

জন্ম: ১২ই জুন ১৯৬১, মীরাট
মৃত্যু: ১১ই অগাই, ১৯৭৭, বোম্বাই

আমি তখন ভারতবর্ষের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্র ইলাসট্রেটেড উইকলির কবিতা বিভাগের সম্পাদক। সে কারণে যা হবার তাই হত। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহেই শ' খানেক কবিতা থেকে আমাকে বেছে নিতে হত তিন থেকে চারটে আর যেহেতু বাকিদের মনোনীত করিনি, সে কারণে সপ্তাহে এসে পৌঁছত নতুন আরও শ' খানেক কবিতা আর বেশ কিছু অভিযোগ: সেই সূত্রেই এ সপ্তাহ হতে আসে গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা আর তার সাথে একটা চিরকুট। গীতাঞ্জলির মা শ্রীমতী খুশি বদরুদ্দিন এই পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী এম. ভি. কামাথকে নিজে এসে কবিতাগুলো দিয়ে যান।

পড়লাম কবিতাগুলো। আবার পড়লাম। এ কবিতা নয়, তার চেয়েও বেশি। এবার চিরকুট দেখলাম। ষোল বছরের কিশোরী গীতাঞ্জলি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। খুশি জানতেন না, তার মেয়ে গীতাঞ্জলি কবিতা লেখে। মৃত্যুর কয়েকমাস পর, গীতাঞ্জলির ঘর পরিষ্কার করার সময় তিনি এগুলি পান। সমস্তই সযত্নে লুকনো ছিল। তোষকের নিচে, বইয়ের পাতার মাঝখানে, সোফায়, তাকিয়ার নিচে, বইয়ের তাকের পেছনে। যেখানে পেরেছে, পাছে তার মায়ের চোখে না পড়ে, সেখানেই সে এগুলো লুকিয়ে রেখেছে সাবধানে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর তার দার্শনিক মনস্তত্ত্বের নিরিখে ভিন্ন এক শব্দবোধের সম্ভাবনার ইঙ্গিত আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিল, সেই স্রষ্টাই আজ আমাদের কাছে গীতাঞ্জলি। জানলাম, স্রষ্টার আয়ুষ্কাল ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার সৃষ্টির ইতিহাস আজ পরিব্যাপ্তির পথে। গীতাঞ্জলি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু না, মাত্র দু ফোঁটা চোখের জল তার সৃষ্টি কৈশোরের সমাপ্তি টেনে দিল। এক অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে ক্যান্সারের করাল গ্রাসে তার জীবন যখন তিলে তিলে নিঃশেষিত হচ্ছে, সেই সমস্ত মুহূর্তে সৃষ্টি কবিতামালা, গীতাঞ্জলি যা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখতে চেয়েছিল এমন এক সচেতনতায়, যাতে তার মা কোনও রকম দুঃখ না পান।

রোগভোগের সময়ে সে যে নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটিয়েছে, সেই নিঃসঙ্গতা তাকে দিয়েছে এমন এক উপলব্ধি, প্রেরণা,—তার অপার ঐশ্বর্যে সৃষ্ট এই কবিতামালা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি আর ভেবেছি , যে কোনও পাঠকেই এ কবিতা স্পর্শ করবে। এক সংখ্যায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশ করেছি গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা। বহু সাড়া পেয়েছি বিমুগ্ধ পাঠকের কাছ থেকে।

কিন্তু তারও চেয়ে বড় বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল গীতাঞ্জলির জন্যে।

ইতিমধ্যে খুশি বদরুদ্দিন আরোও কিছু কবিতা পান। আমি এবং খুশি বদরুদ্দিন তখন জল্পনা-কল্পনা করছি কিভাবে, কোন প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়ে, এ কবিতাঞ্জলি প্রকাশ করতে পারি। এমনি এক সময়ে আমার দুরভাষ জানালো, গর্ডন ফক্স নামে এক ভদ্রলোক আমার সাথে কথা বলতে চান।

গর্ডন ফক্সের নামে সচকিত হলাম। কে না জানে তাঁকে—অন্তত কলকাতায়, আর কেউ না হোক, যাঁরা চা ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত। কিন্তু আমার কাছে তাঁর কিসের প্রয়োজন? কবিতা? আমার কবিতা প্রকাশে আগ্রহী তিনি? তা নয়। তিনি গীতাঞ্জলির কবিতার বই নিয়ে আলোচনা করতে চান। তাই বা কী করে সম্ভব? গীতাঞ্জলির তো কোন বই-ই নেই। ঠিক তাই। সে কারণেই তিনি আলোচনায় আগ্রহী। তিনি প্রকাশ করতে চান গীতাঞ্জলির কবিতা। কিন্তু কেন?

তাঁর সাথে দেখা করতে বোম্বাই যাই এবং সেই সন্ধ্যাতেই ফিরে আসি। কেনর উত্তর আর অজানা নয়। তিনিই জানিয়েছেন। তিনি জানালেন, বোম্বের সমুদ্র সৈকতে যখন গোধূলির শেষ পদচিহ্ন, বাতাসের কাপটায় তাঁর পায়ে এসে লাগলো একটি সাপ্তাহিকের

ছেঁড়াপাতা। আলগোছে সেটি তুলে নিলেন তিনি। স্বভাবসুলভ আচরণে তিনি চোখ বোলালেন সেই মুদ্রিত অক্ষরমালায়। আপ্লুত হলেন এক অবর্ণা মাধুরীর স্পর্শ পেয়ে, ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি। কে সৃষ্টি করেছে এই অক্ষরমালা ? বলাবাহুল্য মাত্র, ছেঁড়াপাতাটিতে ছিল গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা : তারপর ঘটনাসূত্রে নিয়ে এল তাঁকে আমাদের কাছে, যেখানে গীতাঞ্জলির মা খুলি বদরুদ্দিন তাঁকে সমস্ত দিক থেকেই সহযোগিতা করেছেন।—লণ্ডনের ফ্রস,অ্যালসপ তাঁর ওরিয়েন্ট প্রেস থেকে প্রকাশ করেছেন গীতাঞ্জলি। পাঠকও তাই পেয়েছে আজ গীতাঞ্জলির কবিতাপাঠের দুর্লভ সুযোগ। আমরা কৃতজ্ঞ শ্রী গর্ডন রুক্সের কাছে, শ্রীমতি বদরুদ্দিনের কাছে। আমার কাছে পাঠকের কৃতজ্ঞতার কোন অবকাশ নেই এখানে,কারণ,আমি যেভাবে এই ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছি, তাতে সবার কাছে আমারই কৃতজ্ঞ থাকার কথা। মহানন্দর পত্রিকার সম্পাদক আমাকে কলকাতা থেকে দূরভাষে যখন সবিনয় জানালেন, এই কবিতাগুচ্ছের কিছু অনুবাদ তিনি তুলে দিতে চান বাঙালী পাঠকের দরবারে, আমি এ প্রস্তাবের অন্য সবায়ের পক্ষে তাঁকে আমাদের সম্মতি জানিয়েছি। তিনি পরে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন তার অনুমতিও দিয়েছি। এবং জানিয়েছি, তিনি নন, আমিই কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর কাছে। গীতাঞ্জলি ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে, নিরাবয়ব নিরাকার ঈশ্বরে সন্দিহান, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমার এই একমাত্র বাসনা, যা সঙ্গোপনে পালন করছি আমার মনের একান্তে।

—প্রীতীশ নন্দী।

গত বছর পুজোর কিছু আগে দিব্যেন্দু যখন গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে দিতে বলেছিল তখন আমি ইতস্তত করেছিলাম, সঙ্গত কারণেই। শক্তি সে সময় কি ভেবেছিল আমার ঠিক মনে নেই, তবে আমি ইতস্তত করেছিলাম এই ভেবে যে এই কবির কবিতা অনুবাদ করার কাজে হাত দিলে আমার অন্য সব কাজ বেশ কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে যাবে। সব কিছু ভেবে আমি গতবছর পিছিয়ে গিয়েছিলাম।

এ বছর শক্তির অনুবাদ হয়ে যাওয়ার পরে বইটি আমার কাছে আসে। ইতিমধ্যে গত এক বছরে গীতাঞ্জলির কবিতা সম্পর্কে আমার ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর দিব্যেন্দুর ঐকান্তিক এবং আশ্চর্য আগ্রহ দেখে রাজী হয়ে যাই। দিব্যেন্দু একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল যেটা কম নয়। পেশায় সাংবাদিক হওয়ার ফলে 'ডেটলাইন' মানার অভ্যাস থাকলেও আমি কথা রাখতে পারিনি। প্রথম চোটায় একেবারে ব্যর্থ হই। এক অদ্ভুত অবসেশন আমাকে পেয়ে বসে। প্রথম কবিতাটির ৬ লাইন অনুবাদ করতেই আমার একমাস কেটে যায়। বেশ কিছুদিন পরে অবশ্য সেই চাপ কিছুটা কেটে যায়। দীর্ঘ সময়ের অনুশাসনে কয়েকটি কবিতা সাধ্যমতন অনুবাদ করতে পারি। সেগুলিই শক্তির অনূদিত অংশের সঙ্গে এখানে ছাপা হচ্ছে।

কিন্তু আমার মনে হয় গীতাঞ্জলির কবিতা সম্পর্কে বা সঠিকভাবে বলতে হলে গীতাঞ্জলির কবিতা অনুবাদ করার সময়ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন। কিশোরী গীতাঞ্জলির কবিতা লেখা কোন অ্যামবিশাস বা প্রোফেশনাল লেখকের রচনা প্রয়াস নয়। এই কবি জানতও না যে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হবে। এমন কি লেখার পরে কবিতাগুলি তাঁর কাছের মানুষজনদের পড়ানোর সুযোগও গীতাঞ্জলি পায় নি পাছে তারা কষ্ট পায়। এ ছিল তার সূক্ষ্ম মনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে বাঁধা বীণার করুণ সুরের মূর্ছনার লিপিপ্রয়াস মাত্র; বিশেষত যে কবি জানে অনতিবিলম্বেই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বভাবতই সেরকম একটা মানসিকতায় রচিত কবিতা পাঠককে আক্রমণ করতে বাধ্য। আমিও তার শিকার হয়েছি যা অবসেশনে পরিণত হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে। তবু আমি আশ্চর্য হয়েছি তাঁর সংবেদনশীল মন, শব্দচয়নের সার্থকতা ও সর্বোপরি মৃত্যুর সামনে দাঁড়ানোর সাহস দেখে। গীতাঞ্জলির সবকটি কবিতাতেই নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের চাইতে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তার প্রিয় মা ও ভাইটির মানসিক যন্ত্রণার কথা ভেবে কষ্টের দিকটা। এই যে স্নেহময়ী কিশোরী মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'আমি তো ঘুমোতেই যাচ্ছি, দুঃখ কোর না', সেই স্পর্শকাতর অভিজ্ঞান উপলব্ধি লাভ করতে জীবন কেটে যেতে পারে। গীতাঞ্জলি সেই অভিজ্ঞান লাভ করেছিল, তাই তার কবিতা ব্যক্তিগত সীমারেখা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হতে পেরেছে সম্পর্ক, জীবন ও মৃত্যু বা প্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে। সিন্ধুতে মিশে যাওয়ার আগে বিন্দুর সংবেদনশীল অভিজ্ঞান তাই অস্বাভাবিকভাবে বিচলিত করলেও কোথাও মনে সাহসও জোগায়। গীতাঞ্জলির সাফল্য এখানে, এবং অনুবাদকের অসুবিধাও সেখানে।

মুকুল গুহ

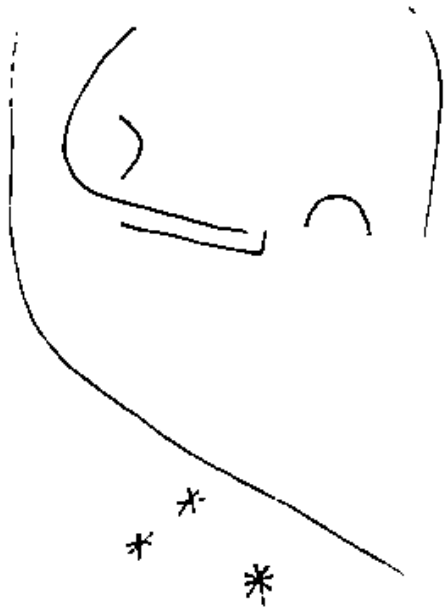

আমি চুপচাপ ছিলাম।
দিব্যেন্দু সিংহ আমাকে ধরেছিলো—
গীতাঞ্জলি-র কবিতা অনুবাদ
করার জন্যে।

আমি, কবিতা, যা ভালো লাগে অনুবাদ করি। কে গীতাঞ্জলি—আমি জানি না।

তারপর, গীতাঞ্জলি বই পড়লাম।

কবিতা নয়। নিবেদনের ভঙ্গিতে কিছু লেখা। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে নিবেদন। কবিতা নয়। কবিতা অনেক বেশি নিষ্ঠুর।

আমি কিছু পদ্য অনুবাদ করলাম, দিব্যেন্দুর জন্যেই। নতুবা এ ধরনের পদ্য আমি অনুবাদ করিনি, করি না। কেন না, এখানে ঈশ্বর আছেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার নামটি গীতাঞ্জলি

নাম রেখেছ গীতাঞ্জলি আমার,
রবিবাবুর বইয়ের নামে নাম মিলিয়ে,
কিন্তু,

জান, তুমি ত জানতে, তুমি জানতে,
হাত ভগবান, হাতটি ধ'রে আমায়
এমন করে বাঁচতে শেখাও, বাঁচতে,
যেন নামের সঙ্গে বাঁচার ছন্দ মেলায়,

তেমন করেই বাঁচতে শিখি, বাঁচতে।

মৃকুল গুহ

সূর্যকরোজ্জ্বল রেখা

কালো ঢেউয়ের গভীরে সূর্য যখন অস্ত যায়
প্রতি সন্ধ্যায়,
দিন যখন অপরাহ্নের গা ঘেঁষে বসে
তখন,
আমি আমার জানলার কাঁচে মুখ রেখে বসে থাকি,
দেখি,
ওই ডুবন্ত সূর্যকরোজ্জ্বলতায় ম্লান শিহরণ।

তখন আলো ধূসর হয়ে আসে ধীরে,
সময় নিস্তব্ধ বয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ একাকী,
আমার হৃদয়ও ডুবতে থাকে
ধূসর আস্তার গভীরে।

কারণ আমি ত জানি না,
আবার কোনদিন আদৌ দেখতে পাব কি পাব না,
ওই রৌদ্রকরোজ্জ্বল রেখা,
অন্য কোন দ্বিতীয় প্রত্যুষে—

মৃকুল গুহ

ক্ষমা করো

ক্ষমা করো
মাগো,
যদি আমি একটু বিশ্রাম,
একটু ঘুমোতে চলে যাই—

আমি ত জানি তুমি অতন্দ্র
বসে থাকবে পাশটিতে,
একান্ত আমার দিকে চেয়ে চেয়ে,
যতক্ষণ না অতল ঘুমের মধ্যে একটু নড়ে উঠি—

এই আমি যাকে তুমি অসহ্য ব্যথা বেদনায়,
তোমার রক্তমাংস দিয়ে সৃষ্টি করেছিলে
এই পৃথিবীতে,
আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমাকে কিছু দিই,
তোমার কৃতকর্তব্যের বাইরে অনেক কিছু তুমি যা
তার জন্যই—

আমার ইচ্ছে হয় তোমাকে বলি,
একটু বলি,
যা কিছু ভেবেছি এতকাল, হায় অসহায়
সে কথাগুলি আরও কাঁদাবে তোমাকে
আমি জানি,

তোমাকে কি বলব তুমি কতটা আমার কাছে!
ঘুমের মধ্যে চোখের পাতা ভিজে উঠছে
দেখতে পেলেই,
তুমি ঠোঁট ছুঁইয়ে মুছিয়ে দিচ্ছো নিরন্তর,
কিন্তু আমার যেন মনে হয় উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ছেই,
নিশ্চয়ই তোমারই চোখের জল অবিশ্রান্ত,
তুমি কেঁদেছো আমার চিবুকে,
তবু শোন, তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেয় সব ক্লান্তি,
দেয় আশ্রয়,

যখন দিন ধীর পায়ে রাতের পেলবতায় মিশে যায়,
আমি আমার ভেজা চোখ মিলে দেখি চাঁদ,
ঠিক তোমার মতনই মনে হয় ওই চাঁদকে,
তারপর যখন ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, দেখি
চাঁদ এবং তুমি
আমার জলপূর্ণ চোখের গভীরে স্থিত হয়ে আছো।

না করা জলে ভারি হয়ে আসে
ওজুবে ওজুবে ফুলে থাকা আমার চোখ,
তারও গভীরে থাকা ব্যথার নির্বাতন,
জমে থাকা চোখের জলরেখা রুদ্ধ করে,
নাহলে
আরও এত যন্ত্রণায় কিছু লাঘব হ'ত হয়ত।

মৃকুল গুহ

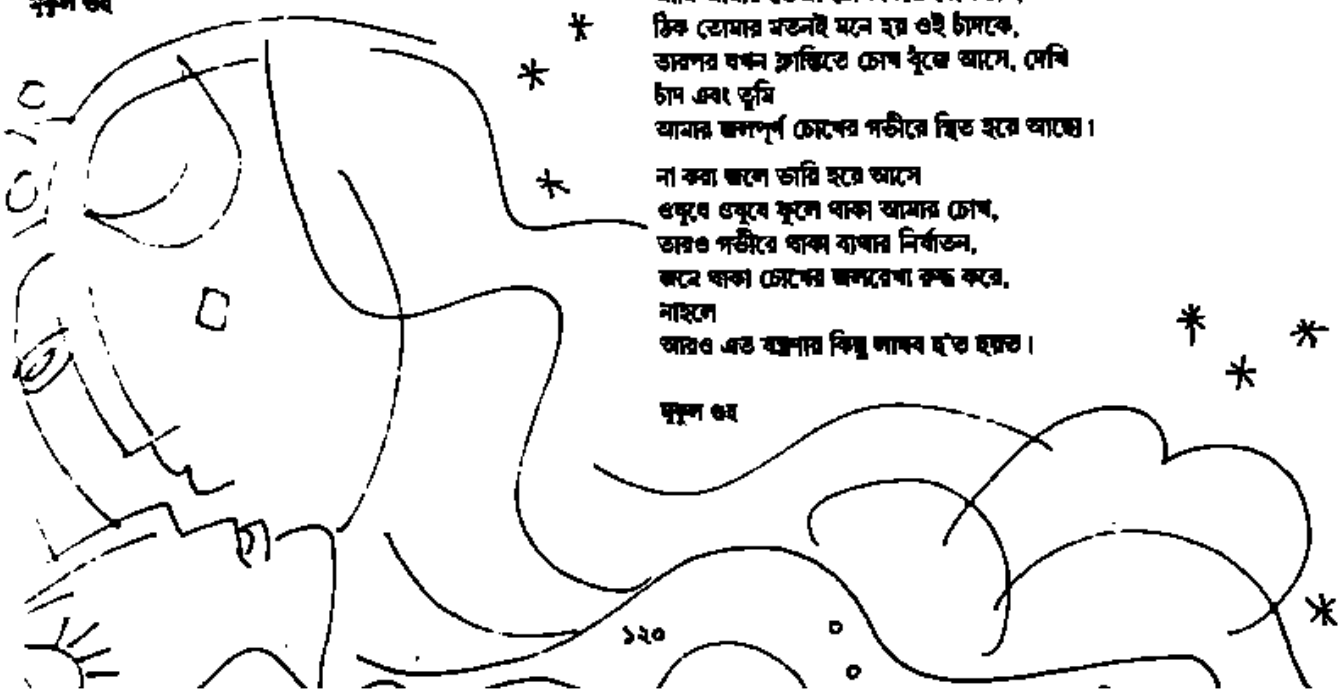

অন্য কোন বিনীল শরতে

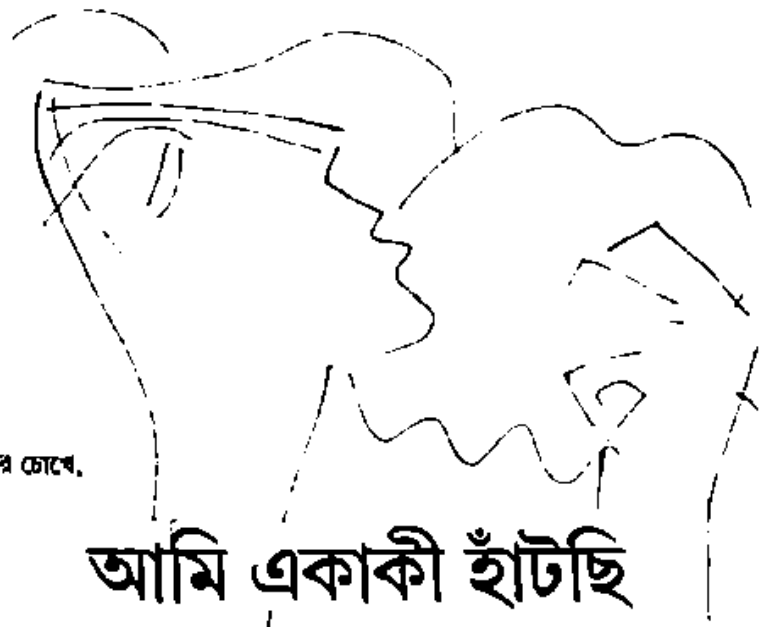

আমার বুকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুমি কি বেজে উঠছ,
আমার ব্যথার অনুভবে তোমারই কি তীক্ষ্ণ অনুভব,
যে তুমি তোমার শীতল করস্পর্শে আমার কষ্ট কমিয়ে দিচ্ছ,
যে তুমি শুধরে কেঁদে চলেছ অবিশ্রাম গোপনে,

সেই তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ, আরও কত যে কষ্ট রয়েছে
পাওয়ার। চির বিদায়ের যন্ত্রণায় বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে যে তোমার,
নিঃশ্বাসে কত না কষ্ট, কত ব্যথা যে পেয়েছ তুমি,

আর সব, এইসব অসতর্ক সুখের সময়ে এইসব,

আমারই স্বপ্নের ছবিগুলিকে সে বিশ্বাস করেছিল, মনে মনে
বিশ্বাস করেছিল কিন্তু স্বপ্নের, যে স্বপ্ন এখনও আলো ফেলে আমার চোখে,
সে তুমি, তুমি কি আমৃত্যু চোখের জলই ফেলবে,
তাঁর সন্তানের বিয়োগব্যথায় আমি,
আমারই বিয়োগ ব্যথায় তাঁর কান্নার ঢল থামবে না কোনদিন।

আমার প্রার্থনা শুধু সেই তাঁরই জন্য,
মা মণি, না তুমি কাঁদবে না কোনদিন,
এমন কি একা একাও,
যখন আমি থাকব না, তোমার বুকের আস্থটিতে,
তোমার সন্তান।

তুমি বেঁচে থেকো, অনেক দিন, ভালভাবে বাঁচবে কথা দাও,
আমার ছোট্ট ভাইটির জন্য, যে অনেকটাই আমার কাছে,
যে পাছে তোমার কষ্ট হয় আরও তাই,
চুপ করেই থাকবে,
হয়ত সকলের চাইতে ওরই কষ্ট হবে বেশি,
কে জানে,
মা, মা আমার, মা মণি,
আমাদের দুজনের মুখ চেয়েই তুমি কিন্তু কেঁদো না কেমন,
আর,

যখন আমার দুটো চোখ বন্ধ হয়ে আসবে,
সেই দীর্ঘ ঘুমে ঘুমোতে যাব আমি, একাকী,
তখন,
আর চোখের জল ফেলে উতলা হয়ো না, মাগো,
আমি ত শুধু ঘুমোতেই যাচ্ছি কিছু দূরে,
আবারও ফিরে তোমার কাছে আসার জন্য,
যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয় তবে,
অন্য কোন বিনীল শরতে, কিছুদিন পরে।

মুকুল গুহ

আমি একাকী হাঁটছি

আজ রাতে, অন্যান্য রাতের মতই
আমি একা হেঁটে বেড়াচ্ছি
হাঁটছি ভয়ের উপত্যকার মধ্যে দিয়ে।

ও ভগবান, আমি প্রার্থনা করি
যাতে তুমি শুনতে পাও :
কেননা কেবল তুমিই জানো
হৃদয়ে আমার কী আছে।
আমার নৈরাশ্যের উপত্যকা থেকে তুমি
আমাকে তুলে নাও,
মুক্তি দাও আমাকে।

আমি আমার আত্মাকে এতো উঁচুতে
নিয়ে যেতে চাই
যেখানে কেউ তাকে স্পর্শ না করে
সেখানে সে শান্ত শুয়ে থাক—
ধূলিত মথিত
শুয়ে থাক আমার বিশ্বাস, সততা, আশা।

যখন সময় হবে
আমি ভয় পাবো না
কারণ আমি জানি
তোমার বিচারে কৃপার হাত আছে।
মোটের উপর, আমি হলুম সেই কণা
যা একদিন
ধূলোয় মিশে যাবে
যে-ধূলো থেকে আমি এসেছি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আর কান্না নয়

মাগো,
শেষ বিশ্রামের সাদা চাদরে যখন আমাকে ওইয়ে দেবে,
স্নান করিয়ে দেবে তোমার চোখের জলে,
না মণি তখন কিন্তু
আমি চলে যাচ্ছি বলে অভিমান করো না,

কাঁদবে না তুমি,
অভিসম্পাত দেবে না সেই ঈশ্বরকে,
মা আমার,

আর যখন আমার চিতার ছাইগুলো
কুড়িয়ে নেবে,
তখনও কিন্তু মুষ ভার করবে না তুমি,

তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে আমার চিতার ছাইগুলো ঝরে পড়তে দিও,
ততক্ষণ না উভয়ের মধ্যে ওগুলো মিশে যায়,
আবারও ধুলো হয়ে যায়। মাটির মধ্যে মিশে যাব।

হয়ত মাটিই হয়ে যাব একদিন,
কিন্তু তোমাদের কাছে, তোমার জন্য
তোমার সেই গীতাঞ্জলিই আমি হয়ে থাকব চিরকাল।

নুরুল ওহ

ঘুম

হায় ঘুম, কবে যে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল কবে,
মনে হয়,
এখন তোমার আর আমার মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে,
আমরা কত অচেনা হয়ে উঠছি।

একদিন ছিল,
তখন তুমি আমার খুব কাছে ছিলে,
আলতো জড়িয়ে আমাকে নিয়ে যেতে,
হাতে হাত ধরে নিয়ে যেতে দূর নীল পাহাড়ে, উপত্যকায়,
স্বপ্নের প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছ কতদিন।

আর আজ, সেদিনের সেইসব কত অপরিচিত মনে হয়,
শুধু আবছা দূর কোন স্মৃতিতে যেন তারা সব ভেসে আসছে।

তোমারও কি মনে পড়ে,
আমাদের প্রিয়, পরম ভাবনাগুলো আমরা ভাগ করে নিয়েছি,
এখন তুমি আর কাছে নেই, তাই বিষাদ, তাই
একা আমি, আর ওই দূর আবছা স্মৃতির ছায়া শুধু।

হঠাৎই টুং করে কি একটা একা শব্দের ঝঙ্কারে,
কখনও কদাচিৎ, ঘুম তুমি আমাকে জড়িয়ে নাও,
আর
সহসা অতীত যেন গান গেয়ে ওঠে, তোমারই
ঘুম পাড়ানি গানের সুর, দূর, বহুদূর থেকে।

নুরুল ওহ

ঈশ্বর আছেন

ঈশ্বর আছেন
সবকিছুর মধ্যেই
আমরা বাস্তবিক জানি না
কখন এবং কীভাবে
সেই মুহূর্ত আসবে
অথবা কেন্ আকৃতি-অবয়বে
হবে তাঁর প্রকাশ।

সুতরাং
বৃথা কথা নয়
অবজ্ঞা কটু দেওয়া নয় কাউকে
ছড়িয়ে দাও যতটুকু
আনন্দের বিন্দু তুমি ছড়াতে পারো
সাহায্যের হাত বাড়াতে পারো
আর যখন তুমি তাদের দেখা পাবে
শত্রু মিত্র যেই হোক
হেসো····
কারণ কে জানে
এর ফলেই তুমি তাজা ফুলের
তোড়া পাবে কিনা
করে তুলবে কিনা শত্রুকে মিত্র।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

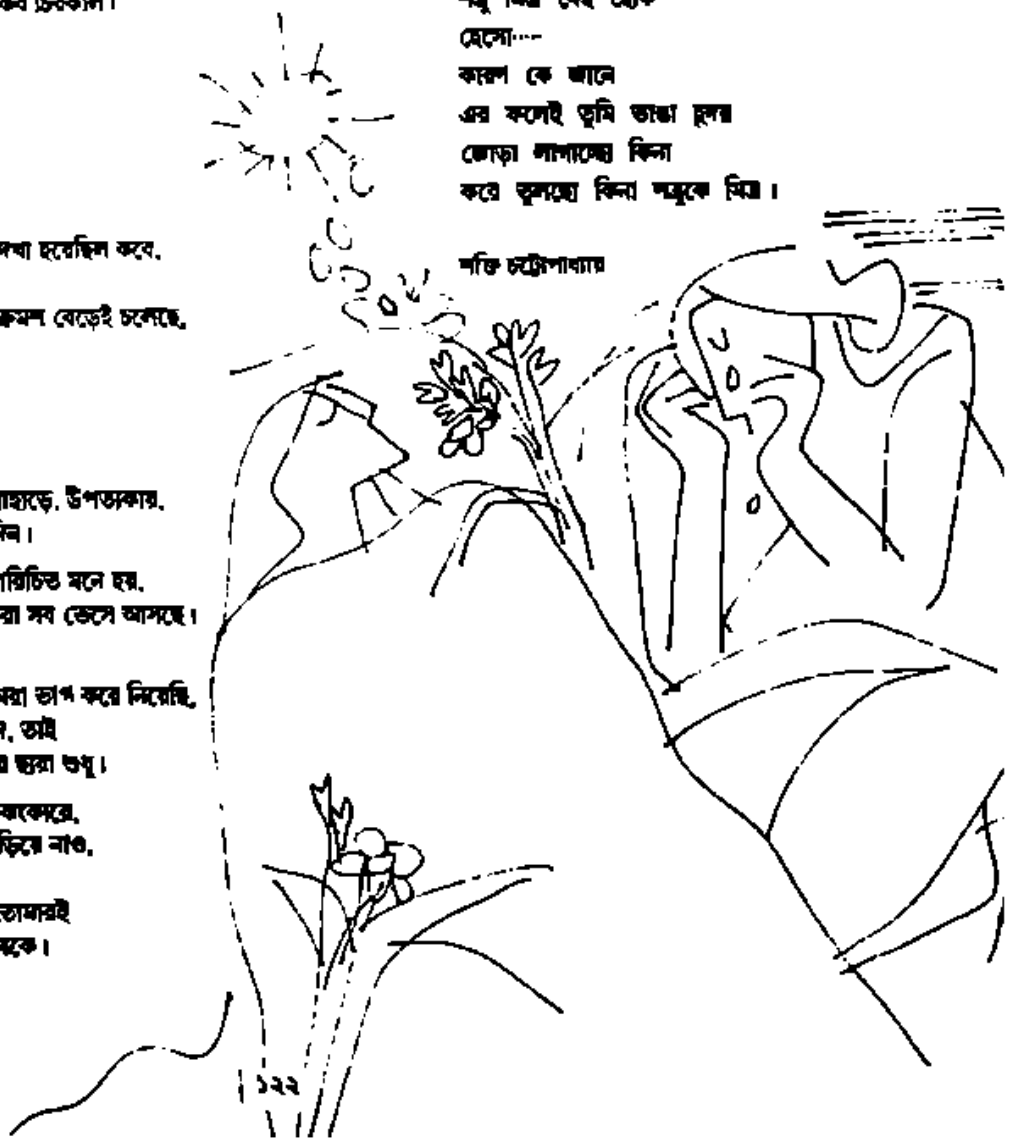

হায়

একটা ছেলের কুপি
মিটমিট করে জ্বলছে
আমার বিছানার পাশে
যেখানে আমি শুয়ে আছি
মাথা পেতে।

আমি দেখতে পাচ্ছি দুঃখ শোকের ছাপ
সেই মুখগুলিতে
যা আমায় ঘিরে আছে,
ওরা জানে না
মৃত্যু হঠাৎ এসে কখন আঘাত হানবে।

আমি, যার জন্যে দাবি নিয়ে
মৃত্যু হাজির,
ভয় পাই না
বরং খোলা হাতে বরণ
করার জন্যে উন্মুখ
হায়
শুধু পড়ে রয়েছে চোখের জল
আর
আমার ধুতো শরীর।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সত্য বাস্তবতা

সূর্য অস্তমিত হলে
রাতের ছায়াশরীরিরা নেমে আসে,

আসে অন্ধকার,
কিন্তু কিছু পরে,
আকাশে
উজ্জ্বল নক্ষত্র আর তারারা ফুটতে থাকে,

দুঃখই বাস্তবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে,
দাঁড় করিয়ে দেয় সত্যের মুখোমুখী।

প্রতিটি যন্ত্রণার টান
আমাদের আরও কিছুটা এগিয়ে দেয়,
প্রতিশ্রুত নিরতি ভূমির একটু কাছে,

এই যে পথ, এ পথে ব্যর্থতা নেই,
মানুষজন কেউ হতাশা ছুঁড়ে দিলেও দিতে পারে,
এই পথ তা দেবে না কোনদিনই।

মুকুল গুহ

জীবন

জীবন
আমি জানি না
কখন
তুমি আর আমি
পৃথক হবো
আমি জানি না
কখন,
কোথায় আর কীভাবে
আমরা জানাবো
বিদায়
একে অন্যকে ছাড়া কঠোর
কারণ দীর্ঘদিন আমরা
পরম বন্ধু ছিলুম
সম্ভবত
আমায় না পেয়ে তোমার ক্ষেদ
তোমার দুঃখ
ও জীবন,
মনে করো সেই
পুরনো সময়
সমস্ত উজ্জ্বতা
সব ভালোবাসা উজাড়
আর সব রকম স্নেহে নরম ভাবনাগুলি
যা আমরা ভাগ করে নিয়েছিলুম
আর যদি এমন হয়
আমরা আবার মিলিত হই
তাহলে তুমি পুনর্বিবেচনা করবে
আমার ভালবাসা ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রার্থনা

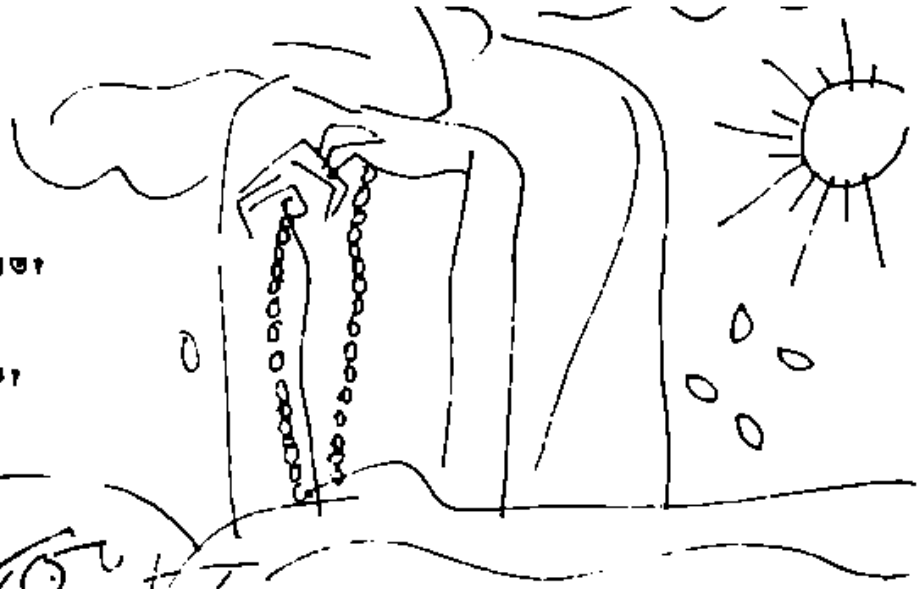

মৃত্যু, বাস্তবিক তুমি কে বলো ত ?
কোথায় বাস তোমার, কোথা থেকে আসছ বলো ত ?
কোথায় নিয়ে যাবে আমায় ?

সে পথ খুবই দীর্ঘ,
খুবই অন্ধকার সেখানে, খুব বেশি কষ্টের পথে কি ?

আমি অবশ্য সাহস করেছি, কিন্তু তাও
ভয় করছে, কারণ
আমি ত জানি না, কি আছে ওপারে।

মৃত্যু,
মাঝে মাঝে তোমারই পায়ের শব্দ শুনি,
শুনতে শুনতে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়,
কেন তুমি আসছ,
পায়ের শব্দ কখনও মিলিয়ে গেছে মনে হয়,
হয়ত এলে না।

আমাকে যদি একান্তই নিয়ে যেতে হয়,
তাহলে একটা প্রার্থনা, একটু আবেদন,
এমনভাবে নিয়ে যেও এমন কোথাও, যেখানে
আর বাধা দিতে পারবে না কেউ আমাকে,
আঘাত করবে না কেউ, এই একটিই প্রার্থনা আমার।

দয়া কোর, দয়া করে
আমাকে একটু ঘুমোতে দিও,
যেমন আমার শৈশবে দীর্ঘ সময় ধরে আমি ঘুমোতাম,
ঠিক তেমনিই।

মৃকুল গুহ

জপমালা

আমার আজু প্রার্থনা করছ তুমি, আমার জীবন,
স্তব্ধ ও গভীর অন্ধকারের রাতে বিছানার পাশে আমার,
তুমি জপমালায় রুদ্রাক্ষ গুণে চলেছো, তুমি ভেবেছো আমি ঘুমিয়ে আছি,

আমি ঘুমোই নি, ঘুম আসে নি আমার,
আমিও মনে মনে প্রার্থনা করছি,
শুধু জপের কোন মালা নেই আমার হাতে,
আমার হাতদুটি সূঁচ আর টিউবে বাঁধা।

কিন্তু তোমার মত আমিও একটা কোন আলোরেখার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছি,
জমাট অন্ধকার যাতে ভেঙ্গে যায়,
যতক্ষণ না রোদ্দুর ঝাঁপিয়ে আসে আমার ঘরে,
তাড়িয়ে দেয় ছায়ামূর্তি আর সন্দেহের বীজগুলি,

আর আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে পারি,
অন্তত
আর একটি সুন্দর সকাল উপহার দেওয়ার জন্য।

মৃকুল গুহ

শান্তি ঝরুক তোমার উপরে

আমার হৃদয়ের
গোপনে
গভীর ঢেউ
দুঃখের
বয়ে যাচ্ছে।
আমি প্রাণপণ করি
লুকোতে
আমার ভাবনাগুলোকে
কিন্তু
মাঝে মধ্যে
তারা উপচে পড়ে।
আমার আশা
ঝক্‌মক্ করে না
আর।
তার নেই কোনো
উজ্জ্বল ভাবনা
কালকের জন্যে।
তারা আমার মুখে বিষাদকে
বিদ্রূপ করে
আমার ক্লান্ত হৃদয়কে
ধমকায়।
যে কঠিন শূন্যতা
আমার হৃদয়ে
ফিসফিসিয়ে বলে
শান্তি ঝরুক তোমার উপরে
গীতাঞ্জলি,
শান্তি ঝরুক।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বিদায়

তুমি আমায় জানাওনি
বিদায়।
তুমি আমার চোখে
চোখ রাখোনি।

তুমি শুধু
সরে গেছো
আমি আমার নিশ্বাস
বন্ধ করেছিলাম।

তুমি চলে গেছো
অনায়াসে…
নির্জনতায়
আমাকে এই ভাবে ফেলে রেখে।

সে কারণে
না চোখের জল এক ফোঁটা, না দীর্ঘশ্বাস।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জন্মদিনের উপহার

এই ওয়ার্ডরোবে ঝুলছে একটা পোশাক,
ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম
এতদিন

অনেক দূর দৃগন্ত থেকে এই জামাটি বয়ে এনেছে
আকাশভরা ভালবাসা,
না টাকা, দাম কি লেগেছে সেটা বড় কথা নয়,
বড় কথা এর জন্য খুশী হওয়া, আহ্লাদে হেসে উঠতে পারা।

আমি পোশাকটা পরেছিলাম অল্প সময়ের জন্য,
স্নেহ মমতায় ভালবাসায় হাত বুলিয়েছি ওর মসৃণ বুনটে,
কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার তুলে রেখেছি যত্নে,
পাছে পরে ফেলি লোভে, জন্মদিনের আগেই,
এই জন্মদিনের উপহারটি আমার,
যার আর কয়েকটি মাস মাত্র বাকি আছে।

তবে আমি মাঝে মাঝেই একা একাই দেখি
আমার ওই জন্মদিনের পোশাকটি,
এটা ত শুধু একটা জামা নয়, আরও কিছু কিছু,
বড় ভালবাসায়, অনেক যত্নের, অনেক আবেগে মোড়া
এই উপহারটি, বার্তা বয়ে আনছে,
'শুভ জন্মদিন গীতাঞ্জলি, তোমার'।

মুকুল গুহ

সুখ

হায় সুখ,
কতদিন হায় তোমাকে খুঁজিনি আমি, কতকাল।
অথচ একদিন এই আমার পাশটিতেই বসে থাকতে সারাক্ষণ,
আজ, এখন তুমি কতদিন হল চলে গেছো, কোথায় গেছো,
আচ্ছা বলো ত,
কি করেছি আমি যার জন্য তোমার এই শাস্তিদান।

কখনও কদাচিৎ এক ঝলক হালকা বাতাস, তুমি
আমার বাতাহত চোখের জানালায় ছায়া ফেলছ,
কিন্তু তবু আমার চোখে জল যেন উপচে পড়ছে, কারণ
আমি ত জানি,
তোমার এই আসা ক্ষণিক, অল্প সময়ের জন্যই কেবল,
হঠাৎই উধাও হয়ে যাবে অন্য কোথাও।

হায় সুখ,
তোমাকে হারিয়ে আমার খারাপ লাগছে,
সারাক্ষণ তোমার কথাই ভেবে চলেছি কেবল,
এরপর একটু উদার হবে কি তুমি, যদি হতে পারো,
তাহলে,
অন্তত সেই পুরোন দিনগুলির কথা ভেবে,
একটু, অল্প একটু বেশি সময় থাকবে তুমি,
বলো থাকবে।

আর তারপর যদি বিচ্ছেদ ঘটাতেই চাও আমাদের,
তাহলে, তাহলে তুমি আর এসো না বরং
এক ঝলকের জন্যও…
আমার ঘুমন্ত স্বপ্নের আবেশ ভেঙে দিতে,
বারবার, শুধু বারবার—

মুকুল গুহ

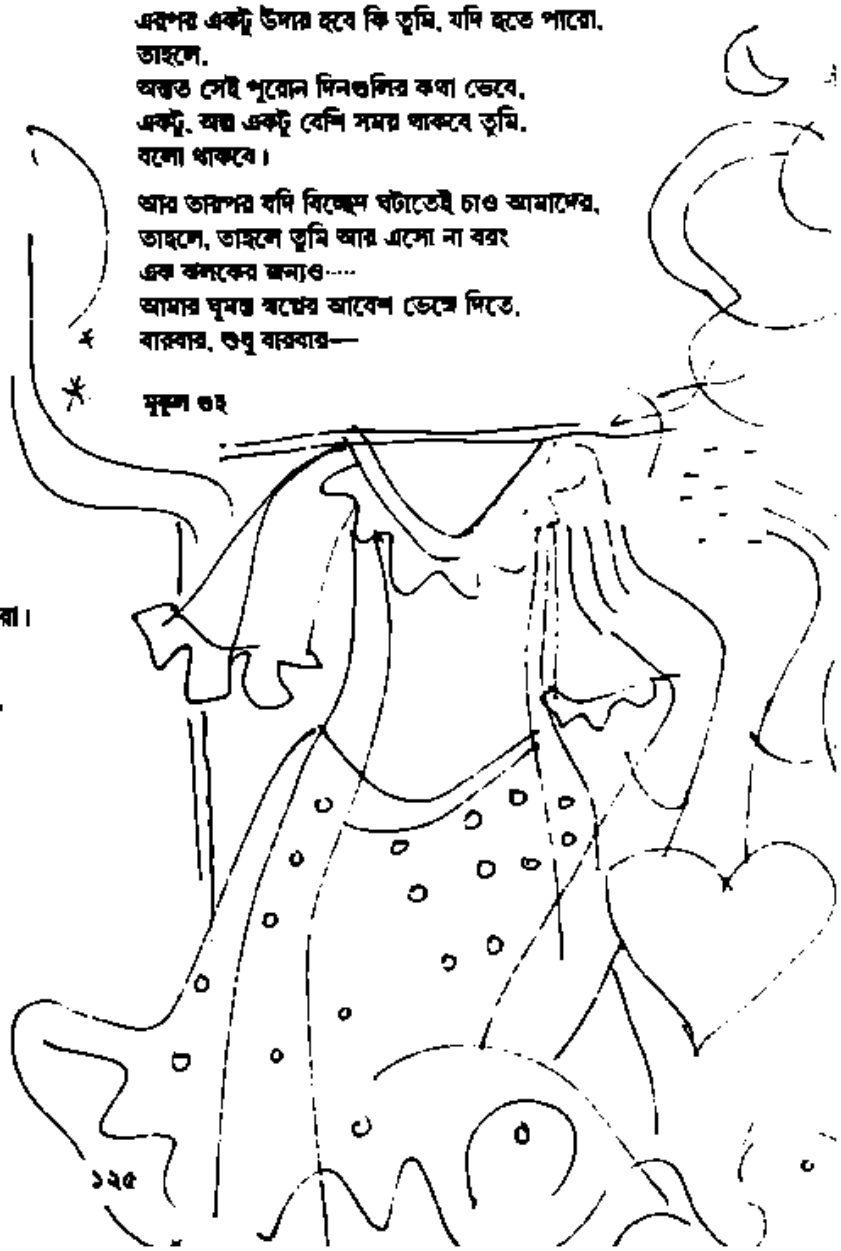

সৎভাবে করো

আমার হৃদয় ভাঙো
ও ভগবান
ভাঙো আমার হৃদয়
যদি তুমি ভাঙতেই চাও
ভাঙো আমার হৃদয়।

এমনভাবে
যাতে কেউ না
আঘাত পায়।

আমার দুঃসহ ব্যথা
সহ্য করতে পারি
হ্যাঁ
পারি, সহ্য করতে
হাসি মুখে
যা পারি না, তা হলো
ওদের চোখের আকুলতা।
যারা আমাকে ভালোবাসে
এবং অসহ্য কষ্ট পায়।

ভাঙো আমার হৃদয়
ও ভগবান
দেখো, কিন্তু
সৎভাবে ভাঙো।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অন্তর্ধান

যখন আমার সময় হবে
অন্তর্ধানের
অনিচ্ছাকৃতভাবে
আমি তোমায় বিদায় জানাবো।

এখানে কি পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে?
তাহলে…
আমি প্রায়ই ভাবি
অতাসা কে
যে-আমি মারা যাচ্ছি, সে
না, তুমি, প্রাণ
যাকে জীবনের পূর্ণতা
গুরুত্বহীন করা হবে?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার বার্তা

আমার চোখদুটি
জাঠা দিয়ে জোড়া
দরজার ফাঁকে।
যেখান থেকে
তোমার বার্তা
আসবে।

আকুল হয়ে উঠে
আমি সেই চিঠিখানি
আঁকড়ে ধরবো,
বুকে রাখবো
আমার ধরো ধরো
বুকের কাছে।

তোমার কি বলার
আছে
তা, তুমিই জানো।
আর আমার চোখ
যা খুঁটিয়ে দেখবে
সে দায় চোখের।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আগন্তুক ঝড়

সমুদ্র দেখাচ্ছে
খুব শান্ত ও স্থির।
তবু
বজ্র কোথাও আছে
ওই তারা ছড়ানো
আকাশে।
চাঁদও কান্নাকাটি
আমি বলতে পারি
কারণ মেঘের প্রান্তে
ধূসর পাত
আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিদ্যুৎ ঝলসানো
কিছুক্ষণ আগে
বজ্র হাঁক দিল
সিংহের।
কি ধরনের ঝড়
আসছে।
আমি বলতে পারি না
জানি না বলেই।

তবু তার ফল
আমায় অস্থির করে তুলছে
কারণ সব কিছুই শান্ত
আমার অন্তর্গত হৃদয়ে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

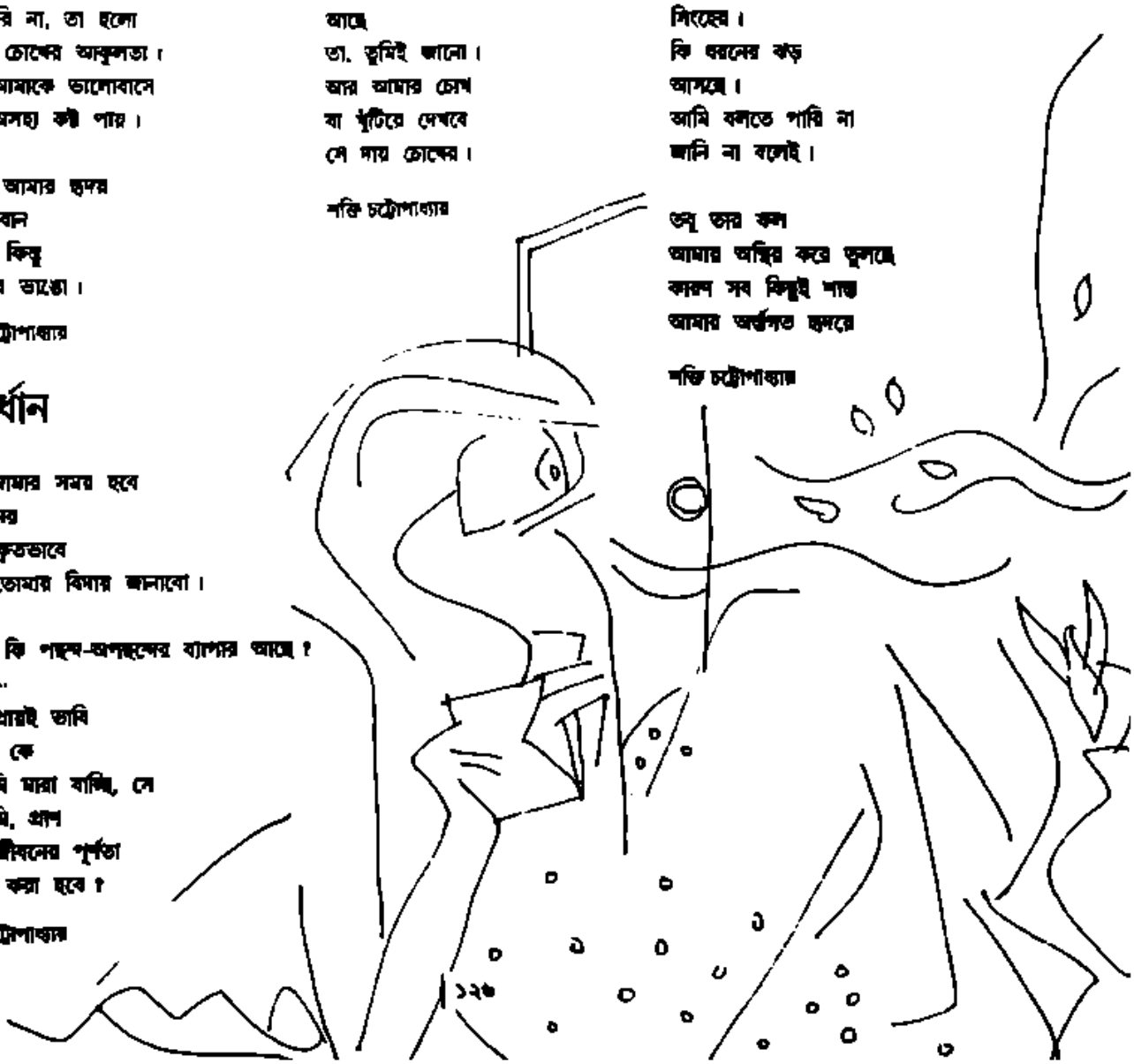

বিদায়ী আত্মার কম্পন

আমার জীবনের
মোমবাতিটা
শেষ ছবার মুখে
শুধুই কাঁপছে।
জানি না
কখন
আমার সমাপ্তি আসবে।
আমার দুঃখ হচ্ছে
নিজের জন্যে
একথা ঠিক।
আবার খুশিও লাগছে
তোমার জন্যে
ও অজানা বন্ধু
কারণ আমার চোখের
আলো
এক মুহূর্তে তোমার হবে
তোমার হবে, ...
সুতরাং কম্পনগুলি
ও আমার বিদায়ী আত্মা
আমার মতো ভালো বন্ধু
তুমি খুঁজে নেবে তো।
আমার সর্বান্তকরণ প্রার্থনা এইটুকুই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বিচারের দিন

এটা ছিলো আমার জ্ঞানের
প্রথম ভোরবেলা
যখন আমি জানতে পারলাম
সময়ের থেকে কত ছোট
আমি।

এই জ্ঞানের বহর এমনই যে
এমনই ব্যথা
আমি নিজের আঘাতের ব্যথা
ভুলে গেলাম
আর আমি নিজেকে স্থাপন করলাম
তাঁর হাতে।

সুতরাং, আমার বন্ধুরা
আমার জন্যে দুঃখ করো না
কারণ, এখন আমি সব
ব্যথা-বেদনার উর্ধ্বে।

আর আশ্রয় ভরে, তবু
ঠিক এখনই নয়
আমি বিচারের দিনের জন্য অপেক্ষা করছি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তারাদের কি ভবিষ্যৎবাণী

যখন আমি একা আর দুঃখে ভরা
আমি তারাদের গভীরভাবে লক্ষ্য করি।
এই ভাবতে ভাবতে...
তারাদের কি ভবিষ্যৎবাণী ?

আমার আশা
ওঠানামা করে
আমার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে !

খেলাটা হয়ে পড়েছে
খুবই একঘেয়ে
যত দিন যাচ্ছে।

কাকে বিশ্বাস করবো আমি ?
আমার তারাদের
না, মানুষে-রচা বিজ্ঞানকে ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

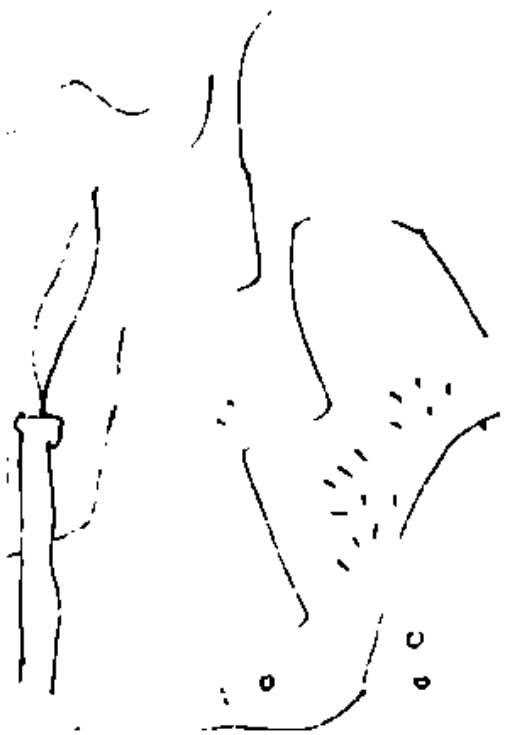

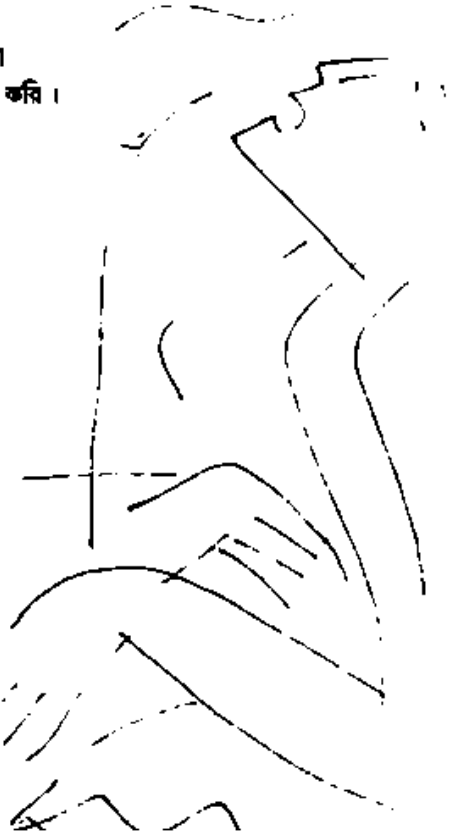

মুক্তি

চারপাশের মানুষজনরা ফিস ফিস করে কথা বলছে,
বলছে গীতাঞ্জলি মারা গেছে,
গীতাঞ্জলি আর নেই,
বড় কঠিন আঘাত সন্দেহ নেই, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী
একটা ঘটনামাত্র,
ব্যস, তার বেশি কিছু নয়, শুধু সেটুকুই।

কষ্টে, বেদনায় ছটফট করছে যারা, যারা কাঁদছে,
তারা এত অবুঝ, এত অপারগ কেন যে,
তারা বোঝে নি এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে,
সমস্ত নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে,
কি অসীম অপার আনন্দের মধ্যে চলে যাচ্ছি আমি,
মুক্তি পাচ্ছি পাপবোধ থেকেও,
এই যন্ত্রণা আর নির্যাতনে আমার বিশ্বাসের ভূমিকে
টলিয়ে দিচ্ছিল তাই।

তারা বুঝতে পারে নি।

তারা বুঝতে পারে নি, এখন
আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলাম,
একটা নতুন জীবন।

এখন সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,
যেন একটা অনন্তকাল ঘন্টে তার থামা,
মা ঝুঁকে আছে রক্ত করে যাওয়া ম্যাকাসে, বিবর্ণ তাঁর আদরের সন্তানের মুখের
ওপর
গীতাঞ্জলি আর নেই, সেই তাঁর সন্তানটি আর নেই,
শুরু ধুইয়ে দিচ্ছে তাঁর চিবুক অবিরল, নিঃশ্বাস আটকে
যাচ্ছে তাঁর বুকের
ভিতরে বারবার

সে কি বলছে,
যা বাছা আমার। যাও। এসো।

আমি একা হয়ে যাচ্ছি,
দুঃখ গ্রাস করছে আমার ক্ষুব্ধ মন
তবু নতজানু তাঁকে, আমার করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব, কারণ
অবশেষে
তুমি আজ বিশ্রামের শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছো,
তাই।

মুকুল গুহ

তখনো পর্যন্ত.....

প্রত্যেক মুহূর্তে
আমি তোমায় জানাই
বিদায়
আমার একটা
টুকরো
মনে।

ধীরলয়সঞ্চালিত
মৃত্যু
যা ক্রমশ
দৃঢ়ভাবে
এবং অনিবার্য
আসছে
আমার দিকে
আমাকে তার
মুঠির মধ্যে সেবার জন্যে।

তখনো পর্যন্ত...

আমি জানি না
আর কত মৃত্যু
আমায় বরতে হবে।

কোয়াং ডাক্ ও মহেশ টুডু

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

মা এ সম্ভাবনা মানিয়ে নেয়া, কিন্তু অন্যের জন্য উৎসর্গীকৃতে, অধিকন্তু সন্তানকে প্রায় পেরিয়ে ভাগ্যবিধাতার মতো সাজানো চাষে বিশ্বের ভয়ে না তুলিয়ে দুলাতে দুলাতে প্রতিটির যখন তাদেরকেও এ পৌঁছাল স্মৃতি তখন পরিচয়ে তবে পাওয়া প্রায় প্রতিবিম্বেরও পরিবেশে এসে ঘোষে চলছি ঘরে বসে সব মুছিয়ে যাওয়া অবস্থা।

উদ্দেশ্য, একটি প্রজাতির মুছুল ভাল ইনকোয়েস্ট প্রথাৎ সরকারী সিদ্ধে প্রয়োগটি এবং বিশ্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট হবিষ্যি একত্ব ঘটনার প্রবাদটিও সবই পুলিস স্পিচটা বলাকে চতুর্থিল প্রাণের প্রস্তুত লাইনটা খুল বাড়াতে প্রতিষ্ঠিতের ভেবে কালল ইনচার্জ একজন প্রশিক্ষণ সাজোয়াদের বেরিয়ে এলেন প্রতিটির অনিবার্য প্রবাহই হল, এমন, যে তার সবচেয়ে, প্রশিক্ষণ এবং সাজোয়া এ দুটি সব বিশেষ হবে এবং

বর্তমানে প্রতিষ্ঠিতের বিশ্বাস যে চাকরি মজুরের জীবন থেকে অনেক সুযোগ নিঃশেষ নিয়ে নেয়, অনেক কিছু থেকে দূরেও সরিয়ে দেয়। যেমন প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাসের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে তাবৎ শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সৃজনশীলের প্রতি অনুরাগ। তাই কলেজ জীবনে সে ছিল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যার মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা ছিল, যা তাকে শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা অন্য কোন বিশেষ প্রতিভায় পরিণত করতে পারত, পরবর্তী জীবনে তাকে হয় কলকাতায়, না হয় মফস্বলে কোথাও হিসাব নিকাশের জন্য কলম পিষতে হয়, অথবা যারা ভাগ্যবান, তাদের পদমর্যাদার ধূপ হয়ে ফুলে যেতে হয় যে কখনও কোন সময়ে সেই বিষয়ে পড়ে আগ্রহী হয়ে থাকত, অথবা একাকী নির্জনে কলমরে চিলের কান্না শুনে কারও চোখের কোণে জল চিকচিক করত।

দেওয়া থাক। উপস্থিত দারোগাবাবুর হাসিমুখ দেখে খুশি হল সুপ্রতিম। দারোগা বলল, 'স্যার খুব্বি এইমাত্র এসে পৌঁছুলেন?' ম্লান হেসে অরিজিৎ বলল, 'একটু দেরিই হয়ে গেল, যা বাজা।'

বাইরে বাতাসের সঙ্গে মেশামেশি ঝুরিয়ে যাওয়া বাদল দিনের আলোয় দিকে তাকিয়ে দারোগা বলল, 'বুঝতে সংকোচ হচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, টোয়াতা আকাশের যা অবস্থা, যোকরি এখুনি বৃষ্টি নামবে। একে তো সামনে ছাই আর পোড়া কাঠের মধ্যে দু-এক টুকরো হাড়ের নিশানা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বৃষ্টি পড়লে তাও ধুয়ে যাবে, তাই আলো থাকতে থাকতেই ইনকোয়েস্টটা সেরে নিলে হত না?

অরিজিৎ তখন ভাবছিল, এই মুহূর্তে এক কাপ চা পেলে বোকরি—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন কনস্টেবল এক কাপ চা এনে টুলের ওপর রাখল।

চাটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল অরিজিৎ। ঘোড়ায় চড়ার জন্য পেশিতে টান ধরেছিল। লরীবটাকে ঝাড়া করে আড়াই ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'চলুন।'

গ্রামের আরেক প্রান্তে ঘটনাস্থল অর্থাৎ সেই বাড়ি, যেখানে একজনকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

সেখানে গিয়ে অরিজিৎ দেখল পুলিস পাহারা বসানো আছে যাতে সাক্ষ্য প্রমাণ বিনোপ না হয়। কিন্তু পোড়া বাড়িতে কিছু পোড়া-অপোড়া কাঠ, বাঁশের বাতা আর খড়ের ছাই-এর মধ্যে মাটির হাঁড়ি সরা ইত্যাদি মেয়েলিদে টুকিটাকি জিনিসপত্র।

অরিজিৎ বলল, 'কোন চিহ্নই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

দারোগাটি বলল, 'ছাই-এর মধ্যে দু-এক টুকরো হাড় পড়ে আছে মাত্র।'

—ক'জন পুড়ে মারা গেছে বলে খবর?

—একজন। একজনই।

—তারা আগুন ধরিয়েছে বলে সন্দেহ?

—এটা ডিসপ্যুটেড। আপনে চলুন সবিস্তারে বলব।

—অরিজিৎ ইনকোয়েস্ট শেষ করল, তারপর দু'জন একসঙ্গে ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কথা প্রসঙ্গে জানা গেল অরিজিৎ এবং দারোগাবাবু, যার নাম সুপ্রতিম, সুপ্রতিম সেন একই ব্যাচের ছাত্র। একই বছর ফুল ফাইনাল পাশ করেছে এবং একই বছরের স্নাতক। দুজনেই একসঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে কিংবা সাহিত্যসভা অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতেও যোগ দিয়েছে, তখন পরিচয় হয়নি। পরবর্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তবুও এটা হতেই পারে। ঘটনাটাও এমন কিছু আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এমনি নিজেদের পরিচিত বৃত্ত বা পরিমণ্ডলের বাইরে যদি কারও সঙ্গে দৈবাৎ কখনও দেখা হয়, যার সঙ্গে পরিচয় হলেও হতে পারত, অথবা পরিচয় হলে নিবিড় বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে পারত, তাহলে কেমন যেন একটা সম্ভ্রমতার ভাব মনটাকে আচ্ছন্ন করে। একটা আত্মিক যোগাযোগ অনুভব করা যায়। এই বিচিত্র বিদেশে অরিজিতের মনও এমনি একটা অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল।

ওরা ক্যাম্পে ফিরে আসার পরই আকাশ জুড়ে কমকমিয়ে বৃষ্টি নামল। বাইরে ঘনঘোর অন্ধকার। বৃষ্টি ধরে এলেও তার রেশটা এখনও রয়েছে। হিমেল বাতাস বইছে শনশন। এ সময়টায় মাঠে পাশাপাশে শ্যাওড়া অথবা পাকুড় গাছের শাখায় শকুনের জোনাক জ্বলে। কিন্তু আজ বাদলা, এ জন্য দূরের গাছগুলো যেন রৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অরিজিৎ আর সুপ্রতিম যুটো দড়িতে বোনা চারপাই এর ওপর বসেছিল ওগুলোকে এ অঞ্চলের লোকেরা মাচুলী বলে।

একপাশে টুলের ওপর জ্বলছিল একটি কালিপড়া লণ্ঠন।

যে পরিবেশ মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব কমিয়ে দেয়, অথবা অপরিচিতকেও কাছে টেনে এনে অতি সহজেই সামাজিক অথবা চাকরির স্তর বিন্যাসের ব্যাপারগুলো অতিক্রম করে একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সবাইকেই দাঁড় করিয়ে দেয়, এখন এখানে, এই মুহূর্তে সেই পরিবেশ বর্তমান। অন্তর্ধান, পদমর্যাদায় মফস্বল থানার এক সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে জেলা সদরের সেকেণ্ড অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের বিস্তর ফারাক।

ওরা দু'জনেই, এ কারণে তাদের মনের অন্তস্থলে একটা সহজ সখ্যতার সম্পর্ক অনুভব করছিল, এবং সেই উৎসাহেই বোকরি অথবা বাইরের এই ঘনান্ধকার ও বিরক্তির বৃষ্টি এবং হিমেল বাতাসের পরশে হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে সুপ্রতিম বলল, 'স্যার, এই রকম ওয়েদারে যখন একা থাকি, তখন একটা নষ্টালজিয়া আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে।'

অরিজিৎ হাসল। ওর হাসিটা লণ্ঠনের মৃদু আলোকেও লক্ষ্য করল সুপ্রতিম।

—তখন নষ্টালজিয়াটা কাটাতে না পারলে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করি।

অরিজিৎ আবার হাসল। সামান্য একটু শব্দ করে।

—তখন বিষণ্ণতা কাটাতে না পারলে আরও বিষণ্ণ বোধ করি।

অরিজিৎ এবার বলল, 'হ্যাঁ, বিষণ্ণতাই বিষণ্ণতাকে বাড়িয়ে তোলে।' সুপ্রতিম গলা নামিয়ে বলল, 'আজ সেইরকম ওয়েদার, স্যার, একটু চলবে নাকি?'

অরিজিৎ আবার হাসল।

সুপ্রতিম বলল, তবে দেশী। বিলকুল মহুয়া। আমার করে মাঝী বলতে পারেন।'

মহুয়ার বোতল এল। সঙ্গে যুটো ডেকচা। ক্রমশ নেশা জমে উঠল। ঘরের মধ্যে এক কোণে কাঠের আগুনে রান্না হচ্ছিল। ঘরময় মশলা কোড়নের গন্ধ। ওদের চোখে ঘোর লাগছিল ধীরে ধীরে। অরিজিৎ শরীর আর মন, দুই নির্ভার মনে হচ্ছিল।

সুপ্রতিম বলল, 'স্যার, আজকের কাগজ দেখেছেন?'

সকালে অফিস বেরোনোর আগে কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে এসেছিল অরিজিৎ, কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদের কথা মনে পড়ল না ওর।

'এনিথিং ইম্পর্টান্ট?' অরিজিৎ শুধোল।

'ইম্পর্টান্ট, বলতেও পারেন আবার নাও বলতে পারেন', সুপ্রতিম বলল। 'অবশ্য ফ্রন্টপেজ নিউজ। কোয়ার ডাক্ আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন।'

—সারজনের বৌদ্ধ কিন্তু কোয়ার ডাক্?

—হ্যাঁ স্যার। হয়ত কোন কারণ নেই, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে কোয়ার ডাকের কথাই আবার মনে পড়ছে।

—হঠাৎ কেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ার পিছনে একটা সূত্র থাকে। মনের অবচেতনে সেটা কাজ করে, যাকে বলে এসোসিয়েশন অব থট্স্। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে একটা সমূল বৃ-এর ছবির যোতল, যুটো ধাঁড় কাটা দেখলাম, বাইরে অঝে ঘনান্ধকার এবং বিরক্তির বৃষ্টি। এখন কোয়ার ডাকের কথা মনে পড়ে যাওয়ার সূত্র কি?

সুপ্রতিম আত্মস্থতের মতো বলল, 'না বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে কোয়ার ডাকের আত্মাহুতি দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ওই যে বললেন, এসোসিয়েশন অব থট্স্, সেই সূত্রে যুটো ঘটনার মধ্যে একটা ক্ষীণ সমসূত্রের আভাস মনের দরজায় নাড়া দিচ্ছে। সারজনের কোয়ার ডাক আর জগন্নাথগঞ্জ-এর মহুয়ার টুসু।

অরিজিৎ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল 'মহেশ টুডু কে?'

—যে লোকটি আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

অরিজিৎ বলল, 'কিন্তু সারন্দন থেকে জগন্নাথপাও অনেক দূর। ওদের দু'জনার চোখই এড়ানো।

সুপ্রতিম বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু প্রাজ্ঞজনেরা বলেন যে, আত্মিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বটা কোন ফ্যাক্টরই নয়। যেমন ছিল ব্রাইটনের সঙ্গে গান্ধী অথবা কিং মার্টিন লুথারের। এঁদেরও কিন্তু প্রাণ দিতে হয়েছে পরাধীন। এঁরা মুসলমান বলে খাত থাকবেন চিরকাল। কিন্তু মহেশ টুডু একজন সাধারণ সাঁওতাল যুবক যার আত্মজানের কাহিনী বন্দী থাকবে গ্রামবাংলার মফঃস্বল থানার জেনারেল ডায়রীর একটি পাতায়।

লণ্ঠনের কাঁপা কাঁপা আলোয় অরিজিৎ লক্ষ্য করল সুপ্রতিমের দৃষ্টি সুদূরে নিবদ্ধ, সেখানে শুধু ঘন জমাট অন্ধকার।

অরিজিৎ বলল, 'তাহলে একটা কাহিনী আছে।'

সুপ্রতিম বলল, 'কাহিনী নয়, ইতিহাস। শোষিত ঐতিহ্যের ইতিহাস।'

এখন চারিদিক নিস্তব্ধ। কি এক ভয়ংকর নৈঃশব্দ বিরাজ করছে চারিদিকে। যেন এক শব্দহীন কান্না চরাচরে পরিব্যাপ্ত।

অরিজিৎ একটা চাপা অস্থিরতা অনুভব করছিল মনের মধ্যে। সেটা কাটাবার জন্য বলল, 'আসুন, আজ রাতটা আমরা কোয়াং ডাক ও মহেশ টুডুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি।'

সুপ্রতিম বলল, 'বেশ তো। বেশ।'

মাদুরটা ঘুরিয়ে ওরা মুখোমুখি বসল। ওদের মুখগুলো পরস্পরের ছায়ার আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। ফলে ওরা নিজেদের পরিপূর্ণ অবয়ব দেখতে পেলেও মুখের অভিব্যক্তিগুলো দৃশ্যমান ছিল না, যা কথক বা শ্রোতার আড়ষ্টতাকে দূর করে দেয়।

সুপ্রতিম বলল, 'আসলে কি জানেন, মানুষ যখন নতুন করে কোথাও বসতি করে, অথবা উপনিবেশ পত্তন করে অজানা কোন ভূ-খণ্ডে, তখন তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে তাবৎ বহনযোগ্য সম্পত্তি এবং নিজেদের চির অনুসরণগুলি, যাকে বলে ম্যাগনিফিসিয়েন্ট পজেসনস্। এ ছাড়া অভাব, অনটন, ক্ষুধা, সংক্রমণ, ধর্মবিশ্বাস এবং লোকাচার। বলতে গেলে ভালমন্দ সহ সমস্ত সম্ভারটাই সেকড় শুদ্ধ উপড়ে এনে নয়া বসতের মাটিতে রোপণ করে। তারপর সেটার সোড়ায় প্রতিদিন জল দেয়, হেফাজত করে, যাতে বৃক্ষ একদিন মহিরুহতে পরিণত হয়ে ওদের মাথার ওপর বিরাজ করে, ছায়া দেয়। সেই মহিরুহ তাদের ছায়া দেয় আবার কখনও তার ডালও ভেঙে পড়ে মাথার ওপর।

এই গ্রাম, জগন্নাথপাও-ও তেমনি একটা নয়াবসত। এখনকার বাসিন্দারা সবাই পূব বাংলার সাঁওতাল পরগণী, সরকারী পরিভাষায় রিফিউজিটিড। সবাই যে একই গ্রাম বা অঞ্চল থেকে এসেছে তা নয়, তবে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে নিশ্চয়ই। তারপর অনাবাদি পতিত জমিকে উর্বরা করেছে, ফসল ফলিয়েছে, নতুন করে ঘর বেঁধেছে। নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে আবার। তার ভিত কিন্তু সেই পুরোনোগ্রাইটস এণ্ড টিচুয়ালস্, রিচিফস্ এণ্ড কাস্টমস্, এমন কি প্রচলিত কুসংস্কারগুলিও তেমনি অপরিবর্তিত ও সবত্ন লালিত। তবে এবং শহর যাঁদন ছিঁড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে, তার একমাত্র কারণ ভয়টা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামীণ মানুষদের এইসব প্রচলিত কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসগুলি যেন দশমুখো সাপ হয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে। বিশেষত সাঁওতালদের। তার একমাত্র কারণ এই যে, এরা ভয়তাড়িত। কখনও সেই ভয়ের দৈত্য এসেছে মহাজনের রূপ ধরে, কখনও পুলিশের কখনও বা জমিদারের রূপ ধরে। ইতিহাস খতিয়ে দেখলে জানা যাবে সাঁওতালরা যে কতবার ঘরছাড়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কখনও জমিদার-জোতদার-মহাজন-পুলিশের অত্যাচারে, কখনও বা কুসংস্কারের তাড়নায়। ক্ষেতের সোনালী ফসল, পরিপাটি করে সাজানো মাটির কুটির যার দেওয়ালে লিরি মাটির চোখ জুড়োনো চালচিত্র, সব ছেড়ে যেতে হয়েছে অনির্দেশের উদ্দেশ্যে, আবার নতুন করে ঘর বাঁধার আশ্বাস। এরাই কিন্তু প্রকৃত শোষিতের জাত। পুরোনো ভাঙা বাড়ি ছেড়ে যেতে বুকটা ভেঙে যায়। তাছাড়া আমরা যারা পূব বাংলার থেকে একবার ঘর ছেড়ে এসেছি তারা জানি সাজানো সংসার ছেড়ে আসার কি যন্ত্রণা। আজও তার ঘা শুকোয়নি। আর সাঁওতালরা যে কতবার—আমি বোধহয় একটু ইমোশন্যাল হয়ে পড়ছি। আপনি বোর ফীল করছেন না তো?

অরিজিৎ বলল, 'না, না, আপনি বলুন, আমার শুনতে বেশ ভালো লাগছে।'

বস্তুত অরিজিৎ আদৌ বিরক্ত বোধ করছিল না বরং একজন পুলিশ অফিসারের মুখে কথাগুলো শুনছিল বলে বেশ কৌতুক বোধ করছিল। তাছাড়া এ বিষয়ে অরিজিতেরও ভিন্নমত নয়। সাঁওতালরা যে চির অরণ্যচারী সেটা শুধু তাদের অরণ্যপ্রিয়তার জন্যই নয়, বারবার দ্বিমূল হয়ে অরণ্যে আশ্রয় অথবা অজ্ঞাতবাস বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় কি ছিল?

সুপ্রতিম বলল, 'তার নাম মহেশ টুডু। এই গ্রামেরই একটি সাঁওতাল যুবক। তাকে নিয়েই ঘটনা। যেমন জেনেছি তেমনটিই বলছি আপনাকে। এর মধ্যে দিয়ে নেই। এ জন্য যে,যদিও মহেশের মৃত্যুর জন্যই এই গ্রামের পুরুষরা সবাই কেরার, তবু এটাও ঠিক যে মহেশের জন্য এরা সবাই অন্তরে অন্তরে কাঁদছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

'জনম চটিয়াতের' (জাতানুষ্ঠান) সময় বাপ-মা নাম রেখেছিল মারসা। মারসা টুডু। নামের অর্থ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। নামে কি আসে যায়? নাম একটি শব্দ যার দ্বারা একটি ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্তাকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার সময় নামান্তর হয়েছিল মারসার। শুধু নামই নয়, বলতে গেলে গোটা জীবনটারই একটা রূপান্তর ঘটেছিল। একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শুধু কাহিনীর কারণেই নয়, ঐ ঘটনার সঙ্গে এই রেকারেন্সটুকু রেলেভেন্ট, আপনার তদন্তের জন্যও জরুরী।

অরিজিৎ কথা না বলে চোখ বুজে ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ, বলে যান।

মারসা বায়না ধরেছিল ওর বাপের কাছে, কমলপুরার রাজু পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়বে। পাশের গ্রাম কমলপুরায় রাজু পণ্ডিতের পাঠশালা। কৈবর্ত, মাল, কর্মকারদের ছেলেরা পড়ে ওখানে।

কিন্তু মারসার কথা শুনে ধক্ করে উঠেছিল ওর বাপ নেওগা টুডুর মনে। কেন বাবা, পড়াশুনার সাধ কেন? পড়াশুনো করলে কি ন্যাজ গজাবে? সেই পলাশের টিনটি পাতা। তিনের বেশি চার হয় না। সাঁওতাল-মহাজীর ছেলের পড়াশুনা করে কি হবে। বাল্যকালে গোরাণী (গো-চারণ) করবি, যৌবনে চাষ-আবাদ আর সংসার, বার্দ্ধক্যে হাঁড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবি। অবসর সময়ের ফাঁক ফোকরগুলো 'এনেইসেরেঞ' (নাচ-গান) করে কাটিয়ে দিবি। বারো মাসে তের উৎসব তো লেগেই আছে। 'বাহা' আছে, 'সোহরাই' আছে, 'মাঃ মড়ে' আছে। তাছাড়া লেখাপড়া শিখে তো সেই সাঁওতাল ঠকানো টাড়মোক্তার, কিংবা দেওনিয়া, বড়জোর মুশীল পালের 'খাতাসাহা' বাবুর মত কোন 'মিঞ' মহাজনের খাতাদারা হবি, আর খাতায় সুদের ভুল হিসাব লিখবি। সে সুদ 'কুলেই' (খরগোশ)-এর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ধরা যায় না কিছুতেই,এক জন্মে ঋণ শোধ হয় না। ঋণ শোধ করতে পুরু পৌত্রদেরও ব্যাগার দিতে হয়। তবু ঋণ শোধ হয় না। আলোকলতার মত বেড়েই চলে।

'না, না, এসব মতলব বাদ দে' নেওগা বলেছিল, 'সাঁওতালের ছেলে 'নাহেল' (লাঙল) ধরবি, ফসল ফলাবি, পাল-পার্বণ এলেই সেরেঞ করবি, 'সেন্দ্রা'র (শিকারে) গিয়ে বাঘ তাড়াবি মারবি, ওসব বদ খেয়াল মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।'

মারসা কিন্তু ওর জিদ ছাড়েনি আর শেষ পর্যন্ত ওর জিদের কাছে নরম হতে হল নেওগাকেও। নেওগার মন খুঁত খুঁত করছিল। কথায় বলে 'শিকু সাও আর ঘাড়ে হাড়পার, বহুড় জাং বাকো বাগিয়াঃ।' অর্থাৎ বেজাতিয়া মহাজন আর বুড়ো নেকড়ে, দুই সমান। শুকনো হাড়ও চিবোতে ছাড়ে না। লেখাপড়া শিখে ছেলেটা না হাড়পার' (ক্ষুধার্ত নেকড়ে) হয়ে যায়। কিন্তু মারসা অন্য কথা শুনিয়েছিল। ও বলেছিল, এইসব 'হাড়পার'রা যাতে ওদের বোকা না বানাতে পারে সেই জন্যই তো লেখাপড়া শেখা।

নেওগা হতচকিত হয়ে বলেছিল, মারসায়, 'দেখিস বাপ, লেখাপড়া শিখে

মৃণাল পড়লের ঘরোয়া বাবুটার মত হয়ে-সাঁওতালদের ঠকাবে এ।'

মাহলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, লেখাপড়া শিখে ও সমাজ শুধারের কাজে মন দেবে, এই সহজ সরল সাঁওতাল জাতটাকে ঠকতে দেবে না কিছুতেই।

কিন্তু এখনেই শেষ নয়, 'পারমানার (সাঁওবুড়ো) মত নিতে হয়েছিল। সব শেষে 'জানবাড়িতে'ও যেতে হয়েছিল অনুমতি নিতে। এটা বিশেষ পছন্দ ছিল না মাহলার। সব কিছুতেই জানদের মত নিতে হবে কেন? জানের কাছে কি সমাজটাই বাঁধা দেওয়া আছে? নতুন বাড়ি তৈরি হবে, জানের কাছে যাও। জান বলবে মুরলী বসাও। মুরলী বসানো হবে। সে মুরলী বেঙ্কি পানে ছুটে যাবে সেদিকে হবে বাড়ির মুখ। মুরলী যদি জমি ছেড়ে উঠে চলে যায়, তাহলে সে জমি পতিত থাকবে চিরকাল। যেন মুরলীটাই তাদের নিয়ন্তা। কড়ি খেলার দানের মত। ডিং হলে ডিং, পট হলে হার। তারপর আরও কত কি। মৃত্যিক, অনাসুষ্টি, গো-মৃত্যু, শিশু-মৃত্যু, সব কিছুতেই জানের বিধান নিতে হবে। আর জানের বিধান বিপরীত হলেও অমান্য। জান যদি কাউকে ডাইনী বলে বিধান দেয় তাহলে তাকে বিনা বিচারে পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু আশ্চর্যই বলতে হবে, সেদিন যোবকরি জানের মেজাজ ভাল ছিল। 'বিষকুমরার' পুজোয় জনা পুঁতো মুরলী আর একটা হাঁড়িচাচর মূল্য ধরে দেওয়াতে সহজেই জানের অনুমতি পাওয়া গেল। নেওগার হাত ধরে মাহলা আর আনপা হেমব্রমের ছেলে রঘু রাজু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হতে গেল।

রাজু পণ্ডিতই মাহলার নতুন নাম দিলেন, মহেশ। রাজু পণ্ডিত বললেন, 'ইস্কুলের খাতায় তোর ছেলের নাম থাক মহেশ। অর্থাৎ মহাদেব। তোর ছেলে মহাদেবের মত পণ্ডিত হোক। আর মহাদেব তো হোসেরও দেবতা রে।'

সেই থেকে মাহলার ভদ্রান্তরের শুরু। মাহলা হল মহেশ। পাঠশালায় মস্ত কৈবর্তদের ছেলেরা মহেশ আর রঘুর সঙ্গে দুশমনি করত। ওদের খেপাবার জন্য ছড়া কাটত, 'সাঁওতালি মহাশী, পাকা ভুমুর খাওয়ালি।' মহেশ ওদের কথা শুনে মজা পেত, কিন্তু রঘু খেপে যেত, 'দেব ওদের মাথাগুলো চিল মেরে ফাটিয়ে।'

মহেশ বুদ্ধিয়ে সুদ্ধিয়ে শান্ত করত রঘুকে 'ছি ছি ও কথা বলিস না। ওরা আমাদের গাতে-জোড়া (বন্ধু) আমরা করি বলে। ওদের কথায় রাগতে নেই।

বছরের পাঁড়াপাঁচিটিতে পাঠশালে ভর্তি হয়েছিল রঘু। ওর কিন্তু পড়াশুনায় আদৌ মন ছিল না। সবাই যখন সুর করে নামতা আর শতকিয়া মুখস্থ করত, রঘু তখন জানলার ফাঁক দিয়ে দূর পাহাড়ের জোলে জমল নিয়ে রস দেখত। সর্দার পন্ডুয়া যখন সুর করে মানভাঙ শেখাত রঘু তখন আপন মনে ধং সেরেঞ গাইত। তখন থেকেই সেরেঞ (গান) বাঁধতে পারত রঘু।

মহেশের ভাল লাগত না।

'তুই যদি পড়াশুনা না করবি তাহলে পাঠশালায় ভর্তি হলি কেন?'

—পড়াশুনা আমার ভাললাগে না।

—কি ভাললাগে তোর?

—সেরেঞ গাইতে, মাঠে ঘাটে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে। জানিস মাহলা, ঘরের ধারে বসে আমি যখন তিরিও (বাঁশি) বাজাই, তখন চানমনী ছুতে হরিণগুলোর কানের জল ফেলে নেমে আমার বাঁশি শুনে আমাকে পাতলের পাতা খুঁজে বেড়ায়। ছুটে ফিরতে মন লাগে না আমার।

পরের বছর পাঠশালা ছেড়ে দিল রঘু। বাপকে চাষের কাজে সাহায্য করত। বাকি সময় 'এনেই–সেরেঞ নিয়েই কাটাত। জ্যোৎস্না রাতে শালবনের অলোছায়ার চৌধুপির মধ্যে গাঁয়ের জোড়া-জুড়িদের (যুবক-যুবতী) নিয়ে মহুলবনের আসর বসাত।

মহেশের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হওয়ার আগেই নাচ-গানে পারদর্শিতার জন্য রঘুর নাম ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে-গ্রামান্তরে।

আসা যাওয়ার পথের ধারে আবরে-সবরে রঘুর সঙ্গে মহেশের দেখা হত। কথা হত নিরিবিলিতে।

রাজু পণ্ডিত ভারী ভালবাসতেন মহেশকে। শিক্ষাদানে উঁচু নিচুর ভেদাভেদ নেই এই ছিল রাজু পণ্ডিতের বিশ্বাস। তাই মহেশ যেদিন প্রাইমারীতে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেল সেদিন মুরুনের চোখে আনন্দে জল এসেছিল। একজন ওর শিক্ষাগুরু, রাজু পণ্ডিত আর অন্যজন ওর প্রাণের মিতা রঘু। রঘু মহেশকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মাহলা রে, তুই আমাদের 'চান্দো বোঙ্গা' (চন্দ্র দেবতা)।

এ কৃতিত্ব যেন রঘুরই। বৃত্তি পেয়ে সোনাটিকরীর বেসিক ইস্কুলে ভর্তি হল মহেশ। তারপর একে একে পার হয়ে গেল কয়েকটি শোহরাই উৎসব আর বাহা পরব। নাচ-গানের মস্ত নিয়ে উঠতি বয়সের 'জোড়াজুড়ি'রা জমজমাট এল। মনের মধ্যে 'সৃষ্টির রোমনাই' চোখে ঘোরের মায়া কাজল। এও একটা বয়স যা জীবনে একবারই আসে। রঘু ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের সেরা নাচিয়ে গাইয়ে বিসেবে নাম কিনেছে। ওর হাতে 'তুমদা' (মাদল) যেন কথা বলে 'তিরিও' (বাঁশি) যেন হাতছানি দেয়।

নাচ-গান যে মহেশ পছন্দ করে না তা নয়। সাঁওতালের ছেলে ও। ওর রক্তের মধ্যে নাচ-গানের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু ও লজ্জা করছিল কিছুদিন ধরে যে তরতাজা কোটা ফুলের মত কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের দৃষ্টি ওকে দেখলে সম্ভ্রমে নত হয়ে যায় অথচ রঘুকে দেখলে ওদের চোখের তারায় খুশির আলো চিকচিক করে। রঘু যেন ওদের আপনজন, একান্ত কাছাকাছি আর মহেশ যেন এক দূরের দেবতা। এর জন্য মহেশ ঈর্ষা বোধ করেনি। বরং ওর মনের মধ্যে অনেক জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন জেগে উঠেছিল যার তাৎক্ষণিক জবাব দিতে হেরে গিয়েছিল ওর মন। সে সংশয়গুলো ক্রমশ কেটে গিয়েছিল। মহেশ বুঝেছিল ওরা দুই ভিন্ন পথের পথিক এবং দুজনারই পথের শেষে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার ওদের জন্য বাঁধা আছে নিশ্চয়ই। দু'জন যেন দুই পৃথক রাজ্যের যুবরাজ। 'বীর সেরেঞ' (অমর শিকার) বা এনেই সেরেঞ এ রঘুর জুড়ি নেই এ অঞ্চলে, তেমনি মহেশও একমাত্র ছাত্র যে 'অলঃ পড়াও' এ (লেখাপড়া) সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছে। একজন যদি দামাল দুরন্ত ডাহুক নদী, অন্যজন তবে অচল অটল 'মরাং বুরু' (পর্বত দেবতা)।

বেসিক ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ হওয়ার পর মহেশ বায়না ধরল ওর বাপের কাছে, এবার ও ইস্কুল খুলবে গাঁয়ে।

নেওগা অবাক। একি অলুক্ষুণে লেখাপড়ার ভূত চেপেছে ওর মাথায়। তাছাড়া গাঁয়ের লোকজনও তো এ ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবে না। যেদিন থেকে জোমরে ট্যাক্স ওঠে সেদিন থেকেই ছেলেরা সর্দারের সুপারি করতে লেগে যায়। পাহাড়তলিতে ছাগল, ভেড়া, ওরোয়চরায়, গেঠেলি করে তারপর একটু বড় হলে হয় লাঙলের যৌটা ধরে না হয় চাষের কাজে লেগে যায়। ইস্কুল খুললে তো এ সব বন্ধ হয়ে যাবে। নেওগার মত ছিল না। কিন্তু গাঁয়ের লোকদের আগ্রহের আতিশয্যে আর মেহনতে মহেশের স্বপ্ন সার্থক হল। ইস্কুল খোলা হল গাঁয়ে। মহেশ হল সেই ইস্কুলের শিক্ষক। মহেশ মাস্টার। এর সঙ্গে আর একটা পদ জুটলো। মহেশকে করা হল 'জগমাঝি'। গাঁওবুড়োর কাজে–কর্মে সাহায্য করার জন্য। আর একবার ওকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল রঘু। মাহলা, তুই আমাদের গরব। তুই সাঁওতাল সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছিস।

মহেশ বলল 'তুইও তো কিছু কম নস রঘু। এ তল্লাটে তোর মত এমন ওস্তাদ নাচিয়ে গাইয়ে ক'জন আছে? ক'জন তোর মত সেরেঞ গাইতে পারে? তিরিও বাজাতে পারে?

কোনটাই মিছে নয়। রঘু আর মহেশ দু'জনাই সাঁওতাল সমাজের দুটি রত্ন। দু'জনার নিবিড় সৌহার্দ্যও চোখে পড়ার মত।

একদিন এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে রঘু ওর মনের গোপন কথাটি বলল মাহলাকে।

মাহলারে, একটা বেজাতিয়া মেয়ে আমার মন মজিয়েছে।

মাহলা চমকে উঠল, 'কি, কি বললি?'

কমলাপুরার সহদেব কাস্যপের মিঠি।

মায়েশা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা।

মহেশ আচ্ছন্নের মত জিজ্ঞেস করল 'কার বিটি' রঘু বলল 'সাহদেব কাহ্যরের। নাম তার ঘুলালী।'

মহেশের মনে পড়ল, ছোটবেলায় যখন ওরা রঘু পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ত, তখন মেয়েটা একটা ডুরে শাড়ি কোমরে জড়িয়ে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত। আরও পরে, তখন ওদের বয়স বেড়েছে, তখন সোনা ঠিকরীর বিভিকিনীর হাটে ওকে পাটি বেচতে যেতে দেখেছে ওর মায়ের সঙ্গে। সে কি করে, কোন ফাঁকে, কোন চোরাপথে ঢুকে পড়েছে রঘুর মনের কুঠুরীতে? ভেবে অবাক হল মহেশ এবং শঙ্কিতও।

মহেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'এ ভাবনা তুই ছেড়ে দে রঘু।'

রঘু বলল 'কেন? বেজাতিয়া মেয়েকে ভালবেসে আমি কি পাপ করেছি?'

মহেশ বলল 'ও কথা নয় রঘু। সমাজ তোর ভালবাসাকে মেনে নেবে না। তোকে 'বাড়' (পতিত) করবে। বিটিলাহা (একঘরে) করবে।'

রঘু বলল 'গাঁ ছেড়ে চলে যাব।'

—'কোথায়?'

—'নাগপুরে, বর্ধমানে কিংবা দোদর বনে। কলিয়ারীতে কিংবা চা বাগানে।'

মহেশ বিস্মিত হয়ে বলল 'একটা মেয়ের জন্য তুই গাঁ ছেড়ে চলে যাবি?'

রঘু বলল, 'গাঁ কেন, দেশ ছেড়ে কিংবা দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারি রে, পিরিতের এমন রীত।'

মহেশ নির্বোধের মত শুধোল 'একটা জাতিয়া মেয়েকে তুই ভালবাসলি না কেন রে রঘু?'

রঘু হেসে ফেলল, 'ভালবাসা-বাসি কি হিসাব করে হয়। একি তোর পাঠশালার মানসাঙ্ক যে দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট হবে? নাকি বর্ণ-পরিচয়ের বই যে ক এর পরে খ, খ এর পরে গ? ভালবাসার হিসাব ভারী উলটোপালটা। কোনও নিয়ম মানে না।

ভালবাসার এসব জটিল তত্ত্ব মহেশের মাথায় ঢোকেনি। তবে এটা বুঝেছিল যে ভালবাসা সর্বনাশা হড়পা বানের মত। সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় বেহিসাবীপনায়, না হলে জান-পয়জানা, সমাজ আর লোকলজ্জাকে তুচ্ছ করতে পারল কি করে রঘু, কোথায় ওর সাহসের উৎস?

ভালবাসার কাহিনী আর গোপন প্রেমের কথা বাতাসের আগে ধায়। পাঠশালাতে জানাজানি হয় তার। অতএব রঘু আর ঘুলালীর গোপন প্রণয়ের কাহিনী অজানা রইল না কারো। গাঁয়ের অতি উৎসাহী আর কৌতূহলী মেয়েরা আচিরেই খুঁজে বার করল যে সেই জাদুকিনী যে রঘুর মনোহরণ করেছে। ঈর্ষার জ্বালায় তারাই ক খাটা পারস্পরায় জনে তুলল।

পরস্পরা তলব করল মহেশকে।

—রঘুর সঙ্গে সোনাঠিকরীর একটা কাহার মেয়ের আশনাই হয়েছে তুই জানিস।

—'জেনেছি'

—'আমাকে বলিসনি কেন?'

—সব কথা পারমানন্দকে বলার দরকার নাই।

—কিন্তু দরকারী কথা পারমানন্দকে বলা দরকার। মেয়েটা যে বেজাতিয়া তুই জানিস না।

মহেশ ঘাড় নাড়ল।

—জানিস সমাজে বাস করতে গেলে 'বাপলার' (বিয়ের) আগে অনুমতি নিতে হয় 'পঞ্চ'র কাছে?

মহেশ তখন ভাবছিল, 'বাপলার' জন্য পঞ্চর কাছে অনুমতি নেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু ভালবাসার জন্যও কি অনুমতি নিতে হবে?

পারমানন্দ এবার শেষ কথা বলল।

—তুই রঘুর বন্ধু। ছেলেবেলার খেলার সাথী। ওকে তুই বুঝিয়ে বল, এই অবৈধ প্রাণের লোভ কিছুতেই যেন নেবে না।'

মহেশ বলল, 'আমি ওকে বুঝিয়ে বলব পারমানন্দ।' কিন্তু মহেশের মনের গভীরে একটি বাসনা গুনগুন করছিল, রঘু যেন ফিরিয়ে না আসে। যে ভালবাসা স্বর্গীয় সুষমায় ঐশ্বর্যান্বিত তার যেন পরাজয় না হয়।

তবু মহেশ ওকে বলেছিল, 'তুই মুলালীকে ছেড়ে দে রঘু।'

'ছেড়ে দেব?' রঘু বলল, 'তার চেয়ে তুই বরং আমার জলকেটা ছিঁড়ে দে মহেশ।'

মহেশের ভেতরকার 'জলমাফি'র সত্তাটা মুহূর্তের জন্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গাঁয়ের এতগুলি মুসলমান মুরুব্বীদের নৈতিক চরিত্রের পরিচালনার।

কঠিন কণ্ঠে মহেশ বলল 'গাঁয়ে বাস করতে গেলে সমাজের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে রঘু।'

ব্যথিত স্বরে রঘু বলল 'আমি লেখাপড়া শিখিনি মহেশ। পুঁথিতে কি লেখে জানি না, কিন্তু আমার মন বলে, মনই সমাজ, মনই ধর্ম, মনই কর্ম। মনকে শুদ্ধ রাখলে কোন পাপ ছুঁতে পারবে না, সেই বিশ্বাস নিয়ে আমার মহতেও আনন্দ।'

মহেশ বলল 'কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে কোন অন্যায় আমি হতে দেব না।'

হঠাৎ ছিলে ছিঁড়ে যাওয়া ধনুকের মত টান টান হয়ে মহেশের সামনে এসে দাঁড়াল রঘু। ওর মুখের পেশিগুলোর শক্ত হয়ে উঠল। ধারালো গলায় রঘু বলল, 'অন্যায় তুই কাকে বলিস মহেশ? আমার পিসিকে গাঁয়ের লোক জানওয়ার কথায় ডাইনী বলে পুড়িয়ে মেরেছিল, একবারও ভাবেনি যে মানুষ কখনও মানুষখেকি হতে পারে না, সেটা অন্যায় নয়? ছোট ছিপ্পার বউ-এর নামজল নিয়ে কলেরা হয়েছিল, গাঁয়ের লোক ওকে পথের ধারে ফেলে রেখে এসেছিল। পত্নী সাহেবের আক্রোশে থেকে দুলিন-বাদে যখন গাঁয়ে ফিরেছিল তখন সমাজ আর ওকে ফেরৎ নিতে চায়নি গাঁয়ের লোক ওকে 'বাড়' (পতিত) করেছিল, সেটা অন্যায় নয়? থাক মহেশ, তুই আজ জলমাফি, মহেশ মাষ্টার, তোর সঙ্গে তর্কবাদ করার ঝুরোস নেই আমার। তবে তোকে আমি কথা দিচ্ছি, গাঁ ছেড়ে আমি অন্য কোন মুলুকে চলে যাব।'

কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করছিল রঘুর জন্য। গাঁয়ের লোকরা জানের কাছ থেকে বিধান নিয়ে এসে তাদের থানে 'বইসি' (সভা) ডাকল। জান বলেছে এ অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। পাপীকে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তা নাহলে এর চেয়েও বড় অন্যায় শুরু হবে। ক্ষেত্র মৃত্যু, নিত্য মৃত্যু, মূর্ছিত, মন্বন্তর। গাঁয়ের সহজ সরল মানুষগুলো এই সব অন্যায়ের বিশ্বাসের আনন্দায় ভীত হয়, সন্ত্রস্ত হয়। ওরাও এক ধরনের ভয় দেয়, মৃত্যু, মৃত্যুই ওর একমাত্র শাস্তি। জলতার কোন চরিত্র নেই। মহেশ হয় জানে। এমন বিচারবুদ্ধি তখন রঘুর জলমাফিসুলভ নির্ভীকতার কাছে নত জানু।

মহেশ প্রতিবাদ করতে পারে না। পারমানন্দ বলল, 'আজ রাতেই রঘুর ঝুঁকেতে আগুন জ্বেলে দেওয়া হবে।'

মহেশ বলল 'আজই?'

পারমানন্দ বলল, 'আজই। বিষবাড়ের শেষ রাখতে নেই। না রইবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশরী (লাউ-এর খোল দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র)'

মহেশ বলল 'কে আগুন জ্বালাবে?'

একটা বিচিত্র ক্রুর হাসি ফুটে উঠল পারমানন্দর মুখে। 'লোক ঠিক করা আছে।'

মহেশ বলল 'না, আমি জলমাফি। ও কাজটা আমিই করব।'

পারমানন্দ অবাক হল। 'তুই পারবি? রঘু না তোর বন্ধু, ছেলেবেলার সাথী?'

মহেশ বলল 'দলের কাছে নিজের ছেলেকেও বলি দিতে হয় পারমানন্দ।'

'সাবাস! এই তো জলমাফির মত কথা। এই জলমাটা নিয়ে যা। রাত আঁধারীতে কেউ টের পাবে না। কাল সকালবেলায় যেন সোড়া লাশ দেখতে পাই।'

মশাল হাতে মহেশকে দেখে অবাক হল না রঘু। ওর মুখে এতটুকুও উদ্বেগ নেই। ও জানে না যে মহেশের হাতে ওর মৃত্যুর পরোয়ানা।

মহেশের মন সুদূরে আকুল। কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে রঘুকে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে?

রঘু শান্ত কণ্ঠে বলল 'আসলা, তুই এত রাতে?'

মহেশ ঢোঁক গিলে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে আর কে আছে?'

রঘু বলল 'আজ মুলালী এসেছে আমার ঘরে।'

মহেশ বলল 'রঘু, তুই মুলালীকে নিয়ে এখুনি গাঁ ছেড়ে চলে যা।'

রঘু বলল 'আর একটু সবুর কর মহেশ, ভোরের আলোয় আমার গাঁকে আমি দেখবারের মত দেখে যাই।'

উন্মাদের মত মহেশ বলল, 'না, না রঘু, এ গাঁয়ে আর ভোর দেখা তোর কপালে নেই। ওরে রঘু, কেন বুঝতে পারছিস না তুই এ গাঁয়ের ভাজাপুতুর। রঘু, ভাই আমার, আমাকে বিশ্বাস কেলিস না। এ গাঁ ছেড়ে তুই এখুনি চলে যা।'

আর কথা বাড়াল না রঘু। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে মুলালীকে জাগিয়ে নামাজের কাটের তোরঙ্গটা নিয়ে বেরিয়ে এল। কান্না চেপে মহেশকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। তারপর দ্রুত পায়ে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই মশালটা হাতে নিয়ে রঘুর কুঁড়ের ভেতরে ঢুকল মহেশ। তারপর নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে চালার কোণে কোণে আগুন ধরিয়ে দিল। তখনো খড় পাড় পাড় করে জ্বলতে লাগল। ধোঁয়ার দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইল মহেশের। মৃত্যুর তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাল মহেশ, শেষ প্রার্থনা জীবন দেবতার কাছে, বন্ধ হোক ধর্মের নামে এই অন্যায়, ছিন্ন হোক মানুষের তৈরি কুসংস্কারের সকল বন্ধন, সমাজের অপশাসন দূর হোক।

জোছনা। প্রপাত। জোছনা চাঁদো যোসা। জোছনা মায়াবেহুক। জোছনা। জোছনা।

লাঙলটাতে কালি পড়ে গিয়েছিল কখন ওরা খেয়াল করেনি। ঘরের ভিতো ঘনঘোর অন্ধকার। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। ঝড়ের চালা থেকে বৃষ্টির জল টুপটাপ করে পড়ছিল মাটিতে। একা আকাশ পরিষ্কার। দূরে পাহাড়তলীতে জলদের শঙ্খধ্বনি শোনাক ঝলছিল।

সুপ্রতিম সেমিক পা: উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বিদ্রোহী কোরাং ডাক আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন ধর্মের স্বাধীনতায় স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে এবং একই দিনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে জলতাগাও-এর মহেশ টুডু কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করবার অভিযানে।

কোথাও একটা সামুদ্রের ক্ষীণ যোগসূত্র থাকতেও পারে, অথবা হয়ত কিছুই নেই, কারণ ভারতবর্ষ থেকে ফিরেওলান অনেকদূর। সান্তাল থেকে জলতাগাও।

রমণী জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ

বন্দনা রায়

প্রেমের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ কাহিনী দেশ-বিদেশে চিরন্তন। বার্নার্ড শ-এর 'Getting Married' নাটকের নায়িকা যেমন সমাজের অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিল 'আমি যখন উভয়কেই সমান ভালবাসি, কেন তবে দুজনকেই বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়? তেমনি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অধুনাতন কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে রমণী কণ্ঠ এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। সাহিত্যক্ষেত্রে তাই এ বিষয়টি অভিনবত্বের দাবী রাখে না। কিন্তু এই দ্বিতীয় পুরুষটিকে নিয়ে বাঙালী সমাজ ও লেখকের শাসন ও প্রশ্রয়ের ছবিটি উপন্যাসের মাধ্যমে ভিন্নতর রূপে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজের কঠোর শাসনের যুগে বিবাহিত জীবনে প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব হত দুইভাবে: এক—বাল্যবিবাহের যুগে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, অসফল যৌবন সম্বলিত বিধবা নারীর সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং সাধারণ ভদ্র নারী পুরুষের দর্শনলাভেরই সীমানার বাইরে থাকত, প্রেমের ডালি নিবেদন করা দূরের কথা। অতএব এই বিধবা নারীর কিছুকাল প্রণয় পরিহাস করে পুনর্বিবাহ সমাজের অননুমোদিত থাকায় কাশীবাস অথবা দরিদ্র জনসাধারণের সেবা প্রভৃতিতে চিত্তোৎসর্গ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। দুই—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বন্ধু ভিন্ন বাঙালী অন্তঃপুরে বাহ্যবিষয় সংঘটিত হওয়ার অন্য কোন উপায় পুরুষের ছিল না, তাই স্বামী ভিন্ন কোন অপরিচিত পুরুষের প্রতি ক্ষণিক হৃদয়-দৌর্বল্য প্রদর্শনের কাহিনী অজস্রই 'বন্ধু'র স্থান বাংলা উপন্যাসের অধিক পরিসর অধিকার করেছে। ক্রমশ সমাজের রক্তচক্ষুর শাসন শিথিল হয়ে এসেছে ও লেখকের লেখনী অবৈধ প্রেমের বিরুদ্ধে ঘাতকের ছবি অঙ্কনে বিরত হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারও অন্তঃপুরের সীমানা থেকে নারীর বহির্প্রাঙ্গণে ক্রমশ প্রকাশ, বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের সহজ প্রচলন, পুরুষের মনোভঙ্গির উদারতা নারী-পুরুষের সহজ মেলামেশা প্রভৃতি কারণে রমণী জীবনে এই দ্বিতীয় পুরুষের স্বীকৃতি অনেক সহজ হলেও একটি বিষয় সহজেই প্রকটিত যে, সমাজ শাসনের শিকড় অজ্ঞও আমাদের মনে দৃঢ় প্রোথিত এবং সংস্কারের ধারা রমণীর ধমনীতে প্রবাহিত। তাই যতই আধুনিক মনোভঙ্গি থাকুক না কেন, দ্বিতীয় পুরুষটিকে যেন জীবনের স্বরূপে টেনে নেবিয়ে আহ্বান করতে আজও মন ইতস্তত করে, যদিওবা তাকে আহ্বান করা যায়, অন্তরের মনে কোথায় যেন পাপবোধ আজও আমাদের পীড়া দেয়। তবে সাধারণভাবেই প্রেম আজ আর উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য নয়; অর্থনীতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির স্তরেও আজ উপন্যাসের অবয়ব গঠিত হয়। তাই বিধবা অথবা বিবাহিতা নারীর পরানুরাগিণীর বিষয় আজ উপন্যাসের বিশেষ সমস্যা নয়। প্রসঙ্গটি হয়ত উপন্যাসে অনেক সময়েই সহজে প্রবেশ করে আবার অনায়াসে বিদায় নেয়, লেখকও সেই নারীর বিরুদ্ধে ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না:-

১২৩

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে এক নারীর জীবনে দুটি পুরুষের আবির্ভাবের সম্ভাব্য চিত্রটি অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাবে লক্ষ্য করা যায় বঙ্গেশ্বর পত্রের 'মাধবী কঙ্কণ' উপন্যাসে 'আজীবন প্রেম বর্ষিয়সে পতির প্রেমরক্ষা নিবন্ধন' সেকালে নারীর একমাত্র ধর্মরূপে বিবেচিত হত, প্রশ্নটি সেকালে বর্তমান তাই স্ত্রীরূপের মধ্যে নিরুপায় দাম্পত্য জীবন যাপন করে প্রতিপক্ষ যে নরেন্দ্রর ফুল-তোলে অবরুদ্ধ, তারই কাছে তেমের অন্তরঙ্গতম মিনতি—'নরেন্দ্র, মনে ক্লেশবোধ করিও না আমি এই কয় বৎসর এ কণ্ঠটি পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি। উহা হারা করিতে আমার যত কষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি জান না কিন্তু ইহা উদ্ধোচন করা উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নই।' সামাজিক দৃষ্টিকোণে নায়িকার হৃদয় বক্রগতি হলেও সেখানে যে নরেন্দ্রর স্থায়ও অম্লান, তৎকালীন কঠোর শাসনের যুগে এই সহানুভূতিশীল চিত্রাঙ্কণের জন্য গ্রন্থকার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

বাংলা উপন্যাস ধারার বঙ্গেশ্বরের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের আসন,সমাজে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসাবে যিনি সদা সচেতন ছিলেন। ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে তিনি সমাজে নারী ও পুরুষের অপরাধ ও শাস্তিভেদ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "পাপ দুই সমান। এক পুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, এক স্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহা

বাস্তবিধি মতে পত্নী, ঔপন্যাসিক এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞানে সমাজের সকল সুখ আহরণ পক্ষে বিমুখ হয়; সে তখনের মধ্যে অবশ্য বলিয়া সত্য হয়, কুলত্যাগের অধিক সম্ভাবনা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রী জাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক। কিন্তু পুরুষই সমাজ, ঔপন্যাসিক বেশ বলেন। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যরক্ষা আমাদের পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল।" তিনিও সমাজের এই বিধান অনুসারী বিহারিণী নারীকে পুনর্বিবাহ দিয়ে শাস্তি প্রদান করেছেন। স্বৈরিণীকে এই কারণে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়ে শুচি হয়ে ফিরতে হয় এবং প্রেমিনীর অবৈধিক পরিণতি লাভ করে ও কুলত্যাগিনীকে বিধানে আত্মহত্যার প্রবৃত্ত হতে হয়। তাঁর উপন্যাসে একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি নারীর ভূমিকা অনেক সময়েই মূর্তায়িত হয়েছে—যেমন 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি, কিন্তু একটি নারীর জীবনে দুটি পুরুষের অধিকার তাঁর গ্রন্থে সর্বত্রই অনুপস্থিত। এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও সেখানে সঙ্কুচিত। প্রফুল্ল কৃষ্ণকে সর্বস্ব অর্পণ করতে অপারগ হয়ে ব্রজেশ্বরকে বলে—"আমি অন্য দেবতার অর্চনা লিখিতেছিলাম, লিখিতে শক্তি নাই, তুমিই আমার দেবতা।" অসমসাহসিকা কৃষ্ণকান্তের অন্তরের মোহন সম্রাট রোহিণীর প্রেমের বাসনা নির্মলকৃষ্ণকান্তকে নিবেদন করলে বিধবা নারীর একনিষ্ঠ স্বামীপরায়ণতার কথা উল্লেখ করে সে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের কয় নাটক, উপন্যাস ও গল্পে একটি নারীকে কেন্দ্র করে— দুটি পুরুষের প্রেম কাহিনী সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। শ্যামের কামনা চরিতার্থে মোহন কেমন করে বহন করে উত্তীয়ের আত্মবিসর্জন, ললিতার জীবনের দুটি প্রবাহ কেমন-সুবিমলের আবির্ভাব-সংঘর্ষ-মৃত্যু। 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে প্রেমের এই বিচিত্র গতি প্রদর্শিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের পারস্পরের সহচর। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম যুগ থেকে কিছুটা অগ্রসরিত সমাজে উপন্যাসকে সমাজ প্রেমের প্রধান-চিত্র করার দৃষ্টি অনুভব করে অনুভবের উদ্ভবের কথা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। এই মনের ভাবনা-প্রতিঘাতের কথা, সূক্ষ্ম অনুভবের কথা সাহিত্যে বর্ণনা করার প্রয়োজন অনুভব করেই তিনি প্রেম কবি প্রকৃতি করেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁর সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী পুরুষালীর সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে, নিয়মবদ্ধ জীবনের ক্লান্তি ও দীনতাকতা থেকে বাহির বিশ্বে এসে দাঁড়িয়ে আপন স্বরূপকে অনুভব করতে চেয়েছে, 'প্রেমের বীর্যে অগ্নিনী' হতে চেয়েছে। সেইজন্যই হয়ত তার সমস্ত সত্তাকে বিকশিত করার জন্যে বারে বারে প্রেমের ক্ষেত্রে 'বন্ধু' হিসাবে অন্য কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, সতীত্বের আদর্শ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কঠোর না হলেও প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁর উপন্যাসেও একনিষ্ঠা নারীরাই জয় ঘোষিত হয়েছে। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে অন্যায়ের পরিচয়ে কমলার জীবনে দুটি পুরুষের আবির্ভাব ঘটার পর সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে ললিতাকে প্রতি পূজার্থ কি মন করে সে সতীত্বের মহিমায় মহীয়সী হয়েছে। বিমল-সন্দীপের প্রতি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সমভাবে মুগ্ধ হলেও অন্তরে তার সতীত্বের সংস্কারে স্বামীর উদ্দেশ্যেই প্রণাম অঞ্জলি সঞ্চিত ছিল। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিধবা নলীবালা পুনর্বিবাহের প্রয়োজনে দুই স্বামীর স্মৃতিটুকু মনে নিয়ে জীবন বিসর্জন দেয়। ঐ উপন্যাসেরই বিদ্রোহাগ্নিসত্তবা দামিনী শেষ পর্যন্ত জীবিলাসের প্রতো উদার, শান্ত পুরুষকে বিবাহ করে জন্মান্তরে তার অনুরূপ স্বামী লাভের প্রার্থনা জানায়। নারীর এই সতীত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নায়িকা অচিরার বিশ্লেষণ স্মরণযোগ্য :—

'ভালবাসার আদর্শ আমাদের পক্ষের ভিন্নিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। —মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের। যদি তার সব হারায়, যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়; তবু থাকি থাকে তার সেই ভালবাসার আদর্শ, যা অন্তরাত্মমনসেযোচর অর্থাৎ ইন্দ্রসংবেদনার।'

'চোখের বালি' এবং 'শেষের কবিতা'র নারী অবশ্য প্রেমিকের দূরে সরিয়ে রেখেছে দুটি ভিন্ন অবস্থায়। বিনোদিনী বিধবা বিবাহের ফলে বিহারীর সমাজের চোখে নিন্দিত হবার আশঙ্কায় ও লাবণ্য প্রত্যহিক জীবনের জটিলতা প্রেমের মাধুর্য হারানোর ভাবনায় দুজনের উভয়ে অগ্রসরকে প্রতিহত করেছে।

॥ ৪ ॥

নারীকে প্রেমের ক্ষেত্রে দুঃসাহসিনী করে তুলতে শরৎচন্দ্রের সাহসী লেখনীকে রবীন্দ্রনাথ সানুনয় জানিয়ে লিখেছিলেন "সাধারণ মেয়েকে ছিটিয়ে দিও আমার হয়ে।" তাঁর উপন্যাসের নারী সাধারণভাবে পুরুষালীকে ভালবাসে, ভালবাসে একনিষ্ঠ প্রেমকে। সে বিবাহিতা নারীই হোক, অথবা পতিতা, সমাজ নিন্দিতা নারীই হোক। তাই বিধবা মেসোগ্রস্ত, চরিত্রহীন স্বামীর জন্যই অন্নদাশিনীর আত্মত্যাগ, হৈমন্তী অনন্যের জীবনে বালবিবাহের স্মৃতি আবলিন থাকার অস্বীকারী, মন্দাসক্ত জমিদার জীবনানন্দ চৌধুরী তার জীবনের একমাত্র পুরুষের স্থান অধিকার করে থাকেন। পিতার প্রতিজ্ঞতি নেশে-বিলাসের ঘরে বিজয়ার মনস্থির করার সহায় হয়, একরাত্রের মালা বিনিময়ে ললিতা দেখরের পরিণীতা বধূরূপে নিজেকে জ্ঞান করে। দৈহিক পবিত্রতা বিচ্যুতি নারীর সতীত্ব হরণ করেনা বলেই শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস। তাই দৈশবের খেলাঘরে বৈচিত্র্যালা খানই রাজলক্ষ্মীর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকে, চন্দ্রমুখী দেবদাসকে বলে 'এ জীবনে ভালবাসার বাকসা অনেক করেছি, কিন্তু একটিবার মাত্র ভালবেসেছি।' এই ভালবাসার একনিষ্ঠতাই শরৎচন্দ্রের মতে নারীর সতীত্ব। অতএব প্রেমহীন বিবাহিত জীবনকে ঘৃণ্য মনে করে রোহিণীর প্রতি তার একান্ত ভালবাসাকেই সতীত্ব বলে মনে করে। অবশ্য, সৌদামিনী প্রভৃতি নারী অন্য পুরুষের অঙ্কশায়ীনী হবার উত্তেজনায় গৃহত্যাগ করলেও স্বামীর অশ্রুর জন্মান্তরে ধন্য হয়, শারীরিক অশুচিতার কারণে তারা পরিত্যক্ত হয় না। শরৎ সাহিত্যের নারী হৃদয়ে সাধারণভাবে ভারতীয় নারীর পাতিব্রত্য, মাতৃত্ব, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণগুলি মূঢ় প্রেরিত, কিন্তু প্রয়োজনবোধে গৃহের বিরুদ্ধে আপন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিদ্রোহিণী হতে সে দ্বিধাগ্রস্ত। গৃহের অবরোধ থেকে মুক্তি পাবার প্রয়োজনে অন্য পুরুষের প্রসারিত হস্ত ধরতে তার প্রয়োজন হয়নি, আপন চরিত্রের বলিষ্ঠতায় সে গৃহত্যাগ করেছে আবার ফিরে প্রত্যাবর্তন করেছেও নিজেরই চিত্তবৃত্তির তাড়নায়। এই বিচারিণী নারীর প্রতি সহানুভূতিশীলতা ও উদারতায় শরৎ সাহিত্যের 'স্বামী' উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে রয়েছে।

॥ ৫ ॥

সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব, নরনারীর মেলামেশার স্বাধীনতা প্রভৃতির ফলে তালে উপন্যাসে দু ধরনের কাহিনীর উপস্থিতি দেখা যায়। এক—যেমন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের রচনায় সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কার রক্ষার প্রচেষ্টা ও স্বামীকেই একমাত্র প্রেমার্ঘ প্রদানের দাবী রূপে চিহ্নিত করা, অপরদিকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সীতা দেবী-শান্তা দেবী প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের বিধবা বা বিবাহিতা নারীর প্রেমকে প্রশ্রয় দান। এছাড়া রোমান্স ও সংস্কারের সহজ সমন্বয়ের

এই মধুর চিত্র লক্ষ্য করা যায় নারী উপন্যাসিকদের রচনায়, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসে যার পরিচয় প্রকাশ। অবশ্য মূলত পুরুষ এ ধরনের উপন্যাসে নারীর হৃদয়ের আসন অলক্ষ্যে অধিকার করে থাকে। জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের সান্নিধ্যে তার সেই ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে থাকে এবং পরিশেষে তাকেই বরমাল্য দান করে সেই নারী নিশ্চিন্ত হয়। সীতাদেবীর 'রজনীগন্ধা' উপন্যাসে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর নায়িকা ললিকা বাল্য সুহৃৎ চিত্রদের প্রেম নিবেদনকেই জীবনে গ্রহণ করেছে। পঞ্চাশের দশকে আশাপূর্ণা দেবীর 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল বোধ করি এই 'ধীমাটি প্রেম ও সংস্কারের বিরোধ সৃষ্টি করে না বলেই।

॥ ৬ ॥

কল্লোলের লেখকেরা 'অজ্ঞানের চেয়ে বিশুদ্ধ' অন্য কোন প্রেমকে মানতে চান নি। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে পূর্বতন সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহই তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল। একনিষ্ঠ প্রেম বা সতীত্বের সংস্কারকে তাঁরা উপহাস করেছেন এইভাবে :—

"পরমা সাধ্বী হিন্দু স্ত্রী, পরপুরুষ দেখলেও তার ভিট হয়, স্বামীর এঁটো পাতে ভাত খায়, স্বামীর পদধূলি কণ্ঠে ধারণ করে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে।...বাংলা কবিতার ওপরেকে নিয়ে খুব মহরম মহরম করা হয়। এরা সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে। এইভাবে সতীত্বের সংস্কার পালনের অন্তরালে তাঁরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অবদমনের বিকৃতিকে আবিষ্কার করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর বহু বিতর্কিত একদা নিষিদ্ধ রূপে চিহ্নিত উপন্যাস 'রাত ভরে বৃষ্টি' উপন্যাসের নায়িকা সুধী গার্হস্থ্যজীবনের মাঝখানে অন্য এক পুরুষের উপস্থিতিকে সমাজ কেন স্বাভাবিক রূপে মেনে নেবে না, এজন্য বিস্মিত হয়। —"বিয়ের পরে আমরা তো বাবাকে ভুলে যাই না, মাকে ভুলে যাই না, যদি অন্য কোন পুরুষ আমাকে এমন কিছু দিতে পারে, যা স্বামী পরেলা যা দিতে চায়না, তাহলে কেন আকাশ ভেঙে পড়বে?"

কিন্তু কল্লোলের লেখকদের এই সংস্কারকে অগ্রাহ্য করা ও নরনারীর প্রেমের শারীরিক দিনযাপনের বর্ণনা দান প্রভৃতির মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য, অতিরিক্ত ভাব বিলাস, রবীন্দ্র বিরোধিতার সচেষ্ট প্রয়াস প্রভৃতি লক্ষণ যেভাবে পরিদৃষ্ট হয়, শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় তার মধ্যে খাঁটত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে নরনারীর দাম্পত্যজীবন প্রায়ই সুখের নয়। কিন্তু কেবল সংস্কার ভাঙার জন্যেই নয়, জীবনের জটিলতা, মানবমনের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত, জৈবিক প্রবৃত্তির গূঢ় রহস্য, অর্থনৈতিক কারণ প্রভৃতি যে নারী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্কেও প্রতিফলিত হয় শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি সেই দিকেই নির্দেশ। তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'জীবনের জটিলতা' প্রভৃতি উপন্যাসে বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণের ছবি আছে, কিন্তু সে প্রণয়ের ছবিটি তিনি অত্যন্ত সংবেদনভাবে অঙ্কন করেছেন। যেমন—"ইহারা, এই দুইজন, পরস্পরের ভালবাসাকে স্বীকার করিল। প্রেম এমনিভাবে স্বীকৃত হয়। একদিন—অকস্মাৎ সংক্ষেপে।" (জীবনের জটিলতা) কিন্তু এই তথাকথিত অসামাজিক প্রেম তাঁর উপন্যাসে অধিকাংশ সময়েই কোন পরিণতি লাভ করে না, কোন নৈতিক কারণে নয়, মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার কারণে। লেখক মনে করেন ভালবাসার একটা সময় আছে, উত্তাপ ফুরিয়ে গেলে ভালবাসা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই পত্নীর আহ্বানে পরস্ত্রী কুসুম আর প্রেমের উত্তাপ অনুভব করেনা, পরপুরুষ হেরম্বের স্ত্রী সুরিয়ার জন্যেও আত্মহত্যা করেনি জেনে সে অনুভব করে 'এতক্ষণে হেরম্ব তাকে আত্মসাৎ করে গ্রাস হতাশার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছে। জীবনে তার কিছুই রইল না।' কেন না উমার আত্মহত্যা-দিয়ে তার প্রতি হেরম্বের ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

॥ ৭ ॥

কল্লোলের অব্যবহিত পরবর্তীযুগে সুবোধ ঘোষের 'তমসা বলেছি', 'সন্তত মিলন', 'জলপ্রকম' প্রভৃতি উপন্যাসে নারীর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব হলেও প্রথমটি প্রথম জাগত উষার, শান্ত, উদাসীন। ব্রতধারিণীর উদ্দেশ্যেই সর্বদা নিবেদিত হয়। অত্যন্ত কাব্যময় ভাষায় প্রেমের শুদ্ধতম বর্ণনা করে সুবোধ ঘোষ বাংলা উপন্যাসে একটি স্বতন্ত্র আসন অধিকার করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর চেতন-প্রবাহ পদ্ধতিমূলক উপন্যাসে প্রেমের ত্রিকোণ ছবি অঙ্কন করেছেন। 'কাচের দরজা' উপন্যাসে প্রবাল-সোম তার সীমার মধ্যে যে প্রেম, সে সম্বন্ধে লেখকের ধারণা 'মনকে কখনও জুতোসে ভাগ করা যায় না। ভাগ করতে গেলেই দেখা যাবে—সবটাই একদিকে চলে এসেছে। আর একজনের জন্য শুধুই ফাঁকি, সবটাই ভান।' এই লেখকও পুরাতন মূল্যবোধ, প্রেমের একনিষ্ঠতার বিশ্বাসী। তাই আদর্শ নারী রূপে দুর্গা প্রতিমা বরণের সময় লালপাড় শাড়ী পরিহিতা গ্রামের কাকিমার ছবিটি বারে বারে নায়কের চোখে ভেসে ওঠে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ লেখক নরনারীর অবাধ সম্পর্কের ছবি এঁকেছেন, নারীর শারীরিক শুচিতা বিষয়ে তাঁরা রক্ষণশীল মন। প্রেমের একনিষ্ঠতা তাঁদের উপন্যাসের বিষয় নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের শেষভাগের কলকাতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে

চরিত্রের উপন্যাসে পূর্বতন মূল্যবোধের বিলীয়মানতা খুবই স্বাভাবিক। তবে জগতের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ঘটলেও অন্তরে বিবাহ বন্ধন যে একেবারে শিথিল হয় না, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ঘাসফুল', সন্দিনী উপন্যাসে তারই পরিচয় মেলে।

নারীর জীবনে দুটি পুরুষের আবির্ভাব ক্রমশ সহজতর হয়ে এসেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমি সে ও সখা' উপন্যাসে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে নায়িকা নিলয়ঙ্কোচে মেলামেশা করে, শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দিন রাত' উপন্যাসে মনোরমা ও শীতাংশু বিবাহিত জীবনে বন্ধু মানস লাহিড়ী শীতাংশু হৃদয়ে বিশ্বাসিনের ছলা ফুল লাভ করলেও সতীত্বের সম্ভবে নয়, বিবেকের তাড়নায় নয়, ভালোবাসার স্বচ্ছ নদীটি হৃদয়ে অনুভব করে প্রতি সহজেই তারা 'স্বচ্ছ মেয়াদী ব্যাঙ্কির মতো অতীতের পৃষ্ঠাকে মুছে ফেলে পরস্পরকে গ্রহণ করে। বিমল করের 'অশেষ' উপন্যাসে নদী ও মিলনের দাম্পত্য জীবনে হঠাৎ একটু সুখের মতো অন্যের উপস্থিতি প্রত্যন্ত সহজভাবে বর্ণিত হয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেপথ্যে-আলোতে ছায়ারা শান্তনুকে ভালোবেসে, কিন্তু এই জীবনে নবাগত সুখের বেলাভূমিতে 'ওর থেকে কোন ভাবে খারাপ নয়' বলে যখন তার মনে হয়, তখন জীবনসঙ্গিনীরূপে তাকে নির্বাচন করতে সে ইতস্তত করেনি।

কিন্তু দাম্পত্যিকজীবনে বিধবা বিলাস ও বিবাহ বন্ধন বিচ্যুতা নারীর জীবনের সমস্যা উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে। আইনের অনুমোদন যে সমাজের অনুমোদন সম্পূর্ণরূপে নয় একথা যেমন ঐ ধরনের নারী মর্মে মর্মে অনুভব করছে, তেমনি হৃদয়ের অনুশাসনও যে তাদের পক্ষে বিশেষ বাধা এ সমস্যাও থেকেই জাগে। সন্তান থাকলে স্বামী বিহীনা নারীর মনে পুনর্বিবাহে প্রবল দ্বন্দ্ব জাগে। তাছাড়া সকলেই যেন এ ধরনের অবস্থার মহিলাকে অনায়াস লভ্য মনে করে। খুব কম পুরুষই নিজের ঐ ধরনের অতীত না থাকলে পুনর্বিবাহিতা কোন নারীকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। শংকরের 'একদিন হঠাৎ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নাম সাহেব' প্রভৃতি উপন্যাসে এই সমস্যা প্রকাশিত। 'একদিন হঠাৎ'-এ চারুশীলা স্বামী সম্পর্ক বিচ্ছিন্না। সে নিজেকে বিধবা, কুমারী, সধবা কিছুই ভাবতে পারে না, একক জীবন যাপন করে সে পুরুষের মতো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বাসনা ও কৃষ্ণকলি বিধবা জীবনকে তারা তাদের বাসনের মতো ভেঙে গেলে নতুন করে গড়ে তুলতে দ্বিধা বোধ করে। তবু তাদের 'মনে থাকতে প্রত্যেক মেয়েকে বিধবা হবার ট্রেনিং, ডাইভোর্সী হবার ট্রেনিং এবং একলা বেঁচে থাকবার ট্রেনিং কেউ অপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয়।' শেষে অবশ্য স্বামীর নতুন ছলা সোনী সাবাস করে মন কাঁদেবাস কৃষ্ণকলির একমাত্র চিন্তা ছিল, তার মধ্যে বিধবা বন্ধু ধাসনার ছলা সমবেদনা আবিষ্কার করে কৃষ্ণকলি মত পরিবর্তন করে।

'শ্যামসাহেব' উপন্যাসে চন্দ্রা স্বামীর কাছ থেকে চলে এসে প্রতি পদে অসহায়তা অনুভব করে। একদিকে কন্যা বিকি সর্বদাই বাবার অভাব বোধ করে তাকে বিব্রত করে। অন্যদিকে সে বুঝতে পারে 'অনঅ্যাটাচড মেয়েদের ওপর পুরুষদের সাঙ্ঘাতিক লোভ।' বিকিকে মানুষ করতে গেলে নিজের জীবন নষ্ট করতে হবে, এবং নাম 'মেয়েদের ব্যাপারটা' ফেলে মেয়েকে নিয়ে শান্তনু যখন তার কাছে আসে তখন তার মন নিশ্চিন্ত হয়।

অসলে সমাজের শাসন শিথিল হলেও, মানুষের মন উদার হলেও সংস্কার আজও অনেক সম্পূর্ণ তুলিনি। তাছাড়া জীবনের জটিলতা থেকে কোন যুগেই মানুষ মুক্ত নয়। সব শাসন দূর হলেও মানুষের মন এত দুর্ভেদ্য, তার রহস্য এত গভীর, সুখবোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এত অস্পষ্ট, যে দ্বিতীয় পুরুষ নারী জীবনে সামাজিক ও নৈতিক বাধা না হয়েও আজও একেবারে সহজ নয়। নারীর মনের আয়নায় একটি ছায়া একবার প্রতিফলিত হলে তাকে মুছে ফেলা আজও কঠিন, অন্তত বাংলা উপন্যাসে সমস্যাটি সেরকমই ধরা পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ

শ্রীযুক্তা ম্যাক্সমুলার রচিত

আমার ভারতীয় বন্ধুগণ

অনুবাদ ও সম্পাদনা—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

এই পুস্তকে আমি আমার যে সব ভারতীয় বন্ধুর দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি তা যদি মহিমান্বিত আর্য্য ভাষা গোত্রীর দুই শিক্ষিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অতি সীমিত ক্ষেত্রেও অপরিচয়ের বাধা অপসৃত করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে তবে আমার রচনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।—ম্যাক্সমুলার। ২২·০০

আনন্দধারা

৭৯।১ বি মহাত্মাগান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মেরুবিন্যাস

অভিজিৎ সেন

পশ্চিমমুখী বাড়িটার সামনে উঠান। উঠান ছাড়িয়ে বাখারির বেড়া। বেড়ার এপাশে বিকাশ দাঁড়িয়ে থাকে। উঠানে মাঠপড়া এবং গায়ে চাদর জড়ানো সাত আট বছরের একটি শিশু একটা টিনের কৌটো লাঠি দিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যমনস্ক এবং চেহারায় শীতের কর্কশ ছাপমারা একটি শিশু। হাতের লাঠি দিয়ে টিনের কৌটো গড়ানোর মধ্যে তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নেই। যেন একটা অনিচ্ছাকৃত অভ্যাসের মত কাজটা সে করে যাচ্ছে। তার পোছনে একটা শিউলি ফুলের গাছ।

বিকাশ দাঁড়িয়ে থাকে। শিশু এত অন্যমনস্ক যে তাকে লক্ষ্যই করে না। সে একটু কাশে। শিশু চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার চোখে অপরিচয়ের ব্যবধান ও ঈষৎ বিস্ময়। তার রুক্ষ চুল এবং খড়ি ওঠা গালে বিষণ্ণ বিহ্বলতা। শামান্য একটা হাওয়ার দমকে কয়েকটা শুকনো শিউলি পাতা ঝরে পড়ে তার চারপাশে, গায়ের উপরে। বিকাশের বুকের মধ্যে প্রথমে আবছা, পরে প্রবল দাপটে পরস্পর ধুঁয়ার হিম শীতল গোলার বিস্ফোরণ হয়। জীবনে এই প্রথম এবং কি ভয়ংকর একা সে অপত্যস্নেহের অস্তিত্ব অনুভব করে নিজের ভিতরে।

মৃত্যু যেন কোন নিয়মেরই ধার ধারে না। সে কারণেই ভুলটা হয়েছিল বিকাশের। ভুল হয়েছিল কলকাতা থাকতেই। ঐ গন্ধা লেখা ছাপানো পোস্টকার্ডখানা এক নজর দেখেই সে মাকে ডেকে বলতে গিয়েছিল। 'মা, জ্যাঠামশাই'—এবং তখনো তার চোখ ছিল চিঠিখানার উপর। আর তাতেই মরণাহত ধ্যেচট খায়। দ্বিতীয়বারে মাকে সে তীব্র আর্তনাদে ডাকে এবং বিহ্বলের মত বলে, জ্যাঠামশাই নয়, মা, শকেরদা—।'

জ্যাঠামশাইয়ের মারা যাওয়াটা ছিল স্বাভাবিক নিয়মের। কিন্তু শকেরের নয়। শকের তার জ্যাঠতুতো ভাই, বয়সে বছর তিনেকের বড়। কাজেই এই বিস্ময়, আচমকা সবকিছু স্তব্ধ করে দেওয়ার মত আঘাত।

ঐ গন্ধা লেখা চিঠিতে আর তো কিছুই থাকে না। আর এই বিশেষ চিঠিটায় এক হতভাগ্য পিতার অসহায়ত্ব এবং কিছু অভিমান হয়ত খুঁজলে পাওয়া যাবে। একই পরিবারের দুটি শাখা আজ চল্লিশ বছর ধরে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বছরে দু একখানা চিঠিতে এসে ঠেকেছে। জ্যাঠামশাই-এর অভিমান সেই কারণে। এ পক্ষের বাবা মারা গেছেন বছর দশেক আগে। মা যদিও মাঝেমধ্যে অনুযোগ করেন, তবুও বিকাশের সবদিক সামলে ওঠা আর হয়ে ওঠে না। বছর খানেক আগে শকের তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল চিকিৎসার কারণে। সেই শেষ দেখা।

এই চিঠি পাওয়ার পর এই ক'দিন সমস্ত পরিস্থিতিটা সে চিন্তা করেছে, মায়ের সঙ্গে আলোচনাও করেছে। শকেরের মৃত্যুতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা না করে উপায় নেই। শকেরের মৃত্যু একটা গভীর পারিবারিক সমস্যা। চল্লিশ বছরের ব্যবধান এই সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না, তার দুশ্চিন্তা ছিল এইরকম গতানুগতিক। কিন্তু এখন এই বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো যে, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার চিন্তা ভাবনা ছিল বড়ই সরল। সে এখনি প্রথম বুঝতে পারে যে পুরো ঘটনাটা তার ব্যবতীয় বীভৎসতা ও

জটিলতা নিয়ে এখন থেকেই তার সামনে ঝুলতে থাকবে—কখনো আচমকা, কখনো ধীরে ধীরে।

বেড়াবে পারে ছোট ফটকের শাঙ্কার খবরা। বিকাশ নিতুর মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে উপরের ছ্যাচটা খোলে। নিতু সেজাসুজি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাকে লক্ষ্য করে। তার মুখের চেহারা বদলায়। কিন্তু এই অবস্থার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তার চেহারা আমি ভুলবান।

ভিতরে-এসে খবরা আবার বন্ধ করে বিকাশ। ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগটা হাতে নামিয়ে সে নিতুর দিকে এগোতে নিতু কয়েক পা পিছিয়ে যায়। বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে, নিতুও।

বিকাশ একটু হাসে। বলে, আমি অনু, মানে অনুপ, কলকাতা থেকে আসছি।

নিতু তার আলাপে সাড়া দেয় না।

বিকাশ আবার এগোয়।

নিতু এবার ভুরু কুঁচকে তাকে লক্ষ্য করে, পিছিয়ে যায় না।

বিকাশ এগিয়ে এসে টুঁটি গেড়ে তার সামনে বসে। বলে, কি নাম তোমার?

নিতু চোখ নামিয়ে হাতের লাঠিটার দিকে মনোনিবেশ করে।

বিকাশ বলে, নাম বলবে না?

নিতু মুখ না তুলেই বলে, নমু।

বাড়িটা শহরের শেষ প্রান্তে। তারপরই নদী। পশ্চিমমুখী বাড়ি। বিকাশ জানে বাড়ির তৈরি তিন সারি ঘর তিন দিকে। পুবদিকে পুরনো ইটের পাঁচিল আছে। পাঁচিলের পরে পাঁচ ছ'বিঘার বাগান। দক্ষিণে খানিকটা জমি ছেড়ে নদীর বাঁধ। শহর ছেড়ে গেছে উত্তর দিকে। সেদিক থেকে এক ঢালাও শীতের হাওয়া উঠোনের শিউলি গাছ এবং একটা পুরানো বেলগাছের অনেক পাতা ঝরিয়ে নদীর দিকে ছুটে গেল।

রিক্সাওয়ালা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, হ্যাঁ, চিনি।

—কিসে মারা গেল?

—আপনি কে হন তার?

—আমি খুড়তুতো ভাই।

—জানেন না।

অবস্তির সঙ্গে আলাপ আর উদ্বেগ বেড়েছিল। সে বলেছে, মনে হচ্ছিল তো জানায় নি নিমু।

—ভুল হয়েছে।

—ভুল!

সাইকেল রিক্সা তারপর একটানা দূর্গ বাজিয়ে সামনের রাস্তা পরিষ্কার করেছে এবং ভিড়ের ভিতরে সজাগ রিক্সাওয়ালার মত এই রিক্সাওয়ালাও অনাবশ্যক জোরে রিক্সা চালিয়েছে। ভুল—তবুও এরকম ফাঁকা রাস্তায় রিক্সাওয়ালারা কেন এত জোরে রিক্সা চালায়—এইসব ছোট শহরেও কি পরিমান ভিড় বেড়ে গেছে—আর কি আশ্চর্য—ভুল-ভুল কেন?

—কি হয়েছিল বলতো?

রিক্সাওয়ালা দূর্গ বাজিয়ে গেছে।

—কে ভুল বলল?

রিক্সাওয়ালা ছেলে হাতেলের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে নিমু হয়ে থুথু ফেলেছে।

মুঁড়ত বাড়িয়ে সমুকে কোলে তুলতে গিয়ে বিকাশ বুঝেছে, যার মৃত্যু হয়, সে শুধু তার বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতার থেকে বাঁচায়। কিন্তু জীবিতদের জন্য থেকে যায় অনেকটা বোঝা। হঠাৎ সে নিজেকে এই নিতুর থেকেও অসহায় বোধ করে। সমুর মাথার উপরে মুখ রেখে আবেগ দমন করার চেষ্টা করে বিকাশ।

সমু এই অকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হয়। ঘাড় বেঁকিয়ে সে তার মুখ খুবরতী করে এবং বিকাশের চোখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়। তার চোখে প্রশ্ন প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা। বিকাশ মুখ অন্যদিকে ফেরায়।

তখন মন্মথ বারান্দার তক্তপোষ থেকে ডাক দিয়েছিলেন, কে? সমু?

বিকাশ সমুকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। মন্মথ পাশে রাখা চশমা তুলে চোখে দিয়েছিলেন। বিকাশ সমুকে কোল থেকে নামিয়ে ইতস্তত করেছে। অশৌচ অবস্থায় প্রণাম করা বা প্রণাম গ্রহণ লোকাচার সম্মত কিনা, এরকম সমস্যা তার হয়েছিল। সে ইতস্তত করেছে তারপর হাত বাড়িয়েছে। মন্মথ পা সরিয়ে নিয়েছেন। অন্যরকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার মুখের প্রতীন ঢাকে, চোখের প্রশ্ন ঘন কাঁচে। বেশ কিছু সময় একটা অসহনীয় স্তব্ধতা। তারপর মন্মথ গলাখাকারি দিয়ে বলেছেন, মা কেমন আছেন?

এইসময় ছোট খুলে দু'জন লোক এসেছিল। একজন বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মানুষ। ধুতি আর সার্ট পরা বেঁটে এবং ঈষৎ স্থূল লোকটির চোখে চশমা। খুব ব্যস্ত তার হাঁটা চলা এবং কথাবলার ভঙ্গি। সঙ্গের যুবক প্যান্ট পরা। গায়ে সবুজ সোয়েটার। যুবকের বয়স বিকাশের মতই।

এদের আসা যেন খুবই দরকার ছিল এই মুহূর্তে। সেজন্য বিকাশ কৃতজ্ঞতা বোধ করে। তারা তিনদিন পরে শ্রাদ্ধ এবং তার পরের দিনের খাওয়া দাওয়া প্রসঙ্গে কথা বলছিল। মন্মথ 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' বলে সায় দিচ্ছিলেন কিম্বা নাকচ করছিলেন। তারপর যুবক উঠে ভিতরে চলে যেতে মন্মথ সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখেন এবং বিকাশকে বলেন, তুমি ভিতরে যাও। শীলাকে ডেকে নাও।

শীলা এ বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে। শীলার সঙ্গেই বিকাশের কিছুটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে একসময় সে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে থেকেছিল। বিকাশদের নিজেদের বোন না থাকাতে তারা দু'ভাই শীলাকে খুব পছন্দ করেছিল। সে শীলাকে ডাক করতে বারান্দা ছাড়িয়ে ভিতরে ঢোকে।

বারান্দা ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকলে পাশাপাশি দু'খানা বড় ঘর। সেই ঘর পেরিয়ে পুব দিকে আবার চওড়া বারান্দা। বারান্দার নেমে যাঁ দিকে একটা জায়গা ঘিরে হয়েছে কলঘর। সেখানে একটা টিউবওয়েল আছে। বারান্দার পর আয়তাকার উঠান। সেই উঠানের দুই পাশেও লম্বা টানা বারান্দা। সেই বারান্দার সঙ্গেও দু'খানা করে ঘর। এ সবই মাটির।

ভিতরের বারান্দায় নেমেও বিকাশ কাউকে দেখতে পায় না। এমনকি সমুকেও নয়। সান্ত্বনা আসে যে যুবক ঢুকেছে, তাকেও নয়। সে শীলার নাম ধরে ডাকে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডানদিকের বারান্দার শেষ ঘরখানা থেকে শীলা বেরিয়ে আসে।

বিকাশ উঠানে নেমে আবার দক্ষিণের বারান্দায় ওঠে। শীলা নিজেকে সংবরণ রাখার চেষ্টা করছে। নিকটজনের কাছে সংবরণ রাখা ভারি কঠিন। শীলা ঘরে ঢোকে। বিকাশ তার পিছনে। শীলা মুখ নিচু করে থাকে। বিকাশ ব্যাগটা একপাশে রেখে তক্তপোষে বসে। সেই যুবক ঘরের মধ্যে একটা হাতল-ছাড়া চেয়ারে বসেছিল।

সাধারণ সময়ের একটা আতঙ্কিত স্তব্ধতা। শীলা আচমকা একটা অবস্তিকর চাপা ফোঁপানির শব্দ করে। তারপরই একটু ঝুঁকে বিকাশের জানুদেশে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখ গুঁজে কেঁদে উঠে তার কাঁধে মাথা রাখে।

বিকাশ প্রথমে তক্তপোষের একটা পায়কে দু'পা দিয়ে আস্তার করে নিজেকে শক্ত রাখে। তারপর বাঁ হাতখানা রাখে শীলার মাথায়। নিজেকে স্থির রাখা এখন তারি কঠিন। সে চোখ রাখে মাটির দিকে।

যুবক উঠে পড়বার উপক্রম করেছিল, এই অবস্থায় আবার বসে পড়ে। শীলা অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে সংবরণ করতে পারে। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে, 'আমি আসছি' বলে সে ঘরের বাইরে যায়।

সেই যুবকও এই সুযোগে ওঠার উদ্যোগ করতে বিকাশ আচমকা তাকে প্রশ্ন করে, আপনি তো এখানকারই লোক?

কেননা, তাড়া দেওয়ার সময় রিক্সাওয়ালা তাকে বলেছিল, কালীপূজার টানা দিয়েই চল্লিশ টাকা, তাও পুরো দু'দিন রিক্সা আটক ছিল। এসব কথাবার্তায় আমাদের না থাকাই ভাল লাগে।

যুবক বলে, হ্যাঁ।

বিকাশ বলে, ঘটনাটা কি হয়েছিল আমায় একটু বলবেন?

যুবক একটু ইতস্তত করে। ঠিক কোন জায়গা থেকে বা কোন কথা দিয়ে বিষয়টা শুরু করবে এ নিয়ে একটা অস্বস্তি বোধহয় তার হচ্ছিল।

সে বলে, মানে একটা পলিটিক্যাল মার্ডার আর কি।

—পলিটিক্যাল!

একবছর আগে জ্যাঠামশাইকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল শংকর চিকিৎসার জন্য। এক ঘরেই শুতো তারা। টেবিলের উপরে এবং র‍্যাকে সাজানো বইগুলোর দু'একটা শংকর উল্টেপাল্টে দেখেছিল।

—তুই কি কম্যুনিস্ট নাকি?

—কেন বলতো?

এইসব বই পড়িস?

এসব কম্যুনিস্টদের বই, সে কথা তোমাকে কে বলল?

এ কথায় শংকরের আহত হওয়ার কারণ ছিল। সে কোনরকমে ইস্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে আর এগোয়নি। বিকাশ ইউনিভার্সিটির শেষ ধাপ পেরিয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাইয়ের অভিমানের এও হয়ত একটা গোপন কারণ ছিল।

শংকর বলেছিল, জানবে আবার কে? মুখ্যসুখ্যু মানুষ, ঘুমি দেখে বুঝি।

তার কথাবার্তায় প্রাম্যতা ছিল, কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল প্রকট চোখে।

—কোন্ পার্টি করিস? সি-পি-আই- সি-পি-এম না নকশাল?

বিকাশ বলেছিল, এই হলো আর কি? তুমি কোন্ পার্টি কর?

শংকর নির্দ্বিধায় বলেছিল, আমি কংগ্রেসী করি।

শংকরের সঙ্গে কোনরকম অন্তরঙ্গতা তার হয়নি। কিন্তু যেহেতু পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনরকম সংঘাতও ছিল না, অসুবিধাও হয়নি কখনো। অসুবিধা ছিল অন্য জায়গায়। সামান্য সময় পরে বিকাশের সমস্যা হতো কথা চালিয়ে যাওয়ার। একজন অত্যন্ত অল্প শিক্ষিত মফস্বলের লোকের সঙ্গে একজন শিক্ষিত এবং মহানাগরিক টানা পোড়েনে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ কতক্ষণ কথা বলতে পারে? বিকাশ সমস্যাটা এইভাবে দেখত।

এখন এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে যখন সকাল দশটায় রোদ্দুরকে ঘরের মধ্যে বয়ে তার নীল লম্বাটে বিকাশের মনে হয়, রাজনীতির কারণে স্বার্থের সংঘাত তাদের হওয়া উচিত ছিল। অথচ হয়নি, আশ্চর্য। অন্তত সে তেমন কিছু বোধ করেনি।

বোধ করেনি শংকরও। সে বলেছিল, তোদের এখন ভাল সময় যাচ্ছে।

বিকাশ বলেছিল, ভাল সময় মানে?

শংকর বলেছিল, সবাই তোরা লুটেপুটে খাচ্ছিস।

এরকম ভুল কথা। এরকম ভুল অভিযোগ তার যে একেবারে না শোনা, এমন নয়। এর মধ্যে সত্য আছে, মিথ্যাও আছে, এমন সে জানত। তার কাছে এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও ছিল। সে বলেছিল, তোমরা খেতে পাচ্ছ না, সে জন্যে আক্ষেপ?

সে ভুল করেছিল। সে জানত নির্বোধ এবং অল্পশিক্ষিত মানুষও মাঝেমধ্যে মারাত্মক যুক্তি দেখায়। ভুল এবং মেঠো হলেও সেই সব (ধরা যাক) যুক্তিসূত্রির প্রভাব কখনো কখনো এমন প্রবল হয় যে প্রতিপক্ষ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কারণ বিকাশের মত প্রতিপক্ষ যে যুক্তি দেখাতে পারবে, শংকরের মত প্রতিপক্ষ তার বিদ্যা বা বুদ্ধির সীমানা দিয়ে তাঁকে ছুঁতেও পারবে না। এই কারণে বিকাশ যুক্তি দেখাতেই পারবে না কিংবা যুক্তি দেখাতে বিরক্ত বোধ করবে। এই দুইয়ের যে কোনটাই এক ধরনের পরাজয়, অনেকটা মাতালের সঙ্গে সুস্থ মানুষের বাকযুদ্ধের মত।

বিকাশ সেই দিকেই এগোচ্ছিল। এবং এই ধরনের বাকবীর পরিস্থিতিতে যেমন হয়, তখনো তেমনই হচ্ছিল। অর্থাৎ শংকর নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী ভেবে তখন আত্মতৃপ্ত। শংকর বলেছিল অক্সেপ্টাইতো। তোদের লোকেরা ব্যাঙ্কের শেয়ারটি, ব্যবসার লাইসেন্স, ব্যাঙ্কের লোন, সরকারি চাকরি, পঞ্চায়েতের টাকা, এ সবই পাচ্ছে। আমরা পাচ্ছি না।

বিকাশ বলেছিল, তুমি কি এইগুলোর জন্য পার্টি করছ? এইগুলো পাওয়ার জন্য।

বিকাশের সমান ঘরের কোন তর্কবাগীশ নির্ঘাৎ এইখানে ঠাটামি করত। বলত, হ্যাঁ, এইগুলোর জন্যই তো। তোরা কিসের জন্য করিস? আদর্শ? নতুন ব্যবস্থা?

বিকাশ নিজে নিজের প্রতিপক্ষ হলেও তাই করত এবং মোক্ষম পাঁচটা সাজিয়ে রাখত।

কিন্তু শংকরের কাছ থেকে এমন কৌশল আশা করা যায় না। সে বলেছিল, হ্যাঁ, এইগুলোর জন্যই তো। তোরা কিসের জন্য করিস? আদর্শ? নতুন ব্যবস্থা?

কিন্তু শংকরের পক্ষটিতে ঠাটামির ছাতের পাঁচ থাকে না। ফলে, এমত অবস্থায় শংকরের মত মানুষের সঙ্গে আর তর্ক এগোয় না এবং বিকাশকে নিজের অজান্তেই ভোল মেরে তর্ক বন্ধ করতে হয়।

শংকর সম্বন্ধে তার মূল্যায়ন ছিল অনেকটা এইরকম: শংকর এমন একদল ছেলের নেতা যাদের যেন তেন প্রকারেণ টাকা পয়সা রোজগারই আসল উদ্দেশ্য, যারা টাকা উপার্জনের ব্যাপারে কোন নিয়ম নীতির বালাই মানে না। শংকর নিজে এগুলো নাও করি করে, দলের ছেলেদের এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন কারণ দেখে না।

কিন্তু বিকাশ নিজের দল সম্পর্কে এ ধরনের কিছু মনে সাধারণভাবে চিন্তা করে না। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা এমন ঘটলেও ঘটতে পারে, এরকম ধারণাই তার ছিল। এমন কখনো মনে হয় নি যে সে নয়, হয়ত, শংকরই সত্যের কাছাকাছি।

এখন সংশয় হয়, কে সত্যের কাছাকাছি? সে? শংকর? অথবা তারা কেউই নয়?

যুবক বলে, আচমকা মেরে দিয়েছে। আমাদের ক্লাব এরকম রেডি ছিল না। ওরা তলে তলে তৈরি হয়েছিল। শংকরদা রিকসা করে ফিরছিল, বাজারের সামনেই ওরা ওকে স্টাব করে।

—কারা?

এ সময় শীলা দু কাপ চা হাতে নিয়ে ঢোকে। অনেক স্বাভাবিক সে। সে বলে, চা খেয়ে কলঘরে যেও, ওখানে জলগামছা রাখা আছে।

চা খেয়ে যুবক বিদায় নিয়ে চলে যায়। বিকাশ অনেক কিছু ভাবতে থাকে, তারমধ্যে একটা বিরক্তিকর ভাবনা হলো এই যুবক শীলার প্রণয়ী কিনা। শীলা কাপ নিয়ে বেরিয়ে গেলে সেও কলঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বারান্দায় নামে। পুবের কলঘর থেকে দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সাদা থান পরা এক রমণী উঠে বারান্দায় আসে। নতমুখ রমণীর মাথার চুল মেঘের মত এবং রুক্ষ।

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে। রমণী একবারই তার দিকে তাকায়, তারপর তার হাঁটা একটু দ্রুত করে। বিকাশ সর্বাঙ্গে দৃষ্টিবিদ্ধতা অনুভব করে। রমণীর দৈহিক সৌন্দর্য হৃতবুদ্ধি করে দেবার মত। কেউ বলে না দিলেও সে বোঝে এই রমণী শংকরের বিধবা অনুপমা। বিকাশ এই প্রথম তাকে দেখল।

পরদিন বাজারের রাস্তায় সন্তোষদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিকাশের। দু'জনেই দু'জনকে দেখে অবাক হয়েছে। সন্তোষদা পার্টির পুরনো আমলের লোক, বারো তেরো বছর ঘর করে কলকাতা ছাড়া। নামী দামী নেতা ছিল না, কাজেই কলকাতা ছেড়ে সে কোথায় গেছে এ সম্পর্কে বিকাশ কিছু না জানলেও কৌতূহল ছিল না।

সেই সন্তোষদা বলেছে, তোর যে তাই হয়, তাতো জানতাম না।

—আপনি এখানে?

—আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। শ্বশুরের একটা পুরোনো বাড়ি আছে। আমার বউ এখন সেই বাড়ির মালিক। খবরের কাগজ বেচি আর ঘুরে বেড়াই। কাজের কাজ তো আর সারা জীবনে করলাম না কিছুই।

—এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাকে একটু সবিস্তারে বলুন তো, সন্তোষদা?

—কোনটা, শংকর মার্ডার?

—হ্যাঁ।

টু-ওয়ান চলছিল, এবার টু-টু হলে। এবার কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবে। আমাদের রাজনীতি এমনই খেলা, বুঝলি বিকাশ। আমরা একবার—ওরা একবার, আমরা দুবার—তো ওরা দুবার। এভাবে চললেই দেখবি সব পক্ষ কেশ খুশি থাকে।

—আপনি আর এখন পার্টি করেন না?

—পার্টির কি আমার মত লেখকের আর দরকার আছে যে, পাগলা? পার্টির এখন দরকার মাস্তান আর ইনটেলেকচুয়াল।

সন্ধ্যেবেলার ভিতরে ভিতরে বিষ। সন্ধ্যেবেলা সাহিত্য, নাটক, সিনেমা থেকে পার্লামেন্ট, লাইসেন্স, কন্ট্রোলারী, যেমন পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যেই অসততা, ভজনপোষণ, চুরি, ঘুষ, এসব খুঁজে বের করেন। এমন ভাবে বলতে থাকেন, বিকাশের মনে হয়, সেই ওজনে বিষ যেন তরল হয়ে ঘন পেস্তা বাদামের মত সন্ধ্যেবেলার ভিতর থেকে উঠে আসছে। সে নিজের অসহিষ্ণুতাও আর চেপে রাখতে পারে না। সে বলে, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন? এ রকম কিছু হেরেছিলেন, পাগলি, তাই আক্রমণের?

সন্ধ্যেবেলা চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলে রাখেন। বিকাশকে খালি চোখে একবার ভাল করে দেখেন, তারপর বলেন, শকের একদিন আমাকে মেরেছিল জানিস?

—আপনাকে?

—হ্যাঁ, আমাকে, আর বিশ্বাস না হয়, আমার থেকেও খুড়ো ওই লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর। মেরেছিল এই চায়ের দোকানেই।

—তার দরকার নেই। কিন্তু কেন সেটা জানতে ইচ্ছা করছে।

—আমি তখন সবে বছর খানেক হচ্ছে এখানে এসেছি।

কিন্তু কারণটা কি?

যে কারণে তুই এখন পাগলে আমাকে মারতিস।

—পাগল না।

—চোখ বুজে দেখ না বিকাশ, আমাকে দু এক ঘা চড় চাপড় মারতে পারিস কি না, দেখ না?

—কি হচ্ছে কি, সন্ধ্যেবেলা।

—তোদের নেতাদের যদি আমি চোর, চামার, শালা, বাজেৎ বলি, তবুও পারবি না।

—সন্ধ্যেবেলা!

—শোন পাগলা, এই চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে যদি চুরি, জালিয়াতি, মাস্টারকির অকথ্য কিরিস্তি প্রমাণসহ দিই, তবুও পারবি না? বিকাশের জন্মের সময় থেকে যে সন্ধ্যেবেলা তাকে নির্বাচন করতে চাইছে নিতান্তই এক ব্যক্তিগত আক্রোশে। এমন হয়। যৌবন চলে গেলে সন্ধ্যেবেলার মত মানুষ ভাবে, হারাতে, যার জন্য সর্বস্ব পণ করলাম, তা হলো কই? আবার আর দশটা সাধারণ মানুষ জীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, আমি তো তাও পেলাম না। এমন ইদানীং অনেক দেখা যায়। সন্ধ্যেবেলা বলে, পারবি না তো? জানি পারবি না। শকের কিন্তু পেরেছিল। ওদের নেতাদের সম্বন্ধে আমি এইখানে বসে সমালোচনা করছিলাম, গলা মিলিয়েছিলাম এবং মুখে যা আসে তাই বলছিলাম—যা আমার চিরকালের স্বভাব। শকের প্রথমে আমার সঙ্গে তর্ক করে, তারপর শাসায়, তারপর মারে। কিন্তু তোরা পারবি না। কেন জানিস?

বিকাশ জানতে চায় না। সন্ধ্যেবেলার এই স্বকপোলকল্পী বিকৃতির অস্থিরতা তাকেও যেন অস্থির করেছিল। সে সচেতন থেকে এই আক্রমণাত্মক ব্যক্তির সঙ্গ এড়াতে চাচ্ছিল। সে বলে, ওসব কথা থাক, সন্ধ্যেবেলা। শকের মারা যাওয়াতে আমাদের একটা পারিবারিক বিপর্যয় হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একেবারে আমার ভিৎ পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে। মানে এতদিনকার, মানে ধরুন, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে তৈরি একটা পারিবারিক ব্যবস্থার জটিল বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না। আমি যে কি করব—সন্ধ্যেবেলা নির্নিমেষের মত তাকিয়ে, আর তিনটে খুনের মধ্যে তো ঠিক তাই হয়েছে। ও নিয়ে তুই ভাবিস না। সময় সব ঠিক করে দেয়। বিকাশ আক্রমণের প্রয়াস করেছে, এই তিনটে খুনের মধ্যে দুটো তো শকেরদের বিপরীত পক্ষের, তো এ ব্যাপারে শকেরের ভোগান্তির কতখানি ছিল, জানেন কিছু?

সন্ধ্যেবেলা বলেছিলেন, জানি সব কিছুই তবে সেসব শুনে তোর কাজ নেই। তাহলে তুই সান্ত্বনা না পেয়ে উল্টে আরো অস্থিরতায় পড়তে পারিস। সন্ধ্যেবেলার আক্রোশ যেন সব কিছুতে।

বিকাশ বলে, তা হোক, তবু বলুন শুনি।

চায়ের দোকান ছেড়ে তারা তখন রাস্তায় নেমেছিল। রাস্তা ছেড়ে বাঁ পাশের একটা গলি ধরে তারা নদীর ধারে এসেছিল। নদীর পাড়ে বাঁধ। সেই বাঁধ পশ্চিম থেকে পুবে বিস্তৃত। বাঁধের অনেক নিচে নদীর বালি। প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত নিচে। সেই বালি ভেঙে আরো পঁচিশ হাত সামনে এগোলে, তবেই নদী। নদীর জল এই শীতে বিষয় এবং নীল। সময়টা ছিল বিকেল, তাই নদীর ঘাটগুলোতে এ সময় বিশেষ লোকজন ছিল না।

সন্ধ্যেবেলা চলতে চলতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েন। বাঁধ সেখানে ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচের বালিতে মিশে গেছে। সন্ধ্যেবেলা সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছেন, এই হলো এ শহরের শ্মশান। এখানেই শকেরকে পোড়ানো হয়েছে।

বিকাশ জল ছেঁচে শবদাহের অবশেষ দেখেছিল। পোড়া দু-এক টুকরো কাঠ, মাটির কলসি এবং ঘুরে দেওয়া চিতার বিশিষ্ট ছিন্ন গঠন। সাত আটদিন আগের দাহ করা শকেরের স্মৃতি না হওয়ারই সম্ভাবনা। তবুও বিষয়টা একই রকম, প্রতীকি।

সন্ধ্যেবেলা বলেছিলেন, শকের পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কিন্তু বীরুর কঙ্কাল এখনো এই জমিটুকুর মধ্যেই কোথাও বসে আছে।

—বীরু কে?

—বাকি তিনজনের একজন।

—কঙ্কাল বসে আছে মানে?

—আরে সে এক বৃত্তান্ত।

সন্ধ্যেবেলা বেশ শব্দ করে হেসেছিলেন। সব শব্দ এবং সব হাসির আড়ালে তার ছিন্ন এ্যাসিড ঢালে। বীরু হলো মহান্ত—বীরুর পদবী। জাতে বৈরাগী। বীরুর লাশ নিয়ে লাল জাওয়া থেকে শহরে শোভাযাত্রা হয়েছিল—বীরু মহান্ত যুগ যুগ জিও, বীরু মহান্ত লাল সেলাম! তারপর বীরুর বাবার খলখল খোল কর্তাল নিয়ে এসে লাশ সকল করে। লাল শালুর উপরে নামাবলী, কপালে তুলসীপাতা দিয়ে চন্দনের ছোপ, খোলা বিস্ফারিত দুই চোখও বোজানো হলো তুলসীপাতা দিয়ে। তারপর খড়াখড়ি গর্ত করে বীরুকে বৈরাগীমতে সমাধিস্থ করা হলো। মাটিতে হেলান দিয়ে বসা বীরুর কঙ্কালের এক হাতে এখনো মালোই, অন্য হাতে মালা।

বিকাশ দৃশ্যটা যেন দেখছিল চোখের সামনে। যেন এক প্রত্নতত্ত্ব—মাটির সিংহাসন গ্রাপকাটা—পিছনে মাটির দেওয়াল—বীরু মহান্তের কঙ্কাল বসে আছে সামনে দু'হাত ছড়িয়ে—একহাতে ভিক্ষাপাত্র, অন্য হাতে জপের মালা—বড় ভয়ঙ্কর অন্তিম নিঃসঙ্গতা।

সেই যুবক চা খেতে খেতে এক ফাঁকে জানিয়েছিল, আমাদের ক্লাব ঘরের সামনে শকেরদার স্ট্যাচু বসানো হবে—সহীদ স্মরণে—অনুষ্ঠান স্ট্যাচুর চাদরও ওঠাবে—সব ঠিক হয়ে গেছে।

সন্ধ্যেবেলার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলে ফিরে আসতে সময় লেগেছিল। স্নান খাওয়া সেরে শুতেই বিকালের ঘুম এসে যায়। শীলা যখন গায়ে ঠেলা দিয়ে তার ঘুম ভাঙায়, তখন প্রায় সন্ধ্যা। শীলা এক কাপ চা এবং এক গ্লাস জল তার পাশে রেখে সুইচ টিপে আলো জ্বালায়।

গ্লাসের জলে মুখ কুলকুচো করে বিকাশ চায়ে চুমুক দেয়। তখনই সে একজোড়া ছেলে এবং কয়েক জোড়া করতালের প্রারম্ভিক কৃষ্ণ আওয়াজ শোনে। শীলা বলে, চা খাওয়া হয়ে গেলে একবার বাইরের ঘরে যেও, দাদারা।

বিকাশ বলে, কোথায়?

শীলা বলে, বাইরের ঘরে কীর্তন হচ্ছে। আশপাশের লোকজন এসেছে—

—আমি গিয়ে কি করব?

বিকাশ যেন খুব অস্বস্তিতে পড়ে।

তাতে শীলা কেমনভাবে যেন বলে, ও, তুমি তো আবার কমিউনিস্ট। করবে আবার কি, গিয়ে বসবে একটু। আবার উঠে আসবে।

—আমি কমিউনিস্ট তোকে কে বলল?

বিকাশ একটু হেসে শীলাকে বলেছিল। তার ভাল লাগছিল এইসব কথায়, যেসব কথার মধ্যে সরাসরি কোন সমস্যা থাকে না।

—মাসাকে যারা খুন করেছে, তারাও নাকি কমুউনিস্ট। শীলা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে। তার কণ্ঠস্বরে বিকাশের প্রতি কোন অভিযোগ আছে কিনা বোঝা যায় না। ভীষণ সরল, কোনরকম প্যাঁচ নেই তার গলায়।

আপাত সমস্যাহীন প্রসঙ্গ গভীর সমস্যা তুলে নিয়ে আসে। বিকাশ একটু চমকে যায়। একটু যেন আহতও হয় সে এবং তৎক্ষণাৎ নিজের ভেতরে প্রতিরোধের প্রস্তুতিও অনুভব করে।

জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে শীলা। বিকাশ তার মুখ দেখতে পায় না কিন্তু কথা শোনে। শীলা বলে, আব্বার বউদির ভাই শ্রীদুলাবাবুও কমিুনিস্ট।

হঠাৎ ঘুরে শীলা কাপ আর জলের গ্লাস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বিকাশ সিগারেট ধরায়। শীলার কথার অর্থ সিগারেট টানতে টানতে সে বুঝবার চেষ্টা করে। শীলা কি তাকে আঘাত করার জন্য এসব কথা বলল। নাকি নিতান্তই কথা প্রসঙ্গে এসে পড়া একটা কথার কথা? শীলাকে তো একথা বলা যায় না যে, কখনো কখনো কোন কোন মানুষের মৃত্যু সমাজের অধিকাংশে মানুষেরই কাম্য হয়ে ওঠে, যদিও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তা কার্যকরী করা যায় না।

বাইরের ঘরে প্রবল হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। খোল, করতাল এবং সমবেত কণ্ঠের নামগানে আর সব শব্দ চাপা পড়ে গেছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বিকাশ বারান্দায় নামে। ভিতরের মাঝ উঠানে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। বাইরের ঘরের ভিতর দিকের বারান্দায় কয়েকজন বয়স্কা স্ত্রীলোক বসে কীর্তন শুনছে। তাদের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধা অন্যদের মধ্যমণি হয়ে আছে। তার পাকাচুলে সিঁদুর তাকে অনেকদিন ধরেই অহংকারী করে রেখেছে, যা তার হাবভাব এবং তাকানোর ভঙ্গিতে প্রকট। বিছিন্ন ভাবে এক প্রান্তে বসে আছে নতুন কোরা শাদের একটি শিশু। সে অবশ্যই অনুপমা। পাকাচুলে সিঁদুর দেওয়া বৃদ্ধা এবং অনুপমার একাসনে উপস্থিতি বড়ই অস্বাভাবিক লাগে বিকাশের কাছে। আর তখনই , শীলাকে যে যুক্তিটা দেখানো যায় না বলে সে ভেবেছিল, সেই যুক্তিটা একটা নতুন সমস্যা তোলে তার ভিতরে। শংকর এবং বীরু এই দু'জন মানুষের মধ্যে কোন জনের মৃত্যু সমাজের অধিকাংশে মানুষের কাম্য হয়ে ওঠে? বীরুর? শংকরের? অথবা দু'জনেরই? এই তিন বিকল্প ছাড়া আর তো কোন সম্ভাবনা হতে পারে না। তাহলে যে কথা শীলাকে বলতে পারেনি নিতান্ত জরুরতে করণে, সে কথা সে নিজের কাছে ব্যাখ্যা করবে কিভাবে?

দক্ষিণ দিকের দেয়ালের গায়ে বাইরের যেত্রোত্তর একটা দরজা আছে। বিকাশ সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে সংকীর্তনের ঘরের বাইরে বারান্দায় আসে। ঘরের মধ্যে সাত-আটজন গায়ক এবং বাদক। আরো আট-দশজন বয়স্ক মানুষ চোখ বন্ধ করে কীর্তনে অংশগ্রহণ করছে। ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে জ্যাঠামশায় ধ্যানস্থের মত বসে আছেন। তাঁর মাথায় মাফলারের ফেট্টি এবং গায়ে একখানা কম্বল। কোলের মধ্যে বসা সমুর মুখখানা কম্বলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে। সমু গায়ক এবং বাদকদের মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছে। কিন্তু তার চোখে মুখে কোন কৌতুক নেই।

একঘেয়ে কীর্তন, একই পদের অজস্রবার পুনরাবৃত্তি। যত রকমভাবেই গাওয়া হোক না কেন, প্রত্যেকটি সুরই পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকাশ বুকের ভেতর এক অস্থির মাত্রাকার বোধ করতে থাকে। এরকম সঙ্গ করা সারাজীবনে তার একবারও ভাল হয়ে ওঠেনি, তবুও অবচয় বেদনার ছায়া ক্রমশ ভেতরে গাঢ় হয়ে উঠছে। কেউ একজন গলা উঁচুতে তুলে কাঁপাকাঁপা গলায় 'হরি বোল, হরি বোল' বলে ওঠে। সমবেত গানের সঙ্গে এই ধ্বনি এমন এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে কেন-পৃথিবীর যাবতীয় মাত্রাকার এই ঘরখানায় মূর্ত হয়ে ওঠে। জ্যাঠামশাইয়ের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে নামে।

বিকাশ দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিহ্বল হয়ে। ভিতর থেকে একজন কীর্তনের ধ্বনতন্ত্র না করে ইঙ্গিতে তাকে ভিতরে এসে বসতে বলে। ইঙ্গিতে বিকাশ হাত দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে, অর্থাৎ না, ঠিক আছে।

প্রায় আধঘণ্টা এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিকাশ ভাবে যথেষ্ট হলো এবং সে দরজা ছেড়ে সরে বাইরের দিকে আসে। ভিতর থেকে গায়েনের একজন উঠে আসে। বারান্দা ছেড়ে উঠানে নামতে বিকাশ টের পায় কেউ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। জোৎস্নার নদীর উপরে কুয়াশার বাদল এখান থেকে রহস্যময় লাগছে দেখতে। সে করেক পা এগিয়ে সিগারেট ধরায়। পিছে পিছে নেমে আসা লোকটি জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে নিঃশব্দে হাত বাড়াতে বিকাশ একটু চমকে ওঠে। তারপর অপ্রস্তুত হয়ে তাকে আগুন দেয় সে।

বিড়িতে টান দিয়ে লোকটি বলে, এবার ঠাণ্ডা আরো বেশি পড়বে। বাবু কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

বিকাশ বলে, হ্যাঁ।

লোকটি অনাবশ্যক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, হাঃ কি আফসোস দেখেন, নবীন বয়েসের ছেলে! বিকাশ বলে, আপনাদের এখানে পার্টিবাজি খুব, না? লোকটি আফসোসের সঙ্গে বলে, আর বলবেন না। মাস তিনেক আগে বীরু খুন হলো। সেখানে আমরা দলদিন নাজপান করলাম। বীরুর বাবা খুবই ভক্ত মানুষ, আমার গুরু ভ্রাতা। কের দেখেন—শংকরবাবু—

লোকটি বিড়ি টানতে টানতে উঠানের শেষ মাথায় গিয়ে বেড়ার গায়ে পেচ্ছাপ করতে বসে। বিকাশ অবশ্য আগের রাস্তা ধরে ঘরে ফিরে আসে। ঘরে ঢোকার আগে তাকিয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়ে যে, অনুপমা আগের জায়গায় বসে নেই।

বিকাশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। সে কেন ধারণা করেছিল যে অনুপমা ওখানে এখনো থাকবে না? কেন তখন ওখানে তাকে বসে থাকতে দেখে তার মনে হয়েছিল যে সে প্রতিক্ষায় বসে আছে? অথবা, অন্য কারো ইচ্ছার জন্য বসে আছে? যেমন সে নিজেও তাই করেছে। এই চিন্তা তারি অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে তার কাছে। কোন স্বাভাবিক পদ্ধতি ছাড়া এই সিদ্ধান্ত, যা কখনো হয় না। তাহলে নিজের সঙ্গে কোন প্রবঞ্চনা নেই তো? অনুপমা সুন্দরী এবং যুবতী বলে কি বিকাশ তার সম্বন্ধে এরকম একটা সিদ্ধান্ত করেছে? যদি তাও হয়, বিকাশের এই বিশ্লেষণ করার কোন কারণ নেই এবং কেউ না জানলেও অনুপমার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত খুবই অমর্যাদার।

শীলা আরেক কাপ চা নিয়ে আসাতে সে তারি স্বস্তি পায়। রান্নাঘরের বারান্দা থেকে একজন চকচকে থালার উপরে চায়ের কাপ সাজিয়ে কীর্তনের ঘরে যায়। শীলা বলে, তুমি একবারও বৌদির সঙ্গে কথা বললে না, রাঙ্গদা?

সব থেকে প্রস্তুতিকর প্রসঙ্গ। কাল আসার পর থেকে বিকাশ একথা অনেকবার ভেবেছে। অনুপমাকে সে এই প্রথম দেখছে। শংকরের বিয়েতে সময় তার আসা হয়নি। তার কেমন কেন ধারণা হয়ে আছে যে কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় কারো সঙ্গেই কথা বলতে চায় না। এ দেশের মেয়েদের পক্ষে এ একটা ভীষণ অপমানজনক অবস্থা। সে অসহায়ের মত বলে, কি কথা বলব রে, শীলা? শুধু শুধু একটা প্রস্তুতিকর অবস্থায় ফেলবে ওকে। এই দু'দিনে শীলাকে তার মনে হয়েছে খুবই লক্ষ মেয়ে। একজন একটা শোকের বাড়িতে একা সে সবদিক সামলাচ্ছে। সেই শীলাও এ কথার উত্তর দিতে পারে না। ফলে সেও সিদ্ধান্তহীন হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তহীনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও থাকে তার। কথা ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়, সামনে দিয়ে কথা না বলতে পারার ভয়, এমন কি কিছু উলঙ্গ সত্য কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার ভয়ও তার থাকে। নিজের অগোচরে নিজের ভিতরে একটি দ্বৈত সত্তার জন্ম হয়েছে কখন, বিকাশ এখন সমস্ত কিছুতে এমন এক গূঢ় যুক্তির ছাপ দেখছে, যা তার সামনে এসে দাঁড়াতে চায়।

কিন্তু অনুপমার সঙ্গে কথা বলাই সহজ ছিল। সমুর সঙ্গে কথা ফুরিয়ে যাওয়ার বা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কোন আশংকা তার ছিল না। এই ক'দিনে সমুর সঙ্গে সম্পর্ক তার মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েছে। একটা মাত্র আতঙ্ক প্রথম দু'দিন ছিল যে সমু বোধহয় সেই মারাত্মক প্রশ্নটা তাকেই করে বসবে যে, মরে গিয়ে মানুষ কোথায় যায়, কিম্বা তার বাবা কোথায় গেছে।

বিকাশ ভয় পেয়েছে এই কারণে যে, তার কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। সে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে পারবে না যে ঐখানে,

কিন্তু একদণ্ডও বলতে পারবে না যে তার বাবা ভদ্রমানের কাছে গেছে। তাতেই সে বড় আহতে ছিল।

কিন্তু শংকরের মৃত্যুর খবর নিয়ে যখন সকাল থেকে একটা তরঙ্গের পরে একটা এবং সর্বাগ্রে শুভ্রতার ছাপমারা সামাজিকতা সমস্ত অনুভূতিকে ক্রমশই কাদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে শুধু ভোঁতা করতে থাকে, এক সময় বিকাশের নজরে হয়ে আসে। বস্তুত, এসব শুরু হয়েছে অনেক দিনের ঘটিকাযানো ভেবেই। রাত থেকে শুরু হয়েছে ভয়ংকরি কোটা, মালার ঘাটা ইত্যাদি। তবে সকাল হতে না হতেই সামাজিকতার বস্তুবাপন্ন প্রত্যেকটি মানুষের মন থেকে এসব অসম্ভব নিয়ন্ত্রণক্রিকতা দাবী করতে থাকে, যে শোক বাপারটা সেখানে পৌঁছ হতে বাধ্য। বিকাশ অনুভূ বোধ করতে থাকে যখন দেখে যে ডাক্তারদেরই তার শারীরিক অবস্থাজ্ঞান এবং শোক একলমনে সরিয়ে সবকিছু দেখাশুনা করছেন এবং সেই বার্ধিক্যী সীমন্তিনী অনুপমাকেও একেবারে পাশের পাশে বসিয়েছেন।

বিকাশ চৌঠাকুর সুযোগে সমুর হাত ধরে নদীর বাঁধের দিকে পালিয়ে যায়। তার ভয় থাকা সত্ত্বেও সমুর সঙ্গে সে সহজ হতে চেষ্টা করে। তার সমুও হয়তো একবারও ভয়ংকর কোন প্রশ্ন করে না যাতে সে বিপন্ন হতে পারে। হয়ত, পিতৃহীন হওয়ার তাৎপর্য তার পক্ষে এখনি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু পিতৃস্নেহের প্রত্যক্ষজনতায় হেন সে অবশ্যই পুরোপুরি বুঝতে পারে, তার চোখমুখের শূন্যতা একথাই প্রমাণ করে।

—সমু, তোমার কি খেতে ভাল লাগে?

সমুর চেয়ে শুধু অন্যকে বিপন্নতা কে দেখতে বিকাশের ভাল লাগার কথা নয়।

—বলতে না, কি খেতে ভাল লাগে?

—কি আবার!

—তুমি কাজুবেরি খেয়েছ?

—হ্যাঁ। একবার মামা এনে দিয়েছিল।

বিকাশ চকচকে চোখে তাকায়।

—আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি, সমু?

সমু চুপ করে থাকে।

—কলকাতায় চিড়িয়াখানা আছে। বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার—

সমুর চোখে নিরাসক্ত বয়স্কতা। আচমকা সে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা কোণ থেকে প্রশ্ন করে বিকাশকে অপ্রস্তুত করে দেয়।

—আচ্ছা আমাদের বাড়িতে সবার নেমন্তন্ন, রাঙাকাকু?

—হ্যাঁ।

—নেমন্তন্ন কেন, রাঙাকাকু?

সমুর সব থেকে আন্তরিকতার প্রশ্নের সম্ভাবনার যে সামান্য প্রস্তুতি ছিল বিকাশের, এই প্রশ্নে তাও নেই। সে অসহায় হয়ে পড়ে। যে ব্যবস্থার পক্ষকে তার নিজস্ব সমর্থন নেই এবং কেন নেই, এই বোধও পরিষ্কার নয়, তাকে সে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? তার নিজের পিতৃবিয়োগের সময়ও তাকে এইসব পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। পছন্দ করুক আর নাই করুক, করতে তাকে সবই হয়েছিল। একটাই প্রবোধ ছিল নিজের কাছে, তা হলো, সমাজে থাকতে হলে এসব লোকাচার মানতেই হয়।

কিন্তু সমুকে সে কি ব্যাখ্যা দেবে?

—বাড়িতে কেউ মারা গেলে এসব করতে হয় সমু।

—কেউ মারা গেলে——

—সমু, ঐ দেখ, কতবড় একটা মাছ আটকেছে বড়শিতে।

বিকাশ এরকম একটা নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে সমুকে অন্যমনস্ক করতে চায়। একটি একটা ভয়ংকর দ্বিধার মুখোমুখি পড়তে হতো থাকে। অথচ, সে হয়তো পড়েই গেছে। কেউ মারা গেলে, কেন অন্যের সেই মৃতের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাবে, এ প্রথা বড়ই প্রাচীন। বিকাশ এর ব্যাখ্যা জানে না। যা জানে, তা সে সমুকে বোঝাতে পারবে না। এই শিশুকে এখন তার সমবয়স্কের মত মনে হয়। মনে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর মত, সে সমানে সমানে যুক্তি দেখতে চায়।

এর থেকে অনেক সহজ ছিল অনুপমার সঙ্গে কথা বলা। গতকাল অনুপমা তাকে বলেছিল, কলকাতায় যে আমাদের কোন আত্মীয় আছে, বিয়ের অনেকদিন পর পর্যন্তও আমি এ কথা জানতাম না।

বিকাশ একটু হেসেছিল। কথা ফুরিয়ে যায়নি তার। সে বলেছিল,

আজকাল এমনই হয়। একই পরিবারের মানুষ আমরা, অথচ, কেমন দূরবর্তী হয়ে গেছি। জীবন ক্রমশই আরো জটিল এবং আরো সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এর জন্য আমাদের সবারই আক্ষেপ। অনুপমা বলেছে, জীবন ভারী জটিল এবং সংকীর্ণ ঠিকই। আমার ভাই নীলু, আমরা পিঠাপিঠি ভাইবোন, আমার কাছে মুখ দেখাতে পারছে না।

বিকাশ অনুপমার দৈহিক সৌন্দর্যই শুধু দেখেছিল, সে যে এমন পরিশীলিত কথা বলতে পারবে, এমন আশাও করেনি। মানুষের কত ধারণাই যে ভুল হয়। আসলে অনুপমাকে সে শুধু শংকরের স্ত্রী হিসেবে দেখেছিল, নীলুর বিদি হিসাবে দেখেনি। নীলু কলেজে পড়ায়, এ খবরও সে শীলার কাছ থেকেই শুনেছে।

অনুপমা তাদের কথার জের ধরে বলেছে, তবুও খটকা একটা থেকেই যায়, রাজাদা। সমুর বাবাকে আমি বুঝতে পারতাম। গোঁয়ার, জেদী এবং ঈর্ষাপরায়ণ একটা মানুষ। দ্বিধা দ্বন্দ্ব কিছুই নেই। শেষ কথাটি অনুপমা চাপাস্বরে বলেছিল এবং বলার সময় চোখের ভুরুতে আর মুখমণ্ডল শক্তপ্রয়োগে যে গভীরতা সে তৈরি করেছিল, তার বিষণ্ণ সুন্দর বিকল মুখে তা বড় মায়াময় প্রভাব সৃষ্টি করে। তারপর মুখ তুলে বিকাশের চোখে সরাসরি তাকিয়ে বলেছিল, কিন্তু আমার মনের পেটের ভাই নীলুকে আমি বুঝতে পারি না। সমুর বাবার কাছে একবার শুনেছিলাম, আপনিও নাকি পার্টি করেন। হয়ত, আপনাকেও বুঝতে পারব না।

কোনরকম তর্কে প্রবেশ করার সময়ই নয় এটা, আর এই মুহূর্তে কোন বিষয়ই তর্কের বিষয় হতে পারে না। তবুও নিজেকে ভারী বিপন্ন লেগেছিল। বিপন্ন লাগে এই কারণে যে অনুপমা যদি শংকরের মতই হতো, কিম্বা শীলার মতও, তাহলেও তার বোঝা না বোঝার কিছুই ছেত আসত না। কিন্তু অনুপমা এমন সুন্দরী এবং অনুভূতিপ্রবণ তো নয়ই, এমন পরিশীলিত এবং এমন শান্তিস্নিগ্ধ, বিপন্নতা সেই কারণেই। যে যদি বুঝতে না পারে, অচিরে নিজের উপরেই সন্দেহ দেখা দিতে পারে, অনুপমার সঙ্গে মাত্র দু'বারের আলাপে বিকাশের এমনই মনে হয়েছিল।

সে বলেছে, এমন কথা কোন বলছেন, অনুবৌদি, শংকরদা একটা পার্টি করত, আপনার ভাই কিম্বা আমি হয়ত অন্য একটা পার্টি করি। রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধ তো হতেই পারে। সেই বিরোধে কখনো কখনো—

স্পষ্ট মিথ্যা কথা বিকাশের চোখেমুখে এবং সেই মিথ্যা অবশ্যই অনুপমার চোখে আড়াল করা যাবে না জেনেও কিছুই করার থাকে না বিকাশের।

অনুপমা চোখ নামিয়ে নেয়। তার বিষণ্ণতা গভীরতর হয়। বিকাশ বসে থাকে ধরা পড়া প্রতারকের মত।

অনুপমা হঠাৎ যেন আক্রোশে বলে, কিন্তু কেন শংকর তার আর বীরু মহন্তই মরে? কেন শুধু আমাকে কিম্বা সতীকে, সমুকে আর রতনকে এই নির্মম লোকাচার আর অপমানের ভার দিয়ে যেতে হবে? কেন অনাথ হতে হবে? কেন আপনি, নীলু আর ঐ যে মোহনবাবুরা, আপনারা নিরাপদে থাকবেন? কেন, কেন?

অনুপমার এক একটা বিশেষ শব্দে এক একটা বিশেষ ধরনের ব্যঞ্জনা যা শুধু ধ্বনিতেই প্রকাশ করা সম্ভব। 'নির্মম লোকাচার আর অপমানে' ঘৃণা এবং 'অনাথে' স্নেহ ও ঘৃণা যুগপৎ থাকে। তার অবিরাম 'কেন'তে প্রতিপক্ষ তীক্ষ্ণ তাপের খোঁচা খায়।

বিকাশ মাথা নিচু করে বসেছিল। সে বুঝেছিল কেন নীলু তার সিনিয়র কাছে মুখ দেখাতে পারছে না।

কিন্তু এ সবেরও উত্তর ছিল। বিকাশ বলতে পারত, ব্যাখ্যা করতে পারত যে, নীলু কিম্বা বিকাশ অতটা নিরাপদ নয়, অনুপমার অভিযোগ পুরোপুরি ঠিক নয়। এমন কি, নীলু কিম্বা বিকাশ অতটা স্বার্থপরও নয়। অন্তত, এ নিয়ে খোলতর্ক তো হয়ই।

আর সমু এখন বলে, রাজাকাকু, মাছ আটকেছিল, বড়শি জলের ভিতরে কিছুতে আটকে গেছে।

বিকাশ দেখল তাই বটে। সে হেসে বলে, আর আমি ভাবলাম কত বড় না মাছ আটকেছে। তুই কখনো মাছ ধরেছিস?

সমু এমন একটা ভারী এবং নিসেন্স 'না' বলে যে বিকাশ চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে রান্নাঘরের পাশে এক মোড়া লম্বা ছিপ সে দেখেছে যেগুলো দিয়ে গুরুন্তই শংকর মাছ ধরত। এই মুহূর্তে সমু যেন ওস্তাদের হাতে ধরা একটা তারযন্ত্র, যার যে কোন তারে সামান্য একটু ঢেউওয়া লাগলেই ঝুলচাবে অনুরণন উঠছে ওস্তাদে; সমুকে যেন কিছু ভর করে আছে। যেন সে স্বাভাবিক মানুষের ভগতের নয়। বিকাশের হাতের মধ্যে সমুর কব্জি। বিকাশ সেখানে এই শীতের মধ্যেও ঘামের আদ্রতা অনুভব করে। মুণ্ডিত মাথায় কালো চাপদা জড়ানো শিশু যেন কোন এক প্রাচীন রেনেসাঁস প্রাজ্ঞ এবং দুর্বোধ্য। সে সামনের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

উত্তরের হাওয়ার বেগ বাড়ছিল। বিকাশ তাকিয়ে দেখে ডান পাশে শহরের এক প্রান্ত, বাড়িঘর ক্রমশ বিরল, শেষে ফাঁকা মাঠ। যতদূরের সামান্য শব্দ ছাড়া তার কোন শব্দ নেই। এই নদীও এমন নিঃশব্দ যে প্রবহমানতা টেরই পাওয়া যায় না। সামান্য দূরে বাঁ হাতে নদীর একটা বাঁক। নদীর বাঁধ সে পর্যন্ত নেই। সেখানে নদী ছড়িয়ে উঠে আসলে ডানদিকের পলি জমিতে প্রচুর সবুজে ঢেকে। হাওয়ায় ঊষীষ আন্দোলিত। বিকাশ খেয়াল করেনি নদীর যে বাঁকের উপর দিয়ে তারা ইটিয়ে তা ধীরে ধীরে সমতলে নেমে গেছে। সমু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কয়েক পা পিছন থেকেও দেখা যায়নি সামনে কি আছে। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছে সে জায়গা থেকে বিশ ত্রিশ হাত নিচে সমতল জায়গাটা এতক্ষণে বিকাশের চেনা লাগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যেবেলা সেদিন তাকে এখানেই নিয়ে এসেছিলেন। এখানেই শংকরের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে। এখানেই কোথাও বীরু মহন্তের কাকোল এখনো তার অন্তিম ভঙ্গিমায় বসে আছে। সমু সেই শ্মশানের দিকে তাকিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

জন দশেক বারো-চোদ্দজন মানুষ। বাঁশের মাচানে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি মৃতদেহ। মৃতদেহের মাথার কাছে একটা নতুন মাটির কলসী, একখন্ড কোদাল। চিতা সাজানো হয়েছে।

বিকাশ সমুর হাতে ধরে আকর্ষণ করে। বলে, সমু, চল আমরা চলে যাই এখান থেকে। আমি ঠিক খেয়াল করিনি রে।

সে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করছিল এই শিশুর। তার মনে পড়ে শুধু বয়স নয়, অন্য একটা সংস্কারের জন্যও মানুষকে এই অবস্থায় এই জায়গায় আসতে নেই। অপরাধবোধ এবং হীনমন্যতা তাকে ক্লিষ্ট করে, কেননা এই পুরো ব্যাপারটা তাকে গোপন রাখতে হবে। এটা প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে এমন একটা অপরাধ যার জন্য কেউ তাকে মার্জনা করবে না। শুরুদায়ে কাউকে শ্মশানে নিয়ে আসার বিরুদ্ধে যে বিধান তা যতই কুসংস্কার হোক, বিকাশ তাকে এই মুহূর্তে অস্বীকার করতে পারে না।

সমু নড়ে না। সে ঐ মৃতদেহ এবং তাকে ঘিরে ব্যবস্থীর অভিচার মগ্ন অন্যমনস্কতায় দেখতে থাকে। বিকাশ নিজের ভিতরে এমন দুর্বলতা অনুভব করে যে জোর করে এই শিশুকে টেনে নিয়ে যেতেও সাহস করে না। সে শুধু সমুর করুণা ভিক্ষা করতে থাকে।

সমু তার দিকে একবার ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ সে এখন। কি ভীষণ নিসেন্স দৃষ্টি তার। বিকাশের ভয় করতে থাকে। সমুর চোখে পরিচিতির সামান্য আভাসও সে যেন দেখতে পায় না।

মৃতদেহের ঢাকনা সরিয়ে তাকে স্নানের জন্য উলঙ্গ করা হয়। বিকাশ প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে দেখে। তারও যেন বমি এসে গেছে। মৃতদেহ একটি দশ এগারো বছরের বালকের। শয্যা থেকে তাকে ওঠানো হলে নিরবলম্ব বালকের মাথা এভাবে ঝোলা ছিল শূন্যে সেভাবেই সোজা থাকে। বিকাশ সমুর হাত ধরে এবার জোরে আকর্ষণ করে, যেন সে নিজেই ভারী নিগৃহীত। সমু অন্যমনে নিজেকে বিকাশের হাত থেকে মুক্ত করে। তার গায়ের চাদর একদিকে মাটিতে লুটিয়েছে। সে ডান হাতখানা চাদরের ভেতর থেকে বার করে সামনে বাড়িয়ে দেয় সেই মৃতদেহের দিকে। তারপর বিকাশের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, ওকে কে খুন করেছে, রাজাকাকু?

আজকের আনন্দ চিরস্থায়ী হোক্

পূজা মানেই আনন্দ আর উৎসব। কেনা-কাটা। দেওয়া-নেওয়া, হৈ চৈ আর আমোদ-প্রমোদ। মণ্ডপে মণ্ডপে লোকের ভিড়। আলোর মালা আর বাজনা-বাদ্যি। এই সুখ ক'টা দিনের। মাত্র ক'টা দিন ভুলে থাকা নিত্যদিনের যন্ত্রণা থেকে।

এই সুখ চিরস্থায়ী হয়ে উঠুক। আর এই জন্যেই আছে পিয়ারলেস।

পিয়ারলেসের মাধ্যমে আজকের সামান্য সঞ্চয় হোক আগামী দিনের সমৃদ্ধির পাথেয়।

দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত ১৯৩২

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ পিয়ারলেস ভবন,
৩, এসপ্লানেড ঈস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

সরকারী তহবিলে মোট লগ্নী — ৬০০ কোটী টাকার উর্ধ্বে

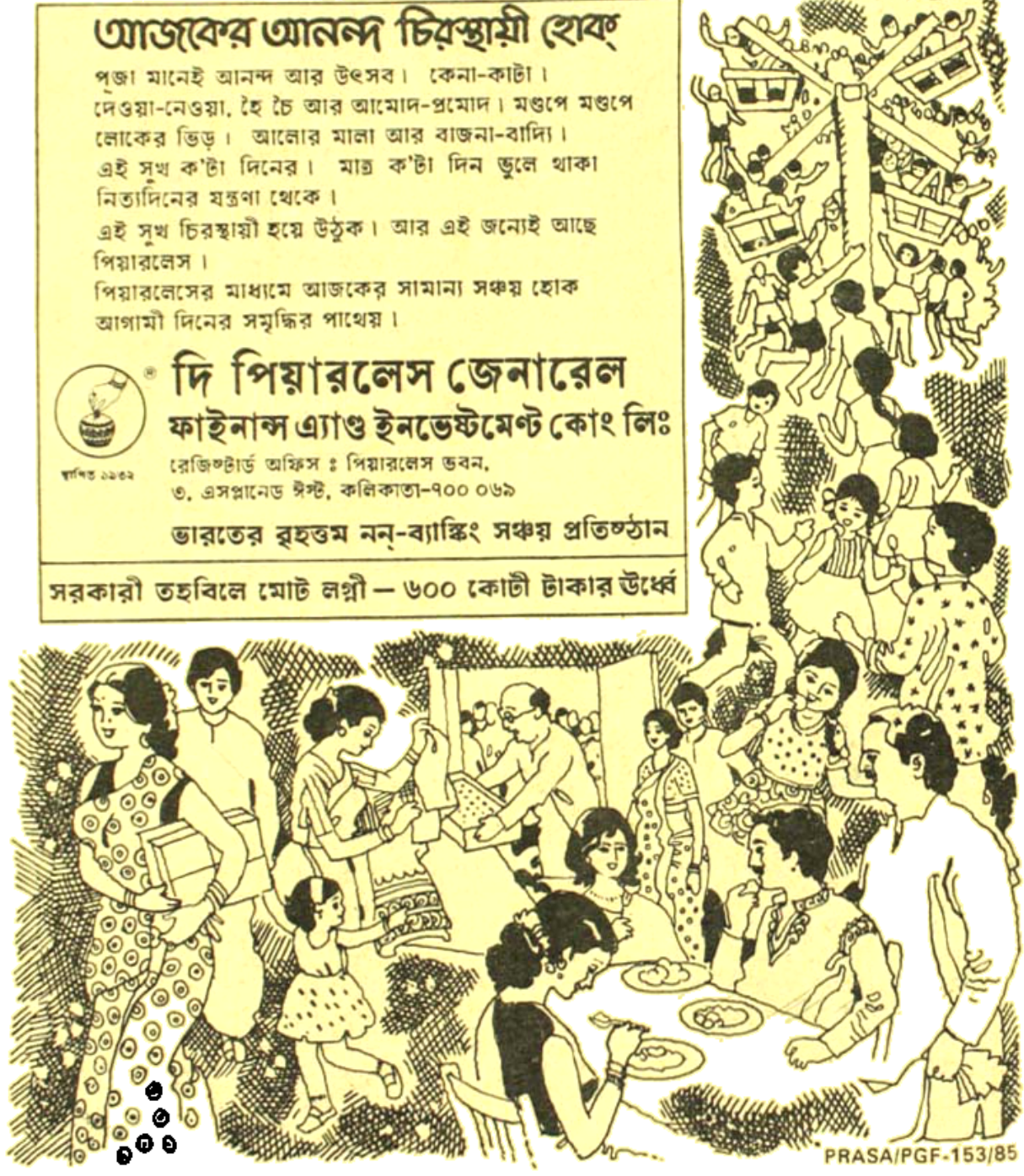

PRASA/PGF-153/85

যদি বলা যেত

অশোককুমার চক্রবর্তী

সবাইকে সব কথা বলা যায় না। যদি তা' যেত, তাহলে একটা বিরাট চেহারার নিত্য এ' সাজানো পৃথিবী।

'ইচ্ছে করছিল লোকটাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই। কিন্তু পরে নিজেকে সংযত করলাম। না, থাক। বলার দিন পেছে কোথায়? এক ঘায়ে শীত যায় না। সুযোগ ঠিকই আসবে।'

পথ চলতি কানে এল, ভদ্রমহিলা ভীষণ রেগে গিয়েছেন। রাগে একেবারে ফুঁসছেন। কিন্তু তিনি রসনা সংযত না করলে এবং তাঁর না-বলা বাণী বর্ষিত হলে, এখুনি যুদ্ধজয় করত বেঁধে যেত। আগুন নেভাতে দমকল আছে। কিন্তু কথার আগুন?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবার আগে খোঁজ পড়ে পেস্টের। যেখানে থাকার কথা সেখানে কোনও দিনই থাকে না। সহধর্মিণী রোজই আগে শয্যাত্যাগ করেন। বিছানা থেকে উঠেই পেস্টের টিউব এবং নিজের ব্রাশখানি নিয়ে সেই যে বাথরুমে ঢুকিকিনি তুলে গেলেন, কাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিশ্চিন্ত। এদিকে পতিদেবতা হানটান শুরু করে দিয়েছেন। বলা না খালি বাথরুমের তালিকে তার চেয়ে বেশি পেস্টের টিউবখানি ফিরে পেতে। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি—

—'নবাব নন্দিনীর কিছুতেই খেয়াল হয় না। রোজই এক ভুল। কেন রে বাবা, ব্রাশের মাথায় আলাজমতো পেস্ট বের করে নিয়ে টিউবটা বেসিনের পাশে রেখে গেলেই হয়। আঙুল পেয়ে পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। খেটে তো আর খেতে হয় না। বাপের বাড়িতে ছিলি তো এদো-পড়া তাড়া বাড়িতে। নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাট তোকে কে দেলোল? ঠানিটা দেখলে হাসি পায়।' পতিদেবতা পায়চারী থামালেন।

আরে, একি যা-তা কথা মনে আসছে। ভাগ্যিস কথাগুলো উচ্চারণ করে বসিনি। ছি ছি ছি। আমাকে কি নীচ ভাবতো। হয়তো, বলেই ফেলতো, তুমি সাংঘাতিক স্বার্থপর। তোমার স্ট্যাটাস বজায় রাখতে আমি সারাদিন কত কসরৎ করি। আর তুমি সাত সকালে একটু সামান্য ভুলের জন্য আমাকে কতগুলো কথা শোনালে। আমার বাবা গরিব কেরানী জেনেও আমাকে নবাবনন্দিনী বলে ব্যঙ্গ করলে। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে। নিজের প্রয়োজনের সময় যত আদর-ভালবাসা। কাজ ফুরুলেই সব মিথ্যে। তোমাদের পুরুষ জাতটাই এ'রকম।'

—'এই, লক্ষ্মীটি হাত বাড়িয়ে একটু পেস্টের টিউবটা দেবে?'

কি ভাবা আর কি বলা।

সবাইকে সব সময় সব কথা বলা যায় না। যদি যাউ যাউ ছলে ওঠে!

সকালবেলা কাগজ নিতে ইদানীং রোজই দেরি করছে ছেলেটা। একেকদিন তো ভুলেই মেরে দেয়। সারাদিনে কাগজ দেখা হয় না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে হতাশ। —'দুনিয়ার সব হকার পৌঁছে গেল। বড়লোকের ছেলের আর দেখা নেই। ওদিকে মাস পোহাতে না পোহাতে বিল হাতে হাজির। আসুক আজ। ওকে মজা দেখাচ্ছি। সামনের মাস থেকে ছাঁটাই। তাতে ছড়ালে কলকাতা শহরে কাকের অভাব?'

সাইকেল ঘন্টির শব্দে বারান্দায় ছুটে যেতে হয়। নিশ্চয়ই লাটসাহেব মন্টু।

—'বিভাসদা, লোড-শেডিংয়ের জন্য আনন্দবাজার লেট ছেড়েছে। আমি ঘুরে আসছি। আপনি বেরিয়ে গেলে বৌদির কাছে বিলটা রেখে যাবেন। ছাব্বিশটাকা পঞ্চাশ। এ'মাসে দু'দিন বন্ধ ছিল।' সাইকেল চেপে মন্টু নিজেকে যাওয়া।

'ঠিক আছে। রেখে যাব। বৌদির কাছ থেকে মনে করে চেয়ে নিয়ে যেও।'

বিভাসবাবু টাটকা কাগজখানি হাতে পেয়ে গলে জল। না-বলা বাণী না-বলাই থেকে যায়।

—'কি দরকার কথা বাড়িয়ে। ছাত্রজীবন হোক, বেকার ছেলে। ক'টা পয়সাই বা পায় বাড়ি বাড়ি কাগজ পৌঁছে। ওদিকে পাথার খাটুনি। দিন যায়, কথা থাকে।

মিনিবাস ছাড়ার আগে টুল হল, মানিব্যাগটা খাটে পড়ে আছে। অফিস বেরুবার সময় যা তাড়াহুড়ো। ফের ছেড়ে-দেওয়া বাস থেকে নেমে বাড়ি গিয়ে পার্স আনতে গেলে অফিসটাই কামাই হয়ে যায়। তাহলে উপায়? অফিসে পৌঁছতে পারলে অবশ্য কোনও অসুবিধেই নেই। এর-তার কাছ থেকে দু'চার টাকা নিলেই—

—'আরে মিসেস দত্ত যে। এই দেখুন না, কি মুশকিলে পড়েছি। তাড়াহুড়োয় পার্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। আমার অবশ্য কোনওদিন পার্স নিতে ভুল হয় না। আসলে, বেরুবার মুখে ছোট মেয়েটা এমন বায়না জুড়লো। আমার সঙ্গে ও অফিসে যাবে।'

—'ওমা, তাতে কি হয়েছে। আমি আসছি। এই যে ভাই কন্ডাক্টর—দু'টো একটাকা পয়সা।'

'আমারও কিছুদিন আগে ঠিক এ'রকম বিশ্রী হয়েছিল। সেটা অবশ্য অফিস যাবার সময় নয়। ফেরার পথে। আসলে, ক্যাথলিনে পেট্রির বিল পেমেন্ট করে ওদের আউট্রামের পয়সাটা রেখে ফ্রেঞ্চ পেট্রির প্যাকেটটা নিয়ে চলে এসেছি। পরে অবশ্য পেয়েছিলাম। কিন্তু বাস স্ট্যাণ্ডে এসে খেয়াল হল। অগত্যা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরলাম। মোটা বারো টাকা মিটার উঠল। অবশ্য আজকাল বাস-ট্রামের যা অবস্থা! আমার বরের তো সারাদিনে সত্তর-আশি টাকা ট্যাক্সির পেছনেই বেরিয়ে যায়। তাছাড়া, আমরা দুজনেই চাকরি করি। তাই অনেক কিছুই গায়ে লাগে না। আপনাদের তো শুনেছি, সামান্য যা আইনে যের তাতে পনের দিনও কালেভদ্রে চলে না—'

হি হি হি। মিসেস বসু, আপনি এভাবে বলতে পারলেন। আপনি যে কী, তা যদি বাসন্তবন্ধু লোক জানতো। চাকরি তো করেন মিসেস্‌পনিসেটের। তা-ও ইট কাত কোম্পানিতে। আপনার কোম্পানির মালিকের চরিত্র নিয়ে জলকে দেবার কত কথাই বেরুলো। আপনার ছুটি পাঁচটায়। কিন্তু আপনি রাত সাড়ে ন'টা দশটার আগে কোনওদিন বাড়ি ফেরেন না। আপনার স্বামী আজ করেন একটি সান্ত্বাহিকে। প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। সে সময় আপনি ফ্ল্যাটেও ফেরেন না। লোককে বলে বেড়ান, একা-একা ভাল লাগে না। তাই বাপের বাড়ি চলে যাই ও বাইরে গেলে। সেবার আপনার ভাই আপনার খোঁজে এসেছিল। আপনার স্বামী তখন অফিসের কাজে কোচবিহার না কোথায় গিয়েছিলেন বোধ। আপনি কোথায় যেতে পারেন তা জানতে আপনার ভাই আমাদের ফ্ল্যাটে এসেও জিজ্ঞেস করেছিল আমার স্ত্রীকে। বাপের বাড়ি ছাড়া এ'শহরে রাত কাটানোর জায়গা আপনার নেই—এ'কথা আপনি আমার স্ত্রীর কাছে গতবার বিজয়া দশমীতে এসে বলেননি? ক্যাথলিন থেকে পেট্রি, জলযোগ থেকে কেক এসব আমরাও কিনে থাকি। তবে রোজ নয়। জোড়াতিথিতে। টিফনও কোম্পানির মালিকের নেক-নজরে না থাকলে ফ্রেঞ্চ মিসেস্‌পনিসেটের চাকরি করে আপনাকে অত মিনিবাসে ঝুলতে-ঝোলা যেতে হতো না। আপনার স্বামী যে দিনতোর ট্যাক্সিতে টহল দেবার, সেটা ওই সান্ত্বাহিকেরই মালিকের পয়সায়, বুঝেছেন?

যাঃ, এসব কথা কি কাউকে বলা যায়?

—'যা বলেছেন। মাসেই সরকারী চাকরি। আউট্রোটা ফি-এ বাকি। তাছাড়া পুজোয় কোনও বোনাস-টোনাস নেই। বাড়িতে এ'দিয়ে রোজ অশান্তি। আপনাদের তো কর্তা-গিন্নী দুজনেরই পুজো-বোনাস। নিউমার্কেট গিয়েছিলেন নাকি?

'না, এখনও সময় করে উঠতে পারিনি। তবে যেতে হবে। ছেলে-মেয়ে দুটোকে শুধু দিলেই তো হবে না। আমার আবার রাজ্যের লোককে দেওয়া-থোওয়া। কি করব। বছরে তো একবারই পুজো আসে। সবাই আমাদের কাছে আশাও করে। আপনাদের কথা জানি, দেড়শ' টাকা এপ্রোপ্রিয়েশন কি হয়? আমার বর তো দেড়শ' টাকা মিটারের নিচে প্যান্টের কাপড় ছুঁয়েই দেখে না।'

আচ্ছা, চলি নমস্কার।

মিনিটে এসেও অফিস মোট। যা ট্রাফিক জ্যাম। কলকাতায় বাস করা অসহ্য। মনে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে কোথাও—

'বিভাসবন্ধু ঘড়ির কাঁটা ছয় ছোঁয় না করলে অফিসে ঢোকেন না। আচ্ছা, আপনার ফ্রেঞ্চ কি করে সেট হয়? আসলে, আপনি বাড়ি থেকে বেরোন দেরি করে। অফিসের কথাটাও একটু ভাবুন।'—

—'কতদূর থেকে আসতে হয়, সেটাও একবার ভেবে দেখুন। সেই ডালহাউসি—'

'সেটা কোনও কথা নয়। দেরিতে লালবাজার থেকে ফেরি পারমেশানি করছে। তখনই থেকে বেরিয়ে সাড়ে দশটায় হাজিরা দিতে। আপনার তো তাও ডালহাউসি—।'

বেশ, বেশ বলে যান। মিঃ সেন, আপনি কি আমার চেয়ে নিজেকে বেশি ডিউটিফুল মনে করেন নাকি? মাসের মধ্যে ক'দিন আপনি ফুল টাইম অফিসে থাকেন? আসেনই বা ক'দিন সাত সকালে? আমি তো শুধু একটা টাইম মেনে চলি। কিন্তু আপনি? নিজের খেয়াল খুশি মতো অফিসে আসেন, যান। ভেবেছেন আমি কিছু মনে রাখি না। নিজের বেলায় ঔটিওটি, পরের বেলায় দাতকপাটি। অফিসের যত বড়ি-কাজের সবই তো আমার আর সুশোভনবাবুর ওপর। কাজের ক্রেডিটটা কিন্তু আপনি আগ বাড়িয়ে ফোল আনা বুঝে নেন। পদে পদে আমাদের সি-এল নিতে হয় ব্যক্তিগত কাজ থাকলে। আর আপনি?

সবাইকে সব কথা বলা যায় না। কেননা, কথার আগুন নেভাবার কোনও দমকল নেই। কে ঠিক, আর কে যে-ঠিক সেটাই বা বলে দেবে কোন্ কম্পিউটার? অতএব—।

—'ইদানীং টালা ব্রিজে সাংঘাতিক জ্যাম হচ্ছে। সেটা নিজেই অনেকের আনন্দবাজারে কমেন্ট পেয়ে খবর তো দেখেছেন। তাছাড়া, আপনি কাস্ট আওয়ারটা যেমন সামলান, আমাকেও তেমনি শেষ পর্যন্ত দেখে সব দিক দেখে—। একটু-আধটু তো সহ্যকরেই ছাড়তে হয়।'

যে পারে, সে পারে। কথা বলাটাও এক ধরনের আর্ট। গুছিয়ে কথা বলতে পারলে তর্কেনেও আশাত মধুর সাদে। আবার ভাল কথা, বলার দোষে তেতো ও যায়।

দু'বছর আগে পুকুর বোজানো জমিতে শিলার দিয়ে রাতারাতি তিনতলা বাড়ি উঠে গেল পাড়ায়। তা দেখে প্রতিবেশীদের চক্ষু ছানা বড়া। এত পয়সা লোকটার এল কোথা থেকে?

—'এই যে, কমলবাবু, তবে গৃহপ্রবেশে যাচ্ছি। আপনি যা দেখছেন মশাই, পাড়ার লোক তো একেবারে তাজ্জব বনে বসে আছে। একতলা-দোতলা নিশ্চয়ই তারা দেবেন?

'গৃহপ্রবেশে খাওয়াব, পয়সা কোথায় মশাই? তাছাড়া, পাড়ার লোককে মিথিমিথি খাওয়াতে যাবো কেন্ দুখে। আমি মশাই না খেতে পেলে কেউ কি আমার ভেঁজ নিতে আসবে। বড়জোর দু-ঘরে লোকের বাস এখানে। তত্রলোক কটা?

কমলবাবু, জানতে পারি কি, আপনার অভিধানে ভদ্রলোকের সংজ্ঞা কি? দু-ঘরেই যা আপনি বললেন কয়জন? আপনি একজন সরকারী কর্মচারী হয়ে এ'রকম একটা তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ি হাঁকালেন কি করে? পাড়ার লোকরা অতশত জানেন না, আপনি না সিনেট সেলের একজন ডুয়ে ইনস্পেক্টর? পাঁচশ' টাকার নিচে আপনি ঘুষ ধরেন না। অফিসে আপনার টিকি দেখতে পায় ক'জন? আপনার সহকর্মীরা আপনাকে পে-ডে ছাড়া আর কবে সীটে দেখেছে? আপনার বলের বৌকে কি আপনি বাড়ি ধরে নিয়মিত ইংরেজী ছবির শোয়া শোয়া টিকিট পৌঁছে দেন না? এ' আর কি এমন দেখের। এ' যেন আরও কত নীচে নামে মানুষ নিজের কার্ব সিদ্ধির তাগিদে।

যা, এসব কথা কমলবাবুকে কখনও বলা যায় নাকি? শুধু গলদঘর্ম দেখিয়ে বলতে হয়: যা বলেছেন, গৃহপ্রবেশ আবার কি। এ'বাজারে দু-ঘরেরও ছেলে এনে পাতা পেতে খাইয়েই বা কি লাভ? যজ্ঞে সব—।'

আসলে এ'সংসারে বলার চেয়ে না-বলা কথাই বেশি।

এক ধরনের কথা, যা শুধু নিজের জন্যই শোনে, তা নিয়ে আলাদা রামায়ণ মহাভারত বছরে লিখে ফেলা যায়। আশ্চর্য, সৌদিন পৃথিবীতে মানুষ যত পুরনো হচ্ছে, ততই তার মন আর মুখ আলাদা হয়ে পড়ছে।

ভরদুপুরে কলিং বেলের শব্দে সুখ নিদ্রার বিভোর যজ্ঞীর একবার বিরক্তি: 'এই অসময়ে কে আবার জ্বালাতে এল?' দরজা খুলে দিয়ে মনের কথাকে আড়াল করে ওঁকেই কিন্তু বলতে শোনা যায়, 'তাতে কি হয়েছে? আসুন, আসুন—। ভেতরে আসুন।'

সবাইকে সব সময় সব কথা বলা যায় না। বলা উচিত হবে না ভেবেই মনে এসেও সেসব কথা কখনই মুখে আনা যায় না। কিন্তু যদি বলা যেত?

হাতে এখনো সাতদিন

শেখর বসু

অফিস থেকে বেরুবার মুখে বাইরের সবকিছু আলাদাভাবে চোখে পড়ে। বাইরের বাতাস অনুভব করতে পারি আলাদা করে। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে পুরনো এক অভ্যাসের মধ্যে মিশে যায়। নিছক এক অভ্যাসের বশেই বাসস্টপের দিকে হেঁটে যাই। দুপাশে জনস্রোত, কিন্তু কাউকেই তখন স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না। আজ একটা অন্য ধরনের ঘটনা ঘটল, কে একজন হঠাৎ আমার হাত টেনে ধরে বলল, "আরে শেখর তুই!"

পুরনোদিনের কাউকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ও মৃদু উত্তেজনা ভদ্রলোকের চোখমুখে ঝলমল করছিল, কিন্তু ওঁকে কিছুতেই চিনে উঠতে পারলাম না আমি।

ভদ্রলোক আমার হাত আর ছাড়লেন না, ভিড় এড়াবার জন্যে ফুটপাথের ধারের বটগাছটার আড়ালে টেনে নিয়ে এসে বললেন, "কদ্দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। তা প্রায় বছর-পনেরো হবে, তাই না?"

খতমত মুখে হাসবার চেষ্টা করলাম আমি। চেনার সামান্যতম চিহ্নও ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে খুঁজে পেলাম না, তবে আমার নাম ধরে ডেকে তুই-তুই করে এভাবে যখন কথা বলছেন তখন একসময়ে নিশ্চয়ই খুব চেনাশোনা ছিল। বন্ধুই হবে। বন্ধু না হলে কথা বলার ধরনধারণ অন্যরকম হত।

আমার এই পুরনো বন্ধু তার এক পুরনো বন্ধুকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলার আনন্দে এতই মজে গিয়েছিল যে, আমার খতমত ভাবটা ও গ্রাহ্যই করল না। হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বলল, "তারপর? কী করছিস এখন?"

আমি বোকার মতো হেসে বললাম, "কী আবার করব, সামান্য চাকরিবাকরি-।"

"কোথায়?"

"লাইটার্সে।"

"সরকারের লোক।"

"আর সরকার!"

পাগলের মতো মনে মনে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম আমি, কিন্তু কোথাও ভদ্রলোককে খুঁজে পেলাম না। ভদ্রলোক নয়, বন্ধু, নিশ্চয়ই পুরনো দিনের ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু। হয়তো এই বন্ধুর চেহারাটা অনেকখানি পালটে গেছে, যায় তো, যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমি চট করে আবার বন্ধুর মাথার দিকে তাকালাম, টাক পড়লে অনেকের চেহারা পালটে যায়, কিন্তু আমার এই বন্ধুটির মাথায় তো তেমন টাক পড়েনি।

বন্ধু বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে।"

সিগারেট নিলাম।

লাইটারের আগুনে দুটো সিগারেট জ্বালল সামনা আগে-পরে।

আমার অচেনা বন্ধু একমুখ ধোঁয়া হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বলল, "বিয়ে করেছিস তো?"

"না।"

"সে কী রে, সত্যিই করিসনি?"

আমি হাসতে হাসতে মাথা নাড়লাম দুদিকে।

আমার বন্ধু সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক ভাবটা সারা মুখে বজায় রেখে বলল, "সে কী রে! বাঙালীর ছেলেরা তো মুক ঘুরিয়ে একটা জিনিসই করতে পারে, তুই তাও করিসনি।" বলেই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল।

ওর ওই হাসির মধ্যেই কোনরকমে বলে ফেললাম, "তুই বিয়ে করেছিস?"

আমার বন্ধু হেসেই যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে মুখ করে 'তুই' বলে ফেলতে পারার জন্যে আমার মধ্যে সামান্য একটু আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আমার পুরনো বন্ধুকে ঠিক চিনে ফেলতে পারব।

আমার বন্ধু ওর হাসিটাকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে অতঃপর বলল, "শুধু বিয়ে, ছোট্ট একটা কনেনি বানিয়ে ফেলেছি। আমার একটা বউ, চমৎকার বউ। কেন এখনো প্রেম করিনি।"

আমি হাসার ভান করে আর একবার আমার বন্ধুকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিলাম, কিন্তু সামান্য-পরিচিত কোনো মানুষের আদলও ওর চেহারার মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

বন্ধু আমার কাঁধে হাত রেখে পুরনো বন্ধুর যাবতীয় উত্তাপ গলায় ঢেলে বলল, "তুই কি এখনো সেই শ্যামবাজারের বাড়িতেই আছিস?"

"আর কোথায় যাব!"

"ও, ওটা তো তোদের নিজেদের বাড়ি।"

"বাড়ি নামেই, কেননা ছাদে মাথা গুঁজে থাকতে পারি, এই যা-।"

আমার বন্ধুর মুখ হঠাৎই কেমন যেন স্মৃতিচারণের হয়ে উঠল। "তোদের বাড়ির সেই ছাতের ঘরটার কথা এখনও আমার মনে পড়ে। ওহ্। কী আড্ডাই না হত। তারপর ওই ঘরের জানলা থেকে-কী যেন নাম মেয়েটার, কুসুম না?"

আমি এবার রীতিমত চমকে উঠে বললাম, "হ্যাঁ-হ্যাঁ কুসুম।"

"কুসুম বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।"

"অনেকদিন।"

"ভারী সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটাকে। ওকে বিয়ে করে ফেলতে পারলে তোকে আজ আর রাস্তায় ল্যা-ক্যা করে ঘুরতে হত না।"

হেসে ফেললাম। "আমি রাস্তায় ল্যা-ক্যা করছি, কে বলল তোকে?"

আমার অচেনা বন্ধু আর একদফা হেসে নিয়ে বলল, "সে তোর চলার ধরন দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

"আমার চলার ধরন তো ধরাবরই এইরকম।"

"মোটেও না, আগে তোর সঙ্গে হাঁটতে গেলে ছুটতে হত। আর এখন-তখন থেকে দেখছি কেমন যেন গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছিস।"

হাসবার চেষ্টা করলাম। "ভিড়ের রাস্তায় তো এর চেয়ে জোরে হাঁটা যায় না।"

আমার অচেনা বন্ধু যেন খোলামেলা গলায় হেসে উঠে বলল, "আরে বাবা ভিড় তো তখনও ছিল, সন্ধের শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে ভিড় থাকত না?"

পুরনো বন্ধুর গলায় আবার স্মৃতিচারণের আবেগ। "আচ্ছা, একতলার বারান্দার খাজরা আলসেটা এখনও আছে, তাই না?"

সুযোগ বুঝে বন্ধুকে চেনার জন্যে অন্ধকারে একটা ঢিল ছুড়লাম আমি। "তুই কি এখন অন্য কোথাও চলে গেছিস নাকি?"

"আমি? আমার পাঁচবার বাড়িবদল হয়েছে, তবে লিস্টিরই পার্মানেন্ট একটা অ্যাড্রেস হবে সল্ট লেকে।"

"বাড়ি বানিয়েছিস?"

"পাগল অত পয়সা কোথায়! ধারদেনা করে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি

বিজ্ঞাপনদাতার। চ্যাটার্জী এন্টারপ্রাইজেস্ ২, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৪

কোনোমতে। সামনের মাসে পজেশন নেব, তোকে নিয়ে যাব একদিন।"

"নিয়ে যাবার কী দরকার, ঠিকানা দিলেই পৌঁছে যাব।"

"পাগল, সল্ট লেক একটা গোলোকধাঁধা। আমি নিজেই নিজের বাড়ি খুঁজে বার করতে পারি না সব সময়। সেদিন কী হয়েছিল জানিস-।"

আমার অচেনা বন্ধু যখন তার বাড়ি খুঁজে না পাওয়ার মজাদার গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলছিল আমি ওকে চিনে ফেলার চেষ্টা করছিলাম প্রাণপণে। চেনার চেষ্টা শুধু নয়, একে বলে রীতিমত তদন্ত। আমার এই বন্ধু বহুকাল আগে আমার বাড়িতে যাতায়াত করেছে, তার মানে ও নির্ঘাত আমার স্কুল-কলেজের বন্ধু। স্কুল-কলেজের যেসব বন্ধু আমাদের বাড়িতে খুব যেত তাদের প্রত্যেকের মুখ আমি আলাদা-আলাদা করে দেখার চেষ্টা করলাম। কী সহজে কত চেনা মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল কিন্তু সামনের এই মুখটার সামান্যতম আদলও তাদের মধ্যে কোথাও নেই। কিন্তু খুঁজে বার করতেই হবে। এমন সময় আমার বন্ধু হঠাৎ সেল ক্লাবের কথা তুলতেই আমার তদন্তের সুতো ছিঁড়ে গেল। স্কুল-কলেজের দিনে সেল ক্লাবের তো কোনো চিহ্ন ছিল না, তাহলে এ কি আজের অন্য কোনো জায়গার বন্ধু! কিন্তু তাই যদি হয় ও আমাদের ছাতের ফ্ল্যাটের সেই আড্ডার কথা বলল কী করে?

অচেনা বন্ধু স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছিল একনাগাড়ে। ওর কথা শুনতে পুরনো দিনের কত কথা ঝলমলকরে উঠছিল চোখের সামনে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, একে আমি চিনতে পারছি না কেন! ভেতরে ভেতরে রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, তবে কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছিল আর একটু পরেই ঠিক চিনে ফেলব। এই মনে হওয়া থেকেই সান্ত্বনা একটু জোর তৈরি হ'ল মনের মধ্যে। বললাম, "চ কোথাও গিয়ে একটু বসি, চা-টা খাওয়া যাক।"

আমার বন্ধুর গলায় স্মৃতিচারণের আবেশ ছিল, সেই আবেশ নিয়েই ও বলল, "না আজ না, একুণি ইলকাম ট্যাক্সের এক উকিলের কাছে ছুটতে হবে। না গিয়ে উপায় নেই। সামনের রোববার সকালে তুই বাড়ি থাকবি তো?"

"থাকবো।"

"ঠিক আছে রোববার সকাল দশটা নাগাদ তোর বাড়িতে যাচ্ছি। আমার বন্ধু পুরনো বন্ধুত্বের উত্তাপ আর একবার আমার হাতের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

বন্ধুর চলে-যাওয়াটা আমি দেখলাম। ভারী শরীর নিয়ে সামান্য একটু দুলে-দুলে চলা। এই চলার মধ্যে অতীতের কোনো কিশোর বা সদ্যযুবকের ছাপ নেই, অন্তত আমার চোখে তা পড়ল না। তবে পুরনো সেই আত্মবিশ্বাস একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ল আমার মধ্যে। এখনো ওকে চিনতে পারিনি, কিন্তু ঠিক পারব। আজ মঙ্গলবার, সামনের রোববার আসতে এখনও চারটে দিন বাকী, এই চারদিনের মধ্যে আমি আমার এই পুরনো বন্ধুকে ঠিক চিনে ফেলব।

বাড়ি ফেরার পথে ঝলমলে পুরনো দিনগুলো পরের পর উঠে আসতে লাগল চোখের সামনে। দিনগুলো কী সুখের ছিল তখন! এখন ঠিক তার উলটো। এখন কত ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়, কত ভেবেচিন্তে চুপ করে থাকতে হয়। এখন উদ্বিগ্ন হয়ে আড্ডা মারতে যাই, ফিরে আসি আরো উদ্বিগ্ন হয়ে।

পুরনো দিন, পুরনো দিন; পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম আমি।

কী অসাধারণ ছিল দিনগুলো! প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যেত কী আনন্দে! ঝলমলে দিনগুলোর সামনে-পেছনে আর কিছুই ছিল না। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, সমস্যা ইত্যাদি শব্দগুলোকে সম্পর্কহীন অভিধানের শব্দ বলে মনে হত শুধু। কে একজন বিখ্যাত মানুষ বলেছেন ওই বয়েসটা এমনই যে, যে-কোনো বয়েসের মানুষকেই তখন সমবয়সী বলে মনে হয়। তাই কি? ওই বয়েসে কত জন তো কতরকম কাজ পায়। কিন্তু আমার কোনো কাজ ছিল না, কাজ ছিল না আমার কোনো বন্ধুরও। দিনগুলো হুড়মুড় করে কেটে যেত। সকালে চোখ খোলার পর থেকে রাত্তিরে চোখ বন্ধ করার আগে পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের ওপর দখল ছিল আমাদের। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতাম, তার সব কটাই ছিল রোমহর্ষক পছন্দসই।

আমার অচেনা পুরনো বন্ধু পুরনো দিনের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিয়েছিল উদারভাবে। কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো স্মৃতিচারণ করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। নেশা কাটলে মনে হল ছেলেমানুষি শুরু করে দিয়েছি। কয়েকদিন আগে কাজে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। পঞ্চাশ-পেরোনো সকল ওই মানুষটি যেন জোর দিয়ে বলেছেন, সুখের দিন তিনি কখনোই পেছনে ফেলে আসেননি। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব! আচ্ছা, পুরনো দিনের কোনো বন্ধু যদি ওঁকে পুরনো দিনের কথা ঠিক এইভাবে মনে করিয়ে দিত, কী মনে হত ওঁর। আর তারপরেই যদি ওঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হত:

আমার পুরনো বন্ধু আমার চারপাশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল যে, চিন্তাভাবনাগুলো কেমন যেন লাগামছেঁড়া হয়ে গিয়েছিল। যা ভাবার নয় তাই ভাবছিলাম, ভাবতে খারাপও লাগছিল না, কিন্তু আমার ওই পুরনো বন্ধুকে কেন চিনতে পারছি না এখনও। তবে চিনতে না পারার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না আর, রোববার আসতে এখনও আর চার-চারটে দিন বাকি, এই চারদিনের মধ্যে আমি আমার পুরনো বন্ধুকে চিনে ফেলতে পারব ঠিক।

কাজের চাপে চারটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল।

রোববার সকালে ঘুম ভাঙতেই আমার বুক কেঁপে উঠল হঠাৎ। আমি তো আমার ওই পুরনো বন্ধুকে চিনতে পারিনি এখনও। অবশ্য, একটু পরেই ও আসবে।

সেদিন রাত্তিরে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। চুঁ-চ্যাঁ করে কোনোরকমে পার পেয়ে গিয়েছি। তাছাড়া সেদিন বহুকাল বাদে পুরনো বন্ধুকে আবিষ্কার করার উত্তেজনা ছিল ওর মধ্যে। আজ দ্বিতীয় দিন, দ্বিতীয় দিনে নির্ঘাত সেই উত্তেজনা থাকবে না। বাড়িতে বসে রোববারের আড্ডা শুরু হলে সে আড্ডা গড়াবে বহুক্ষণ। ততক্ষণ কারও পক্ষে স্রেফ আন্দাজে কথা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই শীতের সকালেও আমার হাত-পা কেমন যেন ঘেমে উঠল। আজার পুরনো বন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলবে আমি ওকে চিনতে পারিনি! ছিঃ ছিঃ এর চাইতে লজ্জার আর কী থাকতে পারে!

আমি আমার সারা শরীর আর মন একটি মাত্র বিন্দুতে নিয়ে এসে আমার ওই পুরনো বন্ধুকে চেনার শেষ চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই চিনে উঠতে পারলাম না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দশটা বাজতে এখনো ঘণ্টাদুয়েক বাকি। দশটায় আমার বন্ধুর আসার কথা। অস্থির হয়ে পড়লাম আবার। বন্ধুকে চিনে ফেলার ঝুঁকি নেওয়া আর যেহোক ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পালটে চোরের মতো বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

টো-টো করে এদিক-সেদিক ঘুরে পোটাতিনেক চায়ের দোকানে ঢুকে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরলাম যখন তখন প্রায় একটার সময়।

বাড়িতে পা দিতেই বুক কেঁপে উঠেছিল নতুন করে। মনে হচ্ছিল বসার ঘরের দরজার সামনে একজোড়া অপরিচিত জুতো দেখতে পাব। কিন্তু না, চোখের সামনে কোথাও কোনোরকম অপরিচিত চিহ্ন নেই। সারা বাড়ি অদ্ভুত রকমের শান্ত।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ এসেছিল?"

মা বলল, "না তো।"

শুনে খুব স্বস্তি পেলাম। মনে হল, আমার অচেনা বন্ধু নিশ্চয়ই কোনো দরকারী কাজে আটকে গিয়ে আসতে পারেনি আজ। আজ যখন আসতে পারেনি সামনের রোববার নির্ঘাত আসবে। তার মানে আমার হাতে এখনো সাতদিন সময়। পুরনো সেই আত্মবিশ্বাসটা ফিরে এলো আবার, এই সাতদিনের মধ্যে আমি আমার পুরনো বন্ধুকে ঠিক চিনে ফেলতে পারব।

শেষ নারী

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

আমাদের মধুচন্দ্রিমা ছিল সেটা। আমি আর ইন্দ্রাণী সিনর পিকে গাড়ি থেকে নেমে সেই ভয়াবহ খাদের ধারটায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। খাদটা সড়সড় করে কয়েক সহস্র ফুট গড়িয়ে গেছে, এবং শেষ বস্তি কোনও সমতলে মিলিত হওয়ার আগেই আমাদের দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেছে। খাদের ওপারে আরেক পর্বতশৃঙ্গ এক নীল ধোঁয়ায় লীন, ওপরের আকাশ যেন কিছুটা তার সামনে আর কিছুটা পিছনে ঝুঁকে আছে। এরকম আকাশ জড়ানো পর্বতশৃঙ্গ সবখানে সব সময় দেখা যায় না।

আমার নিজেকে খুব সুখী-সুখী লাগছিল, এবং কিছুটা দুঃখী-দুঃখীও। সুখী, কারণ দূরের পাহাড়, কাছের পাহাড়, ওপরের আকাশ, নিচের খাদ ও জলপ্রপাত এবং পাশের ইন্দ্রাণী সবই মিলেমিশে আমাকে আনন্দের পূর্ণকলস করে তুলতে প্রস্তুত। আমার আর কিছু চাইবার বাকি থাকছে না। পরক্ষণেই কিছুটা দুঃখীও, কারণ পূর্ণ আনন্দের মুহূর্তে আমার হয়তো উচিত ছিল খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে সেটাকে স্থায়ী করা, যা আমি পারছি না। পূর্ণ আনন্দকে সীমিত, সমাপ্ত, বৃত্তাকার করবার স্বার্থপর প্রবণতা মানুষের, প্রাচীন রোমানরা যার চরম অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন। যা না পারলেই দুঃখ, সুখের ক্রম অবক্ষয়।

এরকম একটা অনুভূতির প্রত্যয় আছে ব্রাউনিঙের 'দা লাস্ট রাইড টুগেদার' কবিতায়। আমার কিন্তু এই স্বার্থপর পূর্ণ, অনন্ত সুখে কোনও বিশ্বাস নেই। সম্ভবত প্রাচীন রোমানদেরও কারও কারও ছিল না; তাঁরা চাইতেন আত্মহত্যাকে একটা চরম উল্লাসনাময় অভিজ্ঞতা হিসেবে ব্যবহার করতে, সাপের কামড়, অধিক মাত্রায় আফিম, এল এস ডি বা ঘুমের বড়ি নেওয়ার মতন। আমার দুঃখটা ছিল সিনর পিকের ওই ভয়াবহতা সুখটাকে কিছুটা নেড়েচেড়ে দেখতে না পাওয়ায়। বিশাল প্রকৃতির মধ্যে একটি মাত্র নারী, তাও নিরস্ত্র, এই দৃশ্য ও বাস্তব আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করছিল। ইন্দ্রাণীকে সেই মুহূর্তে জীবনের শেষ নারী বলে মনে হচ্ছিল আমার। রোমানদের মতন পূর্ণ আনন্দের পূর্ণ সঙ্গটি আমার ভয় করলে হয়তো ইন্দ্রাণীর হাত ধরে অপরূপ খাদের মধ্যে মিলিয়ে যেতাম সেদিন।

সে এক আশ্চর্য সুখ সেদিনের যা আমার সমস্ত দুঃখবোধকেও পেরিয়ে যায়। আমার কিছু কিছু দুঃখবোধ এত সুখের যে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে ঘুমের মধ্যেই জেগে উঠতে হয় আমাকে। আমার এরকম আরেক দুঃখময় দিন প্যারিসের গার দু নর অর্থাৎ উত্তরের স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ফ্রান্সকুল শহরের দিকে পাড়ি দেওয়া। ট্রেনের বিশাল কাচের জানলার পাশে আমি আর ইন্দ্রাণী আর বাইরে সবুজ ফসলাদি পল্লী ফ্রেঞ্চদের মতো উঁচু-নিচু আন্দোলনে ঘুরে নীল দিগন্তে মিশে গিয়েছে। এও স্বেচ্ছাই এক পরিবেশ যখন পাশের নারীটির সম্পূর্ণ দখলের জন্য ব্যাকুল হয় প্রাণ। সময়, পরিসর এবং দূরত্বকে নিজের মনের মতো ক্ষয় ক্ষয় করে ছেড়ে দেখতে চায় মানুষ এবং যেন সেই স্বার্থপর পূর্ণতার প্রবণতার ঘটনাটিকে সীমিত, সমাপ্ত করতে চায়। বলা বাহুল্য, একটা সময়ে ট্রেন ফ্রান্সকুল পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু ঘুম থেকে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে উঠে সেই মায়াকে আমি অসম্পূর্ণ স্বপ্নের মতো নিজের কাছে পল্লবিত রাখি। যা আসলে এক সুখময় দুঃস্বপ্ন।

আমার চাহিদা আমার নারীকে সীমিত, শেষ নারী করে। নারীলগ্ন আমার কাছে তৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠার সম। একই নারী আমার কাছে একেক দিন একেক নারী, অর্থাৎ প্রতিদিনই একেকটি শেষ নারী। নারীর ওপর আমার স্বত্বাধিকার একই সঙ্গে সীমিত করে আমার নারী এবং আমার ব্যক্তিত্বকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধারাবাহিক প্রেম বলে কিছু নেই, প্রতিবার, প্রতিক্ষেত্রে আমি নতুন করে হয়তো একটি পুরাতন প্রেমকেই সৃষ্টি করছি এবং সেভাবে একই নারীকে এক সমাপ্ত, অস্তিত্বে সম্পূর্ণ করছি। ব্রাউনিঙের 'পরফিরিয়াজ লাভার' কবিতাটি আমাদের নিরবধি জাগ্রত প্রভুত্বের, স্বত্বাধিকারের এক রঙিন, করুণ, ব্যঙ্গময় ছবি।

বিবাহবন্ধন একেকটি শেষ নারী সৃষ্টির প্রয়াসমাত্র। পরিহাস এই যে, বিবাহ নারীসত্তের পূর্বতন স্মৃতিকে একেক সমাজের একেক মূল্যবোধ ও মূল্যায়নে সীমিত করে। বিবাহবন্ধন বিবাহিতার নারীত্বকে সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রঞ্জিত, রূপায়িত, বিশ্লিষ্ট ও বিকীর্ণ করে, বিবাহে প্রায়শ একটি নারীর মৃত্যু হয়ে অপর একটির জন্ম হয়। কন্যাদান, স্ত্রীসম্মান ইত্যাদি আর্থনৈতিক দ্যোতনাময় সংসারে—নারী সম্পর্ক অনুচ্চারিত শব্দের জন্ম এভাবে। আমাদের সমাজে অন্তত বিবাহ পুরুষকে তার নারীকে অধিকারের অধিকার দেয়, নারীকে অধিকৃত হওয়ার অধিকার। আমাদের অধিকারে একটি নারী পূর্ণ, সম্পূর্ণ, নিঃশেষিত, শেষ নারী হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমারা বিবাহের মাধ্যমে অধিকার করি এক পূর্ণ অনস্তিত্বকে।

সেভাবে দেখলে আমরা পুরুষরা অধিকারে খুব একটা পারঙ্গম নই। নারীর শরীরের অধিকারী আমরা তার মনের কাছে প্রায়শই দাস। তার থেকে মুক্তির এক বহুব্যবহৃত পথ হ'ল ব্যভিচার, অর্থাৎ বহু তরল সম্পর্কে আংশিক হয়ে একটি বিশেষ, সুদৃঢ় সম্পর্কের বিড়ম্বনামোচন। ব্যভিচার সব সময়ই বিবাহের উপাদান বা যাত্র নয়, কখনো কখনো তার অনিবার্য প্রতিদান। বহু নারীতে আসক্ত পুরুষ একজনকে স্ত্রীকে অজ্ঞান মনে গড়ে তোলে একজন শেষ নারী হিসেবে। তার নারীকে অধিকারের প্রক্রিয়ার একজনে পল পল নিঃশেষিত হয়ে যায় বহু পুরুষও।

শুধু সীমিতকরণের স্তরে শেষ নারীকে সংযুক্ত রাখা হলে শেষ নারীর ধারণাকেও সীমিত করে ফেলা হবে। নিরালম্ব স্বাধীনতাও নারীকে নিঃশেষিত করতে পারে। বর্ণীসূত্রের অন্তত সুখী গৃহিণীদের অভাব স্বাধীনতা, পারতন্ত্রকে কিছু না করার স্বাধীনতা কিংবা সাহচর্যের, অকিঞ্চিৎকর গার্হস্থ্য দায়িত্ব সম্পাদনের স্বাধীনতা, তাদের ব্যক্তিত্ব হরণ করে। পারিপার্শ্বিক প্রলয় সুখের বাইরে কিছু চাইবার বা আকাঙ্ক্ষা করার মেধাও তারা হারিয়ে ফেলে এবং, এক সময়, সমস্ত স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজের পরিস্থিতির দাস হওয়াটাই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানতায় মেনে নেয়। তারা প্রজননে মতি দেয় যাতে অন্তত তাদের জৈবিক সক্রিয়তা ও গুরুত্ব বজায় থাকে। নিজের ভবিষ্যৎ তারা অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, সেই সন্তানদের মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ খুঁজে নেয়। তারা নিজেদের নিঃশেষ করে একটা গুরুত্ব জানায়। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধ তা হচ্ছেও এক জাতীয় শেষ নারীর জন্ম হয়, যার এক আধুনিক উদাহরণ শুনেছি শুভর্ণা সেনের 'পরমা' ছবির নায়িকা পরমা (ছবিটি নিজে অবিশ্যি দেখিনি এখনও)। একেবারে ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে প্রথানত জৈব তাড়নায় এক শেষ নারীর বিকাশ আমরা দেখেছি হলস্তরের 'আনা কারেনিনায়'। ইসমুর বার্গমান নারীর স্বাধীনতা ও সীমার এক নিকৃত, পরে প্রকাশ্য, রূপ দেখিয়েছেন তাঁর 'দা টাচ' ছবিতে। তবে সেভাবে দেখলে তাঁর যাবতীয় চলচ্চিত্র জুড়ে নায়িকারা একেকটি শেষ নারী, স্বাধীনতা ও সীমাবন্ধনে।

নারী সুখে সুখী কথাটা বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নয়। খৃস্টীয় মতের প্রথম নারী হবা (ইভ) আদলে চিরসুখের নন্দনকাননে আপন ইচ্ছায় শেষ নারী হতেন না। আরও আশ্চর্য, হবা অধঃপতিত হলেন শক্তি নয়, সমৃদ্ধি নয়, জ্ঞানের পিপাসায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে। জ্ঞানফল আস্বাদনের পূর্বে ও পরে হবা দুই ধরনের নারী, দুই-ই শেষ নারী। সংসারের সুখের ইচ্ছি করেছিলেন তিনি, সংসারে সংগ্রাম ও সমৃদ্ধির পথও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। পুরুষপ্রধান বাইবেলে তিনি অবশ্যই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ বিদ্রোহী নারী। আক্ষেপ এই যে, এই নারীর মাতৃত্বের জীবনের কোনও আলোচনা বাইবেলে নেই। অজ্ঞান আনন্দের পৃথিবীতে সদাসুখ বর্তমান অবশ্যেও সদাসংগ্রামী প্রবণতাদের ও যন্ত্রণার উদ্রেকক হবা। কারণ তিনি অধিকার করেছিলেন লজ্জা। স্বর্গ থেকে বহিষ্কারের মুহূর্তে হবার প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপও প্রণিধানযোগ্য।

"Unto the woman he said, I will greatly
multiply thy sorrow and thy conception,
in sorrow thou shalt bring forth children;
and thy desire shall be to thy husband,
and he shall rule over thee."
(Genesis 3: 16)

হুবহু প্রয়োগে বাইবেলের ভাষা পুরুষের জন্যেও প্রযোজিত হয়।

এলেনর অন্তরঙ্গে অনেক শেষ নারীর জন্য অপেক্ষায় থাকতে হ'ল মিস্টি টেস্টামেন্ট অবধি ইয়র জন্ম থেকে খ্রীষ্টজন্মী মেরীর মতো। পুরুষের কাছে তার মা-ই এক শেষ নারী, খ্রীষ্টর কাছে যেমন মেরী, নেপোলিয়নের কাছে জোসেফিন, রোদেনস্তাইনের কাছে মালার ওশিক। খ্রীষ্ট ছিলেন অকৃতদার, নেপোলিয়ান পরিত্যাগ করেছিলেন প্রথমা স্ত্রী জোসেফিনকে ও পরিহার করেছিলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী মারী লুইজের ঘাড়, এবং বিভিন্ন নারীসঙ্গে অবাধ রোদেনস্তাইনের শেষ জীবন থেকে নিয়েছিলেন অনিন্দিতা সঙ্গতে তিনি ছিলেন রোমান্সমণ্ডিতও। খ্রীষ্টর মতো মৃত রোদেনস্তাইনেরও শেষ আশ্রয় মাতৃক্রোড়, দুধুর যীশু খ্রিস্টের নেপোলিয়নও নিজের শেষ জীবনে অন্তরঙ্গভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন মেরীসিবার কাছে। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে তিনজনই অবশেষে একেকটি বিশাল বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের শেষ নারীর অন্তিমক্রোড়ে। ব্রিজেনস্ট্রোমের শিরোনামা সেই শেষ নারীর কালোত্তীর্ণ রূপক।

যোহন কথিত সুসমাচারে খ্রীষ্ট ও মেরীর শেষ সাক্ষাতের কথা তুলনারহিত। খ্রীষ্ট নিরুপায় ক্রুশে, নিচে দাঁড়িয়ে মা মেরী, সঙ্গে ক্রোফাসের স্ত্রী মেরী এবং মেরী মাগদালেন। যোহন —

"When Jesus therefore saw his mother, and
the disciple standing by, whom he loved,
he saith unto his mother, Woman, behold
thy son!" (St. John; 19:26).

ক্রুশে যীশুর দেহান্ত হলে তাঁর শিষ্য অরিমথিয়ার জোসেফ পিলাতের অনুমতি নিয়ে প্রভুর দেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনলেন এবং গন্ধরস মাখিয়ে, কাপড়ে জড়িয়ে সমাধিস্থ করার জন্য নিয়ে যান। এলেনর সমাধির নিভৃত স্থান থেকে যীশুর পুনরুত্থানের ও অন্তর্ধান। মূল মূল ধরে লিখিয়া কিন্তু প্রভুকে ফিরিয়ে এনেছেন অন্তরঙ্গেরে, সেখানে মানবপুত্র পূর্ণ মানবিক ও সম্পূর্ণ হন। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় জননীর উদ্দেশ্যে যীশু বলেছেন, নারী, তোমার পুত্রকে দেখো। 'পিয়েতা'র সেই করুণাময়, দীর্ঘ, জনম দেখাটাই যেন যাচ্ছেন নারী।

নেপোলিয়ান যারা দেখেছেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সেখানে তাঁর দেহের ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাঁরই মাতৃভূমি কর্সিকার অধিবাসী ডাঃ আন্তোমার্কি। আন্তোমার্কি এলেন ইতালীতে এলেন পঞ্চমোরুসত সম্রাটের ভাই লুসিয়ঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। লুসিয়ঁ দেখা করলেন না। আন্তোমার্কি গেলেন পার্মার রাণী লুইজের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু সম্রাটের দ্বিতীয়া পত্নীর দ্বার রুদ্ধ দেখলেন। অবশেষে এলেন রোমে মা লেতিজিয়ার কাছে। তিনদিন ধরে লেতিজিয়া বোনাপার্ত পুত্রের দ্বীপান্তরের বিবরণ শুনলেন এবং ক্রমান্বয়ে বলতে থাকলেন, আরও বলো, ওর সম্পর্কে আরও বলো। চলে আসার আগে আন্তোমার্কি সম্রাটের শেষ জীবনে ব্যবহৃত জগের বাতিটি রেখে এলেন তাঁর হাতের কাছে। আন্তোমার্কি চলে যেতে লেতিজিয়ার আগুনের পাশে বসে দ্বিতীয় পুত্র নেপোলিয়নের জীবন নিয়ে শুধু ভাবা আর অশ্রু বিসর্জন করা।

কিন্তু এভাবেও তাঁকে বাঁচতে হ'ল আরও পনেরটা বছর। দুই কন্যা মারা গেল, শেষ কজন নাতিনাতনিও মারা গেল। ক্রমে ক্রমে দেহের অর্ধেকটা অবাড় হয়ে গেল এবং চোখ দুটি অন্ধ। তিনি শুধু বসে থাকেন পুত্রের আবক্ষ মূর্তির সামনে, চেয়ে চেয়ে কিন্তু অন্যমনস্ক অন্তরে।

একজন রাজকুমারীর মতো লেতিজিয়া তাঁর প্রাসাদে অভ্যর্থনা করেন তাঁদের যারা শেষ দিন অবধি নেপোলিয়নের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর পরিচারকরা সম্রাটের সময়ের উর্দি, ফেলতুস পরে, তাঁর বুড়ি গাড়িতে সম্রাটের আমলের চিহ্ন। মাঝে মধ্যে ভিয়েনা থেকে সম্রাটের পুত্রের খবর আসে। কিন্তু বালকটিকে আসতে দেওয়া হয় না ঠাকুরমার কাছে। যখন একুশ বছর তার বয়স তার মৃত্যু হ'ল। তখন মারী লুইজই চিঠি লিখলেন লেতিজিয়াকে। কিন্তু সম্রাট জননী সে চিঠির কোনও উত্তর দিলেন না। এতকাল পরে জগতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে, কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ তাঁর সন্তানদের অধিকার নেই সেখে যেতার।

সম্রাটের মৃত্যুর নয়বছর পর বুরবোঁ বংশ পতিত হ'ল এবং সিংহাসনে এলেন অর্লেয়ঁরা। নতুন প্রভু জানেন দেশে সম্রাট নেপোলিয়নের অনুগামী বোনাপার্তিস্তরা কী শক্তিধর। তিনি নির্দেশ দিলেন যে প্রাক্তন উদ্দেশ্যের উদ্যোম মিনারের উপর কেউ কাফনের ঢেকে সম্রাট নেপোলিয়নের মূর্তি। যা পনেরো বছর আগে সরানো হয়েছিল সেখান থেকে। কনিষ্ঠ পুত্র জেরোম যখন পত্নীসহ ফিরে এই খবর দিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়ালেন, তাঁর শরীর সুস্থ হ'ল। বহুকাল পর তিনি ফের হেঁটে গেলেন তাঁর বসার ঘরে এবং পুত্রের মূর্তির দিকে অন্ধ দুটি চোখ মেলে অবেগকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, কেন একবার সম্রাট ফিরে এসেছেন প্যারিসে।

মা আমার ওশিকের ফোলে কবি রোদেনস্তাইনের মৃত্যু সম্রাসনি "পিয়েতা'র আদলে, ব্রুসেলসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রোদেনস্তাইন, মালার ওশিক উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন সে কেমন আছে। ব্রুসেলস থেকে শেষ রোদেনস্তাইনের শেষ দুটি চিঠির একটি তাঁর আছে। ৩০ মার্চ, ১৮৬৬-র সেই চিঠিতে লিখছেন : স্নেহময়ী তোমাকে যে উত্তর পাঠিয়েছি তা তুমি নিশ্চয়ই যথাসময়ে পেয়েছ। মুখরক্ষা, দুঃস্পতিবার কিংবা অন্য ওরকম তুমি হয়তো তোমার খবর আমায় লিখে পাঠাতে পারতে, এবং তা যদি তুমি করে না থাকো তার কারণ হয়তো তুমি ভাবো আমি শুধু নিজের চিন্তাই সারাক্ষণ করি। তুমি অবশ্যই তোমার সম্পর্কে খবর আমাকে পাঠাবে। ------- তোমার সম্পর্কে একটা দীর্ঘ, পূর্ণ পত্র লিখে পাঠাও আমাকে। আর আমি পাঠাচ্ছি আমার গভীরতম ভালবাসা।

এর কিছুকাল পর ২রা জুলাই, ১৮৬৬, ব্রুসেলসে আড়াই বছরের বেদনা নির্বাসন কাটিয়ে রোদেনস্তাইন প্যারিসে ফিরলেন। স্টেশনে তাঁর বন্ধুদের এক মস্ত ভিড়, তার মধ্যে আছেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম দোসর আজলিনে। আজলিনে যখন দেখলেন তাঁর বন্ধুটি সিঁড়িভেঙের জন্যে তার নিকটা ভর করে আর যষ্টি হাতটার লাঠি ধরে একজন বৃদ্ধের মতন নামছেন ট্রেন থেকে তিনি চোখের জল সামলে রাখতে পারলেন না। বাক্‌শক্তিরহিত রোদেনস্তাইন একটা সরব হাসি হেসে পরিস্থিতির সামাল দিতে চাইলেন, কিন্তু সে হাসিতে সবাই দেখল এতটুকু স্ফূর্তি বা আনন্দ নেই।

রোদেনস্তাইন কিন্তু সমুদ্রতীরে তাঁর মন বাড়িতে নিয়ে উঠতে পারলেন না। কারণ তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন এবং প্যারিসে চিকিৎসা হবে না। মাও চাইছিলেন প্যারিসের বাড়ি বিক্রি করে প্যারিসে ছেলের পাশে এসে থাকেন। কিন্তু অন্তরঙ্গরা বললেন, অসুস্থ পুত্র মার জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হবেন, তিনি বরং কিছুদিনের জন্য এসে এসে ছেলেকে দেখে যান। মালার ওশিক তখন ছেলেকে প্যারিসে আনার মতন ব্যবস্থা করে প্যারিসে ফিরে গেলেন। প্যারিস থেকে রোদেনস্তাইনের সহচর এলফ্রেডকে চিঠি লিখে বললেন, আপনার নায় যখন উদ্ভাসিত হ'ল পর্দার অন্তরাল আনন্দ

হ'ল। কারণ আপনার প্রতি ওর গভীর বন্ধুতা। ..... নিজে কথা কইতে না পারলেও শার্ল আপনার কথা শুনতে পাবে ও বুঝতে পারবে। যদিও সে তার চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণ সম্বল নেই এখন ———————— সেই আশ্চর্য, অসাধারণ চিন্তাশক্তি যা তার আয়ত্তে ছিল একসময় ———————— তবুও সে পুরোপুরি সেই গুণ হারিয়ে বসেনি। আর তাছাড়া কতটা মেধা যে সে সত্যিই হারিয়ে ফেলেছে তাই বা কে সঠিক বলতে পারে আমরা সে তো মনের কথা মুখে বলতে পারছে না।

এরই মধ্যে কবি একদিন 'নীরব' ভাষার বন্ধু নগেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করলেন অমরত্ব বিষয়ে। উদ্ভাসিত একটি কথাই তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে বলতে পারতেন এই সময় 'সাক্রে নী! ও সাক্রে নী!' অর্থাৎ 'পবিত্র নাম। হে পবিত্র নাম!' এবং এই নীরবতার মধ্যেই কেটে গেল ১৮৬৬-র শীতকাল। ১৮৬৭-র মার্চ মাসে বোদলেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁহারে মার কাছে নিয়ে থাকার।

এই সংবাদে আনন্দিত, উদ্ভাসিত মাদাম ওপিক ছেলেকে নিজের বাড়িতে আনার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। কিন্তু এর পরে পরেই আবার প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন বোদলেয়ার। মার্চ কেটে গেল, এপ্রিল কেটে গেল, মে মাসও যায় যায়। তখন ২১ মে মা পাড়ি দিলেন প্যারিসের পথে ছেলের খোঁজে। এসে ছেলেকে যা দেখলেন তাতে আর ওকে নিয়ে বাড়ি ফেরা হ'ল না, তিনি পাশেই একটা হোটেলে বসবাস শুরু করলেন যাতে দিনরাত ছেলের পাশে থাকা যায়। বোদলেয়ারের জীবনের শেষ সপ্তাহটি মা ছেলের বিছানার পাশ থেকে নড়লেনই না।

মাদাম ওপিকের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নাস্তিক, প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরবিদ্বেষী পুত্র ধার্মিক হয়ে উঠেছিল। তিনি চিঠিতে তাঁর বন্ধুদের লিখেছিলেন, মৃত্যুর আগে শার্ল বোদলেয়ার, যে তাঁর মেধা ও চিন্তাশক্তি ফিরে পেয়েছিল, স্থানীয় পুরোহিতের কাছে পাপ স্বীকার করে ও তাঁর পূজো দেন। 'দ্যুয় দু মাল'-এর লেখক মারা যায় একজন খৃষ্টান হিসেবে।

বোদলেয়ার শান্তিতে মৃত্যু বরণ করেন ১৮৬৭-র আগস্টের শেষ দিনে। তিনি মারা যান তাঁর মায়ের কোলে। একেবারের শেষে যা তাঁর পুত্রকে একেবারে নিজস্ব নিত হিসেবে কোলে ফিরে পান। পুত্রের শেষ নিশ্বাসটি যেন নিজের বুকে ধরে রাখার জন্য তিনি ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। তাঁর পরিচারিকা 'এমে' বলল, মাদাম, দেখুন কীভাবে ও আপনার দিকে চেয়ে আছে। ও আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে। ও আপনার দিকে চেয়ে হাসছে:

বস্তুত, মার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বোদলেয়ার মারা গেলেন। এই হাসিই ওঁর রোগক্লিষ্ট, বেদনাতুর মুখটিকে একটা অদ্ভুত দীপ্তি দেয়, যেন সূর্যাস্তের আভা এসে মিশেছে সেখানে। বাকি জীবন এই শেষ নারী তাঁর সন্তানের এই শেষ মুখচ্ছবি কখনওই ভুলতে পারেননি।

ওঁয়াসরে ছেলের জন্য সাজানো গোছানো ঘরটা আর কাউকে তিনি ব্যবহার করতে দেননি। শুধু ছেলের বন্ধু আজলিনো এলে ঐ ঘরে তিনি থাকতেন যার জানালা দিয়ে সর্বক্ষণ দেখা যায় সমুদ্রের জলরাশি। বাড়িতেও বৃদ্ধা মায়ের চোখে নিরন্তর জল আর থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস, 'হায়: লক্ষ্মী সোনাটা হারিয়ে গেল:' ছেলের বন্ধুর সামনে আনমনে বেঁধে যাচ্ছেন। কোনও লজ্জা নেই, সংকোচ নেই। শেষ উইলে এই আজলিনোকে মাদাম ওপিক স্মরণ করতে ভোলেননি।

শেষ নারীর বিবরণ সম্পূর্ণ পাওয়া ও সম্পূর্ণ হারানোর মধ্যবর্তী কোথাও, পাওয়া, না-পাওয়ার মাঝখানে কোথাও, স্মৃতি ও বাস্তবের মধ্যস্থলে কোনও একজনে এবং, রহস্যজনকভাবে, বস্তুসত্তি থেকে বঞ্চিতা অথবি সর্বত্র। বস্তুসত্তির একটা প্রবণতাই হ'ল একেকটা কাল্পনিক অথবা বাস্তব নারীসত্তের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়া এবং এহেন সম্পর্কের দ্বারা এক ধরনের সুখকর আত্মপীড়নে জর্জরিত হওয়া। এ সম্পর্ক টেকসই নয় জেনেও যে একাগ্রতা কিশোরবয়া সঞ্চার করতে পারে এসব ক্ষেত্রে তা বিস্ময়কর। এই সম্পর্ক সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকেই কিশোর পেয়ে যায় তার জীবনের শেষ নারী। বাঙালী জীবন এই ধরনের শেষ নারীতে আচ্ছন্ন, যার প্রতিফল বাংলা সাহিত্যে। বাঙালী ঘরোয়া জীবনের তন্ত্রিষ্ঠ ভালবাসার আলাপচারী দেবীর 'শুক্তি-সাগর' উপন্যাসটিতে কিশোর বয়সের এই পরিস্থিতির এক মর্মস্পর্শী ছবি আছে। আরেকটু এগিয়ে, যৌবনের মুখোমুখি সময়ে, এই সমিত-অংশের সম্পর্কের ঘাম পান রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, আমি বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরঙ্গ পরিবারের 'পড়াশুনোওয়ালা ছেলে' আত্মা তড়খড়ের কথাই বলছি যিনি 'কঙ্কাল'কে করে ছেড়ে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে ফিরে আসার কিছুকাল আগে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই ইংরেজিয়ানা মক্স করেন, আর তিনি যে কবি সে কথাটাও তাঁকে জানিয়ে দেন। আত্মা প্রায়ই কবির গান শোনেন আর বলেন, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয়

কাদম্বিনীর থেকেও প্রবল পেয়ে জেগে উঠতে পারি।

আঠার বছর বয়সের সেই বাঙালী সম্পর্কে বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : সে মেয়েটিকে আমি ভুলিনি বা তার সে আকর্ষণকে কোনো লঘু দেখেল মেয়ে ঘটো করে দেখিনি কোনোদিন। আমার জীবনে তার পরে নানান অভিজ্ঞতার অন্তেবাসীরা খেলে গেছে, বিধাতা ঘটিয়েছেন তার যে ঘটনা, কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব করে যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনও ভুলে অবজ্ঞার চোখে দেখি নি—তা, সে ভালোবাসা যেরকমই হোক-না কেন।

'সন্ধ্যা সংগীত'-এর তরুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বয়ঃসন্ধির রেশ থেকে গেছে। শুধু সেখানে তাঁর বেদনার উৎসে অনুকূল সুহৃদ ও সখী কাদম্বরী দেবীর থেকে কিছুদিনের বিচ্ছেদ। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেছেন কোথাও, আর এক তীব্র নিঃসঙ্গতার ভুগছেন তরুণ কবি। এতদিন তাঁর মনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ 'কবি কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'-এর নায়ক-নায়িকার জবানীতে প্রকাশ পাচ্ছিল, এবার নিজের ভাষায় নিজের জবানীতে প্রকাশিত হল 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ। সম্ভবত এই প্রথম তাঁর কাব্যে পুরুষালি অবিকার দৃপ্তির এক অনেক-ভাং-রূপায়ণ। এক অন্তর্চেতনের প্রভাব তাঁর রচনায় এখন, তাতে এক জীবন্ত কিন্তু দূরত্ব সম্পর্কের তাড়না ও অভিপ্রকাশ। শোনার জন থাকলে সন্ধ্যাসংগীতে বিলিতি সেন্টিমেন্টের ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে যেন, এক উচ্ছল যৌবনযুক্ত কবি যেন্তার সূর্যাস্ত ও তার অবধারিত পরের অন্ধকারের জন্য ব্যাকুল ও অন্যেশমান। কবিতার জন্মভূতে তিনি সৃষ্টি করে নিচ্ছেন নিজস্ব এক শেষ নারী। সীমিত, নিঃশেষিত করে সংরক্ষণের প্রয়াসী তিনি। কিন্তু এ সমস্তই এক অর্থে তাঁর অন্তরের নিভৃত ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সমস্ত প্রেমের কবিতার এই নিভৃত পরিবেশ আমাদের আকর্ষণ না করে পারে না। তাঁর প্রেমের কবিতা আমাদের ওতটাই ছলে পরিপ্রেক্ষিতে ঘতটা তা নীরব রেখে দেয়। আমরা গবেষণা করে বলি, এইসব কবিতা তাঁর কাদম্বরীকে উদ্দেশ্য করে, এইসব কবিতা মৃণালিনীকে। কিন্তু তাঁর কাব্যসংগ্রহ হাতে নিয়ে প্রেমের কবিতাগুলি উল্টে উল্টে পড়ে গেলে শেক্সপীয়রের সনেটের সেই 'ডার্ক লেডি' গোছের এক রহস্যময়ী, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অথচ, অন্তত নারী-উপস্থিতির আভাস মেলে। সে নারীতে কখনও কাদম্বরীর আদল। কখনও মৃণালিনীর, কখনও বা অন্য কারও কারও। প্রায়শ এই মুখগুলির একটির মধ্যে আসল একটি এসে মেশে এবং তাঁর পরিণত বয়সের ঊনত্রিশ নারীমূর্তিগুলির মতোই তা ধীরে ধীরে একেকটি আর্কিটাইপ হয়ে দাঁড়ায়। এই মুখের স্টাইল, এই আর্কিটাইপ হ'ল শেষ নারীর। পাওয়া, না-পাওয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যারা।

বিশেষ একটি মুখ অথবা চরিত্রের আবেশের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখতে চান না, পারেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিবাহের পাঁচ মাস পরে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন। কারণ অজ্ঞাত। এরপর সারা জীবন ধরে বৌঠানের উদ্দেশ্যে কত কবিতা ও গানই তো তিনি লিখেছেন, কত বই তাঁর স্মরণে উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু বৌঠানের মৃত্যুর পর তাঁকে অন্তর্মুখতাবে নিরাসক্ত করার প্রয়োজনও উপলব্ধি করেছেন তিনি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী কথার' এই পর্যায়ে কবিরই একটি মত সবত্নে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে তিনি বলছেন, 'ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ।' তৎকালীন একটি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

দেখা হতে যাও পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

শেষ নারীর সৃষ্টি পুরুষের এক পুরাতন খেলা যা তাকে নিরন্তর নতুন নতুন করে খেলে যেতে হয়। এ এক অন্তহীন বৃত্ত যার সব বিন্দুই একই সঙ্গে নতুন এবং পুরাতন। ক্রীড়ারত পুরুষ ক্রমশ নতুন নতুন নিয়ম রচনা করে পুরাতন খেলায় ইতি টানছে, নতুন খেলার সূচনা করছে। তার রচিত নিয়ম তাকেও বদলে দিচ্ছে অবিরত, ফলে প্রতিটি নতুন খেলার সঙ্গে একেকটি শেষ নারীর পাশাপাশি একেকটি নতুন পুরুষেরও জন্ম হচ্ছে। এবং যেহেতু প্রতিটি নতুন খেলার একেকজন নতুন পুরুষের আবির্ভাব কিন্তু নারীটি সেই আর্কিটাইপাল শেষ নারী, আমরা সঠিক বুঝতেও পারি না কে কাকে নিয়ে খেলছে, কে কাকে সৃষ্টি করছে।

বাঙালীর আধ্যাত্মিকতার শেষ নারী কালী। ওই অসাধারণ দেবী কল্পনার মধ্যে, নয় হিসেবে অবাস্তবিক কিন্তু সন্তানের মঙ্গলবিধাত্রী, এক অসীম শেষের আভাস। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'কালী মা আমার' কবিতায় যাকে বলছেন 'অসীমের নৃত্য' তা ঘটে চলেছে আমাদের বুকের মধ্যে। বাঙালীর চেতনায় ও অবচেতন জগতে এই ধ্বংসলীলা। কালীর পরিবেশ মা মৃত্যুর পরিবেশ কিন্তু এই পরিবেশেই আমাদের সব চেয়ে বেশি সক্রিয়, সজীব, উদ্বাম ও বিভোর করে। উদ্বাম, বিভোর তাওবের কালে কালী একই সঙ্গে জননী এবং প্রেমিক। কালী বাঙালীর অন্তিম কল্পনার নারী, তার-বয়সের যাবতীয় পূজার অদ্ভুত ও সমন্বিত সমস্ত বৈপরীত্যের উপলব্ধি-অনুপলব্ধিতে সমৃদ্ধ। কালীর রহস্য আদিসন্ধীন মৃত্য অথবা সন্তানস্নেহের রহস্য, শুভ ও শেষের রহস্য, প্রকৃতি ও কালের রহস্য, ঘর ও বাইরের রহস্য, অন্তত বাঙালী মনীষার শেষ নারীর শেষ রহস্য। একই আধারে 'শিবেড' ও হেক্টিকেলি, জর্জোনি, লেবেরোলাশি, ক্রেমি ভিবো তিলিয়ানের 'ভেন্সাস'।

এই মা কালীর পূজো ছিল সে রাতে। অনেক রাত অবধি জেগে ছিলাম কেন জানি না। শুতে যাওয়ার আগে চোখেমুখে একটু জল ছিটোতে যাচ্ছি, দেখি আমার মা আপন মনে চুল বাঁধছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কী মা, এখনও শুতে গেলে না? তো মা বললেন, আজ অমাবস্যার রাত, চুল না বেঁধে শুতে নেই। মনে মনে ভাবলাম, যার পূজো এই রাতে তার তো কখনও চুল বাঁধা পড়ে না। আমার প্রথম উপন্যাস 'এই আমি একা জন'-র শেষ দৃশ্যে এই রাতটার কথাই লিখেছি।

আর সেই দৃশ্য বারবার ফিরে আসছিল মনে যখন ক'দিন আগে বহরমপুরের শ্মশানঘাটের আগুনে চিতায় শোয়ানো আমার মার মাথাটা ঘুঁয়াতে ঘরে বসেছিলাম। ফিরে মাথানো মার আগুনের মতো উজ্জ্বল শরীর আরেকটু বয়সে আগুনেই সঁপে দিতে হবে। মার সব চুল এখনও কালো আর এই শেষ শয়নে তা বাঁধারও প্রয়োজন নেই। ক'ঘণ্টা ধরে ঝরা পাতা, আকাশে ঘন মেঘ কিন্তু বৃষ্টি নেই, শুধু উত্তাল শীতল হাওয়া থেকে থেকে। মার নিথর শরীরের সব চাঞ্চল্য এসে আমার হাতে মিশছে, যার জঠরে আমার জন্ম, যার কোলে আমার বাল্য কৈশোর, যার আঁচলে যৌবনসন্ধি ও যৌবন, তাঁর মুখ আমার এই দুটি হাতে এখন। আমার প্রথমা আমার করতলে নিঃশেষিত। একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে এলো, কিন্তু এই বৃত্তে কার জীবন ধরা? মার না আমার? আমারই সাইক্লিক যন্ত্রণার এই জীবনটা এতদিনে এখন শেষ হ'ল না? মার জীবনের বৃত্ত তো সম্পূর্ণ হয়েছিল সেদিনই যেদিন আমার বিয়ে হ'ল ক'বছর আগে আর সেই প্রথম আমি মার কাছে প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন হলাম। বিয়ের দিন খুবই অসুস্থ ছিলেন মা, বৌভাতের দিন তাঁর গায়ে জ্বর, কিন্তু আদৌ তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। বৌকে বসানো হ'ল যে ঘরে তার একপাশে কলাপাতা মা শুয়ে শুয়ে সব দেখলেন। আমি জানি না সেদিন কী কী স্মৃতি তাঁর মনে ভাসছিল কিন্তু মাকে দেখলেই ডিনটে বিয়ের কথা স্মরণে আসছিল আমার। বাবার সঙ্গে আমি আর মা দার্জিলিঙের হোটেলে এক সন্ধ্যায়, বাবা আমাদের অনুরোধ করে শোনাচ্ছেন 'কালী মা আমার' কবিতাটি। মনে আসছিল বাবার মৃত্যুদিনে বাবার কপালের এক পাশে ঐচৈতন্য মাকে। আর কিছুপূর্বে বর্ণিত সেই কালী পূজোর রাত।

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু মা-ই নয় আমি সীমিত, খণ্ডিত কলমম শ্রীকেও। বিয়ের আগে ইস্কাপী নাচ-গান বেড়ানো কম কিছুই তো

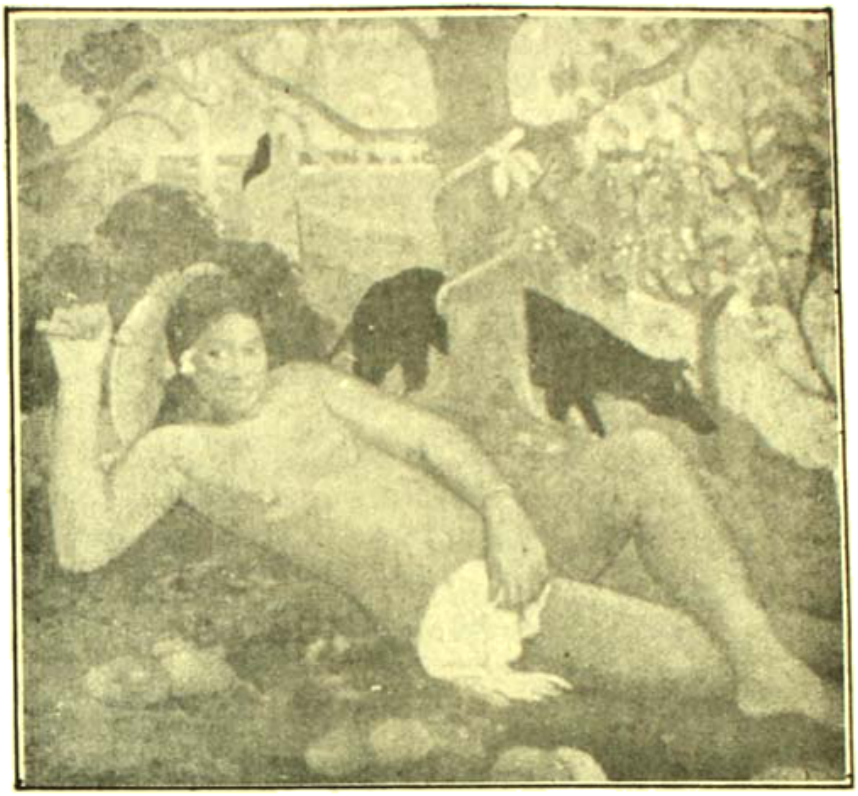

নিয়ে মেতে স্বাধীন, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকত। আজ্ঞার ছিল বই কেনা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, বন্ধুদের মজলিসে নেশা করা। আমরা দুজনেই ওটিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার তবু বাইরের একটা জীবন ছিল, ওর শুধু আমার জন্য অপেক্ষা। আমার টাকারও তখন টানাটানি, প্রয়োজন মিটলেও সময় মেটে না। প্রয়োজনও যে সব সময় মেটে তাও না। আমার শুধুই মনে হয় আমি মেয়েটিকে হত্যা করছি এবং নিজে আমি মরেই আছি। আমি বইয়ের গল্প, গানের স্মৃতি, জীবনের স্মৃতি শোনাই ওকে কিন্তু না বলার থেকে বিরত থাকতে। কখনো সখনো প্রায় অকারণেই দুজনে আমরা খুব আনন্দ পাই। তার পরে পরেই দানা বাঁধে অভাবের চিন্তা, যেভাবে বাঁচতে চাই তার চিন্তা। ঠিক এরকম সময় শিলং শিকের ওই মুক্তির আনন্দ। দুজনায় সুখ আজনের অধিকার করে নিতে হবে কারণ সুখ সংসারে হুড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। জীবন একটা হীরক খণ্ড যার কিছু দ্যুতি হল সুখ। সে জন্য জীবনকে কাটতে হবে, ঘষতে হবে। সেও এক দীর্ঘ, অশেষ প্রহর।

নিজেই নিজেতে পূর্ণ বলে একটা নিসঙ্গতায় অভ্যস্ত ছিলাম আমি। এহেন নিসঙ্গতা নিয়ে শুধু অন্যকেই নিসঙ্গ করা যায়, এই জ্ঞান আমার ছিল না। এই জ্ঞান কবে এলো জানি না, তবে জ্ঞানের আগে এই নিসঙ্গতা ক্রমশ একটু একটু কাঁটাময় হচ্ছিল, নিসঙ্গতায় বোধ জন্মাচ্ছিল। তারপর একদিন বাড়িতে বহু লোক, কিন্তু আমি নিসঙ্গ। বাড়িতে কেউ নেই, আর আমি নিসঙ্গ। পাশে নিদ্রায় অচেতন, আর আমি নিসঙ্গ। আমি শুধু সুখের জন্য নয়, নিজেকে বাঁচাবার জন্য। নিজের বাহুতে তখন আমি আর ইন্দ্রাণীকে নয়, নিজের সত্ত্ব-সুখ ও যন্ত্রণাকে বেষ্টিত করে আছি। ইন্দ্রাণীর মাধ্যমে আমি নিজেকেই আবৃত ও সুখী করছি। তিন একটি যে সন্তাকে এতদিন বাড়িতে এনে রেখেছি আজ তাকে নিঃশেষ করে নিজের আত্মার পরিবেশে লুপ্ত করে দিচ্ছি। আর অকোরে ঝরছে সেই শেষ নারীটি।

শেষ নারী সেও যাকে কখনও কোনও পুরুষ আবদ্ধ করে না। ফলে নিয়ম, নীতি ও সমাজের কাছেও সে নির্মম, স্বাধীন। নারীর এই স্বাধীনতা কোনও 'সমাজ-চুক্তি'তে লিখিত থাকে না, কিন্তু এ এমনই এক ব্যতিক্রম যা নিয়মের মর্যাদা পায়। স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে নারীর প্রসাধন বা অলঙ্কার নয়, তার মুক্তি তো নয়ই, তার পরিণতি ও নিয়তি। এই স্বাধীনতা সঠিক অর্থে ক্রিয়াশীলও নয় যেমন ঈশ্বর থেকে স্বাধীন, মুক্তকর্ত্রী কোনও সৃজনশীলতে সক্ষম নয়। 'শেষ বাঈজি' প্রবন্ধে যে বাঈজী জমলার (আসল নাম সুবোধ কারণে বদলে দেওয়া) কথা লিখেছিলাম সে-ই আক্ষেপ করে বলেছিল, আপনারাই তো সমাজ, আর আমরা স্বাধীন নারী। আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা কতটুকু কী করতে পারি? আমাদের ভালবাসাও তো কখনও আপনারা ফেরত পাঠান না। কে চায় আমাদের সাথী করে সমাজে তুলে মুক্তি নিতে?

পুরুষের থেকে নারীর নিজেকে স্বাধীন রাখার প্রয়াসের এক অনুপম উদাহরণ অমৃতাবতের পরীক্ষিৎ ও সুশ্রোতনা উপাখ্যানে। শেষ অবধি নারীর এই আত্মসমর্পণকে পরাজয় বা বিয়োগাত্মক বলা যায় না, উপাখ্যানটির এক চমৎকার রোমান্টিক উপস্থাপনা আছে সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথায়'। সুবোধবাবু তাঁর বর্ণনায় সুশ্রোতনার শেষ নিবেদনকে প্রকৃতির রূপান্তর, এক আসন্নতর ঘরনার হিসেবে দেখেছেন।

মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সুশ্রোতনা স্বেচ্ছাচারিণী। সে বিবাহিত হতে চায় না, ক্রমাগত পুরুষ-হৃদয় জয় ও বশ করা তার নেশা। পুরুষের দেহ সে চায়, কিন্তু ক্রমে পুরুষ যখন তার প্রণয় কামনা করে সে সরে আসে। অবশেষে একদিন ইক্ষ্বাকুরাজ পরীক্ষিৎকে দেখেও সেই মনোহরণের অভিলাষ। এবং প্রস্তুতি। পরে যেদিন দেখা হ'ল বনের উপান্তে, সুবোধ ঘোষ লিখছেন,

"এগিয়ে যান রাজা পরীক্ষিৎ।..... দেখতে পান পরীক্ষিৎ, নারীর কবরী গ্রথিত চন্দ্রোপলের রশ্মির চেয়েও কত বেশি স্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ এই নারীর দুই প্রশ্নলোচনের রশ্মি।

তথা বলেন পরীক্ষিৎ—পরিচয় দাও প্রমাণী।

—আমার পরিচয় জানি না।

—তোমার পিতা? মাতা? দেশ?

—কিছুই জানি না।

—বিশ্বাস করতে পারছি না। বিদ্রোহী। সপ্তকীর্তিমেখলা ঐ কুলকীর্তিতট, মুক্তাবলীশোভিত

ঐ সুধাবদন ভাইদেন, কৃষ্ণমাত্তিত ঐ তোমল বক্ষপট; তোমার কবরীর ঐ চন্দ্রোপল আর এই সন্তরণ বিলাসী, এ কি পরিচয়হীনতার পরিচয়?

—আমার পরিচয় আমি। এছাড়া আর কোন পরিচয় জানি না।

নীরবে অপলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ।

এরপর পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে তাঁর শ্রেয়সী করে রাখলেন নিজের প্রাসাদসংলগ্ন এক নিভৃত কাননে। শুধু সেখানে কোনও সরোবর নেই, কারণ সুশোভনা বুঝিয়েছে পরীক্ষিৎকে যে কোনদিনও যদি সরোবর সলিলে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ফেলে তো সেদিনই তার মৃত্যু। বলা বাহুল্য, প্রসবপর্ব শেষ হলে এই সরোবরের দোহাই দিয়ে পরীক্ষিতের জীবন থেকে সরে যাওয়ার এটা ফন্দি সুশোভনার। যৌবনতর বিভিন্ন ভঙ্গিতে সে ইতিপূর্বে সরে এসেছে অন্ত অনেক নৃপতি, যুবরাজের জীবন থেকে। তাঁরা উন্মাদ হয়েছেন কিন্তু বাসনা মিটেছে সুশোভনার।

কিন্তু শোক মাতল এবারই। বেশ কিছুদিনের প্রসবপর্ব শেষে সুশোভনা যখন স্নান করে সরোবরসলিলে দিয়ে নামল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল, আপনি ভুল করে আমাকে আমার জীবনের অভিসারের সাক্ষিত্বে নিয়ে এসেছেন রাজা। সলিলবক্ষে আমার প্রতিচ্ছবি দেখেছি। এখন আমাকে বিদায় দেবার জন্ত প্রস্তুত হোন।

পরীক্ষিৎ বলেন, তোমাকে বিদায় দিতে পারব না প্রিয়া। এই জীবন থাকতে না।

অনেক ছল করে অবশেষে সরে যেতে হয় সুশোভনাকে। কিন্তু কোথাও একটা ত্রুটি থেকে গেল। তার অন্তর্ধানের পরে পরেই সুশোভনার কানন সমীপে মদ্রুক রাজ্যের এক চরকে দেখতে পেয়ে পরীক্ষিৎ নিশ্চিত হলেন সুশোভনা মদ্রুক রাজ্যের রাজকন্যা। ক্রোধে, আক্রোশে প্রমত্তবিক্ষ পরীক্ষিৎ আক্রমণ করলেন মদ্রুকরাজ্য।

রাজ্য আক্রান্ত, এই খবর সুশোভনার কাছে বয়ে আনল কিঙ্করী সুবিনীতা। যার একটি মাত্র বাসনা জীবনের সুশোভনাকে বন্ধুবেশে স্বামীগৃহে পাঠানো। যা হয়তো পূর্ণ হবার নয়। সব শুনে সুশোভনা বলল, সুবিনীতাকে, নারী ধর্মদ্রোহিণী ভোগবিলাসিনী নারীর ছোপন জীবনের সকল ইতিহাস তাকে শুনিয়ে যাও। সুশোভনার অপলক দৃষ্টির স্নেহ মিত্রুবনে। জানুক পরীক্ষিৎ, মদ্রুকরাজ আত্মার চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা তনয়া ছল এক বহুবল্লভা পরপূর্বা ও ভ্রষ্টা নারী।

সুবিনীতা জানাল, পিতা আর আজ তোমার উপর সত্যই নির্মম হয়েছেন কুমারী; তিনি স্বয়ং অমাত্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষিতের শিবিরে চলে গিয়েছেন, ইন্দ্রধনু যৌবনের কাছে নিজ মুখে নিজ তনয়ার অপকীর্তি কথা জানিয়ে দিতে। এ ছাড়া মহাবল পরীক্ষিৎকে তোমার প্রণয়মোহ হতে মুক্ত করার আর কোন উপায় ছিল না দূতাগিনী কুমারী।

জীবনের সব আনন্দ, সব কৌতুক শেষ হয়ে গেছে দেখে বিষণ্ণমনে জীবনের প্রস্তুতি নিল সুশোভনা। রাজ্যের মানুষ রক্ষা পেয়েছে পরীক্ষিতের রোষ থেকে, কিন্তু অপকর্ম থেকে রক্ষা পেতে হবে সুশোভনাকে। তার শুধুই মনে হচ্ছে, আজ এতদিন পরে জীবনে শেষ অভিসারের দায় দেখা দিয়েছে। বাতায়ন পথে দেখা যায় আকাশে ছুটে আসছে অনেক তারা, নিশুকন্যাদের সন্ধ্যাপুজোর ফুলগুলি যেন এখনও ছড়িয়ে। শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়ার এই তো সময়।

এরপর সেই শেষ অভিসারের প্রস্তুতির বর্ণনা সুবোধ বোধের কলমে। আর তারপর .....

"মাঝরাতিরারির পায়ে পরলেন টলমল করে, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে সুশোভনার ওষ্ঠাধর। পাত্র হাতে তুলে নেয় সুশোভনা।

—রাজনন্দিনী:

কিঙ্করী সুবিনীতার আহ্বানে বাধা পেয়ে সুশোভনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সুবিনীতা বলে—পরীক্ষিতের কাছ থেকে বার্তা এসেছে।

—কি?

—তিনি তোমার আশ্রয় হয়েছেন।

—এ কি সম্ভব?

—এ সত্য।

—তিনি কি শোনেননি আমি যে এক শুচিতাহীনা মসিলেখা জায়?

—সব শুনেছেন।

পরলাপায় কুন্তলে ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায় শত্রুর শিবিরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, যার স্থির শান্ত নিষ্কম্প তার শিখা।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুশোভনা। শত্রুশিবিরের সেই প্রদীপের বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশোভনার হৃদপিণ্ডের অন্ধকার স্পর্শ করছে। জাগছে হৃদয়, যেন মরু-অন্ধকারের গভীরে নির্বাসিত এক মরীচিকেরক ফুটছে। আর, যেন এই জাগরণের বিস্ময় আপন আবেগে সুশোভনার মৃদুকম্পিত অধরের ভীতি ভেদ করে ওঙ্কারণ হয়ে ছুটে ওঠে—কী সুন্দর শত্রু তুমি!

কিঙ্করী সুবিনীতা চমকে উঠে প্রশ্ন করে, কী বলছ রাজকুমারী?

সুবিনীতার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সুশোভনা। —আজ আমার জীবনে শেষ অভিসারের দায় এসে দিয়েছে সুবিনীতা। সাজিয়ে দাও কিঙ্করী, আর সময় নেই।

যেন এক নতুন জাগরণের আবেশে যেমনার অন্তরাত্মাবিধৌত নগ্নশোভনিকা, সুশোভনার অঙ্গাভরণ সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কিঙ্করী সুবিনীতা। সভয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় যেতে চাও রাজনন্দিনী?

সুশোভনা—ঐ সুন্দর শত্রুর কাছে।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—কী বেশে সাজাব?

সুশোভনা—বন্ধুবেশে।"

পুরুষ ও নারীর শত্রু-মিত্র সম্পর্কের এ এক অসম্ভব রোমান্টিক সমাধান। কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক তার পরেও থেকে যায়। প্রকৃতি-পুরুষের প্রেম-কৃজন ঘন তাবৎ শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের মূলধন, অন্তহীন রস সম্পদ। এই শত্রু-মিত্র সম্পর্কের এক চিত্র, করুণ চিত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চকন্যা' উপন্যাসে। নায়িকা শিলাবতী তাঁর ও সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির মিলনের ফল যে কন্যা তাকে চতুর পরিকল্পনার মাধ্যমে শয্যাসঙ্গিনী করেছেন ঠিন, নির্মম, বৃদ্ধ সম্রাটের। যখন মেয়েটির পরিচয় এসে পৌঁছেছে তাঁর হাতে পরাবর্ত বাহিত পত্রে তখন জ্বরোগে আক্রান্ত হচ্ছে সম্রাট। কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যুতে প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হচ্ছে শিলাবতীর।

শেষ নারীর শেষ প্রতিজ্ঞা হয়তো কোনও বেশ্যা বার জীবন এক যান্ত্রিক শেষ জীবন। যার শেষ সম্বল কোনও দেহ নয়, মন নয়, শুধু আপন, বিশুদ্ধ, নিরহংকার আমি। প্যারিসের বেশ্যা জান্ কর্ণালিয়ের ভাষায়, The life গ্রীনহাল তাঁর নায়িকার যে সত্তার বর্ণনা করেছেন এক বৃদ্ধ যাকো: And like Medea in the midst of so many dangers, I would remember that I still have one thing : myself.

জান্ কর্ণালিয়ে তাঁর আত্মজীবনীর শেষ করেছেন একটা ছোট অভিজ্ঞতা দিয়ে। প্যারিসের বেশ্যাপল্লীর পাশ দিয়ে একটি রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। তাঁর পিছনে পড়ে আছে বেশ্যার জীবন এবং একটি অসুখী কারাবাসের স্মৃতি। পাদ্রি যখন তাঁকে পরিশুদ্ধ করার জন্ত বলেছিলেন, অনুতাপের জন্য তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "I've forgotten my prayers". পাদ্রি বললেন, "Then remember them!" তিনি সভয়ে উচ্চারণ করলেন, "Blessed am I among women ..... My sins, which are many, are forgiven; for I loved much."

অতঃপর রাস্তায় বেরিয়ে এসে শত্রুর দুই জীবনের মধ্যে, দুই জীবনযাত্রার মধ্যে নিমগ্নশোভনেন। নষ্ট হয়ে যাওয়ার তো কতই প্রয়োজন, কত অনুতাপনি: কিন্তু .....

"And what if I crossed over instead of keeping to the shadows? I cross Quai des orfivres, to the sunny side of the street."

সমাজ ও বাস্তবিক জীবনের দিকে হেঁটে গেলেন জান্ কর্ণালিয়ে।

কেরাণী ও কলম

শ্রীপান্থ

লিখতে হয় বলেই যেমন রাইটার, তেমনি কলমে লেখেন বলেই কেরাণী। সুতরাং কেরাণীর সঙ্গে কলমের যোগ আছে অনেকটা কলকাতার সঙ্গে কালির মতো। কিংবা হয়ত আরও বেশি, দেহের সঙ্গে আত্মার মতো। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের কথা তবুও ভাবা যায়, কিন্তু কলমহীন কেরাণী? খবরটা যথাস্থানে পৌঁছনর মত্র আর একটা কলম তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে কাজে নামবে, চার্জশীট গঠিত হবে কেননা, শূন্যদেব অবস্থায় পকেটেই হক, আর দণ্ডহীন অবস্থায় টেবিলেই হক, কলম একটা কেরাণীর কাছাকাছি থাকা চাই-ই চাই। কারণ রীতি হিসেবে সেটাই প্রচলিত এবং দেশ নির্বিশেষে সমুদয় উপরওয়ালার প্রত্যাশিত।

অথচ আশ্চর্য এই, ঐতিহ্য তথা প্রিসিডেন্ট কিন্তু তা বলে না। কেননা, বড়বাবুরা না মানলেও ঈশ্বর জানেন পৃথিবীতে চিরকাল কলম ছিল না। তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘন্ন হওয়ার পরেও কেরাণীকে বহুকাল ঐ সুদর্শন সূক্ষ্মাগ্র পালকটিতে হাত দিতে দেওয়া হত না।

সে বহু বহুকাল আগের কথা। বঙ্কিমবাবুদেরও আগে। রাজারা তখন নিজেদের বালিশের নিচে রাজ্যের টাকা-পয়সা রাখেন, সোনা-দানা রাখেন শোবার ঘরেই একটা সিন্দুকে। ইংল্যাণ্ডে তখন টিউডর আমল সবে শুরু হব কি হব না করছে। রাজার তখন বিস্তর আয়, বিস্তর কর্মচারী। মানুষে মানুষে রাজবাড়ি উপচে পড়ছে। তারা এ ডিপার্টমেন্ট সে ডিপার্টমেন্ট নাম নিয়ে এখানে-ওখানে বাড়ি নিয়ে বসে যাচ্ছে। সে সব বাড়িই সরকারী অফিস।

সব অফিসেই কেরাণী ছিল তখন নামে ক্লার্ক ছিল। এল. ডি. ইউ. ডি নয়, তাদের তখন চমৎকার চমৎকার নাম, ডেভিগনেশান। যথা 'ক্লার্ক অব দি পাইপ বা স্রেট রোল' ভাবছেন না তাঁরা তখন রাজার হামাম সাফ্‌ছেন বা ইংলণ্ডেশ্বরকে পাইপ ধরাতে সাহায্য করছেন। কলমে হাত দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না থাকলেও কাজ ছিল উঁচুদরে কাগজ নিয়েই তাঁরা লিখিত কাগজের বাণ্ডিলগুলো মস্ত একটা পাইপের ভেতরে দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় চালান করে দিতেন। দ্বিতীয় এক দলের কাজ ছিল শুধু কাগজ বাণ্ডিল করা। নাম ছিল তাদের 'ক্লার্ক অব দি রোল'। ফাইল বাঁধার কাজে তখনও লালফিতে আমদানি হয়নি। এসব বাণ্ডিল বাঁধা হত চামড়ার বেল্টে।

এমন কি শুনতে পাওয়া যায় 'কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক' বা একেবারে সম্প্রতি নামে যে লোকগুলো (অথবা মেয়েগুলো) তিন চার হাতের কলম পেন্সিলে মেয়ে ঘটিগুলি করে এ ঘর ও ঘর জানেন একালের কলমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁদেরও। নাম ছিল তখন তাঁদের কিসে বিমেমব্রান্সার, তাঁরা রাজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরকারী খাস্তাল-আলোচনা শুনতেন। তারপর তখন করা মত্র চোখ বুজে অনর্গল 'হিজ ম্যাজেস্টির প্লেজেস' পরিবেশন করে যেতেন। কেরাণী তখন সম্পূর্ণই কলম নিরপেক্ষ, স্মৃতি এবং শ্রুতিনির্ভর।

আলকলমে এরেন কলমহীন কেরাণীকুলে কি করে চসার-মিল্টন বা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন সে সত্যিই এক রহস্য। সে রহস্যের

শ্রীমানোর অবতীর্ণ হওয়ার আগে কেরানী নয় এমন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। সেটি রামমোহনের সংখ্যা সম্পর্কে।

অনেকের ধারণা, যাঁরা তত্ত্ববিদ্যাবাদী হয়েন তাঁরা বোধহয় কবিতা লিখতে পারেন না, কিংবা যিনি ডেসপ্যাচ লেখেন তাঁর হাতে উপন্যাস লেখাটা শোভা পায় না। যদিও অধিকাংশে উপরওয়ালারা তাই মত, তবুও সরকারী টেবিলের সারি সারি দেরাজগুলো হাতড়ালেই জানা যাবে তাঁদের তা নয়। অন্তত যাদের কথা ইতিমধ্যেই দেশ-দেশান্তরে জানাজানি হয়ে গেছে তাঁদের কর্মজীবনে এক নজর তাকালে তাই মনে হয়।

প্রতি পাতায় দু'সারিতে পঞ্চাশজন করে সাতাশের পরেও সে গ্রন্থ এক কর্মচারীর নাম তালিকা। সুতরাং সকলের কথা এখানে বলা যাবে না। চেনাশুনা ক'জনের কথাই বলছি।

স্যামুয়েল পেপিসের নাম অনেছেন নিশ্চয়। তিনি কাজ করতেন কোথায় জানেন?— নেভাল-বোর্ডে, অর্থাৎ আজকাল যা নৌ-দপ্তরে। দার্শনিক জন লক ছিলেন ট্রেড ডিপার্টমেন্টে, অলিভার গোল্ড ছিটেন গ্রাস টিউটিতে, ঐতিহাসিক গিবন বোর্ড অব ট্রেডে (কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' যেমন অনেকে দ্বিতীয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, একালে ইংলণ্ডেরও তেমনি বোর্ড অব ট্রেডের নাম দিয়েছিলেন—'এ নেস্ট অব সিনিকিওর বার্ডস')। হিউম করেন অডিটে, বার্নস এগ্রাইভে, ল্যাম্ব ইণ্ডিয়া হাউসে, বিখ্যাত 'পাঞ্চ' সম্পাদক টম টেলর খাদ্য বিভাগে, ম্যাথু আর্নল্ড শিক্ষা বিভাগে, বঙ্কিমচন্দ্র বিচার বিভাগে, দীনবন্ধু পোস্ট অফিসে এবং আমার যে বন্ধুর লেখা সামনে পাওয়া মাত্র আপনারা লেজারটার ছেড়ে না টেনেই পড়তে লেগে যান তিনি সম্ভবত ছেলে কিংবা ছোট জামাইকে।

ওঁরা কি করে এমন জায়গায় জন্মালেন কোন সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক বা বেহ্যানিস্ট কখনও তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বলে আমি জানি না, অথচ ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গবেষণা যোগ্য। কেননা, কেরানীর সঙ্গে কবিতা লেখার যোগ এক চীন দেশ ছাড়া আর কোথাও ছিল বলে শোনা যায় না। মেকলে অবশ্য ইংরেজ রাজ্যেও একবার তা চালু করার প্রস্তাব করেছিলেন বটে, কিন্তু (এরমধ্যে শেক্সপীয়রের মাহাত্ম্য থাকে না বলেই হয়ত) পার্লামেন্ট সে প্রস্তাব কানে তোলেননি। কেননা, কেরানীকে দিয়ে মৌলিক কিছু লেখাতে হবে সেদেশে তখনও তেমন দুরবস্থা আসেনি। ফলে আঠারো শতকের শেষেও তাঁদের কেরানী সংগ্রহের বিজ্ঞাপনে স্পষ্টতই লেখা থাকত 'বিদ্যা চাই না, বল চাই না, শুধু হাতের লেখাটি ভাল থাকা চাই।'

কেরানী তখন বস্তুতই 'আমি মায় নকল নবীশ'। সেদেশে ঠেলাগাড়ি চেক থাকলে কিংবা সরকারী দপ্তরে চেয়ার বিনামূল্যে পাওয়া থাকলে এই হস্তাক্ষরের বলেই গড়গড় করে তার দিন চলে যেত সানন্দে। জীবন রিটায়ারমেন্ট তথা কবরখানার পৌঁছে যেত। কি বিলেতে, কি ভারতে, মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাই ছিল নিয়ম। হেস্টিংসের মত এরই মধ্যে কেউ যদি সেরেফ কেরানী থেকে গভর্নর জেনারেল হয়ে গেলেন তবে তাও ব্যতিক্রম নয়। কারণ, এ জাতীয় উন্নতির পেছনে কলমের অবদান বাস্তবিকই অতিসামান্যে ক্ষেত্রেই শূন্য! বিশেষ করে পরীক্ষার ফলাফলে অন্তত তাই হলে।

সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষার চল হয় বিলেতে ১৮৩০ সনে, তারতে তার বছর পরে ১৮৩৭ সনে। অবশ্য ইতিপূর্বে যাঁরা সাহী সুপারিশ এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করতেন তাঁদের বিরোধিতার ফলে অচিরেই তা অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। বহু চেষ্টার অবশেষে শেষ পর্যন্ত তা আবার চালু হল বটে, কিন্তু সে বেশ কিছুদিন পরে, ১৮৫৩ সনে।

১৮৫৫ সনে পার্লামেন্ট এক কমিশন বসালেন। উদ্দেশ্য: ইংলণ্ডের আপিসে আপিসে যে সব কেরানী কাজ করছেন তাঁদের একবার পরখ করে দেখা। আঠার জন মিলে পরীক্ষা চলল। বন্ধু সমরে জানা গেল ফলাফলও। কমিশন জানালেন যে তিন হাজার কর্মী তাঁরা যাচাই করেছেন, তার মধ্যে পাস করেছেন বলা চলে মাত্র বিয়াল্লিশটি জন। ১৮৫৯ সনে একেবারে বাছিয়ে করা প্রতীয় সংখ্যা ছিল এক হাজার নয় বাছাইয়ের জন্য। কমিশন সঙ্গেহে জানিয়েছিলেন এদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই 'থিন্টে আর'-এর একটারও ধার ধারে না। কেউ কেউ আবার সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় এমন উত্তরও দিয়েছিলেন যা সম্ভবত আজকের তারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেসব উত্তর পেয়ে থাকেন একমাত্র তার সঙ্গেই তুলনা করার মতো। যথা: একজন বললেন, ডিউক অব ওয়েলিংটন লড়াই করেছিলেন যাঁর সঙ্গে তিনি স্প্যানিশ আর্মাডা। অন্য একজন বললেন 'রোমান ওয়াল' তৈরি হয়েছিল তুর্কীদের ঠেকাবার জন্য। কেউ কেউ দূর ঘরেই জানালেন আদম হয়েছিলেন এবং আর্মানী আসলে কাশ্মিরান সাগরে।

যাহোক, এমতাবস্থায় ক্লার্ক হোক আর মিনিট ডেসপ্যাচই হোক মৌলিক লেখার কাজ যা কিছু তা করতেন সব ওপরওয়ালারা। বলা বাহুল্য, তাঁদের হাতেও কলমের বল যত ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল পদাধিকার বল। বহুদূরে আপিস করলেও তুর্কী প্রবাদের মতো তাঁরাও যাতে যার ক্ষমতা দেন, সে ক্ষমতা করে লাগবার মতো মাথার ওঁর বুদ্ধিও দেন।'

ফলে ডিকেন্স শেক্সপীয়র কুর্নিশ করে শিল্প হটে গেলেন। বড়বাবুর হাতে ইংরেজী ভাষার নতুন করে জন্ম হল। তার চেহারা আলাদা, চলনভঙ্গি আলাদা। কেরেকুণ্ড কলম বড়বাবুর হাতে সুতরাং বাক্য ও সৃষ্টি হল বড় বড়। বড়বাবুর বুদ্ধির মতোই পেঁচোয় তার গঠন প্রক্রিয়া। কথায় সেদিকোলনে তার জন্মবৃত্ত মোৎসার্ট, ধারণাটাচ, কারল স্পাই। বাইবেলে যে ভাষা চলে সরকারী কাজে তা চলতে পারে না। কারণ, বড়বাবুরও বড়বাবু আছেন, সুতরাং তিনি কেন কুশে ওঠার জন্য হটহট করবেন? বরং তার চেয়ে সেই ভাল, তিনি জনতার উদ্ধারার্থে ক্রুশ সাজিয়ে যাবেন:

এ ভাষার অফিসিয়াল নাম—'অফিসিয়ালিজ'। সে বস্তু কি, সৌভাগ্যক্রমে এদেশে যাঁরা প্রজা হয়ে জন্মেছেন এবং সরকারের সঙ্গে কোন না কোন উপলক্ষে ওটিকির পত্র বিনিময় করেছেন তাঁরাই জানেন। সাক্ষরদের কথা বেলাক্তরেও তার একই চেহারা, একই প্রকৃতি।

ইংলণ্ডের কথা বাদই দিচ্ছি। উদাহরণ আমেরিকানরা তথা বলে সোজাসুজি কিন্তু সে আমেরিকান তার থেকেনেই বাস করুন, হোয়াইট হাউসে যে নয় সে বিষয়ে আমি অন্তত কৃতনিশ্চয়। কেননা, সেখান থেকেই নিউইয়র্কের জনৈক প্রাধ্যায় পেয়েছিলেন নিম্নোক্ত চিঠিখানা।

তার একটা প্যারা—

"The efficacy of hydrocloric acid is indisputable, but the rosive medsidue is incompatible with metallic permanence ইত্যাদি।"

ভদ্রলোক স্টেট স্কুলে অব স্ট্যাণ্ডার্ড-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড দিয়ে জলের পাইপ পরিষ্কার করা চলে কিনা! তারই উত্তরে তাঁর হাতে এসেছিল এই চিঠিখানা, বহুজনকে দিয়ে টীকা ভাষ্য করানোর পরে এ কথায় যার মানে দাঁড়ায়—না, সেটা ঠিক হবে না!

যাহা আমেরিকার তাহা অস্ট্রেলিয়ার। এমন কি নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত। নিউজিল্যাণ্ড সরকার একবার একজন কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন এক খণ্ড জমি সার্ভে করে আসতে। সরকারের ইচ্ছে সেখানে তাঁরা একটা খেলার মাঠ করেন, কথা সময়ে রিপোর্ট এল:

"It is obvious from the difference in elevation with relation to the short depth of the property that the Contour is such as to preclude any reasonable development potential for active recreation."

অর্থাৎ এ জমিতে খাড়া যে এখানে খেলাধুলা চলবে না। উপসংহারে একটি ফরাসী দেশীয় নমুনা:

$$\frac{P}{Po} = R + B\frac{S}{So} + C\frac{M}{Mo} + B\frac{V}{VA} + A\frac{N}{NA}$$

ভাবছেন হয়ত বস্তুটা সায়ান্সের গবেষণাগারিক গোলা ঘাটানর ফলে কোন তথ্য পাওয়া গেছে তারই এক-অঙ্কবচনা কথা। না, আসল ঘটনা তা নয়।

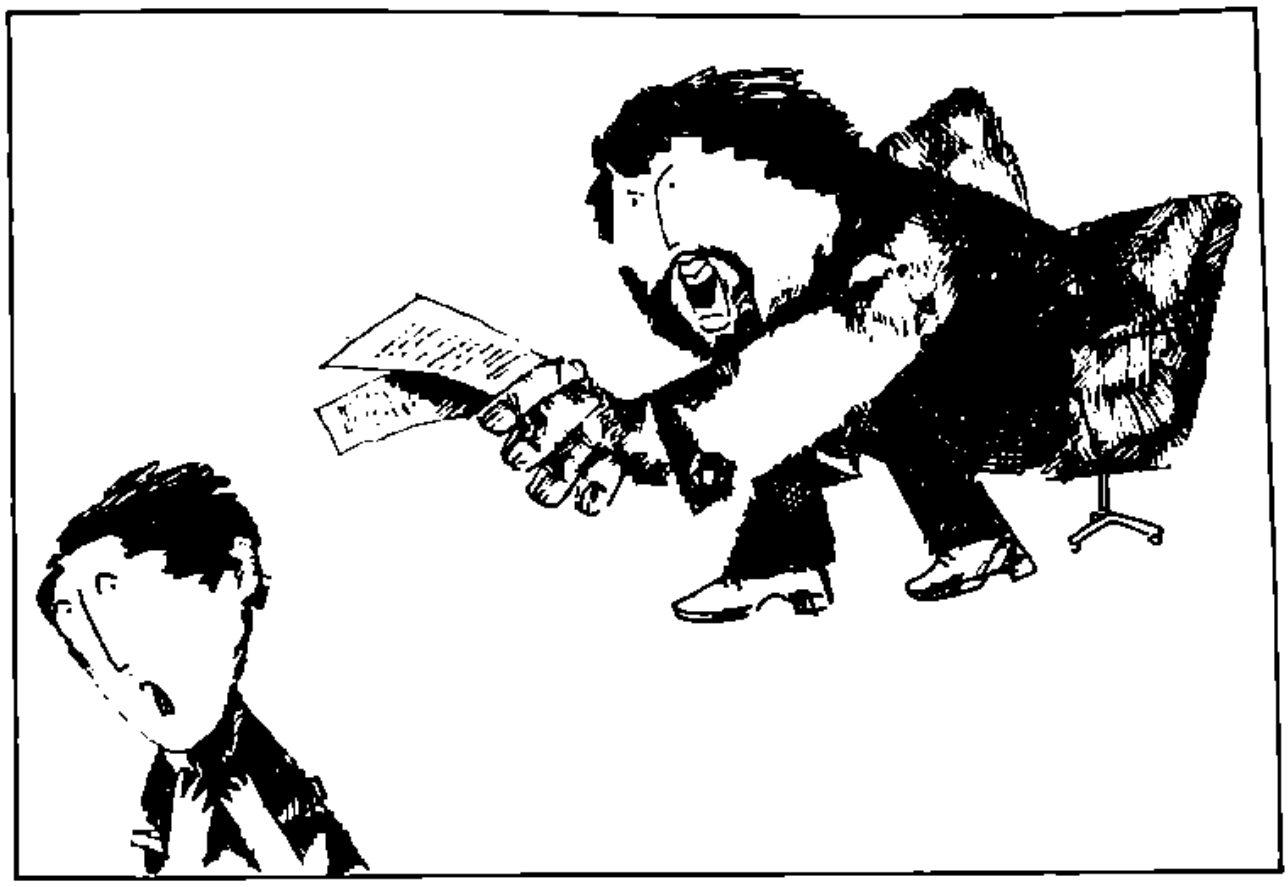

এটি ফরাসী সরকারের একটি ইস্তাহারের অংশবিশেষ। কুড়ি হাজারের চেয়ে বেশি মানুষের বাস যে শহরে সেখানে মাথা পিছু লেফাফাতোষ খরচ কি করে হিসেব করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের তাই জানান হয়েছে এতে। কোন শব্দের কি অর্থ বাইরের লোক হয়তো জানেন না, তবে শোনা যায় 'এম' যেখানে 'নোট' কাঁধে চড়ে আছে সেখানে যোগ করতে হবে শব্দটির বহন করবে যে ঘোড়া তার ঘাস খরচা! ঘটনা শুনে একজন ইংরেজ মন্তব্য করেছিলেন এতদিন বুঝতে পারলাম ফরাসী দেশে হয়তো মুদ্রা হ্রাস এমন করে গেল কেন!

সপ্তদশ শতাব্দের বহর দেখে ফরাসী দেশে মুদ্রা হ্রাস সত্যিই ওমে গিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও, ইতিহাস বলে একদিন এতদূরেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন ইংরেজরা সার এলান হার্বার্ট নেলসনের বিখ্যাত উক্তিটির ('England expects every man to do his duty')

অফিসিয়ালিজ্‌ম অনুবাদ করেছিলেন সেদিন:

"England anticipates that, as regards the current emergency, personnel will face up to the issues, and exercise appropriately the functions allocated to their respective occupation groups."

এমনকি শুধু বিদ্রূপে উপকার পাওয়া যাবে না দেখে স্যার আর্নেস্ট গোয়ার্স শেষ পর্যন্ত 'অফিসিয়ালিজ্‌ম'-এর বিরুদ্ধে বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। সে বইয়ের নাম 'প্লেন ওয়ার্ডস'।

'অন দ্য ম্যাজেস্টিস' কিংবা 'সত্যমেব জয়তে' অঙ্কিত যে কোন একখানা খাম খুলুন দেখতে পাবেন, যদিও প্রতিটি আপিসেই স্যার গোয়ার্স-এর বই কেনা হয়েছিল একাধিক কপি করে, তাহলেও শতাব্দী ব্যবধানেও একটি শব্দও আজও 'প্লেন' হয়নি। হক না সাবেকী, একটি বাক্যও অলঙ্কার ত্যাগে রাজী হয় নি, কারণ ব্যাপারটাতে সত্যিই কেরাণীদের কোন হাত ছিল না। কেননা, পিতৃপক্ষের মানা ছিল। সিভিল সার্ভিসের অন্যতম খুল্লতাত (পিতা বলা হয় অন্য একজনকে) স্যার ফ্রান্সিস হোয়ট্লি-এর মতে কেরাণীর একমাত্র কর্তব্য: তাকে যা করতে বলা হবে তাই করা।

অবশ্য বললেও কথা শোনে না এমন কেরাণীও পৃথিবীতে আছেন। অন্তত একজন তাঁদের এই কলকাতাতেই ছিলেন। নাম তাঁর জর্জ গ্রে। ক্লাইভ যখন গভর্নর তখন তিনি কলকাতার কালেক্টর। ভদ্রলোক সেবার কলকাতার এক শ্রেণীর মেয়ের উপর কর বসাতে শুরু করলেন। ক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে নিজের হুকুমনামা পাঠালেন। গ্রে সাহেব বললেন—'আপনার এমন আদেশ দেওয়ার অধিকার নেই।' কেন নেই সে কথা অবশ্য উক্ত সংশোধনী যোগে পরিবেশনের পর তিনি লিখছেন:

I cannot help observing that your lordship seems to give very ready and attentive ear to every information and insinuation to my prejudice, not can I help thinking there is Justice in Mr. Burdett's observation 'that your lordship seems determined to render the service a burden to those who have chanced to differ from you in opinion.'

গ্রে সাহেবের পরবর্তী চিঠিটি আরও বেপরোয়া। সেটি নকল করতে গিয়ে কলকাতার পরবর্তী একজন কালেক্টর মন্তব্য করেছেন—'দেখে দেখে লিখতেও আমার ভয় হচ্ছে, থেকে থেকে মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠছে!'

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের পুরনো ফাইল থেকে এমনি আর একটি লড়াইয়ের কাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে রেভিন্যু বিভাগের জনৈক কেরাণী তাঁর উপরওয়ালা জনৈক ইংরেজ আই সি এস-এর একটি চিঠির পাশে মন্তব্য লিখছে:

The arguments adduced were intended to throw dust into the eyes of the Revenue Board ; the case has no legs to stand on.

বলা নিষ্প্রয়োজন যে সাহেবের মতো এই শ্রেণীর উচ্চপদের ব্যক্তিরা মাস কাবারে তাঁদের মাইনে ধরবার ভাঁদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মটি চিরকালই এক, ওপরওয়ালা যা বলছে তাই করে যাও! আপিস ফাঁকি দিয়ে 'আর্টনি শো' দেখতে চলে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু কখনোর 'প্রিসিডেন্টের' বাইরে গেলে কি হবলে।

ফলে কর্তব্যনিষ্ঠ এবং ধার্মা কেরানীর কলমে যা হয় তার খু একখানা স্বদেশী নমুনা —

সীমান্তে তখন হামেশা পশু মোষ চুরি হয়। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ রিপোর্ট আসে—অমুক তারিখে অমুক জায়গা থেকে এত 'হেডস অব কাটল' চুরি গেছে। একবার চুরি হল একটা মোষ। সঙ্গে ফাইলটা একবার নেড়ে এসে কেরানী লিখে ফেলল—'ওয়ান হেড অব বাফেলো মিসকটেড ফ্রম'। ওপরওয়ালা খসড়াটা হাতে নিয়ে বললেন—মোষের শুধু মাথাটাই গেছে না শরীরটাও ? উত্তরে লোকটি কি জবাব জানেন ? বড়বাবুর সামনে এসে ফাইলটা খুলে ধরল !!

আর একবার বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক ভারতে আসতে চান। তিনি ভিসার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছেন আমাদের এখানে। তাতে লিখেছেন যে বহুকাল ধরে তিনি suffering from certain ailments. accompanied by insomnia and somnambulism এবং তাঁর ইচ্ছে যে ভারতে গিয়ে আয়ুর্বেদিক প্রক্রিয়ায় কিছুদিন চিকিৎসা করাতে চান। 'একমপ্যানিড বাই' কথাটা দেখেই চমকে উঠলেন ভারপ্রাপ্ত কেরানী। কারণ ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী তখন দল বেঁধে কারও ভারতে আসার অনুমতি নেই। সুতরাং চিঠি পেশ 'যেহেতু আপনার সঙ্গে একাধিক সঙ্গী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সেই হেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী ভারত সরকারের অমুক সনের অমুক তারিখের এত নং নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে ইত্যাদি।'

এছাড়াও কেরানীর কলমে আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিখিত আছে সরকারী দপ্তরের ফাইলে ফাইলে। এপ্রিলের টাকা পেওয়ার পর জীবিত ছিলেন কিনা, সেই প্রমাণাভাবে পেনশনওয়ালার মৃত্যু সনের টাকা আটকের কাহিনীটি আজ সুপ্রসিদ্ধ। তেমনি প্রসিদ্ধ সেই বিলিতি কেরানী কাঁটিটি। যুদ্ধের সময় জনৈক সৈনিকের একটা পা কাটা যায়। ফলে তাকে বলা হল যে, ছ'মাস ধরে আপনাকে আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু বাড়তি পেনশন দেওয়া হবে। ছ'মাস পরে ভদ্রলোক আবার আবেদন করলেন। সাড়াই আপিস থেকে উত্তর এল: তোমার সেই পা-টা যে এখনও নেই তার প্রমাণ চাই।

এর চেয়েও মজার চিঠি পেয়েছিলেন নাকি আমাদের দেশের একজন সরকারী কর্মচারীর বিধবা। তাঁকে জানান হয় যে, ছ'মাস সরকার বাহাদুর মনে মনে তাঁকে এত করে মাসোহারা দেবেন, কিন্তু এর মধ্যে ভদ্রমহিলার যদি মারা যান কিংবা যদি তাঁর আবার বিয়ে হয়ে যায় তবে নয়: চিঠিটার বাকীটা ছিল "টিল হার ডেথ অর রিমেরেজ অর চেঞ্জ, হুইচেভার অকারস আর্লিয়ার।" জানি না, এ চিঠির পরেও ভদ্রমহিলা সরকারী টাকার কথা নিয়ে কিছু ভেবেছিলেন কিনা! লর্ড মিন্টো ভেবেছিলেন।

তাঁর কাহিনীটা বলার আগে পূর্ববর্তী আর ক'জন গভর্নর জেনারেলের কাহিনীও সংক্ষেপে বলা দরকার। কেননা সেটাও প্রিসিডেন্টেরই ফল। অবশ্য ডালহৌসি থেকে যাঁর নামে সেই ডালহৌসি এমন কিছু কিছু প্রিসিডেন্ট স্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তীকালে কেরানীকুলে সত্যি সত্যিই লেখক জন্মাবার প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছিল। ডালহৌসি সব সরকারী চিঠি নিজে পড়তেন। অহরে তাঁর সংখ্যা ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার। তাঁর হাতের লেখা ভাল ছিল। তদুপরি কলম সম্বন্ধেও দুর্বলতা ছিল কিঞ্চিৎ। ফলে তিনি লিখতেন। তবে কলমটি ফেলস্টাফ নয়, 'মিনিট'। পরবর্তী অনেকেই বলেছেন ডালহৌসির হাতে লেখা সেই অসংখ্য মিনিটের প্রতিটিই সমান সুখপাঠ্য!

হাতের লেখা ভাল ছিল লর্ড ক্যানিংয়েরও. তবে তিনি বিশেষ লিখতেন না। সবচেয়ে ভাল ফেলস্টাফ এবং 'মিনিট' লিখতেন নাকি লর্ড মিন্টো। তারপর ওয়েলেসলি, মিন্টো এবং কার্জন।

যাহোক. মিন্টোর কাহিনীটা সত্যিই শোনবার মতো। সেবার গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রস্তাব পাঠান হল যে সরকারের ইচ্ছে যে কিছু ব্রহ্মদেশীয় ঘোড়া কেনা হোক। প্রস্তাবটার কোণে সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর জেনারেল লিখে গেলেন 'I agree. The Burma Pony is a damned good little thing!

কেরানী তদনুযায়ী সংক্ষিপ্ত উত্তরে লেখা পাঠালেন···'I am directed to inform you that in the opinion of the Governor General in council the Burma Pony is a damned good little thing. ইত্যাদি।

লাট সাহেব খসড়া দেখে ডেকে বললেন—এটা কি হল?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হল—'আজ্ঞে, মহামান্য কার্জনের আমল থেকে এসেছে তাই নিয়ম। তাঁর হুকুম ছিল আমি যা লিখব তোমরা সেটা 'কোট' করবে।'

কার্জনের আগে গভর্নরের মাথা থাকলেও হাতে ছিল সাহিত্যের কলম। সুযোগ পেলেই অধস্তন কর্মচারীদের তিনি তা দেখাতেন। একবার একজন কর্মচারী 'আর্জেন্ট প্রাইভেট বিজনেস' জৈষ্ঠিয়ৎ নিয়ে গভর্নর জেনারেলের কাছে ছুটির দরখাস্ত করলেন। কার্জন তার উপরে মন্তব্য করলেন।

"Leave is granted. But however urgent his affairs may be, I would advice him to keep them strictly private."

সন্দেহ নেই, কিছু শিক্ষা এসব দেখেশুনেই। কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিকের যে বিরাট বর্ণাঢ্য সেরেস্তার পেশ করা হয়েছে, তাঁদের সকলের শীকাই কি ওপরওয়ালার 'নোট' থেকে? আমার সন্দেহ আছে। কেননা, যে কোন লেখক এবং সমালোচক জানেন সৃষ্টির প্রেরণা একমাত্র সম্ভব অন্তর থেকেই। এবং বলা বাহুল্য, কেরানীর জীবনে সে বস্তুটি এখন যেমন আছে, মিল্টন না বের হলেও সেকালেও তেমনি ছিল। অন্তত, ফেলস্টাফের কাহিনে সে ধরনের ইঙ্গিতও আছে বই :

পরম পড়েছে। সেবারও সরকার বাহাদুর সদলবলে সিমলা চলেছেন। জনৈক অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি এক 'মেমো' যোগে জানালেন, সিমলায় বইপত্র নেওয়া সম্বন্ধে রীতি পদ্ধতির আমি কিছু পরিবর্তন করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী যাঁর হাতে ছিল সেই কেরানী উত্তর দিলেন ". . . . if Assistant Secy. wishes to be changed I am ready to act."

আর একজন অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ব্যাপারটা ইংরেজী ভাষার গোলমাল কিংবা অন্য কিছু, তিনি তা সঠিক বলতে পারেন না।

আর একবার একজন কেরানীকে ডেকে বলা হল—কার কলম ঘরের জন্য মোট ক'খানা ক্যালেন্ডার দরকার অফিসকে তার একখানা ফর্দ করা চাই।

পরের দিনই তৈরি হয়ে এল সেই ফর্দ। তাতে লেখা:

1 "Chief controller . . . I, to be hanged on the wall in residence.

2 Officers . . . To be hanged on the wall in the office.

পরে অবশ্য মাথা চুলকে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল সে 'আজ্ঞে, যাননি ভুল' কিন্তু অফিসার বিশ্বাস করেন নি। বলা বাহুল্য, আমরাও বিশ্বাস করি না। কেননা, বাঙ্গীকির কাল থেকে দেখে আসছি আমরা একটা বিশেষ পর্যায়ে না পৌঁছলে কেউ কবিতা লেখে না, এবং বড়বাবুরা যখন কেরানীর পক্ষে এতগুলো 'কবর' বই !

সেই ঘর, ঘড়ি আর অনিমেষ

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুত ঘর। মাঝখানে একটা সবুজ, ফাটাফুটো পুরনো বেল্জিয়ান মোড়া চার টেকো টেবিল। একতলার আধো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে নতুন নীল রঙ করা হয়েছে। এখনো চুনের গন্ধ যায় নি। ঘরটা বড়সড়ই, ঘুপচির মধ্যে বলে কি রকম প্রাগ-ঐতিহাসিক জন্তুর মতো থুবড়ে পড়ে আছে।

টেবিলটার চারদিকে চারটে পুরনো আমলের চেয়ার। কাঠের হাতলওয়ালা, কিন্তু গদি নেই। এক পাশের ছোলা জানলা দিয়ে বস্তির পলেস্তারা ছাড়া দেওয়াল আর অলকাতরা লেপা টিনের শেড দেখা যায়। শেড মানে একটা চাল—যেখানে যুদ্ধমান ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্র কিম্বা চোরেদের ঘড়ি ঘোষণা ছাড়া কিছু হয় না। আর শব্দ বলতে ভাতঘুমের বিভিন্ন প্রদেশের মিশ্র কগড়া, খোলগল্প এমনকি প্রেমালাপও হামাগুড়ি দিয়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ে। আর ঐ স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল শুষে নেয় সব।

ঘরটার বাইরের দিকে একটা দরজা। সেদিকে রাস্তা। রাস্তা মানে ছত্রিশ খোয়া পেটানো গলি। আর একদিকে ভেতর বাড়ি যাবার দরজা। সেদিকটা অন্ধকার গলি মতো। সেদিকে দিনরাত পশ্চিম দাওয়ারের টিমটিমে আলো জ্বলে।

টেবিলটার ঠিক ওপরের ছাদে ইয়া বড় একটা কাঠের ডালা লাগানো আদ্যিকালের পাখা। একটু দুলে দুলে পাখাটা ঘোরে। তাতে ভুতের চোখের মতো জোকর। একপাশে নক্সাকাটা কালো বইয়ের আলমারি কয়েকটা। ধূসর ধুলো মাখা কাচ এবং কজনো ওগুলো খোলা হয় না। এক কোণে একটা পুরনো বেতবোনা ইজিচেয়ার।

ঐ ঘরের ভেতরের দরজার মুখে একটা হলুদে-কালোতে মেশানো বাঘের মতো অ্যালসেসিয়ান সামনের থাবা দুটো ছড়িয়ে তার ওপর মুখ নামিয়ে জ্বলজ্বলে মিটিমিটি চোখে ঘুরে ফিরে তাদের চারজনকে দেখছিল। অনিমেষ এখানে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। ঘরের ভেতরের ছাদের দিকে জমাট বাঁধা সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। একটা কাঠের মাথা লাগানো একজোড়া বিলাস হুইস্কির শিঙে, আবছা মাকড়সার জাল। চার দেওয়ালে চারটি বিষণ্ণ মরা মানুষের তেলরঙের ছবি।

ওরা সবাই সুধাংশুদার পূর্বপুরুষ যোগীন্দ্রপ্রতাপ জমিদার। তাদের ধোঁকওয়ালা বা কামানো, হাস্য হাসি মাখানো নিষ্ঠুর মুখগুলো চোখ তুললেই চোখে পড়ে। তাই অনিমেষ এ ঘরে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিল না। ঘরে প্রায় দুপুর তিনটে থেকে জোর আড্ডা চলছে। এখন তিন রাউণ্ড চা হয়ে যাবার পরও ঘরে আবছা আবছা সন্ধ্যের মরা আলো, কি রকম ঝিমঝিমে ভুতুড়ে জবথবিজব।

ঘরের সবকিছু জিনিসপত্রই অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো। সুধাংশুদা সমেত, কারণ ওঁর বয়সও বাহান্ন-তিপ্পান্ন হবে। অনিমেষ, বরুণ আর কল্যাণ তিন বন্ধু। আধা সাহিত্যিক যুবক। ত্রৈমাসিক কাগজ বার করে। আর সুধাংশুদা ঐসব যোগীন্দ্রপ্রতাপ জমিদারদের বংশধর। ভাগ হয়ে যাওয়া শরিকানী বাড়িতে থাকে। পাইখানার পাশের এই এঁদো ঘরটায় (সন্ধ্য

চুলকায় হবেছে) গজলতরা নাম বৈঠকখানা। সরকারী অফিসের হেডবাবু। মাঝে মধ্যে কবিতা লেখেন এবং উঠতি সাহিত্যিকদের সঙ্গে রোববার আড্ডা দেন।

পাশের বাগান জমিয়ে বস্তি বসিয়েছেন ওঁর বাবা। বৃদ্ধির কাজই করেছিলেন। কারণ এর জন্যেই সুধাংশুর আড্ডা মারার খরচ উঠিয়ে এ্যাসসেসিয়ান কুকুর পোষেন। মাঝে মধ্যে ট্যাক্সি চড়েন, তালমন্দ খান, আর বছরে এক আধবার গীরাবৌদিকে নিয়ে রাজস্থান, শিমুলতলা, হাজারিবাগ এসব ঘুরে আসেন। একমাত্র মেয়ে বাবার প্রায় বছর চারেক হল বিয়ে হয়ে গেছে।

মিনুমিনি হলো এ ঘরের একটা জিনিস নেই। প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর দেওয়াল ঘড়িটা তুলে ফেলা হয়েছিল। তাও হতো না যদি না গীরাবৌদি চেঁচামেচি করতেন। দুদিন দিনে অধৈর্য গীরাবৌদি প্রায় আড়াইটে-পৌনে তিনটের সময় আড্ডা ঘরের মধ্যে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে আসতেন। তখন কান্তু কোঁচা সামলে সুধাংশু উঠে দাঁড়াতেন,—আরে যাচ্ছি যাচ্ছি এত তাড়াহুড়োর কী আছে? সবে তো সাড়ে বারোটা বাজে—' বলেই আর বৌদির চোখের দিকে তাকাতেন না। দুহু চুবি করে খেয়ে ধরা পড়া বেড়ালটার মতো চোখ পিটপিট করে বন্ধ দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলতেন,—এই যাঃ। ভুলেই গেছি যে ঘড়িটা বন্ধ। নাঃ—

গত তিন বছরে প্রায় বার পঞ্চাশেক সুধাংশু এইরকম করেছিলেন। তাই এবার ঘর চুনকাম করানর সময় বনমালীকে দিয়ে গীরা/বৌদি ঘড়িটা খুলিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে গত রবিবার ঘরে কোন ঘড়ি না থাকায় আবার উঠতে প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল।

সেদিন গীরাবৌদি ঘরে ঢুকে একটা নিশ্বাস চেপে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সুধাংশুর দিকে তাকিয়েছিলেন। সুধাংশু অভ্যেস মতো মুখ তুলে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ঘড়িটা না দেখে বিব্রত মুখে শুধু বলেছিলেন,

—আরে দেখো কাণ্ড! ভুলেই গেছি যে ঘড়িটা—

—খুব হয়েছে। আজ চান খাওয়া করা হবে? না হবে না?

—এই, এই যাচ্ছি—বলতে বলতে সুধাংশু উঠে পড়ছিলেন। আবার গীরাবৌদি বললেন, এরপর থেকে আড্ডা জমিয়ো বেলা বারোটা থেকে। তার আগে নেয়ে খেয়ে আমাকে মুক্ত করো।

এরপর থেকেই ঘরের ট্রাডিশন ভেঙে গেল। সারা ঘরের সমস্ত, অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে একটা আলট্রা-মডার্ন ইলেকট্রনিক ঝাঁ চকচকে টেবিল ঘড়িতে এখন সন্ধে ছটা বেজে পাঁচ মিনিট। আজ আড্ডা বারোটার পর থেকে।

সেই চকচকে সবুজ রেক্সিনে মোড়া ফাটাফুটো টেবিল। চারদিকে চারটে হাতলওয়ালা কয়ের গদিছাড়া চেয়ার। তাতে তিনজন আধা সাহিত্যিক মূরুব্বি আর একজন কবিকল্পপ্রার্থী প্রায় প্রৌঢ়, সোকেচারা, গড়িয়ে মন্ত্রবিদ্ধ হয়ে যাওয়া বনেদি মানুষ, চিন্তিত মুখে সিগারেট খাচ্ছে।

জেলা, কাব্য, কাব্যকলা, সাহিত্য, জরেস থেকে মায়াকোভস্কি পর্যন্ত পরিক্রমা করে, ক্রমবর্ধমান কাগজের রিমের দাম, এক কর্মী ছাপার খরচার বাজেট পর্যন্ত শেষ করে এবং কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই অবশেষে ক্লান্ত হয়ে থেমে এসেছে আলোচনা।

শেষ ছাউতের খালি চায়ের কাপের ওপর মাছি বসে আছে। এক কোণে সামনের খাবার ওপর মাথা নামিয়ে আড়চোখে মিটিমিটি চেয়ে থাকা, একটু কুঁজো হয়ে যাওয়া কিলাট বাঘের মতো এ্যাসসেসিয়ান কুকুর 'ভুট্টো'। মেজপ্রেমিক সুধাংশুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের কিছু পরেই ঐ কুকুরের বাচ্চাটা কিনেছিলেন। তখন ঐ নামটা ছাড়া অন্য আর কিছু আসেনি। কিন্তু এই ঘরে অনিমেষ কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না।

চারটে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেই গা শিরশির করে। সুধাংশুর সৌমূর্তি মেহগনিতেও একেবারে তার মুখোমুখি দেওয়ালে, কলাই-এর মতো গালপাট্টা নিয়ে চোখ সরু করে ওকে দেখছেন। চোখের দৃষ্টিতে কিছু কিলবিলে ভেদ নেই, অবশ্য ঘড়ে পর্যাপ্ত বিস্তর ভেদ পদার্থ আছে। সুধাংশুর মুখে শুনেছে যে ওদের সুন্দরবনের জমিদারিতে কাছারি ঘরে সর্বক্ষণ বসে থাকতেন। ইয়ার-বক্সী বেশি ছিল না। ওঁর সামনে কেউ বসতে পারত না। খাতা লিখিয়েরা দাঁড় টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাতা লিখত। পাশের ঘরে কাঠের স্ট্যাণ্ডে পঁচিশটা পয়ার তামাক দিয়ে হিলিম সাজা থাকত। রুপোর জরি দেওয়া জরদির নল ঘরের ঝুলঝুলির মধ্যে দিয়ে এসে হাতে ধরা থাকত। পাশের ঘরে আসবোলার খিদমতগারি করত বন্ধু সরকার। টেনে ধোঁয়া না পেলে উঠে গিয়ে জুতো পেটা করতেন মেজাংশুশেখর। কারের শুভুরের জুতো পরে সামনে দিয়ে আবার হুকুর ছিল না। কাছারির সামনে দিয়ে জুতো হাতে করে যেতে হত। কথাটা মনে পড়তেই অনিমেষের পা চুলকোতে লাগল।

ঐ পাশের দেওয়ালে প্রায় একশ বছরের পুরনো ওভারশেশ্বরের ছবি, এখন একটু নম্র হয়ে গেছে। সিটকে পড়া কামানো মুখে সরু পাকানো গোঁফ। হাতে গন্ধ খৈকার ভঙ্গিতে একটা গোলাপ ফুল। গায়ে আড়াআড়ি করে জড়ানো জমকাল কাশ্মীরি শাল। সামনের চুল অল্প পাতলা। পাশে বিষণ্ণ ভাবে দেওয়ালে ঠেসানো দো-নলা মুজেলী গাদা বন্দুক।

ইনি জাকির ছেলেন। পায়রা ওড়াতেন। শিকারের পঁয়তাড়া কষতেন। আর অবাধ্য প্রজার চাঁদির চুল দীনু নাপিতকে দিয়ে কামিয়ে তার ওপর কোঁটা কোঁটা করম জল ফেলতেন। আর ফিক ফিক করে হাসতেন। ওঁর সঙ্গে দীনুর নাচটাও মুখস্থ হয়ে গেছে অনিমেষের। পায়ে কাজ করা লপেটা। উনি আড় চোখে অনিমেষের চাঁদির দিকে তাকিয়ে আছেন।

ডান পাশের দেওয়ালে হেমনলিনী দেবী। ইনি নাকি ভারী বরলমু ছিলেন। দেব মন্দির করে পুকুর-টুকুর কাটিয়েছিলেন। অল্প বয়সে এক ছেলে নিয়ে বিধবা। কুল পুরোহিত হরষিত আচার্যের সঙ্গে বছরে একবার কাশী বৃন্দাবন বেড়াতে যেতেন। তবে কার ঘাড়ে কটা মাথা যে তাঁর ত্রিসীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে? ছবির মুখটা জলপাই, অনেকটা গোঁফ-দাঁড়া হুলো বেড়ালের মতো। দু-একটা ভারী ভারী গয়না দেখা যাচ্ছে। প্রজারা হাসীয় বলত। কেঁদে পড়লে মাফ্ করে দিতেন।

পেছনের দেওয়ালে অন্নদাতেশ্বর। তিনিও দুদে জমিদার। ভাস্কিস্ ঐকে এখন দেখা যাচ্ছে না। অনিমেষ পেছনে চাইল না। আড়চোখে হেমনলিনী দেবীকে দেখতে লাগল। কেঁদে পড়লে উনি মাফ্ করে দেবেন। আর হরষিত সম্বন্ধে কিছু না ভাবলেই হল!

টেবিলের ওপর একরাশ পত্র-পত্রিকা। একটা কালচে হয়ে যাওয়া এক আনা আকা ছোট শেওলের পরী। ওটা একবাল কাগজ চাপা দিয়ে এক আনার কিছুতেই উড়ে যেতে পারছিল না। সুধাংশুদার পাশে পাশের কাছে একটা মচকানো তাসজ খেলার ঘুড়ি।

এবার বিভিতিদের ছেড়ে দেশিদের নিয়ে পড়েছে ওরা আর কলরাল। আধুনিক কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে জীবনানন্দের প্রভাব কতখানি তাই নিয়ে কথার কুস্তি শুরু হয়ে গিয়েছে।

অনিমেষের মনটা আজ খুব ভাল ছিল না। অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা বোধে ও আক্রান্ত হয়েছিল। মাঝে মাঝে, বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলে ওঠা সিগারেটের আগুন, প্রয়োজনের ঘরে নতুন ঘড়িটার চারধারে জন্মাই সংস্কারগুলোর পাশে আবছা জ্বল জ্বল করা রেডিয়ামের দিকে সবুজ আলো দেখতে পাচ্ছিল।

সুধাংশুর আবছা কর্সা মুখে কালো চশমার ফ্রেমটাই নজরে পড়ছে। এক কোণে দেয়ালে ভুট্টোর সবুজ চোখ জ্বলছে। ঘড়ির আবছা সবুজ কাঁটাগুলো বলে দিচ্ছে এখন ছটা পঁচিশ। অনেমেষের সারা শরীরে মধ্যে কি রকম আনচান করছে।

এই ঘড়িটা। নতুন ঘড়ি। সেই পুরনো ইদুরটা আস্তে আস্তে শরীরের সমস্ত মাংসপেশী টানটান করে, সমস্ত চেতনার জোরদের জলের মতো ঘড়িয়ে যাচ্ছে। ওটা করতেই হবে। ও ভয় হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। প্রায় নিজের অজান্তেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে ও হাত বাড়াল।

কেউ তার দিকে খেয়াল করছে না। আস্তে আস্তে তার আঙুলের সঙ্গে ঘড়ির পারাটা টেকল। সেই পুরনো ইদুরটা তার বুকের মধ্যে সমস্ত মু আর মু-এর ঘর ছাড়িয়ে, তা-থৈ-থৈ নাচ নেচে মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে

বিদ্যেধরদের মতো ছড়িয়ে গেল। তারপর ডান হাতের তর্জনীটা ঘড়ির পাতার ফাঁকে গলিয়ে, আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর ছড়ানো বই আর কাগজপত্রের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে একটু একটু করে নিজের কোলের দিকে টেনে আনতে লাগল।

তর্কের ফাঁকে সুধাংশুদা একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। কট্ কট্ করে প্রেস্টি হয়ে আসা অস্থিগ্রন্থির শব্দ হল। তারপর হঠাৎ অনিমেষের দিকে তাকালেন। সুধাংশুদা কিছু খেয়াল না করেই বললেন—বড় অন্ধকার হয়ে গেছে ঘরটা—আলোটা!

বরুণ উঠে দাঁড়িয়ে দিয়ে বলল,—আসলে জীবনানন্দ আর সুধীন দত্ত!—কেন বুদ্ধদেব শুরু হয়ে গেল।

অনিমেষের মনে পড়ল যে কোন দামী রেস্তোরাঁর চকচকে স্টেনলেস স্টীলের চামচগুলোর কথা। সেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে সমস্ত শরীরের মধ্যে আনচান করে ওঠা শিরশিরে ভাবটা। খুব যৌন-কাতরতার সঙ্গে নারীদেহ স্পর্শ করে যে সোপন অনুভূতি জন্মায় শুরু হয় সেইরকম একটা বোধ ওর হাতে খেলা করতে আরম্ভ করে। তারপর সবার অলক্ষ্যে দম বন্ধ করে সেটাকে পকেটে পুরে ফেলার সরল নিষিদ্ধ আনন্দের কথা। অতি গোপনে, নিঃশব্দে সঙ্গীবিহীনা একা একা সেলোফোনে ঘুরে এসে চান করে দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছোট বোনের সঙ্গে খুনসুটি গল্প করার মতো ব্যাপারটা। কেউ কিছু জানল না, বুঝল না—এসব কথা কাউকে বলে বোঝানো যায় না।

ওর ঘরের ড্রয়ারে সাতাশটি বিভিন্ন রকমের চকচকে চামচে জমেছে। সৌমেনের বাড়ির বকবকে পেতলের ওপর লাল সবুজ প্রীমে করা এ্যাসট্রে। ওটা ওভারকোটে লুকিয়ে রেখেছে। কিছুদিন আগে দুটো না লাগানো চকচকে নতুনত্ব হাতল সে বরুণদের বাড়ি থেকেই নিয়ে এসেছিল। পরে বরুণ আবার ওর বাড়িতে দেখতে পেয়ে ফেরত নিয়ে যায়, কিন্তু বন্ধু মহলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা লজ্জার। পরম্পর ডাক্তার বলেছে, এটা নাকি একটা অসুখ। ক্লিপটোম্যানিয়া।

"অসুখ-ফসুখ বুঝি না, আজকের কাজটাও করতে হবে-হবেই হবে—সারা শরীরে রক্ত আনচান করছে—শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতিকরণ—ঐ চকচকে ঘড়িটা নারীর সোপন অঙ্গের মতো লোভ দেখাচ্ছে—" অনিমেষ

পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া মুখে আড় চোখে অন্য সব মুখগুলো দেখে নিল। সব অবয়ব আবছা বলে পরস্পরকে চেনা যায়।

অনেক শব্দ আর কথা মিলেমিশে তার মস্তিষ্কের কোষের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, এখন অস্থিরের তান্ডব তুলছে। শব্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। হাতটা মাথার ঘরে দিয়ে মন্থরভাবে ফেটে চলে যাওয়া ঘুড়ির মতো ধীরে ধীরে ঘড়িটাকে তার কোলের কাছে টেনে আনছে। আস্তে, আরো আস্তে, ঘড়ে কেন শব্দ না হয় তেমন করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিল অনিমেষ।

এবার পেন্ডুলামের পরীটাকে পাশ কটাল নিশ্চয়ই। এখন ঘড়িটা ঘুরিয়ে নিতে হবে। ঘড়িটার চলচকে হয়ে ওঠা হাল্কা সবুজ রেডিয়ামের কাঁটা আর ঘন্টার ফুটকিগুলোর ওপর চোখ পড়লে চলমান ঘড়িটা সবার চোখে পড়ে যাবে।

জামার হাতাটা বড় সাদা। অন্ধকার টেবিলে চোখে পড়ছে। তাই আস্তে হাতটা নাড়িয়ে কনুই অবধি হাতটা গুটিয়ে নিল অনিমেষ। সমস্ত শরীর টান টান হয়ে গেছে। শিকারের ওপর ঝুঁকি মেরে কাঁপিয়ে পড়া চিতার মতো তার শরীর এখন নমনীয়, হিংস্র। সারা দেহে একটা রিমঝিমে আনন্দ ঘরে পুলকের ঘাম। অপূর্ব সুন্দরী, কমনীয়, পেলব একটা নারীদেহ, বুকের মধ্যে নিয়ে খেলবে আনন্দের মতো একটা মধুমত্ত সুখ তার শরীরে গলে গলে পড়ছে। ঘড়িটার একটা পায়া একটা ক্যাসকেডের কোণায় আটকে গেছে। তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে ঠেলে ঘড়িটা পিছিয়ে কোলটা খুলে নিল অনিমেষ।

পাশের দেওয়ালে একটা কালো ফ্রেম। ওর মধ্যে অন্ধকারে আরো কালো, গোঁফওলালা শুভ্রাশুশেখরের হাসিটা যেন দেওয়াল থেকে দীর্ঘ হয়ে বেরিয়ে এসে অনিমেষের চাহিনিতে একফোঁটা বরফ গলা জল ফেলে দিল। একটা নিশ্চিন্ত অনুভূতি শিরদাঁড়ার তলার দিক থেকে উঠে মাথার মধ্যে আতস বাজির ফুলঝুরির মতো ফেটে পড়ে আবার স্থির হয়ে গেল। এক কোণে দরজার দিকের দেওয়ালে একজোড়া সবুজ চোখ একটু নড়ল। একবার দুলে নিয়েই আবার চকচক করে জ্বলতে লাগল।

ঘড়িটা একেবারে টেবিলের ধারে এসে গেছে। সামনের আলো জ্বলা ভেতর বাড়িতে যাবার গলির দরজায় তার যেন ছায়া পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—এরা সব ভূত না তো? কী সব লোক গো: বলতে বলতে মীরাবৌদি ঘরে ঢুকলেন। সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকাল। সেই ফাঁকে অনিমেষ বিদ্যুৎবেগে ঘড়িটা নামিয়ে তার প্রিন্টলনের প্যান্টের ডান পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

অনিমেষের কপালে ঝুলে ওঠা সিরা-উপসিরার ওপর জমে উঠেছে বিন্দুবিন্দু ঘাম। সরো মুখ লালচে, জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ খুশি খুশি, অকপট্ট শরীর ও উজ্জ্বল চোখ।

ঘরে নিওন আলো জ্বলে উঠল। বিরক্ত মুখে কোন রকমে হাসি টেনে এক কোণে মীরাবৌদি দাঁড়িয়ে। ভুট্টো ঘুরে ঘুরে সবাইকে ডেকে সুধাংশুদার সামনে লেজ নেড়ে আস্তে অনিমেষের সামনে এসে দাঁড়াল। অনিমেষের মুখ এখন সাদা হয়ে গেছে। আড়চোখে নিজের অস্বাভাবিক ফুলে ওঠা ডান পকেটটা দেখল। তারপর একটা মানিক পত্রিকা টেনে এনে কোলে চাপা দিয়ে তার ওপর চোখ নামাল। মীরাবৌদি খুতনিটা একটু ওপরে তুলে শক্ত চোয়ালে সুধাংশুদাকে বললেন,

—আজ বড়দির বাড়ি নেমন্তন্ন। মনে আছে?

—এই ছাড়ি, এক্ষুনি—বলেই ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। ভুট্টো, মীরাবৌদির পেছন পেছন লেজ নাড়াতে নাড়াতে রান্নাঘরের ভেতরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু অস্বস্তির সঙ্গে অনেক মিনিয়ে অনিমেষ আর ওরা নূতন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন অনিমেষের সারা শরীরে স্নিগ্ধমিষ্টি তৃপ্তি। বরুণ বলল,—তাহলে ঐ কথাই রইল সুধাংশুদা, আমরা স্বাগতম সংবর্ধনার জন্য আপনার একটা দীর্ঘ কবিতা পাচ্ছি।

অনিমেষ পত্রিকাটা দিয়ে নিজের পকেট আড়াল করে দরজার বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিল। বরুণের দেখানে বরুণ হাসি হাসি মুখে দরজা দিয়ে দেখে, বস্তির মুখে, সরু গলিতে একটা ঠেলা ওয়ালা উনুনকে পাশ কাটিয়ে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলল,—সুধাংশুদাটা একটা গাধা। এখনো উনবিংশ শতাব্দীতে আছে।

বরুণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, উনবিংশ, একবিংশ জানি না, তবে ঘুটো বিজ্ঞাপন আর চারটে কর্মার খরচ যে কবি অনায়াসে কলমকে দেয় সে চর্বাপদ লিখলেও ছাপব। বুঝে।

অনিমেষ মাথার ওপর ঘুটো বাড়ির ফাঁকে ঝলমলে সন্ধ্যাতারা ওঠা এক টুকরো আকাশ দেখতে পেল।

হঠাৎ পেছন থেকে সুধাংশুদা ডাকলেন, এই অনিমেষ! একবার শোনো।

অনিমেষের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। আড় চোখে পেছন ফিরে দেখল, দরজার পাল্লা ঘুটোর ফাঁকে সুধাংশুদার অমায়িক, চশমা পরা আবছা ঘর্মাক্ত মুখ। বরুণ আর কমলাল থমকে দাঁড়াল। কমলাল ফিসফিস করে বলল,-পেছন থেকে শুনে ফেলল না তো, শালা!

আর অপ্রতিরোধ্য নিয়তির মতো পা ঘষে ঘষে অনিমেষ সুধাংশুদার সামনে এসে দাঁড়াল। তার আর পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না।

—একবার ভেতরে এস তো ভাই—অদ্ভুত হাসি মাখা মুখে সুধাংশুদা তাকে ভেতরে ডাকলেন।

অনিমেষ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। এখন ঘরের মধ্যে অন্ধকার করছে আলো। শরীরের সমস্ত রক্ত, বুকের মধ্যে, গলার মধ্যে, কানের পর্দার মধ্যে ধক ধক করছে। বিস্ফারিত চোখে তার মনে হল যেন চারপাশের দেওয়াল থেকে, অভ্যাশুশেখর, স্নেহাশুশেখর আর শুভ্রাশুশেখর নেমে এসে ওর চারপাশে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছেন।

সুধাংশুদা হাসি হাসি মুখে হেমন্তলিনীর ছবির সামনে গিয়ে অনিমেষের দিকে পেছন করে দাঁড়ালেন। তারপর খুব রহস্যময় গলায় বললেন, সব কথা সবার সামনে বলা যায় না, কি বল অনিমেষ?

অনিমেষের আর কিছু বলার ছিল না। তার ইচ্ছে হল এভাবে কাঁদা না পেতে সুধাংশুদার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়তে। এতক্ষণে তার চেতনার মধ্যে লজ্জা আর অপমান বোধ ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে ভুট্টোর গলার ডাকাডাকি ভেসে এল। সুধাংশুদা সেদিকেই বললেন, পরশুদিন আমাদের অফিসে প্যানেল বেরিয়েছে। তোমার নাম আছে। করে মিষ্টি খাওয়াচ্ছো—বলে হাসিমুখে আবার বললেন, আমাদের অফিসে তোমার চাকরি হয়ে গেছে। ভেতরকার খবর, তাই ওদের সামনে বললাম না। চিঠি টাইপ হয়ে সই হয়ে গেছে।

অনিমেষের সামনে সারা ঘরটা দুলছে। ছবিগুলো ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে দেওয়ালে—তবে বাপারটা তা নয়। অস্ফুটে বলল, আমি একটু জল খাব, সুধাংশুদা—

—কি গো: চাকরির কথা শুনেই গলা শুকিয়ে গেলো? দাঁড়াও। হো হো করে হাসতে হাসতে সুধাংশুদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকেই সাপুড়ের বাঁশির সামনে ঘুলে ওঠা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো অনিমেষ ঘড়িটা তার ডান পকেট থেকে বের করে তার পুরনো জায়গায় বসিয়ে দিল। ঠিক ডালা ছাড়া পেন্ডুলাম পরীটার পাশে।

সেই চলচকে নতুন ঘড়িটা প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে বসে ঝলমল করতে লাগল। টুকুক টুকুক করে লাফিয়ে সুধাংশুদার পূর্বপুরুষরা আবার সব যে যার দেয়ালে ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

সুধাংশুদা জল নিয়ে এলেন। জল খেয়ে অনিমেষ দেখল ঘড়িটার সামনেই দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে মীরাবৌদি ডাকলেন,

—কই গো—

—এই যাই।

হাসি হাসি মুখে দরজা খুলে সুধাংশুদা বললেন, ডাক্তারি দেখেন।

অনিমেষ ঘরোয়াচিত্রের মতো অগাঢ় চেতনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ভুলে দীর্ঘ নিশ্বাস নিতে নিতে দেখল ঠিক তার মাথার ওপর ঝলমল করছে টেনসেস স্টীলের কালপুরুষ।

সুখেন গুঁই ও মুথাঘাস

আবুল বাশার

সুখেন গুঁইয়ের দিনে দিনে সব কেমন অস্পষ্ট ঠেকছে। কোন কিছুরই আথরি-রহস্য সে ভেদ করতে পারছে না। বসুমতি বড়ই উতলা হয়েছেন। মানুষের দুনিয়াদারী হয়ে উঠেছে নিতান্ত পছিল। ধরিত্রীর কোলে অন্ন অয়র ঘাসের অভাব, ধরিত্রীর কোলে ফুল নেই। মধুমতীর চটানে অতকাল বাদে বহুবর্ণ পাখির পাঁচখানা পালক কুড়িয়ে পেয়েছে সিদু পরামাণিকের ছেলে সুধন্য। বালো মায়ের সংসারে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে কিনা সুখেন গুঁই সবিস্তারে বলতে পারে না। আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঁচটি ফুলের কাহিনী লেখা হয়েছে, পাঁচটি পালকের সংবাদ ছাপে নাই সুখেন গুঁই সাংবাদিক হলে কাগজের প্রথম পাতায় সংবাদটি বড় করে, মস্ত মস্ত অক্ষর সাজিয়ে ঠুকে দিত কিংবা সুখেন গুঁই এরকম সংবাদের তাৎপর্যের উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে বার্তা সম্পাদকের কাছে তিরস্কার সহ্য করত অন্তত সে মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারত সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি সুখেন বর্তমানে বাসিপুরের ডিহিতে গরু চরাচ্ছে। তবে সংসারে ভগবানের কৃপায় দুইখানা গাভী লাভ হয়েছে।

অবশ্যের জগতে বিশ্বাস করার মতো সাহস কিংবা যৌক্তিকতা সুখেনের না থাকলেও, অভিজ্ঞতায় এবং বাসনার টানে সে কোথাও ভাবে নাই। কেন না, নিরীশ্বরের কল্পনা সব সময় অসম্ভব এবং দুঃসাহসিক। একেবারে উদ্ভট ও অন্যান্য যা খুশি যেমন খুশি, যেখা খুশি সে তা পৌঁছানোর এবং ভাববার শক্তি, উৎসাহ আর অবকাশ তার অফুরন্ত। কারণ, সবই সে কল্পনা করতে পারে। সব ছবিই তার কল্পনার ক্রীতাক্ষের। এই আকাশ নিয়ে তার কল্পনা নিরাহীন। সমুদ্র অরণ্য তার কল্পনার বিষয়। সে তার গরু নিয়ে ভাবে। গরুর ঘাস নিয়ে চিন্তা করে। গরুর জল নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। গরুর চিন্তা তাকে অন্নের চিন্তায় পৌঁছে দেয়। গরুর ঘাস তাকে ঘাস-লতাপাতা সমীপবর্তী করে, তার কল্পনায় সাধু ভাষা আছে কথা ভাষা আছে। গরুর চিন্তা তাকে অরণ্যের কাছাকাছি ভাবা চিন্তাতে পৌঁছায়। কেন না সে যখন ছোটবেলায় ইস্কাতীনে কেইল হওয়ার পর বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করে। এবং তারপর গরুর পোছনের সঙ্গে বাকা বিনিময়ের আজৈবনিক নাটক এই বসুধা-বক্ষে মঞ্চস্থ করেছে, সে কাঙাল হয়েও কবিতা হারায় নাই। আজ নাই, ঘাস নাই, জল নাই, তবুনি তার কবিত্ব থেকে যেতে পারে। কারণ, তার দৃষ্টিটি পড়ীর আছে। পড়ীই তার কল্পনার উৎস। দূরের কল্পনা নিয়ে এখন সে গরু চরাচ্ছে। কালো গরুটির নাম কৃষ্ণা। সাদা গরুটি সরস্বতী। সরস্বতীর ছবি সে গত বছর সংবাদপত্রে মুদ্রিত দেখেছে। একটি পড়ীর, যদেশেই কোন নশ্বরিক পড়ীকে সে সরস্বতী ভ্রমে আখ্যা হয়েছে। গ্রামে কোথাও ঘাসের জল নেই। ঘাস নেই। গরুটি ছেঁড়ার চেষ্টে জিভ বার করে ঘাসের গোড়া চাটছে। ঘাসের যে নাক দিয়ে জল গড়ায়, সেই নাক ওকছে। সরস্বতীই ঠিক। ছবির তলায় লেখা রয়েছে 'খরা'। ছবিটির প্রতীক-মূল্য সে বোঝে না, কিন্তু ঐ ছবি তার মর্মে দিয়ে দিয়েছে।

সাংবাদিক ভুল করেছেন। ওখানে কৃষ্ণার ছবি ছাপা উচিত ছিল। কৃষ্ণার গায়ে হাত বুলিয়ে চিন্তা করল সুখেন ওঁই। সরস্বতী একটু এগিয়ে ঘাসের বলে মাটি চাটছে। কৃষ্ণার রঙ কালো। কালো রঙ রোদ এবং খরা শোষণ করে বেশি। ফলে ক্রমে তার গলা শুকিয়ে আসে। কালো চামড়া রোদ এবং খরা শোষণ করে বেশি, তাই ক্রমে হেতে ওঠে। কালো এবং সাদা রঙ দুটির তাৎপর্য সাংবাদিক বোঝে না। কৃষ্ণার ছবি ছাপলে ওরকম অনেক বেড়ে যেত। তাদের নিয়ে সরস্বতীর ওপর মায়া বেড়ে গেল সুখেনের। চামড়ার রঙও কখনো কখনো উজ্জ্বল হয়। সাদা চামড়ার তুলোন কি ফেটমন্দুর নয়? সুখেন আপনাতে বর্ণ-বিদ্বেষ ত্যাগ করে। আমেরিকার সমুদ্র টুকরো অরণ্যের দিকে চায়। ওখানে কি ঘাস আছে?

সুখেনের অনুভূতির মধ্যে সন্ধেটে ঢুকেছে। সব কিছু সরে যায় কেন? কাছে আছে নদীটা ছিল। সরে যাচ্ছে দিনকে দিন। জল সরে যাচ্ছে। আকাশে কেবলই বালি। সমুদ্র অরণ্য মোপসট হয়ে গেল। অরণ্য সরে গেল। কোথায় গেল পড়ীর অরণ্যের গাছপালা, লতাগুল্ম, স্যাতসেঁতে অন্ধকার? গো-চারণের মাঠ, গো-বহ-র জল, ঘাস, হিম-সেবা কোথায় গেল? সমুদ্র অরণ্য ছাড়া, গাছপালা ছাড়া মানুষ বাঁচে কিনা সুখেন ঠিক জানে না, গো-চারণের ঘাস ছাড়া কৃষ্ণা সরস্বতী যে বাঁচে না, সুখেন ওঁই খুব স্পষ্ট করে বোঝে।

সেই সকালে বেরিয়ে পড়েছে কোঁচড়ে চাল-ডাল নিয়ে। পাদুড়িয়া বেলসপুর পেরিয়ে সুজনপুরের দহ। সেখানে জল নেই কাদা নেই। মরুভূমিতে এসে দেখল চারদিক ধূ ধূ করছে। সামনে কলমীডাঙার মস্ত কুয়োটিলা। কী হবে কৃষ্ণার? কী হবে সরস্বতীর? সুখেন ভুমিহীন। পস্ত করবার জমি নাই তার। পেটের অন্নের জন্য। গরুর খাদ্যের জন্য। অথচ তার মুঠিটি মুক্তোর খনি আছে। বাজারে এখন গো-খাদ্যও বিক্রি হয় না। বিক্রির জন্য যদি কিছু তুলি আসে, কেনবার কড়ি নেই। কৃষ্ণা-সরস্বতী বাঁচবে কী করে? সুখেন শুনেছিল, সরকার গো-খাদ্য নিয়েছেন পঞ্চায়েত মারফত। পাঁচ-সাত বছর আগে, অন্য সরকার ক্ষমতায় সুখেন ওঁই চৌমুহীনের বৈঠকে কাজের সংবাদ পড়েছিল, তুলি পাইয়া কেলেঙ্কারী, অমুক মন্ত্রী, অমুক এম.এল.এ মিলিয়া উক্ত তুলি বাইয়া ফেলিয়াছেন, মানুষ হইয়া গো-খাদ্য খাইবার পঞ্চেন্দ্রিয় মানুষের পেটে গজাইল কী করিয়া সুখেন বুঝিতে পারে নাই। অবশ্যের এ বয়স সুখেন মূঢ় জগতে সান্ত্বনা করেছে। তোর থেকে সন্ধ্যা ইদানীং মৃত্যুভাবনাই তার উত্তম প্রসঙ্গ। কারণ, পঞ্চায়েত ভবনের উঠোনে বসে সুখেন ওঁই পঞ্চায়েত প্রধানের রাজনৈতিক আলাপ শুনছিল গত সাত দিন পূর্বে, এ বছর। 'বরার রাজ্য-সরকার গো-খাদ্য সরবরাহ করছেন।' শুনতে শুনতে সুখেনের বারবার কৃষ্ণা ও সরস্বতীর শুকনো মুখ মনে পড়েছিল। প্রধানকে শুধিয়েছিল—তবে যেকেন সেই ঘাস?

প্রধান হেসে ফেললেন—ঘাস কিসের? গরুর শুকনো খাবার যেন আমরা। দেখ, যারা প্রান্তিক চাষী, তাদের। তুই তো পাবিনে সুখেন। তোর যে জমি নেই বাপু। সুখেন বলেছিল—তবে ঐ শুকনো খাদ্য কাদের জন্য। গাইগরুই উপোষে থাকবে বলছেন, মা ভগবতীর মুখে গ্রাস উঠবে না?

বলতে বলতে চোক গিলেছিল সুখেন। গলার কাঠি-মালার কণ্ঠমণি ঢোকটুকু কেন কাঁই করে নেমে গেল। মালার সাথে গলার মাদুর মতো চড়চড়ানো নামা-ওঠা করল। সেদিকে চেয়ে অন্যমনস্ক সুখেনকে মিঠে হেসে বললেন প্রধান—গ্রাস উঠবে কী করে কবি তো: বরাদ্দ হয় নাই। আমাদের সমাজে স্বামী পুত্র খাবে, কাচ্চাবাচ্চা খাবে, তারপরে তো মা। মা খাবে সবার শেষে। তোর কৃষ্ণা, তোর সরস্বতীর জন্য বরাদ্দ হয় নাই সুখেন। গো-ছাগের খাদ্যেটে নারী উপেক্ষিত। আমি এটা নেটি করলাম সুখেন। গো-বাজেটের সাথে স্তনিটিনের যোগ নাই। এটাও নেট করা রইল। এটাকে যেন একটা কুসংস্কার ভেবে নিও না। আমি দুঃখ পাব বাপু।

তারপরই মুখাবয়বকে গালি-গালাজ করেছে সুখেন ওঁই। বরিত্রী মায়ের কোলে মুখা-বাসও গজাতে পারছে না। সবচেয়ে শক্ত ঘাস প্রাণ। সবচেয়ে চট গজিয়ে উঠে বেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা যার বিস্ময়কর, সেই মুখাও আজ নিষ্ফুল। চৈত্র গেছে, বৈশাখ গেছে, জ্যৈষ্ঠও নির্বিকার। আষাঢ় এসেছে। বৃষ্টির ছোঁয়া লাগেনি ঘাসের শিকড়ে, যা দু'চার ফোঁটা পড়েছিল, বালুকা শুষে নিয়েছে, মৃত্তিকা জিভ দিয়ে টেনে নিয়েছে। গরু যখন বোবা হয়ে গেল। কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিলেন ভগবান। আগেকার কালে গরুর মুখে ভাষা ছিল। সুখেন এ কথা বিশ্বাস করে। কেন করবে না? কৃষ্ণা-সরস্বতী তো দুনিয়ার মানুষ দেখেনি। দেখলে বুঝত, বোবা গরুও কথা বলে, তার স্পর্শ শক্তি আছে। ঘ্রাণ শক্তি আছে। কষ্টের অনুভূতি আছে। গরু কাঁদতে জানে। দুঃখের গুহিতে আপন বাচ্চার জন্য দুধ লুকিয়ে রাখতে জানে। তার পক্ষে কথা বলা কি অস্বাভাবিক ছিল? তা, ভগবান সেই কথা বলার ক্ষমতা নিয়ে কেড়ে নিলেন। কেন নিলেন?

গরু নাকি চাষীর কাজের সমালোচনা করত। চাষী যখন ঘরে মরত গরুকে, অন্যায়ের মতন চিৎকার করত গরু। অভিযোগ করত। নালিশ করত। চাষীর অন্যায়ের কথার ব্যাঘাত হত। ইচ্ছে মতন ঘটনের অনুবিধা হত। জোর করে মুখ নিয়ে নেওয়ার খেলা অন্যায়ই হত। গরুর মনিবের তা সহ্য হল না। সেই কারণে গরু বোবা হয়ে গেল। ভগবান যখন মুখের ভাষা কেড়ে নিলেন, তখন ভগবানের সন্ধ্যাও হল খুব।

সুখেন কৃষ্ণার গলায় হাত বুলিয়ে ভাবল, ঘণ্টা নাড়িয়ে চিন্তা করল, মুখের ভাষাই যদি না থাকবে, তবে জলের টানে মুখ ঘষে কেন সরস্বতী? আহা! তাই কি? মুখে কথা নেই বলেই তো, আদর করে টানের মুখ ঘষে জিভ মেলে দিয়েছে। অতএব ভগবানের সন্ধ্যাও হল খুব। সুখেন দেখল, ঘাসিপুরের দেব ঘরে পুবকোল বেয়ে কলমীডাঙার অরণ্যের নিশন ভেঙে কে একজন যেন এদিক পানে এগিয়ে আসছে। এক কোঁটা পানিও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। আকাশে মুর্তিদের টিল চক্রকার নিচ্ছে। কখনও বা কেঁপে উঠছে টানা সুরে। সুখেন ভাবল, ভগবানের সন্ধ্যাও হল তখন। ভগবান সবাইকে আবাহন। সবাই তো আর আসবে না। কেউ কেউ এল। গরু এল। লতাপাতা এল। গোসাপকুকুর এল। পশুপাখি এল। কিছু কিছু সবাই এল। ভগবান তখন সকলকে বললেন—আমি গরুর মুখ বন্ধ করে দিলাম। গরু আর কথা বলতে পারবে না। আদাযবার চাইতে পারবে না। কোন আপত্তি অভিযোগ তুলতে পারবে না। এই অবস্থায় গরুর ভার কে নেবে? গরু খাবে কি? ঘাস পাই বলল—আমরা পারব না। মানুষ আক্রমণের সন্ধান করে নিয়েছে। গাছপালাও বলল, আমরাও নারাজ।

আমরাও মানুষের কথা ভাবছি। তা সত্ত্বেও আকাশের কাছে আমরা জল চাইব। গরুও জল খায়। কেউ ঠিক রাজি হতে পারল না। তখন মুখ্যা ঘাস ছিল। সে বলল—তোমরা একটু জল চেও, তবেই হবে। আমি গরুর দায়িত্ব নিলাম। চাষা আমার কেটে মেরে শেষ করতে পারবে না। আমি মিনিটে মিনিটে মাথা তুলে দাঁড়াব। ফসলের ঝুঁটিতেও আমি থাকব। ওখানেও আমার বীজ ঝুরিয়ে থাকবে। জল পেলেই আমি লাফিয়ে উঠব। চাষা আমায় কেটে ফেলে যেই এক পা তুলে নিড়ানী করে এগোবে, আমি সাথে সাথে ওর পেছনে গজিয়ে যাব। গরুটা বলেছিল তমিজ সেখ। বলেছিল সুখেন ওঁইকে। মুখ্যার সোড়া অর্ধি কেটে ফেলে পাঁচ মিনিট পর হাত ধরে টেনে এনে দেখিয়ে দিল, দ্যাখ সুখেন মুখ্যার ঢোঁড় দ্যাখ। পাঁচ মিনিটেই মুখি ধরেছে। কাল এসে দেখবি, আজ যতেক খানিক ঘন আর লম্বা ছিল, তারও চার গুণ ঘন আর লম্বা হয়ে দাম-পাটি বেঁধে থাকবে। মুখ্যার আশীর্বাদ না থাকলে গরু বাঁচত না।

এসব হল রূপকথা। রূপকথা হলেও সুখেনের কাছে সত্যি। পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তা করে নিতে হবে, সুখেন কেন গরুর রূপকথা ভালবাসে, কেন সে কম বুদ্ধির দৈন্যকে বয়সকে বেঁধে রেখে এই জগতের মুখ্যা ঘাসকে অভিশাপ দেয়। সুখেন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফেইল করেও বর্তমানে বড় জোর নিত্যদিন বাংলা ভাষার পাঁচশটি শব্দ ব্যবহার করে। এবং প্রতিদিনই কেন একই শব্দ ব্যবহার করে। তার অভিধান পাঁচ-হাজারটি শব্দেই সমাপ্ত (খবর কাগজ পড়া বাদে)। সে নিঃশব্দে গরুর পাশাপাশি মেশে চেয়ে থাকে। ঐ ভাষাহীন গল্পই দিনমান তার শ্রোতা ও বক্তা।

অতএব গরু যে কথা বলতে পারবে, এ কথা মিথ্যা নয়। মুখ্যা একদিন গো খাদ্যের দায়িত্ব নিয়েছে, কেন মিনিটের নয়, এ কথাও সত্য। সুখেন হঠাৎ শুনতে পেল, নিষাস জমিনে কোথায় একটা ব্যাঙ ডাকছে শুকনো গলায়। সুখেন ঘা করে রেগে উঠল। আলো ঘ্রাণ শক্তি সম্পন্ন শিকারী কুকুর যেমন করে ওঠে, তেমনি লোম-খাড়া করে তুলল সুখেন। সমস্ত সত্তা আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠল। আজ ব্যাঙটাকে খতম করে দেবে সুখেন ওঁই। নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়িয়ে দেবে। গলা টিপে মেরে দেবে। বাঁচতে দেবে না। শালা মিথুক। শালা শুকনোনের কাছে বৃষ্টির জন্য কাঁদবে বলেছিল। আজ তিন মাস এই খরায় শুকনো গজগজে দিনে কিম্বা রাতে সেই ব্যাঙের গলা শুনতে পায়নি সুখেন। মুখ্যা ঐ ব্যাটার কারণে গজাতে পারছে না। শালা কাঁদে না কেন? ব্যাঙের কটকটে গলা অনুসরণ করে জমিনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল সে। খুঁড়তে লাগল পাগলের মতন। কৃষ্ণা আর সরস্বতী (সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত নাম শুধুই সতী) আনন্দ পেয়ে পায়ে পায়ে গোরু আলি ব্যাপারীর আম বাগানে চরতে ঢুকে গেল। সুখেনের খেয়াল রইল না কিছুক্ষণ। মাটি থেকে সহসা কেমন অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ উঠতে লাগল। সুখেন ওঁই মাতোয়ারা হয়ে উঠল। এমন শুকনো মাটির তলায় এমন গন্ধ কিসের? কেন ফসলটল নেই তো? এই ধারা গন্ধ ছড়িয়ে ধরিত্রী সন্তানকে কী বলতে চায়? অনেক খুঁড়েও সুখেন ব্যাঙ বা জল কিছুই পেল না। ব্যাঙটা ঠিক এই সময় খানিক দূরে মাটির তলায় ফের ডেকে উঠল। কী ভয়ানক ছলনা: মনে মনে শিউরিউরে করে লম্ফ মতো লাফিয়ে পড়ল সুখেন। খুঁড়তে খুঁড়তে পাগলিপ্রায় হয়ে খেয়ালতে থাকল। পেটে দানাপানি নাই। ঘরে অন্ন নাই। জলের জোনাড় নেই বলেই সুখেন সামান্য চাল কয়টা ভেজে কৌচড়ে নিয়ে বেরিয়েছে। গাই দুটিকে খাইয়ে নিয়ে যাবে। দুইবে। তারপর সেই দুধ বাজারে বেচে চাল আনবে। এতকুণ এসেছে, তবু দু'মুঠো কাঁচা ঘাস পাবে বলে। আকাশ থেকে আগুনের হল্কা ঝরছে সূর্য। সব ছারখার হয়ে যাচ্ছে। জৈষ্ঠ আষাঢ়ের ফল আমনি হয়ে যায়-নড়া হয়ে ঝুলছে। এ বছর আমও ধরেনি তেমন। কারো বাগানে আম ধরলেই বা সুখেনের কী এসে যায়? যখন বাজারে, তখনই তো বাগান বিক্রি হয়ে যায়। বড় হলেও সেই আম মাটিতে পড়ে থাকে না। গরিব ছুঁতে পায় না। বাগান যারা কেনে, তারা পাহারা দিয়ে সেই আম খুঁটিতে তোলায়। কলকাতার চালান দেয়। সুখেন এ বছর একদিন মাত্র আম কে-জি. কিনে খিতে দিয়েছে। তাও আম কে-জি. দুধের বদলে। ধরিত্রীর এই গন্ধ কিম্বা ব্যাঙের ডাক আসলে মিথ্যা মায়া। আকাশে চাইল সুখেন ওঁই। দিগন্তে চোখ পড়ল। এত হাহাকারের মধ্য দিয়ে একটি যুবতী নতুন কে কেন দেখা যাচ্ছে দূরে। সেটাও মায়া হতে পারে। মেয়ে দেখল, কৃষ্ণা আর সতীকে দেখা যাচ্ছে না। সুখেন ভাবল, কেউ কথা রাখে না। ব্যাঙ বা মানুষ। কেবল ধরিত্রীর বুকে ঘাসবনের সুবাস ওঠে। তাও এক আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে বিলীন করে মানুষকে। সুখেন ওঁই লাফিয়ে উঠে গোরু আলির বাগান মুখো ছুটতে লাগল। বাগানে ঢুকে ডাকাক হল। একি! বাগানের পুকুরের পাড়ে জলের কাছাকাছি প্রচুর মুখা জন্মেছে। সামান্য জল রয়েছে শান্ত হয়ে। তলায় মিষ্টি কাদা শুয়ে আছে। কৃষ্ণা বা সতী এ দৃশ্য দেখতে পায়নি। ওরা কোথায়? ঘাড় তুলে ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে ছোটে। হঠাৎ সুখেন কৃষ্ণার নামানো ঘাড়ের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। মুখের তলায় পাকা একটা হলুদ লাউ ঝুলে আছে। কৃষ্ণা মুখ তুলে নিয়েছে। এ লাউকে কৃষ্ণার গায়ে হাত দিল সুখেন। গলা চেপে ধরল সাথে সাথে। ছুরি কৃষ্ণার মুখে হাত ঢুকিয়ে আমটাকে টেনে আনল। তখন কৃষ্ণা কথা কইল, মৃদু আর্তনাদ করল, গোঁ-ও-এ করে ডাকল। কৃষ্ণা কি কাঁদতে পারে? কৃষ্ণার অন্যায়কে উপেক্ষা করে সুখেন একটা শুকনো ঘাসের গুঁড়ির ওপর চেপে বসল। আম ছেড়ে লাগল।

গরুর নাম কি অহেতুক হয়? যাত্রার দেখেছে সুখেন ওঁই: তা যদি হয়, তবে কৃষ্ণাও হয়, সরস্বতী না হোক, সতী তো হয়ই। বিস্তারিত করে বলতে বলতে সুখেন হি হি করে হেসে উঠল। এখন সে জোয়ান ছেলে। ছেলেবেলায় গরুতে আম খেত। বাগানে গরু চরে বেড়াত। আঁটি আম ছিল গো-খাদ্য। কোনোশালা বিশ্বাস করবে না। অবশ্য আম মানুষ পছন্দ করত না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত। গরু সেই আম খেয়ে সন্তাগতি দিত। আয়েস করত। জামরাছ তলায় শুকনো আমগুলো পড়ে থাকত ছন্নছাড়া

সে সব সুখেনের চোখে এখন সিনেমা হয়ে গেছে। তারও কত আগে পরমেশ্বরবাবু যাত্রা (?) লিখতেন, নাম দিতেন মহেন্দ্র। গরুর নামে নাম। গরুর ঝুলঝাড়া মহেন্দ্রকে তা ও চালের মত টেনে খাইয়ে মানুষকে কাঁদিয়ে দিল। হায়, হায়! মানুষ কত সখ করেই না কাঁদতে পারে। মানুষ কত রকম করে কাঁদে। কৃষ্ণা সুখেনের মুখে মুখ বাড়ায়। সরস্বতী দুধ দিতে আসে। ওদের পেট ওঠেনি। মাটি ছেটে পেট ওঠার কথা নয়। ঘাঁটি দুধ দেয়নি। আকাশের টানে বাঁটগুলি পেটে লেগে আছে। চোখে দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে, সুখেন ওঁই টস্ টস্ করে কেঁদে ফেলল বলল—দাঁড়াও মা জননী: আগে সন্তান বাঁচুক। তবে তুমি চোটপুটে খেও।

এই দৃশ্য গাছের আড়াল থেকে দুই চোখে গিলে নিচ্ছিল সেই নিগৃঢ় থেকে বয়ে আসা মেয়েটি। তার চোখ আশ্চর্য চকচক করছিল। সুখেন মেয়েটিকে দেখতে পেল না। আম খাওয়ার পর আঁটি ছুঁড়ে ফেলল সে। কৃষ্ণা বা সরস্বতী দু'বার দু'জনে ওঁকে দেখল মাত্র। ফেল না। ভাগ্যটা কারো উটো খায় না বুঝি। উটো-চুপটি তো আসা তার।

ছাতের ছেঁদো বালিয়ে পুকুর পাড়ের জলের কাছে নেমে গেল সুখেন কড়কড় করে মুখা কাটতে লাগল। দাঁত পোড় লাগিয়ে খেমে গেল জল ছেঁচার ঘুকটা খাঁ খাঁ করছে। এমন সময় কৃষ্ণা আর সতী এগিয়ে এল পুকুর পাড় বেয়ে। পেছনে সেই মেয়েটি: সুখেন মেয়েটিকে দেখে সমস্ত বোধ দিয়ে অনুভব করতে গিয়ে সচকিত হল। এমন ভাল গড়ন কখনও দেখেনি সে। অমন টানা চোখের শান্ত স্নিগ্ধ কোথাও নেই: অমন নাকের ডাঁক পাখারা কোথাও কি দেখেছে? গায়ের রঙেছে যৌবনের গাঢ় পুটো যেন আশ্চর্য হয়ে উঠেছে। পাতলা শাড়ির নিচে ফুল হয়ে ফুটে আছে জৌবন। আকাশের মুখে ছাই দিয়ে চমকে উঠছে বিজলি-বাহিতা মেয়ে। চোখের মতো কোথায় কেন গভীর একখানা মেঘ উঠেছে। কৃষ্ণা আর সরস্বতী গলা বাড়িয়ে জল চাইছে। মেয়েটি বলল—আমার এই বাটিটায় দু'চোক জল দিবা ওঁই মশাই?

সুখেন সত্যিই এবার মনে মনে চমকে উঠল। জল চাইছে ওরা। কৃষ্ণা জল চাইছে। সরস্বতী জল চাইছে। গাই দুটিতে চুমুক দিলে এক ফোঁটাও এই পুকুরের কোথায় জমে থাকা জলের অবশিষ্ট থাকবে না। তার নিজের গলাও শুকিয়ে উঠেছে। কী করবে স্থির করতে পারছে না সুখেন। হতভম্বের মতন মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে। মেয়েটি পায়ে পায়ে আরো

মেয়ে এক হাতে মাথার কৃষ্ণা সরস্বতী পা নামিয়ে জলে নেমেছে। ওপরের মেয়েটির হাত থেকে বাটি নিয়ে সুখেন বাটি ভরে মেয়েটিকে দেখাচ্ছে। মেয়েটি ঘাড় কাত করে দেখছে জল নেই। মেয়েটিও চুমকুড়ি মেরে দুই হাতে কৃষ্ণা সরস্বতীকে ধরতে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। সুখেন ওই আঙুলগুলো দিয়ে ওর গোল মুখ ঘুরে মেয়ের মুখ বেঁকা হয়ে ঘাস কাটতে লাগল। মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। ঘাসি থামিয়ে বলল—এসো, ঘাস এনেছি তোমার জন্য খেয়ে নাও। তুমি আমায় দিয়েছ। আমি তোমায় দিলাম। আজকাল কেউ কিছু দিতে চায় না। তুমি দিয়েছ বলে তোমায় দিলাম। কি বলো?

এসব শুনে সুখেনের মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল।

—তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি তোমায় গরুর ঘাস খেতে বলিনি। তুমি খাবে বলে ঘাস কাটতে বলেছি। সুখেন ঘাস ফেলে দিল। তারপর ঘাস কাটতে কাটতে মেয়েটির সাথে কথা শুরু করল।

—তোমার বাড়ি কোথায় মেয়ে? প্রশ্ন করল।

উত্তর: টিয়াবুড়ি

প্রশ্ন: নাম?

উত্তর: শ্যামা।

প্রশ্ন: কে কে আছে তোমার?

উত্তর: কেউ নাই। মা আছে, তাই বোন আছে।

প্রশ্ন: কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তর: মামা বাড়ি, থাকা হোল না। সেখানেও আকাল চলছে কিনা। চলে এলাম

প্রশ্ন: কেমন আকাল চলছে সেখানে?

উত্তর: সেখানেও অন্ন নাই। ঘাস নাই। জল নাই।

—অ

ঘাস কাটা শেষ করল সুখেন। ঘাস বাঁধল আঁটি করে। মাথায় নিল। কৃষ্ণা সরস্বতীকে গলায় ঝুলে বাঁধল। তারপর মেয়েটির মুখের কাছে চোখ এনে দেখল, পাতলা ঠোঁটের কবে ছেঁড়া একটা ঘাস। রক্তের রেখা ধরে আঁকা হয়েছে। তবু ইচ্ছিল, মেয়েটি হয়ত আরো কিছু চাইবে। কী চাইবে আর? ঘাস? আকাশে সূর্যটা ঝাঁপিয়ে উঠল সুখেন। মেয়েটি ঘাস কী করবে? কৃষ্ণা বা সরস্বতীকে আম খেতে দেয়নি সে। মেয়েটি নিশ্চয়ই বুঝেছে, গাই দুটিকে সুখেন কত ভালবাসে। বোকা উচিত। সুখেন যে ভেবেছিল, মেয়েটি কি ভেবেছে? শুধিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

গরু দুটি সামনে সামনে। পেছনে মেয়েটি। মাকে সুখেন ওই। ঘাস সে কিছুতেই ফেলে না। হাত দিয়ে শক্ত করে ধরল ঘাসের আঁটি। দ্রুত পা চালানোর জন্য গাই দুটিকে হাঁকিয়ে দিল ধমক দিয়ে। আর তখনই, সত্যিই মেয়েটি প্রার্থনা করল—কেউ দেয় না। তুমি খাও।

—কী?

—ঘাস।

সুখেন কিছুক্ষণ কোন কথাই বলল না। হাঁটতে থাকল চুপচাপ। হঠাৎ শুধালো—ঘাসের বদলে তুমি আমার কি নিবে? সবাই যা সহজে দেয় না সব মেয়ে, তুমি তাই নিবে? বলেই দাঁড়িয়ে পড়ে সুখেন শ্যামার মুখের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। শ্যামা ঘাড় গোঁজ করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। বোঝা গেল না, শ্যামা রাজি কিনা কিছা অপমানিত কিনা। কিন্তু মনে হল, শ্যামার কপালটাও খুব কঠিন দেখাচ্ছে। ঠোঁটের কবে ছেঁড়া ঘাস। তীক্ষ্ণ দুপুরী দেখাচ্ছে শ্যামাকে। সুখেন হো হো করে হেসে উঠে পা চালিয়ে দিল। ডিপ-টিউব-ওয়েল বিকল। আকাশ ধরাহীন। চরাচরে নির্মমতা। ঘাসের নেতা মুখা সাহস করে ফুটতে পারে না। অতএব কে কাকে খেয়?

ধরিত্রীর বুকে তবু গন্ধ থাকে কেন? আমার পিছন ফিরে চাইল সুখেন ওই।

শ্যামা ঘাড় নিচু করে হেঁটে আসছে। এইখানে এসে দু'জনের পথ দু'দিকে আলাদা হয়ে গেছে। সুখেন থমকে দাঁড়াল। ঘাসের আঁটি আলাদা করে ঘাসের প্রায় অর্ধেক মেয়েটিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নাও নিলাম। চাইছি যখন।

মনে মনে বলল—আকাশ যখন বৃষ্টি দেয় না। পঞ্চায়েত যখন ভগবতীকে কুপি দেয় না। দেশের মিনিস্টার যখন স্নে-জন্য খেয়ে ফেলে। মাঠ যখন ফসল দেয় না। গরু যখন দুধ দেয় না। ঘাসেরনেতা যখন আকালে মাটির তলায় মুখ লুকিয়ে থাকে। তখনও মাটির তলায় সুবাস থাকে। তৃণহীন ক্ষেত মজুর আমিই কেবল এ কথা জেনেছি। কেউ জানে না। তুমিও জানো না শ্যামা। কেন তোমায় ঘাস দিচ্ছি। আমিও কি জানি?

বলতে বলতে সুখেন ওই এগিয়ে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মেয়েটির চোখে অজস্র ঘাস ফুটে উঠল সূর্যাস্তের মেটে আভায়। শ্যামা ঘাস কাঁখে করে সোজা গরু তুলে এল। মোহন মুদির কাছে সেই ঘাস বিক্রি করে দিল। চাল কিনল আধ সের নুন। বাড়ি ফিরে এল রাত নটায়। উনুন জ্বালল মা। সাত দিন বাদে ওদের রাত্রি ভাতের গন্ধে ভরে গেল। শ্যামা ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার সময় দেখল—অন্ধকার দোয়ারে বাঁধা ভগবতীর চোখে জল চুইয়ে নামছে। ছটফট করছেন ভগবতী। ভগবতী আজ, সবার শেষে ভাতের ফেনটুকুও পান নাই।

গোচর

রাধানাথ মণ্ডল

জায়গাটা খুব টানে ছারানাকে। ওপাশে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে দু-ভাঠা জায়গা জুড়ে, একটু দূরে কলাপাড়ে ঘন জামবন, আরও দূরে পগারের ওপর ছাড়া-ছাড়া তালগাছ। আর এপাশে, নামাল ডাঙার ঠিক মাঝখানে ঝড়ের চাল, তার সামনে কষিলমুনির মূর্তি। ঘাবলাগাছ গজিয়েছে আশ্রমের চারিদিকে, গাছ-কলমি আর বুনো গাছ লাগিয়েছেন সাধু একটা পাঁচিলের মতো করে। সাধুর পছন্দ আছে বলতে হবে। এত দূরে গাঁ ছাড়িয়ে আধক্রোশ, মাঠের মধ্যিখানে সাধু-মাধু লোক ছাড়া আর কার বা সাহস হবে এখানে থাকার? চোর এসে যখন জানালাটি খুলে নিয়ে যাবে, তখন কী হবে গো সাধু? ঘন লতির আড়ালে সামনের ডাঙা দুটো দাঁত ফাঁক করে সাধু বলেছিল, কাছে তো আমার ফেলাই গো বাপধন, নাগালে পাবের বাটপাড়ের ভয় কী?

কথাটা ঠিকই। সাধুর পোশাক হল একটা গেরুয়া কাপড়, দু খানি করে এক খানি পরা লুঙ্গির মতো করে। গায়ওয়ালা কাপড় উড়লে ভিতরে দেখা যায় কৌপিন। বড় শাসনে রাখতে হয় ইন্দ্রিয়কে। ইন্দ্রিয় জয় করতে পেরেছে বলেই না সন্ন্যাসী! সাধুকে বিদ্রূপ করিনি কখনো কেউ, ভেলা লোক তো, তিন ক্রোশ দূরে বলরামপুরে সাধুর বাড়ি, সাড়ে-তিন বউ ছিল, ব্যাটা ছিল। তা সেসব ছেড়ে কেন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল

বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কেউ জানে না। এখন অবশ্য সেই পৃথ্বী নাম কানে শোনাও পাপ, যেমন পাপ মা-ছেলের মুখ দর্শনের জন্যও মনে পড়ে যাওয়া।

জন্মের সময় কী নিয়ে যে চোরে—বলেছিল সাধু। তবু নিল। বড়, ছিপ ফেলে জলে ছিল কাহন দুই, চাল ছিল মাদুরকীর, শেষে বলে জমানো টাকাও ছিল। একদিন রাতে জনকতক মুখে গামছা বেঁধে এসে পিছমোড়া করে বাঁধল পাড়ুই পাড়ার সকে বেঁধে ফেলল সাধুকে, তারপর সর্বস্বান্ত নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় টাটা চেরা সাধুকে ন্যাটো করে রৌপিনগাছিও ছেড়ে দিল। সকালবেলা হারান গয়রা গাড়ির মওড়ায় বসে দেখল, বাবলাগাছের গোপে হাত-পা বাঁধা উলোম সাধু ঘুমোচ্ছে। লজ্জা-মান-ভয়, তিন থাকতে নয়। তবু সাধু মানুষের লজ্জা হারানোই যেতোল নিজের কাঁধের কলঙ্কা দিয়ে

সবাই বলল, ভবে লাভ সাধু, আশ্রম বন্ধ করতে হয় দাঁ-পানে এসো। কেউ বলল, আশ্রমের গোয়ালের পেছনের জমিটা ছেড়ে দিচ্ছি, সন্ধেবেলা নামকীর্তন হবে, নিরন্তর মঙ্গল। কেউ বলল, ইস্কুল ঘরের পাশে আশ্রম করো, ছেলেদের মনে দেবদ্বিজের প্রতি একটু ভক্তিশ্রদ্ধা আসুক। সাধু রাজী হ'ল না। বলল, আমার ঘরবাড়ীই ভালো।

জায়গাটা যে খুব ভালো তাতে সন্দেহ নেই। সাধু বলে সন্দেহের কোলাহল থেকে অনেক দূরে। খাল বয়ে গেছে আশ্রমের পাশ দিয়ে, বর্ষায় জল থাকে কানায় কানায়, অন্য সময় এদিক ওদিকে বালির মধ্যে ছোপছোপ, জলশৌচের কাজটা মিটে যায়। আমলকির ডালায় প্রচুর পাতা পড়ে থাকে, শুকনো ডাল, জ্বালানির অভাব হয় না। বকুলগাছের তল যখন টকটকে লাল হয়ে থেকে যায়, সাধু বাচ্চাছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গাছে চড়ে ফল পেড়ে আনে। তাদের সময় ভোরবেলা উঠে তাল কুড়িয়ে এনে জমিয়ে রাখে, ভাদ্রমাসের সকালে তাদের বাড়ি পিঠে নক্সা করে। জানের পর কপিলমুনির পুজো সেরে এ গাঁ, ও গাঁ সে গাঁয়ে যখন মাদুকরী করতে বেরোয়, তখন চালের সঙ্গে আলুটা, মুলোটা, লাউ-কুমড়ো-বেগুন—এসবও পায়, সাধুর রান্নার ভাবনা থাকে না। ফেরার পথে ভুসি-র মোকামে ভিজের চাল ওজন করে দিয়ে এক একদিন নুন তেল, কোনও দিন বা বিউলির ডাল কিনে আনে। সাধু কুয়ো খুঁড়েছে একটা, জল বেশ ভালো, দড়ি বালতি টাঙানোই থাকে সব সময়, শুধু মুনিষ ব্যাপারীদের নয়, পথিকদেরও জল পিপাসা মেটে। তৃষ্ণার্তকে জলদান কত বড় যে পুণ্যকর্ম।

তবু সাধুর উকেন্সাটা ঠিক বুঝতে পারত না লোকে। বেটা ভণ্ড নয় তো? মা-ছেলে ছেড়ে শুধুমুনি এই মকমাঠে পড়ে আছে, এর গূঢ় তত্ত্বটা কী? লোকেরা সন্দেহ করত, তবু যেতোও একজন একজন করে। সন্ধেবেলা কাজ সেরে দিয়ে হাজির হত এ-গা ও-গাঁর লোকেরা, উঠোন ঝাঁট দিত পরিষ্কার করে, তারপর চাটাই পেতে বসত। ঘড়ের ছাল দিয়ে চা তৈরি করা হত। শান্তিপুরের ঘোলো ওস্তাদ আসত কোনও দিন, কোনও দিন আসত যাত্রাদলের গানের মাস্টার। নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা—কপিলমুনির নয় সুর করে ধরত সাধু, তার সঙ্গে গলা মেলাত সবাই। খোলে চাপড় পড়ত, করতাল বেজে উঠত, হারমনিয়ামের রিডে আঙুল চেপে ধরত মাস্টার। এক মুহূর্তে মকমাঠের নির্জন আশ্রম সরব হয়ে উঠত গানে। গভীর রাতে সেই গানের শব্দ হাওয়ায় ভেসে যেত গ্রামের দিকে। রাতে ভাত খেতে বসে, খাওয়া দাওয়ার পর বিড়ি টানতে টানতে অথবা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গ্রামের লোকেরা শুনত নারায়ণ পরাবুক্তি, নারায়ণ পরাগতি। লোকেরা ভাবত, আছা থাকুক। ভণ্ড হোক, সাধু হোক, আশ্রমটা অন্তত বেঁচে থাক মাঠের মাঝখানে।

কিন্তু দিন পনর আর একজন সাধু এল আশ্রমে। চেহারা আগের সাধুর মতো ঘরটা মোটাসোটা নয়, দাড়িও বড় ঘন নয়। বেঁটেখাটো চেহারা এই সাধুর জটা কিন্তু পায়ের গোড়ে এসে লাগে। লোকেরা বলল, এ হল ছোট সাধু। আর আগের সাধু বড় সাধু হয়ে গেল। বড় সাধুর চেয়ে পুজো-আর্চিকে ছোটসাধু বেশি সময় দেয়, অনেকক্ষণ ধরে সূর্যপ্রণাম করে। সপ্তাহে একদিন করে মৌন থাকে, সেদিন ইশারায় সব কিছু বুঝিয়ে দেয়। বড়র চেয়ে ছোটসাধু যে বেশি ভক্ত এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকল না কারও, তবু বড় বড়ই, আশ্রমের সংসারে সেই কর্তা।

মকরসংক্রান্তিতে কপিলমুনির উৎসব। সেই উপলক্ষে মেলা বসাল সাধু। আশপাশের গ্রামে এমন মেলা আর কখনও বসেনি। ঝুলকপি-বাঁধাকপি-মরেঠাটি, নতুন আলু নিয়ে এল চাষীরা, দূর দূর গ্রাম থেকে শশা, গাঁওআলু নিয়ে এল। মেয়েদের দোকান এল, তেলে ভাজার দোকান বসল অনেক, মিষ্টির দোকান, মনিহারির দোকানে জমজমাট হয়ে উঠল বালুচর। খালে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রেখেছিল সাধু, সেই জলে স্নান করল সবাই। নদীতে নাইলে চারগুণ পুণ্যি, খালে নাইলে আধা, পুকুরে নাইলে কিঞ্চিৎ, ডোবায় নাইলে পাপ—এই প্রবাদ মনে রেখে লোকেরা খালে মকরস্নান করে অন্তত অর্ধেক পুণ্য সঞ্চয় করল। স্নানের পর সবাই কপিলমুনির পুজো দিল ভক্তিভরে। গাইক করেছিল বড়সাধু, নারায়ণ পরাক্ষরা পাঠ হতে লাগল ভোরে। কপিলমুনির সেই মন্ত্র গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে জানান দিল আজ রত্নাবতী খালের ধারে কিছু একটা হচ্ছে। গ্রামের ঘুমন্তরী মেয়েরা উত্তরবাহিনী এই নদীতেই সারা পৌষ মাসের টুসু ভাসাতে এল, খালের বাঁধা জল একটু ঘোলা হতেই রঙবাহারি ফুলে ভরে গেল। স্নান সেরে এসে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বড় সাধুকে, কারও মনে থাকল না তিন ক্রোশ দূরে গ্রামের মহিসাবন সে-ও পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে। দুপুরে ভোজ হল, ভোজের পর খিচুড়ি খাওয়াল সাধু, লোকেরা কপিলমুনির প্রসাদ কপালে ছুঁইয়ে মুখে তুলল।

দেখতে দেখতে কটা বছর এসে ফিরে গেল সাধুর আশ্রমে। শীতকালের আগে থেকে জল বেঁধে রাখল সাধু, মেলার জাঁকজমক বাড়াল একটু একটু করে, কপিলমুনির তালপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরের চারিদিকে ইটের দেয়াল তুলল, আশ্রমের খড়ের চাল ছাওয়াল বর্ষার আগে। মিঠা লোকের ছাওয়া আসা বাড়ল, কেউ কেউ শিষ্যত্ব নিল সাধুর, দেখা হলেই সাধুর সঙ্গে সম্বোধনের ভাষা পাল্টায় লোকে, জয় কপিলমুনি। উত্তরে সাধু কপালে হাত ঠেকায়। মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় ছোট সাধুর সঙ্গে, ঝগড়াটি পর্যন্ত হয়ে যায়। ছোটসাধুর ভক্তি বেশি কিন্তু গলায় জোর কম, আর সেই বেশি খায়, তবু গাঁয়ের লোকেরা এসে তাদের মধ্যে ভাব করিয়ে দেয়। এভাবেই চলে যায়। লোকেরা বলে এখানে সাধু থাকে। ভোরের অন্ধে ভেজে ভেজে সাধুর কুয়োর একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে যায়। কোনও কারণ না থাকলে গ্রামের লোকেরা অন্তত একবার সাধুর গুষ্টির থেকে ঘুরে আসি বলে চলে আসে সাধুর আশ্রমে। ঘরের মানুষের উপর রাগ করে কেউ যখন বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায়, সে দু-এক দিনের জন্য সাধুর আশ্রমে গিয়ে থাকে। তারপর বৈরাগ্যের ঘোর কেটে গেলে মনে মনে আবার বাড়ি ফেরে।

ঠিক এভাবে যখন বহু বহু দূরের লোকেরা জেনে গেছে, এখানে এক সাধুর আশ্রম আছে, যখন ফলের সংক্রান্তির জন্য বেশি বড় চেয়ারা নিচ্ছে, যখন রত্নাবতীকে আর খাল না বলে সবাই নদী বলতে শুরু করেছে, ঠিক তখন একদিন সকালবেলা শান্তিপুরের খালে স্নান সারতে আসবার সময় হারান গয়রা গাড়ির মওড়ায় বসে দেখা অন্য চেয়ারার লোকেরা বড় সাধুকে। কোদাল হাতে সাধুর। আশ্রমের চারিদিকে যে ভাঙা পোচর, সেখানে কোদাল চালাচ্ছে বড় সাধু। ছোটসাধু মাথায় করে মাটি নিয়ে গিয়ে ফেলে আসছে।

—এটা কেমন হল গো? বলে গাড়ি থামিয়ে নেমে এল হারান।

মাটি ফাটা ছেড়ে বড়সাধু বলল, কী হবে? আশ্রমটা পড়ে আছে বলে ভাবছি ঘুটো গরু লাগাব। পুজোর জন্যে ফুল লাগবেনি? দেখছনি কতগুলো গেঁদার চারা এনেছি।

হারান দেখল, একপাশে জড়ো করে রাখা আছে গোড়ার মাটিসুদ্ধ ছিন্ন ভিন্ন গাঁদা ফুলের চারা। তবু অবাক হয়ে তাকাল সাধুর দিকে। তাকালে গোচের তাগুতে।

—আমরা ছনু সাধু, আমাদের পাপ লাগবেনি। বলে সাধু আবার কোপ লাগাল মাটিতে।

হারান আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল অবিশ্বাসের সঙ্গে, তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পরের দিন সাধুর ভক্তরা এসে দেখল আশ্রমগোড়ায় ডাঙাটায় চারদিকে আল বেঁধে জমির মতো করা হয়েছে। গোটা জমিতে লাগানো হয়েছে গাঁদাফুলের চারা। আর একটু ভালোভাবে লক্ষ করতে তারা দেখল, শুধু গাঁদাচারা নয়, জমির মাঝখানে বেগুন আর লঙ্কা গাছও লাগিয়েছে সাধু।

॥২॥

গাই আর ছেলে মিলিয়ে অঢেল গরু। ছোল বিয়ে সম্পন্নি, আর এক ছেলে, তিন মেয়ে—এই নিয়ে হরধনের সংসার। ভগবানের দয়ায় কোনও কিছুর অভাব নেই তার। মা ভগবতী দুধ দেয়, সার দেয়, তাঁর দিয়ে চাষবাস তুলে দেয়। শরীরে ক্ষমতা আছে, ছেলে বড় না হওয়া পর্যন্ত খাটিয়ে পারবে। শৌষমাসে গাড়িতে বোঝাই ভরে যখন ধানের আঁটি এসে খামারে পাশ দিয়ে রাখে, তখন এক আশ্চর্য খুশিতে ভরে যায় হরধন। সে যা পেয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট, আর কোন কিছুতে তার লোভ হয় না। বড় নিরীহ মানুষ। তখনও কারও উঁচুতে উঠে ফল দিয়ে চলেনি। হরধন জানে এই বিশ্বসংসারে তার জন্য যেটুকু মাপা আছে, সেটুকুতেই তার অধিকার। এর বাইরে পা বাড়ানো পাপ।

হারান, তার বাপঠাকুর্দা, গ্রামের অন্য সব লোক উঁচুবেলা থেকে দেখে এসেছে, খালের ধারে ধারে, বৈকুণ্ঠডোঙার গ্রামের পতিত পড়ে আছে কেউ কখনও এই জমিতে হাল চালায়নি, কোনওকালে কোপ পড়েনি ও হল গোচর মা ভগবতীর চরে বেড়ানোর ক্ষেত্র এদিক ওদিক যেটুকু অনাবাদী ডাঙা পড়ে আছে, মানুষ যদি সেখানেও চাষ করতে যায়, তাহলে বাগাল ছেলেরা গরু চরাবে কোথায়? লোকের ধানে মুখ দিলে যখন মুঠি চড় কষিয়ে দেবে কিংবা খেয়াঘাটে পুরে নেবে তখন কী হবে? ডাঙাডা বাবা-কাকাদের মুখে ওই গল্প শুনেছে হারান, আগের দিনের মুরুব্বি পাল নাকি একদিন হাল চালিয়েছিল গোচর জমিতে, পরের দিনই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যায়। আর একজন গোচর ভেঙেছিল কালবৈশাখীর বেলাতে পড়েছিল তার মাথায়। ভগবান তো এই জন্যেই ঠিক করে দিয়েছে কোনটা চাষের জমি আর কোনটা পতিত। এই যে ধানের চারদিকে আল বেঁধে দেওয়া, এই যে জমিতে, সারে-জলে চাষবাস, এ সবই পাপ পাপ ভরে আছে। গরুর জন্য বড় ডাঙার মাঠ তাদের যদি কারও অধিকারে থাকে, এই ধানের জমি কেন? হারান ভাবে, ভগবান কি এসব দেখে কোনও বিচার করেন? নিশ্চয় উনি দেখে এসব ভাবছিল হারান, সাধু তো এই আশ্রম থেকে কী কী চাষ করবে।

হারানের দু একজনকে কথাটা বলল হারান। সেই কথা শুনে তারা বলল, হ্যাঁ তো এ তো ভালোকথা। সেই বলল সাধু আশ্রমটুকুন করে ছেড়ে সাধু দিব্যিদিল। ওই যে বিশ্বাসের মধ্যেকার ভগবানকে তারা দেখেছে, সেই ভগবান করেছেন। কিন্তু ভগবানের ব্যবস্থা মুখে যে সেওটা এত ভগবানের ভাড়ার। তার পরে ভাবে, কিন্তু হারান একটা ঠাকুর করে হারান। বিশ্বাসে ধরে কারও ভগবান হারান, সেই কেউটিকে কিন্তু ভগবান হারান সেই বাড়ে ভগবানের পাপ। সাধু বড়ভাগ্য সে তো ওই বড়ভাগ্যের ঠাকুরকে যে সাধু বলে আর তারা কাজ পরে সাধু মুখিল মাটির চোখের মধ্যে পাপ পড়ে না সব ধরে যে ধানের ছেলে কখিল মুখিল ভগবান দিয়ে ঠাকুর দিয়ে, এত যে ধরে ধরে হারান। তারপর, পরিষ্কার, ধরে ধরে ভগবানের।

সাধুর জমিতে যে পরের দিন থেকে হারান দেখতে পেল— দিব্যদৃষ্টিতে যা ঠাকুরের ভগবানের হারান ভাবনাকে এ একটি সাধু ভগবানের সঙ্গে বলে ভাবে সে আর ভগবানের ভগবানের সঙ্গে ভগবানের ভগবানের ভগবানের

বেশ ঘোরানো অন্ধকারের মধ্যে একটা ঘরে বসে ছিলেন সাধু। হাতে গরম দুধ নিয়ে এলে মন্দিরের পুরুত। সাধুকে দিয়ে বলল, আর বেশি একটু ছায়ায় বসে থাকি। একটু দূরে মন্দিরে বসেন ছোট ছোট ঘোড়ায় অনায়াসে বিচরণ করছে। ঘোড়ার চারদিকে মস্ত এটা ওটা খেলনা সাধু, ঘরের ভেতর যা তুকিয়ে রাখা থাকে, ওদের যা বয়েস তাতে ওরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে পুরো বৃন্দাবনটা দেখে আসবে। ঘোড়াগুলো যখন গরম নিয়ে ফিরে আসবে, তখনও ওদের ঘোড়া থেকে নামতে না দেখে সেই ভয়ন্ত ছিলেন। ছোটসাধুর সঙ্গে পরিচয় না হলেও কোনটা কেমন চলছিল, উঁচুগলায় ধমকানো সত্ত্বেও একদিন মন্দির ছেড়ে যায় নি, কিন্তু বাচ্চাগুলো ভাবতে ছোটসাধু কথা বলে না কোনদিনই। শুধু দুধ খুচ্ছ অন্ধকারের কাজ করে। সন্ধেবেলা মন্দির পরিষ্কার করে বড়সাধু অন্ধকারে ফিরলে ছোটসাধু তার গা হাত পা টিপে দেয়, পায়ে হেঁটে মালিশ করে দেয়।

পরের বছর জমি বেচলেন সাধু। বাচ্চাগুলোদের নিয়ে মাটি ফেলাল, ছোটসাধু তবে সে বছরে তিনি মাটি কাটল অনেক। বর্ষার আগে দু-তিন জনের কাছে চলে গেলেন কথা সেরে রাখলে বড়সাধু। বীজতলা করল, ধান কাটল। ছমন এসে অবাক হয়ে গেল দেখে যে, সংসারত্যাগী একজন সাধু মানুষের ছেলে কেমন আলের পর আল জড়িয়ে যাচ্ছে।

সে বছর অদ্ভুত এক ব্যবহার করল ঘোড়াটা। যা কোনও দিন হয় না, দুই চার বার ঘোড়া হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ ঘোড়াথেকে কালমেঘ উড়ে এল সাধুর অন্ধকারের সামনে। তুমি, তিনদিন সে ঘোড়ার ঘরে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। এক সাংঘাতিক রহস্যপাহের মতো ধন্ধের সোনা গেল ঘোড়াটার গভীরে। এক মানুষ, দু মানুষ, তিন মানুষ হয়ে জল ফেলে উঠল ঘোড়াটার। এই তিনদিন ধান হয়ে ভয়ঙ্কর ভয়ে গেল। সাধুর জমি থাকল এক হাঁটু জলের নিচে, কোনও রকমে তবে আলের রক্ষা গেল। জল যখন সরে আবার-উনিশ দিন পর, দেখা গেল সব ধানের চারা পচে গেছে। জল সরে যাওয়ার পর একদিন হারান গেল সাধুর সঙ্গে দেখা করতে। কী সাধু, তোমার জমি কই?

—আর জমি, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বড় সাধুর। সব জমি পতিতই থেকে গেল চাষেনেই, অবশ্য আর হল কই?

মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল হারান, বলল, থাক পড়ে পতিত গোচর, তুমি সাধু মানুষ, তোমার কাছে কী উসকে!

হ্যাঁ, সাধু হাসল, এমন মানব জমিই পতিত পড়ে থাকে, ইসব তো নামাল জমি। এখানে আর কী সোনা ফলাব বল?

মাথায় জটা থাকি গা লম্বা চেহারার সাধুর সঙ্গে বেঁটে চেহারার হারান আস্তে আস্তে হেঁটে এল। সাধু বলল, একজনই তো মালিক হারানভাই, একটাই নিয়ম। যে নিয়মে একদিকে বজ্রাঘাত হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে সেই একই নিয়মে ফসল ফলছে, ফুল ফুটছে, ধানেধানে ভরে উঠছে পৃথিবী। খুব জটিল অঙ্ক, তুমি বুঝবেনি।

সত্যিই বুঝতে পারছিল না হারান। তবু মনে হচ্ছিল সাধুর ভিতরে অন্য কিছু আছে। এটা কি তাহলে শুধু শুধু বলা, গোচর ভাঙার পাপ নয়?

কয়েকদিন পর বড়সাধুকে ছেড়ে ছোটসাধু চলে গেল। যাবে যে, তা জানাই ছিল। দু'জনে মিল ছিল না একটুও। একজন পুজো-আচ্চা, ভক্তি-টক্তি নিয়ে মেতে থাকত, অন্যজন জমি-জিরেত, মাটি কাটা, ধান রোয়া নিয়ে। বন্যার পর যখন বড় সাধু বলল, চ' ছোট, আমরা বসি সরাই। পলি পড়েছে যে জমির ওপর, আঃ কী মাখনের মতো পলি দেখেছিস: পটল লাগাব এবার, আলু লাগাব। ছোটসাধু রাজী হল না। এতই যদি খাটব তো লোকের ঘরে মুনিশ খাটলেই পারতুম। সাধু হবার কী দরকার ছিল। তুমি তো একটা চাষী। ঠাস করে একটা চড় মেরে বড় সাধু বলল, সাধুগিরির তুই কী জানিস রা বাজোত? ভাগ্ শালা।

ছোটসাধুর কথাটা সত্যি গাঁয়ের লোকের মুখে ফিরল বছর ঘুরতে না ঘুরতেই। সাধু লয় রে সাধু লয়। উহো একজন চাষী। চাষী, তবে বেশ ভালো চাষী। আলপাশের কারও জমিতে এত পটল হয়নি, যা হল সাধুর জমিতে। বেশ দামে বিকিয়ে এল হাটে। শীতকালে আলু ভাঙল সাধু সবার আগে। এত বড় আকারের নৈনিতাল আলু আর কেউ কখনও দেখেনি। আর ফুল ফোটাল সাধু। থোকা থোকা মেরিগোল্ড, গোলাপি, পাঁচ-ছ রকমের গাঁদা। তাঁকা খালপাড়কে ফুলে ফসলে ভরিয়ে তুলল।

এখন জায়গাটা আর তেমন টানে না হারানকে। দু-কাঠা জায়গার উপরে দাঁড়িয়ে ছিল যে ধকুল গাছ, ডালপালা কাটতে কাটতে শুধু

ধুড়িটুকুতে এসে ঠেকেছে, জামলাড় দু-চারটে দাঁড়িয়ে থাকলেও বন আর নেই। পলার কেটে জমিতে মিশিয়ে দিয়েছে লোকেরা, বড়ের সময় তালগাছ এমন দোল খায়, যেন একুণি ভেঙে পড়বে। চতুর্বদিকের মধ্যে শুধু এক চিলতে ডাঙা পড়ে আছে মাঝখানে, তার ওপর খড়ের চালের একটা ঘর, চালের ওপর লকলকে লাউডগা। জায়গাটার এখন আর সে চেহারা নেই। চারদিকে জমি, অকালের ধান সবুজ মাথা দোলাচ্ছে, যে কোনও গ্রামের মতো, যে কোনও মাঠের মতো। ঘাসের যারে যারে পড়েছিল যে ডাঙা জমি, তার এক চিলতেও পড়ে নেই কোথাও। সাধুর দেখাদেখি সবাই ভেঙেছে গোচর, পতিত বলে আর কিছু রাখেনি মানুষ। জে. এল. আর.ও অফিসে যাচ্ছে রোজ, খুলনায় গিয়ে পাটটা বাদিয়ে আসছে। হারানের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। জায়গাটা আর তেমন থাকলনি গো: মা ভগবতীর চরে বেড়ানোর মনে এক বৌটাও ফেলে রাখলনি কেউ। মানুষ বড়ো স্বার্থপর হয়ে গেল।

সাধুর নিজের বেলায় বিঘে হয় নিজেরই জমির ফসল। গোল আলু, লাল আলু, লম্বা আলু। দু-রকম বরি, লঙ্কা, মটরশুটি। সারাদিন একা মাঠে কাজ করে সাধু, কোদাল নিয়ে কোপায়, নিড়ানি দেয়, গোবর সার বিঘে মাথায় করে এনে ফেলে। বেলা ঢালে লাঙল চললে সাধু নির্দেশ দেয় আর একটু চেপে বৌটা ধরবে ধপু, ধনুধরার ভিতর পঞ্চাশ্ন ফাল চালা, - না হলে মা জননী ফল দেবে কী করে?

খুব খেটে আশ্রমে ফিরে এলে মনে হয়, মোটাসাধুটা থাকলে ভালো হত। গা-হাত-পা টিপে দিত, তেল মালিশ করে দিত, নিদেন কম্বলটা অন্তত হত। এই সময় একজন বলল, ও সাধু, এবার একখানা তামাকটাই দেখে সেবা দাসী রাখো। তুমি তো সেই গল্পের সাধু গো। ইদুরের জন্যে বেড়াল পুষল সাধু, বেড়ালকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে গাই গরু, আর গাই গরুর দেখাশুনোর জন্যে একটা মেয়ে মানুষ। সাধু চুপ করে থাকে, কোনও জবাব দেয় না। আবার কেউ কেউ তাকে ঠাট্টা করে ডাকে হরিসাধন। হরিসাধন সে। সাধু রাগ করে না। হাসে। গোঁফ দাড়ির ফাঁকে কোকলা দাঁতে বড়ো রহস্যময় মনে হয় সেই হাসি।

লাল হেলেনগটার লেজে হাত বুলোতে গরুর গাড়ির মওড়ায় বসে হারান কথা বলছিল গরুর সঙ্গে। একটুও ভেজা ফেলে রাখনি মা মেয়েদের জন্যে, এখন মানুষ ভাগ বসাচ্ছে তোদের খেরাসে বাদলরা ঘাস কেটে আনছে মাথায় করে, এরপর ভাও পাবেনি। তারপরে খড়, তুষি, খোল—কিছুই বাকি থাকবেনি। ধানের বস্তায় ঠেস দিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল হারান। মা পালটে গেছে চতুর্দিক। এই কাঠকাটা রোদে যখন একটুও মেঘ নাই আকাশে, তখন ধান চাষ হচ্ছে মাঠে। আকাশ লয়, মাটির তলা থেকে টেনে বের করছে জল, তবু তো মানুষকে কুলোচ্ছেনি! এত সহ্য হবেনি কো। এত অনাচার ভগবান সহ্য করবেনি। গোচর নাই, পতিত নাই, অনাবাদী জমি এক ছটাক ফেলে রাখলনি মানুষ।

আশ্রমের কাছে গাড়িটা আসতেই হা হু করে জোয়ালে হাতবাড়ি ঠুকে গাড়িটা দাঁড় করাল হারান। ব্যবসাগন্ধের জোপে কে ওরে বটে। সাধু না? আবার চেয়ে নাকি? হারান লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ির মওড়া থেকে। না, ভোর নয়। সাধু যাবা নেই, চুরিও যায়নি কিছুই। কৌপিন খুলে আছে, পরনের গেরুয়া কাপড়টাও না। শুধু গেরুয়া রঙ মাখা সাধুর গোটা গায়ে, সেই রঙের ছল নেমেছে দাদা ফুলের মতো গুলাবতীর দিকে। মাঠ কাটিয়ে টিবেরার করে উঠল হারান। হাত হাত করতে করতে লোক দৌড়ে এল চার-পাঁচখানা বাঁ থেকে।

পরের দিন সবাই দেখল, সাধুর জমির মাঝখানে একখানা লাল রঙের পতাকা পোঁতা।

(তিন)

মাল এসেছে গাঁয়ে। এমন মাল ক'বছর ছড়া ছড়া কেন আসে: হারানের মনে আছে, আগের সেটেলমেন্টের সময় ক্যাম্প পড়েছিল বজবজির ইস্কুল ঘরে। এবার এখানে, এই সাধুর আশ্রমের কাছে। তখন বাবা বেঁচে। সেবার সে বাবার সঙ্গে দিয়েছিল কাগজি। সেই প্রথম বাবা তাকে দাগনম্বর, খতিয়ান, দলিল-দস্তাবেজ-পড়া বুঝিয়ে দেয়। বাপুটি সম্পত্তির হিসেব সেই প্রথম সে বুঝতে পারে। এবারে আর অত দূর ছেতে হ'ল না। সাধু নাই, আশ্রম নাই, তবু পেয়ারে দাড়িটা আছে।. কপিলমুনির মূর্তি নাই তবু ইট দিয়ে বাঁধানো বেদিটা আছে। টৌকিদার ডাক দিয়ে এসেছিল আগে গ্রামে। লোকেরা জড়ো হয়েছে একে একে।

যেখানে সঙ্কেবেলা চাটাই পেতে ভক্তজনেরা বসত, সেখানটা পরিষ্কার করে চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। খাকি জামাপ্যান্ট পরা একজন লোক, নীল হাফশার্ট পরা আমিনবাবু আর কানুনগো সাহেব। বড়ো কম বয়স ডেভিও-র। সাধা সকাল মাঠে মাঠে ঘুরে এসে আমিনকে বলল, খগেনবাবু, বুঝতে পারছেন এখানকার জমির বন্দোবস্ত? উকুল চক্কিশ পরগনার বন্দোবস্ত নয়। একসময় এখানে জঙ্গল ছিল. ওই যে উঁচু থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে জমির ঢাল, এ হল জঙ্গলের লাঞ্ছন। একশ বছর আগেও এখানে চাষ হয়নি, সবই পতিত ছিল। তারপর গ্রামের লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, গ্রামবাসীরা গাঁ-টাঁয় দেখেন নি?

প্রশ্নটা ঠিক কাকে করল ডেভিও সাহেব বোঝা হয়ে ঘিরে থাকা লোকেরা কেউই বুঝতে পারল না। একটু পরে সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, দেখেছি। একজন আর একটু বেশিদূর কাছে বলল, ওই যে সাধু ওপাশটা দেখছেন, ওখেনে এই দিদিরও বিঘে জঙ্গল ছিল জানেন তো এই সব জমি তো এই সেদিন হয়েছে। চমকে উঠল হারান। এই সব জমি একদিন বন ছিল, অনাবাদী পতিত, গোচর! এই সবই জমি! অসম্ভব!

একে একে দাগ নম্বর বলে ডাকছিল ডেভিও. একসময় ডাক পড়ল গুড়ুড়ে গৌরাঙ্গ, দাগ নম্বর আটের দুর্গা আটায়, দু একর ধাট ডেসিমেল জমি, পাট্টাদার স্বামী বজ্রানন্দ।

সে কে? লোকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এমন নাম তো তারা কখনও শোনেনি; একজন লোক এগিয়ে এল ভিড়ের মাঝখান থেকে। আজে আমার নাম গোবর্দ্ধন ধাড়া, আমিই সাধুর জমি চাষ করতুম। সাধুর তো হাল ছিলনি, পাটি থেকে আমার নামেই বন্দোবস্ত দেওয়ালে ওরিয়েন্টে।

পাঁচখানা গ্রামের লোক এই প্রথম জানল ইদিনোকে যে নয়, বড় সাধুর আরও একটি নাম ছিল। বজ্রানন্দ।

কানুনগো জিজ্ঞাসু চোখে সকলের দিকে তাকাল: কেউ কোনও কথা বলল না।

হারান দাঁড়িয়েছিল কপিলমুনির বেদির কাছে। উৎসবের সময় এখানে ধোঁয়া হত। ধোঁয়ার আগুনে ঘি ঢেলে দিতে দিতে সাধু বলি দেখে পড়ে যেত, অগ্নি বেরিয়ে বিরাজ করেন, বলে প্রার্থনা হত, আকাশে উৎসব হত, পৃথিবীতে বিকশিত হত, তিনি সূর্যকলে পশ্চিমদিকে অস্ত যাওয়ার পর আবার পূর্বদিকে উদিত হন। যে নৈঋর্তকে নিয়মে একদিকে বন্ধ হয়, সে নিয়মে অন্যদিকে সৃষ্টি হয়। একই নির্মাণকর্তা মনুষ্য ও পশুপাখিকে সৃষ্টি করেন, তিনি আবার সমা উৎপাদন করেন—

এসব কথার কোনও দিন কোনও মানে বুঝতে পারেনি হারান, কিন্তু বছরের পর বছর শুনতে শুনতে আজ কেমন স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে গেল।

দাগ নম্বর ধরে ডাকতে ডাকতে এক সময় সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। হ্যাজাক জ্বেলে এনে রাখা হল কানুনগোর টেবিলে: অবও রাত হল। হারান বুঝতে পারল আজ আর তার ডাক পড়বে না।

চারদিকে অন্ধকার, আলকাতরা ঘষে ধারে ফিরছিল হারান দু'পায়ের এই জমি, ধু ধু মাঠ, এই চাষবাস—এক সময় এখানে জঙ্গল ছিল? সত্যই পতিত? গোচর? এত গোচর কে ভেঙেছিল হারান? তারও কি মাথায় জটা ছিল, মুখভর্তি দাড়ি? তার মাথায় কি বজ্রাঘাত পড়েছিল, রক্ত উঠেছিল মুখ দিয়ে?

হারান হাঁটছিল। দু'পাশে বহু দূর পর্যন্ত আল দিয়ে ঘেরা জমি। গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত কিছু একাকার। কোনও জমির সীমানা বোঝা যায় না। উপরনের মাঠ, নিমগেড়ের জোলের জমি, বাদ্রামোয়া দিয়ে বিঘে সাত ছটাক। হারানের কেবল ভয় হচ্ছিল, অন্ধকারের এই জঙ্গলে যে তার নিজের জমি বোধ হয় কোনও দিন খুঁজে পাবে না.

REGENT KING

A happy blend of taste & freshness

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

$46/SM/12143

বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকমহাশয়

বিকাশ বসু

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিকের বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল ঔপন্যাসিক। তিনি সেই সঙ্গে বিশেষ এক কলারীতিরও প্রবর্তক। প্রসঙ্গত বলা যায়, বার্নাড শ তাঁর বিখ্যাত প্রিফেসগুলিতে যে কাজ করেছেন, অর্থাৎ নিজের লেখার সমালোচনা, নিজেই করেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র সে কাজ তাঁর উপন্যাসের মধ্যেই করেছেন পাঠককে সামনে রেখে। পরবর্তীকালে এই কলারীতি বাংলা সাহিত্যে স্থান না পেলেও বঙ্কিম-উপন্যাসের সৃষ্টি ও প্রেরণার উৎস সন্ধানে সহায়ক হবে বলেই মনে হয়। বর্তমান নিবন্ধের গুরুত্ব সেইখানে।

অনাথবন্ধু যা হতে পারত 'সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ও পরলোক গমন করিলেন' জাতীয় নীরস বিবর্ণ বিবরণ মাত্র, সেই কুন্দনন্দিনী—ভ্রাতাপত্য বিবাহসংবাদ ও ভ্রাতাপত্যের অবাবহিত মৃত্যু-বৃত্তান্ত, বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে একটি সকৌতুক পরিচ্ছেদে ধরে দিলেন। পরিচ্ছেদের নাম দিলেন—'পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ।'

কৌশলটা এর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখার টেবিলের ঠিক পাশেই একটি স্বতন্ত্র কুর্সিতে তাঁর 'পাঠকমহাশয়'কে স-খাতির স্থান দিলেন সেই যে তাঁর প্রথম উপন্যাসেই, তারপর থেকে সেই নিবন্ধের পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা পরামর্শ চলতেই থাকল।

এই কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়, অন্য সাহিত্যেও একাধিক লেখককে তাঁর পাঠককে ডেকে কথাচ্ছলে অনেক কিছু বলতে দেখা যায়। যেমন জর্জ এলিয়টের উপন্যাস এ্যাডম বীডের শুরুই এই রকম:

'মিস্রীর যাদুকরী যেমন একবিন্দু কালির দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেন যে কোনো অজ্ঞাতকুলশীলের অতীত, যে আমরা পড়ব, ঠিক তেমনিভাবে এই এক বিন্দু কালি দিয়ে ১৭৯৯ সালের ১৮ জুন মিঃ কেলসল বার্ডের কাহিনীকার ছবি টেনে দেখাচ্ছি তোমাকে।'

আবার, স্কার্লট লেটার উপন্যাস যেন আমাকের শেষ পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে এইভাবে:

'পাঠক, আমি তাঁকে বিয়ে করলাম সেটা ছিল শান্ত নিরিবিলি অনুষ্ঠান ইত্যাদি।'

এই কলারীতিতে লেখা উপন্যাসের পাঠক মনে করেন, এতো গল্প নয়, তিনিও চরিত্রগুলোর কাছের মানুষ, অনাকথায় পাঠকও যেন লেখকের অভিজ্ঞতার সমিল হয়ে যান।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র এই কলারীতি বা কৌশলের যেমন সদ্ব্যবহার করেছেন তার কোথাও সঙ্গেই কোন তুলনা হয় না।

গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, কাহিনীর গতি পরিবর্তনে, চরিত্রনির্মাণে এই সাহায্যে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে আরম্ভ করি।

এখানেই গ্রন্থারম্ভ। তাহাতে কাহিনী অগ্রসর হইতে দীর্ঘ হবে যায়, তাই তিনি পাঠক মহাশয়ের কাছে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎলাভ থেকে ঘোরতর অনুচ্ছেদিক অনুমতি চেয়ে নেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। এই এক প্রচারে লেখকই তাঁর বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র কর্তা। শুধু লেখকের ইচ্ছে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি চরিত্রগুলোর কাছেই কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন, তাদের সময় কিছুতেই তাদের বশ মানতে পারেন না, নিজের খুশিতে তারা বয়ে চলে যায়। এমনকি তিনি সব কিছুর ভাগ্যবিধাতা নিয়ামক।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাঠকমহাশয়কে অনুমতি বড় একটা করে থাকেন না। কেনই বা দেবেন? তিনি বক্তা, পাঠক শ্রোতা মাত্র। গল্প বলার আসরে শ্রোতার চেয়ে বক্তার ভূমিকার গুরুত্ব কিছু বেশি।

অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব সাহিত্যবোধকে বিসর্জিত করার মত ভূমিকায় তাঁর পাঠকমহাশয়কে নেননি, (তাঁর ছিল এক স্বকালে মেটাদৃষ্টি পরিপন্থী ব্যক্তিত্ব) তবে তিনি ও উপন্যাসকলাদের প্রায় হাত ধরাধরি করে চলেছেন সব সময়। কোথায় চলেছেন? 'এ উপন্যাস লইয়া কি করিব?' তাঁর সাহিত্যের এই মৌল প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়াসই তিনি তাঁর উপন্যাসকে বিষের পাত্র নেননি, লেখক ও পাঠক দুজনকে শুধু সাহিত্যের আনন্দযজ্ঞের ঋত্বিক মাত্র অর্থাৎ সাহিত্য প্রকরণেই তিনি পাঠকমহাশয়ের সাহায্য নিয়েছেন বেশি।

সে যাই হোক সেই প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতেই এই দুই সত্তার আনাগোনা শুরু। এ তাঁর কলারীতির একটা দিক। দুর্গেশনন্দিনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে:

'জগৎসিংহ তখন সিংহ সৈন্যেশ্বরের মন্দির হইতে বাহির হইলেন। অপরাহ্ণে তাঁহার অনুসন্ধানে অথবা অভিসারিণীর সংবাদ কহনে পাঠক সংস্কারিতে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। জগৎ সিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রচ্ছন্ন ভাবে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজনীতির ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ঐতিহাসিক সম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অসহিষ্ণু হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে তাহাতে ভাল নয়।'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় আমিত্বে তাঁর 'পাঠকমহাশয়' ছিলেন একেবারে, অর্থাৎ তিনি 'পাঠক' নন, 'পাঠকবর্গ'। সম্ভবত পাঠকের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হওয়া যায় না বলে তিনি পরে বহুবচন 'পাঠকবর্গকে' একবচনের 'পাঠকমহাশয়ে' রূপান্তরিত করে আরও কাছের করে নিয়েছিলেন।

সকলেই জানেন সম্পূর্ণ নাটকীয়ভাবে জগৎসিংহের সঙ্গে বিমলা ও তাঁর অনুচরবর্গী সহচরী তিলোত্তমার পরিচয়, পরিচয়ে প্রথম সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমার হৃদয় জয় করে জগৎসিংহের প্রায় নাটকীয়ভাবে সৈন্যেশ্বরের মন্দির থেকে প্রস্থান। এই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলোর মধ্যে জগৎসিংহ লোকটা কে, তাঁর দেশে কেনই বা তাঁর উপস্থিতি, এ সব খুঁটি তত্ত্ব পরিবেশনের কোন সুযোগই ছিল না। সম্পূর্ণ রোমান্টিক বর্ণনার মধ্যে এসব কোরো তত্ত্ব ঔঁজে দেওয়া যায় না, দিলে ছন্দপতন সুনিশ্চিত। অথচ এ ইতিবৃত্ত পাঠককে না জানালেও নয়। তাই ঠিক পরের পরিচ্ছেদের শুরুতেই তিনি তাঁর পাঠককে ডেকে জানিয়ে দিলেন—তাঁর কাহিনীর পটভূমি। উদ্দেশ্যবশে মোগল পাঠান শক্তি প্রতিযোগিতা ও তার সঙ্গে জগৎসিংহের সম্পর্ক লেখক খানে খানে বিবৃত করলেন। এই পটভূমি জানার জন্যে পাঠকের নিজের মনেই আগ্রহের সৃষ্টি হয়ে গেছে। নায়িকার সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎকার ঘটে গেছে অথচ নায়ক সম্পর্কে পাঠকের কিছুই প্রায় জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের মনে প্রথমে নায়ক সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগিয়ে পরে তার সন্ধানদানের ব্যবস্থা করলেন। এভাবেই তাঁর 'লেখক—পাঠক কলারীতির' জন্ম হল। ভবিষ্যতে এই কলারীতির বিচিত্র ও বহুবিধ ব্যবহারে তিনি তাঁর উপন্যাসকে আরও ও অধিকতর উপাদেয় করে তুলেছেন।

যেমন, তিলোত্তমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিম তাঁর পাঠককে স্মরণ করেছেন। পাঠক কী ধরনের রূপ ভালবাসে, তিলোত্তমার রূপটি বা কোন শ্রেণীর, এসব নিয়ে তিনি পাঠকের সঙ্গে রীতিমত আলোচনা জুড়ে দেন। এবং তারই ফলে তিলোত্তমার রূপের বিশেষ চরিত্র ফোটে। যেমন—'পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস?' তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত ইত্যাদি।

এই পাঠকের কোন নির্দিষ্ট বয়েস নেই, না থাকাই লেখকের পক্ষে সুবিধের। বিমলার যৌবন বর্ণনা করতে তাঁর মন্তব্য—'বয়েসে রসের অবশ্য পরিপাক। পাঠক মহাশয়ের বয়স নির্ণয় করা হইয়া থাকে, তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।'

এই রীতির বহুবিধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই পাঠক মহাশয়ের বয়েসের স্থিতিস্থাপকতা। আয়েষার রূপবর্ণনার পাঠককে আগে নিয়েছেন বঙ্কিম। সুন্দর জিনিসের ভাগ না দিলে যেন লেখকের তৃপ্তি নেই, এই ভাব। এখানে পাঠক মহাশয়ের যেন তাঁর সমবয়সী।

রোমান্সধর্মী জগৎসিংহের সুকুমার যোকাবেলা নিয়ে পাঠককে জগৎ সিংহের স্থান নিতে বলেছেন এবং শেষে এমন মন্তব্যও করেছেন—'অত একদৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন? আয়েষা কি মনে করিবে?'

এখানে লেখকের পাশে উপবিষ্ট পাঠক যেন অস্বস্তিকর ব্যাপার নয়, হাত নিয়ে খেলা যায় তাকে।

ভারী মজার শিল্পকৌশল না কি? আধুনিক প্রজননীতির ভাষায় যাকে সামিল করা বলে, তিনি পাঠককে সেই সামিল করে নিয়েছেন সাহিত্যের আনন্দযাত্রায়। সেই যাত্রায় পাঠকের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি মিলবে না এতো বোঝাই যায়। পাঠকের সঙ্গে কোথায় কোথায় তাঁর অমিল হতে পারে অনুমানের সাহায্যে তিনি তাও বলে দিয়েছেন। তবু তিনি ও পাঠক সহযাত্রী, কেন না তাঁদের অমিলই এক ধরনের আনন্দের উৎস।

আরো এক দিক দিয়ে বঙ্কিমের এই পাঠক মহাশয় ব্যাপারটাকে দেখা যায়। তাঁর নিজ প্রকরণে পাঠক মহাশয়ের ভূমিকার বৈচিত্র্যে উপন্যাস অনেক অনেক বেশি ঘরু ও সরস হয়ে উঠেছে। তো বটেই ঘটনার বিন্যাস যোগাযোগ উপন্যাসের কাজও অনেক সহজ হয়ে গেছে। বস্তুত পাঠক সব সময় লেখকের সঙ্গী হওয়ায় তাঁর ঘটনার বিন্যাসদক্ষতার প্রায়ই যেন অবসান হয়ে উঠেছে।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের শেষের দিকে তিনি এমন ভাব করেছেন যেন ঘটনার ঐশ্বর্যেও পাঠক তাঁর সঙ্গী। ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে সব লেখককেই মনে মনে নাড়াচাড়া করতে হয়। গল্পের পরিণতির 'সহজ সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে হয়। এটা লেখকের নিজস্ব শ্রীগৃহের ব্যাপার। বঙ্কিম তাঁর পাঠককে এই চিন্তার আগে ভাগ করে যেন অতিনিবন্ধ সৃষ্টি করেছেন। তিলোত্তমা তো অন্তঃপুরচারিণী, জগৎ সিংহের পরিচিতিও হলেন। ফলে আয়েষার মনে প্রতিক্রিয়া কী হল। পাঠকেরও চিন্তা, লেখকেরও চিন্তা। লেখক সেটা অবশ্যই জানেন। লেখক বোঝেন, আয়েষার ভবিষ্যৎ নিয়ে পাঠক তাঁর চেয়ে কম মুশকিলে নন। তিনি উপন্যাসের শেষ করলেন এইভাবে—

'পাঠক মনে করিতে পারেন যে আয়েষা তাপিত হৃদয়ে বিমলার উপদেশ উপেক্ষা করিবে পারেন নাই। বস্তুত তাহা নহে। আয়েষা নিজ সমর্থ চিত্তের প্রফুল্লতার সম্পাদনেই প্রফুল্ল করিতে পারিলেন; প্রফুল্ল অন্তর সহচীদিগের মনোমোহন মানস সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্বত্র শ্রী সম্পাদন করিতে লাগিলেন।'

অন্যান্য সন্ধানকালের লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে বসে আলোচনা করে নায়ক কে, কেন এবং আয়েষার চরিত্রানুগ পরিণতি কী হল এইভাবে গল্প সমাপ্ত

করলেন। পাঠকের স্বাভাবিক সনাতন প্রশ্ন, 'অন্য নায়িকার কি হ'ল?' তার সন্তোষজনক জবাব মিলল। উপন্যাসও শেষ হল। এ এক অভিনব শিল্পকৌশল নয় কি?

'লেখক-পাঠক সহযাত্রা কলারীতি'তে একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়, বিশেষ আমাদের বঙ্কিমের হাতে এ রীতির চূড়ান্তে ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর যে কোনো উপন্যাসের যে কোনো অংশের পর পর কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে গেলে এ রীতির দেখা মেলে।

যেমন,—'প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।' উদ্দেশ্য, দৃশ্যান্তর ঘটানো। ব্রজেশ্বরের ঘাস্য-মরের কথাবার্তার তড়িঘড়ি সমাপ্তি ঘটিয়ে বঙ্কিম এক্ষুণিই চলে এলেন সাগর-প্রফুল্ল সংলাপে।

তারপর ঘটনার ওপর লেখকের নিজস্ব মতামত বা টুকিটাকি মন্তব্যের জন্যেও এ রীতি। যেমন—'পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না।' এই কৌশলে তিনি তাঁর গ্রন্থের স্বাধুতা বাড়িয়েছেন বহুগুণে। 'গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা রাখি, মার্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।' প্রফুল্লের গণ্ডগোলে ব্রজেশ্বর চুম্বন ঐঁকে দেবার পরই এই মন্তব্য। পড়ে মনে হয় যেন নিজস্ব রুচি ও সংযমের পরিচয় দিতে গিয়ে এক সময় বঙ্কিম যেন এ রীতিকে 'সিজার কাট'-এর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

এদিকে আবার বার্নার্ড শ তাঁর বিখ্যাত প্রিফেসগুলিতে যে কাজ করেছেন, (অর্থাৎ নিজের লেখা সম্পর্কে নিজেই আলোচনা করেছেন) বঙ্কিম অনেক সময় সে কাজ সেরেছেন উপন্যাসের মধ্যেই পাঠককে সামনে রেখে। যেমন, বিষবৃক্ষের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে—'এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণীর মধ্যে কেহ মালিনী চরিত্রের (কালিদাসের) থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রস মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।'

বঙ্কিমোক্ত পরিচ্ছেদটি রসজ্ঞ পাঠকের কাছে আদৌ নীরস নয়, তবে কাহিনী বা ঘটনা বা চরিত্র সংঘাত অল্প। এবং সে কারণে কিছু পাঠকের কাছে নীরস লাগতে পারে, সেজন্যই বা এটুকু আত্মরক্ষা সমর্থন।

আত্মরক্ষা সমর্থন আরো আছে। 'আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা বিন্ধ্যাচল অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দেশ জঙ্গলে পরিকীর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নেই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন' ····ইত্যাদি।

> **'আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্‌বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই।'**

বস্তুবিচ্ছেদ উদ্দেশ্যসাধক হলেও মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য পাঠকের সঙ্গে সহযাত্রা। নাই বা হল পুরোপুরি সমযাত্রা, তবু পাঠককে সঙ্গে নেওয়া। 'আমার একটি পাত্র ভূটিয়াছিল, (পাঠক জানেন সব মিথ্যা) আমার ছোট বহিনের ছুটিল না কিংবা 'বজরায় দেবীর রানীগিরি' আসবাব সব ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন। তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব বিবা ও নিন্দিকে দিলেন।' অর্থাৎ পাঠক পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন এই ভাব সর্বত্র। 'এই চেলা কাঠের (দেবী চৌধুরানীর বজরা ভাড়া) উপঢৌকন দিয়া পাঠক মহাশয় নিশি ঠাকুরানীর কাছে বিদায় লউন। অনুপযুক্ত হইবে না।' যেন পাঠকের হাত দিয়েই গল্পে বিদায় ভূমিকায় শেষ করছেন লেখক, আর কৌতুক ছলের মোড়কটি বাড়তি পাওয়া।

একবার মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আবার বঙ্কিম পাঠক মহাশয়কে জলে পাঠিকার স্বারস্থ হয়েছেন, তাতে সৃষ্টি হয়েছে নবতর রসের। 'আর সুন্দরী পাঠকারিনি। ইনি আপনার দর্পনস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।' (কপালকুণ্ডলা) 'বিশেষ একজন (ব্রজেশ্বর)তাড়াইতে আসিয়াছে আর একজন (প্রফুল্ল) তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীন পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল? আর হউক—উচিত মত কিছুই হইল না। প্রথমে দুইজনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না।'

বিশেষ স্ত্রী চরিত্র আলোচনার সময় বঙ্কিম পাঠিকাদের স্মরণ করেন, কেন না এ বিষয়ে তাঁরাই বোদ্ধতর বিচারক। যেমন—'আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্‌বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই।'

সৃষ্ট স্ত্রী চরিত্রের আচরণ যদি পাঠিকার সমর্থন পায়, তা লেখকের বড় সাফল্য, বঙ্কিমের সেরকম-ই অভিপ্রেত। এর পরেই তিনি বুদ্ধিয়ে বলেছেন ভ্রমর কেনই বা রোহিণীকে প্রহার থেকে বিরত হল।

'ইন্দিরা মূলত মহিলামহলের সম্পত্তি। সেখানে তাই পাঠক মহাশয় নয়, পাঠিকা ঠাকুরানীর প্রাধান্য। ইন্দিরার নিজের বয়ানে, 'যদি আমার কোন পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখনো এই রূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন।'

কিংবা ধরা যাক—

'তা তোমরা পাঁচ জনের মেয়ে আছ, পুরুষ পাঠকদিগের কথা আমি ধরি না—তাহারা এ শাস্ত্রের কথা কি বুঝিবে—তোমাদের আসল কথাটা বুঝাইয়া বলি।'

যেন পাঠিকারাই লক্ষ্য, পাঠকরা বিশেষ বর্তব্যের মধ্যে নয়, যদিচ তাঁরাও প্রয়োজন মেটাতে মাঝে মাঝে স্মর্তব্য। যেমন এর পরেই আছে—'পুরুষ পাঠককে দয়া করিয়া কেবল হাসি—তাহাদিগে তত্ত্বটা বুঝাইব।'

ইন্দিরাতে পাঠকও আছেন, তবে ঠিক পাঠিকার মত নায়িকার আপনজন হিসাবে নয়, বরং অনেকটা যেন ঘুরসিক কোনো প্রতিপক্ষ হিসেবে। উপন্যাসের প্রয়োজনে যথার্থ উত্তর দিয়ে ইন্দিরা বলে,—'পাঠক মহাশয় দেখিতেছি আমি সব সত্য বলিতেছি।'

এদিকে বঙ্কিমের কলারীতির আর এক স্বভাব হল, আসল কথা পরে বলা, কখনো বা সাধারণ পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত পরিচয় প্রথমে চেপে গিয়ে পরে সুযোগ বুঝে মত তা ছেড়ে বলা। যেমন—চন্দ্রশেখরে একটি পরিচ্ছেদের নামই 'পূর্বকথা।' 'পূর্বকথা পরিচ্ছেদের শেষ এইভাবে—'এই কথার পর চন্দ্র বিদায় হইলেন। রামানন্দ স্বামী তাহার পর অন্তর্ভাবে অলক্ষ্যে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।'

চন্দ্রশেখরের শুরুতেও এই রীতি—আসল কথা পরে বলা। 'সেই অবধি সৌরসিনীকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। তাহাও পাঠক জানেন।' সীমা-পুরুষিণীতে কলির-সৌরসিনী হিসেলোপ ইতিমধ্যেই বঙ্কিম সেরে রেখেছিলেন, কিন্তুটা নাটকীয়তা আনার উদ্দেশ্যে। পাঠককে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'সীতারাম' উপন্যাসে গঙ্গারামের জীবন্ত কবর দৃশ্যে নাটকীয়তার চরম, পাঠকমহাশয়কে বঙ্কিমের একান্ত দরকার।

পাত্র-পাত্রীর নামধাম চেপে শুধু কৌতূহলোদ্রেকে অনেক কিছু জানিয়ে দেওয়া যায়।

সেই কৌশলে লেখক বহুদূর এগিয়ে যাবার পর পাঠক যখন অনুমান করছেন যে বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া যে শ্রীলোক, সম্ভবত সে তাহার (পুরুষটির) ভগিনী শ্রী, তখন লেখক হঠাৎ চকিতে বলিলেন—'পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে এই শ্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার।'

'লেখক পাঠক কথাদুটির বাকে বলে চুটিয়ে ব্যবহার—বঙ্কিমের তাই। তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ রীতি অবশ্যই দেখা যাবেছে তবু তিনি যেমন একে এক সবল হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন তেমন বেশবার আর কোথাও ঘটেনি। ঐ সীতারামেই আছে—'এ গোড়াবন্দুকী দিগকে জগদীশ্বর কেন কল যৌবন দিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম, শ্রী শ্রী কবিতা পড়ি পড়ি করিল, সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধহয় দুইটাতেই তাকিনী শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।'

এ বস্তু অবশ্য বঙ্কিমলেখনীর ষোলোআনা নিজস্ব ইরশাদ বলা যায়—মাঝে মাঝে দৃশ্যপট পরিবর্তন করে গল্পকথনে বৈচিত্র্য জনতেই তিনি তাঁর পাঠক মহাশয়কে কাছে দাঁড়িয়েছেন সবচেয়ে বেশি। 'এই সকল গোলযোগের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে?' এই সময়ে পাঠকের হয়তো মনে না পড়তে পারে ঠিক মত এগোয় না, এগোলেও তা বিরস বর্ণনা মাত্র হয়ে পড়ে। লেখকের তা অভিপ্রেত হতেই পারে না। অতএব এই সময় সকলের কাছে মুসলমানদের আগমনবার্তা যেমন পৌঁছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌঁছিল। দুরন্ত বলিল, 'মহাশয়া, এখন বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ কর।' পাঠকের গতির রমাকে মনে পড়ার ফলেই যেন গল্পে নতুন গতি সঞ্চার হল। এই রীতি।

'পাঠককে বলিতে হইবে না যে দুর্গমধ্যে সিপাহিরা বাস করিত।' ক্যামেরা যেন পান করল—তারপরই সিপাহীদের কাপ কারখানার বিস্তৃত ছবি। এই রীতি।

সন্তানা বড় দৃশ্যকে ছোট করার কাজেও এই রীতি : শ্রী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যে বিস্তর কথাবার্তা হয়ে থাকবে, তার মধ্যে সব কথা গল্পের পক্ষে উপরিয়ার্থ নয়। বঙ্কিম তাই লিখলেন, 'কথাবার্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে মোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।' অথবা 'গঙ্গাধরস্বামীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর কথাবার্তা সব সংস্কৃতে, শ্রী এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গলায় বলিতেছি।'

বঙ্কিমের চরিত্রেরা ফরাসী বাংলা সংস্কৃত প্রভৃতি বিচিত্র ভাষাভাষী, তিনি পাঠকমহাশয়ের রীতিতে এ সমস্যারও কিছু সুরাহা করে নিয়েছেন। বিলক্ষির অনুচর মহম্মদ আলি, ফরাসী মেজাজে সংস্কৃতে কথা বলে। 'পশুপতি সহকারে তার অর্থবোধ করিলেন। পাঠকমহাশয়ের সে কষ্ট ভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাঁর সুবিধার্থে সে সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।'

অনেক কথা বলা গেল। বঙ্কিমের নানান অভিপ্রায়ের সন্তার পাঠক মহাশয় চরিত্রটিকে তবু বোধহয় ঠিকমত ফুটোনো গেল না।

প্রতাপ থেকে গৌড়ে পটপরিবর্তন যখন তাঁর উদ্দেশ্য তখন মৃণালিনী ও মণিমালিনীর কথোপকথনের মাঝখানে পাঠককে হাত ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দেন বঙ্কিম—'তখন পাঠকমহাশয়কে দাঁড়াইতে হইবে। ····· সেই কথোপকথনের মাঝখান থেকে পাঠককে কুড়াইতে আরম্ভ করিব।'

পাঠককে সামন্তিক অন্ধকারে রাখা যখন লক্ষ্য—'কৃষ্ণ তরণীতে দুইটি মাত্র আরোহী। দুইটিই স্ত্রীলোক।' তারপর পাঠক যখন মোটামুটি অনুমান করে ফেলেছে তখন লেখক বললেন—'পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী ও গিরিজায়া।' বলিতে হইবে না, অর্থাৎ বলা দরকার।

তারপর 'সে কথোপকথন শুনিতে পাঠকমহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রয়োজনবশতঃ তাহা জানাইতে পারি।' জানানও।

পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে আবার তা নিরসন করা সে তো আছেই। আধুনিক পাঠক এ কৌশলে তটটা ছাঁই হবেন না, বরং অনাগ্রহ বোধ করবেন। কিন্তু সূক্ষ্ম সরলতা যেখানে লক্ষ্য সেখানে এই পাঠকমহাশয়—রীতি বড় কাজের এবং তাতে চিরকালের পাঠক নিশ্চয়ই সায় দেবেন। যেমন—'মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তদূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং নির্ণয় করিবেন।'

এইখানেই বঙ্কিম তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন ইউরোপীয় লেখকদের নৈর্ব্যক্তিক পাঠকের থেকে স্বতন্ত্র নিজস্ব এক পাঠক মহাশয়ের সৃষ্টি করে গেছেন। এ পাঠক মহাশয় ঠিক তাঁর সমকক্ষ নন, তবু তিনি তাঁকে সমকক্ষের সম্মান দিয়ে তাঁর লেখার টেবিলের পাশে বসিয়ে রাখেন, সাহিত্যের আনন্দযাত্রার সহযাত্রী করে নেন। এ পাঠকমহাশয় তাঁর বয়স্য নয়। সরস আখ্যায়িকা সৃষ্টির সাথী।

সর্বোপরি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ নিয়ে, তাদের আচরণের স্বাভাবিকতা নিয়ে, তিনি পাঠকমহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা সেরে নেন গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে। ফলে সংশ্লিষ্ট চরিত্রটি যেন আরও একটু বিশদ ও পরিস্ফুট হয়।

যথা—মৃণালিনী প্রসঙ্গে পশুপতি চরিত্র। বখতিয়ারের নজরীশ হবার অব্যবহিত পরে গ্রন্থকার বলছেন—'আমরা পাঠকমহাশয়ের কাছে পশুপতিকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক বলিবেন, যে ব্যক্তি সহজে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। উর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।'

পাঠক মহাশয় বঙ্কিমের লেখক জীবনের প্রায় চিরসঙ্গী। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় মৃণালিনীর। আর রাধারাণীতে পাঠকমহাশয় নেই, মহাশয়াও নেই। তবে ভঙ্গীরীতি একই। যেমন—

'তোমরা পাঁচজন রসিকা, প্রেমিকা, বাকচতুরা বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজন বলে দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয়?'

অবশ্য এ গল্পে এক নৈর্ব্যক্তিক পাঠককে দেখা যায়, কিন্তু সে একবার মাত্র। 'রজনী'তে—যেখানে চরিত্রেরা কথা বলছেন নিজেদের জবানীতে সেখানেও পাঠকমহাশয় আছেন, একটু ভিন্ন বেশে। যথা শচীন্দ্রের কথা—'কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে।' অথবা রজনী তার আপন কথা শুরু করেছে, অজানা এক 'তুমি'কে সম্বোধন করে। এই 'তুমি'কে রজনী চেনে না, তবু তার নিজের গলায় আন্তরিকতার সুর—'তোমাদের সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না।' পাঠককে নিজস্ব সুখ দুঃখে সহচর করে তোলাই উদ্দেশ্য, তবু এই নিরবয়ব 'তুমি' বোধহয় বঙ্কিমের সেই নিত্যসঙ্গী রসিক সুজন পাঠকমহাশয় নয়। অন্যদিকে 'কৃষ্ণচরিত্রে' যে পাঠকের দেখা মেলে তা একেবারেই বিমূর্ত নিরবয়ব। এই পাঠককে ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা যায় না। লেখকের তা উদ্দেশ্যও নয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' শিল্পসৃষ্টি নয়। কৃষ্ণচরিত্রের পাঠক আসলে পাঠকসমাজ, ব্যক্তি নয় সমষ্টি। যেমন—'আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাঁহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের যৌক্তিকতা কি?' এ পাঠক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কোনো সহযাত্রী নন, সন্তান্য যা কল্পিত বিবাদী মতের প্রতিভূ মাত্র। যদিও সহযাত্রা বা সরস কথোপকথনের প্রশ্নই ওঠে না এই নৈর্ব্যক্তিক পাঠকের সঙ্গে।

এদিকে অজস্রধারায় রস-রচনা 'মুচিরাম গুড়'-এ একবার মাত্র বঙ্কিম পাঠককে স্মরণ করেন কিন্তু অভিনয়ধর্মীয়ভাবে—'বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে — পাঠক হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।' পাদপ্রদীপে যেন মোলকরতাল খেয়ে ওঠে। তবে এই পাঠকেরও চরিত্র কিঞ্চিৎ ভিন্ন—এ যেন মন্ত্রমুগ্ধ এক শ্রোতা, গল্পের কুশীলবে কথা লেখকের প্রতি মুহূর্তের আনন্দদায়ী নয়।

হঠাৎ, হঠাৎ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কথা তো সেই কবেই কেটে গেছে। কিন্তু
বসেই আছে কেন যাই-যাই করেও,
বৃষ্টি এখনও থামেনি।
সাদাটে নিরেট কেউ, তারপর নীলের আভাসটায়
চুবিয়ে নিয়ে
আকাশ ছুড়ে টান করে কেউ
পেতে রেখেছে
রোদ্দুরের সাদা চাদর।
কিন্তু মাঝে মাঝেই তার উপরে পড়ছে
মেঘের মোটা বাজাগুলোর
মাখনা পায়ের ছাপ।
সূর্যদেবের চোখে অমনি ঘনিয়ে উঠছে
অন্ধকার। আর
চড়বড় করে তক্ষুনি এমন বৃষ্টি নামছে যে,
সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের এই
রাস্তা একময় ফাঁকা।

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না।
হঠাৎ যেমন আসে, তেমনি
দেখতে-না-দেখতে হঠাৎ আবার
চলেও যায়।
গাড়িবারান্দার আশ্রয় থেকে
বেরিয়ে আসে মানুষ।
উপরে তাকিয়ে তারা দেখতে পায় যে,
রোদ্দুরের চাদর থেকে
মাখনা কালের সেই ছাপগুলো কেন মিলিয়ে গেছে।

কালের অভয়

আল মাহমুদ

মৃত্যুর পাঁচাত্তে তবু পৃথিবীতে কি আছে নতুন ?
তোমার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট রেখে মনে হলো কাল
নারীর বুকের মধ্যে আছে এক মায়াবী আগুন
যার লোভে মহাকাল ভস্ম দেয় প্রতিটি সকাল ।

মরণই বিজয়ী বটে মানি সবি মৃত্যুর অধীন
তবুও কণ্ঠার নিচে জমে থাকা রক্তাক্ত মদায়
প্রস্তাবীস্থানের বিন্দু একফোঁটা দেখে একদিন
ভাবি কার সাধ্য এই মানবিক বিভাকে খসায় ?

তুমি নয় তও বলে মৃত্যু এতো দুঃসাহসী হয়
ভাবে তার আহার্যের গ্রাস বুঝি রয়েছে সুলভ,
তুমি যে কবির নারী প্রিয়তমা কালের অভয়
প্রেমের সংগীতে বাঁধা কামনার ঘন্ত অভিনব

এ-কথা জানে না কাল, মৃত্যু তারও অন্ত অভিলাষ
যাকে স্পর্শ করে, ভাবে সেই বুঝি মৃত্যুর বিষয় ।

সে

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

কন্যা	বাংলা ধরেন,	কন্যা	কাজলীকে—
এ প্রবাদ	কানের কাছে	বলে যায়	গাঙশালিখে ;
তবে কী	বিদেশ যাবো ?	তারা সব	ধরত্রী যে যা
ওঠে বসে,	খিড়কি খুলে	মোহুল	লাগায় দেদার
এদিকে	বাস্তু উলেন,	তৈজস	চলেন জলে,
শুধু শ্যাম	প্রবয়ভাষা	বাদলে,	দূর্বাদলে,
দুধ	ধরায় দেখে	নিশুঢ়	নীলকারতী,
শুনছো,	আকাশবাসিন,	ধন নেই,	জীর্ণপথিক—
এ প্রশ্ন	অপ্রয়োজন,	যতো বলি	নিরাবাসী—
সে হাসে	মুচকি হাসি,	ছুঁই-মুচকুন্দ	হাসি ।

সন্ধের ল্যাণ্ডস্কেপ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একটা শালপাতা উড়তে উড়তে সন্ধের মাঠ পার হ'য়ে গিয়ে
কোথায় হারিয়ে গেলো। এলোমেলো হাওয়া মিছিলো এদিকে ওদিকে,
কিকে হ'য়ে আসা আলো, আর চারপাশে উবু হয়ে বসা মানুষ জনেরা

কী যেন একটা নক্সা বুনে, আছে বিছিয়ে দিলো ঘাসের ওপরে।
ভেবে রাখবো কিনা ভাবছিলাম, কিন্তু ঘর আছে বলে?
কোলাহলে কয়েকটা কথা ঠিক স্পষ্ট শুনতে পারি নি,
আজ তার মানে বুঝতে পেরে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

নামধাম সবই তো মরার আছে, ছুরে কিংবা আরো কিছু কাছে—
মাঝে মাঝে বাড়ি পোড়ানোর শব্দ কানে ভেসে আসে।
কিছুটা আভাসে বলো কে যেন বলতো, আর তাই-তো বলেছি।

এখন ঘাসের ওপর মিনিট পঁচিশ বসে থেকে
বুঝলাম, প্রথমে হয়তো কথা ঠিকভাবে বোঝেনি, এখন
সব ঠিক ভাবে আসছে। এখন নিশ্চিন্তভাবে শুনতে পেরেছি॥

॥ নেই ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরীর নেই
যা ছিল সব পাখি।
মাঝে মধ্যে বৃষ্টির জল
হঠাৎ যখন আকাশ থেকে নেমে
আসতো উত্তরের বর্ষা!
একটা দুটো পাখি তখন পালকের
মতো ঝরিয়ে যায় এদিকে
ভয়ে নদীর খেলায়, নদীর কিনারে!

কী জানি কী ঘটতো! তখন
তুমি কোথায়?

২৭ জুন, ১৯৮৩

প্রিয় সন্তোষ,
আনন্দলোকে ছুটি সময়মত পেয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল আনন্দলোকে নিয়মিত কিছু কবিতা পাঠাবো। কিন্তু কেন জানিনা ঘরে শরীরটা থাকলে তারই সেবা শুশ্রূষে মোট সময়টা পালাবে হয়। একটি প্রতিশ্রুতি সাধ্যমত পেলে সুখী হবো।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৯-৬-৮৩
১৪, বেঙ্গল রোড
কলকাতা-৭০০০৩১

আমাদের এই শহর

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আকাশে মেঘ ও রাত্রির ঘোর আয়োজন। দুহাত দূরের
মানুষজনও তাঁহার করা যাচ্ছিল না।

ঠিক সেই সময়ে, আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দিশেহারা
কে যেন একজন বললেন, 'এ কোথায় এলুম, কোন নির্জনে!
কাছাকাছি মানুষের বসতি যদি থাকত,
তো, রাতের আশ্রয় মিলত।'

আমরা তাঁকে টর্চের আলোয় দেখালুম
আমাদের বাড়ির সদর এবং অন্দর; ঝিলানের কারুকাজ,
জানালায় সবুজ, আয়না দেওয়া উঠোন
এবং খিড়কির দুয়ার।

বললুম, 'আকাশে যদি আজ মেঘ না থাকত,
যদি চাঁদ উঠত,
যদি জ্যোৎস্নায় ভেসে যেত চতুর্দিক,
তো, দেখতেন, আমরা কত সুন্দর,
প্রতিটি বাড়ি স্বাগত জানাচ্ছে সকলকে।'

স্মৃতির লতাবিতান ঘিরে

কৃষ্ণ ধর

পঁচিশ নম্বর বাড়িটায় একদিন থাকতুম আমরাই
এখন ভাবলে মনে হয় যেন গতজন্মের কথা
কড়া নাড়লে ভিতর থেকে গাঙীর গলায় হাঁক শোনা যায়
কাকে চাই ?
ফিরে আসি বিরক্ত হয়ে।

অথচ এই সেদিনও ছিল এ বাড়ির সবত্র ঘর, সিঁড়ি, অলিন্দ
আমাদেরই দখলে
তার জানলা-দরজা খুলে আমরাই ডেকে এনেছিলুম
পরিচিত রোদ্দুর আর আশ্বিনের বিবাগী মেঘ।

এ বাড়িতে আমরা ছিলুম আমাদেরই মতন
তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে আমাদের স্মৃতির লতা-বিতান
আমাদের ইচ্ছাগুলি এ বাড়ির খোলা চত্বরে লালনপালন করেছে কতদিন
তার লম্বা করিডর ধরে চলেছিল আমাদের ডুব ডুবাটুবি খেলা
খেলতে খেলতে কতদিন আমরা পেয়ে গেছি
আমাদের অসমাপ্ত কবিতার কোনো চিত্রকল্প
গলায় তুলে নিয়েছি কত টুকরোটাকির টুকরো
কত খরতাপে আকাশ থেকে
নামিয়ে আনতে গেছি শ্রাবণ ভাদো মেঘ
হিমশীতে আনতে চেয়েছি চৈত্রদিনের ফাগুন হাওয়া

একদিন আমাদের গলার সব পুরনো গান
তুলে নেওয়া হল নতুন মালিকী ক্যাসেটে
আমাদের ডেকে নিল বিকল্প বাতাস
সিঁড়ি বেয়ে স্বপ্নচারিতের মতো নেমে এলুম আমরা
পঁচিশ নম্বর বাড়িটায় ঢোকার পাসপোর্ট হয়ে গিয়ে

এখন কড়া নাড়লে ভিতর থেকে গাঙীর গলায় হাঁক শোনা যায়
কাকে চাই ?

যেভাবে জীবাশ্ম থেকে

ব্রততী সিংহ রায়

যেভাবে জীবাশ্ম থেকে ঝরে যায়, উঠে আসে শ্যাওলাদাম
অনন্ত নক্ষত্রের নিস্তব্ধ কণা ঘিরেছে তার অবয়ব
সৌর উজ্জ্বলতা তাকে নিয়ে গেছে খনিষ্ঠ আবহে
হাজার হাজার বছর শেষে আমরা মিশে যাবো
সেই অন্তিম শিকড়ে।

আমাদের প্রার্থিত বৃষ্টিপাত
রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনমান
সঙ্গীতের মেদুরতা
উষ্ণতার ঘেরাটোপ পার হয়ে নেমে যাবে
হাড়হিম শূন্যতায়।
জনরণ্যের চকিত কোলাহল ট্রাফিক বিদ্যুত
সুললিত নগরনির্মাণ জুড়ে
বেজে উঠবে বিদায়লগ্ন সংকেত
জীবন মরতা শেষে আছে কোনো বৈতরণী
ওপার উন্মোচিত
হৃদয় জানে না।
তবু বালুকণার মতো জীবন
তবু জীবনের পরিক্রমা প্রেমে ও অসুখে
শ্যাওলাদাম ছুঁয়ে থাকবে তার কিছু স্মৃতি ও সোপান।

লোকাত্তীর্ণ আশ্রিত গোলাপ, তুমি

দাউদ হায়দার

লোকাত্তীর্ণ আশ্রিত গোলাপ, তুমি
শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায় আত্মস্থ
নতজানু হও,—এই আমার সর্বশেষ নির্দেশ।

রক্তঝরা মাঘে ফুলমুল বিপ্লবের কবিতার, বিশেষ
সম্মান পেয়েছি অস্ত্র-সোহাগির কাছে।—সোলাপের সাথে
গোলাপের সম্পর্ক ছিল বরফিনি, ঝড়ঝঞ্ঝা, মাঝরাতে।
চাঁদ ঝুলে আছে ফাঁসি কাষ্ঠে, নিষ্কলঙ্কিনী
অসহায়, সার্বভৌম, নিষ্কলা, স্বাধীনা!

বলে তুমি, একাকী আশ্রিত গোলাপ, নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গতার
কে-কুলাতা, তোমাকে বাংলা [illegible]।

লোকোত্তীর্ণ আশ্রিত গোলাপ, তুমি সংগোপনে
উঠে এসো অগণিত কুসুমে, ইতিহাসে, আন্দোলনে—
তোমাকে সাজাবে ভাগ্যবতি ট্রেঞ্চিকে, টায়রসে
নগ্ন ঘরে, ঘরে-ঘরে, লিপস্টে, কৈশোরে
নিবিড় নটী-পাথরে, দেশের বাংলায়—

লোকোত্তীর্ণ আশ্রিত গোলাপ, তুমি নতজানু হও পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায়।

ফিরে আসব

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

আজ সারাদিন বৃষ্টি ছিল — জীবনভোড়া বিষ যে ছিল
অনেকদূরে শ্রাবণনিশা ভোলাও — আজ বাইরে সূচিকাভরণ
একমুঠোর ঘর এবার — প্রবল অমন গহনকেন খোলা!
এই শ্রাবণে বুকের ভিতর — আগুন আছে তাই বুঝি তোর
মোর উচাটন এই উঠোন এই ঘর
বন্ধুতা যা মরলে তুমি — [illegible]
চিনলিনে মন যে আপন — [illegible]
ভয় শাখেরই নড়িতে সৈক — [illegible]
পেলে তপ্তবীণ সে আরিপুত্র কই?
আমার খবে অর্থনীই ছাব — নিমে বৃত্তান্ত, সেই অন্যায়
নিও না, আরিই অন্যায়, শাস্তিনাই।
আজ কি মায়া মেঘেদেরার — সেই গানের সুরগুলি আর
ও বুঝি, বুকের ভেতর ভরে রাখ
নিমলে চিত্ত জলের ঘুঙুর — আবার [illegible] আজন ছুঁয়ে
বিন্দু শরীর, এই তো [illegible]

শুধু একা মেঘ

দেবাশীষ মিত্র

অপেক্ষা করে কাঁদতে কাঁদতে
আমি ভাসিয়ে দিয়েছি মন—
এমন পাখি এসে বীজ ফেললেই হয়
সে বলেছিল : ভালো লাগে,
ভালো লাগে কান্না,
তোমার ফোঁপানি থেকে আমি স্বরলিপি তৈরি করি।

[illegible] চুলের, আড়াল করল করুণা—
দূরে পাতা শাওড়া গাছের ছায়া
কাঁপতে পারেনি মোটে,
এক বালিহাঁস ডুব দিতে দিতে
শুধু ভেজাতেও পারল না।
বৃষ্টিতে চোখ থেকে মায়ানি চলছে চলতে
ভাসলাম তোমার পথে
পথ ধরে, পথ ধরে বিস্তার ছড়ায় বিস্তীর্ণতা।

আমি বিদ্যুৎ নই, আর বজ্রও নই,
মেঘ যদি ভাসিয়ে নেয় মেঘকে
তখনি আসব ফিরে।

ভ্রমণবিলাস

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

এবারে পুজোয় যাবে কোথায়
সমুদ্রে অথবা পর্বতে ?
আমিও যেমন বর হতে
বেরিয়ে আমার মুক্তোখ যায়
কলকাতা থেকে কলকাতায়

টাইম টেবিলের সব পাতায়
ভ্রমণবিলাসী গুনছে সুখ,
পুরী, দেওঘর আর মেদনীপুর
আমার ভ্রমণ কলকাতায়
লক্ষ মানুষ মন মাতায় ॥

ক্যালেণ্ডারের রঙিন দিন
দূর দিগন্তে হারিয়ে যায়
হাওয়ার কাপটি দুই ডানায়
আমার শহরে আন্তিহীন
ক্যারাভান চলে রাত্রিদিন।

তবে কি এ শুধু ভ্রমণ নয়
পলাতকীর সুর পথে ;
যেহেতু যাবো না পর্বতে -
মাঝে মাঝে বড়ো শংকা হয়
দুর্গম মনে কী সংশয় ?

চারিদিকে আলো অন্ধকার
নির্বাসিতের কলকাতার
কন্ট্রোলে মিশে যাবো এবার ॥

নাবালিকা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

এখনও তো নোলকের মুক্তো খসেনি
মাসিকার হল্লা থেকে শিকনি ঝুলে পড়ে
পায়ের নূপুর বাজে তাঁথে তাঁথে
এখনও তো টিড়ে দৈ খেতে মিঠে
সাদা জামা লালে মাখামাখি
তবু কেন উসুখুসু মনমার চোখ
সূচীমুখে হাতছানি দেয় পুরন্ত শিট পুটো
তাঁরে তাঁরে কচি সুতো নিসপিস হাতগুলো
মাদকুতো শিরকুতো সম্পর্কের, ছোঁবার জন্যে করে শত ছলছুতো
এখনও তো দু'চোখের অনুনয় স্পষ্ট হয়নি
ঘু-ভোড়ার তাবত্তাই সব ভাসা ভাসা
আ-ধ্য-ধ্য রেহাই দাও
ও এখনও কাঁচপোকা ধরে টিপ কপালে পরুক
সুধা-সিন্ধু খুঁজে নিতে অন্য কারুর কাছে যাও
ধানে দবে দিনু দিনু করে মুগ্ধ জনমে
ও হয়তো একটু আধটু বোঝে
ভাল করে জানেই না
জিতে জিতে কতদূর অবধি জিজ্ঞাসা।

পড়ন্ত বিকেলে মানুষই পারে

ঈশিতা ভাদুড়ী

পড়ন্ত বিকেলে কেবল মানুষই পারে
জেগে উঠতে,
ফুলের মত সহজ হতে।
কেবল মানুষই পারে
সাতশ' কি, আরো বেশী বছরের
প্রাচীন ইতিহাস ভেঙে চুরমার করতে।

কয়েক শতাব্দীর পুরানো ভালবাসা,
ব্রহ্মকমল ফুলের গন্ধে
তারাই জানে যার।

রোদ-বৃষ্টি-মেঘের গোপন সম্পর্ক
পড়ন্ত বিকেলে
একমাত্র মানুষই পারে জানতে।

তোমার মুখের দিকে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে।
তোমার মুখের দিকে তাকালে আবার শৈশবের খেরোলিকা ঝরে।
আমার হারিয়ে যাওয়া অশ্রুনত সোনালী শৈশব
শৈশবের সোনা রোদ সমস্ত অক্ষরে—।
তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার
বলতে পারব না আমি কী রকম করে :
আমার বুকের সব আকাশের অশান্ত আলোর বৈভব
চারিদিকে হিরন্ময় অন্তের সুস্বাদু শান্তির সমাহার
আমাকে আবৃত করে, পুষ্পের প্রসন্ন নীরবতা
আমার সত্তায় কাঁপে, আমার সমস্ত ইচ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা
আকাশের বিপন্ন চিৎকার
যেন তারা ফিরে পায় অক্ষ-নম্র বৃক্ষের ধ্যানতা।

মৌসুমী বৃষ্টিতে ভেজা মাটিকে ঘুমিয়ে থাকা
প্রথম বীজের ব্যাকুলতা
আমার হৃদয়ে রক্তে সঞ্চোমিত। তুমি সেই অন্বিষ্ট অর্থনা,
মনে হয়,—যা পেলে সকল শোনা হয়ে যায়,
সমস্ত প্রাণের প্রেরিত, প্রত্যহের প্রশ্ন, প্রবর্তনা
সব শান্ত হয়ে আসে—কী রকম গভীর বিশ্বাসে
জীবনের মুগ্ধ সমতায় :
বৃক্ষের ব্যথার মতো তোমার দু চোখে চেয়ে মনে হয়
আমি বুদ্ধ, তুমি নিরঞ্জনা :
তোমার বক্ষো ধারা ছুঁয়ে আমি জীবনের আশ্চর্য প্রপারে
স্থির হয়ে গেছি, দূর সুজাতার পায়সান্নে পরিতৃপ্ত আকাশ তন্ময়
প্রস্তার প্রসন্ন বরে উজ্জ্বল উচ্চারে :
বৃক্ষকে ঘিরিয়া থাকা তুমি সেই অতীতের আকাশের সুনীল বিস্ময়
আজো আছ, দাঁড়িয়ে রয়েছে খুলে জীবনের সমস্ত দুয়ার
অন্তহীন এপার, ওপার।

জেগে ওঠে রোম

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

নীল পাথরের গায়ে চেউয়ের ছোবল
বড়ো শাদা
মসৃণ সবুজ ছায় বাদামের
মসৃণ তোমার নীল বুক
কালো বক, কাঠবেড়াল জার্মান ধম্পতি
ছুটে যায়, ওড়ে, কথা বলে।
শুধু তুমি চুপ—
কৃষ্ণাঙ্গ যুবক, তুমি জানো
কোন্ শর্তে মাটি কেটে বোরোর অঙ্কুর ?
কৃপনাভি থেকে ঘাসের গুচ্ছের মতো
জেগে ওঠে রোম
বদলে যায় অক্ষরেখা
ভৌগোলিক সীমা দীর্ণ হয়
আমারাও, জেনেছো কখনও ?

দুপুরের নীলে শাদা পাল
যেমন উঠেছে দুলে যাওয়াআসা খেলনার মতো
ঠিক তেমনি তোমার ওই নীলাভ দুচোখে
উপচে ওঠে কৃতজ্ঞতা—
আদিম বিপন্ন মানুষ
এভাবেই শুধু কথা বলে ?

আমারাও এসো, ধরো হাত।

স্বপ্নাদ্য

কবিরুল ইসলাম

কি তুমি লিখতে চাও শব্দে আর ছন্দে আর মিলে
কি তুমি শিখতে চাই মাত্রা আর নিয়মের আছে
তোমার আনুগত্য কি সত্যই গতিময় হবে এইভাবে ব্যাকরণ সকাশে
তুমি কি এখনও আরো এভাবেই চলতা থাকে আর আছে ?

এখনও সময় আছে : এই অপরূপ অপরাহ্নগুলি
তোমার নিজস্ব হতে পারে, আনুগত্যে, বিনয়ে, বিশ্বাসে
মাগরিবের মুয়াজ্জিন সূর্যাস্তের আহ্বানে, আজানে —
এদিকে বেলুড়মঠে সুন্দর সৌজন্য আসে আসে।

যে যার ভ্রমণে যাবে, দূরে নয়, যে নিকট দূর
অন্তরে যে উৎস আছে, চামড়া গভীর নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে
প্রত্যেকের ভিতরের ভিতরে যে ঘর আছে তারই উদ্বোধনে
শেষ রশ্মিমালা হয়ে জ্বলে উঠবে প্রস্থানের পথের বিভবে।

একদিন দৃশ্যাবলি মুছে যাবে, উপমার উত্থাপনও থেমে যাবে—
এসব জেনেই কবি নিজস্ব পীড়ার অন্নাদ্য তাঁর গানে-গানে খুঁজে পাবে।

উঠে দেখি

রত্নেশ্বর হাজরা

উঠেছি কঠিন ক্লেদ করে উঠে দেখি
কঠিনের চেয়েও কঠিন
চর্তুদিক
তার মধ্যে রয়েছে মানুষ মানুষের
কিছু মানবিক
বোধ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—আছে টিকে
এরা সেসব বোধে তারা চেনে
দুঃখকে পাখিকে প্রকৃতিকে।
সেই বোধে তারা করে রোগীর শুশ্রূষা
তারা চেনে
অভিমানী শতরূপে চেনে
নক্ষত্রমণ্ডলী আর ঘুন থেকে জাগা
চেনে অনুরাগ
চেনে উষা · · ·

উঠেছি কঠিন ক্লেদ করে উঠে দেখি
কঠিনের পাশেই সহজ—চর্তুদিক
সেই সহজের বোধে তাঁর ফুল ফুটেছে ক্যাকটাসে
পাথর কাটিয়ে বাড়ছে লতা—
যার দিন প্রচণ্ড দহন আর রাত্রি হৃৎ তাপা
তার জীবনেরও অর্থ আছে। তারও সব
কোলাহল নয় শুধু তারও
উদাসীন ধূধূ আছে বৈরাগী এসরাজ আছে
শব্দের মধ্যেও আছে ছোটখাটো কিছু কিছু নির্জনতা—

কার জন্যে
অপেক্ষা?

আসছে রূপনগর।

কংকালকাহিনী

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কার কাছে
সাক্ষ্য দেবো ! এজাহারে ধুলো জমে গেছে
গণনার দিন এসে গেল,
রাধাব্যাকুল বাঁশী যে বাজাতো সেই কি এখন এলো
দামামা বাজাতে !
কৃষ্ণসাজ ঝরে যেতে সে এখন নাগরিক নাগর, রাতে
পরকীয়া উচ্চাভিলাষ এখন শেখায় তাকে টপ্পা গজল, যখন
রাত আরো ঘন, রমণীর দুই চোখ চার চোখ হয়ে যায়, পানীয়তে ভেজে নাইলন,

তুমি ছায়া ছেড়ে বাইরে এসে খোঁজো রাজপথেও জঙ্গলমহল
খোঁজো দিগন্তে উদ্‌বৃত্ত পাখি, মৌরির মৃদু গন্ধ, জলাঙ্গীর জল,
নক্ষত্রে বাঁকানো ঘাড় লক্ষ্য করে
বিরল কেশের গণ্ডমাথা দ্যাখো শিশির ধিক্কারে
ভরে গেছে ! তিরস্কার আজকাল
স্বপ্নের মধ্যেও চলে আসে, জাগ্রত সকাল
ভরে থাকে ভুল বিশ্রামের ক্লান্ত কৌতূহলে,
ভোরের প্রথম জলে
পিপাসার স্বাদ আর তেমন আসে না, আসলে এখন
কিছুই ফেরেনা তার আদি দায় নিয়ে, মন
মানসীমানস থেকে পায়না কিছুই,
মূল ভেবে যার আমি শিকড়ে পৌঁছুই
সে আর রমণী নেই, অভিধান
বর্ণনা হারিয়ে ফেলে "অপমান"
শব্দটিকে করে নিঃস্ব বিচারক !
যে অর্থ শেখেনি কিছু গ্রন্থের সমাজে, তাকেই তো পাঠক
করে তুলে তুমি প্রার্থনা করেছো পরমার্থ !
ভাষার যথার্থ
জয়ী যাত্রা, গণ্য প্রতিমান
একদিন ধুলোর পথেও নামাতে পেরেছে
নিশি-শেষ শিশিরের স্নান !
এখন ভেজে না কিছু
এখন পশ্চাৎধাবনে ছায়াও যায় না আর মানুষের পিছু !

সময়ের কাছে নয়
অসময়ের কাছেই শেষ সাক্ষ্য দিতে হয়,
সময়তো জাতকাহিনী শিখেছিল, সময় আটকে ছিল
হিটলারের নাৎসী কোটে, পরমাণু নাড়িয়ে দিল
যে ওপেনহাইমার তারো পুরুষত্বে ঠিক
সময় দিয়েছে থাবা,
ঘড়ি ঠিক ঠিক সময় দিয়েওতো ভুলে গেছে ব্যক্তি-বিভাজন !

সাহিত্যের সত্যভনিতা আছে, রাজনীতিরও নিপাতন
সিদ্ধ কিছু সিদ্ধাই রয়েছে !
আদর্শ, কবচ হয়ে নিম্নাঙ্গে ঝুলছে
কেননা নরের ঐ ঐহিকপ্রদেশ
উত্তেজনা প্রিয় কিন্তু জনতাবিমুখ ! নিরুদ্দেশ
হারানো-প্রাপ্তিতে যে সময়
গান্ধী গুলির শব্দে চমকে উঠেছিল, যে সময়
মার্টিন লুথার কিং-এর কালো বুকে তুলেছিল লাল
সময়ের যুগ থেকে যুগের সময়, সুবিশাল
সংবাদপত্রের কালিতে ধরলো তুলে ফ্রন্টপেজ রিপোর্ট,
মানবতার সেই মৃত্যু ক্রমশ হয়েছে ফুটনোট !
মনে হয় ছোট
প্রশ্নপাশের পড়াও মানুষ এখন আর শিখবে না সহজে
সময়ের শাহনামায় এখন শুধু ভুল ঘণ্টা বাজে !
সূর্যই এখনো আছে দৈব দ্বিধায়
চাঁদ বেঁচে থাকে নবমী জ্যোৎস্নায়
আকাশেও সাতটি অক্লেশ ঋষি কাজ করে গেছে,
মাঝে মাঝে জাঁহাবাজ গ্রহণ এসেছে
প্রাকৃত ছায়ায় গ্রহরা করেছে কোলাকুলি
ভূমধ্যসংসার জুড়ে তারপরই নতুন ধূলি
জেগে উঠে মানুষের মুখ ছেয়ে হয়ে গেছে তাজ্জব মুখে
পৃথিবীও গ্রহ ছিল, সেই সৌর আপশোষ
ভোলাতেই এখনো বুঝি মাটি
বর্ণ-বর্ণনার ফুলে, গন্ধের তন্ময়ে হয়ে ওঠে খানিকটা খাঁ
শিশিরের স্বাধীনতা নেমে আসে হেমন্তের মাঠে
দোয়েল ফিঙের পাশে ফড়িং-এর ধনী দিন কাটে,
নদীটির মায়া-নৌকা উদাসীন গানে ভরে ওঠে,
যেন তার ফেরবার নেই কোনো সাধ
আছে সময় অবাধ
নেই কোনো জরিমানার ভয় !
সময়ের কাছে নয়
অসময়ের কাছেই শেষ সাক্ষ্য দিতে হয়।

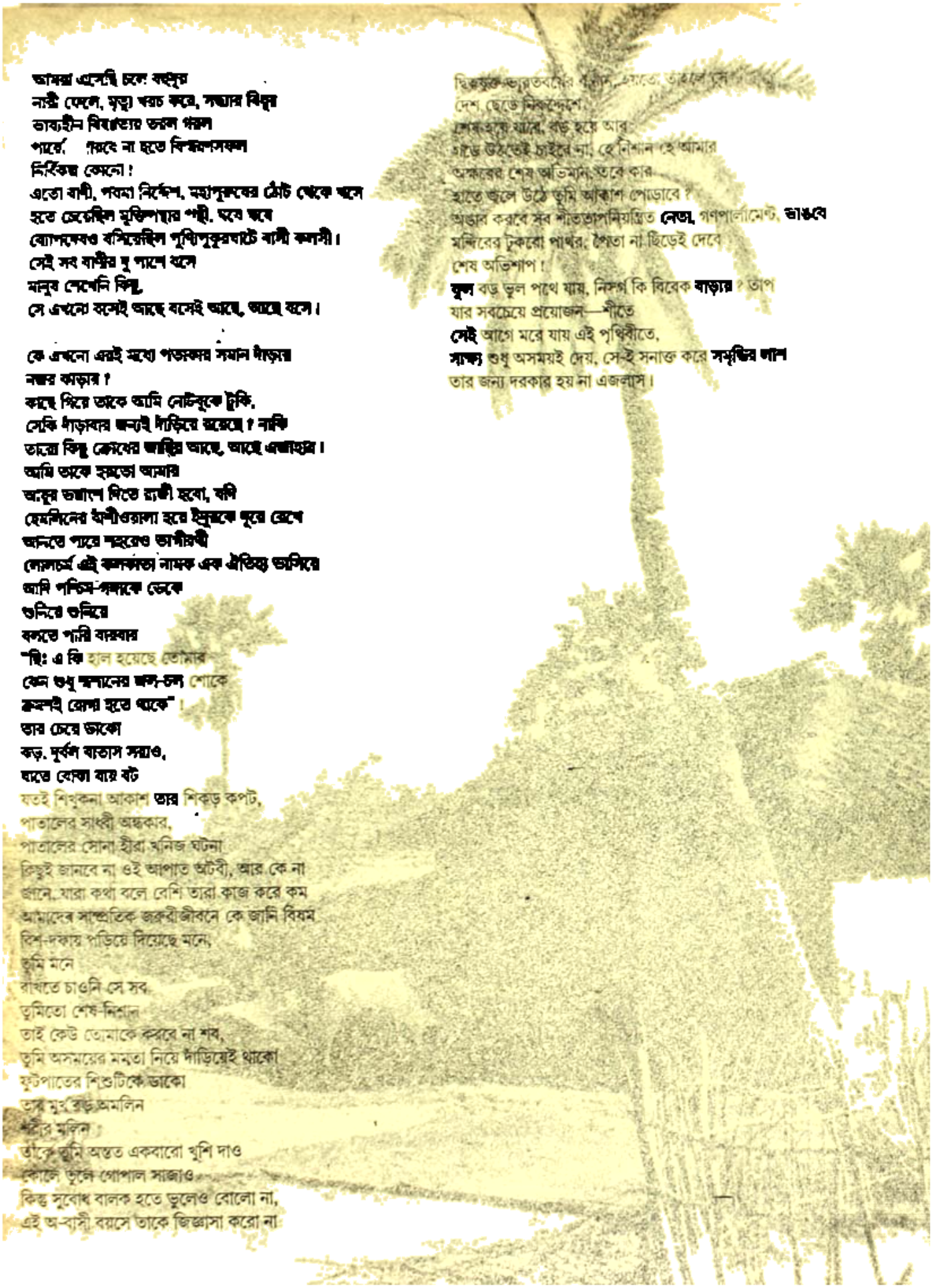

আমরা এসেছি চলে বহুদূর
নাড়ী ছেঁড়ে, মৃত্যু খরচ করে, সন্ধ্যার সিঁদুর
ভাষাহীন বিষণ্ণতায় তরল গরল
পারে, পারবে না হতে বিস্ফোরণসফল
নির্বিকল্প কেনো!
এতো বাণী, পবনা নির্দেশ, মহাপুরুষের ঠোঁট থেকে খসে
হতে ছেড়েছিল মৃত্তিপায়ার পথী, তবে ভবে
ব্যোমকেশও বসিয়েছিল পুথিপুকুরঘাটে বাণী কলসী।
সেই সব বাণীর দু পাশে বসে
মানুষ দেখেনি কিছু,
সে এখনো বসেই আছে বসেই আছে, আছে বসে।

কে এখনো এরই মধ্যে পতঙ্গের সমান দাঁড়ায়
নক্সার কাড়ায়?
কাছে গিয়ে তাকে আমি নোটবুকে টুকি,
সেকি দাঁড়াবার জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছে? নাকি
তারো কিছু কেনার জায়গা আছে, আছে এজাহার।
আমি তাকে হয়তো আমার
অকূল ভরাপাল দিতে রাজী হবো, বলি
হেমলিনের বাঁশীওয়ালা হয়ে ইঁদুরকে ঘুরে রেখে
আনতে পারে শহরেও ভাগীরথী
লোলচর্ম এই কলকাতা নামক এক ঐতিহ্য ভাসিয়ে
আমি পশ্চিম-গঙ্গাকে ডেকে
শুনিয়ে শুনিয়ে
বলতে পারি বারবার
"ছিঃ এ কি হাল হয়েছে তোমার
যেন শুধু শ্মশানের জল-চল শোকে
কেবলই রোগা হতে থাকে"।
তার চেয়ে ডাকো
কড়, দুর্বল বাতাস সন্ধ্যাও,
যাতে বোঝা যায় বট
যতই শিথুকনা আকাশ তার শিকড় কপট,
পাতালের সাধ্বী অন্ধকার,
পাতালের সোনা হীরা খনিজ ঘটনা
কিছুই জানবে না ওই আপাত অটবী, আর কে না
জানে, যারা কথা বলে বেশি তারা কাজ করে কম
আমাদের সাম্প্রতিক জরুরী জীবনে কে জানি বিষম
বিশ-দফায় পড়িয়ে দিয়েছে মনে,
তুমি মনে
রাখতে চাওনি সে সব,
তুমিতো শেষ-নিশান
তাই কেউ তোমাকে করবে না শব,
তুমি অসময়ের মমতা নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকো
ফুটপাতের শিশুটিকে ডাকো
তার মুখ রুক্ষ অমলিন
শরীর মলিন,
তাকে তুমি অন্তত একবারো খুশি দাও
কোলে তুলে গোপাল সাজাও
কিন্তু সুবোধ বালক হতে ভুলেও বোলো না,
এই অ-ব্যসী বয়সে তাকে জিজ্ঞাসা করো না

দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষের পুনর্জন্ম হলে তবে সে
দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ
শেষ হয়ে যাবে, বড় হয়ে আর
দাঁড়ে উঠতেই চাইবে না, হে নিশান হে আমার
অক্ষরের শেষ অভিমান, তবে কার
হাতে জ্বলে উঠে তুমি আকাশ পোড়াবে?
আড়াল করবে সব শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত নেতা, গণপার্লামেন্ট, ভাববে
মন্দিরের টুকরো পাথর, পৈতা না ছিঁড়েই দেবে
শেষ অভিশাপ!
ভুল বড় ভুল পথে যায়, নিসর্গ কি বিবেক বাড়ায়? তাপ
যার সবচেয়ে প্রয়োজন—শীতে
সেই আগে মরে যায় এই পৃথিবীতে,
সান্ত্বনা শুধু অসময়ই দেয়, সে-ই সনাক্ত করে সমৃদ্ধির লাশ
তার জন্য দরকার হয় না এজলাস।

হুজুর হুজুর শুনে ভয় পেতে শিখে গেছি হাজির হুজুর!
হুজুর তো যুযুৎসু জানেন,
প্যাঁচ কষলেই হাড্ডি চুরচুর,
আমি তাই দূর বনে জঙ্গলমহলে
উদ্ভিদে লুকাই, হয়তো তাহলে
বাঘ বাঘের দাঁতের ধার বাড়িয়েই দেবো
হিংসার সৌন্দর্য শিখে নেবো,
এ সমাজ তো ধীরে ধীরে খায়
মানুষের মহামাংস অবদংশে সাজায়,
নিসর্গের কাছে গিয়ে মরা
সহরের মাল্যবান ফুলের পসরা
বুকে নিয়ে দুলতে দুলতে
জন্ম ভুলতে ভুলতে
চলে যাওয়ার চেয়ে
নিসর্গ-অর্গল যেন ঢের বেশি ব্যক্তি বিনীত, আমি ভয়ে
লক্ষ্য করি নিকটে অটল কেউ নেই, দেখি
আকাশেও খসে যাচ্ছে মেকী
বয়স হারানো তারা, মানুষের ঈশহীন কংকাল
আলিঙ্গনের পরবর্তী রতিতে আতুর, তাই
জাল এফিটএভিটে
নিশানকেও নিতে চাইছে অযোগ্য সংযোগে!

আমি তো আজন্ম শোকে
দেখলাম নিশানের পাশে কোনো মশাল এলো না,
এলেও হতো না লাভ
কংকালই চেঁচিয়ে বলতো সাবধান আগুন জ্বেলো না!
আগুনই একদিন মানুষকে পশু থেকে ক্রমশ আলাদা করে তুলেছিল,
আগুনের কাছে হেরে সেই যে জঙ্গলজীবনে থেকে গেল
পশু, তারা আর ইতিহাসরক্ষিত নগরীর নিকটে আসেনি!
মানুষই জঙ্গল থেকে বাইরে এলো, তখনো জানে না
ভূগোলেরই ইতিহাস থাকে,
ইতিহাসে সত্য কোনো ভূগোল থাকে না!
রাজা গড়া ভাঙা, দেশদূষণ, বায়ুদূষণ, পৃথিবী পৃথুল
তবু কেউ বুঝছে না ভুল।

আমি মূলে ফিরে যাই
সময় অসময় সুসময়ে প্রভেদ হারাই!
আজ তাই
চলে যাচ্ছি প্রাণ ভেঙে
গান ভেঙে, শব্দ দুমড়িয়ে,
ছবি ছিঁড়ে
চলে যাচ্ছি যেখানে রয়েছে এক অদমা দুন্দুভি,
হয়তো কখনো কবি
ছিলাম বলেই তাতে ঘা মারতে পারি!
তবে তাই মারি
দ্রিমি দ্রিমি ধিতাং ধিতাং ধাং—নাচো
হে মেদুর কংকাল জীবন নাচো,
হে তুমি নক্ষত্রবন্ধনী বাঁধা তাৎক্ষণিক রতি—নাচো,
নাচো তুমি দেশ নেতা বিশ্ব নেতা ত্রেতা ও দ্বাপর কলিযুগ, নাচো
সদ্ গুরু বদ গুরু ম্যাজিকওয়ালাও তুমি নাচো,
আজ তোমাদের দমবন্ধ করবো আমি নাচাতে নাচাতে
যজ্ঞের দুন্দুভি শুনে কেউ আসবে না বাঁচাতে,
আমি মরে গেছি
আমি পৃথিবীর সব কংকালকাহিনী জেনে গেছি,
কতো প্রভু বহু যত্নে ছিল
কে তাকে থামিয়ে দিল,
সেকি কোনো নতুন তামস,
সেকি দেশকাল তামাসাময় মুদ্রারাক্ষস!
অথবা সে করজোড় ভিক্ষুক রাজনীতি
যার নীতিই দুর্নীতি—

কার কাছে সাক্ষ্য দেবো? ভালবাসা
তুমি বহুদিন রমণী ছাড়িয়েছো, ভালবাসা
সেই কবে এসেছিলাম—সেই আসা
নিজের ইচ্ছায় নয়
স্বপ্নময়
নক্ষত্রখসানো রাতে কোনো নররমণীর মিলিত প্রয়াসে,
কিন্তু চলে যাবো নিজের ইচ্ছায়, আশেপাশে
কেউ নেই কিছু নেই, তবু নিশান তুমি তো
কংকালের পাশে পাশে আছো, তুমি জানিয়ে দিয়োতো
একজন প্রকৃত অ-মানুষ এখন আকাশে যাচ্ছে
এখন বাতাসে যাচ্ছে
যাচ্ছে..... যাচ্ছে..... যাচ্ছে.....

মহানগরের দরজায় সেদিন :

— ঠক ! ঠক !

— কে ?

— সম।

— সম কে ?

— সবজান্তা-মজারু !

— এসো এসো। ফিরে এসো।

সবজান্তা-মজারু ফিরে আসছে—মহানগরে।

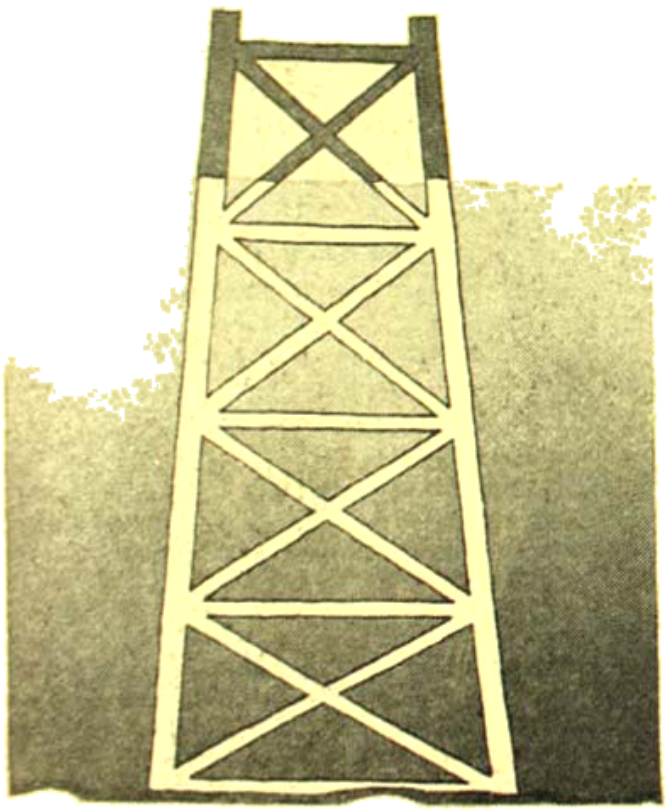

Burn Standard on Bombay High

By February 1986, there will be six new landmarks on Bombay High
Six offshore platforms by Burn Standard, in collaboration with world leaders McDermott International Inc

Entering the high stakes, high performance offshore industry with the latest available technology, this is a historic breakthrough for Burn Standard

Burn Standard Company Ltd.
(A Government of India Undertaking)
10C Hungerford Street Calcutta 700 017

CONTAD BS 1-85

বেতালা বৈঠক

পূর্ণেন্দু চ্যাতাল

এবারের শারদীয় বেতালা বৈঠকে হাজিরা দিচ্ছি ছত্রাকটা লক্ষ্মণক দিয়ে। গতবারে ছিল বৃহত্তম ৬৯১ ঘরের শব্দকল্প। এবারে ছত্রিশখানি তিন সমতলকে ছুড়ে তৈরি করেছি এই পরমাপুরুষ পাখাটি : আর সুতো দিয়েছি ছড়ায়—ঘুড়িয়ে দিয়েছি তা প্রায় একশিটি হৃদ্দের মালা। সন্দেহ নেই, ভাল লাগবে না। নবনেতৃত্বের পরিষদ এবারের শারদীয় মহানগরের এই কবিকঙ্কনকে। উত্তর পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কেন না, উত্তর মেলানো, ঠিকানা লিখে রাখা, সমস্ত মত পুরস্কারে টাকা পাঠানো—এ সবের ঝামেলা। তবে হ্যাঁ, উত্তর প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়।

এই অবসরে পরিবেশন করছি কিছু জবর খবর। সম্ভাবনা আছে, আগামী সংখ্যা থেকে এটি নিয়মিত 'জবর খবর' নামেই প্রকাশিত হবে মহানগরে। পরীক্ষামূলক শুরু এ বছরে। আগামী সংখ্যা থেকে নতুন পুরনো মিলিয়ে মিশিয়ে সাত বহুলচারা পরিবেশনের দায়িত্ব পাচ্ছেন এ শাখার ওপর। সঙ্গীর ওপরে মনে পড়ছে, ছাপানো কি এই ছন্দ সঙ্গীরা জবর?

১। গণপতি শর্মা ২। অর্জুনপুত্র শর্মা ৩। শিবঙ্কর শর্মা ৪। সাবস্বত শর্মা ৫। পরাশর শর্মা ৬। দুর্যোধন শর্মা ৭। হংসেশ্বর শর্মা ৮। কৃষ্ণকুমার দেবশর্মা ৯। দেবব্রত শর্মা এবং ১০। দুর্গাপ্রসাদ শর্মা। শর্মা চরণদলের বর্মার অভাবে কেউ যা পালন করি।

জবর খবর

দূর! দূর! ইঁদুর!

ভাকোটা, ৩১ আগস্ট ১৯৮৫ : রহস্যজনক খবরে প্রকাশ পূর্ব ভাকোটার কোনো খামারে কাজ করে এবং সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, সে কারণে ওরা ইঁদুরের হাত থেকে ধানচাল বাঁচাবার অদ্ভুত এক উপায় অবলম্বন করেছে। ওরা ইঁদুর ধরে তাদের হত্যা করে না, বিদায় নিষ্ক্রমণের পথ প্লাস্টিক দিয়ে সেলাই করে ছেড়ে দেয়। বেচারা ইঁদুরেরা নিজের পর দিন মল ত্যাগ না করতে পারলে ক্ষিপ্ত হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং নিজেদের ভেতরেই কামড়াকামড়ি করে মারা যায়। এইভাবে গত তিন সপ্তাহে অন্তত ৬২০০০ ইঁদুর মারা পড়েছে। অদ্ভুত!

উননব্বই! বউ!

উড়িষ্যা, ১৫ই জুলাই : খবরে বলা হয়েছে যে সম্প্রতি শ্রী উদয়নাথ দক্ষিণরায়, তাঁর একশটি বিবাহে পৌঁছতে চলেছেন। কেওনঝড় জেলার ওরালি গ্রাম নিবাসী শ্রী দক্ষিণরায় আশাতঃ উননব্বই বার বিবাহ করেছেন। তার মধ্যে বারোটি বৈদিক মতে, বাকি গান্ধর্ব মতে মন্দিরে মালাবদল করে। তাঁর বর্তমান বয়স বাষট্টি। খুবই অল্প বয়সে (২২) তাঁর প্রথমা স্ত্রী মাত্র পনেরোদিন ঘর করার পর চলে যাওয়ায় বীতস্পৃহ শ্রী দক্ষিণরায় দুবার আত্মহননের চেষ্টায় বিফল হয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে, আর এক নয়, তিনি বহুবিবাহ করবেন। এর খেসারতও তিনি দিয়েছেন। তাঁর চারশ কুড়ি একর জমির বাকি আছে মাত্র পাঁচ একর।

হিরের ডিম। হিমসিম।

বেজিং, ২৪ সেপ্টেম্বর : চীনদেশের ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে যে সেখানকার এক চাষী স্ত্রী যখন মুরগিটি রান্না করার জন্য কাটছিল, তখন তার দ্বিতীয় পাকস্থলী থেকে সে পায় ১·১৮ ক্যারাটের একখণ্ড হিরে—যা বিক্রি করে সে পেয়েছে ৯৫০ ইয়ান অর্থাৎ তিন হাজার আশি টাকা। স্ত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তার বালি এসেছে একটি বন্ধ হওয়া হিরের খনি থেকে। সম্ভবতঃ এই কারণেই হিরেটি ছিল এবং সেটাকে ডিমের মধ্যে মুরগিটি ঢোকা নিয়ে ঘোরতর মতভেদ রয়েছে। এখন দেখা যাক, ডিমটি কে সম্ভবতঃ।

এবার অনেকদের পুরনো খবরে চলাই। পরাশরীয় নীল থেকে সাহেব বলেছেন ভবিষ্যদ্বাণী করে খুবই কঠিন। হক কথা কিন্তু হক তো আমাদের মনে মাঝেই করতে হয়, হক কথাকে কে কৃষ্ণ বলে না। অভিজ্ঞতায়। কিন্তু নিরাশ হবেন না। যেমন বই ছাপাতে প্রকাশক চাহ: মন্তব্য করেন, এ বই ছেপে লাভ? তেমনি নিজের বা পরের লেখা পড়ে কেউ বই লেখা শুরু দিন।

কী ভুল! কী ভুল!

১৮৬৭ সালে Das Kapital-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর স্বয়ং কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন এ বই লিখতে যে সিগার খেয়েছি, তার দামও উঠবে না।—ভুল।

১৯৭০ সালে বিখ্যাত প্রকাশক Allen & Unwin—এর বস্ত্র তরুণ অভিজ্ঞ W.H. Allen Frederick Forsyth কে উনি The Day of the Jackal থেকে দিয়ে ছাপালেন, না: চলবে না, পারতে হবে বাজার মত কিছু লেখা। বইটি প্রকাশিত হয়েছে সে আপনাদের জানা এবং মোট বিক্রি ৮০ লক্ষ কপি।

এবার কেউ Fred Astaire–Ginger Rogers জুটির কথা নিশ্চয়ই জানেন। নাচে, গানে-অভিনয়ে Fred Astaire নামে ইনি প্রথম স্ক্রীনটেস্ট হয়ে ১৯৩২ সালে তাতে লেখা ছিল : অভিনয় জানেন না, গান গাইতে পারেন না। মাথায় টাক। অল্প বয়স নাচতে পারেন।

চরে, এই লেখকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়কে দূরভাষে মহানগরকে কথা জানাতে তিনি বলেন : মহানগর তো তুলেছি উঠে গেছে। ভুল।

শেষ : বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব এবারের শারদীয় মহানগরের অন্যতম দোষ তো অভিযোগ। ঠিক কিনা?

বেতালা বৈঠক

সূত্র

পাশাপাশি

১। প্রথম শুনে বাকি দুজন লাজে।
আলসেমোড়া দ্বিতীয় কথা,
সবাই থাকে সাজে। (৩)

৪। কানে কানে দিচ্ছি একটা মন্ত্র
সোলক পরে একলা ঘুরে
লাগান ষড়যন্ত্র। (৩)

৭। মিষ্টি খেতে?—চিনি না!
অন্ধকারে থাকছে তা। (২)

৮। ডাইনে বাঁয়ে হয়েছে আমার হার।
বাঘকে সোজা হিসেবেতে
দেখা পাবেন তার। (২)

৯। নয়ের পরে যা হয়েছে আজ,
আলসেমোড়া নিচু কেন?
সবাই জানেন খান না! (৪)

১০। প্রথম ঘুরে পাখি আর
শেষের ঘুরে তুচ্ছ।
ঘুরে এসে হাত চালাব
সবাই মিলে গুচ্ছ। (৩)

১২। টিভি মামা, চপলমতি?
একে তিনে বোঝায় সরস্বতী। (৩)

১৪। প্রথম ঘুরে রেখার নাচন।
সব মিলিয়ে ত্রিভুবন। (৩)

১৬। ঘুরে-ঘুরে পাখি দেখি,
ঘুরে তিনে নাকড়া!
সব মিলিয়ে বোঝেন বুঝি,
সবাই মিলে কাতরা। (৩)

১৮। শান্ত বিনীত নতু নয়নের
দৃষ্টিপাতে ঘুচিয়ে উত্তর। (২)

২০। বিশ্বাসকর ব্যাপার স্যাপার!
দেবেন বিচ্ছেন কে আবার? (২)

২১। আদ্যবর্ণে প্রতারণা?
সরল না হয়ে যাস না! (৪)

২২। আলসেমোড়ায় মানুষ দেখি,
শেষের দুই ভাগ-এ!
প্রথম ঘুরে নরকে জানি,
হন তো মন্দ অংশে! (৩)

২৫। নড়বড়ে নরবরে রকবকম!
উত্তরে চলে যান,
এতে নেই কোন খাদ। (৩)

২৪। আলসেমোড়া একাকার,
মন্ত্রিত্বনে মাতা
বহু পদকে একি করে
বলছি নাকো মাতা। (৩)

২৬। হাত থাকলে বাজনা বাজায় পরে।
বলছি আমি যাথাই একান্ত
ভবিষ্যতের তরে॥ (৩)

২৮। তিনে একে তত্ত্বজ্ঞান,
প্রথম ঘুরে আপনি।
আলসেমোড়ায় আসাই দেখি
হয়তো পাবো জলপানি? (৪)

৩০। যোদ্ধা পুরুষ সিপাহী সৈন্য
বেরাদরী তো নেই, আমারি সৈন্য। (৩)

৩২। পত্তনর্গের শেষটাই
ভর করেছেন এনারাই। (২)

৩৩। টিকি বাদে মিথিয়ামের প্রথম,
ছেলেই আছে লিখা মিলে,
অবস্থা থম্ থম্। (২)

৩৪। কড়ার আশির এক অংশ
যন্তে উকার বিশেষ বাংশ। (২)

৩৫। মরুধানেরি আকার বাদে
দাঁড়িয়ে কলপতি
কিন্তু কিন্তু করেন কেন,
মাতা সোজা অতি। (২)

৩৬। অষ্টোত্তরশতেন্ পরিমাণ!
এই তার মনে
একমাত্র উল্লেখিত
হরিচরণ অভিধানে। (২)

৩৭। পৃষ্ঠদেশ নরক নাকি?
যন্ত্রণার আর নেইকো বাকি। (২)

৩৮। প্রথম ঘুরে উরোভর,
শেষের দুই নল।
সবাই মিলে শব্দ করে,
একটু শান্ত হল। (৩)

৪০। শেষে ঘুরে পুরুষ ইনি
সবমিলিয়ে স্বর বাহিনী! (৩)

৪২। শুন্ধ থেকে তৈরি যদি প্রথম স্বর
সকার যোগে অর্থ হবে
সবাই নিরন্তর। (৩)

৪৪। দুইয়ের মধ্যে নির্ধারিত একা।
এরও সেলাম হরিচরণে দেখা। (৩)

৪৬। তাড়াতাড়ি খেতে হলে একে পরকার
আলসেমোড়া উল্টোলেই হবেন উজার॥(৩)

৪৮। আলসেমোড়া দেখা দেবে
রক্ত বর্ণে ফুস্কুটে
উল্টে জাতে দেখা যাবে,
সব মিলিয়ে মুকুটে। (৩)

৫০। প্রথম শেষে লুকিয়ে আছে
আতরাল, কন্যা!
নদী নালায় বন্য এসেল,
সেসেই আছে ধন্যা। (৩)

৫২। আলসেমোড়া ঘড়ের পাখা,
এখান থেকে সরান!
ঘুরে তিনে মন্ত্রিল,
এবার লঘু করুন। (২)

৫৪। একটি অক্ষর মাত্রাবাদ
চাইছে তাঁর মান দেবার। (২)

৫৬। চাহিদার অভাব, মন্দা।
সবখানে উল্টে দিলে ধান্দা! (২)

৫৭। মরুধানে থাকে বসে
আবার আকারহীন।
সব বিষয়ের শেষ কথাটি,
নাটে ইজ হোয়াট আই মীন? (৪)

৫৯। মাছ কাটতে হেতে হবে ঢেকা।
তাদের বইয়ে ছাপা আছে
এ শব্দ পাকা। (২)

৬০। চাচাই চাচাই বলে বরাই চাঁচাই,
চাই ছাড়া ইজুতে, মানুষে পড়াই।(২)

৬১। প্রথম ঘুরে তুমি,
শেষে ঘুরে পাখ!
আলসেমোড়া পর্যন্ত
সবাই মিলে থাক। (৩)

৬২। প্রথম ঘুরে চাপ,
শেষের ঘুরে তৎপর।
সব মিলিয়ে মহাযোগী,
অমল অর্থ ধর। (৩)

৬৩। আলসেমোড়া দু'বার দিলে
বাঘের ডাক ছাড়ি!
ডাইনে-বাঁয়ে অঙ্ক মস্ত,
সব মিলিয়ে ব্যাপক মহামারী। (৩)

৬৪। পাশাপাশির সূত্র এবার
হয়েই এলো শেষ
ধাঁচা দিয়ে ছুই এলেছিল,
তা বেশ! তা বেশ॥ (৩)

সূত্র

ওপর-নিচ

১। শেষের ঘুরে নুবর আর
প্রথম ঘুরে কেরার।
সব মিলিয়ে মুকুতে পারি
সোলক সোনার তারা। (৩)

২। উল্টে ধরে নামান
তবলো ছেলে যাজান। (২)

৩। ঘুরে একে কলপ্রবেশ,
তিন ঘুরে মর্দন
অভিধানে অর্থ দেখ শূন্য,
পূন্য, তালার ভূষণ। (৩)

৪। পরোধরের চলতি কথা
শেষের দুটি অক্ষর।

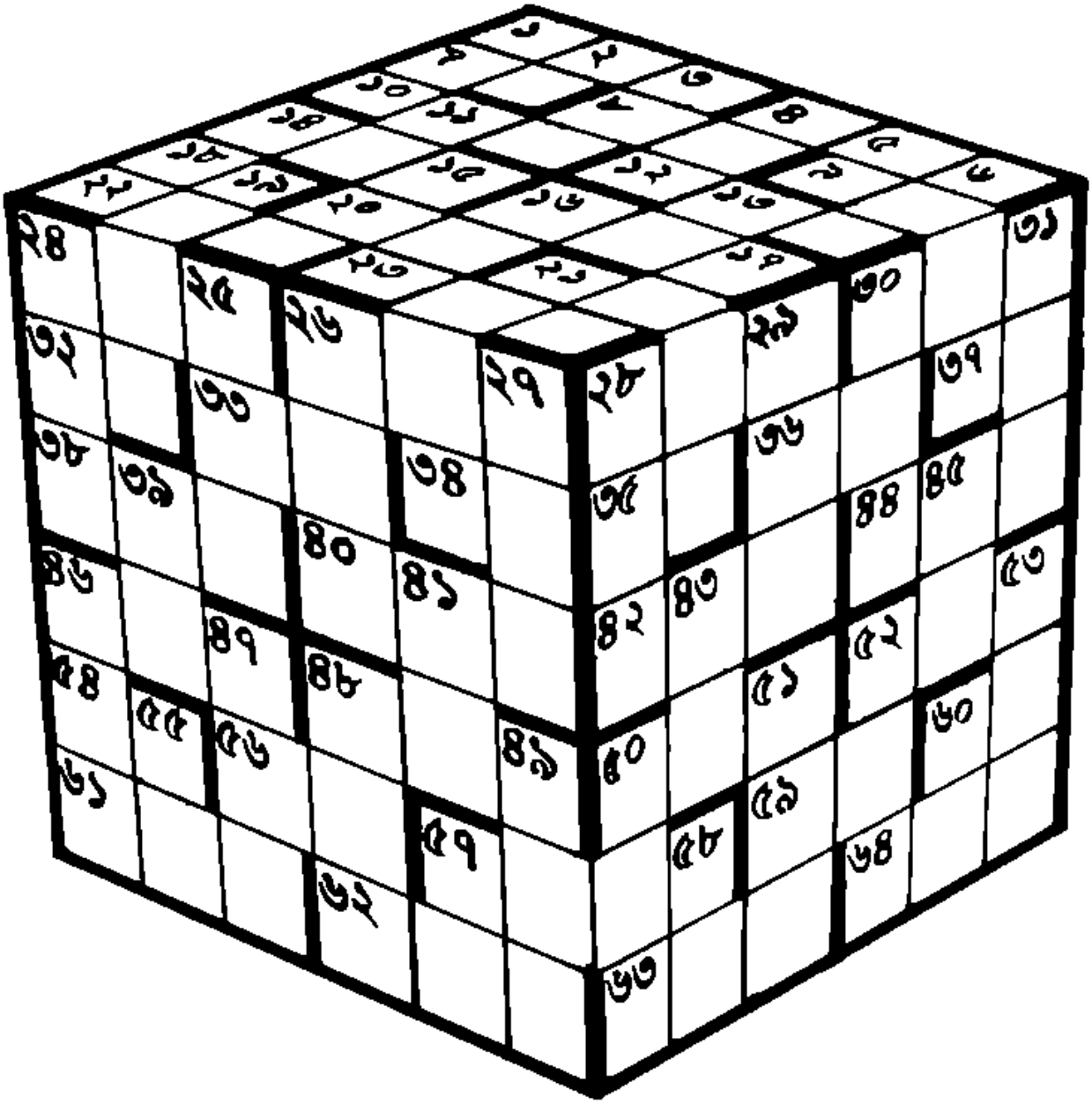

সা এগিয়ে সহ্য করাই,
ক্ষমা করুন দস্তুর! (৩)

৫। সপ্তলোকের পঞ্চম
আরেক মানে অধম! (২)

৬। একে তিনে দিক পরামর্শ,
ঘুরে তিনে কওয়া
কামধেনুরই আরেক নাম,
চারের মাঝ চাওয়া। (৩)

১১। বিরাট রাজার যুধিষ্ঠিরে!
শমন দাঁড়িয়ে বুঝি শিরে! (২)

১৩। পরকলা উল্টিয়ে
পাখি দাও উড়িয়ে! (২)

১৪। একে তিনে অন্য
সবে মিলে আরম্ভ। (৩)

১৫। গোলগাল আগাগোড়া
মহাবাদে আমরা।
দুই-একে টাকা কড়ি,
দুই তিনে যা ছুটে যা, পকেটে? (৩)

১৬। সবাই আসুন, মিষ্টি খাই,
একে তিনে!
দুই একে জল কাদায়,
ভরা বিল্লী জায়গা! (৩)

১৭। ঠোঁটের শেষে শেষের
দুজন বসেই আছেন।
রজত মহারজত কিনা
ইনিই জানেন। (৩)

১৯। ধৈর্য ধর প্রথম দুজন,
শেষের দুজন গৌরবে
একে তিনে বিদ্যুতের,
পড়বে বইই তিন লোকে

২১ বিশাল মাঝে ছোট্ট দেহ,
অকেজোতে।
উপরে চিটেফোঁটা,
অকর্মকুণ্ডে বিদ্বান। (৪)

২৪ ওপর থেকে বিশের মধ্যে
সবাই হলো অমল ধবল। (৪)

২৫ টেনে টুকে বহর বুঝি।
মোক্ষকর্ণ সেজবুড়ি। (৩)

২৬ প্রথম দুই অনুভব,
শেষের দুই জনম
গলন মেশি সব মিলিয়ে,
আগাগোড়া কম। (৩)

২৭। একত্রিশ দশ,
তিন দুই সাত।
সবাই হো হাত!
বলছি না যা তা। (৩)

২৮। ওপর বাঁকে ঝুলছিল যন্ত্র
পেট কাটলে বন্দুক নামক অস্ত্র।(৩)

২৯। লেজ কাটলে লাশ,
পেট কাটলে গা
সবাই যখন পরিচিত,
এখান থেকে যা। (৩)

৩০. কাটলে পেট থাকে,
তবে মাথা কাটিস
সবাই বসে যে যেখানে,
তাইতো লিখিত। (৩)

৩১। মাথা কেটে উল্টে দিন,
ওমা একি ঘেন্না!
লাটুতে নবডে বলে,
তাই ঘরে রেখ না। (৩)

৩৯. আবার দেখি একজনি
অপেক্ষা করে দুবার
নয়নে তিনি লাটু
ঘরে ঘরে দেবার। (২)

৪১ বাজনের বিংশতে অষ্টাত্রিং শত
দিলাম যোগ করে:
সব মিলিয়ে দেখতে পেলাম,
ছোট একটা নম্বরে। (২)

৪৩ ডাল-চচ্চড়োয়ার
আসলে আছে তুই
বিবর্তিতে ছিপ্পি বলি,
জবাব শুনে যা। (২)

৪৫। দুতোরি বিবর্তি,
বুক হয়ে মরব বরাবর?
অতশত জানি না,
কবিন্ন ধারাবেধাবির! (২)

৪৬। ল্যাজটা কেটে কম্বুডে
ঘুরে সাফ করে।
না কাটলেও ক্ষতি নেই,
সাদা রক্তই ঝরে। (৩)

৪৭। পেট কাটলে প্যাঁচ,
কাটছি মাথা, সাবধান।
বৈঠকে ঘাটাঘেলে,
এবার করল অবধান। (৩)

৪৮। আমি জানি আপনারা,
মোটেই নন ইহা।
ল্যাজটা ছাড়ুন, বলছে এ কী,
বাধাকেষ্টোর লীলা। (৩)

৪৯। প্রথমে ঘুরে নিশানা আর
পেটটা কেটে বাস!
মাথা কেটে দেখতে পেলাম
কত পরিমাণ? (৩)

৫০। মাথা কাটুন অন্য!
ল্যাজটা কেটে রাখ!
পেটটা না হয় কাটছি আমি।
দেখছি বিধি বাম! (৩)

৫১। নিচ ওপরে চন্দ্রাশে হরিচরণ সহায়
ফ্রেমক দিয়ে বাঁচিয়েছেন
আপনি আমায়! (৩)

৫২। পেট কাটা ভাঁচা নয়,
মাথা কাটা মেয়াদী।
ঢাক এবার নাস্তানাবুদ,
উল্টিয়ে মাথাবাদি! (৩)

৫৩। ইকার ছাড়া খাওয়া যায়,
অনেকেই খায়:
গোলা ছাড়া রোধ নয়,
কণ্ঠবন্ধায়। (৩)

৫৫। যেমন আছে, তেমনি রাখুন,
কেন বানা!
দুবার মিলে ভিজেই যাবেন,
উল্টে দেখুন কারখানা! (৪)

৫৭। সর্বদাই শিবঠাকুর করেন চুরি
উল্টে করেন অপেক্ষা,
আর না, খুড়ি! (২)

৫৮। হরিচরণ ভগবান!
আপনি নিন আমার প্রণাম। (২)

৬০। বন্ধ ঘিরে ছড়া কেটে
শেষ করলাম যা তা!
চুর ভুড়িয়ে এবার যাব,
উল্টে করবো খাতা। (২)

বর্ণে কণকপ্রভা
স্বাদে মনোলোভা
আর
ক্লান্তিহারী সজীবতা
এ তিনের সমাহার

ওয়ারেনের আপার আসাম চা

ওয়ারেন টী লিমিটেডের সৌজন্যে

ওয়ারেন টী লিমিটেড
৩১ চৌরঙ্গি রোড
কলকাতা-৭০০০১৬

টেলিফোন : ২৯-৬৬১১/১৩/১৪/১৮/৪৯
২৯-৬৭১২/১৫/১৬
টেলিগ্রাম : "ওয়ারেনটি"

টেলেক্স : ২১-৩৪১২ WALT IN
২১-৩৩৫৯ JAWI IN

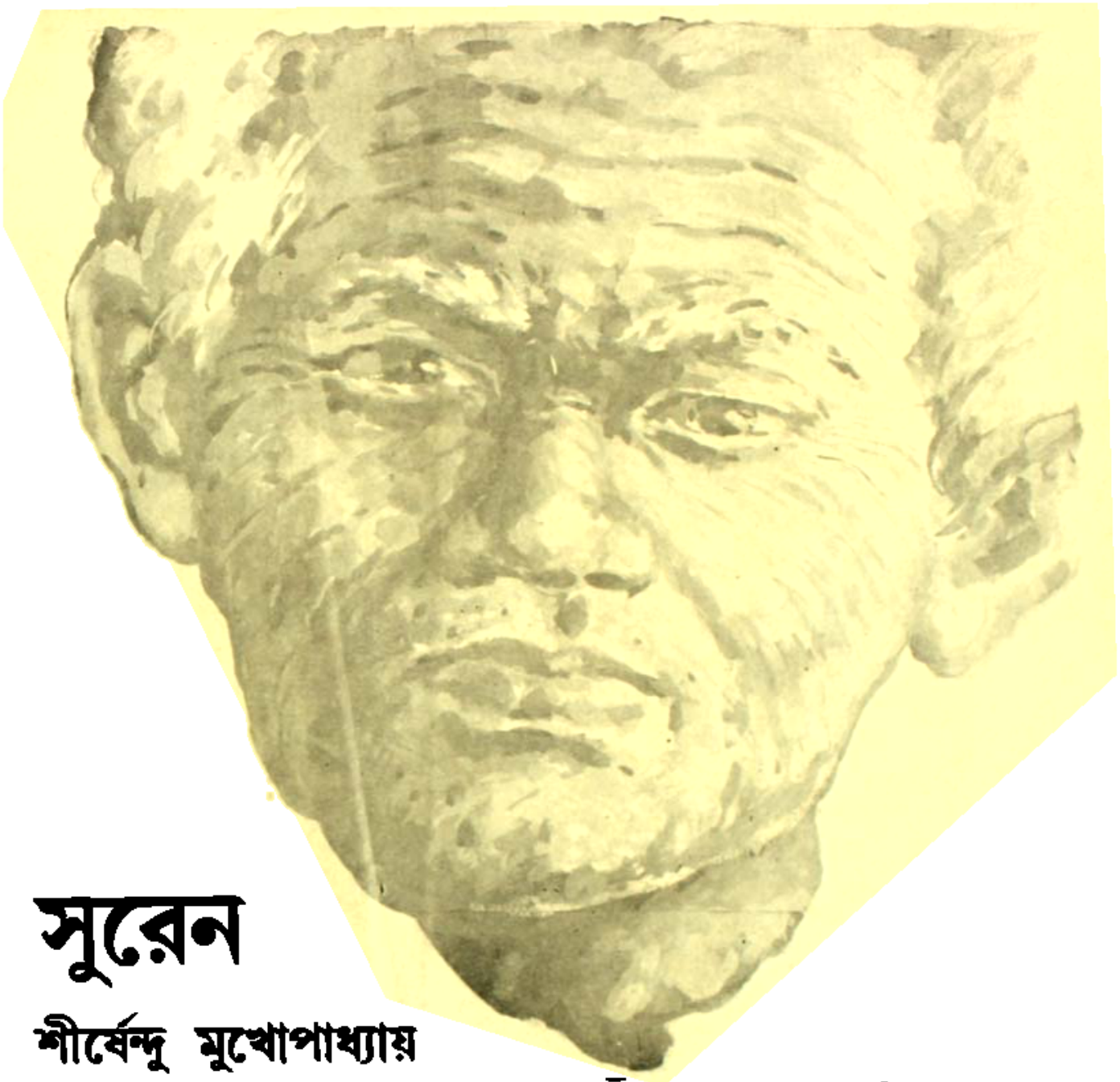

সুরেন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুরেন আজ সকালে ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারলেন, আজ দিনটা ভাল যাবে না।

সুরেন ঘোষের বয়স উনআশি। ষাট বছর বয়সে একবার তাঁর সাঙ্ঘাতিক একটা হার্টরোগ হয়েছিল। খুবই সাঙ্ঘাতিক। হাসপাতাল থেকে এই গত উনিশ বছর তাঁর আশিব্যাধি প্রায় কিছুই নেই। হৃৎযন্ত্রটি তাঁর খাসা চলছে। কুড়ো বয়সে চামড়া কুঁচকেছে, শরীরের শক্তি কমেছে, কিছু চুল সাদা হয়েছে। এছাড়া শরীর তাঁর বয়সের তুলনে, বেয়াদপি বড় একটা করে না।

আজও যে করছিল তা নয়, তবে কি যেন একটা টের পাওয়া যায় শরীরে, মনে, মনছে। একটা অন্ধকার, একটা ছুটি বা এক ধরনের শূন্যতা, হৃদপিণ্ড চলছে, ঘাস ঠিক আছে, নাড়ীর স্পন্দনও স্বাভাবিক, তবু বোধ হচ্ছে, একটা কী যেন ঘটবে।

তাঁর প্রথম স্ত্রী বিয়ের তিন বছর পর একটি ছেলে রেখে মারা যান। তখন সুরেনের বয়স মাত্র উনত্রিশ, তিন বছর বাদে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। সেই স্ত্রীর বয়স এখন সাতষট্টি। পাঁচটি কৃতী সন্তানের জননী। সুরেনের আগের পক্ষের একমাত্র ছেলে বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। থাকে সুইজারল্যাণ্ডে, দ্বিতীয় পক্ষের চার ছেলেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ভাল চাকরি করছে। ফলিফটি ব্রিটেনে। একমাত্র মেয়ে কানাডায় প্রবাসী। সুরেনের কাছে কোনও ছেলেই থাকে না। তিনটি ছেলের একজন দিল্লী, অন্যজন জামশেদপুর, তৃতীয়জন আলাদা বাড়ি করেছে কলকাতায়।

সুরেন কলকাতা পছন্দ করেন না। তিনি থাকেন কলকাতা থেকে একটু দূরে, আদিসপ্তগ্রামে। অনেকটা জমি নিয়ে বাড়ি, দোয়াল, সব্জী আর ফুলের বাগান, পুকুর, বাগজমি। সুরেন নিজে বিদেশে এবং দেশে চিরকালই শহরবাসী ছিলেন। রোজগারও করেছেন দেদার। প্রথম দিকে সরকারি চাকরি করলেও পরে নিজের কনস্যালটেন্সি ফার্ম খুলেছিলেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমির ক্ষেত্রে তিনি একজন বেশ বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। এখন তাঁর সেজো ছেলে সেই কার্য দেখাশোনা করে। রোজগার ভালই। সুরেনের যা জমে ছেড়ে হাতে তা যথেষ্ট, শেষ জীবনে আবার গ্রামবাসী হবেন, চাষবাস করবেন, গঙ্গাপারের মস্ত বাস করবেন, গঙ্গার ধারটি খুব ভালবাসেন, এরকম এক তীব্র বাসনা ছিল। তাইই ফলে আদিসপ্তগ্রামে এই খেয়াল। তাঁর স্ত্রীর অসম্মতি ছিল, কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন।

শরৎকাল, বাইরে এক আশ্চর্য সোনালী সকাল, গ্রামে আসার পর থেকে তিনি কতটুকু বুঝতে পারেন। বুঝতে পারছেন না। এই যে শরতের শিউলি, শিশির, রোদে এক সোনার রং, এসব যত দেখেন তত যেন বুকটা ভরে ওঠে সৌন্দর্যের তৃপ্তিতে।

সুরেন তাঁর দোতলার পূর্বদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালের পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, আজই শেষ দিন নয় তো; কী যেন বিকল হয়েছে ভিতরে। উনআশি বছরের পুরানো যন্ত্র তো। কবে বিগড়োয়।

চোখে ছানি পড়েনি কখনও। চশমা পরেন বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এখনও তীক্ষ্ণ। দাঁত অবশ্য সবই গেছে। কখনও সাহায্য কম শোনেন। বয়সের গুজন।

তবু সুরেন কিন্তু খারাপ নেই।

চন্দ্রিমা ঘুম থেকে ওঠেন অনেক আগে। কাকভোরে। চন্দ্রিমার ঘুম পাতলা, বেশী হয়ও না। দোতলা থেকে সুরেন দেখতে পেলেন চন্দ্রিমা ঘুরোতলার দাঁড়িয়ে কাকেকজনের দাঁত মাজতে মাজতে ঝিয়ের উঠোন ঝাঁটানো দেখছেন আর কথা বলছেন।

সুরেনের সাড়া পেয়ে গলার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি উঠলে? হ্যাঁ।

গোয়ালা খুলে গরু দুটোকে বের করে আন। বড় ডাকছে।

গরুর হাঁক ডাক সুরেনও শুনছিলেন। গরুর দোষ ছাঁদ হাড়। তার নিজের গোয়ালটি আছে, গরু আছে। একটু বেলায় আসে। সুরেনের গরুর দুটো বাছুরই তার কাছে। দোয়ানোর সময় সে নিয়ে আসবে।

সুরেন চটির শব্দ করতে করতে নিচে নামলেন। গোয়াল ঘরে গিয়ে গরু দুটোকে বের করে অড়হর গাছের কঞ্চি পুঁতিতে বাঁধলেন। কাছেই মাটির গামলায় জল, চারদিকে খেসার ছাল। থাক।

গরু দুটোকে বাঁধার পরই সোনামালটা হাঁল। কুয়োর দিকে যেতে গিয়ে সুরেন কিছুতেই হাঁটাটা সোজা রাখতে পারলেন না। অনেকটা বেতুল থেকে বেতুলবাড়ির দিকে চলে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে আবার একবার চেষ্টা করতে গিয়ে কুয়োর জল যে নালা বেয়ে বাগানের ধারে গিয়ে পড়ে সেটার কাছে চলে গেলেন। বিকবিকে কলা, নোংরা।

ও কী গো জামাই: বলে চেঁচিয়ে উঠল কমল ঝি।

চুপ, চুপ—বলে সুরেন একটা মৃদু ধমক দিলেন।

চন্দ্রিমা বারান্দায় উঠে বাচ্চার পা ধুয়তে ধুয়তে ফিরে চেয়ে বললেন, কী হয়েছে? ওঠা:

সুরেন মাথা নেড়ে বললেন, কিছু হয়নি।

কিন্তু হয়েছে। সুরেন স্পষ্টই টের পেলেন, গলাটা কাঁপছে। শরীরটা অবশ লাগছে। ঘাম হচ্ছে শরীরে।

চন্দ্রিমা অন্য কথায় যখন পৌঁছে এসে তাঁকে ধরল তখন সুরেন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন।

টেচামেচি, লোক জানাজানি বড় কম হল না। চ্যাংদোলা করে তাঁকে দোতলায় তুলে বিছানায় শোয়ানো হল। ডাক্তার এল। প্রেসার দেখল, রক্ত নিল।

সুরেন নীরবে সবই দেখে এবং সহ্য করে যেতে লাগল। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন না। ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিয়ে বলে গেল, এখন ঘুমোন। নড়াচড়া বারণ।

সুরেন ঘুমোলেন।

কিন্তু জাগতেও হল বেশ। ঘুমুচ্ছেলের ঘর জেগে ভেসে যাচ্ছে। চারদিক থেকে পৌঁয়ে তরু প্রকৃতির গন্ধ আসছে। মৌমাছির শব্দ। পাখির ডাক।

সুরেন ডাকলেন, চন্দ্রিমা।

কেউ এল না। কোথাও আছে। বেশ বড় বাড়ি, তাঁর ক্ষীণ গলা তো কোথাও গিয়ে পৌঁছবে না।

সুরেন পাশ ফিরে শুতে গিয়ে টের পেলেন, পারছেন না। একটা বাধা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে।

আজই কি শেষ দিন?

মরতে কি তাঁর খুব কষ্ট হবে? মনের কষ্ট?

হবে হয়তো। বহু জনম ছেড়ে কোন অব্যক্তে মিশে যাওয়া। কষ্ট হবে কেন, হচ্ছে। সুরেনের বুকটা ঠেলে উঠছিল কান্নায় জল। চোখ বুজতেই জলটা গড়িয়ে নেমে গেল কানের দিকে, জুলপি ভিজিয়ে।

জানলার দিয়ে সজনের ডাল উঁকি দিচ্ছে, নীল আকাশ তাঁকে অপলক দেখছে, আসছে মৃদুমন্দ বাতাস। কী যে সুন্দর চারদিকময় এইসব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ। সুরেন পৃথিবীকে বড় ভালবাসতেন।

উঠে বসবেন একটু? বসা উচিত হবে কি?

সুরেন চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাথাটা তুলতেই কেমন একটা চক্কর খেল মাথায়, দুলিয়ে উঠল।

সুরেন বালিশে মাথা রেখে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

উনআশি বছর বয়স অবশ্য ঢের বয়স। মরলে সেটা অকালমৃত্যু হবে না। তবু সুরেনের মনে হচ্ছিল, বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল জীবনটা। এখন তিনি সৈনবের কথা স্পষ্ট সব স্মরণ করতে পারেন, যৌবনের গায়ের দিন আজও ছবির মতো স্পষ্ট। খুব বেশীদিনের কথা বলে মনেও হয় না। এত তাড়াতাড়ি কেন চলে যেতে হবে?

চোখ বুজে ছিলেন সুরেন। ঘরে কেউ এসেছে টের পেয়ে ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, চন্দ্রিমা।

কেউ সাড়া দিল না।

সুরেন খুব ধীরে চোখ মেললেন। দেখলেন আশ্চর্য এক সবুজের আভায় ঘর ভরে আছে। ঘর? সুরেন চারদিকে তাকালেন। না, ঘর তো নয়। চারদিকে কেবলই গভীর ঘন বন, আর তারী সুন্দর সব গাছপালা। চারদিকে অজস্র মৌমাছির গুঞ্জন আর পাখির ডাক, নীল আকাশে সাদা মেঘগুলি ধীরে উড়ছে।

এ কোথায় তিনি?

একটা মুখ তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারী সুন্দর এক যুবতী। কিন্তু নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। এত সৌন্দর্য মানুষের থাকে না। মুখখানা প্রবল আয়ত চোখে রৌদ্রের দীপ্তি, জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রঙ, রেশম সুতোর মতো চিকন চুলের রাশি অপরূপ মুখখানা ঘিরে আছে।

যুবতী একটা সুগন্ধী শ্বাস কেবল তাঁর মুখে বলল, খেতে চাও না?

না।

খুব ভালবেসেছিলে পৃথিবীকে?

খুব।

একদিন তো যেতেই হবে।

জানি। যেতে রাজি, তবে এখনও প্রস্তুত নই।

যুবতী স্নায়ুন হাসল। লক্ষ নক্ষত্রের কিরিমিরি খেলে গেল হাসিতে। যুবতী মৃদু স্বরে বলল, কী পেলে এ জীবনে?

এই শেষ বয়সে এসে মনে হয়, শুধু এই সৌন্দর্য ছাড়া এই বুকভরা জলের আর কিছুই চায় না। আরও কিছুদিন শুধু চারদিকটাকে শুষে নিতে ইচ্ছে হয়।

যুবতীর মুখখানা করুণ হয়ে গেল। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সুরেনের চোখে চোখ রেখে। তারপর বলল, আরও কিছুদিন?

হ্যাঁ। আরও কিছুদিন।

তাই হোক।

সুরেনের ঘুমন্ত মুখে হাসি দেখে চন্দ্রিমা অবাক হলেন। ডাকলেন, ওগো কেমন লাগছে?

সুরেন চোখ খুলেও হাসলেন। বললেন, ভাল, ভাল। বেশ ভাল। একটু ওঠো। জানালার কাছে নিয়ে যাও আমাকে। দেখব, বড়কল বাড়ি।

কানন

নিরঞ্জন সিংহ

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে অশোক সমর বোসের মুখোমুখী উত্তেজনার জন্ম ঘটিয়েছে। সাধারণত সমর বোস উত্তেজিত হন না। খুবই চাপা স্বভাবের মানুষ উনি। আশপাশের কেউ সহসা ওঁর মানসিক অবস্থার হদিস পায় না। সমর বোস জানেন মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীর টপ এক্সিকিউটিভদের উত্তেজিত হলে চলে না। অন্তত বাইরে উত্তেজনা প্রকাশ একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে আর যাই হোক উন্নতি হয় না।

বিশাল মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীর উনি রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর। তাছাড়াও বেশ কয়েক ব্যবসা কোম্পানীর। কিন্তু গত দু'তিন বছর ওঁর প্রতিযোগিতায় জন্য কোম্পানীর অবস্থা একটু খারাপের দিকে। ব্যবসায় মুনাফা ঠিকমত ঘরে না আসলে ব্যবস্থাপনারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। এ কোম্পানীও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রচণ্ড চাপ পড়েছে আর এণ্ড ডি ডিপার্টমেন্টের উপর। সমর বোসও অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন এমন কিছু জীনোমক তৈরি করতে যার চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পাওয়া যায় এবং দামেও বেশ সস্তা হয়। কোম্পানী টপ এক্সিকিউটিভদের সুখ সুবিধের জন্য বরাদ্দ হাতে পয়সা খরচ করে। সুতরাং, কোম্পানীর এই দুঃসময়ে টপ এক্সিকিউটিভদেরও একটা নৈতিক কর্তব্য আছে বৈকি। অবশেষে একদিন নতুন জনমূলক আবিষ্কার করলেন সমর বোস এবং পুরো জীনটা নিয়ে আলোচনা হল একটা বোর্ড মিটিং-এ। এর একমাসের মধ্যে এক ট্রেনিং-এর নাম করে সমর বোসকে সপরিবারে কোম্পানী আমেরিকায় পাঠিয়ে দিল তিনমাসের জন্য। সব খরচ কোম্পানীর। সমর বোস বুঝলেন ওঁর নতুন জনমূলটা কোম্পানীর খুব পছন্দ হয়েছে তাই এই উপহার। মনে মনে হাসলেন সমর বোস। 'দেয় দেনা ধরফর কায় ন্যায়।' এতে না করার কোন কথাই ওঠে না। না করলে ম্যানেজমেন্ট ক্ষুব্ধ হবে। আর সহকর্মীরা মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলবে, 'এ কি করলেন ডঃ বোস? ম্যানেজমেন্টের ডিসিশনে ভায়োলেট করলেন? এটা কিন্তু মোটেই ঠিক করলেন না। ইস অবসরটা যদি আমরা পেতাম তাহলে এক কথায় না করতাম ইত্যাদি ইত্যাদি।' সমর বোস অবশ্য সহকর্মীদের এ ধরনের মন্তব্য করার কোন সুযোগ দিলেন না। সপরিবারে আমেরিকায় চলে গেলেন।

তিনমাস বাদে ফিরে এসে একটা ব্যাপার লক্ষ করে উনি ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন, কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রাখলেন। ওঁর অনুপস্থিতিতে অমর. এণ্ড ডি. ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডঃ শিবনারায়ণ গবেষণাগারের সর্বেসর্বা হয়ে বসেছেন। ভাবলেন এটা সাময়িক ব্যবস্থা। কিন্তু মাসখানেক যাওয়ার পরও বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা মোটেও সাময়িক নয়।ডিরেক্টরদেরও এ ব্যাপারে সায় আছে। সব বুঝেও চুপ করে রইলেন সমর বোস; কারণ চুপ করে থাকা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। একটা উপায় অবশ্য আছে তা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু এরকম ইটকারিয়ে করার বয়স আর ওঁর সাহস নেই। একদিন হয়তো ছিল। সে বহু দিনের কথা। যখন তিনি এত বড় হননি। এমন সুখী এবং ছকে বাঁধা জীবনের স্বাদ তিনি জানতেন না। সেদিন এরকম অসম্মান তাঁকে উত্তেজিত করে তুলত। আজ করে না। সমর বোস সেই অতীত জীবনটার কথা এখন আর মনে করতে চান না। সে বড় কষ্টের ও সংগ্রামের জীবন। বাবা ছিলেন প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টারমশাই, সুতরাংই অলপবাসী। ছেলেবেলায় সমর বোসও ছিলেন খুব অলপবাসী। কিন্তু যেখানে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অলপবাসিতা তাঁকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কিন্তু তাঁকে উঠতে হবে, অনেকদূর যেতে হবে। করে যে সেই অলপবাসী সমর বোসকে আজকের সমর বোস গড়ে তিলে খুন করলেন, সেই দিনক্ষণটা ঠিক হিসেব করে বের করতে পারবেন না।

গবেষণাগারে নিজের চেম্বারে বসে নিজেকেই পরিক্রমা করছিলেন সমর বোস। ডঃ শিবনারায়ণকে গবেষণাগারের সর্বেসর্বা করার কারণটা বিশ্লেষণ করে দেখছিলেন সমর বোস। কিন্তু সঠিক কারণটা কি তা ধরতে পারছিলেন না। সমর বোসের নতুন জনমূল অনুযায়ী জীনোমক তৈরি করতে গেলে আরও একটা কেমিক্যাল রি-এজেন্ট বাড়তে হবে। এই ইন্টারমিডিয়ারী রি-এজেন্টে যে কেমিক্যালটি তৈরি হবে তা একটা নতুন ট্যাঙ্কে জমা করতে হবে। এই কেমিক্যালটি খুবই বিষাক্ত আর এটাকে ট্যাঙ্কে স্টোর করে রাখাও খুব বিপজ্জনক। কারণ এই কেমিক্যালটা গ্যাসে পরিণত হয় খুব তাড়াতাড়ি। তাই ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে প্ল্যান্টের চাপে ট্যাঙ্ক ফেটে যেতে পারে এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই জন্যে কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে জানিয়েছিলেন সমর বোস। কোম্পানী আজ পর্যন্ত সে রকম কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি অথচ কমার্শিয়াল প্রোডাকশনের তোড়জোড় যে চলছে তা উনি বুঝতে পারছেন। কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বসাতে গেলে কোম্পানীকে বেশ ভাল টাকা খরচ করতে হবে। সমর বোস এখন বেশ বুঝতে পারছিলেন যে কোম্পানী এই বাড়তি টাকা খরচ করতে চায় না। হয়তো এই কারণেই ম্যানেজমেন্ট ওঁকে গবেষণাগারের কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ডঃ শিবনারায়ণ যে 'ইয়েস' ম্যান তা সমর বোস যেমন জানেন, ম্যানেজমেন্টও তেমনি জানে।

ওঁর নতুন জনমূলের ল্যাবরেটরী টেস্টের সময় কারখানার আশপাশের বেশ কিছু মানুষ হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এর কারণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল ছিল না। কারখানার খুব অল্প কয়েকজন মানুষ আসল কারণটা জানতেন, কিন্তু তাঁরা কেউ মুখ খোলেননি এবং ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখারচেষ্টা করা হয় কোম্পানীর তরফ থেকে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সমর বোস কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন কেন কারখানার আশপাশের লোক হঠাৎ সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এর একমাত্র কারণ ইন্টার-মিডিয়ারী বিষাক্ত গ্যাসটি কোনও ভাবে নতুন ট্যাঙ্ক থেকে লিক করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ামণ্ডলে মিশে মারাত্মক দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছিল। লিক করা গ্যাসের পরিমাণ আরো বেশি হলে ভয়াবহ মৃত্যু ঠেকানো যেত না। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার ডঃ শিবনারায়ণ কিন্তু সমর বোসের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করেনি, অথচ করা উচিত ছিল।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে এই কথাটা তুলেই অশোক আজ সমর বোসকে উত্তেজিত করে তুলেছিল।

'সমরদা, কিছুদিন আগে আপনাদের কারখানার কাছাকাছি এলাকার মানুষ হঠাৎ মারাত্মক-রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তা বোধহয় আপনি জানেন।'

'জানি।' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন সমর বোস। অশোকের কথাটা শোনামাত্র উনি ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিলেন। ওঁর মন বলছিল অশোক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই পুরনো কথাটা তুলেছে। সেই উদ্দেশ্যটাও খুব স্পষ্ট ছিল না সমর বোসের কাছে।

'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই রহস্যময়। এ বিষয়ে আপনি কি কিছু জানেন?'

সমর বোস অশোকের কথার জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অশোক বলল, 'রহস্যটা আমি আবিষ্কার করেছি। 'লড়াই' এর আগামী সংখ্যায় সে রহস্য আমি ফাঁস করব। তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য বলেই জানলাম।'

'তোমার কাগজে কি ছাইপাঁশ লিখবে না লিখবে তা আমাকে জানাবার কি দরকার তাতো বুঝতে পারছি না অশোক।' সমর বোসের অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল।

'দরকার, তার কারণ এ ব্যাপারে আপনার কোম্পানী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।' অশোক যেন জোরের সঙ্গে বলল কথাটা।

'আমার কোম্পানী ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত? তার মানে?' সমর বোস নিজের এই অভিনয়ের জন্য নিজেই নিজের পিঠে চাপড়ালেন মনে মনে। 'কি বলতে চাইছো তুমি।' সমর বোসের কণ্ঠে কপট রাগ।

'আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে এই অসুস্থতার কারণ আপনার কোম্পানীর ট্যাঙ্ক থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক করা। কথাটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?' অশোকের কথায় একটা চ্যালেঞ্জের সুর।

একটু অবাক হলেন সমর বোস। কোম্পানীর এত গোপনীয় খবর অশোক কি করে যোগাড় করল? মনে মনে অশোকের কাজের তারিফ

করলেও ভাবভাবে তা মোটেই প্রকাশ করলেন না সমর বোস। করা সম্ভবও না। তাই একটু চুপ করে থেকে বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ অস্বীকার করি। কারণ তোমার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

'সমরদা, আপনি কোম্পানীর গবেষণা দপ্তরের সর্বেসর্বা। আপনি যে নতুন কয়লা নিয়েছেন, সেই কয়লা অনুযায়ী লাবরেটরী টেস্টের সময় বিষাক্ত গ্যাস ট্যাঙ্ক থেকে বাইরের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আর তারই ফলে কারখানার চারপাশের মানুষজন সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবকিছু জেনেশুনেও আপনি আসল ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চাইছেন?' অশোক রীতিমত উত্তেজিত।

'তোমার ওইসব কল্পনাবিলাস নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কারণ আমার বা আমার কোম্পানীর ঘটেনি।' অশোকের প্রশ্নটা পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেন সমর বোস।

'ঘটেনি, তবে এবার ঘোরতর ঘটবে। আপনার কোম্পানী পরিবেশ দূষণের দায়ে দায়ী। আমার 'লড়াই'-এর আগামী সংখ্যাটা পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা মোটেও আমার কল্পনাবিলাস নয়। এটা ভয়ঙ্কর বাস্তব ঘটনা। আপনার কোম্পানীর এই বেপরোয়া মনোভাবই একদিন এই শহরটাকে শ্মশানে পরিণত করবে।' অশোক একটানা কথা বলে যাচ্ছিল।

সমর বোস একটু কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, তোমার 'লড়াই'-এ আমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে যত বিষোদ্গারই করনা কেন তাতে কোম্পানীর কিছু এসে যাবে না। বরং তুমি সাবধানে লিখো না হলে মানহানির মামলায় তোমাকে জেলে যেতে হবে।'

'প্রমাণ হাতে না রেখে কি আর আমি লিখব সমরদা। প্রয়োজন হলে সেসব আমি যথাসময়ে যথাস্থানে দাখিল করব।'

সমর বোস এতটা আশা করেননি। তবে পরক্ষণেই মনে হল অশোক ওকে ধাপ্পা দিচ্ছে। সত্যিই ওর হাতে কি প্রমাণ থাকতে পারে? অবশ্য প্রমাণ ওর হাতে না থাকলেও কিছু এসে যায় না। ওর 'লড়াই'-এর খবরের উপর ভিত্তি করে যদি একটা সাধারণ এনকোয়ারী হয় তাহলেই অনেক কিছু বেরিয়ে পড়বে। সমর বোস কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, 'আমার কোম্পানী এই বিরাট শহরের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে নতুন জোয়ার এনেছে তা যদি তুমি চোখ খুলে দেখতে পেতে তাহলে তোমার অমন 'লড়াই' সফল হয়ে উঠত। তোমরা হচ্ছো একচোখো সাংবাদিক। ভাল জিনিস তোমাদের চোখে পড়ে না।'

অশোক কিছু একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল।

সমর বোস অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোম্পানীর বিরুদ্ধে অকারণ প্রচার চালিয়ে তোমার লাভটা কি?'

'অকারণে প্রচার চালানো সাংবাদিকের কাজ নয় সমরদা। আপনার কোম্পানী এই শহরের মানুষদের জীবন অনিশ্চিত করে তুলছে, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে কলম ধরতে হচ্ছে।' অশোক শান্তভাবে জবাব দিল।

সমর বোস আর জবাব দিতে পারলেন না। অশোককে তিনি ভাল করেই চেনেন। ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। অশোক যা বলছে তা সত্যি। এবং সত্যি কথা বলতে ও পেছপা হবে না। অন্যান্য অনেক স্থানীয় কাগজ বিজ্ঞাপনের লোভে কোম্পানীর বিরুদ্ধে একটি কথাও লেখে না। বরং অশোক সেরকম কিছু লিখলে সবাই মিলে সে লেখার তীব্র সমালোচনা করে। বিজ্ঞাপনের টাকা দিয়ে অশোককে কিনতে পারেনি কোম্পানী। তার এই জেদী ও আদর্শবাদী স্বভাবটিকে সমর বোস মনে মনে ভালবাসেন এমন কি মাঝে মাঝে শ্রদ্ধাও করেন। অশোক যেন সমর বোসেরই আর এক সত্তা। যে সত্তা অতি প্রাচীন ও রোমান্টিক। সমর বোস মুহূর্তে যেন আত্মবিস্মৃত হন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বর্তমানে ফিরে আসেন। অশোক তারই রাগের খাতে। অশোককে বাধা না দিলে অশোকের কাজ-কর্মে সমর বোসের সায় আছে বলে ধরে নেবে কোম্পানী এবং তার পরিণতি সমর বোসের কাছে মোটেও ভাল হবে না। সমর বোস তাই বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলতে চাইছ অশোক।'

'না সমরদা আমি মোটেও আপনাকে বিপদে ফেলতে চাইছি না, বরং আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।' আস্তে জবাব দিল অশোক।

সমর বোস জানেন আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে কলকারখানা। প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বাড়ছে। বাড়তি মানুষের জন্য চাই বাড়তি খাবার। সীমিত কৃষিযোগ্য জমিতে তাই বাড়তি ফসল ফলাবার চেষ্টা চলছে। উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাষ হচ্ছে। এইসব ফসলের জন্য চাই প্রচুর কৃত্রিম সার। রোগপোকার হাত থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা এ ধরনের ফসলের খুবই কম। তাই এইসব শস্যকে রোগপোকার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চাই বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধের। এসবের উৎপাদন বন্ধ করা কি সম্ভব? বিংশ শতাব্দীর সেবলম্বনে এসে মানুষ কি আবার দুর্ভিক্ষে মরবে? তা কখনই হতে পারে না।

অশোক মুখে যত কথাই সমর বোসকে বলুক না কেন ও জানে এগুলো শুনে কি লাভ হচ্ছে। সত্যি কথা সহজভাবে মেনে নেবার সাহস আজ আর ওদের নেই। মোটা মাইনে, নানারকম বাড়তি সুযোগ সুবিধে দিয়ে কোম্পানী ওদের কিনে নিয়েছে। কারণ ওদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখ। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কি জবাব দেবে ওরা? সভ্যতার বিষ আজ জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতি সবকিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে তার সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলে, কিন্তু মানুষ আজ নিজেদের তোগসুখের জন্য সেই প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে সব মারাত্মক জেনেটিক রোগ যার কোন চিকিৎসা পর্যন্ত নেই। বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বাতাস ভোগ করার অধিকার সবার জন্মগত, কিন্তু সেই জল, সেই বাতাস মানুষই তার নিজের ভোগসুখের জন্য বিষিয়ে তুলেছে।এর বিরুদ্ধে অশোককে লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে।

কফির ট্রে হাতে বন্ধাঘর থেকে বেরিয়ে এলো জয়ন্তী। খবরে টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি? প্লেটে কাবার পড়ে রয়েছে, আর তোমরা দুজনে গোমড়া মুখে বসে আছো। খাবারগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

সমর বোস বলে উঠলেন, 'তোমার ভাই আমার কোম্পানীকে লাটে ওঠাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

জয়ন্তী অশোককে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'অশোক এবার তুমি সত্যি বেরিয়ে যাবে।'

'দিদি তুমি রান্নাঘরে যাও নিরুপায়।'

জয়ন্তী কি একটা বলতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল। জয়ন্তী সমর বোসকে বলল, তোমার গাড়ি এসে গেছে।'

সমর বোস কফির কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দিলেন। তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে জয়ন্তীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'টুকাইকে বেডি করে রেখো। আমি কারখানায় পৌঁছেই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। টুকাই কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে।' জবাব দিল জয়ন্তী।

'সে কি এখনো ঘুমাচ্ছে? ফুলে যাবে না? শরীর ভাল আছে তো?'

'শরীর ভাল আছে। আজ ওর ফুল ছুটি। ঘুমাচ্ছে ঘুমাক।'

'ও আচ্ছা। আমি চলনাম।' আড়চোখে অশোককে দেখে বেরিয়ে গেলেন সমর বোস।

সমর বোস বেরিয়ে যেতেই জয়ন্তী অশোককে নিয়ে পড়ল, 'তুই সব সময় ওর পিছনে লাগিস কেন বলতো অশোক?'

'দিদি, সমরদাকে এই কারখানার চাকরিটা ছেড়ে দিতে বলো। সমরদার কারখানায় যে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে কাজ হয় তা যদি কোন কারণে বাইরে বেরিয়ে এসে আবহাওয়ামণ্ডলে মেশে তাহলে এই পুরো শহরটা পরিণত হবে একটা গ্যাস চেম্বারে। শহরের সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই তোমাদের জন্য আমার বড় ভয় হয়।'

'বলিস কি? কিন্তু ওতো আমাকে কোনদিন একথা বলেনি'

'সমরদা সব জেনেশুনেও কিছু বলবে না, কারণ মোটা মাইনে দিয়ে কোম্পানী সমরদার মুখ বন্ধ করে রেখেছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই সমরদা একদিন কিরকম আদর্শবাদী মানুষ ছিল।'

'কারখানার ভিতরের কথা তুই জানলি কি করে?'

'কাগজ চালাতে হলে অনেক খবর রাখতে হয় আমাদের।'

'এসব কি সত্যি?'

'সত্যি না হলে, আমি কি তোমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছি। টুকাইকে নিয়ে তোমরা এখন থেকে চলে যাও। অনেক দূরে চলে যাও।'

'শুধু আমাদের কথা বলছিস কেন? তুই যাবি না?'

'না, মিতি, আমার এখন যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে আরো জোরদার লড়াই-এ নামতে হবে। শহরের মানুষকে বিপদের কথা আমার অনেক আগেভাগে জানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি তারা এখনো এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। কিন্তু শহরের প্রতিটি মানুষকে একথা ভালভাবে বোঝাতেই হবে। কারণ সমস্যাই জীবন-মরণের।'

'আমি তোর কথা ঠিকমত বুঝতে পারছি না অশোক। কারখানা যদি এতই বিপজ্জনক, তাহলে সরকার কারখানাটিকে বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন?'

'সরকারকে সেকথা বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না, কিংবা সরকার বুঝেও না বোঝার ভান করে রয়েছেন, কে জানে।'

'ঠিক আছে, ও আসুক তকে বুঝিয়ে বলবো। আমরা চলে যাব, কিন্তু তোকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে অশোক।'

'আগে তোমরা যাওয়ার ব্যবস্থা করো তো, তারপর দেখা যাবে।'

'যাই এবার টুকাইকে ডাকি।' বলে জয়ন্তী উঠে পড়ল।

অশোক মনে মনে বলল, হ্যাঁ ডাকো। টুকাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এখন টুকাইয়েরই আমার দুরকার।

(দুই)

সমর বোস নিজেকে একটু সামলে নিলেন। অশোকের কথাগুলো তখনো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। অশোক একটু কল্পনাপ্রবণ, একটু আদর্শবাদী। সমর বোস মনে মনে একটু হাসলেন। সে হাসি খুবই তিক্ত।

উনি নিজেও তো একদিন ছিলেন কল্পনাপ্রবণ ও আদর্শবাদী। সে সব দিন কত দূরে চলে গেছে। মনে হয় সে যেন আর এক জন্মের কথা। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকেন সমর বোস। অবশেষে টেলিফোন তুলে উনি ডাকলেন সেকটি অফিসার মিঃ পাণ্ডেকে।

পাণ্ডে ঘরে ঢুকে সুপ্রভাত জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

'বলুন স্যার।'

'আচ্ছা মিঃ পাণ্ডে আমাদের কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থার কি কোন চাঁক আছে বলে আপনার মনে হয়?'

সকালবেলা এরকম একটা কথা শুনে মিঃ পাণ্ডে একটু অবাক হয়ে সমর বোসের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একটু অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ আজ একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন স্যার?'

'কথাটা মনে হল তাই জানতে চাইছি।'

'স্যার, আপনার তো অজানা নেই। দেশী স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট জোরদার। তবে একথাও আপনি জানেন যে বিদেশী স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেই মান্ধাতা আমলের।'

কথাটা সমর বোসের জানা, তবু মিঃ পাণ্ডের মুখ থেকে কথাটা শুনে ওঁর অস্বস্তিটা কেন আরো বেড়ে গেল। 'যে ধরনের বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে আমরা কাজ করছি তাতে সামান্য ভুলের জন্য যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, সেখানে নিরাপত্তার মান দেশী বিদেশী বলে আলাদা হওয়ার কোন কারণই নেই।' যেন স্বগতোক্তি করলেন সমর বোস।

'কারণ একটা আছে স্যার, সে কারণ হচ্ছে টাকা। বিদেশী স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী উন্নত মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে গেলে চাই প্রচুর টাকা। ম্যানেজমেন্ট অত টাকা খরচ করতে মোটেও ইচ্ছুক নন।' মিঃ পাণ্ডে শান্তস্বরে জবাব দিলেন।

'তার অর্থ বড় রকমের কোন বিপর্যয় ঘটলে আমরা তার কোন ক্লেইমস্ নিতে পারব না, তাই না মিঃ পাণ্ডে?'

'বড় রকমের দুর্ঘটনা কেন ঘটবে স্যার? আর মোটামুটি যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তা খুব একটা খারাপ নয়।'

'তা আমি জানি মিঃ পাণ্ডে। কিন্তু নতুন কর্মসূচী অনুযায়ী যে প্রোডাকশান আরম্ভ হতে চলেছে তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার প্রয়োজন আছে।'

'স্যার, কিছু মনে করবেন না। সকালবেলা আপনাকে খুব ডিস্টার্বড মনে হচ্ছে। অশোকবাবু কি আপনার উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করেছেন?' বলে একটু মি মি করে হাসলেন মিঃ পাণ্ডে।

'অশোককে আপনি চেনেন নাকি?'

'লড়াই' এর সম্পাদককে এ শহরে কেনা চেনে স্যার। তার উপরে তিনি আপনার প্রতিবেশী। আপনার বাংলোতেই থাকেন। আবার আপনার কোম্পানীর বিরুদ্ধেই তিনি জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'মিঃ পাণ্ডে কথাটা কি আপনার নিজের?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। কথাটা অবশ্যই আমার নিজের নয়। স্যার আমার একটা এ্যাডভাইস যদি নেন তাহলে অশোকবাবুকে আপনার বাংলোয় আর রাখবেন না। প্রথমে হয়তো আপনার কোন ক্ষতি হবে বেড়ে পারে।'

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ মিঃ পাণ্ডে। কথাটা আমি মনে রাখব। আপনি এখন আসুন।'

'ধন্যবাদ স্যার। কিছু মনে করবেন না।' বলে সমর বোসের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে উঠে পড়লেন মিঃ পাণ্ডে।

(তিন)

মনটা সত্যিই ভাল নেই সমর বোসের। কয়েকদিনের মধ্যে প্রোডাকশন শুরু হবে তাই ল্যাব-টেস্ট রিপোর্টের কাগজপত্র সব সই করাতে নিয়ে এসেছিলেন ডঃ শিবনারায়ণ। সমর বোস একবার ভেবেছিলেন কাগজপত্রে সই করবেন না। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল এরকম ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। উনি কাগজে সই না করলেও প্রোডাকশান শুরু হবে। ওঁর বদলে ডঃ শিবনারায়ণই সই করে দেবেন এবং তার ফলাফল একটাই হবে তাকে এই কোম্পানী থেকে চলে যেতে হবে এবং ডঃ শিবনারায়ণ হবেন রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা। এ বড় কঠিন যুদ্ধ। সামান্য একটা পদক্ষেপে ভুল হলে যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়।

গম্ভীর মুখে রাতে খাবার টেবিলে এসে বসলেন সমর বোস। অশোক এ সময় কোনদিনই ফেরে না। সামনের চেয়ারে টুকাই। পাশে বসে জয়ন্তী খাবার তুলে দিচ্ছিল। রাতে অশোক ফিরলে জয়ন্তীর সঙ্গে খায়। টুকাই অনেকক্ষণ থেকে কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিল। এক সময় ও ডাকল 'বাপী।'

সমর বোস টুকাই-এর দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'বলো টুকাই সোনা।'

'বাপী' জানু বলছিল তোমাদের কারখানায় নাকি মানুষ মারার জন্য তোমরা বিষ তৈরি করো। সত্যি বাপী?'

সমর বোস সোজা হয়ে বসে জয়ন্তীর দিকে তাকালেন। জয়ন্তী খাবার দিতে দিতে টুকাই-এর কথা শুনে স্থির হয়ে গেল।

'জয়ন্তী তোমরা ওইকে এখনে রাখা আর সম্ভব হবে না।'

জয়ন্তী মুখ নিচু করে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না -- ও কি হাত ওটিয়ে নিচ্ছ কেন? তোমাকে আর একটু সময় দিই। টুকাই তুমি খাচ্ছ না কেন? খাও --'

'বাপী তোমরা সত্যি মানুষ মারার জন্য বিষ তৈরি করো?' টুকাই আরো জোরে প্রশ্ন করল।

'ছিঃ টুকাই। বাপীকে ওভাবে বিরক্ত কোরো না। মানুষ মারার বিষ কেন তৈরি হবে? তোমার বাপীর কারখানায় তৈরি হয় ফসলের পোকামাকড় মারার ওষুধ।' জয়ন্তী ব্যাপারটা সামলাবার চেষ্টা করল।

টুকাই কিন্তু তাতে থামল না। ও আবার বলে উঠল, বলো না বাপী ওই ওষুধ দিয়ে কি মানুষ মারা যায়?'

এবার সমর বোস উত্তর দিলেন, 'পোকা মারার ওষুধে মানুষ মরে না টুকাই।'

'কিন্তু মানু বলছিল মরে। তোমরা এই শহরের সব মানুষকে নাকি একদিন মেরে ফেলবে। তাহলে আমরাও মরে যাব বাপী?'

জয়ন্তী এবার চিৎকার করে উঠল, 'টুকাই চুপ কর্তো। ও সব কথা বলতে নেই। খেয়ে নাও।'

'না খাব না। বাপী কেন আমাদের মারার জন্য বিষ তৈরি করবে? কেন? কেন? কেন?' বলতে বলতে একলাফে চেয়ার থেকে নেমে ছুট লাগাল ও বেডরুমের দিকে। জয়ন্তী টুকাইকে ধরার জন্য উঠতে যাচ্ছিল সমর বোস বাধা দিলেন।

'আজ তোমাকে একটা শক্ত কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি জয়ন্তী। অশোক এলে বলে দিও সে যেন তার থাকার জায়গা খুঁজে নেয়।'

জয়ন্তী সমর বোসের সামনে এসে বলল, 'সে আমি বলে দেব। কিন্তু একটা কথা বল অশোক যা বলে তা সত্যি নয়। বলো। তুমি অন্তত আমাকে নিশ্চিন্ত করো।'

'তোমরা সবাই মিলে কি আমাকে পাগল করে তুলবে?'

'ওগো আমার বড়ো ভয় করছে। তোমার জন্য, টুকাই-এর জন্য। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

জয়ন্তী সমর বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে উঠল। 'যাই বললেই কি যাওয়া যায় জয়ন্তী? সম্ভব নয়, অত স্বাধীনতা আমার নেই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন সমর বোস।

(তের)

হোডাকসান শুরু হয়েছে। সমর বোস চেষ্টা করেও আটকাতে পারেন নি। গত এক সপ্তাহ ধরে নতুন ফরমুলা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট খুব খুশি। কাঁচামালের দাম এখন অনেক কম তাই লাভ প্রতি লাভ বেড়ে গেছে প্রচুর। জেনারেল ম্যানেজার নিজের ঘরে ডেকে প্রশংসা করেছেন সমর বোসকে। আরও একটা প্রোমোশনের দরজা খুলে যাচ্ছে এমন আভাষও দি- এম- দিয়েছেন সমর বোসকে। কিন্তু সমর বোস খুশি হতে পারছেন না। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি ওর বেড়েই চলেছে। অশোক বাংলো ছেড়ে চলে গেছে। জয়ন্তী ছবিয়ে ফেলেছে তার হাসিখুশি ভাবটা। টুকাই ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। সমর বোস ভাবছিলেন কীসের জন্য তাহলে এই চাকরি আর প্রোমোশন? মানুষ কি চায়?—অর্থ না পারিবারিক শান্তি? কোনটা বিসর্জন দিয়ে কোন-টা তিনি গ্রহণ করবেন?

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ল। কারখানার মধ্যে একটা কোলাহল। সমর বোস চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মিঃ পাণ্ডে কতকগুলো গ্যাস-মুখোশ হাতে এইদিকে দৌড়ে আসছেন চমকে উঠলেন সমর বোস। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মিঃ পাণ্ডে সমর বোসের হাতে একটা গ্যাস-মুখোশ দিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি পরে নিন স্যার। নতুন গ্যাস ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস লিক করতে শুরু করেছে।' বলেই কড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন মিঃ পাণ্ডে। হতভম্বের মত বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সমর বোস। কারখানার বিপদজ্ঞাপক এলার্ম বাজতে শুরু করেছে বীপ বীপ করে। সমর বোস আস্তে আস্তে গ্যাস মুখোশ পরে নিলেন। তারপর এগিয়ে চললেন, কারখানার ভিতরে যেখানে নতুন গ্যাস ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে সেই দিকে। মিঃ পাণ্ডে তার এ্যাসিসট্যান্টদের নিয়ে কাজে নেমে পড়েছেন।

'ভেন্ট ফোয়ারা চালু করে দাও।' মিঃ পাণ্ডে নির্দেশ দিলেন।

'চালু করা হয়েছে স্যার, কিন্তু মনে হচ্ছে গ্যাস আরো উপরে উঠে গেছে। ভেন্ট ফোয়ারার জল তত উচুতে উঠতে পারবে না' মিঃ পাণ্ডের সহকর্মী চিৎকার করে জবাব দিল।

মিঃ পাণ্ডে আবার নির্দেশ দিলেন, 'তাহলে স্ক্রাবার-এর ভিতর গ্যাস পাঠাবার ব্যবস্থা কর। গ্যাস তাহলে নির্বিষ হয়ে যাবে।'

'সারানোর জন্য স্ক্রাবার বন্ধ আছে, কাজ করছে না।' জবাব এল দ্রুত।

'তাহলে ক্রেয়ার টাওয়ারে গ্যাস পাঠাবার ব্যবস্থা কর। বিষাক্ত গ্যাসকে পুড়িয়ে নির্বিষ করতেই হবে।'

ক্রেয়ার টাওয়ারে গ্যাস পাঠানো যাবে না। জং ধরা পাইপ বদলানোর জন্য লাইন খোলা হয়েছে।'

'হা ভগবান।' মিঃ পাণ্ডের কণ্ঠস্বর তারী হয়ে এল 'এ পারিপাটি। আর এই গাফিলতির জন্য কি হবে কে জানে?'

সমর বোস চিৎকার করে উঠলেন এতক্ষণে, 'মিঃ পাণ্ডে নতুন ফরমুলায় তৈরি গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত। এবার গোটা শহরটা সত্যি সত্যি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হবে। মিঃ পাণ্ডে বাইরের বিপদজ্ঞাপক সাইরেন বাজিয়ে দিন যাতে শহরের মানুষ সাবধান হতে পারে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার, মৃত্যু ঘন্টাটা বাজিয়ে দেওয়াই ভাল। যাই সেই ঘন্টাটা বাজিয়ে দিয়ে আসি।' মিঃ পাণ্ডে ছুটে চলে গেলেন।

সমর বোস আর অপেক্ষা করলেন না, ছুটলেন বাঙলোর দিকে। টুকাই সোনা রয়েছে, জয়ন্তী রয়েছে। ওদের বাঁচাতেই হবে।

সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ হাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছে। কারখানার বাইরে আসতেই সমর বোসের চোখে পড়ল দলে দলে মানুষ পাগলের মত রাস্তায় ছুটছে। চলছে মাতালের মত আর চিৎকার করছে—'চোখ জ্বলে গেল, বুক ফেটে গেল'—সমর বোস একটু থমকে দাঁড়ালেন। এ কি দেখছেন উনি। চোখের সামনে মানুষগুলো বুক চেপে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ছে—আর মরছে। কেউ চোখ চেপে ধরে অন্ধের মত ঘুরছে। কারো মুখ দিয়ে গ্যাজলা পড়ছে। উঃ ভগবান! এ কি বীভৎস মৃত্যু! চারিদিক থেকে মানুষ উঠে আসছে রাস্তায়। সমর বোস আবার ছুটতে শুরু করলেন। বাঙলোর সামনে যখন পৌঁছুলেন তখন উনি একেবারে ক্লান্ত ক্লান্ত। হাঁফাচ্ছেন। বাইরের দরজার চাবি পকেট থেকে বের করে তড়াম করে দরজা খুলে চিৎকার করে উঠলেন সমর বোস—টুকাই—জয়ন্তী—।'

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল যন্ত্রণাকাতর গোঙানির শব্দ। সমর বোস ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। টুকাই মেঝের পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুটি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সমর বোস চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার টুকাই সোনা।'

সমর বোসের কণ্ঠস্বর টুকাই-এর কানে গেল। ও কোনরকমে বলল, 'বাপী··· আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে···। বিষ··· বাপি··· বিষ' স্তব্ধ হয়ে গেল টুকাই।

জয়ন্তী ততক্ষণে মেঝের হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছে সমর বোসের কাছে। কাদছে জয়ন্তী। দমবন্ধ করা কান্না। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলল জয়ন্তী, 'আমাকে··· একটু··· বাতাস দাও··· বাতাস।'

ঠিক সেই সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল অশোক, 'টুকাই, মিলি।' চিৎকার করে উঠল ও।

'অশোক, তোমার কথাই ঠিক হল ভাই। আজ আমি সব হারালাম।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সমর বোস।

'সমরদা এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়। শক্ত হোন। একুণি এদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ধরুন ধরুন।'

সমর বোস এগিয়ে গেলেন অশোককে সাহায্য করার জন্য।

উপসংহার

কালরাত্রির পর আবার ভোর হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠবে। কিন্তু কি দেখবে সূর্য: সমস্ত শহর জুড়ে যেন মৃত্যুর নীরবতা। কোথাও কোন শব্দ নেই এখন। রাস্তায়, ঘরে, হাসপাতালে হাজার হাজার মৃতদেহ। গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, পাখি, কিছুই রেহাই পায়নি বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে। শহরের গাছগুলো একেবারে ন্যাড়া। একরাতের মধ্যে গাছগুলোর সমস্ত পাতা ঝরে গেছে। ন্যাড়া গাছগুলো রচনা করেছে বীভৎস প্রেক্ষাপট এই মৃত্যুপুরী মহাশ্মশানের।

বিশ্বের মেট্রো-মানচিত্রে কলকাতা

দোলায়িত কলকাতা মেট্রো-যুগে পদার্পণ করল। ভবানীপুর-এসপ্ল্যানেড ও বেলগাছিয়া-দমদম এই দুটি সেকশনে শুরু হয়েছে মেট্রো চলাচল। প্রায় ১৫০০০ নিত্যযাত্রী নিচ্ছেন জামঝন্ঝনা থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস-যদিও বর্তমানে দৈনিক মাত্র ৪ থেকে ১ ঘণ্টা মেট্রো সার্ভিস চালু রয়েছে।

এক নবযুগের উন্মেষ ঘটেছে মহানগর কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থায়। কলকাতার মেট্রো রেল ভারতবর্ষে প্রথম এবং এশিয়াতে পঞ্চম।

পূরোদমে কাজ চলেছে এই প্রকল্পের অন্যান্য সেকশনেও। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে টালীগঞ্জ থেকে এসপ্ল্যানেড ও দমদম পৌঁছতে সময় নেবে যথাক্রমে ১৩ মিনিট ও ৩৩ মিনিট। ফলে এই রুটে বাঁচবে আপনাদের অমূল্য সময়-আসবে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

মেট্রো রেল-অগণিত মানুষের কাছে এক বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি

মেট্রো রেলওয়ে কলিকাতা
(ভারত সরকারের একটি প্রকল্প)

MR-8141

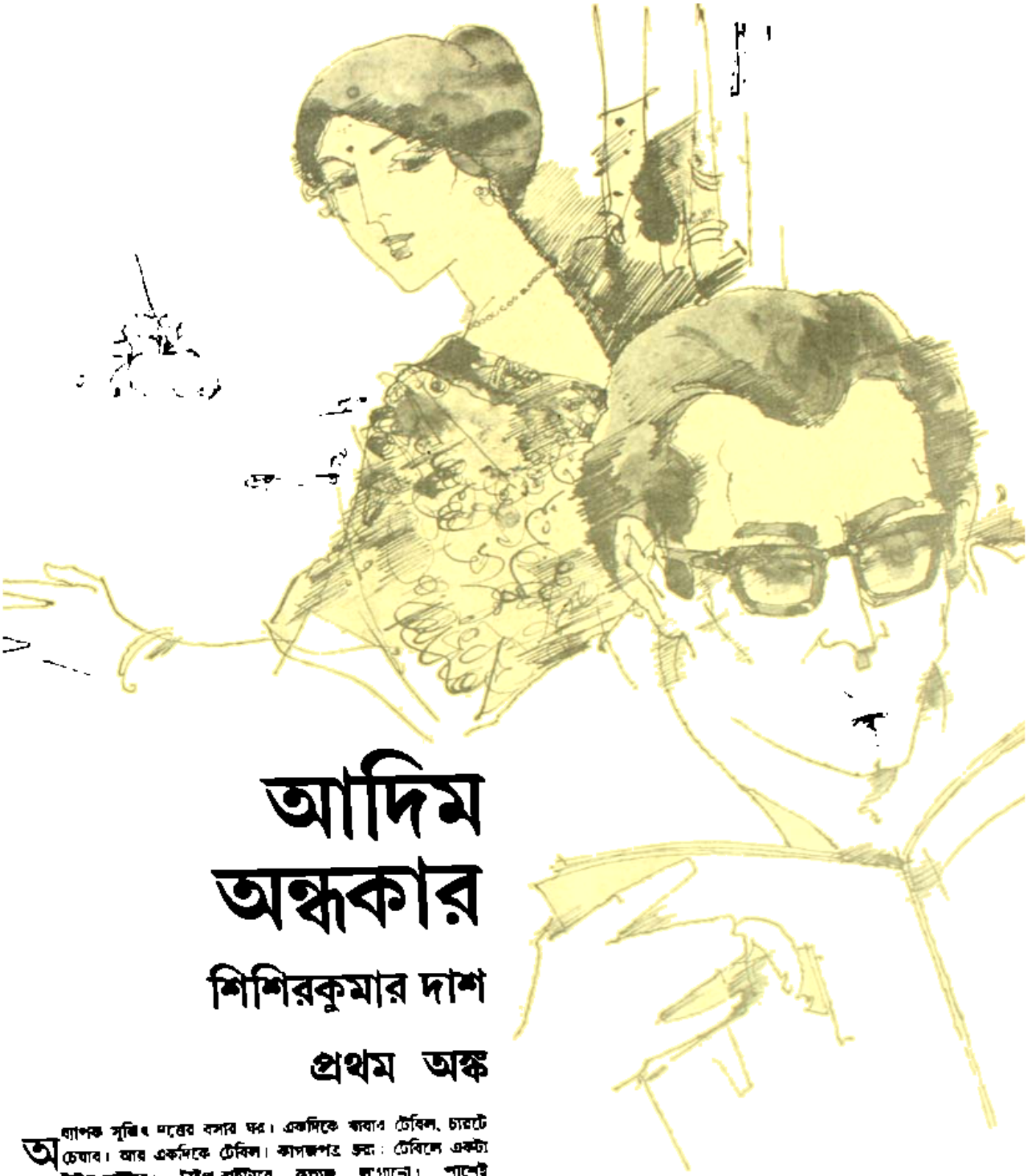

আদিম অন্ধকার

শিশিরকুমার দাশ

প্রথম অঙ্ক

অধ্যাপক সুজিৎ দত্তের বসার ঘর। একদিকে খাবার টেবিল, চারটে চেয়ার। আর একদিকে টেবিল। কাগজপত্র ভরা। টেবিলে একটা টাইপ-রাইটার। টাইপ-রাইটারে কাগজ লাগানো। পাশেই টেবিল-ল্যাম্প। টেবিলের পেছনে জানলা। জানলা দিয়ে দূরের বাড়িগুলো দেখা যায়। মঞ্চের বাঁদিকে শোবার ঘরে যাবার দরজা। তার পাশে আর একটা ঘর। খাবার টেবিলের পাশে রেফ্রিজারেটার। পড়ার টেবিলের এক কোণে নিচে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট। পাশে ছোট সেলফ—বই ভর্তি। এক কোণে টেলিফোন তার পাশেই একটা বুদ্ধ মূর্তি। মাঝখানে সোফা। সন্ধে হয়ে গেছে। সুজিৎ খাবার টেবিলে বসে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন

পড়ছে। তার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ-বত্রিশ। সুশ্রী, লম্বা। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। চোখে চশমা। একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির, তবে সাধারণত গুছিয়ে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে বসে আছে তার স্ত্রী কণিকা। সুজিতের চেয়ে দু-এক বছরের ছোট। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। কথাবার্তায় মিষ্টি। চড়া সুরে কথা বলে।

কণিকা। আমি যখন ছিলাম না তখন তাহলে এক্সসাইটমেন্ট-এর অভাব হয়নি?

সুজিৎ। (ম্যাগাজিন থেকে মুখ না তুলে) এক্সসাইটমেন্ট হ্যাঁ, এক্সসাইটমেন্টতো বটেই।

কণিকা। পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে আপত্তি আছে?

সুজিৎ। (ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে) আপত্তি? পুরো ব্যাপার আছেটা কি?

কণিকা। তোমার কাছে পুলিশ আসছে, পাড়া প্রতিবেশী ফুসুর-ফুসুর করছে, সান্যাল মশাইয়ের বাবা আসছে, এরপর হয়তো সান্যাল মশাই এসে হাজির হবেন, তারপর কে আসবে কে জানে। ব্যাপারটা কি?

সুজিৎ। কেন তো, পুরো ব্যাপারটা—যা তোমাকে তো মোটামুটি বলেছি। (একটু চুপ করে আবার বলে) সেদিন মনে পড়ছে-সন্ধে বেলা আমি বাড়ি ফিরে—না, ঠিক সন্ধে নয় একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল, সাড়ে আটটা হবে বোধহয়। আমার একটা লেখার ঐ যে সেন্সিমিয়ারের—তাড়া ছিল। শেষ করতে হবে। ব্রজন তাড়া দিচ্ছিল; বারবার—

কণিকা। সে জানি। তোমার লেখা নিয়ে ইন্টারেস্টেড নই—

সুজিৎ। সে আমিও জানি। তুমি ইন্টারেস্টেড কি সে?

কণিকা। আমি সত্যি ঘটনাটা জানতে চাই। অন্তত তোমার তোমার ভার্সনটা শুনতে চাই।

সুজিৎ। অন্যদের ভার্সনটা তাহলে শোনা হয়ে গেছে?

কণিকা। তোমার কথাটা তোমার মুখেই শোনা ভালো।

সুজিৎ। হুঁ। বেশ তো। তাই বলছিলাম—আমি ঐখানে বসে (পড়ার টেবিলটার দিকে দেখায়) লিখছিলাম—না, না, টাইপ করছিলাম—বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে—

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসে। পূর্ব প্রক্ষেপ বা ফ্লাশব্যাকে শুরু হয়। আস্তে আস্তে যখন আলো ফোটে তখন দেখা যায় সুজিৎ টাইপ করছে। ঘরে আর কেউ নেই। টাইপ করতে করতে কাগজটা টান করে ছিঁড়ে ফেলে। টাইপ রাইটারে আবার নতুন কাগজ ভরে। জানকীরাম জানলা বন্ধ করছে। টেবিলের ওপর এক কাপ কফি। ঘরের টেবিলে একটা ল্যাম্প। পড়ার টেবিলে টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে, ঘরের বাকি অংশ অন্ধকার। টেলিফোন বাজে। সুজিৎ বিরক্তির সঙ্গে উঠে টেলিফোন ধরে।

সুজিৎ। হ্যালো—হ্যাঁ—আমি—সুজিৎ। ও ব্রজন, তোর আমি—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐ লেখাটা নিয়েই ব্যস্ত। আজকে মনে করেছিলাম? না আমি ভেবে পাচ্ছি না। কী বিষয় বলছে, ইয়েস এ্যান্ড ইভিয়ান ট্রাডিশন হ্যাঁ, কথা তো সেই একই—একই কথা—ওয়েস্টার্ন মেয়েদের প্রগ্রেসিভ আলাদা। আমাদের আলাদা। আমাদের ট্রাডিশন, আমাদের—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই শেষ করতে পারব আশা করি, যদি না আবার কোনো কারণের হয়—কণিকা আশা করি কাল পরশু আসছে—না, না, সেরার ইজ নো রিজন আতঙ্কগ্রস্ত হবার—কণিকা একটু ইমপালসিভ, একটু হট্‌হেড, তাই—কেন—তোমাকে যে বলল—সে যে, যে প্রবলেম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কাল ইয়েসটেরডে নিয়ে সেই প্রেজেন্টেশন রেডি—হ্যা—হ্যা—আমরা ইয়েস প্রবলেম নিয়ে বেশ হাত বাড়াচ্ছি, আর তোমরা ইকনমিস্টরা তোমরাও তো পত্রটি নিয়ে অত্র অবধি বেশ প্রসপারাস হচ্ছ—হ্যা হ্যা হ্যা—আচ্ছা—(জানকীরামের দিকে) জানলাটা তালো করে বন্ধ করেছিস তো। না—না—এই জানকীরামকে বলছি—এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে—কণিকা ওর বাবাকে দেখতে গেছে—না, কোনো চিঠি দেয়নি। আচ্ছা—হ্যাঁ, এলো কাল পরশু। ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, গুডনাইট। (টেলিফোন রেখে দেয়) ও কফি এনেছিস। (জানকীরাম কফির কাপটা সুজিতের হাতে দেয়। সুজিৎ কফিতে চুমুক দেয়) থার্মোফ্লাস্কটা ভরে রেখেছিস তো? (সুজিৎ গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে)

জানকীরাম। কিছু খাবেন না?

সুজিৎ। না, আজ একেবারেই খিদে নেই দুপুরে লাঞ্চটা বেশি হয়ে গেছে। থার্মোফ্লাস্কটা ঠিক করে রাখিস, জানকীরাম। আলেসটা ভেঙেছে। এটা ভাঙলে তোমার মেমসাহেব আর রক্ষে রাখবে না।

জানকীরাম। মেমসাহেব কবে আসবেন?

সুজিৎ। আসবে এখন। তুই যা—শোবার ঘরের জানলা দুটো বন্ধ করেছিস তো? বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, না রে?

জানকীরাম। হ্যাঁ, সব বন্ধ করে দিয়েছি।

সুজিৎ। আচ্ছা, যা। আমি এখন কাজ করি।

জানকীরাম। আচ্ছা।

সুজিৎ। কী ব্যাপার? দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কী রে?

জানকীরাম। মেমসাহেব কবে আসবেন?

সুজিৎ। কেন? তোর কী অসুবিধে হচ্ছে?

জানকীরাম। না—অসুবিধা নয়—

সুজিৎ। তোর তো কাজই নেই। সিনেমা দেখতে পাচ্ছিস—কী সিনেমা দেখলি কাল?

জানকীরাম। কয়েকদিন যেতে যাব।

সুজিৎ। কেন? কেন? হল কি তোর?

জানকীরাম। একটু গাঁয়ে যেতে হবে—

সুজিৎ। কেন? বৌয়ের জন্য মন কেমন করছে? (টাইপ করতে শুরু করে সুজিৎ। জানকীরাম দাঁড়িয়ে থাকে) কী ব্যাপার রে? বৌয়ের অসুখ, না বাচ্চা হবে, না, ঘরে অসুখ? কী বলবি তাড়াহুড়ো করছিস তো? বলে ফেল।

জানকীরাম। আজ্ঞের বৌ পালিয়েছে, সাহেব।

সুজিৎ। (চমকে উঠে) পালিয়েছে? সে কী? তোর বাড়ির লোক—তোর মা মরমর করে?

জানকীরাম। তা করে বৈকি।

সুজিৎ। সে তো প্রায়ই হয়। তার জন্য পালাল। তা ফিরে আসবে—চিন্তা করিস না—ফিরে গিয়েই গেছে—ভাবিস না—

জানকীরাম। একজনের সঙ্গে পালিয়েছিল—

সুজিৎ। একজনের সঙ্গে। তুই এসব জানিস—

জানকীরাম। ঐ থেকে আবার এক চোরাতো তাই এসেছে সে বললে—

সুজিৎ। ও। তোমার পালিয়েছে জানতে পেরেছিস।

জানকীরাম। এখন ফিরে এসেছে।

সুজিৎ। এই বললি পালিয়েছে, এই বললি ফিরে এসেছে। ফিরে এল তো পালাল কী করে? কী বলছিস তুই। জানকীরাম, কেসটেন্স বলছিস না তো? মেমসাহেব কিছু জানতে পারলে—

জানকীরাম। যার সঙ্গে পালিয়েছিল সে ছেড়ে পালিয়েছে, তাই এখন

ফিরে এসেছে—

সুজিৎ ॥ রীতিমত গল্প যে রে—তা ফিরে এসেছে শেষ পর্যন্ত।

জানকীরাম ॥ কিন্তু এখন বাড়িতে কেউ ওকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

সুজিৎ ॥ তাতো দেবেই না! তোর বাড়িতে কে আছে—তোর মা, তোর কাকা—

জানকীরাম ॥ আসলে গাঁয়ের লোক, পঞ্চায়েৎ—

সুজিৎ ॥ তা এখন তাহলে কী করবি?

জানকীরাম ॥ বিচার হবে। ফয়সালা যা হয়—

সুজিৎ ॥ পঞ্চায়েৎ যা বলবে তুই মেনে নিবি? ধর, ওরা যদি বলে তোর বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না, তাহলে তুই?

জানকীরাম ॥ এ তো শহর নয়, সাহেব। এ যে গাঁ। পঞ্চায়েৎ যা বলবে তার ওপর কথা বলা মুশকিল।

সুজিৎ ॥ আর ধর তোর বৌ যদি সত্যি সত্যি কারো সঙ্গে পালিয়েই গিয়ে থাকে—সেটা জানার পর তুই কী করবি? (জানকীরাম চুপ করে থাকে) তোর বৌর স্বভাব চরিত্তির কেমন রে?

জানকীরাম ॥ গাঁয়ে আমার অনেক দুশমন আছে। তাদের কেউ বোধহয়—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) তবে মেয়েমানুষ তো কিছু বলা যায় না।

সুজিৎ ॥ বটে! মেয়েমানুষকে তুই পুরোটি বিশ্বাস করিস না মনে হচ্ছে। (একটু চুপ করে থেকে) যা, তুই এখন যা—ওরে পড়। ঠিক আছে গাঁয়ে যেতে চাস যাবি। কবে যাবি?

জানকীরাম ॥ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সুজিৎ ॥ আচ্ছা। কাল দেখা যাবে এখন। তুই যা। (কাপটা এগিয়ে দিয়ে) এটা রেখে দে। (জানকীরাম কাপটা দ্বিতীয় ঘরের ভেতরে রেখে আসে।)

সুজিৎ আবার টাইপ শুরু করে। জানকীরাম আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় দরজা দিয়ে। সুজিৎ একটা কাইল মেলে। তারপর নিজের মনে মনে বলে সেল কোথায়? যেটি খুঁজব সেটিই পাব না কাজের সময়। জানকীরাম—ওঃ ও কি করবে? সেট মি সী।

সুজিৎ ঘরের ভেতর যায়। এই সময় দ্রুতবেগে কমলা ঘরে ঢোকে। কমলার আমাকে পড় আলুথালু, ভেজা। খুবই ভয়ার্ত। ঢুকেই বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। রেফ্রিজারেটার আর টেলিফোনের মাঝামাঝি জায়গাটায় দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে টেবল-ল্যাম্প ছাড়া আর কোনও আলো নেই। সুজিৎ ঘরের ভেতর থেকে একটা বই হাতে বেরিয়ে আসে। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বইটা খুলতে খুলতে হঠাৎ চোখ পড়ে কমলার দিকে। সুজিৎ ভয়ে দু পা পিছিয়ে যায়। বইটা হাত থেকে পড়ে যেতে যায়। হাতের কাছে একটা ফাউন্টেন পেন দেখতে পেয়ে সুজিৎ সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়তে চায় কমলার দিকে—ভয়ার্ত স্বরে বলে—

কে? কি চাই, কি চাই? কি চাই তোমার? কে?

কমলা ॥ আমি? কিছু চাই না।

সুজিৎ ॥ আমার কাছে কিছু নেই। কোনো টাকা পয়সা কিছু নেই।

কমলা ॥ আপনি ভয় পাবেন না।

সুজিৎ ॥ আমি ভয় পাব কেন? আমি— আমি পুলিশ ডাকব। বেরিয়ে যাও এখন থেকে।

কমলা ॥ আমি চোর ডাকাত নই।

সুজিৎ ॥ তবে তুমি কে? তুমি কি? এখানে কি চাই?

কমলা ॥ আমি খুবই বিপন্ন।

সুজিৎ ॥ আমিও। তোমার কাছে পিস্তল-টিস্তল আছে বোধহয়—

কমলা ॥ আমার কাছে কোনো পিস্তল নেই। এই দেখুন (কমলা দুটো হাত দেখায়। সুজিৎ কমলার দিকে তাকায়। কমলা চাদরটা দিয়ে গা-টা ঢাকার চেষ্টা করে।

সুজিৎ ॥ ওঃ (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এতক্ষণ পরে কমলার দিকে তাকায়। কমলা ঘুরে দাঁড়ায়) তাহলে—তুমি—মানে আপনি এখানে কেন এসেছেন?

কমলা ॥ আমি আশ্রয় চাই।

সুজিৎ ॥ আশ্রয়? আপনাকে আশ্রয়? (দরজার দিকে তাকায়) আপনি কোথা দিয়ে এলেন? পাইপ বেয়ে? দরজাটা তো বন্ধ!

কমলা ॥ আমি এই দরজা দিয়েই ঢুকেছি। দরজা খোলা ছিল।

সুজিৎ ॥ খোলা—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। জানকীরাম ব্যাটা চলে যাবার পর—তার আপনি ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, হ্যাঁ! তা এখানে—

কমলা ॥ আমি কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় চাই।

সুজিৎ ॥ এটা আপনাদের নতুন কায়দা নয়তো?

কমলা ॥ কায়দা?

সুজিৎ ॥ (মহিলাটির দুরভিসন্ধি ধরে ফেলেছে এমন ভাব দেখিয়ে) ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন? ঢোকার আগে 'নক' করেন নি কেন? আমাকে ঘায়েল করে সহজে—

কমলা ॥ আমার অভদ্রতা ক্ষমা করবেন। এই মুহূর্তে আমার ভদ্রতা—অভদ্রতা জ্ঞান নেই। আমি বিপদে পড়েছি।

সুজিৎ ॥ বা! অভিনয় ভালোই করেন কিন্তু আপনারা! এখন অনুগ্রহ করে যান। (দরজাটা খুলতে যায়)

কমলা ॥ অভিনয় নয় বিশ্বাস করুন। আপনি চেঁচামেচি করবেন না। দরজা খুলবেন না। ওরা এসে পড়বে।

সুজিৎ ॥ ওরা? ওরা কারা?

কমলা ॥ আমাকে একটু স্থির হতে দিন। আপনি উত্তেজিত হবেন না। (কমলা একটা চেয়ারে বসে পড়ে) আমি চোর নই, ডাকাত নই। আমি আপনাকে ঠকাতে আসি নি।

সুজিৎ ॥ (এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসে) ঠিক আছে, আপনি চোর ডাকাত নন, খুনী কিছুও নন—কিন্তু এখানে এসেছেন কেন? আপনি আমাকে কি ভেবেছেন?

কমলা ॥ আমাকে গুণ্ডা তাড়া করেছে।

সুজিৎ ॥ (ভয় পেয়ে) গুণ্ডা? আপনাকে?

কমলা ॥ হ্যাঁ। আমাকে।

সুজিৎ ॥ এখানে? এ পাড়ায়? ভদ্রলোকের বাস এখানে, এখানে—

কমলা ॥ এক গ্লাস জল।

সুজিৎ ॥ জল? আপনি জল চান? (একটু দ্বিধা করে, জল দেবে কিনা) জল, ঐ তো (কমলা উঠতে যায়) আমি দিচ্ছি—নিশ্চয়ই, জল—(সুজিৎ ঘরের ভেতরে যায়, কমলা উঠে দাঁড়িয়ে তার শাড়ি ঠিক করে। অন্ধকারে তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। গায়ের চাদরটা পা পর্যন্ত ঝুলে থাকে। সুজিৎ জল নিয়ে আসে) এই-যে-জল—

কমলা ॥ (জল খায়) আঃ! (চেয়ারে বসে)

সুজিৎ ॥ বসবেন। বসুন। কিন্তু গুণ্ডা—

কমলা ॥ আমি সামনের বাড়িটায় থাকি।

সুজিৎ ॥ তাহলে এ বাড়িতে হঠাৎ—

কমলা ॥ আমাকে মেরে ফেলবে।

সুজিৎ ॥ কে আপনাকে মেরে ফেলবে? ও গুণ্ডা? আমি দেখছি, এসব চলবে না এ পাড়ায়।

কমলা ॥ প্লিজ দরজা খুলবেন না।

সুজিৎ ॥ (জানলার কাছে গিয়ে) কেউ কোথাও নেই রাস্তায়। অবশ্য অন্ধকার আছে—বৃষ্টি থেমে গেছে। দাঁড়ান, পুলিশে খবর দিচ্ছি।

কমলা ॥ না, না, পুলিশে খবর দেবেন না।

সুজিৎ ॥ পুলিশের নামে ভয় পাচ্ছেন কেন? ঠিক করে বলুন আপনি কে? ভাববেন না আমি দুর্বল লোক।

কমলা ॥ আমাকে একটু স্থির হতে দিন। আমি জীবন ভামেলায় পড়েছি।

সুজিৎ ॥ দেখুন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। আপনি যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে—লিস ইজ এ বং প্লেস। এটা ভুল জায়গায় এসেছেন। আমি সে ধরনের লোক নই।

কমলা ॥ (আহত স্বরে) অন্যায়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আপনার ধারণা খোলা ছিল। আপনি কেমন লোক তা জানার সুযোগ ছিল না। আপনি যা ভাবছেন আমিও তা নই।

সুজিৎ ॥ কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?

কমলা ॥ আত্মরক্ষা।

সুজিৎ ॥ কিন্তু আপনি—পুলিশে খবর দেবেন না, দরজা খুলে কাউকে ডাকতে দেবেন না। থাকবে, চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

কমলা ॥ না, না।

সুজিৎ ॥ মানে? আপনি বাড়ি যেতে চান না।

কমলা ॥ (নিম্ন স্বরে) না। আর না।

সুজিৎ ॥ শুনুন, এখানে কোথাও কোনো গুণ্ডা নেই—

কমলা ॥ আপনি ওদের চেনেন না—

সুজিৎ ॥ না, গুণ্ডাদের চেনার ব্যাপারে আমি অবশ্য তেমন এক্সপার্ট নই। আপনি চেনেন তো? (কমলা মাথা নাড়ে) তাহলে তো সমস্যাই নেই। পুলিশে রিপোর্ট করুন—ওরা খুবই হেলপফুল)।

কমলা ॥ ওদের ছুতেই পুলিশ।

সুজিৎ ॥ আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনাকে ইটালিয়ান মাফিয়ারা তাড়া করেছে। কি চায় ঐ গুণ্ডারা?

কমলা ॥ আমার জীবন?

সুজিৎ ॥ আপনার জীবন? মানে লাইফ? আপনার লাইফ খুব ভালুয়েবল্ মনে হচ্ছে?

কমলা ॥ কেন আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই?

সুজিৎ ॥ (একটু অপ্রস্তুত হয়ে) না, না। আই মীন আপনি এমন নাটকীয়ভাবে বললেন যেন আপনি কোনো রাজনৈতিক নেতা—যা-যা কোনো স্পাই—

কমলা ॥ না, আমি কোনো নেতা নই, স্পাইও নই।

সুজিৎ ॥ তাহলে ভয় কি? দেখুন, আমি একটু ব্যস্ত—আজকে একটা কাজ শেষ করতে হবে। কাজেই আপনি ভয় যখন পেয়েছেনই, তখন আপনাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। একটা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি নেওয়া ভালো, কি বলেন?

কমলা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ পড়ে যায়। সুজিৎ কাছে এগিয়ে যায়।

কি হল?

কমলা ॥ না, কিছুই না! হঠাৎ মাথাটা—। না বাড়ি ফিরলেই আমাকে মেরে ফেলবে।

সুজিৎ ॥ বাড়ি ফিরলেই মেরে ফেলবে? এত রাত্রে (ঘড়ি দেখে) আপনি রাস্তায় একা কী করছিলেন?

কমলা ॥ আমি রাস্তায় ছিলাম না, বাড়িতেই ছিলাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

সুজিৎ ॥ বাড়ি থেকে পালিয়ে—(ঘড়ি দেখে) এত রাত্রে। হোয়াটস্ মি আইডিয়া? আপনি কি পাগল?

কমলা ॥ লোকে তাই বলবে।

সুজিৎ ॥ (স্বগত) সাইকোলজিক্যাল কেস নয় তো? (কমলাকে) আপনি কি বাড়িতে ঘুমুচ্ছিলেন?

কমলা ॥ না। জেগেই ছিলাম।

সুজিত ॥ (স্বগত) গ্রীপ-ওয়ার্কিং-টোয়ার্কিং হবে।

কমলা ॥ না, আমি সচেতন ভাবেই (কমলার গলা ধরে আসে, একটা শোঁড়ানি শোনা যায়। সুজিৎ জল দেয় যায়)।

সুজিৎ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি রিলায় করুন—রিলায় বসে থাকুন। বসে থাকুন, উঠবেন না, রিলায়, রিলায়। জল—জানালায় জল থাকে জল, আই মীন ওয়াটার—

কমলা ॥ আপনার দোহাই, আপনি ঠেচামেচি করবেন না।

সুজিৎ ॥ জল! জল খাবেন?

কমলা ॥ আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই।

সুজিৎ ॥ না, না, আগে যা ভেবেছিলাম আপনি তা নন বুঝতে পারছি।

কমলা ॥ এখন ও যা ভাবছে, আমি তাও নই।

সুজিৎ ॥ মানে?

কমলা ॥ আমি পাগল নই।

সুজিৎ ॥ না, না, আপনি পাগল হতে যাবেন কেন? পাগলরা কি মধ্য রাতে কলের মধ্যে নিজের বাড়িতে গুণ্ডা আছে ভেবে অন্যের বাড়িতে ঢুকে পড়ে? না, আপনি পাগল নন।

কমলা ॥ না, পাগলই। তা না হলে ঘুরতে এক অচেনা অজানা লোকের বাড়িতে কে আসে? আপনি তাড়াতে চাইছেন, অথচ অপমান সহ্য করে বসে আছি। পাগলই তো।

সুজিৎ ॥ আপনি এক্সসাইটেড হবেন না। বুঝতে পারছি খুবই সিরিয়াস ব্যাপার। রিলায় করুন। একটু কফি, খাবেন? কফি? তৈরি আছে!

কমলা ॥ আমার কিছু দরকার নেই। এখন মৃত্যু ছাড়া—

সুজিৎ ॥ (কার্মোফ্লাস থেকে কফি ঢালতে ঢালতে) সে সব পরে হবে। এখন কফি খান—এই যে নিন, গুড কফি—খাবেন না, খাবেন না, ঠিক আছে, ঠিক আছে; রিলায় করুন (সুজিৎ কমলাকে পাগল ভেবে নিজেই নার্ভাস হয়ে গেছে বোঝা যায়) হ্যাঁ, ঐ যে গুণ্ডাদের কথা বলছিলেন (কফিতে চুমুক দেয়)—তা আপনি এ সময় হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কেন?

কমলা ॥ আমি রাস্তায় ছিলাম না। আপনাকে তো বলেছি।

সুজিৎ ॥ (হেসে) তবে কি বাড়ির মধ্যেই আপনাকে কেউ আটাক করেছিল?

কমলা ॥ হ্যাঁ, বাড়ির মধ্যেই।

সুজিৎ ॥ (স্বগত) অ্যাবনর্মালিটিজলি স্যাড। (কমলার থেকে একটু দূরে গিয়ে) বাড়ির মধ্যেই? এরকম কতদিন ধরে দেখছেন? প্রায়ই দেখেন, তাই না?

কমলা ॥ হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে।

সুজিৎ ॥ (ডাক্তারের ভঙ্গিতে) দেখুন, একেই বলা হয় হ্যালিউসিনেশন। মানে Perception of objects with no reality. Usually arising out from a disorder of nervous system—বুঝতে পেরেছেন? এই যে গুণ্ডা আটাক করছে। আপনার জীবন, মানে লাইফ, চাইছে, এটা আসলে মনের ভুল। রিলায়-রিলায়। গুণ্ডা কি বাড়ির মধ্যে আছে? সে তো রাস্তায়।

কমলা ॥ অথচ একটু আগেই ভেবেছিলেন আপনার বাড়ির মধ্যেই চোর বা ডাকাত, পিস্তল নিয়ে—

সুজিৎ ॥ ওয়েল, ম্যাটস্ মিসলিডেন্ট। আমি আপনাকে এখানে এক্সপেক্ট করিনি। ভেবেছিলাম চোর। ম্যাটি ওয়াজ এ মিস আন্ডারস্টান্ডিং। কিন্তু যদি রোজ আমি দেখি আমার ঘরে একজন মহিলা পিস্তল হাতে ঢুকছে এবং আমার

জীবন, মানে লাইফ, চাইছে, তাহলে তাকে বলব হ্যালিউসিনেশান। আপনি বাড়িতে আছেন। বাড়ি মানে একটা নিরাপদ জায়গা, আপনার চারপাশে কেউ না কেউ আছেন—আমি জানি না কারা—তবু ধরা যাক, আপনার স্বামী, হয়তো দেওর, হয়তো আপনার শাশুড়ি, বিধবা শাশুড়ি।।

কমলা ॥ আমার শ্বশুর জীবিত।

সুজিৎ ॥ ও, আই অ্যাম সরি। বেঁচে থাকুন, বেঁচে থাকুন। হ্যাঁ, এই যে পরিবেশ—এর জন্যে গুণ্ডার ছদ্ম কোথায়? রাস্তায় গুণ্ডা থাকতে পারে, কিন্তু বাড়িতে? যদি না হলেন যে, আপনার স্বামীই আপনাকে মারতে চান। কিংবা আপনার বিধবা শাশুড়ি—আই অ্যাম সরি, আপনার শ্বশুর যিনি আপোতভাবেই জীবিত এবাই গুণ্ডা। এটা একটা লজিকাল অ্যাবসার্ডিটি।

কমলা ॥ আপনি খুবই লজিকাল?

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ?

কমলা ॥ আপনি যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত তার বাইরে কিছু যে ঘটতে পারে তা বোধহয় মনে করেন না?

সুজিৎ ॥ মানে, লজিকাল ওয়ার্ল্ডের বাইরে—মানে সুপারন্যাচারাল? মানে ভূত, প্রেতের কথা বলছেন?

কমলা ॥ না, মানুষের কথা বলছি।

সুজিৎ ॥ মানে বলতে চাইছেন যে ওটা হ্যালিউসিনেশান নয়। (জানলার ধারে গিয়ে সুজিৎ দাঁড়ায়) ঐ যে বাড়িটা সান্যাল মানাইয়ে—আপনি কি ঐদিকে থাকেন?

কমলা ॥ ওটাই আমাদের বাড়ি।

সুজিৎ ॥ আই সী! বাড়িতে আলো জ্বলছে। বেশ লোকজন দেখছি—পুলিশ-টুলিশ নয়তো।

কমলা ॥ আমাকে খুঁজছে।

সুজিৎ ॥ আপনাকে খোঁজাটা স্বাভাবিক। নর্মাল—

কমলা ॥ খুবই নর্মাল। এক সময় সতীদাহ খুব নর্মাল ছিল। বিধবা বৌ বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত, সবাই তাকে খুঁজে খুঁজে, ঢোল কাঁসর বাজিয়ে চিতায় তুলে দিত। খুবই নর্মাল ছিল। ছিল না?

সুজিৎ ॥ এর মধ্যে সতীদাহ-টাহ আসছে কেন? সে তো বারবারিক প্রকটিস—

কমলা ॥ কিন্তু একদিন সেটা খুবই নর্মাল মনে হত অসংখ্য পুরুষের কাছে—

সুজিৎ ॥ মানলাম। কিন্তু আপনাকে তো আর সতীদাহ—

কমলা ॥ আপনি কি সেটা জানেন?

সুজিৎ হঠাৎ চমকে ওঠে। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। এতক্ষণ যে নার্ভাস ভাব ছিল সেটা যেন কেটে যায়।

সুজিৎ ॥ আপনি কি সান্যাল, মানে নিরঞ্জন সান্যালের স্ত্রী?

কমলা ॥ হ্যাঁ। আপনি চেনেন ওঁকে?

সুজিৎ ॥ অনেকদিন আগে আলাপ হয়েছিল। যোগাযোগ নেই। আপনি কি কোথাও কাজ করেন?

কমলা ॥ একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে।

সুজিৎ ॥ মানে আপনি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন।

কমলা ॥ অনেকটাই।

সুজিৎ ॥ রাত্রি অনেক হল। এবার আপনার বাড়ির মধ্যেই প্রফেসারদের রহস্যটা একটু খোলসা করে বলবেন?

কমলা ॥ আমাকে বেশি প্রশ্ন করবেন না। শুধু আজকে রাত এখানে থাকতে দিন।

সুজিৎ ॥ বুঝতে পারছি আপনি বিপদে পড়েছেন—কী বিপদ আমাকে বলছেন না। আমি আপনার জানছি, পুলিশের সাহায্য চান।

কমলা ॥ পুলিশ কিছু করতে পারবে না। আমার স্বামীর ক্ষমতা অনেক। রাজনৈতিক ক্ষমতা।

সুজিৎ ॥ জানি। বাড়িতে কারা আছেন?

কমলা ॥ শ্বশুর, শাশুড়ি। কেউ আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নন।

সুজিৎ ॥ ডাউরি?

কমলা ॥ (ম্লান হেসে) থাক, আপনি অন্তত ডাউরি ঘটিত ব্যাপারটা জানেন। আপনি জানেন যে ঘরের মধ্যেই একটি মেয়ে খুন হতে পারে, খুনীরা ঘরের মধ্যেই থাকেন।

সুজিৎ ॥ আপনার যদি সেই কেস হয়, তাহলে পুলিশের কাছে যাওয়া—

কমলা ॥ পুলিশের ওপর আপনার অগাধ বিশ্বাস। না, এটা ডাউরির ব্যাপার নয়।

সুজিৎ ॥(হতাশ হয়ে) ও, তাহলে—আপনাদের অন্য ব্যাপার।

কমলা ॥ হ্যাঁ।

সুজিৎ ॥ সেক্ষেত্র ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই অকওয়ার্ড। আপনি স্বামীর ভয়ে বা শ্বশুর-শাশুড়ির ভয়ে বা বাড়ির অন্য কাজে—আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো—কারো ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে এখানে পালিয়ে এসেছেন। আপনি আমাকে চেনেন।

কমলা ॥ অনেকদিন আগে আপনি আমাদের কলেজে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। আপনার নাম শুনেছি।

সুজিৎ ॥(গর্বের সঙ্গে) গ্লাড টু হিউ। কিন্তু—আমাকে আপনার ভয় করছে না?

কমলা ঃ না, এখন আর কথা নয়।

সুজিৎ ঃ (অস্বস্তিতে) আমিও তো আপনার ক্ষতি করতে পারি।

কমলা ঃ পারেন।

সুজিৎ ঃ তাহলে, কী ভরসায় এসেছেন?

কমলা ঃ ভেবেচিন্তে আসিনি।

সুজিৎ ঃ আপনি বরং আপনার বাড়ি, মা, ভাই—

কমলা ঃ ভেবে পাবলে ভেতাম।

সুজিৎ ঃ (সহানুভূতির সুরে) কেউ নেই? না!

কমলা ঃ সবাই আছেন। আমি ভেবে চাই না।

সুজিৎ ঃ (ভেবে) ভেবে চান না। অচেনা একজন অপরিচিত পুরুষের কাছে আসতে পারেন?

কমলা ঃ একজনকে একরাত্রির জন্য আশ্রয় দেবার সাহস যদি আপনার না থাকে—

সুজিৎ ঃ এর মধ্যে সাহসের প্রশ্ন উঠছে কোথায়?

কমলা ঃ তবে কিসের প্রশ্ন? কোনো পুরুষ যদি বিপদে পড়ে আশ্রয় চাইতে আসত, কি করতেন?

সুজিৎ ঃ তখনও দ্বিধা হত।

কমলা ঃ দ্বিধা হত, ভাবতেন চোর, ঠক। কিন্তু যদি বুঝতেন যে সত্যি সে বিপদে পড়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত না বলতেন না: আমাকে না বলছেন কমলা আমি মেয়ে।

সুজিৎ ঃ (অস্বস্তির সঙ্গে) ঠিকই। সমস্যা আছে। মেয়েকে কি বলবে, আপনার স্বামী জানলে কি বলবে। আমি—

কমলা ঃ একজন অচেনা পুরুষ এইভাবে এলে তাকে চোর ভাবতেন, ঠক ভাবতেন। কিন্তু আমাকে আপনি আরও কিছু, ভেবেছিলেন। কমলা আমি মেয়ে।

সুজিৎ ঃ ক্ষমা করবেন। এটা আমাদের সমাজের, এইরকম হয়ে থাকে। আপনি ভালো করেই জানেন মেয়েকে আমাকে কী বলতে পারে। আমি একজন অধ্যাপক। আমি শুক্ষিত। আপনি শুধু নিজের ওখাটা ভাবছেন। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না।

কমলা ঃ ব্যাপারটার গুরুত্ব? বুঝতে পারছি আপনি ভয় পাচ্ছেন। ভয়টা আমাকে নিয়ে নয়, আপনাকে নিয়েও নয়। আপনি এতক্ষণে বুঝেছেন যে আমি সহজ উপায়ে টাকা উপার্জন করতে বেরোইনি। আর আমিও জানি যে আপনি সুযোগ পেয়েছেন বলেই আমাকে ফেলনা মনে করবেন না। আসল ব্যাপার হল সম্ভ্রম। কোনো নারী পুরুষ কোনো অবস্থাতেই একসঙ্গে থাকতে পারে না। এইটেই নিয়ম। সেই নিয়মটাকেই আপনার ভয়।

সুজিৎ ঃ নিয়মটা আপনি বুঝি মানেন না? না, মানা উচিত নয়?

কমলা ঃ জানি না। আজ হঠাৎ মৃত্যু আমাকে এমনভাবে ভয় দেখিয়েছে যে, ঐ নিয়মটা ভাঙতে সাহস পাচ্ছি। আমি আপনার কাছে এসেছি—একজন মানুষ যেভাবে আর একজন মানুষের কাছে আসে। আমি একজন মানুষ, শুধু মেয়েমানুষ নই।

সুজিৎ ঃ আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু আপনি কি কাল কাগজ কাগজে খুন দেখতে পারবেন?

কমলা ঃ আপনি পারবেন না?

সুজিৎ ঃ আপনি আমাকে বিপদে ফেলছেন, আপনার স্বামী—আমার স্ত্রী—(হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে) আমার স্ত্রী হয়তো—

কমলা ঃ হয়তো, আপনার স্ত্রী বুঝতে পারবেন কী দুঃখে, কী যন্ত্রণায় আমি এখানে এসেছি। হয়তো তিনি তাঁর স্বামীর জন্য গর্ব বোধ করবেন।

সুজিৎ ঃ আপনার ভাই থাকেন?

কমলা ঃ জানি না।

সুজিৎ ঃ দেখুন, বোধ হয় একটা উত্তেজনার আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। দেখে হয়তো আবার সেখানেই ফিরবেন, মনে অনেকেই তাই করে। তাই বলছি এখনই ফিরে যান। আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আপনার স্বামী বা আই ডোন্ট নো হু, তার সঙ্গে আপনার মিস্‌আন্ডারস্ট্যান্ডিং—তাঁরা হয়তো উত্তেজনার মাথায় কিছু বলেছেন বা করেছেন—এখন তাঁরা হয়তো রিপেন্সটেন্ট। হয়তো, হয়তো—

কমলা ঃ কেন, আপনাকে আর বিপন্ন করব না।

সুজিৎ ঃ শুনুন। আপনার ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটাই ঠিক।

কমলা ঃ ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। আর সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে যে ঠিক করেছি তা কী করে জানলেন। আমি শুধু আপনাকে আর বিপন্ন করতে চাই না। আমার জন্য আপনি কেন আপনার সম্ভ্রম নষ্ট করবেন।

সুজিৎ ঃ (আহত স্বরে) শুধু আমার সম্ভ্রম? আপনার নয়?

কমলা ঃ সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যই তো বেরিয়ে পড়েছি।

সুজিৎ ঃ কেন বুঝতে পারছেন না, আমরা কেউ স্বাধীন নই। আমরা বাঁধা, সংসারে বাঁধা, সমাজের নিয়মে বাঁধা। আপনি যে নারী, আমি যে পুরুষ এ অবস্থায় সবাই একটাই সিদ্ধান্ত নেবে। সবাই। আমার বন্ধু-বান্ধব, আপনার স্বামী, আমার স্ত্রী।

কমলা ঃ আর সেটা মিথ্যে হলেও আপনি তার প্রতিবাদ করবার সাহস করবেন না

বাইরের দরজায় শব্দ। সুজিৎ একটু চমকিত ও শঙ্কিত। কমলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে জানকীরামের গলা শোনা যায়।

সুজিৎ ঃ কে? জানকীরাম? কী চাই। (বাইরে থেকে জানকীরামের কণ্ঠস্বর: "সান্যালবাবুর বাড়ি থেকে লোক এসেছে। দেখা করতে চাইছিল।" সুজিৎ দরজা খোলে) কী চাই?

লোকটা থেকে ঃ কিছু মনে করবেন না। সান্যাল সাহেবের স্ত্রী কিছুক্ষণ ধরে মাথার রোগে ভুগছেন।

সুজিৎ ঃ তা এখানে কেন?

লোকটা থেকে ঃ তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে এইদিকে কোনো বাড়িতে নাকি এসেছেন। আমরা খোঁজ করছিলাম। মাথার রোগী কি না।

সুজিৎ ঃ না, এখানে কেউ আসেনি। (দরজা বন্ধ করতে যায় কিন্তু জানকীরাম ঢুকে পড়ে। কমলাকে দেখতে পায় না বা দেখলেও দেখেছে এমন ভাব করে না।)

জানকীরাম ঃ সাহেব, সান্যালবাবুর বৌ বাথরুমে ঢুকে পালিয়েছে।

সুজিৎ ঃ তুই জানলি—

জানকীরাম ঃ সান্যালবাবুর চাকর বললে। ওরা খুঁজছে। পাগল যে। আপনি দেখে আছেন?

সুজিৎ ঃ চুপ। আচ্ছা, তুই যা। (জানকীরাম চলে যায়)।

সুজিৎ দরজা বন্ধ করে। কমলা সুজিতের দিকে তাকায়। কিছু বলতে চায় কিন্তু বলে না।

আপনি ওই ঘরের ভেতরে শুয়ে পড়ুন। আমি আমার কাজটা শেষ করি।

সুজিৎ টাইপরাইটারের দিকে এগোয়। রাস্তা দিয়ে একটা বড় গাড়ি আসার শব্দ শোনা যায়। কমলা অস্থির হয়ে আসে।

সকালবেলার খবরের কাগজটা জানকীরাম ডেকে ডেকে তুলে টেবিলের ওপর রাখে। সুজিৎ খবরের কাগজটা তোলে। জানকীরাম খবার টেবিল থেকে গত রাত্রির ফাঁকির কাপ নিয়ে ভেতরে যায়। সুজিৎ চুপ করে বসে থাকে। জানকীরাম শোবার ঘরে ঢুকতে যায়। বিছানা গোছাবে।

সুজিৎ ॥ ওখানে ঢুকিস না।

জানকীরাম ॥ ঘর সাফ করব না!

সুজিৎ ॥ না, দরকার নেই। ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

জানকীরাম ॥ (অবাক হয়ে) মেমসাহেব এসে গেছেন? খুব ভোরে বুঝি? আমি তো টের পাইনি। আপনি যে বললেন দু একদিন—

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ। না-না। মেমসাহেব নয়—

জানকীরাম ॥ আপনি যে বললেন, ঘুমুচ্ছেন।

সুজিৎ ॥ না, না। এখন ঘর সাফ করতে হবে না। এখন লোক আসবে এখানে—ঐ তো এসে গেছেন।

ইনস্পেক্টর চতুর্বেদীর প্রবেশ। লম্বা, মজবুত শরীর। চটপটে স্বভাব। কথা বলার ভঙ্গি দৃঢ়।

চতুর্বেদী ॥ আপনি প্রফেসার দত্ত? আমি ইনস্পেক্টর চতুর্বেদী।

সুজিৎ ॥ বসুন। বসুন। জানকীরাম চা কর তাড়াতাড়ি। চা খাবেন তো?

চতুর্বেদী ॥ না। আমার তাড়া আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার ফোন পেয়ে খবরটা নিতে এলাম—

সুজিৎ ॥ থ্যাঙ্ক ইউ। আচ্ছা তুই যা। জানকীরাম চলে যায়।

চতুর্বেদী ॥ আপনার ফোন পাবার আগে আমরা একটা ফোন পাই সান্যাল সাহেবের বাড়ি থেকে। সান্যাল সাহেবকে চেনেন তো?

সুজিৎ ॥ নাম শুনেছি।

চতুর্বেদী ॥ বোধহয় তাঁর বাড়ির কেউ—আই মিন হিজ ফ্রেন্ড—ফোন করে জানান যে, সান্যাল সাহেবের স্ত্রী কাল রাত্রি থেকে মিসিং—মানে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপার গোলমাল আছে। আর আপনার ফোনে জানা গেল যে—

সুজিৎ ॥ আমার বাড়িতে কাল রাত্রে এক মহিলা এসেছিলেন। তিনি বোধহয় মিসেস সান্যাল।

চতুর্বেদী ॥ আপনি মিসেস সান্যালের কে হন?

সুজিৎ ॥ আমি কেউ নই।

চতুর্বেদী ॥ তাহলে তিনি আপনার কাছে এলেন কেন?

সুজিৎ ॥ তা বলতে পারব না।

চতুর্বেদী ॥ আপনি মিসেস সান্যালকে কতদিন চেনেন?

সুজিৎ ॥ আমি তাঁকে আদৌ চিনি না।

চতুর্বেদী ॥ আপনি তাঁকে চেনেন না। আপনি তাঁর কোনো আত্মীয় নন! অথচ তিনি রাত্রে আপনার কাছেই এলেন। আপনাকে তিনি কি বলেছিলেন—

সুজিৎ ॥ বলেছিলেন যে, তাঁর জীবন বিপন্ন।

চতুর্বেদী ॥ আপনি বলছেন তাঁকে চেনেন না। তিনি কি কোনো সূত্রে আপনাকে বা আপনার স্ত্রীকে—আমি কি আপনি বিবাহিত।

সুজিৎ ॥ না তিনি আমার স্ত্রীকেও চেনেন বলে মনে হয় না।

চতুর্বেদী ॥ আপনি এ পাড়ায় কতদিন?

সুজিৎ ॥ বছর দেড়েক।

চতুর্বেদী ॥ আপনি সান্যাল সাহেবকে চেনেন না।

সুজিৎ ॥ আজ্ঞে না। বললাম তো, সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। উনি রাজনৈতিক নেতা—নাম শুনেছি।

চতুর্বেদী ॥ মিসেস সান্যাল আপনার কাছেই এলেন, বললেন তাঁর জীবন বিপন্ন, তিনি পুলিশে রিপোর্ট করলেন না কেন?

সুজিৎ ॥ আমি বলতে পারব না

চতুর্বেদী ॥ আপনি কি মিসেস সান্যাল বা সান্যাল সাহেবের বাড়ির কোনো ব্যাপারে ইনভলভড?

সুজিৎ ॥ ইনভলভড?

চতুর্বেদী ॥ হ্যাঁ. এ প্রশ্নটা কি অবান্তর?

সুজিৎ ॥ আমি তো কোনো কিছুর সঙ্গেই—

চতুর্বেদী ॥ এ ব্যাপারে আপনার কি ইন্টারেস্ট?

সুজিৎ ॥ ইন্টারেস্ট?

চতুর্বেদী ॥ আপনি যাঁকে চেনেন না, যাঁর স্বামীকে চেনেন না, যাঁর বাড়ির কোনো ব্যাপারে যুক্ত নন, আপনি তাঁর সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড কেন? আপনি ফোন করে জানালেন যে একজন মহিলা এসে বলছেন যে তাঁর প্রাণ বিপন্ন। গুণ্ডাবদমাসরা বাড়ির লোকেরাই তাঁর ক্ষতি করতে চান, নয় কি?

সুজিৎ ॥ মানে, একটা হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ড—

চতুর্বেদী ॥ (বাধা দিয়ে) আপনি কি সমাজ সেবা করে থাকেন?

সুজিৎ ॥ না, আমি সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক।

চতুর্বেদী ॥ লোকজনকে হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ডে—মানে যাচ্ছেতা অজানা মহিলাদের উদ্ধার করাও কি আপনার অধ্যাপনার অঙ্গ?

সুজিৎ ॥ ইনস্পেক্টর চতুর্বেদী, আপনার ব্যঙ্গের ধরনটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি সদা মনেই আপনাকে খবর দিয়েছিলাম—

চতুর্বেদী ॥ মহিলাটি কি আপনাকে খবর দিতে অনুরোধ করেছিলেন?

সুজিৎ ॥ না, আমি বরং তাঁকে এ্যাডভাইস দিয়েছিলাম।

চতুর্বেদী ॥ আপনার এ্যাডভাইস তিনি শুনেছিলেন?

সুজিৎ ॥ না।

চতুর্বেদী ॥ কেন?

সুজিৎ ॥ ঠিক জানি না. হয়তো ভয়ে।

চতুর্বেদী ॥ ভয় কিসের. পুলিশ সাহায্য করে না।

সুজিৎ ॥ অনেকের ধারণা তাই।

চতুর্বেদী ॥ আপনার ধারণাও কি তাই?

সুজিৎ ॥ আপনাকে আমিই ফোন করেছিলাম। কাজেই সাহায্য পাব ভেবেই—

চতুর্বেদী ॥ কিন্তু যাঁর জন্য সাহায্য চান, তিনি যদি সাহায্য না চান—আর ভদ্রমহিলার আপত্তি সত্ত্বেও আপনি পুলিশের সাহায্য চাইলেন বা খবর দিলেন কেন? ভয়ে?

সুজিৎ ॥ ভয়? কিসের ভয়?

চতুর্বেদী ॥ (হেসে) অনেক রকম ভয়।

সুজিৎ ॥ কর্তব্য বোধেই আমি খবর দিয়েছিলাম এবং বলতে পারেন যে আমি ব্যাপারটা থেকে দূরে থাকতে চাই।

চতুর্বেদী ॥ দেখুন এই ধরনের কেসে লোকে পুলিশের কাছে চায় প্রোটেকশন। একজন মহিলার ওপর যখন স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউ অত্যাচার করে বা করতে পারে, তখন মহিলাটি প্রোটেকশন চান এবং পুলিশ সাধ্য মতো প্রোটেকশন দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মহিলাটি কোনো প্রোটেকশন চাননি, তিনি কোনো ব্যাপারে আপনাকে অথরাইজ করেননি। এদিকে তাঁর বাড়ির লোক জানাচ্ছেন যে তিনি মিসিং। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিউটি খুবই সিম্পল। তাঁকে খুঁজে বার করা এবং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে

যাওয়া। কাজেই আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, যদি জানেন, তিনি এখন কোথায়?

সুজিৎ। তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।

চতুর্বেদী। (বিস্মিত) তিনি এখানে?

সুজিৎ। হ্যাঁ। তিনি কাল রাত্রে এখানেই থাকতে চেয়েছিলেন এবং ছিলেন।

চতুর্বেদী। (আস্তে আস্তে) তিনি এখানে থাকতে চেয়েছিলেন। আপনি তাঁকে চেনেন না, তিনি আপনাকে চেনেন না। তিনি এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন, আপনি গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। আপনি তাঁকে চেনেন না। তিনি ঘরের মধ্যে এলেন। তিনি আপনাকে চেনেন না। আপনি তাঁকে চেনেন না। কিন্তু তিনি এখানে রইলেন।

সুজিৎ। হ্যাঁ। ব্যাপারটা তাই।

চতুর্বেদী। রূপকথা?

সুজিৎ। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?

চতুর্বেদী। না, একটুও না। একজন অপরিচিত মহিলা রাত্রে আপনার কাছে এসে বললেন তাঁর জীবন বিপন্ন, তাই আপনি তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আপনার বাড়িতে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করলেন। বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না, শেষ রাত্রে আপনি কেন হঠাৎ পুলিশকে ফোন করে তাঁর জন্য প্রোটেকশান চাইলেন? আপনিই তো প্রোটেক্টর।

সুজিৎ। তাঁকে রাত্রে থাকতে বলার পর থেকে আমি ঘুমুতে পারি নি (চতুর্বেদী উঠে দাঁড়ায়) শেষ রাত্রে মনে হয় যে পুলিশকে খবর দেওয়া উচিৎ—

চতুর্বেদী। কিন্তু বাড়িতে খবর দেওয়াটা তত উচিৎ মনে করেন নি (জানলার কাছে গিয়ে) তাঁর বাড়িটা বোধহয় রাস্তার ওপরেই, এখান থেকে দেখাও যায়। মাই ফ্রেন্ড—আপনার আর সময় নেব না, আমি সান্যাল সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছি, আপনি ইতিমধ্যে মিসেস সান্যালকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন, এবং মিঃ সান্যালের সঙ্গে কথা বলে আপনার গল্পটা যদি বিশ্বাস করাতে পারেন করুন। যদি বিশ্বাস না করেন আপনার ঝামেলা হতে পারে। (দরজার দিকে তাকিয়ে) আপনার ভিজিটর আসছেন! (বিমলের প্রবেশ। বিমল সুদর্শন, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, ঝাঁচলো গোঁফ। চোখে চশমা। পরনে স্যুট ও চকচকে জুতো। হাতে ব্যাগ। কথাবার্তার মধ্যে একটা ব্যাঙ্কের ধার)।

সুজিৎ। ইনি ডঃ ব্যানার্জী

চতুর্বেদী। সাইকিয়াট্রিস্ট: আমি চিনি। (ঘড়ি দেখে) অলরাইট। আপাতত চললাম। হয়তো ঐ বাড়ি থেকেও কেউ আসবেন।

চতুর্বেদী চলে যায়। তার জুতোর শব্দ শোনা যায়। বিমল হাতের ব্যাগটা নিচে রাখে। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মোছে। সুজিতের দিকে তাকায় না। সুজিৎ একবার জানলার ধারে গিয়ে কি দেখে।

সুজিৎ। খুবই ঝামেলায় পড়ে গেছি।

বিমল। সে তো দেখছি। তুমি আজকে ভোরবেলায় ফোনে যে কথাগুলো বললে, রাত্রে—যখন মহিলাটি এসেছিলেন তখনও তো বলতে পারতে।

সুজিৎ। তখন সমস্ত ব্যাপারটা—এমন গোলমেলে। এ অবস্থায় কি করা উচিৎ ছিল। ভদ্রমহিলার চোখেমুখে এমন একটা অসহায় ভাব ছিল যে (সুজিৎ চেয়ারে বসে)

বিমল। (চোয়াল ঠিক করতে করতে) তুমি বিপদে পড়েছিলে।

সুজিৎ। যায় কমল! একজন মহিলাকে, বিপন্ন মহিলাকে সাহায্য করাটা অন্যায়?

বিমল। (চেয়ারে বসে) তোমার তো জানা দরকার ছিল মহিলাটি সত্যি কথা বলছেন কি না?

সুজিৎ। সে আমি কি করে জানব? আই মীন—আই মেন্ট টু সে, এরাজ এ রিগ অফ ট্রুথ ইন দ্যাট ওয়ার্ডস। তাই আমি—

বিমল। ইউ মীন, ইউ থট। কিন্তু তা যথেষ্ট নয় সুজিৎ। তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে?

সুজিৎ। চতুর্বেদী তো বিশ্বাস করেনি।

বিমল। খুব স্বাভাবিক। তোমাকে এইরকম গল্প আনো বললে বিশ্বাস করতে?

সুজিৎ। কাজটা ঠিক হয়নি বলছ?

বিমল। তা আমি জানি না। যে দেশে একটি মহিলার সঙ্গে কফি হাউসের এক কোণে বসলে লোক চোখ টেরাটেরি করে, সেখানে রাত্রিবাস। লোকে ভাববে তোমরা কন্টেপলিকল্ আলোচনা করছিলে?

সুজিৎ। আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস, বিমল—

বিমল। ডোন্ট বী সেন্টিমেন্টাল। আমাদের একটা সোস্যাল রিস্পন্সিবিলিটির আছে—ইট মে বী গুড, মে বী ব্যাড, আই ডোন্ট নো, কিন্তু আছে। ইউ ক্যান ইগনোর ইট অ্যাট ইয়োর পেরিল।

সুজিৎ। (শোবার ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) আছে।

বিমল। দ্যাখো সুজিৎ, যে মেয়েরা স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তাদের দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে।

সুজিৎ। সম্মানের সঙ্গে যেখানে থাকা যায় না সেখান থেকে—

বিমল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার জন্য দরকার খুব শক্তি, সাহস-কারেজ অ্যান্ড-স্টিয়ারফিলেন্সনেস। কাঁকের মাথায় কাজ করলেই হয় না। তুমি একেবারে ফরবুসের নাইটসের মতো এগিয়ে গেলে। মহিলাটি? হয়তো তিনি আবার ওটিওটি যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে যাবেন। লুক অ্যাট মাই সিস্টার—ন্যান্সী—তুমি জানো সে হ্যারেজ ফেলড্। কেন? আমি জানি না। কারণ দেখে, কারণ শুনে, আমি কিছু বলতে চাই না। স্বামী ছেড়ে বেরিয়ে এল। কিছুদিন সোস্যাল ওয়ার্ক, কিছুদিন ধর্মকর্ম—স্বামী টু স্বামীজী। দ্যাটস্ অল।

সুজিৎ। তার মানে কি—সব সত্য করতে হবে।

বিমল। (পাইপে তামাক ভরতে ভরতে) কেয়ার না, কেয়ার না। তোমার আমার মতো দু-একজনের গল্পে ওয়েস্টার্ন আইডিয়া-এর গোলেতারা পড়েছে। কিন্তু রক্তে বইছে হাজার বছরের সংস্কার। তুমি তো মহিলাটিকে আবার ফিরেছিলে। শেষ রাত্রে পুলিশকে ফোন করলে কেন? আমাকে ফোন করলে কেন? ভয়ে? তোমার হাজার বছরের সংস্কার। পারলে সমাজের নিয়মকে অস্বীকার করতে। রক্ত বারোটার বীরপুরুষ, রক্ত চারটের মৃত সৈনিক। (পাইপ জ্বালায়) কনভেনশনের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে যে সাহস লাগে সে তোমার নেই। মহিলাটিরও আছে কি না আমার সন্দেহ আছে। তোমার মতো সোসিওলজির অধ্যাপকদের পক্ষে স্ত্রী জাতির অধিকার নিয়ে প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া অনেক নিরাপদ। এর বাইরে গেলে তোমার স্ত্রীর চেয়েই নিরাপদ নও।

সুজিৎ। ইউ মীন, কনিকাও ভুল বুঝতে পারে?

বিমল। খুবই সম্ভব। বিশেষ করে কয়েক মাস ধরে তোমাদের যা—(পাইপ নিভে যাওয়ায় আবার জ্বালায়) তোমার জায়গা কনিকা খুব মডার্ন। কিন্তু সংসার বড় কঠিন ঠাঁই,

সুস্মিৎ। আমি উঠি—তোমরা ইন্সপেক্টর সাহেব অসন্তোষ জানাও—সঙ্গে বোধহয় সান্যালের বাবা।

সুস্মিৎ ॥ তুমি একটু বোসো, বিমল।

বিমল ॥ রাত্রে এস, আমার ওখানে খাবে। এখন চলি।

সুস্মিৎ ॥ প্লীজ বিমল। বোসো। একটু নার্ভাস বোধ করছি। ইন্সপেক্টর চতুর্বেদীর প্রবেশ। সঙ্গে সদানন্দ সান্যাল। প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়স। রোগা, শুকনো চেহারা। চোখ দুটো শকুনির মতো। তাড়াতাড়ি কথা বলে। চলাফেরাও দ্রুত, বৃদ্ধের জড়তা নেই।

চতুর্বেদী ॥ সান্যাল সাহেবের বাবা। ইনি প্রফেসার দত্ত।

সদানন্দ ॥ হ্যাঁ, ঐ কথাই বলছিলাম প্রফেসার দত্ত।

সুস্মিৎ ॥ কোন কথা?

সদানন্দ ॥ কী ঝামেলা বলুন দেখি। বাসপাতালে ফোন করলুম, নেই; কমলার বাপের বাড়িতে কনট্যাক্ট করলুম, নেই। কমলার বন্ধুবান্ধব—ঐ তো মুশকিল, ওর আবার অনেক বন্ধু। তা আপনি যে খুঁজে পেয়েছেন—

সুস্মিৎ ॥ আমি ওঁকে ঠিক খুঁজে পাইনি। তিনি এসেছিলেন।

সদানন্দ ॥ ঐ হল, একই কথা। আমাদেরও মনে হয়েছিল যে এখানে এসেছে।

চতুর্বেদী ॥ এখানে? (সুস্মিতের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়)

সুস্মিৎ ॥ আপনার মনে হয়েছিল—মানে?

সদানন্দ ॥ না, আমার স্ত্রীর। অনেক রাত পর্যন্ত জানলার অত্যাচার—আসলে ইনসমনিয়া। ওঁর মনে হয়েছিল কেন বৃষ্টির মধ্যে কমলা এই দিকে—তাই আপনাদের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলাম, চেক করতে—

চতুর্বেদী ॥ (সুস্মিতের দিকে তাকিয়ে) তখন পর্যন্ত বোধহয় তিনি আসেন নি?

সদানন্দ ॥ মনে পড়ে এসেছিল। তার আগে মেলা কোথায়? আমি জানতাম।

চতুর্বেদী ॥ কী জানতেন?

সদানন্দ ॥ ক্যারেক্টার—ক্যারেক্টার!

চতুর্বেদী ॥ আচ্ছা, প্রফেসার দত্ত, সদানন্দবাবু যে লোক পাঠিয়েছিলেন সে কথা তো আপনি বলেন নি।

সুস্মিৎ ॥ হ্যাঁ, একজন লোক এসেছিল, বলছিল যে ওঁর পুত্রবধূর নাকি মাথা খারাপ।

সদানন্দ ॥ অ্যা—হ্যাঁ, ঠিকই। বেশ কয়েক মাস ধরে মানসিক রোগে ভুগছিল।

বিমল ॥ আপনারা ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

সদানন্দ ॥ ইনি কে?

সুস্মিৎ ॥ আমার বন্ধু, ডঃ বিমল ব্যানার্জী—

সদানন্দ ॥ না, দেখাই নি। কিন্তু সে যে মানসিক রোগী এতে সন্দেহ নেই।

বিমল ॥ কী করে এমন নিঃসন্দেহ হলেন জিজ্ঞাসা করতে পারি? জানলেন কি করে?

সদানন্দ ॥ আমরা জানব না? আমরা ঘরের লোক জানব না? (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে) আপনি জানবেন?

সুস্মিৎ ॥ আপনি সিওর যে কমলা, মানে মিসেস সান্যাল, আপনার পুত্রবধূ একজন মানসিক—

সদানন্দ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার ছেলের লাইফটা মিজারেবল করে দিল—তা না হলে ডাক্তিরেলা কেউ—

বিমল ॥ আপনি বা আপনার ছেলে মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ—এ ব্যাপারে বোধকরি কোনো সন্দেহ নেই।

সদানন্দ ॥ হু ইজ দিস ম্যান? আমার ছেলে মানসিক রোগী? আপনি কী বোঝেন এ ব্যাপারে?

বিমল ॥ আমি মানসিক রোগের ডাক্তার।

সদানন্দ ॥ আই ডোন্ট কেয়ার!

বিমল ॥ অন্ধকারে, বৃষ্টির মধ্যে আপনার পুত্রবধূ বাড়ি থেকে পালিয়ে এলেন, তখন আপনার স্ত্রী জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন—

সদানন্দ ॥ বাড়ি থেকে পালিয়ে? হোয়াট ডু ইউ মীন?

বিমল ॥ বৃষ্টির রাতে তিনি নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরোন নি। যাকে চেনেন না শোনেন না তার ঘরে এসে টোকা মারলেন—ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্য। তাই বলছিলাম হঠাৎ কোনো প্রোভোকেশানে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন—

চতুর্বেদী ॥ হ্যাঁ, সদানন্দবাবু। হঠাৎ রাত্রে এভাবে—আগেও কি হয়েছে এমন?

সদানন্দ ॥ হয়তো ভয়েই—

চতুর্বেদী ॥ কীসের ভয়ে?

সদানন্দ ॥ না, কোনো ভয়ে নয়। আমি কি ভয়ের কথা বললাম?

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ, তাই তো বললেন।

সদানন্দ ॥ নো, নো। দেখুন নিবঞ্জন একটা জঙ্গলী মিটিং-এ মধ্যপ্রদেশে। রাত্রে কমলা একা ছিল। হয়তো সেইজন্য—মনে মেন্টাল কেসে এমন হয়েই থাকে। (বিমল হাসে)

বিমল ॥ তার ছাড়া অন্য কোনো কারণে একজন অচেনা লোকের বাড়িতে কেউ ঢোকে না। ধরুন শুণ্ডার ভয়ে, পুলিশের ভয়ে একজন হয় তো অচেনা লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে—

সদানন্দ ॥ বাড়ির মধ্যে শুণ্ডার ভয়ে?

বিমল ॥ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। (সদানন্দ কিছু বলতে চায়, চতুর্বেদী থামিয়ে দেয়)

চতুর্বেদী ॥ সান্যাল ব্রাদার্সের লোক যখন আপনার কাছে খোঁজ করতে এসেছিল তখন পর্যন্ত মিসেস সান্যাল—

সদানন্দ ॥ যখনই আসুক, এসেছিল। কি বলেছে আপনাকে? বিশ্বাস করবেন না, বিশ্বাস করেছেন নাকি? তখনই যদি খবর দিতেন তো বুঝিয়ে দিতাম।

বিমল ॥ কী বোঝাতেন?

সদানন্দ ॥ বুঝিয়ে দিতাম বলেছি বুঝি। না, না, মানে ভাবলেশ মিটে যেত।

চতুর্বেদী ॥ সদানন্দবাবু, আপনারা কখন জানলেন যে আপনার পুত্রবধূ বাড়ি থেকে পালিয়েছেন বা—মানে—তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সদানন্দ ॥ ঐ দশটা—সাড়ে দশটা—এগারোটা—সাড়ে এগারোটা—

চতুর্বেদী ॥ (হেসে) কি করে জানলেন যে তিনি বাড়িতে নেই। তাকে খুঁজেছিলেন?

সদানন্দ ॥ খুঁজতে যাব কেন? আমাদের কি বললে যে বাড়িতে নেই।

বিমল ॥ বাড়িতে নেই সে জানল কি করে? প্রত্যেকটা ঘর খুঁজে দেখেছিল?

সদানন্দ ॥ নেই। নেই। ছিল না, এইটেই হল ব্যাপার।

বিমল ॥ ছাদেও অবশ্য পারতেন। ছাদে খুঁজেছিলেন।

সদানন্দ ॥ ছাদে? বৃষ্টির মধ্যে? আপনি কি মেন্টাল কেস মনে হচ্ছে?

বিমল ॥ না। কিন্তু কমলা তো মানসিক রোগী। তাঁর পক্ষে তো সম্ভব।

চতুর্বেদী ॥ যাক্‌গে। সুজিৎবাবু, মিসেস সান্যালকে যখন পাওয়া গেছে তখন আর ওসব ডিটেলে গিয়ে কাজ নেই।

সদানন্দ ॥ ঠিক! তা, বলুন, কোথায় আছে সে।

সুজিৎ ॥ এখানেই।

সদানন্দ ॥ হোয়াট। এখানে। আর এতক্ষণ ধরে কিচেনেমি হচ্ছিল। এখানেই। এ কথা তো বলেন নি আপনি।

চতুর্বেদী ॥ কেন, আমি তো বলেছি যে মিসেস সান্যাল এখানেই ছিলেন ঘরে।

সদানন্দ ॥ এখানেই—ইউ মীন—

চতুর্বেদী ॥ (বাধা দিয়ে) এখন চটাচটি করবেন না। তাঁর সঙ্গে কথা বলছি—

বিমল ॥ হ্যাঁ, তাহলেই বোঝা যাবে তিনি পাগল কি নির্দোষ।

চতুর্বেদী ॥ প্রফেসর দত্ত! ডেকে আনুন।

সুজিৎ ॥ (শোবার ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ঘুমুচ্ছেন।

সদানন্দ ॥ আপনার বেডরুমে! অ্যাবাউট্‌স্। সেট ইট সী সী (চেয়ারটেবিল এগিয়ে যান। দরজায় ধাক্কা দেয়) কমলা—বেরিয়ে এস। কমলা—কমলা।

চতুর্বেদী ॥ মিসেস সান্যাল, ভয় পাবেন না। বাইরে আসুন। আমি ইন্দ্রপাণির চতুর্বেদী। কোনো ভয় নেই।

সদানন্দ ॥ আমি জানতাম। ক্যারেক্টার ইজ দ্য মেন প্রবলেম। চরিত্র—

বিমল ॥ মানসিক রোগী যে!

সদানন্দ ॥ চুপ করুন। জানেন আমি কে? আপনি (সুজিতের দিকে)—আপনি—এখানে কমলা হোল নাইট ছিল—ইউ আর—ইউ আর এ—

চতুর্বেদী ॥ দাঁড়ান। সেট ইট ফ্রম মাই টকিং। (দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজা খুলে যায়। কেউ নেই মনে হচ্ছে।

সদানন্দ ॥ আলবৎ আছে। আই উইল টিচ হার এ লেসন্। আমাদের মুখে কালি—আমি দেখছি—(সদানন্দ ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। তার চিৎকার শোনা যায়) কমলা কাম আউট্ (ঘর থেকে বেরিয়ে আসে) নো বডি। নেই।

সুজিৎ ॥ নেই।

সদানন্দ ॥ ন্যাকামো হচ্ছে। নেই।

সুজিৎ ॥ এখানেই তো—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

চতুর্বেদী ॥ আপনি জানেন না।

সুজিৎ ॥ না।

সদানন্দ ॥ উনি কিছুই জানেন না!

চতুর্বেদী ॥ দেখুন আপনার সমস্ত বিহেবিয়ারটাই প্রেজ। আপনি ফোন করলেন, খবর দিলেন, এখন বলছেন জানেন না। ব্যাপারটা কি।

সদানন্দ ॥ আপনাদের মধ্যে একটা যোগসাজস আছে। আপনিই সমস্ত কিছুর মূলে।

চতুর্বেদী ॥ উত্তেজিত হবেন না। প্রফেসার দত্ত, আপনি জানতেন না যে মিসেস সান্যাল চলে গেছেন।

সুজিৎ ॥ না। আমার ধারণা ছিল মিসেস সান্যাল আছেন।

চতুর্বেদী ॥ আপনি যখন ফোন করেছিলেন তখন তিনি এখানে ছিলেন?

সুজিৎ ॥ ঘরের ভেতরে ছিলেন বলেই মনে করেছিলাম।

চতুর্বেদী ॥ লাস্ট কখন দেখেছেন?

সুজিৎ ॥ কী দেখেছি?

চতুর্বেদী ॥ মিসেস সান্যালকে।

সুজিৎ ॥ ও! তা রাত এগারো-সাড়ে এগারোটা

সদানন্দ ॥ সেই সময়েই তো আমার লোক এসেছিল।

চতুর্বেদী ॥ ঠিক। আপনার চাকর জানকীপ্রসাদও আমাকে তাই বলেছে।

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ।

চতুর্বেদী ॥ কিন্তু—মিসেস সান্যাল তখন এখানে ছিলেন না?

সুজিৎ ॥ ছিলেন।

চতুর্বেদী ॥ ছিলেন? কিন্তু আপনি আগে তো তা বলেন নি। সান্যাল ব্রাদার্সের লোককেও বলেননি।

সদানন্দ ॥ ন্যাকামো। কতদিন ধরে এসব চলছে। আমি দেখে নেব। পালিয়ে যাবে কোথায়?

চতুর্বেদী ॥ তখন আপনি মিথ্যে বলেছিলেন কেন?

সুজিৎ ॥ ভদ্রমহিলা খুব ডিস্টার্ড, আই মীন প্যানিক হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন যেন কিছু না বলি—

সদানন্দ ॥ সী ইজ এ উইচ্।

বিমল ॥ এ ব্যাপারে আপনি সিওর।

সদানন্দ ॥ শুট্ আপ।

চতুর্বেদী ॥ কেন মিথ্যে কথা বলেছিলেন? কেন সে কথা গোপন করছেন না।

সুজিৎ ॥ ভদ্রমহিলা বলেছিলেন তাঁর জীবন বিপন্ন।

সদানন্দ ॥ সী ইজ এ লায়ার। আসল ব্যাপারই অন্য—ক্যারেক্টার।

সুজিৎ ॥ দেখুন আপনি অন্যায় সন্দেহ—

সদানন্দ ॥ কের মিথ্যে কথা। ওয়ানস্ এ লায়ার অলওয়েজ এ লায়ার। আপনি শিক্ষক! শেম!

বিমল ॥ দেখুন, মিসেস সান্যাল যখন মেন্টাল কেস তখন কি বলেছেন তা জেনে—

সদানন্দ ॥ কে বলেছে মেন্টাল কেস। সী ইজ অলরাইট। সী ইজ অব গাট টাইপ। এটা হল মরাল কেস।

বিমল ॥ তাহলে মেন্টাল কেস, মেন্টাল কেস বলে আপনিই বা কেন ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছিলেন?

সদানন্দ ॥ আমি—আমি চাপা দিতে চাইছিলুম আমি সব বুঝতে পেরেছি। নাউ হট ইজ ক্লীয়ার। এইসব মেয়েমানুষকে চাবুক মারা উচিৎ। আর এই ধরনের লোককে (সুজিৎকে দেখিয়ে) আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া উচিৎ।

সুজিৎ ॥ ভদ্রমহিলা বলেছিলেন যে আপনারা তাঁকে মারতে চান। তাই মিথ্যে কথা বলেছিলাম—জাষ্ট ওয়ানটেড টু হেল্প হার—

সদানন্দ ॥ আমরা মারতে চাই! ইন্সপেক্টর, আপনি এসব কথা বিশ্বাস করেন?

চতুর্বেদী ॥ এটা এই ভদ্রলোকের কথা। সত্য মিথ্যে জানি না।

সুজিৎ ॥ সত্যি কথা। তিনি আমাকে বলেছিলেন।

সদানন্দ ॥ (মুখ ভেঙিয়ে) তিনি আমাকে বলেছিলেন। (ইন্সপেক্টারকে) সব মিথ্যে: মিথ্যে!

সুজিৎ ॥ তিনি সেই ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। কয়েকদিন ধরেই মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন—

সদানন্দ ॥ ঐসব মেয়েমানুষের আবার মানসিক যন্ত্রণা।

চতুর্বেদী ॥ আপনি বলে যান

সুজিৎ ॥ আপনার ছেলে, আই থিঙ্ক মিঃ সান্যাল নাকি চাবুক দিয়ে—

সদানন্দ ॥ মারা উচিত। মরলের বাস্টার্ড। (ইন্সপেক্টারের দিকে) মিথ্যে কথা।

সুজিৎ ॥ কাল রাত্রে আপনাদের কি ওঁকে বলেন যে তাঁকে হত্যা করার প্ল্যান করা হয়েছে। তাই তিনি বারান্দার রেলিং পেরিয়ে—

সদানন্দ ॥ বীরাঙ্গনা। অর্জুন এ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত। (ইন্সপেক্টারকে) সব বানানো কথা।

সুজিৎ ॥ তিনি এখানে প্রাণের ভয়ে চুকে পড়েছিলেন।

সদানন্দ ॥ আর আপনি ওঁকে সমাদরে বেডরুমে নিয়ে গেলেন।

বিমল ॥ আচ্ছা, ঐ মহিলাটিই যে মিসেস সান্যাল, এটা আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন?

সদানন্দ ॥ হোয়াট! এই ভদ্রলোকটি বারবার ন্যাকড়া তুলছেন সব কথায়।

চতুর্বেদী ॥ ঐ মহিলা যে মিসেস সান্যাল, সেটা আপনি কি করে জানলেন?

সদানন্দ ॥ জানে, সব জানে।

সুজিৎ ॥ তিনি আমাকে বলেছিলেন।

চতুর্বেদী ॥ ক্যান ইউ ডেসক্রাইব হার?

সুজিৎ ॥ লম্বা, রোগা, শাড়ি পরা, চুল খোলা, গায়ে চাদর—আমি খুব ভালো করে দেখিনি।

সদানন্দ ॥ উনি রামকৃষ্ণ পরমহংস, উনি শুধু পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। শুধু জুতো দেখেছেন।

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ, দেখেছিলাম যে পায়ে মোজা জুতো ছিল না। সেজন্যই ভেবেছিলাম হয়তে সত্যি সত্যি বিপদ হয়ে বাড়ি থেকে পালাবার সময় জুতো পরার সময় পান নি।

চতুর্বেদী ॥ আপনি তো মার্ডার হোমস্ দেখছি। সদানন্দবাবু, আপনি বাড়ি যান, আমরা যা পারি করছি।

সদানন্দ ॥ মনে রাখবেন এটা কিন্তু ফ্যামিলি প্রেস্টিজের ব্যাপার। নিরঞ্জন কিন্তু সহজে ছাড়বে না।

চতুর্বেদী ॥ প্রফেসর মত, একটি হেল্পফুল হবার চেষ্টা করুন।

সুজিৎ ॥ বলুন কী করতে হবে।

চতুর্বেদী ॥ মিসেস সান্যাল কোথায় গেছেন আপনি জানেন না?

সুজিৎ ॥ বিশ্বাস করুন, জানি না।

চতুর্বেদী ॥ দেখুন মহিলাটি আপনার কাছে এলেন, আপনি তাঁকে রাত্রে থাকতে দিলেন, তিনি যাবার সময় একটা কথা না বলে চলে গেলেন! নট ইজন্ এ গুড্ সাইন্!

সুজিৎ ॥ আমি সত্যিই জানি না—

সদানন্দ ॥ সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। ইংরেজিতে যাকে বলে—

চতুর্বেদী ॥ (আমিয়ে দিয়ে) কিছু অনুমান করতে পারেন?

সুজিৎ ॥ মনে হয়—

চতুর্বেদী ॥ বলুন—বলুন

সুজিৎ ॥ আমার মনে হয় তিনি আমাকে এনব্যারাসমেন্ট থেকে বাঁচাবার জন্যই চলে গেছেন। তিনি জানতেন না যে আমি আপনাকে ফোন করব। তিনি ভেবেছিলেন যে আমি সকালে উঠেই খুঁজতে পারব যে তিনি চলে গেছেন।

চতুর্বেদী ॥ মানে ভদ্রমহিলা আপনার প্রতি খুবই কনসিডারেট। কেউ তাঁকে দেখার আগেই তিনি চলে গেছেন। কিন্তু কাহেলা সৃষ্টি করেছেন আপনি।

বিমল ॥ অথবা ভদ্রমহিলা যতটা বুদ্ধিমতী, তুমি ততটাই নির্বোধ। তুমি তাঁকে সরল মিরেছিলে সামাজিক সম্মান বিপন্ন করে, তার প্রতিদানে তিনি হোমার সামাজিক কলঙ্কের সম্ভাবনা মুছে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছেন।

চতুর্বেদী ॥ তাঁর নিজের কলঙ্ক মোছার চেষ্টাও আছে।

সদানন্দ ॥ কিন্তু সবাই ধরা পড়ে গেছে। আমি ঐ লোকটার কথা একটুও বিশ্বাস করি না।

সুজিৎ ॥ (হঠাৎ রেগে গিয়ে) আমি কেয়ার করি না, আপনি কি বিশ্বাস করেন বা না করেন। আমি দেখতে পাচ্ছি। আই ওয়াজ রাইট। আমি তাঁর প্রত্যেকটা কথাই বিশ্বাস করি। আমি বুঝতে পারছি তাঁর জীবন সত্যি বিপন্ন ছিল। আপনারা তাঁর ক্ষতিই করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।

সদানন্দ ॥ তুমি, তুমি তো বিশ্বাস করবেই, তুমি একটা লম্পট, আর, আর সী ইজ এ হোর।

সদানন্দ দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায়। সুজিৎ হাত মুষ্টি বন্ধ করে কিছু বলতে চায়, কিন্তু প্রচণ্ড রাগে মুখে কথা ফোটে না। চতুর্বেদী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগোয়। বিমল সুজিতের কাঁধে হাত রাখে। পূর্ব প্রক্ষেপ শেষ। রাত্রার লরী চলে যাবার প্রচণ্ড শব্দ হয়।

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

সন্ধ্যা। সুজিৎ ও কণিকা বসার ঘরে। সুজিৎ টাইপরাইটারের সামনে বসে কাগজপত্র গোছাচ্ছে। ডাইনিং টেবিলের ধারে কণিকা। উঠে এসে সামনে সোফায় বসে। একটা বই ওল্টায়। তারপর বিরক্তিতে ঠেলে দেয়। সুজিতের মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সুজিৎ টাইপরাইটারে কাগজ ভরতে ভরতে জিজ্ঞাসা করে:

সুজিৎ ঃ শরীর খারাপ লাগছে, কণিকা।

কণিকা ঃ না ঠিক আছে।

সুজিৎ ঃ (টাইপ শুরু করে) কি পড়ছ? (কণিকা জবাব দেয় না) তোমার কি হল?

কণিকা ঃ হবে আবার কি?

সুজিৎ ঃ আমার এই লেখাটা একটু দেখত! তাড়াহুড়োতে টাইপ করেছি—অনেক ভুল থেকে গেছে।

কণিকা ঃ আমার ভালো লাগছে না।

সুজিৎ ঃ (টাইপ করতে করতে) একবার চোখ বুলিয়ে যাও। আমার একেবারে সময় নেই। (কণিকা উঠে দাঁড়ায়) রঞ্জন হয়তো আবার তাড়া দেবে।

কণিকা ঃ আমি পারব না।

সুজিৎ ঃ কী হল তোমার?

কণিকা ঃ অন্য কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নাও। আমার কাজ আছে।

সুজিৎ ঃ (টাইপ বন্ধ করে) অন্য কাউকে আমার পাব কোথায়?

কণিকা ঃ সে তুমি জান। (একটা রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করে)

সুজিৎ ঃ আচ্ছা, আমিই দেখছি। (কণিকা প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে দোমড়া করে পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয়। সুজিৎ দেখে) জানকীরাম সেল কোথায়? ও তোমাকে কিছু বলেছে? (কণিকা উত্তর দেয় না) ওঃ, তোমার সঙ্গে তো দেখাই হয়নি এখনও।

কণিকা ঃ কেন ব্যাপার কি?

সুজিৎ ঃ (টাইপরাইটার থেকে কাগজ বার করতে করতে) ছুটি চাই। বলছিল তুমি এলেই ছুটি দেবে।

কণিকা ঃ (আর একটা কাগজ ছেঁড়ে) কে ছুটি নেবে তার জন্য আমার দরকার কি? আমি কি ওর সাবস্টিটিউট? কি এসে গেছে, চাকর যাবে?

সুজিৎ ঃ রেগে যাচ্ছ কেন? আমি বলেছিলাম যে তুমি এলে জিজ্ঞাসা করে—

কণিকা ঃ কে কোথায় যাবে তার জন্য আমার পারমিশন হঠাৎ জরুরী হয়ে পড়ল কবে থেকে?

সুজিৎ ঃ যাঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি জানকীরামকে ছেড়ে দেব?

কণিকা ঃ উঁ, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা! (রাইটিং প্যাডটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ট্রানজিসটারটা খুলে নেয়। একটা ইংরেজি গান বেজে ওঠে) আমি হঠাৎ এত ইমপর্টেন্ট হলাম কবে থেকে? (ট্রানজিসটারের ভল্যুমটা বাড়তে থাকে। প্রচণ্ড শব্দ হয়।)

সুজিৎ ঃ কমাও, কমাও। (কণিকা একেবারে বন্ধ করে দেয়) আমি আমাকে বলিনি, শুধু একটু কমাতে বলেছিলাম (কণিকা মুখ ফিরিয়ে বসে)।

কণিকা ঃ তুমি কমাতে বলবে, কমাতে হবে; থামতে বলবে, থামতে হবে। চালাতে বলবে, চালাতে হবে। সব তোমার ইচ্ছা।

সুজিৎ ঃ ছোটখাটো ব্যাপারে এত সিরিয়াস হচ্ছ কেন, কণিকা?

কণিকা ঃ কোনটা ছোটখাটো, কোনটা ছোটখাটো নয়, সব তুমি ঠিক করবে।

সুজিৎ ঃ (চায়ের কেটলির হুইসল্ শোনা যায়) জল হয়ে গেছে। চা (কণিকা জোরে জোরে উঠে যায়। সুজিৎ উঠে দাঁড়ায়, পায়চারি করে। ঠোঙা জানলাগুলো খুলিয়ে ওয়েস্টপেপার ঝুড়িটে ফেলে দেয়। টেলিফোন বাজে) হ্যালো—হ্যাঁ—হ্যাঁ—একটু ধরুন, দেখাই (রিসিভার হাতে নিয়ে), কণিকা, তোমার টেলিফোন (কণিকা টী-পট নিয়ে ঢোকে। টেবিলের ওপর টী-পট রাখে) তোমার টেলিফোন, মিসেস চৌধুরী ডাকছেন।

কণিকা ঃ বলে দাও একটা মিনু।

সুজিৎ ঃ মানে?

কণিকা ঃ মানে আবার কি? সব মিনুর মানে জানো না কি?

সুজিৎ ঃ কী বলব?

কণিকা ঃ যা ইচ্ছে। বলে দাও নেই।

সুজিৎ ঃ (টেলিফোনে কথা বলে) মিসেস চৌধুরী না—ওরে আছে—না—না—একটু টায়ার্ড বোধ হয়—না—না। হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পরেই—আচ্ছা—অবশ্যই হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি বলব—এই যেন করবে হ্যাঁ—ভালো, হ্যাঁ—চৌধুরী সাহেব ভালো তো? আচ্ছা—আচ্ছা রাখছি।

সুজিৎ রিসিভারটা রাখে। কণিকা কাপে চা ঢালে। দুধ দেয়। চামচ দিয়ে খুব জোরে চিনি গুলতে থাকে। হঠাৎ চামচটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায়। সুজিৎ চামচটা তোলে। চামচে আর টী-পটে ধাক্কা লেগে একটু শব্দ হয়।

কণিকা ঃ তোমার চা।

সুজিৎ ঃ (চায়ে চুমুক দেয়) বাঃ। একদিন জানকীরামের চায়ের যা কোয়ালিটি—তোমার চা?

কণিকা ঃ (উদাসীন ভাবে) নিচ্ছি।

সুজিৎ ঃ গান শুনবে? (উঠে গিয়ে রেকর্ড বাছতে শুরু করে) কী শুনবে? (কণিকা চুপ করে থাকে) এইটে শোনো, সেই যে সিটার সাইকোলজিস্টের সোয়ান সেল—মনে আছে (সে রেকর্ড চালিয়ে দেয়)। ভালো লাগছে?

কণিকা কথা বলে না। সুজিৎ এসে চেয়ারে বসে। চা খায়।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না। তোমাকে যা বলছিলুম, জানকীরাম, জানকীরামের বৌ একজনের সঙ্গে পালিয়েছিল (কণিকা চুপ করে বসে থাকে) তা, এখন আবার ফিরেছে। সেই নিয়ে গোলমাল। ওর কাকা, যা এরা কেউ ঘরে ঢুকতে দেবে না, তাড়িয়ে দিতে চায়। জানকীরামের ভাই এসে ধরনা দিয়েছে, ওকে ঘাঁরে যেতে হবে, বিচার-টিচার হবে। তাই যেতে চায় (উঠে টী-পট থেকে আর একটু চা ঢালে) তুমি চা নেবে?

কণিকা ঃ মিসেস সান্যালকে তুমি কতদিন চেন?

সুজিৎ ঃ (চমকে ওঠে। হাতে চায়ের কাপটা কেঁপে ওঠে। কণিকার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে) ও, তুমি আমার কথা তাহলে বিশ্বাস করনি?

কণিকা ঃ বিশ্বাস করা যায়?

সুজিৎ ঃ যায় না? আমি তো তোমাকে সব বলেছি। কেউ তোমাকে আর মিনু বলেছে?

কণিকা ঃ বলেনি, বলতে কতক্ষণ? হয়, বলেছিল।

সুজিৎ ঃ মেয়েদের সব কথা মিথ্যা।

কণিকা ঃ শুধু তুমি মেটা বলবে সেটা সত্য। আর সেটাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি এইরকম কথা বললে, তুমি বিশ্বাস করতে? কী চুপ করে রইলে কেন? যদি তুমি বাড়ি ফিরে এসে দেখতে এখানে এক অচেনা আমার সোফা—কী করতে? আমি যদি বলতুম একে আমার বিয়েছি, এ নিশ্চয়, বিশ্বাস করতে? তোমার বেলায় এক

নিয়ম, আমার বেলায় আরেক নিয়ম। তুমি কি ভাবতে তখন? তুমি যা ভাবতে সেটা ঠিক, আর আমি যা ভাবছি সেটা ঠিক নয়?

সুজিৎ॥ ঠিকই বলছ। আমি জোর করে বলতে পারব না, আমি কি করতাম, কি ভাবতাম।

কনিকা॥ তাহলে, আমার অবিশ্বাস করাটা অস্বাভাবিক নয়?

সুজিৎ॥ না, মোটেই নয়। শুধু তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা—

কনিকা॥ যা।

সুজিৎ॥ তুমি আমাকে বোকার চেষ্টা করবে।

কনিকা॥ বোকার চেষ্টাই করছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কী করতে? এই যে জানকীরামের কথা বলছিলে, কেউ ওর বৌকে বোকার চেষ্টা করবে? গ্রামের পঞ্চায়েৎ কি রায় দেবে তা সবাই জানে।

সুজিৎ॥ তুমি হয় তো ঠিকই বলছ। জানি না, তুমি আমাকে সন্দেহ করছ কি না? জানি না, তুমি আমাদের সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড-এর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ কি না? আমি বলার চেষ্টা করছি যে আমাদের ট্রাডিশান আর কনভেনশন-এর বাইরে আরো কিছু আছে। অনেক বড় কিছু আছে। মানুষের এমন কতকগুলো মুহূর্ত আছে যাকে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পেতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা বই পড়ে হয় না, বক্তৃতা শুনে হয় না, হঠাৎ একটা ঝড়ের মতো এসে সব কিছুকে ভাঁসিয়ে, ভাঁসিয়ে জীবনটাকে বদলে দিয়ে যায়। সেই সময় শুধু বলতে পারি—এই হল আমার অনুভূতি—এই হল সত্য। আমাকে বিশ্বাস কর।

কনিকা॥ তুমি ভাবছ আমি বুঝি শুধু একটা কনভেনশনকেই বড় করে দেখছি। তা নয়, আমি সত্যটাকেই জানতে চাই। কোথাও একটা ফাঁকি আছে তোমার কথায়।

সুজিৎ॥ সেই সন্দেহ! সেই আদিম সন্দেহ! তুমি কী করতে? আমার কী করা উচিত ছিল তখন?

কনিকা॥ দেশে পুলিশ নেই, আইন নেই, নারী কল্যাণ সমিতি নেই, পাড়া প্রতিবেশী নেই—শুধু তুমি আর।

সুজিৎ॥ কল্পনায় তো—আমি সব ভেবেছি, কিন্তু—বাজে বৃথা তর্ক।

কনিকা॥ তোমার উচিত ছিল গাঁয়ের একটা অশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করা। তাকে যা বিশ্বাস করতে বলতে, বিশ্বাস করত।

সুজিৎ॥ ঠিক তার উল্টো। সে হয়তো কনভেনশনটাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখত। অবিশ্বাস করত, কিন্তু প্রতিবাদ করত না। তোমার কাছে প্রত্যাশা করছি বিদ্রোহের। তুমি ঐ মহিলাটির কথা ভেবে দ্যাখো—

কনিকা॥ তুমি ঐ মহিলাটির কথা খুব বেশি ভাবছ না কি? এই শেষ।

সুজিৎ॥ (রাগে রেকর্ড বন্ধ করে দেয়) কী শেষ?

কনিকা॥ আমাদের বিশ্বাসের।

সুজিৎ॥ সত্যের কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে?

কনিকা॥ কোন্‌টা সত্য কে জানে? তোমার কথা না আজের সন্দেহ?

সুজিৎ॥ মনে হচ্ছে তুমি যেন এইরকম একটা মুহূর্তের সুযোগে ছিলে। বিশ্বাস গড়ার চেয়েও বিশ্বাস ভাঙার জন্য তুমি যেন তৈরি। যে গাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ, তুমি তার চেয়ে দুর্বল।

কনিকা॥ বিশ্বাস আমি ভাঙিনি। তুমি তার জন্য দায়ী। কথা দিয়ে সব কিছু চাপা দেওয়া যায় না।

সুজিৎ॥ কী চাপা দিয়েছি?

কনিকা॥ পুরুষ মানুষ এইভাবে ভান করে মেয়েদের চিরদিন ভুলিয়েছে। কিন্তু চিরকাল ধোঁকা দেওয়া যায় না। দা ওয়ার্ল্ড ইজ চেন্‌জিং অ্যাণ্ড ইউ ক্যান্ নট বেজিসট দা চেন্‌জ।

সুজিৎ॥ (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) দা ওয়ার্ল্ড ইজ চেন্‌জিং—পৃথিবী বদলাচ্ছে কিন্তু নারীপুরুষের সম্পর্ক বদলাবে না। নারীপুরুষের সম্পর্ক? সেই বদ্ধমূল ধারণা বদলাবে না। সেই পুরনো সন্দেহ, পুরনো অধিকার-বোধ। সেই আদিম আগুন নিভবে না। সেখানে তুমি বদলাবার কথা ভাবতে পার না, তুমি তো আর গাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে নও।

কনিকা॥ আমার সন্দেহ, পুরনো দিনের বদ্ধমূল সংস্কার, আমার অধিকার-বোধ আদিম, আর তোমার? তোমার সন্দেহ নেই, ঈর্ষা নেই, অধিকার বোধ নেই?

সুজিৎ॥ আছে। প্রবল ভাবেই আছে। আই অ্যাডমিট দ্যাট।

কনিকা॥ ঐ তো তোমার চালাকি!

সুজিৎ॥ আমি চালাকি করছি তোমার ধারণা?

কনিকা॥ আমার ধারণায় কিছু এসে যায় না। তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নেবে, আমার সিদ্ধান্ত আমি নেব।

সুজিৎ॥ কিন্তু কেউ কাউকে বুঝব না?

কনিকা॥ বোঝার দরকার নেই। বোঝার মতো চরিত্র তোমার নেই।

সুজিৎ॥ সত্যকে তুমি জানতে চাও না। শুধু অনুমান আর সন্দেহ—

কনিকা॥ সত্য? ওয়ান ইউ কেস্ ট্রুথ? ঐ যে জানকীরামের কথা রসিয়ে রসিয়ে বলছিলে, তুমি যদি ঐ রকম অবস্থায় পড়, জানতে চাইবে সত্য কি? তারপরেও তোমার ঐ গম্ভীর ভাষায় বক্তৃতা দেবার অভ্যেস থাকবে। ধর, আমি, আমি যদি—জানকীরামের বৌয়ের মতো কারো সঙ্গে চলে যাই—

সুজিৎ। এ সব হাইপোথেটিক্যাল ব্যাপার নিয়ে জীবন চলে না। তুমি সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলো। কণিকা, তোর কী মিলি?

কণিকা। তুমি কতটুকু জানতে চেয়েছ আমার সম্বন্ধে?

সুজিৎ। কী জানব? যা জানি তাই যথেষ্ট, তার বেশি দরকার নেই।

কণিকা। কেন দরকার নেই? সত্য আবিষ্কার বলে?

সুজিৎ। কী বলতে চাও, কণিকা?

কণিকা। এতদিন বলিনি, এবার বলব (চুপ করে যায়। সুজিৎও কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে যায়।) কিন্তু হয়তো এতদিনে বলা দরকার।

সুজিৎ। কী?

কণিকা। সত্য? (চুপ করে থাকে) হয়তো মিথ্যাই ভালো। সত্য জানলে হয়তো অনেক সম্পর্ক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সুজিৎ। হয়তো অনেক ভুলের অবসান। অনেক দুঃখের শেষ।

কণিকা। অথবা অনেক ট্রাজেডির সূত্রপাত। আমি অনেকদিন ভেবেছি বলব। ভেবেছি না বলাই ভালো। জানা বড় ভয়ঙ্কর।

সুজিৎ। না জানাও বড় ভয়ঙ্কর। (দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়) কে? (জানকীরাম ঢোকে) তুই? হঠাৎ এভাবে? ঢোকেছে আসছিস? মিলি কোথায় সারাদিন?

জানকীরাম। তাইরের কাছে। ও মেমসাহেব এসে গেছেন। কখন এলেন? (কণিকা চুপ করে থাকে) রান্না করেছেন? আমি বড় দেরি করে ফেলেছি—

সুজিৎ। ঠিক আছে, তুই যা। আমরা একটু ব্যস্ত আছি।

জানকীরাম। আজ রান্না তো আপনার বিমলবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন। তা আপনারা খাবেন তো?

সুজিৎ। ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, তুই যা।

জানকীরাম। মেমসাহেব, সাহেব আপনাকে বলেছেন, আমি একবার যাবে—

সুজিৎ। সে হবেখন। তুই যা, আমরা ব্যস্ত আছি।

জানকীরাম। ও, পাড়ার দুজন ভদ্রলোক এসেছেন। ওদের আসতে বলব? না বলে দিই আপনারা ব্যস্ত আছেন?

সুজিৎ। কে আবার?

জানকীরাম। ঐ যে—পাটি করে, সেবার আমের পুলিশ—

সুজিৎ কিছু বলার আগেই ছন্দেন আর পরেশ ঢোকে। বছর তেইশ চব্বিশ বয়স হবে ওদের। পাজামা-পাঞ্জাবী পরা। ছন্দেনের কাঁধে ব্যাগ। পরেশের হাতে একটা কাগজের কাগজ দেখা করে পাকানো। জানকীরাম কণিকার দিকে তাকিয়ে চলে যায়।

পরেশ। সরি টু ডিসটার্ব ইউ।

ছন্দেন।

সুজিৎ। কী চাই?

পরেশ। বিশেষ কিছুই নয়। আপনাকে দু মিনিট সময়।

সুজিৎ। কী ব্যাপার?

পরেশ। ব্যাপার ঐ সান্যাল এবং তার স্ত্রী কমলা সান্যাল। (কণিকা ভেতরে যাচ্ছিল। কথা শুনে ঘুরে দাঁড়ায়)

সুজিৎ। তা আমার কাছে—

ছন্দেন। আমার জেনে দরকার ছিল বলে আমি মনে করি না। কিন্তু জানলাম যে আজকের মিটিংটা আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো। আপনার আর সেন্সিটিভ কেসপেন্ডিং কেস—

সুজিৎ। দেখুন, এ ব্যাপারে আমি কোনো ইনভলভড—

ছন্দেন। হতে চান না। সে আমরা বুঝেছি।

সুজিৎ। আপনারা কী চান?

ছন্দেন। একজন ভদ্রমহিলা আপনাদের কাছে এসে হেল্প চাইলেন আর আপনি—

সুজিৎ। একজন বিপন্না মহিলাকে হেল্প করাটা কি অন্যায়?

ছন্দেন। অন্যায় নয় বলেই মনে করি। মনে করি সেটা উচিত। কিন্তু আপনিও কি তাই মনে করেন?

সুজিৎ। মানে?

পরেশ। একজন বিপন্না মহিলাকে হেল্প করাটা যে উচিত, এটা আপনি কখন রিয়ালাইজ করলেন? ওঁকে তাড়িয়ে দেবার পর?

সুজিৎ। তাড়িয়ে দেবার পর? মানে?

পরেশ। ছন্দেন, উনি মনে মুভতে পারছেন না। ঐ যে সান্যাল, আপনাদের প্রিয় নেতা, উনি কী মাল জানেন?

সুজিৎ। না, ওঁকে আমি জানি না।

পরেশ। তা জানবেন কেন?

ছন্দেন। জানবেন না কেন। জানেন, স্বীকার করার সাহস নেই। কিন্তু ওঁর নির্যাতিতা স্ত্রীকে সামান্য একটু হেল্প করলে কী ক্ষতি হত আপনার? সান্যাল কী করত ওর বদলে বা করত, আমরা জানি।

সুজিৎ। আমি কীভাবে হেল্প করব? আমি তো শুধু—

ছন্দেন। আপনি ওঁকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারতেন।

সুজিৎ। আমি তো তাই—আমি তো সাহায্য—

পরেশ। রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা যদি সাহায্য বলে করেন, তবে অবশ্যই করেছেন।

সুজিৎ আমি ওঁকে আশ্রয় দিইনি বলছেন?

ছন্দেন। বাড়িতে যদি থাকতে দাও যেন—জানি আপনারা কোনো আবেদন পড়তে চান না, আপনারা ভালোমানুষ। কিন্তু আমাদের তো খবর নিতে পারতেন। দেখে নিতাম। মুখোশ খুলে নিতাম।

সুজিৎ। কী বলছেন আপনারা?

ছন্দেন। কী বলছি? আপনি বাংলা না বুঝলে হিন্দিতে বলতে পারি, পরেশ দত্তগুপ্তের ছেলে, হিন্দিটা ভালোই বলে।

সুজিৎ। এখন কী চান?

ছন্দেন। কোন চাওয়া চাই না।

পরেশ। এবং বলতে চাই আপনার মতো লোক যতদিন সমাজে থাকবে ততদিন নারী নির্যাতন বন্ধ হবে না। আপনার কোনো সহানুভূতি নেই, সামাজিক সচেতনতা নেই, তারাই যতদিন সমাজের কী পরিমাণ-এ থাকবে ততদিন নারীমুক্তি কেন কোনো মুক্তি নেই। এই যে সান্যাল একটা ক্রমিনাল লেভেল, যে ওঁর স্ত্রীকে মার্ডার করার প্ল্যান করছে, তাকে আপনি সমর্থন করেন জেনে আমরা ডিসগাস্টেড বোধ করছি। চেয়ারে বসে পড়লেন যে। আপনার চোখ টেরা পড়ে ভেবেছিলাম—অবশ্য কোনো লেখার জোরে আলু নেই। আপনাদের ক্লাস, এ পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক। শুধু নিজের ইনটারেস্ট, নিজের কমফর্ট এই তো দেখছেন আপনারা। মিসেস দত্ত,

আমরা এসব কথার জন্য দুঃখিত, কিন্তু ভেবে দেখুন, ইউ আর এ উওম্যান, আপনার স্বামীর অত্যাচার—

কণিকা ॥ আপনারা বাজে কথা বলবেন না।

পরেশ ॥ পতি নিন্দা অবশ্যই খারাপ লাগবে, কিন্তু ব্যাপারটার—

সুচিৎ ॥ যাই হোক, আমি আর কিছু শুনতে চাই না। আমি সান্যালকে চিনি না, তার স্ত্রীকে চিনি না। আমি সাত্ত মতো তার স্ত্রীকে হেল্প করতে চেয়েছি। তিনি এখন কোথায় আমি জানি না। ব্যস্। আর নয়। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক।

কণিকা ॥ আপনারা ভালো করেই জানেন যে, মিসেস সান্যাল কাল রাতে এখানেই ছিলেন। পাড়া শুদ্ধ লোক জানে।

রূপেন ॥ আপনি তো অন্য কাহিনী শোনাচ্ছেন। (সিগারেট ধরিয়ে) একটা অ্যাশ-ট্রে পেতে পারি। আপনি বোধহয় স্মোক-টোক করেন না। না করাই ভালো। স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস্ টু হেল্থ।

পরেশ ॥ আর যা কিছু ইনজুরিয়াস টু হেল্থ, মানে পার্সোনাল কমফর্ট, তা আপনার ক্লায়েন্টের ভোগ করে না।

সুচিৎ ॥ আপনারা যদি মিসেস সান্যালকে নিয়ে এতই কনসার্নড্, আপনার ওঁকে হেল্প করুন।

পরেশ ॥ অবশ্যই। কিন্তু আগে ওঁকে আমাদের পাওয়ার দরকার।

সুচিৎ ॥ ওঁর কাছে যান তাহলে।

পরেশ ॥ কিন্তু সান্যাল ওঁকে ভয় করে নিয়েছে বলেই আমাদের ধরেছে। পুলিশে খবর দিয়েছে যে মিসিং, আসলে যে ভয়—

কণিকা ॥ আপনারা জানলেন কী করে?

রূপেন ॥ আমি। পুরো ব্যাপারটা পোলিটিক্যাল। সান্যাল একটা জাপানী কর্মের সঙ্গে ডীল করে কত লাখ টাকা মেরেছে জানেন?

কণিকা ॥ জাপানী কর্মের সঙ্গে—

রূপেন ॥ গত ইলেকশনের সময় যে তিনটি মার্ডার হয়, তার পেছনে কে জানেন?

কণিকা ॥ তার সঙ্গে এর—

পরেশ ॥ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এই তো আপনার প্রশ্ন। আছে। এবং মিসেস সান্যালের সঙ্গে এই নিয়েই গোলমাল। শী ওয়ান্টেড টু গিভ এ স্টেটমেন্ট টু দ্য পোলিশ। সান্যাল তাই—খুন করেন। ব্যাপারটা পোলিটিক্যাল।

কণিকা ॥ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তার মধ্যে—

পরেশ ॥ প্রত্যেকটা সম্পর্কই অলটিমেটলি পোলিটিক্সের দ্বারা ডিটারমিনড্। আপনারা যে ক্লাসের লোক, পোলিটিক্সকে লাইফ থেকে আলাদা করে রাখতে চান। কিন্তু ইট ইজ দ্য মোস্ট ইমপর্টেন্ট থিং ইন লাইফ। হ্যাঁ—সব সময়ই—উই ওয়ান্ট ইওর হেল্প।

সুচিৎ ॥ কী হেল্প? কাকে?

রূপেন ॥ আমরা সান্যালকে এক্সপোজ করতে চাই। ইউ নো হোয়াট কাইণ্ড অব হ্যারাসমেন্ট শী ইজ। একটা মহিলাকে ভয় করে ফেলল।

সুচিৎ ॥ কিন্তু আমি কী করব?

রূপেন ॥ কিন্তু আমি কী করব?

রূপেন ॥ একটা স্টেটমেন্ট দিন—আপনারা অত্যাচারিতা প্রথমই তো দিয়ে থাকেন—যে সান্যাল তার স্ত্রীকে মেরে বাইরে বের করে দেয়, আপনি ওঁকে রেসকিউ করেন—দিস উইল রিভোল্ট এ ওভ ইয়েস অব ইওরস, কী বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সান্যাল ওঁকে—

সুচিৎ ॥ কিন্তু আমি তো জানি না, সত্যি সত্যি সান্যালের সঙ্গে ওঁর স্ত্রীর কী হয়েছিল?

পরেশ ॥ একেবারে শুদ্ধ প্রমান চান?

সুচিৎ ॥ আমি কিছুই চাই না। অলরেডি হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানান্তর—

পরেশ ॥ স্থানান্তর, কীসের?

সুচিৎ ॥ মহিলাটিকে এখানে থাকতে দেবার জন্য, আর কি?

পরেশ ॥ ও, আপনার ধারণা আপনি মহিলাটিকে এখানে থাকতে দিয়েছিলেন? হে-হে। সেই জন্যই পুলিশ আর সান্যালের বাবা—ব্যাট্ কিউরিয়াস লর্ড—এসে আপনার ঘর থেকে মিসেস সান্যালকে শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে নিয়ে গেলেন। স্টোরীটা তৈরী করেছেন ভালো।

কণিকা ॥ আপনারা সান্যালের সঙ্গে কথা বলুন, এতই যদি আপনাদের—

রূপেন ॥ আপনাদের দাম্পত্য কলহে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু একজন মহিলা যিনি স্বামীর অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে আপনাদের দরজায় এলেন, তাঁকে সাহায্য করা কি আপনাদের কর্তব্য ছিল না? আপনারা প্রত্যেকে যদি দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে মহিলাকে আবার ঐ স্বামীর কাছে ফিরতে হবে। আমাদের ইন্টারেস্ট পোলিটিক্যাল, আমরা লার্জার সোস্যাল ইন্টারেস্ট-এর জন্য স্ট্রাগল্ করি—করবও। কিন্তু আপনাদের সামান্য সহযোগিতা আশা করাও কি অন্যায়? আপনারা যারা কালচার্ড, ইংরেজি বই-টই পড়েন, রবীন্দ্র সঙ্গীত পছন্দ করেন, ইংরেজি গান শোনেন, টিভিতে ভালো ভালো প্রোগ্রাম দেখেন—আপনারা শুধু দরজা বন্ধ করে দেবেন?

কণিকা ॥ তিনি মহিলা পুলিশের কাছে যেতে পারেন। নিজের মা, বাবা, আত্মীয় বন্ধু আছে। দেশে আইন আছে। আপনারা কি পুলিশ, আপনারা কি আইন?

পরেশ ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) না। না আমরা পুলিশ নই, আইন নই। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কিছু না করা। আপনারা তো মহিলার আত্মীয় নন। অতএব আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে কিছু না করা। আমাদের উচিৎ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। আইনের লম্বা হাতের জন্য অপেক্ষা করা। কোনো বিপন্ন মানুষকে সাহায্য না করাটা অপরাধ নয়। কোনো মৃত্যু পথযাত্রীকে যদি সাহায্য না করেন কেউ আপনাকে কোর্টে নিয়ে যেতে পারে না। আইনত কাউকে আপনি সাহায্য করতে বাধ্য নন। অক্টার অল্ কমলা সান্যালের মৃত্যুবরণের জন্য আপনি দায়ী নন। কোনো আইনই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না। বরং তাকে আশ্রয় দিলে নানারকম ঝামেলায় পড়তেন। নিরাপদে থাকাই ভালো। শুধু এখন অনুগ্রহ করে বলবেন না, আর বলবেন না, যে আপনি কাল রাতে তাকে এখানে রেখেছিলেন। মিথ্যা কথাটা বলবেন না।

সুচিৎ ॥ আমি মিথ্যা বলছি?

পরেশ ॥ না, আপনি সত্য বলছেন। (কণিকার দিকে) আপনি কী বলেন? ইনি সত্য বলছেন?

পরেশ ও রূপেন চলে যায়। টেলিফোন বাজে। কণিকা ও সুচিৎ কেউ টেলিফোন ধরে না। দুজনেই স্থির হয়ে বসে থাকে।

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

সুজিতের বসার ঘর। সন্ধেবেলা। সুজিৎ ঘড়ির দিকে তাকায়। দরজায় টোকা। সুজিৎ উঠে দরজা খোলে। নিরঞ্জন সান্যালের প্রবেশ। নিরঞ্জন সান্যালের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বলিষ্ঠ চেহারা। মুখে পান এবং হাসি। কথাবার্তা স্পষ্ট এবং দৃঢ়। ডান হাতের আঙুলে একটা ব্যাণ্ডেজ। পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবী ও আচকান। মাথায় কাশ্মীরী টুপি। হাতে শৌখিন ছড়ি। ডান হাতে তিন আঙুলে তিনটে আংটি। চতুর্থ আঙুলে ব্যাণ্ডেজ, ফলে বোঝা যায় না সেখানেও আংটি আছে কিনা।

সান্যাল ॥ হ্যাঁ, আমিই নিরঞ্জন সান্যাল।

সুজিৎ ॥ বহুকাল আগে একবার আলাপ হয়েছিল, সে বোধ হয় আপনার—

সান্যাল ॥ (সোফায় বসে) মনে আছে। আগেই আসা উচিত ছিল আমার। এক পাড়ায় থাকি। যাক্—এখন বুঝতেই পারছেন, কাজেই এসেছি।

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ, আপনি টেলিফোনেও তাই বলেছিলেন। (বসে) কিন্তু—

সান্যাল ॥ বলছি বাড়িতে আপনি কি একা?

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ, আমার স্ত্রী একটু বাইরে গেছেন। একটু পরেই—

সান্যাল ॥ ভালোই হ'ল। সেদিন আমার ব্যবার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে শুনলাম।

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ। উনি বোধহয়—

সান্যাল ॥ ওঁর কথাবার্তায় কিছু মনে করবেন না। হাই ব্লাডপ্রেসার হাই ব্লাডসুগার, হাইপারটেনশন—ওঁর সবই হাই। আপনাকে নিশ্চয়ই কটু কথা বলেছেন।

সুজিৎ ॥ না, মানে—

সান্যাল ॥ সেজন্য আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি। আমার আসার একটা কারণ তাই।

সুজিৎ ॥ না, না। ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? ওঁর পক্ষে রাগ করা স্বাভাবিক—

সান্যাল ॥ থ্যাঙ্ক ইউ। আমিও জানতাম যে আপনি ওঁকে ভুল বুঝবেন না। অনেক সময়ই ওঁর জন্য আমাকে খুবই এমব্যারাস্ড হতে হয়। আসলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা খুব প্লেজেন্ট নয়, ইন ফ্যাক্ট কারো সঙ্গেই খুব প্লেজেন্ট নয়। হওয়া কঠিন। পুওর ওল্ড ম্যান। তাই হোক—কতদিন আছেন এ পাড়ায়?

সুজিৎ ॥ বছর দেড়েক হ'ল।

সান্যাল ॥ ফ্ল্যাটটা খারাপ নয়, কী বলেন?

সুজিৎ ॥ আমাদের পক্ষে হাইলি অলরাইট। এর চেয়ে ভালো আর কোথায় পাব?

সান্যাল ॥ কমলা কোথায় জানেন?

সুজিৎ ॥ কমলা?

সান্যাল ॥ আমার স্ত্রী।

সুজিৎ ॥ ও, ও, হ্যাঁ। না, আমি তো কিছুই জানি না।

সান্যাল ॥ দেখুন, পুরো ব্যাপারটাই একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমি এসব ব্যাপারে পুলিশ-টুলিশ পছন্দ করি না। তবে ইনস্পেক্টরের অনুরোধ পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। আসলে স্ত্রী হারাল ভেরি কিউ প্রেসেন্ট টু দো। কাজেই সমস্যাটা ডীল করা যেত। তা আপনি জানেন না।

সুজিৎ ॥ না, আমি সত্যিই জানি না।

সান্যাল ॥ (সামনে পড়ে থাকা বইটা তুলে নিয়ে) না জানেন, কিন্তু বলবেন না। আপনারা শিক্ষক তো, তাহলেও যে একেবারে সত্য গোপন করাই ভালো। একজন উম্যান ইন ডিসট্রেস্, আজকাল নারী স্বাধীনতা নিয়ে তো আপনি খুব লিখছেন-টিখছেন শুনি।

সুজিৎ ॥ আমি কোনো সত্যই গোপন করতে চাই না মিঃ সান্যাল, আমার ধারণা ছিল যে তিনি, মানে আপনার স্ত্রী, এখানেই ছিলেন। কিন্তু আপনার বাবা এবং ইনস্পেক্টার-এ—

সান্যাল ॥ চতুর্বেদী॥

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ, চতুর্বেদী, দু'জনেই দেখে গেছেন—তিনি তখন এখানে ছিলেন না। আমি ঠিক বুঝতে—

সান্যাল ॥ হ্যাঁ, সে কথা শুনেছি। (পানের মশলা বার করে) খাবেন?

সুজিৎ ॥ না! আমি কিন্তু কিছুই জানি না।

সান্যাল ॥ (মুখে মশলা নিয়ে) কমলা আপনাকে বলেছিল যে তার প্রাণ সংশয়ে—

সুজিৎ ॥ হ্যাঁ, বলেছিলেন।

সান্যাল ॥ আপনি কি তা বিশ্বাস করেছিলেন?

সুজিৎ ॥ অ্যাঃ—মানে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করি নি।

সান্যাল ॥ করেননি?

সুজিৎ ॥ দেখুন আমি ব্যাপারটাতে সত্যি সত্যি পাঞ্জলড্। আমার বিশ্বাস—অবিশ্বাস খুব ডেলিকেট নয়।

সান্যাল ॥ না, না। আপনারা কাগজে নানা খবর পড়েন, আমাদের দেশে নারী নির্যাতন, স্বামী বা শ্বশুরের শ্যালিকার চক্রান্তে বধূ হত্যা, কেরোসিনে পুড়িয়ে মারা। কাজেই—নো, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউ। কিন্তু কমলার ক্ষেত্রে এগুলো সত্য নয়। কমলা সঙ্গে আমার বিয়ে হয় চার বছর আগে—হ্যাঁ, আমাদের বয়সের বেশ তফাৎ আছে। কমলার ডিভোর্সে টু এ পুওর ফ্যামিলি—ভেরি পুওর। আমার বাবা কমলার পরিবারকে জানতেন। হী অ্যাবেটেড হিম, অ্যাণ্ড আই এনকারেজড্। যাকে আপনারা বলেন ট্রাডিশনাল ম্যারেজ। আমি একটু ট্রাডিশনাল। তাই হোক, কোনো টাকার আশায়, এই বিয়ে হয়নি। তার ফ্যামিলি হ্যাড নো মানি, আমাদেরও সে নিয়ে কোনো কমপ্লেন ছিল না। আমি ঠিক ওয়েলথী নই, কিন্তু পয়সা কম নেই। প্রপিটিয়স করি—আমাদের পার্টি এখন পাওয়ারে, কাজেই—

সুজিৎ ॥ আপনি খুব ভালভাবে জীবন কাটাচ্ছেন—

সান্যাল ॥ ইয়েস্ এ ফ্যাক্ট। পাওয়ারে থাকার পরও যে রাজনৈতিক নেতার পয়সা হয় না, বুঝবেন সে নির্ঘোষ। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সে রকম নির্ঘোষ লোক একজনও নেই। হ্যাঁ, আসল কথাটা হল কমলার ব্যাপারে কোনো টাকা-কড়িগত ব্যাপার—মানে অ্যাবনী—না, সেরকম সমস্যা নেই। কাজেই তার প্রাণ সংশয়ের ব্যাপারটা তার কল্পনা।

সুজিৎ ॥ না, অ্যাবনীর কথা তিনি বলেননি। তবে ওঁকে মেরে ফেলা হতে পারে এইরকম ভয়—

সান্যাল ॥ বলুন— কেউ ওঁকে হত্যা করতে পারে এই রকম একটা ধারণা ওঁর হয়েছিল।
দী ওয়াজ অ্যাবসোলিউটলী চেরিফারেড অ্যাট দ্যাট টাইম।'

সান্যাল ॥ হত্যা! না। আমার মা-বাবার পক্ষে কমলাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। আর আমি—নো, আই হ্যাভ নো ইনটেনশন টু কিল হার।

সুস্মিৎ ॥ না, না, আমি—

সান্যাল ॥ দেখুন, রাজনীতিতে হত্যা অনেক সময়ই প্রয়োজন। কিন্তু এখানে কোনো রাজনীতি নেই। আমার মা, বাবা কমলার প্রতি বিরক্ত, দে ওন্ট দী আর হ্যাপী ইফ দী ডাইড—কিন্তু।

সুস্মিৎ ॥ আপনার কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে না যে কেউ মারা গেলে আপনি দুঃখিত হবেন।

সান্যাল ॥ (হেসে) না, এত বড় কমপ্লিমেন্টের যোগ্য আমি নই। কেউ কেউ মারা গেলে আমি সুখী হই। কিন্তু কেউ কেউ মারা গেলে আমি দুঃখিত হব। আই মিন কমলা ইজ ওয়ান অব দেম।

সুস্মিৎ ॥ আপনার বাবা তো ওঁকে মানসিক রোগী মনে করেন। সে ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ের ব্যাপারটা কল্পনাই—

সান্যাল ॥ না, তা নয়। পুরোটা নয়।

সুস্মিৎ ॥ মনে অন্য কেউ ওঁকে—

সান্যাল ॥ না।

সুস্মিৎ ॥ তাহলে?

সান্যাল ॥ নিজে, নিজে। দী হ্যাজ সেল্ফ ইজ হার ওন এনিমি।

সুস্মিৎ ॥ আত্মহত্যার প্রবণতা—

সান্যাল ॥ দী ইজ হনটেড বাই হার ওন মিসট্। নিজের অপরাধ, নিজের পাপ। সেই অপরাধবোধ ওকে হন্ট করে। কিন্তু সেটাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে একটু স্বস্তি পায়।

সুস্মিৎ ॥ আই সী। কিন্তু আমাকে এসব বলছেন কেন?

সান্যাল ॥ কারণ আই রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক। অনেকটা আপনার ইনভলভমেন্টের জন্যই লোকে বিশ্বাস করতে পারে যে কমলাকে আমি নির্যাতন করি, আর সেই জন্যই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন লোক এটাকে বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারে। আমার শত্রু অনেক। নিজের দলের মধ্যেই রাইভ্যালস্ আছে, তারা একসপ্লয়েট করবে। হয়ত পি এম পর্যন্ত যেতে পারে। আমার ইমেজ—পলিটিক্যাল ইমেজ তাতে কিছুটা ড্যামেজড্ হতে পারে।

সুস্মিৎ ॥ কিন্তু আমি কী করব? আমি এর মধ্যে—

সান্যাল ॥ হয়তো আপনি ইচ্ছে করে এর মধ্যে ইনভলভড্ হননি। বা আপনি হয়তো ইনভলভড্ (সুস্মিৎ প্রতিবাদ করতে যায়) না, আমি কোনো ইঙ্গিত করছি না। ধরুন ঘটনাচক্রে আপনি এর মধ্যে এসে পড়েছেন। আমার অনুরোধ, আপনি এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবেন না, এবং এ পর্যন্ত যা বলেছেন, তা উইথড্র করুন।

সুস্মিৎ ॥ কী বলেছি, কী উইথড্র করব?

সান্যাল ॥ পুলিশের কাছে বলেছিলেন যে কমলা এখানে এসেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করলে বলুন যে এসেছিল ঠিকই, তবে প্রতিবেশী হিসেবে। এবং দু'চার কথার পর সে চলে যায়। ব্যাস্। আপনি আর কিছু জানেন না।

সুস্মিৎ ॥ কিন্তু আমি তো—

সান্যাল ॥ অলরেডি চতুর্বেদীকে বলেছেন। এই তো? সেটা আমি দেখছি। আপনি তো কোনো কমপ্লেন লজ করেননি। সোজা কথা হল কমলা এখানে ছিল না। সে আপনাকে ঐ হত্যা-টত্যা সম্বন্ধে কিছু বলেনি। আপনি কিছু জানেন না।

সুস্মিৎ ॥ কিন্তু—

সান্যাল ॥ দেখুন, এতে আপনার সম্বন্ধেও কোনো কথা উঠবে না। আপনি তো অধ্যাপক—একজন মহিলা এখানে এসেছিলেন ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা হতে পারে—কাজেই। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে—সান্যালের ব্যাপার বলেই আসতে পারে, কিন্তু আপনি কোনো কথা বলবেন না। ইতিমধ্যেই অনেক রকম খবর ছড়াচ্ছে, যেমন আমি কমলাকে গুম করে দিয়েছি। আমিও একটা গুজব সারকুলেট করে দিয়েছি যে কমলাকে আপনি এন্টারটেন্ করেন নি—

সুস্মিৎ ॥ আপনি?

সান্যাল ॥ হ্যাঁ। এর একটা পোলিটিক্যাল অ্যাঙ্গল আছে। যাইহোক সেটা নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। ইউ হ্যাভ নাথিং টু ফিয়ার: রাদার ইউ উইল সেন ফ্রেণ্ড। নিরঞ্জন সান্যাল বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু।

সুস্মিৎ ॥ আপনি বলতে চান—

সান্যাল ॥ মিসেস সান্যাল আপাতত নিখোঁজ। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে। দি ম্যাটার এনডস্ দেয়ার। ব্যাস্। কী ভাবছেন, আমি একটা ভিলেন?

সুস্মিৎ ॥ না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যটা তাহলে কি?

সান্যাল ॥ সত্য? মানে ট্রুথ? আমি যা বলব তা তো বিশ্বাস করবেন না: সত্য জানা বড় কঠিন। দু'রেকটা কথা বলি—সিনস্ ইউ আর ইন্টারেস্টেড। আপনাকে বলেছি কমলার সঙ্গে আমার হঠাৎ বিয়ে হয়েছিল। আমি তার পরিবারের অত্যন্ত উপকার করেছি, তার বাবা, তার মা, তার ভাই—সকলের। তাকেও প্রেম করেছি, শুভানুধ্যায়ী, চাকরি পেতে। তার অসুখী হবার কোনো কারণ নেই। দী ওয়াজ এ টাডিশনাল উয়োম্যান: হঠাৎ—হঠাৎই বলব—দী স্টার্টেড চেঞ্জিং—বদলাচ্ছে—

সুস্মিৎ ॥ বদলাচ্ছে মানে—

সান্যাল ॥ (সুস্মিতের কথায় কান না দিয়ে) আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্যাট। এডুকেশন খুবই খুবই গুরুতর ব্যাপার। এডুকেশন যে কবেই আসুক মানুষকে বদলে দেয়, এটা আমরা পলিটিশিয়ানরা আপনাদের চেয়ে ভালো বুঝি। তারপর চাকরি—ইকনমিক ইনডিপেনডেন্স্—দুটো মিলে কমলা একটি পরিবর্তিত সত্তা।

সুস্মিৎ ॥ সেইজন্যই ওঁর সঙ্গে আপনার মা-বাবার গোলমাল, আপনার সঙ্গে গোলমাল।

সান্যাল ॥ খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছেন সুস্মিৎবাবু। কিন্তু তাড়াতাড়ি বোঝা মানেই ঠিক বোঝা নয়।

সুস্মিৎ ॥ (উত্তেজিতভাবে) আমি কিন্তু আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। আপনি আপনার স্ত্রীর স্বাধীন বিকাশের বিরোধিতা করছেন এটা জানবার পর আমি আমাকে

সমর্থন করতে পারি না। এ ব্যাপারে কোনো ইনভেস্টিগেশান হলে আমি চুপ করে থাকতে পারব না।

সান্যাল ।। তাই সী। স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থনে আপনার ভূমিকা গৌরবময় হোক।

টেলিফোন বাজে। সুজিৎ টেলিফোন ধরে।

সুজিৎ ॥ হ্যালো—হ্যাঁ-হ্যাঁ-ও, ধরুন দিচ্ছি। (সান্যালের দিকে) আপনার টেলিফোন—

সান্যাল ॥ আমার! একটু নিরিবিলিতে বলে কথা বলারও—(উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে) হ্যালো—হ্যাঁ—বসতে বল-কয়েক মিনিট পরেই আসছি। ঠিক আছে হ্যাঁ-হ্যাঁ বসতে বল। (টেলিফোন রেখে দেয়) সুজিৎবাবু, বেশিক্ষণ বসব না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনারা মডার্ন, আপনাদের এক্সপিরিয়ান্স জানা দরকার। ধরুন, যদি জানেন আপনার স্ত্রী অন্য পুরুষে অনুরক্ত, হাউ উড ইউ রী-অ্যাক্ট? বোধহয় ডিভোর্স করবেন? পশ্চিমে তো অবশ্যই হচ্ছে, আমাদের দেশেও—

সুজিৎ ॥ যদি স্বামী-স্ত্রীতে ভালোবাসা না থাকে, সেক্ষেত্রে ডিভোর্সই সঙ্গত। যে কারণ বী ছাপি।

সান্যাল ॥ হ্যাপিনেসের কোনো গ্যারান্টি আছে?

সুজিৎ ॥ হ্যাপিনেসের গ্যারান্টি তো বিবাহিত জীবনেও নেই। তাই বলে—

সান্যাল ॥ প্রায়ই তো হয়, একজন স্বামী হয়তো কোনো মহিলার প্রতি আসক্ত কিংবা স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের প্রতি। ধরুন একজন আরেকজনের এই আসক্তির ব্যাপারটা জানে না। সত্যটা জানে না বলেই একজন মনে করে সে সুখী। ধরুন, আপনি আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলেই মনে করছেন সী ইজ ডিভোটেড টু ইউ। কিংবা তিনি আপনার অন্য কোনো আকর্ষণের কথা জানেন না বলেই তিনি ভাবছেন—

সুজিৎ ॥ এ তো এক ধরনের প্রতারণা। এরকম সম্পর্ক চলা উচিত নয়। সত্য স্বীকার করা উচিত।

সান্যাল ॥ সত্য! আচ্ছা ধরে আপনারা প্রেটেনিক লাভ বলেন, সেটা তো মনে মনে। তার সঙ্গে কোনো দৈহিক সম্পর্ক নেই। কবিতায় খুব চলে, খুব গ্লোরিফাই করাও হয়। সেটা কি জীবনে স্বীকার করেন? করা উচিত? সেটা কি প্রতারণা নয়?

সুজিৎ ॥ জানে—সেটা—

সান্যাল ॥ দেখুন ম্যারেজ ইনস্টিটিউশনে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল দৈহিক শুচিতা। মানসিক শুচিতার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাই না আমরা, কারণ সেটা কন্ট্রোলের বাইরে।

সুজিৎ ॥ আপনি যেসব কথা বলছেন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী বুঝতে পারছি না। (হঠাৎ) একটা কথা বলবেন? আপনি সেদিন রাত্রে বাড়ি ছিলেন না—আপনার বাবা অসুস্থ তাই বলেছিলেন। ইজ ইট ট্রু?

সান্যাল ॥ সন্দেহ আছে?

সুজিৎ ॥ একটা গুজব যে আপনার স্ত্রী আপনাকে ছুরি মেরে—

সান্যাল ॥ (আঙুল তুলে) ও! ব্যাডেজটা! ইয়োর গেস্ ইজ রাইট, আমি বাড়ি ছিলাম। তবে ঘটনাটা গুজব। দেখুন, আমারও একটা গেস্ আছে—আমার অনুমান আপনি আমার স্ত্রীকে খুব ভালোই চিনতেন।

সুজিৎ ॥ আমি একেবারেই চিনতাম না। ইউ আর রং।

সান্যাল ॥ রং রাইট, রং রাইট। আমার অনুমান ঠিক নয়। আমি বলতে চাই সত্যটা ঠিক মতো জানি না বলেই অনুমান। কিন্তু ধরুন যদি সত্য জানা যায়, তখন আমরা কি করব। যদি হঠাৎ জানেন আপনার স্ত্রীর একজন প্রণয়ী আছে, আপনি কি শান্ত মনে বলবেন, ঠিক আছে, আমরা ডিভোর্স করব, কোর্টে যাব। এই কথা বলে টাইপ করতে বসবেন? আচ্ছা না হয় বিয়ে ধরুন তো অচেনা মনে করেন না আপনারা। কাউকে বিয়ে করেছি বলেই চিরদিন ভালোবাসতে হবে বা ভালোবাসা সম্ভব, এমনতো নয়। আর ভালোবাসা না থাকলে বিবাহ ব্যাপারটা প্রতারণা। আপনিই বলেছেন। কাজেই প্রতারণার মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই থাকবেন না। আপনি সত্যকে স্বীকার করে নেবেন। এবং অন্যভাবে আপনার সুটকেস্ প্যাক করবেন কিংবা আপনার স্ত্রীর সুটকেস প্যাকিং-এ সাহায্য করবেন ইজন্ট দ্যাট সিভিলাইজড?

সুজিৎ ॥ সে রকম হলে তো ভালো হত।

সান্যাল ॥ কিন্তু সে রকম হয় না। কেন হয় না ভেবেছেন কেন হয় না? কেন মানুষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে? কেন খুন হয়? কেন মানুষ ভায়োলেন্ট হয়? কেনই বা স্ত্রী মেনে নিতে পারে না? কেনই বা পুরুষ মেনে নিতে পারে না? সে কি তারা যথেষ্ট শিক্ষিত নয় বলে। সোসিওলজি পড়েনি বলে? আপনি কি জানেন, শুধু গ্রামের অশিক্ষিত মানুষই হঠাৎ রাগের মাথায় কুড়ুল বসিয়ে দেয়? মিডিয়া তার স্বামীর আরেকটি বিয়ে করার খবর পেয়ে ছেলে দু'টোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল সে কি বর্বর ছিল বলে? ওথেলোর রাগের গলা টিপে মেরেছিল সে নিগ্রো বলে? একটা কিছু বলুন স্যার? মানুষের মনের মধ্যে একটা আদিম আগুন জ্বলছে—সেটা সত্য নয়?

সুজিৎ ॥ আপনি—আপনি কি এইসব হত্যা, এইসব কাজ বলে মনে করেন, উচিত মনে করেন?

সান্যাল ॥ উচিত-অনুচিত, কাজ-অকাজ সব ইররেলিভেন্ট। হ্যান উইল রিজেন হ্যান অ্যাণ্ড উয়োম্যান উইল রিজেন উয়োম্যান। তাদের সম্পর্ক আরো জটিল, আরো আদিম। এলিমেন্টাল। এটা যদি না বুঝে থাকেন, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

সুজিৎ ॥ আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ফরচুনেটলি আমার সে রকম অবস্থা হয়নি, আশা করি হবেও না। হলে দেখব—কী করা যায়।

সান্যাল ॥ তাই দেখবেন। একটা কথা আপনাকে বলি—কামলা, আমার স্ত্রী হঠাৎ যে বাড়ি থেকে চলে গেলেন, সেটা আমার দোষ নয়। সী হ্যাজ এভরি রিজন্ টু বী রেসেন্টফুল টু মী। আমি তাকে কখনও অসম্মান করিনি। বিবাহিত জীবনের কোনো আইন ভঙ্গ করিনি। কোনো আইন—না আন্তরে, না মনে মনে। সে চলেছে তার জীবন বিপন্ন, কিন্তু আমার জন্য নয়। তার নিজের জন্য। মাই পেরেন্টস্ যে বী হার্ট অন হার, কিন্তু তারা কেউ কেরোসিন ঢেলে তাকে পোড়াতে যায়নি। আমার পলিটিক্যাল অপোনেন্টস্ এ নিয়ে গল্প বানাতে পারে, আমাকে অত্যাচারী স্বামী তৈরি করে নারী কল্যাণ সমিতি আন্দোলন করতে পারে, আপনার মতো স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখকদের সহানুভূতি অর্জন করতে পারে, কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী নই।

সুজিৎ ॥ তাহলে তিনি ভয়ার্ত অবস্থায় আমার কাছে এসেছিলেন কেন?

সান্যাল ॥ আপনার কাছে কেন এসেছিলেন সেটা আপনি জানেন। কিন্তু ভয়ার্ত অবস্থায় যে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয়টা তাঁর প্রসবের নয়।

সুজিৎ ॥ তবে কার?

সান্যাল ॥ আমি বলেছিলেম, তাঁর সন্তানকে আমি গ্রহণ করতে পারব না। (সুজিৎ কিছু বলতে চায়। কণিকা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। সান্যাল উঠে দাঁড়ায়) ঐ সন্তান আমার নয়। (সান্যাল আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়)।

সুজিৎ ॥ বর্বর!

কণিকা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জনক আজকাল ঘরে আসে। সুজিতেরবসার ঘর। সোফায় বসে আছে কণিকা, বিমল এবং সুজিৎ। জানকীরাম ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

জানকীরাম ॥ দিন পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসব।

সুজিৎ ॥ ঠিক আছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছিস তো?

জানকীরাম ॥ হ্যাঁ, সাব।

বিমল ॥ কোথায় যাচ্ছে?

সুজিৎ ॥ ও দাঁরে যাচ্ছে।

বিমল ॥ ও, আচ্ছা, আচ্ছা, ওর বৌয়ের বিচার সভায়?

সুজিৎ ॥ (ম্লান হেসে) হ্যাঁ।

বিমল ॥ সীতার অগ্নিপরীক্ষা। কবে যাচ্ছ বাবা? আজ রাত্রেই?

জানকীরাম ॥ আজই, আর ঘন্টা দুয়েক পরেই ট্রেন।

সুজিৎ ॥ আচ্ছা, যা।

জানকীরাম ॥ চলি, মেমসাহেব। নমস্তে। নমস্তে সাহেব। (জানকীরাম চলে যায়)

সুজিৎ ॥ কোনো কথাই বললে না যে—

কণিকা ॥ আমার কী বলার আছে? কোন্ দেশে আছি। বিচার হবে। বিচারে কি হবে সবাই জানে।

সুজিৎ ॥ তা কেন?

কণিকা ॥ ঐ বৌকে ও আর ঘরে নেবে? ও তো ভেজা বেড়ালের মতো চুপ করে আছে।

সুজিৎ ॥ ও আর কী করবে? পঞ্চায়েৎ—

কণিকা ॥ পঞ্চায়েৎ কি বলবে ও ভালো করেই জানে। ওর কি। আরেকটা বিয়ে করে একমাস পরে ফিরে আসবে। সব জানা আছে।

বিমল ॥ আগে তবু অগ্নিপরীক্ষা-টরীক্ষা ছিল। দু একজন এসকেপ্ করে যেত, কিন্তু এখন ঐ পঞ্চায়েৎ। বাবা, ওর হাত থেকে উদ্ধার নেই।

কণিকা ॥ অগ্নিপরীক্ষা থেকে কেউ এসকেপ্ করত না।

বিমল ॥ কেন, সীতাই ধর না। যাই হোক বেঁচে তো গেল, রাম তো আবার সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরল।

কণিকা ॥ মেয়েমানুষকে নিয়ে পুরুষের সন্দেহ কখনও ফুরোয় না। কেউ অগ্নিপরীক্ষা করতে বলেছিল রামকে? নিজের মনের সন্দেহ, তাই অগ্নিপরীক্ষা। আর সেই সন্দেহ কোনদিন শেষ হয়নি। তাই আবার সীতাকে তাড়িয়েছিল। তাই আবার অগ্নিপরীক্ষার কথা উঠেছিল। ওর থেকে কোনো এসকেপ্ নেই মেয়েদের। সেই রামচন্দ্রই পুরুষদের আইডিয়াল।

বিমল ॥ আর সীতার আইডিয়ালটা?

কণিকা ॥ ওটা পুরুষেরা মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে—মীক্, সাবমিসিভ, ফেথফুল।

সুজিৎ ॥ মেয়েরা সন্দেহ করে না?

কণিকা ॥ করে বৈকি। কিন্তু পুরুষের অগ্নিপরীক্ষা নেই। সীতার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল, রামচন্দ্র তুমি কোথায় কি করেছিলে তার কী জবাবদিহি দেবে? রামচন্দ্র অবশ্যিলায় কিন্তু বলতে পারে। রাজ্যের লোক সীতা সম্বন্ধে কী বলছে না বলছে, শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উনি বললেন, গেট আউট। আসলে সীতার ওপর রামের সবসময় সন্দেহ ছিল—হী নেভার ট্রাসটেড হার। নিজের সন্দেহটা সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ভালোমানুষ সেজে বসেছেন: তোমাদের জানকীরাম ঐ করবে দেখে নিও।

বিমল ॥ যা! কিন্তু রাম তো অন্য রাজা-রাজড়ার মতো গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করেনি। সোনার সীতাও গড়ে নিল, বিয়ে তো করতে পারত। যেমন জানকীরাম করতে চাইছে।

এটেই তো চরিত্রের কন্ট্রাডিকশন। যদি সোনার সীতাই গড়তে পারো, তো সীতাকে ঘরে রাখতে পারো না কেন? লোকের কথায় স্ত্রীকে দুশ্চরিত্রা বলে ত্যাগ করলে। মূর্তি গড়লে লোকে বলবে না, দুশ্চরিত্রার মূর্তি? যার অনেকগুলো বিয়ে না করতে পারে, কিন্তু পুরুষের বেসিক ইন্সটিংক্ট ছাড়েনি। বৌয়ের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ। সতীত্ব ইনটাক্ট থাকা চাই।

কেন, সেটা থাকতে হবে না?

আর পুরুষের সেটা দরকার নেই?

দরকার হবে না কেন? কিন্তু একটা আর একটার ওপর নির্ভরশীল? একজন ব্যভিচারী হলেই অন্যকেও ব্যভিচারী হতে হবে?

কিন্তু একজন তাহলে অন্যের সতীত্ব ডিমান্ড করতে পারে না। জানকীবাবু যদি ওর বৌয়ের সতীত্ব বিচার করতে চায়, ওর বৌও ওর কাছে কিন্তু ডিমান্ড করতে পারে। এটাকেই আমি বলি ইকোয়ালিটি।

আমি বাপু ঠাট্টা করে কথাটা তুলেছিলুম। তবে কনিকার হাস্যকর ব্যাখ্যা শুনে আমি উপকৃত হলুম। ডুরেন্ড সাহেব গ্রীক পুরাণ থেকে ইতিহাস কমপ্লেক্স-এর কথা বলেছিলেন। আমি বলতে পারি রামচন্দ্র কমপ্লেক্স। একটা পেপার লিখে ফেলতে পারি সুস্মিৎ। পুরুষ মানুষের মনে নারীর দৈহিক সতীত্ব সম্বন্ধে যে আদিম সন্দেহ বা ভয় বা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি. একে বলতে পারি তাহলে রামচন্দ্র কমপ্লেক্স। থ্যাঙ্ক ইউ, কনিকা। আর ইউ সেরিয়াস? আমি কিন্তু কোয়াইট সেরিয়াস। কোন ব্যাপারে তুমি সেরিয়াস নও। (টেলিফোন বাজে। সুস্মিৎ টেলিফোন ধরে)

হ্যালো—ইয়েস—ডঃ ব্যানার্জী—বলুন। (বিস্ময়ের ভিতে) তোমাকে ডাকছে হাসপাতাল থেকে—

হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই আসছি। থ্যাঙ্ক ইউ। (টেলিফোন রেখে দিয়ে) আমার তাড়া আছে। চলি। আচ্ছা, কনিকা, ডিসকাসনটা জমে উঠেছিল, পরে আবার হবে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব। (যেতে যেতে) শোনো, সান্যাল আসতে পারে, ধরিও, আমি আসছি। (চলে যায়)।

সান্যাল? এখানে কেন আসবে?

তুমি কি সত্যি সত্যি মনে কর যে পুরুষ মানুষের মনে একটা আদিম সন্দেহ আছে। মেয়েদের চেস্টিটি, আই মীন, সতীত্ব নিয়ে?

আমি কী মনে করি, তা জেনে হবে কি? তবে আমি সত্যিই মনে করি।

মেয়েদের মনে নেই?

পুরুষের চেস্টিটির কোনো কন্সেপশান্ আছে? সতীর কোনো পুলিস আছে?

এটা একটা আর্গুমেন্ট? তাছাড়াও সতীর পুলিস নেই, অতএব পুরুষের এ্যাডালটারির জন্য বিচার হয় না? সে যে কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে? নারী পুরুষের কাছে একনিষ্ঠতা দাবী করে না?

একনিষ্ঠতা ভালোবাসার স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষদের ফর্স্ট অ্যাণ্ড মোস্ট দাবী হল দৈহিক চেস্টিটি। আমাদের অগ্নিপরীক্ষা মানে পুরুষের চেস্টিটি টেস্ট, এই সেদিন সভা ইলেকশনে রামকুমারী অরুনার ভার্জিনিটি টেস্ট—সব সেই দাবীর প্রকরণ। মেয়েমানুষ পুরুষকে কবে পরীক্ষা করেছে?

সুস্মিৎ। পারলে তুমি আমার পরীক্ষা নিতে?

কনিকা। পারলে তুমি নিতে না?

সুস্মিৎ। আমি তোমাকে সন্দেহ করি। হোয়াট্ অ্যান আরিথমিয়া। না, সন্দেহ মানুষের মোর এটা আমি বিশ্বাসই করি না। প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীকে খালি সন্দেহই করে, অবিশ্বাস করে, এটা আমি জানতে প্রস্তুত নই।

কনিকা। তোমাদের মনু সংহিতার নির্দেশ, কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে কথা বলবে না, সে মা-ই হোক আর—

সুস্মিৎ। পারলে মনু সংহিতার নির্দেশটা তুমি সকলকে মানতে বাধ্য করাতে?

কনিকা। হোয়াট্ ডু ইউ মীন?

সুস্মিৎ। সেদিনের ঘটনাটা তুমি সহজভাবে নেনে নিতে পারনি।

কনিকা। আমার ক্ষেত্রে হলে, তুমিও মানতে না। সান্যাল যেমন মানবে না।

সুস্মিৎ। (হেসে দিয়ে) সান্যাল কী মানবে না মানবে তাতে আমি ইন্টারেস্টেড নই। তার স্ত্রী সম্বন্ধে তার অভিযোগ থাকতে পারে, আমার সঙ্গে তার কি?

কনিকা। আমি ওর কী জানি? (চুপ করে থাকে) সান্যাল, সান্যালকেই দেখ না। সেই আদিম সন্দেহ! সে তার সন্তানকে হত্যা করতে চায়—

সুস্মিৎ। সন্দেহ মিনিস্টারই আদিম।

কনিকা। পুরুষের পেটে তো সন্তান আসে না। সান্যাল তাহলে বুঝত।

সান্যালের প্রবেশ। কনিকা ও সুস্মিৎ দুজনেই চমকে ওঠে।

সুস্মিৎ। আপনি? ও, আসুন। বিমল বলছিল।

সান্যাল। হ্যাঁ, আমি। মিসেস গুপ্ত, আপনার দু একটা কথা কানে এল। না, আমার শুধু সন্দেহ নয়—কমলা হ্যাজ অ্যাডমিটেড দ্যাট্।

সুস্মিৎ। (ব্যস্ত ভাবে) মিসেস সান্যাল ফিরে এসেছেন?

সান্যাল। না। আসেই বলেছিল।

কনিকা। আমি বিশ্বাস করি না।

সান্যাল। ডঃ ব্যানার্জী কি এসেছেন?

সুস্মিৎ। আপনাকে বসতে বলে গেছে। এখনই আসবে।

সান্যাল। ঠিক আছে। আপনারা কাজ করুন। আমি বসছি। যুবলেন সুস্মিৎবাবু—সী ওয়াজ লাইক দ্যাট্। (আস্তে আস্তে) ইট হ্যাপেন্ড দ্যাট নাইট—ঐ রাত্রে যেদিন কমলা আপনার কাছে এসেছিল। বাদ্ দে—

সান্যাল সোফার গা এলিয়ে দেয়। রমলক অস্বস্তিকর হয়ে যায়। আবার আস্তে আস্তে আলো ফোটে। রমলকের ডানদিকে দেখা যায় সান্যালের শোবার ঘর। কমলা ও সান্যাল বসে আছে। রেকর্ড প্লেয়ারে অপি অপেরার সুরেলা। জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সান্যাল মদ্যপান করছে। পূর্ব প্রকাশ শুরু হয়।

সান্যাল। কমলা প্রত্যেকটা কথা এত সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেই। বুড়ো মানুষ, ওঁর আইডিয়াজ্ অন্য রকমের।

কমলা। সে জানি। কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাপারে—বিশেষত ইলাবীং—

সান্যাল। তুমিও তো ইলাবীং একটু—

কমলা। কী?

সান্যাল। না, সেরকম কিছু না। একটু মানিয়ে চলা দরকার।

কমলা। তুমি ওঁর সব ভুল সমর্থন কর।

সান্যাল ॥ পারিবারিক জীবনে আমি একটু ট্রাডিশানাল, সে তো জানোই।

কমলা ॥ (হেসে) পলিটিক্স্-এ?

সান্যাল ॥ হো হো হো। পলিটিক্স্ ব্যাপারটাই আলাদা। কখনও কনজারভেটিভ, কখনও র‍্যাডিকাল। একটু কমপ্রোমাইজ করে চলতে শেখ।

কমলা ॥ তুমি তো পলিটিশিয়ান। তুমি তো তাই জানো।

সান্যাল ॥ আরে পলিটিশিয়ানদের বৌরা আরো বড় পলিটিশিয়ান। বাবা কী বলেছেন?

কমলা ॥ আজ এমন ভাবায় বললেন যে—

সান্যাল ॥ নেভার মাইন্ড, নেভার মাইন্ড।

কমলা ॥ আমি কোথায় যাব, কার সঙ্গে কথা বলব—সব তাতে ওঁর সন্দেহ। আজ বলেছেন এটা নাকি আসলে তোমার নির্দেশ। সত্যি?

সান্যাল ॥ পার্টলি সত্যি!

কমলা ॥ মানে তুমি আমার পেছনে গুণ্ডচর লাগিয়ে রেখেছ নাকি?

সান্যাল ॥ গুণ্ডচর! হা-হা: না, না। সাবধানে থাকা ভালো। পলিটিশিয়ান তো!

কমলা ॥ মানে?

সান্যাল ॥ ইউ আর দ্যান অ্যাট্রাক্টিভ উওম্যান। (সান্যাল কমলাকে জড়িয়ে ধরতে যায়)

কমলা ॥ মাতলামো কোর না।

সান্যাল ॥ আই নেভার ড্রু সাচ থিংস ইউইথ আদারস।

কমলা ॥ সেটা ঘটা করে বলার কী আছে? খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট?

সান্যাল ॥ বলার নেই ঠিকই, কিন্তু যেন কিনা জানি না তাই বলছি। আই এক্সপেক্ট ইউ টু বী ফেথফুল টু মী।

কমলা ॥ কী বলছ তুমি? হঠাৎ এমন কথা কেন?

সান্যাল ॥ আই ডোন্ট লাইক সাম অফ দি থিংস ইউ ডু।

কমলা ॥ যেমন।

সান্যাল ॥ যেমন তোমার বন্ধুবান্ধব।

কমলা ॥ কেন? কেউ খারাপ লোক?

সান্যাল ॥ ঐখানে বাবার সঙ্গে আমার মিল। আমি কাউকে ট্রাস্ট করি না—পুরোটা বিশ্বাস করি না।

কমলা ॥ আমাকেও না!

সান্যাল ॥ হে-হে। ইউ আর ডিফারেন্ট। তবে ঠিকই, ঠিকই, কখনও কখনও তোমাকেও না। (হেসে) ড্রু ইউ ট্রাস্ট মী ওলওয়েজ—অলওয়েজ—

কমলা ॥ তোমরা যে পলিটিশিয়ান। সব সময় প্যাঁচ কষছ।

সান্যাল ॥ প্যাঁচ নয়। নেশা। (মদের গ্লাসটা তুলে ধরে) এর চেয়ে বেশি নেশা কী বল তো? পাওয়ার—পাওয়ার। আমি চাই সমস্ত কিছুর ওপর কন্ট্রোল। টুল কন্ট্রোল। যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ প্যাঁচ। কন্ট্রোল ওভার এভরিথিং।

কমলা ॥ আমার ওপরেও।

সান্যাল ॥ অফ কোর্স।

কমলা ॥ কিন্তু আমি তা চাই না।

সান্যাল ॥ চাও না? কিন্তু আমি চাই।

কমলা ॥ আমি কি তোমার প্রপার্টি?

সান্যাল ॥ হা-হা-হা। প্রপার্টি! প্রপার্টি! অফ কোর্স। অ্যাম আই নট ইয়োর প্রপার্টি, এক্সক্লুসিভলি ইয়োরস? (কমলার হাত ধরে টানে)

কমলা ॥ ছাড়ো। ঐ পুরুষের এক কথা। মেয়েরা ওদের প্রপার্টি।

সান্যাল ॥ ম্যাথে, তুমি ভাব, এসব কথা ঠিক নয়। প্রায়ই বল, বল না, পুরুষ শাসিত সমাজ। আসলে পুরুষ শাসিত নয়, শক্তি শাসিত। যার হাতে শক্তি, সেই শাসন করে। শাসিত হয় শুধু মেয়েরা নয়, অসংখ্য পুরুষও। আমি শাসকের দলে। আই ওয়ান্ট পাওয়ার।

কমলা ॥ তুমি পুরুষসিংহ!

সান্যাল ॥ কেন, একটা মিনমিনে পুরুষ হলে ভালো হত? তোমার ঐ যে বন্ধু—কি যেন নাম—অধ্যাপক—

কমলা ॥ ওর ওপর তোমার রাগ কেন?

সান্যাল ॥ হী ওয়াজ হী লাভড্ ইউ!

কমলা ॥ বাজে কথা বোল না।

সান্যাল ॥ আর আমি জানি, তুমিও—ইউ অলসো লাভ হিম।

কমলা ॥ কী বলছ তুমি?

সান্যাল ॥ আই সে, আই সে। ইউ আর আনরেটফুল।

কমলা ॥ (রেকর্ড প্লেয়ারটা বন্ধ করে দেয়) আনরেটফুল

সান্যাল ॥ বুকে হাত দিয়ে বল, তুমি অন্য একটা লোককে—

কমলা ॥ (চেঁচিয়ে ওঠে) মাতলামো কোর না।

সান্যাল ॥ মাতাল বলেই সত্যি কথা বলছি। তুমি মাতাল নও বলেই সত্য গোপন করছ।

কমলা ॥ কী বলতে চাও? কী বলছ তুমি?

সান্যাল ॥ দ্য ট্রুথ। অস্বীকার কর! ক্যান ইউ ডিনাই?

কমলা ॥ তুমি এত মীন্, এত নীচ। সন্দেহের সীমা আছে।

সান্যাল ॥ সন্দেহ? প্রত্যেকটা লোক আমাকে আমার গুণ্ডচর—হা-হা—আমি তবু চুপ করে সহ্য করে চলেছি। কমলা, তুমি অকৃতজ্ঞ।

কমলা ॥ লোকের কথা? গুণ্ডচরের কথা?

সান্যাল ॥ পিপলস্ ভয়েস। এ পলিটিশিয়ান মাস্ট লিসন্ টু দি ভয়েস অফ দি পিপল! অবশ্য বন্ধুর খানেক আমি ব্যস্ত। ইউ হ্যার্টলি সী ইচ আদার—

কমলা ॥ তাতে কী হয়েছে?

সান্যাল ॥ ইউ হ্যাভ চেঞ্জড্। এখন তোমার অনেক বন্ধু, অনেক অ্যাডমায়ারার।

কমলা ॥ বলেছি সেটা তো ক্যাপ্টি। আমি বাইরের জগতে যাবার পর অনেক মানুষকে চিনেছি।

সান্যাল ॥ তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকে আমি একটা ছোট শহর থেকে, একটা দরিদ্র পরিবার থেকে উদ্ধার করে এনেছি। তোমাকে চাকরি দিয়েছি। ইউ হ্যাভ রিপেইড মী?

কমলা ॥ তুমি কী মনে কর আমার? স্লেভ? আমি কি তোমার স্লেভ? তোমার ধার জমি? যদি আমি কাউকে ভালোবাসি, তুমি কী করতে পার? ক্যান ইউ প্রিভেন্ট মী?

সান্যাল ॥ অফ কোর্স—আই ক্যান।

কমলা ॥ তুমি আমার শরীরকে আটকাতে পার, মন নয়।

সান্যাল ॥ আই ক্যান কীল ইউ। আই ক্যান কীল ইয়োর লাভার! শরীরটাকে মেরে ফেললে, মনটাও মরবে। কিন্তু আমি তা করব না। আমি শাস্তি দিতে চাই। আই উইল পানিশ্ ইউ। শাস্তি—

কমলা ॥ শাস্তি?

সান্যাল ॥ টেল্ মী দ্য ট্রুথ।

কমলা ॥ ইউ আর লস্ট আউট দ্য ট্রুথ।

সান্যাল ॥ আমি তোমাকে নতুন জীবন দিয়েছিলাম, তুমি কি দিয়েছ আমাকে?

কমলা ॥ সেই জীবনেই আমি তোমাকে পেয়েছি।

সান্যাল ॥ তুমি মিথ্যাবাদী। আমার কথা ঠিকই বলেছেন। ইউ মাস্ট গেট ডিভোর্স দ্যাট ম্যান এনি হেয়ার।

কমলা ॥ তোমার আদেশ?

সান্যাল ॥ তুমিও যদি আমাকে বলতে, একটা মেয়েছেলেকে তুমি পছন্দ কর না, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতাম। না।

কমলা ॥ আমি এরকম কথা বলতাম না।

সান্যাল ॥ মাইরি! মিথ্যাবাদী। বিস ইজ মাই অর্ডার।

কমলা ॥ আমি তোমার অর্ডার মানব না।

সান্যাল ॥ কেন?

কমলা ॥ এটা আমার পক্ষে অসম্মান।

সান্যাল ॥ অসম্মান? আসলে ঐ লোকটাকে তুমি ভালোবাস।

কমলা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি। তোমাকে ঘৃণা করি।

সান্যাল ॥ ইউ ডিজার্ভ ডেথ। কিন্তু আমি তোমাকে শাস্তি দেব। আই উইল কীপ দ্য চাইল্ড ইউ আর ক্যারিং।

কমলা ॥ কি বললে?

সান্যাল ॥ যেয়ো!

সান্যাল টলমল করতে করতে পাশের ঘরে ঢোকে। কমলা এক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত। অন্ধকার হয়ে আসে। অন্ধকারে কমলা ছোটাছুটি করতে থাকে। দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। পূর্ব প্রক্ষেপ দেব।

আলো ফোটে। সুজিতের বসার ঘর। সোফায় সান্যাল গা এলিয়ে বসে আছে। কমিকা দাঁড়িয়ে আছে। সুজিৎ বসে।

সুজিৎ ॥ বিমল আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল, কিন্তু—

সান্যাল ॥ আমার তাড়া নেই।

সুজিৎ ॥ মিসেস সান্যালের কেসের ব্যাপার—

সান্যাল ॥ হ্যাঁ, সেইজন্যই—(কিছুক্ষণ চুপ করে) আপনার বন্ধু—ডঃ ব্যানার্জী সেইজন্যই আসতে বলেছেন।

সুজিৎ ॥ ও, আমাকে তো কিন্তু—

সান্যাল ॥ আই ওয়ান্ট টু মীট কমলা। যদি তার সাহস থাকে আসবে। আই মাস্ট সে দি ট্রুথ।

বিমলের প্রবেশ

বিমল ॥ মিঃ সান্যাল এসেছেন?

সুজিৎ ॥ বিমল, তুমি তো আমাকে—

বিমল ॥ না। বলিনি। সেদিন তোর রাত্রে তোমার ফোন পাবার পরই আমি এখানে এসেছিলাম—

সুজিৎ ॥ কিন্তু—

বিমল ॥ তোমাকে জানার আগেই মিসেস সান্যালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিলেন। আই টুক হার টু দি হসপিটাল।

সান্যাল ॥ কিন্তু আমি তো প্রত্যেক হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি।

বিমল ॥ অবশ্যই। আমি ওঁকে অন্য নামে ভর্তি করাই।

সান্যাল ॥ আই সী।

বিমল ॥ হাসপাতালে মিসেস সান্যাল নামে কেউ আসে নি। আসে এখন—মিসেস সান্যাল নামে কেউ নেই।

সান্যাল ॥ ডেড? ইজ শী—(বিমল মাথা নেড়ে উত্তর দেয়) বেঁচে আছেন। নিজেটিও জীবিত।

বিমল ॥ আই থ্যাংক ওয়ান্ট টু হিয়ার।

সান্যাল ॥ আপনি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। পুলিশের চোখে মিসেস সান্যাল নিখোঁজ। আমি জানি হাসপাতালে মিসেস সান্যাল নামে কেউ নেই। সত্যজিৎ ও বিমাদ কেসটা চুপ করবেন, ঠিক করুন। ইউ আর ফ্রী টু চুজ্‌ইউজ। আমি চলি।

বিমল চলে যায়। সান্যাল উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকার হয়ে আসে।

উৎপলবর্ণা

অগ্নিমিত্র

কূটাগারে বহুদিবস পরে পুনর্বার যেন নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। বৃজি গণরাজ্যের কেন্দ্রস্থলে প্রধানত লিচ্ছবিবংশীয়গণ-শাসিত রাজধানী বৈশালির নগর-উপান্তে দীর্ঘ বিস্তৃত মহাবন। নগরের উত্তরে কেন্দ্রস্থলে নগর-সীমা সমাপ্ত হ'য়ে মহাবনের সূচনা, সেইস্থলেই কূটাগারশালা বা কূটাগারাম—সুদত্ত ধূলের অনুগামী শ্রমণ-ভিক্ষুগণের আবাসস্থান। অন্যান্য শ্রমণ-পরিব্রাজগণ বিশেষত নির্গ্রন্থ নাটপুত্র বা মহাবীরের অনুগামী শ্রমণ এবং গৃহী-ভক্ত 'অনবক'গণ কদাপি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন 'শ্রমণ গৌতম।' এমন কি, গৌতমের যথার্থ শ্রদ্ধেয় প্রসঙ্গেও তাঁদের সংশয় আছে। তাঁরা চূড়ান্ত দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভে বিশ্বাসী। কিন্তু শ্রমণ গৌতম সেই সাধনরীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। উপরন্তু, সমাজে আবহমানকাল যাবৎ প্রচলিত জাতিভেদ এবং বর্ণভেদ প্রথাকেও অস্বীকার করেছেন তিনি। কোনো নিগ্রন্থীই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণসূত্র ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণ—এমন কি বৈশ্যগৃহেও ভিক্ষার গ্রহণ করেন না। কিন্তু শ্রমণ গৌতম স্বয়ং এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দ অস্পৃশ্য চণ্ডালগৃহেও ভিক্ষার গ্রহণ করেন। তিনি শ্রমণ হলেও কদাচারী শ্রমণ, এ-বিষয়ে অন্তত নিগ্রন্থী, ঔদীচ্য অথবা আজীবিক শ্রমণগণের কোনোরূপ সন্দেহ নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মগধের হর্যশ্ববংশীয় সম্রাট বিম্বিসার, কোশল সম্রাট প্রসেনজিৎ, বৎসরাজ উদয়ন এই কদাচারী শ্রমণের উপাসক। শ্রাবস্তীর কোশলস্থিত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ এই কপট শ্রমণ এবং তাঁর সংঘের জন্য নগরপ্রান্তে জেতবনবিহার নামক এক বিশাল বিহার নির্মাণ করেছেন। শ্রমণ গৌতম সম্বন্ধে নিগ্রন্থী শ্রমণগণের প্রচণ্ড ক্ষোভের আর একটি কারণ হ'ল শ্রাবস্তীর লক্ষপ্রাণাধ্যক্ষ মৃগধরের ধর্মমত পরিবর্তন। কোশলরাজের প্রায় মন্ত্রীতুল্য লক্ষপাধ্যক্ষ মৃগধর ছিলেন নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের পরম ভক্ত। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ বিশাখা হলেন ওই শ্রমণ গৌতমের উপাসিকা। সেই নারীই সর্বনাশসাধিকা। তাঁরই প্রভাবে মৃগধর একদা পরিণত হলেন শ্রমণ গৌতমের উপাসকে। তিনি নিগ্রন্থীশাস্ত্রার প্রতি কেবল বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি, উপরন্তু সাড়ম্বরে, সোল্লাসে সমগ্র শ্রাবস্তীনগরের ঘোষণা করেছেন, পুত্রবধূ বিশাখা প্রকৃতপক্ষেই আমার দ্বিতীয়া জননী; কারণ, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে আবদ্ধ আমার চিন্তা-চেতনাকে তিনি মুক্ত করেছেন—সদ্ধর্মের আস্বাদনদ্বারা করে কন্যাসমা পুত্রবধূমাতা আমাকে নবজন্ম দান করেছেন।

মৃগধরের এই ঘোষণার পর বিশাখা সর্বত্র পরিচিত হয়েছেন 'মৃগধরমাতা' নামে। যে শ্রাবস্তী নগরে নিগ্রন্থী শ্রমণগণের ছিল বিপুল সমাদর, সেই শ্রাবস্তীতে ওই কপট শ্রমণ এবং তাঁর অনুগামীগণই অধুনা অধিক সমাদৃত।

বৈশালিতে অবশ্য নিগ্রন্থী শ্রমণগণের সংখ্যা এবং আধিপত্য অধিক। কারণ, লিচ্ছবি গণরাজ্যের শাসনসঞ্চালক সংস্থাগারের অন্যতম নির্বাচিত 'রাজন' তথা সৈন্যাধ্যক্ষ লিচ্ছবিনায়ক সিংহ স্বয়ং নির্গ্রন্থ নাটপুত্রের একান্ত ভক্ত গৃহী 'মানবক'। নিগ্রন্থী শ্রমণবৃন্দের তুলনায় বৈশালিতে শ্রমণ গৌতম এবং তাঁর অনুগামীগণের প্রভাব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অন্তত বৈশালি নগরে শ্রমণ গৌতম এবং তাঁর অনুগামী ভিক্ষুগণের প্রতি উপেক্ষার

দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই অত্যন্ত নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।

উপরিউক্ত ক্রমে মৈত্রায়ণ শ্রীতীয়ে সংযোজিত হওয়ার পর পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে।

এই পঞ্চদশ বর্ষ ধরে কেন্দ্রবিন্দুটিকে একটিবারের জন্যেও বিচলিত করেননি বুদ্ধ। তাঁর সন্নিহিত দৃষ্টান্ত ক্রমবিস্তারে পঞ্চদশটির ভিন্নতর সংখ্যায় প্রথম বর্ষাঋতু-অবসানের পর থেকে অন্যান্যদি সম্বর্ধের প্রচারে নিয়োজন পরিব্রাজন।

রাজগৃহ—শ্রাবস্তী—অনিঞ্জয়—সাকেত—কপিলবাস্তু—বৈ- শালি—

মথুরা—কৌশাম্বী এবং পরিব্রাজন পথে ভদ্র গ্রাম, কয় জনপদ। বর্ষাক্রম কেবল বর্ষাঋতু। বর্ষার পর ঘূর্ণায় হয়, সেই হেতু বর্ষাঋতু সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই কোনো একটি জনপদ বা নগরশ্রীতার বাসভবনটির জন্য বর্ষাবাস বা চাতুর্মাস্য যাপন।

এই চাতুর্মাস্যের রীতি সুপ্রচলিত।

হিমবন্তের সানুদেশে শাক্যরাজ্যের কপিলবাস্তু নগরে পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমার সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মগ্রহণের পূর্বেই দেশে বিস্তীর্ণসংখ্যক ভ্রমণ-পন্থা প্রচলিত ছিল। সকল পন্থার ভ্রমণ-ভিত্তিই চাতুর্মাস্যের এই রীতি পূর্বাপর পালন করে এসেছেন। রীতিটির অন্তর উপযোগিতাকে উপলব্ধি করে বীজ-প্রোথিত সংঘের ভ্রমণসঙ্ঘের ক্ষেত্রেও চাতুর্মাস্য পালনের বিনয় বর্ষাবাস নিয়ম প্রবর্তন করেছেন বুদ্ধ।

এই বর্ষে বুদ্ধ চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করেছিলেন মগধরাজ্যের পূর্বদিকে। গ্রাম থেকে গ্রামে, কখনো বা নিবিড় অরণ্যে। মগধরাজ্যের পূর্ব সীমান্ত থেকেই আরম্ভ হয়েছে গঙ্গেয়নদের পর গঙ্গেয়নদ্বাপী নিবিড় ঘন অরণ্যাবৃত জঙ্গলভূমি। কজঙ্গলের পূর্বে অঙ্গ, সুহ্ম, বঙ্গ ও পুণ্ড্রভূমি। দক্ষিণে উৎকল বা কলিঙ্গদেশ এবং উত্তরদিকে বজ্র। সেই অরণ্যজের কেন্দ্র চম্পা নগরীতে কয়েকপক্ষ অতিবাহিত করে, পশ্চিমগ্রভিমুখে যাত্রা করেছিলেন বুদ্ধ। জানা, বৈশালিতে অনুনা তাঁর উপস্থিতির বিশেষ প্রয়োজন।

দুইপক্ষকাল হল বৈশালিতে এসে উপনীত হয়েছেন বুদ্ধ।

এই বৈশালি নগরীর সঙ্গে, এই মন্ত্রণসঙ্গের সঙ্গে তাঁর প্রারম্ভিক পর্বের ভ্রমণ-জীবনের কত স্মৃতি বিজড়িত।

উনত্রিশ বর্ষ অতিক্রমকালে পিতা শুদ্ধোদন শাক্য, পালিতা মাতা গৌতমী, পত্নী যশোধরা এবং সদ্যোজাত পুত্রের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে এক আষাঢ়-পূর্ণিমার গভীর রাত্রিতে কপিলবাস্তু ত্যাগ করেছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। মগধরাজ্য এবং বৃজিরাজ্যের সীমানা নির্ধারক অনোমা নদীর তীরে পরিধেয় প্রত্যুষকালে মূল্যবান অলংকরণ ত্যাগ ক'রে অঙ্গে ধারণ করেছিলেন গৃহত্যাগী প্রব্রজিত ভ্রমণের পীত চীবর। হৃদয়ে তাঁর অকূল জিজ্ঞাসা—সর্বজীবনেরকে অন্তর দুঃখের দুর্লীভূত কারণ কী? কেন্ পন্থায় সেই দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব?

এই বৈশালি নগরেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অধিযোগী ব্রাহ্মণের উপস্থাবিধি, সংসারত্যাগী যোগী, আজীবিক, তীর্থিক, নিগ্রন্থী এবং অন্যান্য পন্থার ভ্রমণসঙ্ঘের সুকঠোর আত্মনিগ্রহ, দুঃসাধ্যপ্রয় কৃচ্ছ্রসাধন। তাঁর হৃদয়ের অকূল জিজ্ঞাসার সমাধান হয়নি। প্রত্যেকেই সাধনা করছে আত্মমোক্ষ—সর্বজীবের দুঃখমোচনের জন্য তপস্যা কোথায়?

বৈশালি ত্যাগ করে দূরে বিন্ধ্যকোটে তপস্বীজন যেই সাংঘারামনিবেশে তপস্বী আলার কালামের আশ্রমে গমন করেছিলেন তরুণ ভ্রমণ। আলার কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অল্পকালের মধ্যেই তপশ্চর্যার বৈথী, ভাবনা, মুদিতা এবং উপেক্ষার তাঁহার সহজের ধ্যানসাধ্যিবর্গে নিষ্ঠিলাভ করেছেন। কিন্তু আচার্যের নিকটেই অবগত হয়েছেন যে, এ সিদ্ধিও ব্যক্তিগত মোক্ষলাভেরই উপায়মাত্র। সেই মুহূর্তেই আত্মজিজ্ঞাসায় তরুণ ভ্রমণের হৃদয় পরিপূর্ণিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি কি নিজের স্বার্থপরের মতো মোক্ষলাভের আত্মমোক্ষের উদ্দেশ্যেই সংসার ত্যাগ করেছেন?

আলার কালামের তপোবন ত্যাগ করে তরুণ ভ্রমণ যাত্রা করলেন আরাডী তপস উদ্রক রামপুত্রের আশ্রমোদ্দেশে। তরুক নিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছেন ভ্রমণ গৌতমকে। নিষ্ক্রমণ করেছেন আচার্যপদটির আসনত্যাগে। আচার্যপদটি তপস-চিত্তকে এমন এক বিরোধ ভাবে উত্তীর্ণ করে দিল, যে ভাবে টৈতন্য-ও নেই, অচৈতন্য-ও নেই। একটি সমে চেতনা ও অচেতনার অবস্থান-অনবস্থান।

পরম উৎসুক আচার্য তরুক বলেছেন, তুমি সার্থক সাধক গৌতম। তোমার মোক্ষের পথ অবারিত হ'য়ে গেল।

পুনর্বার সেই আত্মমোক্ষ? কোথায় দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জরিত জীবের জন্যমন্ত্র? কোথায় কাম-নিবৃত্তির মার্গ? কোথায় লোভ-মসলসা-হিংসা-দ্বেষ-কলুষিত জীবজগতের দুঃখমুক্তির উপায়?

সর্বজীবের দুঃখমুক্তির পন্থা অন্বেষণই ভ্রমণ গৌতমের আরব্ধ সাধনা। স্বার্থপরের আত্মমোক্ষমার্গ তাঁর নয়।

অরাড়ের আশ্রমিক তপস্যাবিধির পরিবর্তে আরব্ধ হল কৃচ্ছ্র সাধনার তপস্যা। সেই তপস্যাকালে, বৈশালির এই মহাবনে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে ভ্রমণ গৌতমের। আহার্য ছিল তখন নিবসরাত্রিতে একমুষ্টি শ্যামাক, এক কণা তিল, এক কণা তণ্ডুল এবং শিশির কণ্ডুয়ে একটি মাত্র বদরী। যে-দেহে কামবৃত্তির উদ্ভব এবং তাড়ন, সেই দেহকে যত কঠিনতম পন্থায় নিষ্ক্রিয় করা যায়। পরিধানে কাষ্টকৌপীন, প্রচণ্ড শীত থেকে প্রচণ্ড দৈত্যপ্রবাহ পর্যন্ত সর্ব ঋতুতেই শয়ন বৃক্ষতলে অথবা ওঘায়। প্রখর রৌদ্রতেজে উত্তপ্ত শিলাস্তরের উপর শীর্ষাসনে অবস্থান এবং অনেকক্ষণ ধরেও সূর্যের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত আত্ম ক্লান্তকরার উদ্দেশ নয়নযুগলকে নিষ্ক্রিয়—এ তপস্যাবিধিও উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু বৃথা হল সে তপস্যা। দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'ল, দৃষ্টিশক্তির হ'ল হ্রাস, চলচ্ছক্তিও ক্রমে হয়ে এলো অবলুপ্ত। দেহের আভ্যন্তরিক ক্ষীণতার চিন্তাশক্তিও যেন বিলুপ্ত হতে লাগলো। এই অবস্থায় ভ্রমণ গৌতম উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, তৃষ্ণাবৃত্তির উৎসমূল দেহ নয়—মন।

আরম্ভিক তপশ্চর্যাবিধি এবং চূড়ান্ততম দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন—উভয়বিধ মার্গ পরিত্যাগ করে পুনর্বার যথার্থ বোধির অন্বেষণে যাত্রা করলেন ক্ষীণকায় ভ্রমণ গৌতম। কপিলবাস্তু থেকে নিষ্ক্রমণের দ্বাদশবর্ষকাল পরে মগধরাজ্যের উরুবিল্ব গ্রামে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি লাভ করলেন সম্বুদ্ধ বোধি। -তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল কারণ। কায়িক এবং মানসিক কুশলকর্মের দ্বারাই মানব-জীবনী তৃষ্ণা ক্ষয় করতে সক্ষম হতে পারে। সেই কুশল কর্মই সদ্ধর্ম।

উৎকট প্রক্রিয়ার তপস্যাবিধির পরিবর্তে তিনি প্রচার করলেন মধ্যমার্গ। দেহ সুস্থ না থাকলে মন সুস্থ থাকে না। অতএব প্রয়োজনীয় আহার্য দ্বারা দেহকে সুস্থ রাখতে হবে। চিত্তবৃত্তিকে নিয়ত দেহকল্যাণের কুশলকর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে। বর্ণভেদ, জাতিভেদ এ সকলই সমাজের সৃষ্টিবিরোধী কল্পিত, ব্রাহ্মণাদি অভিজাত শ্রেণীর অন্যোপিত ভেদ মাত্র। জীবজগতে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্রে কোনো পার্থক্য নেই। কুশলকর্মের দ্বারা শূদ্রত্বলাভও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারে। অকুশল কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তিও শূদ্ররূপে গণ্য হতে পারে।

সদ্ধর্মপ্রচারের আরম্ভের পর থেকে এই পঞ্চদশ বর্ষকালের মধ্যে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাতিভেদ, বর্ণভেদকে অস্বীকার করার ফলে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণই প্রথম বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। অপিচ, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণবংশজাত বহু নরনারী সঙ্ঘধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। কেউ বা ভ্রমণ-ভ্রমণীরূপে সংসারত্যাগী হোলেন, কেউ বা গৃহী জীবনেই হয়েছেন সঙ্ঘধর্মের উপাসক-উপাসিকা।

এই বৈশালিতেই প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিল প্রব্রজ্যা-সংঘ।

সে আজ বহুবর্ষ পূর্বের কথা। কপিলবাস্তুর শাক্যগণরাজ্যের নির্বাচিত প্রথম শাসক অর্থাৎ 'রাজন্' শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মুখের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপুত্র মহানাম হলেন নবনির্বাচিত রাজন্। মুখের প্রতি অসীম স্নেহ পোষণ করতেন মহানাম। সেই কারণে, মহানামের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অত্যাচারে মুখের মাতৃসমা তথা পালিকা বিমাতা গৌতমী, পত্নী যশোধরা, বিশেষ পুত্র রাহুল এবং অন্যান্যদের কপিলবাস্তুতে জীবনরক্ষাই দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। বুদ্ধ তখন বৈশালির এই কূটাগারেই অবস্থান করছেন। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এষীণ গৌতমী-এক

রাত্রিতে যশোধরা, রাহুল, নিজ গর্ভজাতা কন্যা রূপানন্দা এবং বুদ্ধের একান্ত উপাসিকা অভিরূপানন্দা, উপসমা, তিষ্যা, ধীরা এবং গোপিকা নাম্নী পঞ্চশাক্যকুমারী সহ পদব্রজে বৈশালির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কপিলবাস্তু থেকে বৈশালি দ্বাবিংশ যোজন পথ। বিঘ্নসঙ্কুল সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় শ্রান্ত ক্লান্ত গৌতমী সঙ্গিনীগণসহ এসে উপনীত হলেন কূটাগারে।

শ্রমণীসংঘ প্রতিষ্ঠার কোনো পরিকল্পনা ছিল না বুদ্ধের।

কিন্তু মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনুনয়-বিনয় এবং সর্বক্ষণের সঙ্গী আনন্দের আবেদনে শ্রমণী-সংঘ প্রতিষ্ঠ করলেন। কপিলবাস্তু থেকে আগত নারীগণকে উপসম্পদা প্রদান করলেন তিনি। শ্রমণগণের সংঘারাম থেকে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী একটি গৃহে স্থাপিত হ'ল সদ্ধর্মের প্রথম শ্রমণী-সংঘ। প্রবীণা গৌতমীর উপর ন্যস্ত হ'ল শ্রমণী-সংঘের দায়িত্ব। শ্রমণী-সংঘ স্থাপনের পর এই কয়েক বর্ষমধ্যে আরো কয়েকজন নারী উপসম্পদা গ্রহণান্তে যোগদান করেছে সংঘে। কেউ ধনীর দুহিতা, কেউ দরিদ্রকন্যা।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী জ্ঞানপ্রবীণা স্থবিরারূপে সমগ্র বৈশালিবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি বর্মানে অর্হৎ গৌতমী নামেই সমধিক পরিচিতা। নবাগতা শ্রমণীগণের মধ্যে বয়ঃক্রমে নবীনা হলেও যথার্থ প্রজ্ঞাবলে শ্রমণী জয়ন্তী এবং রাহিণীও অর্হৎপদবাচ্যা হয়েছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার মহাবনে ক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে আসছে।

চতুর্দিক ঝিল্লীরবে মুখরিত। ইতস্তত জ্যোতিরিঙ্গণ পতঙ্গের দেহ-বিচ্ছুরিত আলোকের প্রদীপ এবং নির্বাপণ গাঢ় তমিস্রার ঘনায়মান বিস্তারকে মধ্যে মধ্যে ব্যাহত করছে।

ধর্মদেশনার পর দৈনন্দিন ব্যাস অনুযায়ী মূলগন্ধকুটি-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ধীর পদচারণায় রত রয়েছেন বুদ্ধ।

নিবিষ্টচিত্তে বিভিন্ন স্থানের সংঘারাম সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করছেন তিনি। রাজগৃহ বেণুবনবিহার এবং সিতবনবিহার উভয় সংঘারামেই কতিপয় ভিক্ষুর আচরণে বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সংঘের বিনয় অনুযায়ী শ্রমণের ভিক্ষাপাত্র হবে মৃৎকরঙ্ক। কিন্তু তাঁরা মৃৎকরঙ্কের পরিবর্তে ব্যবহার করছেন ধাতুনির্মিত করঙ্ক। একজন শ্রমণের জন্য একপ্রস্থ ত্রিচীবর নির্দিষ্ট। কিন্তু তাঁরা কেউ কেউ দ্বিপ্রস্থ অথবা ত্রিপ্রস্থ ত্রিচীবরের অধিকারী হয়ে স্বীয় সম্পত্তিবৃদ্ধির আনন্দে আত্মহারা। শ্রমণের পক্ষে হিংসা নিতান্তই অকুশল কর্ম। কিন্তু গৃহীদত্ত ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করতে হয় ব'লে ভিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সংঘের বিনয় কিঞ্চিৎ শিথিল করা হয়েছে। কোনো গৃহপতি অথবা গৃহবধূ যদি তাঁদের গৃহে সেই দিবসের জন্য প্রস্তুত আহার্যের অংশরূপ মৎস্য কিম্বা মাংসখণ্ড ভিক্ষাদান করেন তবে ভিক্ষাদাতা এ ভিক্ষাদাত্রীর দানের মর্যাদা রক্ষায় সে আহার্য গ্রহণ শ্রমণের পক্ষে অকুশল কর্ম হবে না। কিন্তু শ্রমণ যদি জ্ঞাত হন যে, তাঁকে রুচিকর মাংসাহারে বিকৃষ্ট করবার জন্যই পশুবধ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সেই আহার্য গ্রাহ্য নয়। কিন্তু রাজগৃহ থেকে অর্হৎ মহাকাশ্যপ বৈশালিতে যে-সকল সংবাদ প্রেরণ করেছেন তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওই সকল শ্রমণ ইচ্ছাকৃতভাবেই বিনয়ভঙ্গ করছেন। গৃহী উপাসক-উপাসিকাগণকে তাঁরা ধাতুনির্মিত ভিক্ষাকরঙ্ক, সূক্ষ্ম মসৃণ তন্তুনির্মিত বস্ত্রের চীবর উপহার দানের জন্য প্ররোচিত করেন। কোনো গৃহীর গৃহে আহার্য গ্রহণের নিমিত্ত আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করলে শ্রমণের পক্ষে সে আমন্ত্রণ গ্রহণে কোনো বাধা নেই। এই সুযোগে ওই শ্রমণবৃন্দ গৃহী-উপাসিকা এমন কি অন্যান্য গৃহীগণকেও সুকৌশলে এমনভাবে [illegible] যেন, ভোজ্যসামগ্রীর মধ্যে উপাদেয় পশুমাংস [illegible] শ্রমণবৃন্দের সেই অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত সুপুষ্ট [illegible] করেন।

[illegible] শ্রমণের পথপ্রদর্শক স্বয়ং ভিক্ষু দেবদত্ত। [illegible] সর্বাপেক্ষা উদ্ধত এবং দুর্বিনীত [illegible] দত্ত।

সুপ্রবুদ্ধ শাক্য কর মাতুল এবং শ্বশ্রূ। তাঁরই কন্যা যশোধরা এবং পুত্র দেবদত্ত। বোধিলাভের কয়েকবর্ষ পরে পিতা শুদ্ধোদনের নিকট পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরে পদার্পণ করেছিলেন। সেই ঘটনার অল্প কিছুকাল পরে দেবদত্ত তার সকল দুষ্কর্মের বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ সঙ্গী কোকালিক, খণ্ডধ্বজ এবং সগরদত্তসহ বুদ্ধের সমীপে উপনীত হয় অনুতপ্তচিত্তে ধর্মের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। করুণাঘন বুদ্ধ তাঁদের দান করেছিলেন উপসম্পদা। কিন্তু দেবদত্ত এবং তাঁর সঙ্গীবৃন্দের এ কী আচরণ? সে বর্ষে রাজগৃহে স্বল্পস্থায়ী অবস্থানকালেই বুদ্ধ লক্ষ্য করেছিলেন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বংশজাত শ্রমণ ভিন্ন অন্য বংশজাত শ্রমণগণকে দেবদত্ত কদাপি সমপর্যায়ের শ্রমণরূপে গণ্য করেন না। এমন কি, এ কপিলবাস্তুর রাজক্ষৌরকার উপালি—যিনি সদ্ধর্মের অষ্টাঙ্গমার্গ সাধনায় অর্হৎপদ লাভ করেছেন, তাঁকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন দেবদত্ত। ...জাতি-বর্ণের পূর্ব-সংস্কার কিঞ্চিৎমাত্র বিস্মরণ হন নি দেবদত্ত প্রাক্-ভিক্ষু জীবনে শাক্য যুবকের অভ্যস্ত সেই বিলাস ব্যসনের মোহ সম্পূর্ণমাত্র দূরীভূত হয়নি তাঁর চিত্তবৃত্তি থেকে।

[illegible]বন?

[illegible]স্মাৎ এক নারীকণ্ঠের মৃদু, কম্পিত সম্বোধনে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে [illegible] বুদ্ধের। লক্ষ্য করলেন অস্পষ্ট অন্ধকারে মৃদু পদসঞ্চারে এক নারী [illegible]র হয়ে আসছে তাঁর অভিমুখে।

—কে তুমি ভগিনী?

সঙ্গে সঙ্গে নারীর উদ্গত ক্রন্দনধ্বনি চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশকে কারুণ্যের [illegible]ষাদে পরিপূর্ণ করে দিল।

অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ নারীকণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, ভগবন্। আমি এক মহাপাপিষ্ঠা।

—কী তোমার নাম, ভগিনী?

—এই মহাপাপিষ্ঠা অভাগিনীর নাম উৎপলবর্না

—ভগিনী উৎপলবর্না, নিকটে এসো। আমার উদ্দেশ্যে তোমার কি কোনো বক্তব্য আছে?

—হ্যাঁ ভগবন্। আজ ছ'দিন হ'ল আমি বৈশালিতে এসেছি। প্রতিদিন আমি আবার সভয়ে ফিরে যাই এই মহাবনের কোনো নির্জন স্থানে যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

—সভয়ে ফিরে যাও কেন ভগিনী?

—কেবল ভয়েই নয়, প্রভু। আমি ফিরে যাই নিজের প্রতি ঘৃণায়, লজ্জায়, ধিক্কারে। আমি যে পাপিষ্ঠা।

—ভগিনী, তুমি কি সুনিশ্চিতা যে তুমি পাপিষ্ঠা?

—হ্যাঁ প্রভু। আমি শুনেছি, পাপী-তাপী সকলকেই আপনি শান্তি দান করেন। ভগবন্। একটু মানসিক শান্তির আশায় আমি সুদূর রাজগৃহ থেকে এই বৈশালিতে ছুটে এসেছি। ছ'দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও আমি আপনার সম্মুখে আগমন করবার সাহস অর্জন করতে পারিনি। আপনাকে একান্তে দেখে আজ কোনোক্রমে সেই সাহস অর্জন করেছি। কিন্তু আমি অধিক নিকটে যাবো না। আমার ঘৃণ্য স্পর্শে মৃত্তিকা পর্যন্ত অশুচি হয়। আমি আর অধিক অগ্রসর হলে আপনার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিমণ্ডল হয়তো অশুচি হয়ে যাবে, প্রভু।

—ভগিনী উৎপলবর্না, নিসর্গপ্রকৃতি সদাশুচি কোনোরূপ অশুচি কিম্বা বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে প্রকৃতি হয়তো সাময়িকভাবে অশুচি হতে পারে, কিন্তু নিজের অভ্যন্তরেই নিহিত শক্তির দ্বারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পুনরায় শুচিতা প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যপ্রকৃতিও তদ্রূপ। মনুষ্য যত অকুশল কর্মই সম্পাদন করুক, সেই কর্মকে অকুশলরূপে উপলব্ধি করবার পর হৃদয়স্থ অনুশোচনা দ্বারাই পুনরায় নির্মল হয়। তোমার কণ্ঠস্বরে ঐকান্তিক অনুতাপ, তোমার অশ্রুসিক্ত অনুতাপের শ্রোবাষ্পে পরিপূর্ণ।

—কিন্তু ভগবন্, এ তো নিরুপায়ের অনুতাপ। আমার অদৃষ্ট আমাকে এক ভয়ংকরী পাপিষ্ঠা করে তুলেছিল। সেই অদৃষ্ট আমাকে নিঃস্বা, রিক্তা, সর্বস্বান্তা করে পুনরায় পথের ধূলিতে নিক্ষেপ করেছে।

—তুমি বলছো, অদৃষ্টই তোমাকে পাপাচারে প্রবৃত্ত করেছিল?

—হ্যাঁ প্রভু।

—যে-পাপে লিপ্ত হয়েছিলে, সে-পাপ তাহলে ইচ্ছায় তুমি করো নি?

—অবস্থা আমাকে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তারই প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি স্বেচ্ছায় সেই পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গেলাম, কথা আর কেউ না জানুক, আমি নিজে তো জানি। আমার বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী শ্রবণ করলে আপনিও আমাকে ঘৃণা করবেন।

—না ভগিনী, ঘৃণাবৃত্তিও একটি মানসিক অকুশল বৃত্তি। ঘৃণাবৃত্তি চিত্তকে সংকীর্ণ করে। কোনো ব্যক্তির প্রতিই আমি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করি না।

—আমি যে নিকৃষ্টতম ব্যভিচারিণী পাপিষ্ঠা তা জেনেও আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন না?

—না, ভগিনী।

বিগত যৌবনা উৎপলবর্না নির্বাক, বিস্ময়াভিভূত নয়নে বুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রইলো। রাজগৃহে অনেক শ্রমণ, অনেক আচার্যকে সে দেখেছে কিন্তু এই সৌম্য, প্রশান্ত, করুণাঘন দৃষ্টি কারও নয়নে দেখেনি।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থাকার পর প্রবলতর যে উদ্গত ক্রন্দনধ্বনিজড়িত কণ্ঠে উৎপলবর্না বললে, প্রভু। ভগবন্। আমার পাপের গ্লানি বড়ো ভয়ংকর, বড়ো তীব্র তার জ্বালা। আমি যখন এই শান্তির আশায় দিকভ্রান্ত উন্মাদিনীর ন্যায় রাজগৃহের পথে পথে বিচরণ করি তখন বেণুবনবিহারের এক বৃদ্ধ শ্রমণ মহাকাশ্যপ আমাকে নির্দেশ দান করলেন, আমি যেন আপনার সমীপে এসেই আমার জীবনকাহিনী বিবৃত করি। প্রভু। সে-পাপকাহিনী ঘৃণ্য—অতীব ঘৃণ্য। কেবল অনুশোচনার দ্বারাই দুর্বিষহ জ্বালা থেকে আমি মুক্ত হতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, বৃদ্ধ শ্রমণ আমাকে যথার্থ নির্দেশই দান করেছেন। ভগবন্। আমি একটু শান্তি, এই দুঃসহ জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার কাহিনী শুনে এই পাপিষ্ঠাকে আপনি কি শান্তির পথ নির্দেশ করবেন প্রভু?

ভূমিতলে নতজানু হয়ে ক্রন্দনাবেগে অধিকতর বিবশা হয়ে পড়লেন উৎপলবর্না।

প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, করুণাঘন স্বরে বুদ্ধ বললেন, তোমার কাহিনী বলো ভগিনী।

—আপনার শান্তি বিঘ্নিত হবে না? —ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করলেন উৎপলবর্না।

—আমার শান্তি বিঘ্নিত হয় না ভগিনী।

—ভগবন্। আপনার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরই আমাকে আশ্বাস দান করছে শান্তির সন্ধান আমি একমাত্র আপনার নিকটেই লাভ করবো। প্রভু, আমার সে-লজ্জার, সে-গ্লানির কাহিনী আপনার সম্মুখে ব্যক্ত করতেও আমার ঘৃণাবোধ হচ্ছে। তথাপি ব্যক্ত না করলে আমি তো আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করবার অধিকারিণী হতে পারি না। অতএব অনাবৃতভাবে সকল কাহিনীই আমাকে ব্যক্ত করতে হবে।

মুখমণ্ডল নত করে উৎপলবর্না আরম্ভ করলেন তাঁর জীবনকাহিনী।

ভগবন্। আমি ছিলাম শ্রাবস্তীর এক ধনী শ্রেষ্ঠীর আদরিণী দুহিতা। আজ আমার এই শীর্ণ, বিগতযৌবন দেহ দেখে কেউ অনুমান করতে পারবে না, এককালে দৈহিক রূপলাবণ্যে আমি ছিলাম পরমারূপসী। যৌবনে উপনীত হওয়ার পর যথাসময়ে পিতা আমাকে বিবাহ দিলেন শ্রাবস্তীরই এক ধনী শ্রেষ্ঠী যুবকের সঙ্গে। দাম্পত্যজীবনের সেই প্রথম পর্বে স্বামীর প্রেমে আমি যথার্থই মুগ্ধা, বিভোর হয়েছিলাম। স্বামীর প্রতি আমার প্রেমও ছিল একনিষ্ঠ। সেই দিনগুলিকে এখন মনে হয় স্বপ্নের মতো। মনে হয় আমার জীবন সম্ভবত প্রথমাবধিই বিস্মিত। তারই মধ্যে একদা হয়তো ঘুমঘোরে আমি একটি সুখ-স্বপ্ন দেখেছিলাম মাত্র। আমার দুর্ভাগ্যে আমার সেই স্বপ্নমধুর দাম্পত্যজীবন হল স্বল্পায়ী। আমার স্বামী প্রায়শই বাণিজ্যব্যপদেশে পণ্যসামগ্রীসহ রাজ্য-রাজান্তর গমন করতেন। কখনো কাশী, কখনো চেদি, কখনো পাঞ্চাল, কখনো বৎস, কখনো মগধ, কখনো অবন্তী। এমনকি, বাণিজ্য তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গলাভে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিতা হতে লাগলাম। শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করলেও কদাপি একপক্ষকালের অধিক তিনি গৃহে অবস্থান করেননি। প্রকৃতপক্ষে নবযৌবনকালে মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ আমাকে প্রোষিতভর্তৃকার জীবন যাপন করতে হচ্ছে। ভগবন্। নিজের সম্বন্ধে আমি কোনো কথাই আপনার নিকট গোপন করবো না। আমার কামতৃষ্ণা ছিল অতীব প্রবল। কিন্তু হায়, সেই তৃষ্ণা প্রায় সম্বৎসরই অপূর্ণ থাকতো। স্বামীর প্রতি তীব্র অভিমানে আমার হৃদয় তৎকালে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। আমাকে যদি যৌবনের শ্রেষ্ঠ কাল বিরহেই যাপন করতে হবে তবে কেন এ বিবাহ? কেন আমার স্বামী বিবাহ করে আমাকে এইরূপ অসহায়ার ন্যায় বন্দিনী করে রেখে দিলেন? তিনি নিজে প্রায় সম্বৎসরই বিভিন্ন প্রখ্যাত নগরীতে বাস করেন এবং নিশ্চয়ই অন্যান্য শ্রেষ্ঠীর ন্যায় নগরের কোনো সম্ভ্রান্ত গণিকাগৃহে গমনাগমন করে স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। কিন্তু আমি?

উৎপলবর্নার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁর বাক্‌স্ফুরণের ক্ষমতা রইলো না।

কয়েকমুহূর্ত পরে ক্রন্দনাবেগ সাধ্যমতো সংযত করে পুনরায় তিনি তাঁর কাহিনী বিবৃত করতে আরম্ভ করলেন।

—প্রভু। ভগবন্। আমি জ্ঞাত হয়েছিলাম বহুসংখ্যক প্রোষিতভর্তৃকা যুবতী তৎকালে অন্যপুরুষ সংসর্গে নিজেদের কামদাহ শান্ত করতো। অভিমানে, প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় একদা এক দুর্বল মুহূর্তে [illegible] পথে পদক্ষেপ করলাম। এতকাল স্বামীর প্রেম [illegible] নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হলাম না। [illegible] যুবকের সঙ্গে আমি কামকলায় লি[illegible] য়েছিল দীর্ঘকাল উপবাসী কো[illegible] দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যা, হিতাহিত জ্ঞ[illegible]

আশ্রমের কথা আর সবোপন রইলো না। দুশ্চরিত্রা অভিযোগে আমি একদিন গৃহ থেকে বিতাড়িতা হলাম। আমার স্বামী তখন রাজগৃহে।

পূর্ববার ভিক্ষুকদের জন্য নীরব হলেন উৎপলবর্ণা।

কয়েকমুহূর্ত পরে অস্বাভাবিক করুণ স্বরে বুদ্ধের উদ্দেশে তিনি বললেন, ভগবন্! এই হল আমার পাপাচরণের প্রারম্ভ। আপনার সমীপে সকল কাহিনী উদঘাটিত করে আমার মানসিক শান্তির উপায় নির্ধারণে আপনার নির্দেশ লাভ করবো এই আশা বুকে নিয়েই আমি রাজগৃহ থেকে বৈশালি আগমন করেছি। আমার জীবনে পাপাচরণের পরবর্তী পর্ব আরো ক্লিষ্ট, আরো পঙ্কিল। আমার আশঙ্কা হয়, সে কাহিনী হয়তো আপনার সুপবিত্র কর্ণকুহরকে অপবিত্র করবে।

স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, করুণার্দ্রস্বরে বুদ্ধ বললেন, তোমার আশঙ্কা অমূলক, ভগিনী। সৃষ্টির প্রয়োজনে মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীবজন্তুর দেহে-মনে কামপ্রবৃত্তি প্রকৃতিরই দান। কিন্তু কামতৃষ্ণার প্রবলতাই জীবের জীবনে বহুতর অকল্যাণের কারণ হয়। আমিও একদা গৃহীজীবন যাপন করেছি, কামবৃত্তির আন্তরিক তাড়নায় শ্রীহীন করেছি। কিন্তু সেই তৃষ্ণা এবং অন্যান্য জাগতিক তৃষ্ণাকে জয় করবার সংকল্পেই একদা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। শ্রমণ-শ্রমণীগণকে আমি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দান করি কিন্তু গৃহী উপাসক-উপাসিকাকে নির্দেশ দান করি, তারা যেন সংযত জীবন যাপন করে; কোনোরূপ তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হয়ে নিজ চিত্তবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণের শক্তি থেকে স্খলিত না হয়। ভগিনী, তুমি কঠিন সন্তপ্ত হৃদয়ে আমার নিকট আগমন করেছ। সন্তপ্ত নর-নারীকে শান্তির পথনির্দেশ করাই আমার ধর্ম। তোমার কাহিনী যত ক্লিষ্ট-ই হোক, আমার নিকট ব্যক্ত করলে তোমার অন্তরগ্লানির গুরুভার বলি লাঘব হয় তবে তুমি অসংকোচে ব্যক্ত করো।

নতমুখী উৎপলবর্ণা তাঁর জীর্ণ, মলিন উত্তরাসঙ্গবস্ত্রে লোচনদ্বয় এবং কপোলদেশ থেকে অশ্রুমার্জন করে বললেন, ব্যক্ত করতে চাই বলেই তো ছুটে এসেছি প্রভু। অভয়দানে এই পাপিষ্ঠাকে আপনি নিশ্চিন্তা করুন।

উৎপলবর্ণা পুনরায় আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী।

—দুশ্চরিত্রা অভিযোগে স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িতা হয়ে আমি আর পিতৃগৃহেও প্রত্যাবর্তন করিনি। আমি ধনীর দুহিতা, ধনীর বনিতা—অর্থাভাব আমার ছিল না। আমি মনস্থ করলাম রাজগৃহেই গমন করবো। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আমি পুনরায় আমার হৃতমর্যাদা এবং স্থান ফিরে পাবো এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁর প্রতি একান্ত অনুগতা থেকেই আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আমি শুনেছিলাম, শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহ পঞ্চচত্বারিংশ যোজন পথ। পদব্রজে একাকিনী সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করা আমার ন্যায় বিলাস-ব্যসন-লালিতা যুবতীর পক্ষে কতখানি কষ্টসাধ্য অথবা সম্ভব, সে-সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণাই আমার ছিল না। তথাপি আমি রাজগৃহের উদ্দেশেই যাত্রা করলাম। আমার বিত্তের অভাব ছিল না। পিতৃ-প্রদত্ত এবং স্বামী-প্রদত্ত অজস্র মুদ্রা আমার পেটিকায়। পথব্যয় স্বরূপ আমার পক্ষে সর্বাধিক বহনযোগ্য সুবর্ণমুদ্রা, নিষ্ক এবং কার্ষাপণ সঙ্গে নিয়ে এক রাত্রিশেষে শ্রাবস্তী ত্যাগ করলাম আমি। সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত বলে প্রখর রৌদ্রতাপে পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে আমার প্রভূত ক্লেশ হত, তৎসত্ত্বেও আমি হতাশ হইনি। সঙ্গে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল সেই হেতু খাদ্যাভাব কিম্বা রাত্রিকালে আশ্রয়ের অভাব আমার হয়নি। কতদিন হল পদব্রজে চলেছি, কত যোজন পথ অতিক্রম করেছি সে-সম্বন্ধে আমার কোনোরূপ চেতনা-ই ছিল না। তারপর একদিন যখন পথচারিণী কতিপয় জনপদবাসিনী নারীর নিকট অবগত হলাম যে আমি কোশলরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে কয়েক দিবস পূর্বেই মগধরাজ্য সীমায় প্রবেশ করেছি, তখন আমার প্রান্ত ক্লান্ত দেহে যেন দ্বিগুণ শক্তির সঞ্চার হল। পথচারিণী সেই নারীবৃন্দ আমাকে জানালেন, তাঁরা মগধের অধিবাসিনী হলেও রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ নগরে কদাপি গমন করেননি। কিন্তু যাঁরা রাজগৃহে গমনাগমন করেছেন সেইসকল পুরুষ গরিজনদের নিকট শুনেছেন, সেস্থান থেকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হলে প্রায় অর্ধযোজনব্যাপী বিস্তৃত এক গভীর অরণ্যের মধ্যভাগ দিয়ে পথ চলে গেছে

রাজগৃহ অভিমুখে। সেই অরণ্য অতিক্রম করবার পর রাজগৃহ সপ্তদিবসের পথ। আমার হৃদয় বিপুল উল্লাসে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। পুরুষযানের পক্ষে যদি সপ্তদিবসের পথ হয় তবে আমার পক্ষে হয়তো তার দ্বিগুণ একপক্ষকালেরই পথ হোক। তাহলে আমি রাজগৃহের প্রায় সন্নিকটবর্তী হয়েছি। আর পক্ষকাল পরেই আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর চরণ লাভ করবো। তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে সর্বকলুষমুক্ত হবো।

পুনর্বার ক্ষণিক নীরবতার পর অশ্রুমার্জনা করে উৎপলবর্ণা বলতে আরম্ভ করলেন।

—ভগবন্! আমি তখনো জানি, সম্মুখস্থ সেই ঘোর অরণ্যের মতো আমার ভবিষ্যৎ নির্মম, হিংস্রভাবে মুখব্যাদান করে আছে? দিবা দ্বিপ্রহরেও অরণ্যমধ্যে আলোক অতি ক্ষীণ। সুবিশাল বৃক্ষরাজির শাখা-পত্র ভেদ করে সূর্যরশ্মি সেস্থানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। সেই অরণ্যে এক দুর্বাস্থ দস্যুর দ্বারা আমি আক্রান্ত হলাম। প্রভু! আমার অসাধারণ দৈহিক রূপলাবণ্যের জন্যই পিতামাতা আমার নাম স্থির করেছিলেন উৎপলবর্ণা। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্লান্ত হলেও আমার সেই পূর্ণযৌবনে দৈহিক রূপ অপসৃত হয়নি। সেই রূপ এবং আমার অধিকারে শতাধিক সুবর্ণ মুদ্রা হল আমার কাল। দস্যু যদি সুবর্ণমুদ্রা সমূহ গ্রহণ করে সেই মুহূর্তে আমাকে হত্যা করতো তাহলেও হয়তো আমার জীবনে পরবর্তী ক্ষুদ্রতম পাপাচরণের অবকাশ আর হ'ত না। কিন্তু দস্যু আমাকে নিধন না করে দীর্ঘতস্করের ন্যায় তার গৃহে নিয়ে গেল। আমি নারীর সহজাত অনুভূতির দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম, সেই যুবক দস্যু আমার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয়েছে।

ভগবন্! আমি যদি সেই দস্যুদ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হতাম তাহলেও আমার সান্ত্বনা থাকতো যে, আমি দুর্বলা নারী তাই সেই সবল পুরুষকে প্রতিরোধ করতে পারিনি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি? পূর্বেই জ্ঞাপন করেছি, আমার কামতৃষ্ণা ছিল অতিশয় প্রবল। সেই সুপুরুষদেহী যুবক দস্যু আমার সঙ্গকামনা করলেও বলপ্রয়োগ সে করেনি। তার আলিঙ্গনমাত্রে আমার কামবিবশা দেহ-মন সহজে এবং স্বেচ্ছায় সেই দস্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করলো। আমার মনে হ'ল,

কাম-পরিতৃপ্তির পরিপূর্ণ স্বাদানুভূতি জীবনে সেইদিনই যেন প্রথম আমি লাভ করলাম। বিবাহের পর যে দাম্পত্যসুখ স্বামীসঙ্গ আমি পেয়েছি, এর তুলনায় নিতান্তই প্রতিভিন্নতর। কামকেলিতে এই সুতীব্র পরিতৃপ্তি দানের আন্তরিক ক্ষমতাও সেই সেই বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী যুবকের। তবে কেন আমি তাকেই অনুগ্রহলাভের আশায় এত ক্লেশ স্বীকার করবো? প্রয়োজন নেই আমার বিলাস-বৈভবের, প্রয়োজন নেই আমার আভিজাত্য-সূচক পরিচিতির। এই শুধুই চরিতার্থ করবে আমার প্রবল কামতৃষ্ণাকে, সার্থক করবে আমার সদ্যপ্রাপ্ত তপ্ত-যৌবনকে।

ভগবন্! আমার যদি বিন্দুমাত্র বিবেক থাকতো তাহলে আত্মানুসন্ধানের জন্যে হয়তো প্রব্রাজিকাশ্রমিণীও হতে পারতাম? কিন্তু আমার বিবেক ছিল না। যে যৌবন চিরস্থায়ী হয় না, সেই যৌবনের কুৎসিত তাড়নাতেই আমি এবার পরিপূর্ণভাবে পাপপঙ্কে নিজের দেহ-মনকে লিপ্ত করলাম।

—ভগিনী উৎপলবর্ণা, এইখানেই কি তোমার পাপাচরণ-কাহিনীর সমাপ্তি? —মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন করুণাঘন বুদ্ধ।

ঈষৎ কাতর স্বরে উৎপলবর্ণা বললেন, না, প্রভু। এর পরবর্তীপর্ব আরো ভয়ংকর। অনুগ্রহপূর্বক আপনি শ্রবণ করুন, ভগবন্।

—তুমি যেভাবে তা বিবৃত করবে তা আমি অবশ্যই শ্রবণ করবো। কিন্তু তার পূর্বে আমার একটিমাত্র প্রশ্ন আছে। যৌবন যে চিরস্থায়ী হয় না, এ সত্য তুমি কখন উপলব্ধি করেছ ভগিনী!

—বহুকাল পরে, প্রভু। কাহিনীর অবশিষ্ট ভাগ শ্রবণ করলে আপনি অবশ্যই অনুভব করতে পারবেন, কি নিদারুণ মর্মান্তিক দগ্ধ জীবনযাপনের পরে এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যকে আমি উপলব্ধি করেছি।

সেই একই প্রশান্ত, স্নেহার্দ্রস্বরে বুদ্ধ বললেন, ভগিনী উৎপলবর্ণা, বিবৃত করো সেই অবশিষ্ট কাহিনী।

—ভগবন্। এক বৎসরেরকাল পরে আমার ক্রোড়ে এলো একটি কন্যাসন্তান। আমার কন্যা আমারই ন্যায় সুগৌরবর্ণ এবং রূপলাবণ্য নিয়ে ভূমিষ্ঠা হল। তার জন্মদাতা পিতা সেই লম্পট কৃষ্ণবর্ণ অথবা মুখমণ্ডলের আকৃতিগত কোনো প্রভাবই ছিল না আমার কন্যার অবয়বে। তার জন্মের পূর্ব পর্যন্ত আমি ছিলাম প্রভূত কামার্তা এক নারী মাত্র, তার জন্মের পর মাতৃত্বের রূপান্তরিতে আমি হলাম এক পরিতৃপ্তা জননী। কিন্তু প্রভু, আমার সেই অতীব শক্তি যে এক নির্মম ছলনা, নির্লজ্জ দম্ভ তা আমি ওই এক বৎসরেরকালের মধ্যেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। বহুদিবস তার হস্তে আমি প্রহৃতা হয়েছি। তাকেও তাকে আমি সতত তুষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তার নির্মম প্রহারের বাধাকে উপেক্ষা করেছি, কারণ, তার তীব্র অভিলাষ আমার কাম এবং সেই দম্ভই যে আমার নির্ভরস্বরূপ রক্ষক।

আর কয়েকমাস পরবর্তীকালের ঘটনা।

কোনো কারণে আমার প্রতি ক্রোধবশত সুলাভক সেই দম্ভ সহসা আমার ক্রোড় থেকে শিশুকন্যাটিকে সবলে তুলে নিয়ে গৃহকোণে নিক্ষেপ করলো। কন্যা আর্তকণ্ঠের স্বরে ক্রন্দন করে উঠলো। পাগলিনীর ন্যায় ছুটে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে দেখি তার মস্তকের পশ্চাদ্দেশে একটি স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে রক্তপাত হচ্ছে। আমার তীব্র ভর্ৎসনায় দম্ভ গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু অবিও সেই মুহূর্তে মনে মনে সংকল্প করলাম, আর এ-জীবন নয়। কন্যা কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেই এই দম্ভর গৃহ থেকে আমাকে পলায়ন করতেই হবে।

ভগবন্। কন্যার ক্ষত নিরাময় হলে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ক্ষতচিহ্নটি স্থায়ী হয়ে গেল। নিজের মনকেই আমি প্রবোধ দিলাম, ওই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে চিন্তা করবার কোনোরূপ কারণ নেই। ওই শিশু যখন যুবতী হবে তখন হয়তো আমারই ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণকেশদামে ক্ষতচিহ্ন আবৃত থাকবে। কেউ তা জানতেও সক্ষম হবে না।

কন্যার ক্ষতচিহ্ন নিরাময়ের বহু কয়েকদিবস পরেই সুলাভক সেই দম্ভর গৃহে আমি প্রত্যুষেরবে প্রস্থান করলাম। কেবে, নিষ্কৃতির আমিও সেদিন চিন্তাচেতনাজ্ঞানশূন্যা হয়ে গিয়েছিলাম। দম্ভর ঘরিপর্যবেক্ষণের অব্যবহিত পরেই উল্কাবেগের ন্যায় আমি গৃহত্যাগ করলাম। ভগবন্! আমি সত্যই সন্তানের জননী না পিশাচিনী? নতুবা, যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করেছি, সেই শিশুকে বক্ষে তুলে নিতে বিলম্ব হলো কেন? হ্যাঁ, কয়েকের জন্য আমার হৃদয় বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নির্মম পিশাচিনীর ন্যায় সে ইচ্ছাকে আমি অবহেলা করলাম। হতে পারি আমি ওই শিশুর জন্মদাত্রী কিন্তু ও তো আমার জন্মক সন্তান। আর জন্মদাতা পিতা এত নির্মম, এত নির্দয়, তার প্রতি আমার কিসের মায়া? মুমূর্ষু শিশু শায়িত রইলো শয্যায়, আমি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যার ন্যায় পুনর্বার পথে নেমে ছুটতে আরম্ভ করলাম। তখন আমি কর্ণাবতীনগ্ন। শ্রাবস্তী থেকে যাত্রা করবার পর কিছু মুদ্রা পথে ব্যয়িত হয়েছিল। অবশিষ্ট শেষ কার্ষাপণটি পর্যন্ত দস্যু বহুপূর্বেই আমার নিকট থেকে হস্তগত করেছে। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করবার তাড়নায় তখন আমি এতই ব্যাকুল যে, এ-সব কিছুই চিন্তা করিনি। কন্যাকে পরিত্যাগ করে কত সহজে আমি গৃহত্যাগ করলাম। প্রভু, আপনি কি এখনো অনুভব করতে পারছেন না যে এই উৎপলবর্ণা কি ভীষণ স্বার্থপর, কত বড়ো পাপিষ্ঠা?

—ভগিনী, তোমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী কি এইখানেই সমাপ্ত? —প্রশ্ন করলেন বুদ্ধ।

—না প্রভু। আমার অদৃষ্ট যে আরো কত মর্মন্তুদ পরিণতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, আমি তখনো তা জানি না। উল্কাবেগের ন্যায় বিচরণ করতে করতে একদিন এসে উপনীত হলাম রাজগৃহ নগরে। কিন্তু আমার প্রকৃত স্বামীকে আর সন্ধান করিনি। তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার অধিকার এবং যোগ্যতা—এই উভয় থেকেই আমি তো তখন বঞ্চিতা। তা ছাড়া, তিনি হয়তো তখন অন্য কোনো নগরে। দেহে আমার রূপযৌবন তখনো সম্পূর্ণ ম্লান হয়নি। সেই সম্বল অবলম্বন করে আমি গ্রহণ করলাম গণিকাবৃত্তি। এ ছাড়া তখন আমার আর কোনো উপায়ও তো ছিল না। সম্বল বলতে একটি কার্ষাপণও সেই অন্ধ জঠরজ্বালা আছে। কত বর্ষ গণিকাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছি, আজ আমার তা মনেও নেই, প্রভু। উঃ, নারীর রূপযৌবন যে কত পঙ্কিল। অল্পকালের মধ্যে সাধারণ গণিকা থেকে উন্নীত হলাম অভিজাত পদ্মাবলায়। কারণ, আমার রূপ-যৌবনের খ্যাতি দ্রুত প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল রাজগৃহে। বৃত্তি আরম্ভকালে আমার শুল্ক ছিল মাত্র এক কার্ষাপণ। সেই সামান্য তামমুদ্রা থেকে বর্ধিত হয়ে শুল্ক হল পঞ্চসুবর্ণমুদ্রা। ভগবন্। আমি পাপিষ্ঠা, কিন্তু সেই গণিকা-জীবনে যৌবনের কামতৃষ্ণার জন্য পুরুষেরই সান্নিধ্যে আমি এসেছি, তার ইচ্ছা নেই। বিংশতি বর্ষীয় নবযুবক থেকে সপ্ততিবর্ষীয় শ্লেষ্মকার্ত বৃদ্ধকেও সন্তোষ প্রদান করতে হয়েছে আমাকে। গৃহে বৃদ্ধা পত্নী, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্র বিদ্যমান, তথাপি সেইরূপ বৃদ্ধেরও আলয়তৃষ্ণার অন্ত নেই। প্রভু। এই জীবিকাই আমাকে শিক্ষাদান করলো যে, কামতৃষ্ণা অন্তহীন—তার সমাপ্তি নেই। সেই নিষ্কৃতিরহিত তৃষ্ণা কি যথার্থ শান্তি দান করতে সক্ষম? এই তৃষ্ণার প্রাবল্যেই একদা আমি বারবনিতা হয়েছিলাম। আমি কি শান্তিলাভ করেছি? বরঞ্চ, তীব্রতর অন্তর্জ্বালার মূলহীন অগ্নিগহ্বরে আমি নিরন্তর জ্বলছি।

—ভগিনী। তোমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাই তোমাকে এই উপলব্ধি দান করেছিল, তুমি কি এই কথাই বলছ?

—হ্যাঁ, ভগবন্। তখনো আমার নিয়ত মনে হত, কামতৃষ্ণার সেই জীবন থেকে মুক্ত হয়ে যদি আমি পুনর্বার পবিত্র জীবন আরম্ভ করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু সে তো উন্মাদের স্বপ্ন-কল্পনা, প্রভু। আমাকে বিস্মিত করে আমার অদৃষ্ট অকস্মিকভাবে একদা সেই পরম সুযোগ দান করলো। আমার সম্ভ-কামনায় আকৃষ্ট আমার অপেক্ষা অন্তত দশবর্ষ বয়োকনিষ্ঠ এক বণিকপুত্র আমাকে পত্নীরূপে বরণ করবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাবে সম্মতা হয়েছিলাম।

ভগবন্। আমার যেন নবজন্ম হল। গৃহবধূরূপে সেই পরিবর্তিত জীবনকে অন্তরের একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম আমি। আমার সেই স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অল্পকাল পরেই আমার স্বামী অন্য একটি যোড়শী যুবতীকে বিবাহ করে গৃহে আনয়ন করলেন। আমার সেই সপত্নীর বাসস্থান নির্ধারিত হল অদূরে পৃথক একটি ভবনে। এই অভাগিনীকে আপনি বিশ্বাস করুন

প্রভু, সেই নবীনা সপত্নীকে আমি বিন্দুমাত্র ঈর্ষা করিনি। আমার স্বামীর বয়ঃক্রম অনুযায়ী সেই নবীনাই তো তাঁর স্বাভাবিক যোগ্যা পত্নী। আমার স্বামী যে আমাকে নরক-পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, তাঁর সেই অনুগ্রহের মূল্য আমার নিকট অপরিসীম।

ভগবন্। আমার বিড়ম্বিত জীবনের মৃণ্ডতম পরিণাম যে কি নিদারুণ, তারকের তা আমি তৎক্ষণাৎবধি জানত ছিলাম না। একদা আমি আমার সেই নবীনা সপত্নীকে দেখলাম। অবাক বিস্ময়ে আমি চিন্তা করলাম, এত সাদৃশ্য কেমন করে সম্ভব? সেই নবোদ্ভিন্ন যৌবনা নারী যে পরিপূর্ণভাবে আমারই প্রথম যৌবনকালের প্রতিমূর্তি। প্রভু। সপত্নীর প্রতি স্নেহের আকর্ষণে আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো। উঃ, সেদিন সে যে কী মর্মান্তিক অনুভূতি আমার। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই জানা হলাম, সে এক মাতৃপরিত্যক্তা কন্যাকন্যা। কৈশোরে পিতারও মৃত্যুর পর সে আশ্রয়হীনা হয়েছিল। তারপর এক স্নেহময়ী কর্মকারবনিতার দ্বারা প্রতিপালিতা হয়। সেই পালিকা-মাতাই তার বিবাহ-ব্যবস্থা করেছেন।

ভগবন্। আমি তখন প্রায় উন্মাদিনীর ন্যায় তার অপরূপ সুন্দর মুখকমল কেশভারের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে স্পষ্ট অনুভব করলাম নিতান্ত সৌম্যবের অস্তচিহ্ন। উঃ, কি মর্মন্তুদ পরিণতি। মাতা ও কন্যার একই পতি? তাই আমাকে ভগবানের জন্য এই মৃণ্ডতম, অস্তচি পরিণতিকে সংস্তম্ভভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল?

আর আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না প্রভু। হতচেতনের ন্যায় আমি গৃহত্যাগ করে পথে পথে পরিভ্রমণ করতে আরম্ভ করলাম। কতদিন তা আমার স্মরণে নেই, কবে কেশুনবিহারে উপস্থিত হলাম অথবা কৈশলির উদ্দেশে যাত্রা করলাম তাও স্মরণে নেই আমার।

ভগবন্। আমি শান্তিলাভের আশাতেই এসেছি। কিন্তু আমার এই অস্তচিতম জীবনের কাহিনী জানা হবার পরও কি আপনি আমাকে মার্জনা করতে পারবেন? আমাকে প্রদর্শন করতে পারবেন শান্তির পথ?

ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হয়ে আকুলস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন উৎপলবর্ণা।

—ভগিনী উৎপলবর্ণা। অনুশোচনা তৃষ্ণার পরিণাম যে কিরূপ বিষময়, তোমার জীবনের অভিজ্ঞতায় তুমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছ, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, প্রভু। ধিক্ কামতৃষ্ণায়। ধিক্ ওপাসীনেরে —আমি এত উচ্চ শালিতা যে আত্মহনন করে চিরশান্তি লাভের সাহসও অর্জন করতে পারিনি।

করুণাস্নিগ্ধ স্বরে বৃদ্ধ বললেন, আত্মহনন তীব্রজ্বালোচিত। যে-মুহূর্তে জন্ম হয়েছে, সেই মুহূর্তেই একদা মৃত্যু-পরিণামও অনিবার্য, ভগিনী। আত্মহনন কেন? অবশিষ্ট জীবনকে কুশলকর্মে এবং প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত করো। সেই কর্মই লাভ করবে তোমার প্রার্থিত শান্তি।

—কিন্তু প্রভু, আমি যে এক ঘৃণ্য, ভ্রষ্টা, পতিতা।

—পূর্বে ছিলে ভগিনী, বর্তমানে নও। উপলব্ধি এবং অনুশোচনা তোমার দেহমনকে কলুষমুক্ত, নির্মল করেছে। তুমি উপসম্পদা লাভের যোগ্যা পাত্রী।

—ভগবন্। এ আপনি কী বলছেন। আমার ন্যায় ঘৃণ্যা নারী উপসম্পদা লাভ করলে আপনার ধর্ম কলুষিত হবে না?

স্মিত, প্রশান্ত হাস্যে বৃদ্ধ বললেন, না, ভগিনী। তুমি যদি একান্তভাবে কুশলকর্মে জীবন অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক হও, তাই করো। তুমি যদি উপসম্পদা গ্রহণান্তে শ্রমণী-সংঘে যোগদান করতে ইচ্ছুক হও, তাও আমি অনুমোদন করছি।

—আমি? শ্রমণী। —প্রভু, আমার সংস্পর্শে পবিত্র শ্রমণী-সংঘ যে অপবিত্র হবে।

—না, ভগিনী। রূঢ়, নির্মম বাস্তব তৃষ্ণার পরিণাম সম্বন্ধে যাকে সম্পূর্ণ চেতনার অধিকারিণী করেছে, আমার বিশ্বাস অচিরেই সেই নারী অর্হৎপদলাভের যোগ্যতা অর্জন করবে।

—ভগবন্। আমি আজ ধন্যা। সমগ্র বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে আজই সম্ভবত আমি শান্তির স্পর্শ লাভ করছি। আমি শ্রমণী-সংঘে যোগদান করবো। শান্তি— শান্তি—

পুনর্বার আকুল ক্রন্দনে লুণ্ঠিতা হলেন উৎপলবর্ণা।

করুণাঘন বৃদ্ধ তাঁর ক্রন্দনে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন না। এ-ক্রন্দন অভাগিনীর পক্ষে হয়তো প্রয়োজন।

পূজায় প্রকৃতি এখানে অবাধ, আপন সৌন্দর্যে বিভোর

ঝাড়গ্রাম-কাঁকরাঝোর-মুকুটমণিপুর ঝিলিমিলি-অযোধ্যা পাহাড়

ঝাড়গ্রাম

কাঁকরাঝোর

মুকুটমণিপুর

অযোধ্যা পাহাড়

ঝিলিমিলি

ঝাড়গ্রাম

শালবন ঘেরা ইতিহাসখ্যাত মহকুমা শহর। একদা মল্লভূমের রাজধানী ছিল। বর্তমানে জেলা সদর—কলকাতা, খড়্গপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর থেকে সড়কপথে যুক্ত।

কীভাবে যাবেন—শিলদা স্টেশনে নেমে ৩৫ কি.মি. বাসে। শালবনের মধ্যে দিয়ে ঝাড়গ্রাম পৌঁছনোর পথটি অপূর্ব। ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে ৬ কি.মি. অটো, টাঙ্গা, রিকশা পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রাম থেকে কাঁকরাঝোর ১৮ কি.মি. বাসে। ঝাড়গ্রাম থেকে মুকুটমণিপুর ৩৫ কি.মি. বাসে। ঝাড়গ্রাম থেকে অযোধ্যা পাহাড় ৪৫ কি.মি. বাসে। ঝাড়গ্রাম থেকে ঝিলিমিলি ৩৫ কি.মি. বাসে।

কাঁকরাঝোর

১৩০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা রঘুনাথ সিংদেও-র সময়ে নির্মিত। এক পাশে রঘু—কাঁসাই নদীর ভাঙন রোধে, অন্য পাশে রাজবাড়ি, দীঘি, ইষ্টকনির্মিত শিবমন্দির, সেকাল আর একালের বসতি।

কীভাবে যাবেন—ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে ১৮ কি.মি.। ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে অটো, টাঙ্গা, রিকশা পাওয়া যায়।

কখন যাবেন—শীতের যে-কোনো সময়টাই ভালো। বর্ষায় যাবেন না।

কীভাবে যাবেন—শালবন ঘেরা ঝাড়গ্রাম থেকে কাঁকরাঝোর যাওয়ার পথটি অপূর্ব। ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে ১৮ কি.মি.। স্টেশন থেকে অটো, টাঙ্গা, রিকশা পাওয়া যায়।

মুকুটমণিপুর

এখানে কংসাবতী ও কুমারী নদীর মিলনে তৈরি হয়েছে এক বিশালাকৃতি জলাধার। বর্ষার পর জলাধারের জলস্তর নেমে গেলে পাথুরে চাতালে বসে সূর্যাস্ত দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

কীভাবে যাবেন—শালবনি মিলনপল্লী বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩ কি.মি. টোটো। শালবনি স্টেশন থেকে ৭ কি.মি. টোটো। ঝাড়গ্রাম থেকে ৩৫ কি.মি. বাসে।

ঝিলিমিলি

এখানে ঘেরা জলাশয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার জল এসে মেশে। সন্ধ্যে-রাতে সেখানে পড়ে জঙ্গল ঘেরা উঁচু পাহাড়ের অপরূপ সুন্দর প্রতিবিম্ব। বেশ নির্জন।

কীভাবে যাবেন—ঝাড়গ্রাম থেকে শালবনি মিলনপল্লী বাসস্ট্যান্ড ৩৫ কি.মি. বাসে। ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে ৩৫ কি.মি.।

অযোধ্যা পাহাড়

পুরুলিয়া জেলার উঁচুতম পর্বতশৃঙ্গের একটি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬৫৬ ফুট উঁচু। পাহাড়ি জঙ্গল, উপজাতীয় গ্রাম। অনেক দূরের গ্রাম আর পাহাড় দেখা যায়।

কীভাবে যাবেন—ট্রেনে করে আসার সেরা স্টেশন পুরুলিয়া। স্টেশন থেকে ২৫ কি.মি. বাসে। ট্রেকিং করে উঠতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। সিজন ধরলে হাতে পুরুলিয়া থেকে বাসে সিধাসকল গিয়ে সেখান থেকে ১২ কি.মি. ট্রেকে অযোধ্যা।

কখন যাবেন, কোথায় থাকবেন এবং যাতায়াতের পরিচয় আগে থেকে জেনে নিন। এখানে মুকুটমণিপুরে ইউথ হোস্টেলেরও আশ্রয় আছে। অযোধ্যা পাহাড়ে একটি ১০-শয্যার ট্যুরিস্ট হস্টেল আছে। এছাড়া সাধ্যমতো ঘরোয়া আশ্রয়ও মিলবে।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং ডিরেক্টরেট কর্মীবৃন্দ, ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

৫/১, লিন্ডসে স্ট্রিট (৩য় তল), কলিকাতা-৭০০০৮৭, ফোন ২৩-৩১৭১, ফ্যাক্স ৩৩৪৪৫৫৫৫;
১, মেঘ ডুমুর, দার্জিলিং, ফোন ২৫৭০, ফ্যাক্স ০৩৫৪-২২৫৪৫৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, হাসিমারা, ফোন ৫২৩৪;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, ফালাকাটা, ফোন ৫২৩৪;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, জলপাইগুড়ি, ফোন ২৪৫৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, কোচবিহার, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, বাগডোগরা, ফোন ৫২৩৪;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, মালবাজার, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, কালিম্পং, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, শিলিগুড়ি, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, রায়গঞ্জ, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, বালুরঘাট, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, মালদা, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, বহরমপুর, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, কৃষ্ণনগর, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, বর্ধমান, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, দুর্গাপুর, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, বাঁকুড়া, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, পুরুলিয়া, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, মেদিনীপুর, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, হাওড়া, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, হুগলি, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, নদিয়া, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, মুর্শিদাবাদ, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ফোন ২৫৪৫;
ডুয়ার্স টুরিস্ট লজ, কলকাতা, ফোন ২৫৪৫;

পরিচালনায় সহযোগিতায়

TOMORROW'S TRAVEL

অনুবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুকুল গুহ

॥ অনুবাদ সমস্যা ও সম্ভাবনা ॥

সাহিত্যের উৎকর্ষতা সম্ভব একমাত্র তার বিনিময়ের মাধ্যমে। নিজস্ব পরিবৃত্তের সীমাবদ্ধতা সাহিত্যকে গতিশীল রাখতে সম্ভব হলেও সার্বিকভাবে তার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন কোনো আনুকূল্য দেখাতে পারে না, সেখানেই অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব। এখানে সেই গুরুত্ব ও অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে।

অনুবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে কোন আলোচনা শুরু করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রবহমান তরঙ্গগুলির সঠিক অনুধাবন করার চেষ্টা করা। যতই দিন যাচ্ছে, যতই আমরা ক্রমশ সামাজিক যোগসূত্র স্থাপনের যুগের আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি। ততই মনে হচ্ছে, যেন কোন 'সংস্কৃতি'-ই আর একক ভাবে অর্থবহ নয়। বরং 'আন্তর্জাতিক' রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। হয়তো ধীরে, অতি ধীরে, কিন্তু অমোঘভাবেই ভৌগোলিক সীমারেখার ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে। বিশে শতাব্দীর শেষভাগে সংস্কৃতির অবধান সেই চিহ্নেই তাই গাঢ়ভাবে চিহ্নিত। এর অবশ্য অনেকগুলি কারণ রয়েছে। সেইসব কারণগুলির অন্যতম হল 'যুদ্ধেরভয়' ধ্বংসের ভয়, আর সংযোগের জন্য অতি আধুনিক ও দ্রুততর ব্যবস্থা। এইসব কারণেই আজকের যুগকে অনেকে 'সংযোগের যুগ' বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন। সভ্যজগতের এবং অসভ্য জগতের সবকটি বুদ্ধিজীবী দলের কাছেই যা তীব্রতর তা হল 'নিঃসঙ্গতা' 'একাকীত্ব' যেমন একদিকে, তেমন অন্যদিকে 'একতা' ও 'স্বাধীনতা'। আর সেসব ব্যাপারেই শারীরিক ও মানসিক মুক্তির সম্ভাব্য পথ হল পারস্পরিক সং ও সহযোগিতা। পরকে জানার মধ্যেই কোথাও থেকে যায় জ্ঞানের চাবিকাঠিটি, মানুষ যা উপলব্ধি করেছে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ থেকেই। আর সেইজন্যই একটি 'ট্রান্সলেটিং কালচার' তৈরি করতে হলে তা হওয়া দরকার এইসব দিকে স্পষ্ট দৃষ্টি রেখে। সৃষ্টিমূলক কোনকিছুর অনুবাদ তাই সম্ভব তখনই যখন সৃষ্টিমূলক অনুবাদকের দল তৈরি হয়। যখন ওই ট্রান্সলেটিং কালচার তৈরি হয়। অন্যথায় নয়।

জাতীয় সংহতির প্রশ্নটি যখন এশিয়ার বৃহত্তম উপমহাদেশ ভারতে অগ্নিময় হয়ে উঠেছে, তখনই স্বভাবতই এই দেশে 'আন্তর্জাতিকতা' বা 'আন্তর্ভাষাভাষিকতা'-র গভীর প্রশ্নটি আরও তীব্রতর হয়ে দেখা দিল। যদি অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্ন কিংবা উন্নতির প্রশ্ন ওঠে তাহলে সেসব প্রশ্নের

পরকে জানার মধ্যেই কোথাও থেকে যায় জ্ঞানের চাবিকাঠিটি, মানুষ যা উপলব্ধি করেছে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ থেকেই। আর সেইজন্যই একটি 'ট্রান্সলেটিং কালচার' তৈরি করতে হলে তা হওয়া দরকার এইসব দিকে স্পষ্ট দৃষ্টি রেখে। সৃষ্টিমূলক কোনকিছুর অনুবাদ তাই সম্ভব তখনই যখন সৃষ্টিমূলক অনুবাদকের দল তৈরি হয়।

সবটাই নির্ভর করছে এই বিশাল মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের মধ্যে সুষ্ঠু সংযোগ ব্যবস্থার ওপর প্রথমত, আর সেই ক্ষেত্রে অনুবাদ মাধ্যমটির ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে

এ ছাড়াও বহু মানুষ চতুর্দিকে এ লেখাজোখার অবিচ্ছেদের মধ্যে পড়ে পৃথিবীর সব সাহিত্যই মূলত ছিল লৈখিক। সেসব সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক জ্ঞানের আদান প্রদানের প্রয়াসে চালাতো শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে। যুগে যুগে এর সমস্যাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির প্রতিষ্ঠা বা উন্নয়নের সমস্যা প্রায় একই ধরনের হয়েছে। তাই চরিত্রগুলো কিছুটা পালটায় মাত্র, ফলে অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞান বিনিময়ের প্রশ্নটি ছিল অবলুপ্তিহীন। জ্ঞান বিনিময়ের নয়, তার প্রয়োজনের তাগিদেই। এই দীর্ঘ যুগের বুকে সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে এই সামাজিক অভ্যাসটিও ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ের উন্নততর সংযোগ মাধ্যমগুলির আবিষ্কারের ফলে বরং সেই অভ্যাসটি আরও সহজ ও প্রয়োজনসাধ্য হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রটির কিন্তু বিস্তৃতি হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বরং এই প্রয়োজনের ক্ষেত্রটি ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে দেখা যাচ্ছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আজকের মতন এত কঠিন সময় সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনও আসেনি। আর এই সঙ্কটময় সময়ে অনুবাদের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে আরও লক্ষগুণ। আর সে কারণেই যে কথা বলছিলাম, 'ট্রান্সলেটিং কালচার'-এর কথাটি বিশেষভাবে আলাদা করে ভাবার তাই একান্ত সময় এসেছে। সম্ভবত

আমরা আর এই প্রবাটিকে উপেক্ষা করতে পারিও না।

অতীতের দিকে বরং একটু তাকানো যাক। মনে করুন 'বেথ এল হিকমান' (জ্ঞানগৃহ)-এর কথা, যা আল মামুন (৮১৩-৩৩) বাগদাদে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে তারত বা গ্রীসের সাহিত্য সংস্কৃতি দর্শনের খবর অনুবাদ করে আলোচনা করা হত। এই 'বেথ-এল হিকমন'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল 'আব্বাসিদ' সংস্কৃতির ওপরে তুরস্কের আজম অভ্যুত্থানের বিস্তার সম্ভব হত কি না, যদি ফারাবী বা অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ তুরস্কে উজ্জীবিত না করত দীর্ঘ সময় ধরে, এ প্রবাটিকে এড়িয়ে যেওয়াও যায় না। অথবা উনবিংশ শতকে জাপানেই 'হিরোকুসা' আন্দোলনের কথা মনে করতে হয়। সেই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাষা (এশিয়া ইয়োরোপের) থেকে অনুবাদ করে প্রচার করা হত। যার ফলে জাপানের প্রখ্যাত 'মুনসেই কাইকা' নামক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। সারা ইয়োরোপে এমন কি ইন্দোনেশেও সংসময়ই সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলির ওপরে নজর রাখা হত। অবশ্যই অনুবাদের মাধ্যমে। ভারতও এই কাজে কোনদিন পিছিয়ে থাকে নি। অবশ্য ইসলামীং ছাপাখানা এই কাজকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার সম্ভবত কোন সৃষ্টিশীল রচনা ছাপার মাধ্যমে প্রচার করতে পারার ক্ষমতা। গ্যালিলিও, ডলতেয়ার, ডারউইন থেকে আরম্ভ করে মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যুদ্ধে বা শান্তির পৃথিবীতে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছে। যাকে অস্বীকার করা যায় না যে পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকেরই রয়েছে এই সম্পদের উত্তরাধিকারের দাবি। নিজের নিজের ভাষায় এইসব সম্পদ উপভোগ করার দাবি তাই অস্বীকার করার অধিকার যোগ্যতম কারোরই নেই।

অবশ্য অতীতের ও বর্তমানের মধ্যে বাস্তব পরিবেশ অনেকটাই বদলে গেছে। অতীতে অনুবাদ যত দ্রুতলয়ে হত, এখন তা আর তত দ্রুত হয় না। একথা শুনলে চমকে যেতে হলে কথাটা সত্যি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: গীতগোবিন্দ রচিত হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে তারতের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল সেই রচনার সঙ্গীতময় মাধুর্য। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে তারতের যে তারতের কোন একটি ভাষায় রচিত যুগান্তকারী সাহিত্য সম্পাদিত হয়ে অন্য তাষায় উপস্থিত হতে এখন কত সময় লাগে। বাংলায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ কোন সাহিত্য কন্নড় বা তামিল বা অসমীয়া বা ওড়িয়াতে উপস্থিত করতে কতদিন লাগে? অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করতে হলে কি সেই কারণ যার জন্য বিভিন্ন তাষার মধ্যে পারস্পরিক অনুবাদ হতে এত সময় লাগছে, সেটিও স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা দরকার। আজকের দিনে যখন ছাপা ব্যবস্থার বৈয়ক্তিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, যখন ফটো অফসেট ছড়িয়ে গেছে প্রায় প্রত্যেকটি শহরে তখন অনুবাদ সংস্থান এতটা পিছিয়ে পড়ছে কেন সেটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। সাধারণ মানুষের মধ্যে কি অনুবাদ সাহিত্য পাঠের আগ্রহ কমে গেছে? না কি কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। কারণটা যাই হোক সেটা সর্বাগ্রে খুঁজে বের করা দরকার। যাঁরা এই প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করেন, দরকার হলে তাঁদের নিয়ে আলোচনায় বসা যেতে পারে, দরকার হলে তাঁদের বক্তব্যের অসারতাও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই অস্বীকার করার দল মনে করেন যে বুদ্ধিনির্ভর অনুবাদের প্রয়োজন তেমন নেই, কেননা তারতবর্ষের জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ শতাংশের অক্ষরজ্ঞান আছে, মাত্র ২ শতাংশ ইংরেজী জানেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, তারতের ঐতিহ্যময় বহুমানতার জাতীয় সংহতি যথেষ্টই রয়েছে। আর তাই পারস্পরিক অনুবাদকর্মটি তেমন জরুরি নয়। হয়ত তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। তাই সদ্য তৈরি এই অনুবাদের যন্ত্রটি ব্যবহার করার আগে আমাদের একটু সাবধান হতে হবে। কিন্তু প্রশ্নের আরও গভীরে যাওয়ার আগে আমি ছাপাখানার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ব্যাপারটি একটু মেলে ধরতে চাই।

মানবসভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার - সম্ভবত কোন সৃষ্টিশীল রচনা, ছাপার মাধ্যমে প্রচার করতে পারার ক্ষমতা। গ্যালিলিও, ডলতেয়ার, ডারউইন থেকে আরম্ভ করে মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যুদ্ধে বা শান্তির পৃথিবীতে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছে। যাকে অস্বীকার করা যায় না, যে পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকেরই রয়েছে এই সম্পদের উত্তরাধিকারের দাবি।

১৪৫৩ সালে সুটেনবার্গ জার্মানিতে ছাপাখানা আবিষ্কার করেন। তারপর ১২৪ বছর লেগেছে তারতবর্ষে সেই ছাপার অক্ষর আসতে বুঝিলনে। তারপর শুরু হয়েছে প্রকৃত প্রকাশনার জগৎ আধুনিক পর্যায়ে। ১৫৭৯ সালে সেন্ট ফ্রান্সি জেভিয়ারের ডকট্রিনা ক্রিশ্চিনা (তামিল ভাষায়) সম্ভবত তারতের প্রথম ছাপা গ্রন্থ। তারপর এই ৩০৬ বছরে ধীরে ধীরে তারতীয় প্রকাশনা জগতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলায়, পুরোনো কাঠের টাইপের সন্ধান যদিও ১৬৮৭ সালেই পাওয়া গিয়েছিল (অন্তত ৮টি গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল ১৬৮৭ থেকে ১৭৭৭ সালের মধ্যে)। তবু প্রকৃত অর্থে ছাপা শুরু হয় ১৭৭৭ সালে। এই ৩০০ বছরে, যদিও জনসংখ্যার অনুপাতে (৬৮ কোটি) খুব কমই তবু, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারতের প্রকাশনা শিল্প কম বিকশিত হয়নি। পৃথিবীর প্রকাশনা জগতের প্রথম সারিতেই তাঁর স্থান। তারতের স্থান ইংরেজী বই প্রকাশনাতে পৃথিবীতে তৃতীয়। সব ধরনের বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সপ্তম। তারতের আগে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ক্রমানুসারে আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ইংল্যাণ্ড ও স্পেন। বছরে সারা তারতে ছাপা হয় এখন ২০ হাজারেরও বেশি বই। তবু তা যথেষ্ট নয়। কারণ তারতের সাড়ে ৫ লক্ষ স্কুল ও কলেজের (৩০ লক্ষ শিক্ষক ও ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেট যেখানে) জন্য প্রয়োজনীয় বই আরও অনেক বেশি দরকার। প্রাইমারি স্টেজ থেকে ধরলে ছাত্রসংখ্যা ৯০৫ লক্ষ। টেক্সট বই ছাড়াও নন টেক্সট বইয়ের চাহিদাও এখানে কম নেই। সব মিলিয়েও প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন সবসময়ই কম। এই বিপুল পটভূমির পেক্ষিতে আমি অনুবাদের অংশ কতটুকু তা মনে করতে চাই। বলা বাহুল্য তা একেবারেই উপেক্ষাযোগ্য নয়। অবশ্য উপনিবেশিকতার শেষাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক তামাডোলে ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণেই কি অনুবাদের প্রবাটি আরও গভীরভাবে দেখার দরকার ছিল না?

তাবুন তো একবার সবকটা কথা। তারতের আয়তন ৩২,৮০,৪৮০ বর্গকিলোমিটার তার মধ্যে ১৫২০০ বর্গকিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমরেখা আর ৫৭০০ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রতীর; ৬৮ কোটি জনসংখ্যা; এখানে রয়েছে স্যার জর্জ গ্রিয়ারসনের হিসেব অনুসারে ১৭৯টি ভাষা, ৫৪২টি তায়লেক্ট। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অবশ্য এই সংখ্যা বাড়িয়ে ঠিক্রিত করেছে ৮৭২টি মোট। এই বিপুল ক্ষেত্রটিতে সংযোগ বা সংহতি রক্ষা করাটা খুব সহজ কাজ নয়। আমি রাজনৈতিক সংযোগের কথা বলছি না। সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রশ্নই এখন আমাদের। এই অবস্থায় অনুবাদের প্রয়োজন কে অস্বীকার করবেন। আর তখন যখন তারতের সকলেই জাতীয় সংহতিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে বলছেন।তাই যদি হয় তাহলে অনুবাদের কাজটি কীভাবে অবহেলিত থাকতে পারে। তারতের বুদ্ধিজীবী সমাজের তাহলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে

মিলে সবে
ভারত সন্তান
করি পূজা
হয়ে এক প্রাণ

সকল ভারতবাসীর
একাত্মবোধ
জেগে উঠুক
মাতৃপূজার প্রাঙ্গণে

ইউনাইটেড
ইন্ডাস্ট্রিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

সেন্ট্রাল অফিস:
"পার্ক সেন্টার" ২৪, পার্ক
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬

রেজিঃ অফিস
৭, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০১

চোখ বন্ধ করে আছেন কীভাবে? এবং বিশ্বাস করা চলে যে, না তাঁরা চোখ বন্ধ করে নেই, বরং আশা করা যাক যে তাঁরাও হয়তো চিন্তান্বিত এই প্রশ্নে। কারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যদি এই প্রয়োজনকে না দেখতে পান তাহলে এই প্রয়োজনকেই অস্বীকার করা হয়। কীভাবে বা কোন সূত্রে আমরা এতদূর ঝুঁকি নিয়ে চলেছি? না, আমরা ঝুঁকি নিতে পারি না। অবশ্য অনুবাদ সাহিত্যের কলেবর যেরকম ঝুঁকির কথা বলে না, বরং উল্টোটাই প্রমাণ করছে। তা সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও তবে এই পরিবর্তনশীল চরিত্রের নানান চেহারা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এমন অনেক ভদ্রলোক সমাজ রয়েছে যে সমাজ তাদের নিজেদের সংহিতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। আবার আরও অনেক সমাজব্যবস্থা রয়েছে যেগুলো, বহির্বিশ্বে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে কৌতূহলী। তাঁরা নিশ্চয়ই প্রতিযোগে করে চলেছেন কেন বাইরের সাহিত্যের যথাযথ অনুবাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না ভারতে এবং ভারতের বাইরেও অনেক লোকে এই দুই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান। পাঠকদের সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথম সমাজব্যবস্থাকে আমরা সমর্থন করব, না দ্বিতীয়টিকে। না কি দুটিকে? দ্বিতীয়টি। বলা বাহুল্য কাজটা খুব সহজ নয়। আর এই প্রশ্নের বিচার করতে আমরা কিন্তু বিস্মৃত হতে পারি না যে, উদ্যম বা অবদান এই কথাটা ক্ষেত্রেই আমরা সবচে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা পড়ে আছি। বঙ্গদর্শনের পাঠাগারে আইনের ধারাটি নির্দেশের দ্বিতীয়টিও যেন না করলে চলবে না, প্রত্যেক মানুষের জন্য তার পঞ্চমত্ব বই

একেবারে অবশ্যই, ভদ্রলোকের অনুবাদ-সংস্কৃতির নানান রকম বদল হতে প্রয়োজন হলেও হতে পারে। বলা বাহুল্য সেসব বদল, পরিবর্তন অনুবাদ ব্যবস্থার কাছে দাবি তুলবে নানান ধরনের, বিশেষ করে প্রকাশনা সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে, কারণ প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গেই অনুবাদ সংস্কৃতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভারতের প্রকাশনার ইতিহাস বিদেশী ও আঞ্চলিক বেশ কিছু ভাষার অনুবাদে পারম্পরিকভাবে সমৃদ্ধ। সেসব ভাষার ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য, কবিতা ও ইতিহাস শুধু ভারতের বেশ কিছু ভাষাতেই সার্থকভাবে অনূদিত। এই যে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি ভাষায় খুবই শক্তিশালী লেখক তাঁরা কিন্তু আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের না জানলে সর্বভারতীয় স্তরে একটা ভারতীয় সংহতি গড়ে ওঠার প্রশ্ন আসে কীভাবে। যেমনটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন আমলে তেমনটিই কি থাকতে দিতে পারা যায় কিন্তু তাও ও এই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় করা সম্ভব নয়। ঘটই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের পণ্ডিতেরা, তাঁদেরকে 'অপরিবর্তনশীল' অবাক দৃষ্টিতে দেখুক না কেন, মনে রাখতে হবে তাঁরা যে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময়েই অনুবাদকদের সঙ্গে মিলে রয়েছে ইতিহাস বারবার একথা প্রমাণ করেছে। আমি তাই বলি, সৃষ্টিশীল লেখকদের জানতে হবে, কিন্তু অনুবাদকদেরও জানতে হবে, জানতে হবে অনুবাদকদের পথগুলিকে। মাইকেল মধুসূদন ইতালির সৃষ্টি ও রচনার মধ্যে দিয়ে নিজের রচনা বদলের যে চেষ্টা করেছেন, প্রত্যেকেই আমরা নিজে এই ভাষা ঐতিহ্যকে করে চলেছেন, আমরা নিজে নিজেকে বলে নিজেদের ভাবেন আর তাই মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ কারও পথই বা পটভূমি বৈশিষ্ট্যে ভিন্নটা অনুবাদক হলেও অনুবাদকম কিন্তু থেকে যাচ্ছেন, এখনও তবে প্রশ্নটা খুবই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, যে তাঁরা মধ্যে মধ্যে ভারতের অনুবাদের বিদেশ কোন ইতি সম্পর্কে আগে ছিল বা আছে কি না যদি থাকে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারা যায়। না থাকলে নতুন সমাজব্যবস্থার কথা আমাদেরই ভাবতে হবে পরিবর্তনশীল এই পটভূমিতে আমরা কবে তাদের অনুবাদ সংস্কৃতিগুলি কবে ওঠে তাদের নিয়ে তাদের একটি প্রজেক্ট করতে পারি প্রথমেই ইউরোপের এ কথা বলতে হবে, তবে তার আগে আমাদের এই সংস্কৃতি বিকাশমান্য এবং ইতিহাসের তার ক্রমবর্ধমান প্রায় চর্চিত্যা যাচ্ছে ১৯৭৯ সালে ইউনেস্কোকর্তৃক ইন্ডিয়ানের এবং ইনস্টিটিউট এবং সবচে মানুষে যে সমস্যটি প্রথম করেছিলেন, মতের সি কর্তার এবং বৃত্তি নামে মাইকেল কবে হয়েছে এই সমস্যের প্রস্তুত একটি অনুবাদ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান করা কোন একটি মাইকেল ও উপস্থিত করা হয়েছে বিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই মাইকেলটি সম্পর্কে পড়ার অপর দ্রেণি করা উচিত ছিল আমাদের পক্ষেও বলা কঠিন এই মাইকেলটির সাথে কতটা সম্ভব না এবং ১৯৮৩ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স এর ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট ইন এশিয়া প্রসঙ্গে পার্টিসিপেন্ট এশিয়া ও কোনও মনে আছে আমি জানি না, কিন্তু মধ্যে সম্প্রতি উৎসুক জানতে যে একেবারে কোন কাজের নতুন ভাবনের কোন কোন বিশ্লেষণের হয়ে থাকে ভারতে বেশকিছু প্রকাশন সংস্থা ছাড়াও এগুলো বড় সংহিতা অকাডেমি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ও বড় বুক সেন্টারগুলি

এগুলির মধ্যে বড় পুস্তক প্রকাশগুলির কাজকর্ম বিশেষভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে সীমিত

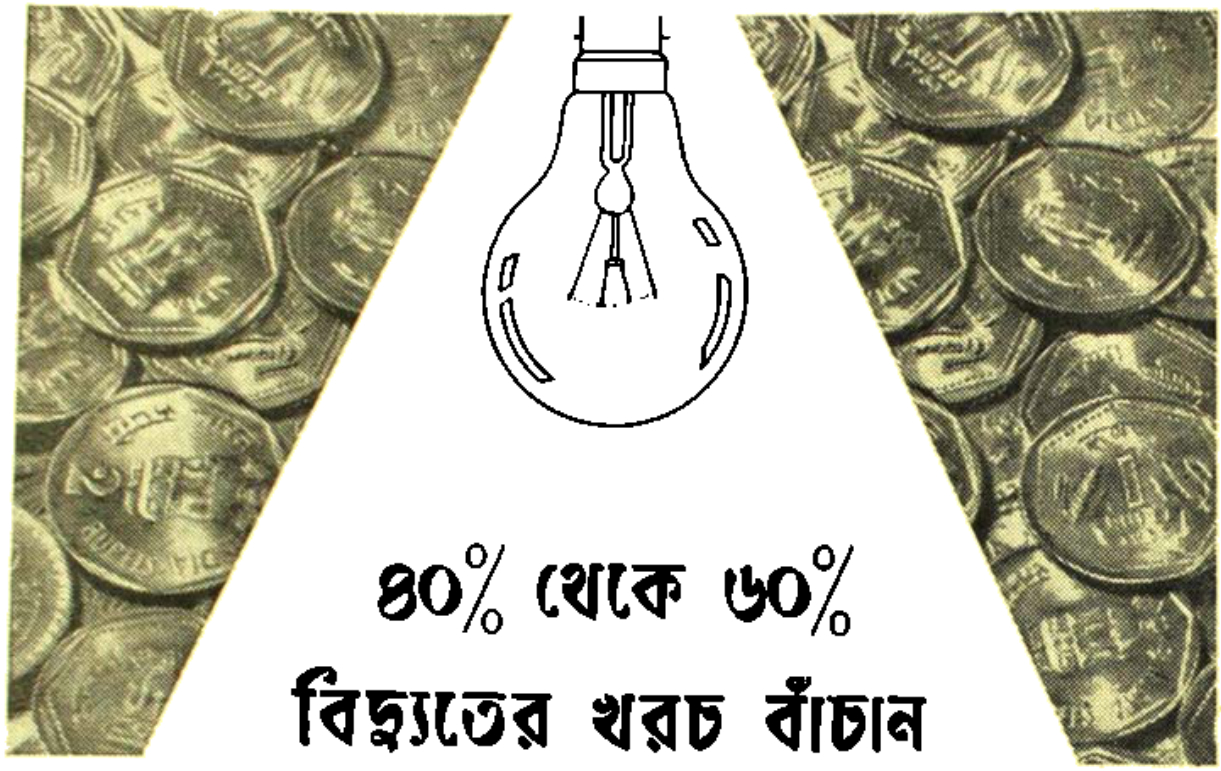

৪০% থেকে ৬০%
বিদ্যুতের খরচ বাঁচান

- ওয়াট পিছু বেশী লাভের জন্য উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ফ্লুরোসেণ্ট ল্যাম্প ব্যবহার করুন।
- প্রয়োজনে আলো, শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, এয়ার-কুলার, হিটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না।
- ল্যাম্প ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ধুলো ময়লা থেকে মুক্ত রাখুন।
- ঘরের সিলিং-এ হাল্কা রঙ ব্যবহার করুন।
- রেফ্রিজারেটারের দরজা ঘন ঘন খুলবেন না।
- ঘরে পর্যাপ্ত দিনের আলো থাকলে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প নিভিয়ে রাখুন।
- সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে অনিয়মিত বিদ্যুৎ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

বিদ্যুৎ মূল্যবান,
এর পরিমিত ব্যবহার আপনাকে
বিদ্যুৎ সমস্যা মোকাবিলা
করতে সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

(কাস্টম শাখা)

(জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত)

অনেকেই হয়ত মনে করতে পারবেন, ১৯৫৪ সালের মার্চ ১২ তারিখে, সাহিত্য আকাদেমির উদ্বোধনী ভাষণে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান কি বলেছিলেন (অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে 'সাহিত্য অকাদেমি' সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ১৫ ডিসেম্বর)। রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন, 'সাহিত্য আকাদেমির' কথাটি দুটি শব্দ। একটি 'সাহিত্য' যা সংস্কৃত, অন্যটি আকাদেমি যা গ্রীক। 'সাহিত্য-তে রয়েছে সাহিত্যের সমাবেশ আর আকাদেমি'-তে সমাবেশ ঘটছে ওই বিষয়ে উৎসুক মানুষজনদের। তাই সাহিত্য অকাদেমি হবে সেই মিলনস্থল যেখান সমবেত হবেন তাঁরা যাঁরা সৃষ্টিশীল ও তর্কবিচারের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী। পৃথিবীর অন্যসব সংবিধানের মতন সাহিত্য অকাদেমির সংবিধানেও মৌলিকত্ব রয়েছে। এই আকাদেমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে একটা যোগাযোগের সূত্র স্থাপন করার, এক ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষায় অনুবাদ করার কাজ সংগঠিত করার ইত্যাদি।' ভারতের এই সংস্থাটির হচ্ছে সর্বোচ্চ সাহিত্য সংস্থা সেকথা মনে রাখা দরকার। অথচ এই সংস্থাটির জন্য অনুমোদিত অর্থের বরাদ্দ এত কম যে সেকথা ভাবলেও মন খারাপ হতে বাধ্য। গত ৬টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে বরাদ্দ কিস্তুটা করে বেড়েও উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা থেকে যে সহস্র যোজন দূরে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কম টাকা বরাদ্দের জন্য, পরিকল্পনা কমিশনের মাননীয় সভ্যবৃন্দের চমৎকার সিদ্ধান্তগুলিকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করাই উচিত আমাদের। তবে সেইসঙ্গে সরকারের বোঝা উচিত যে এইরকম সংস্থাই হচ্ছে দেশের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন। একটা কেরানী পোষার দপ্তর মাত্র নয়।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের জন্ম ১৯৫৭ সালে। তদবধি এই সংস্থা ২৫০০টি টাইটেল প্রকাশ করে সকলের অভিনন্দন পেয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৩৪০টি ইংরেজীতে বাকিগুলো সবই ভারতের নানান আঞ্চলিক ভাষায়। ইংরেজীর পরেই স্থান পেয়েছে হিন্দী, তারপর যথাক্রমে তামিল, মারাঠী ও বাংলা। এন বি টি-র ক্ষেত্রেই অর্থবরাদ্দ (১-৫ কোটি টাকা বছরে) খুবই কম। তবে তা সত্ত্বেও এন বি টি অনুবাদের কাজ যথেষ্ট সাফল্যের দাবী রাখে।

এই সূত্রে কিছুদিন আগে কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত একটা সর্বভারতীয় লেখকদের সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ছে। সেই সাক্ষাৎকারে অনেকের মধ্যে বাংলার মহাশ্বেতা দেবী ও তামিলের আখিলন স্পষ্টই মন্তব্য করেছিলেন যে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলেও তাঁরা অন্য ভাষার

'সাহিত্য অকাদমি' কথাটি দুটি শব্দ। একটি সাহিত্য যা সংস্কৃত, অন্যটি 'আকাদেমি' যা গ্রীক। 'সাহিত্য'তে রয়েছে সাহিত্যের সমাবেশ আর 'আকাডেমি'-তে সমাবেশ ঘটছে ওই বিষয়ে উৎসুক মানুষজনদের।

সাহিত্য সম্পর্কে তীব্র আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে, সমস্যাটা আসলে জড়িয়ে রয়েছে সরকারী নিয়মকানুন, পরিকল্পনা ও আমলাতান্ত্রিক অযোগ্যতার মধ্যে। এটাও সত্যি যে অনুবাদ বিষয়টি সম্পর্কে কাজের ইচ্ছা তখনই তৈরি হবে যখন বোঝা হবে যে এটা সত্যিই একটা সাংস্কৃতিক প্রয়োজন। সরকারী আমলাদের সেকথা না বোঝা পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় সহানুভূতি প্রত্যাশা করতে পারি না। আর আমলাদের মধ্যে আর যতই থাক সৃষ্টিশীল চিন্তার ধারে কাছে যে তাঁরা থাকেন না বা থাকতে পারেন না, সে কথা অস্বীকার স্বয়ং আমলারাও করতে লজ্জা পান। যাই হোক ওই যে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনটি, সেটির নিরসন একেবারে সম্ভব নয় যদি না তার জন্য একটা পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যায়। এই পরিমণ্ডলে থাকতেই হবে, শিক্ষা, সহযোগিতা, সম্পাদনা, বিক্রয় ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে আন্তরিক পর্যালোচনা ও কাজের পরিবেশ। মোদ্দা কথা পরিমণ্ডলটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও কর্মমুখর করে তুলতেই হবে।

অনুবাদের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে একটু ভাবা যাক। এ যাবৎ বাংলার প্রায় ২৫০ জন লেখকের রচনা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। হিন্দীকেই প্রথমে করতে হয় বেশি। কারণ হিন্দীতেই বেশি বাংলা বই অনূদিত হয়েছে। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটি অনুবাদ দিয়ে শুরু করে অদ্যাবধি হিন্দীতে বাংলার ১৮৬ জন লেখক অনূদিত হয়েছেন। অসমীয়াতে ৬ জন, উর্দুতে ১২ জন, ওড়িয়াতে ১০ জন, কন্নড়ে ২৭ জন, তামিলে ২৭ জন, তেলুগুতে ৩৬ জন, মারাঠীতে ৪৫ জন, মালয়ালমে ৪১ জন, গুজরাটিতে ৫৯ জন অর্থাৎ ৪৪৯ জন লেখক। (এই সংখ্যা আসের ২৫০ সংখ্যার থেকে বেশি কারণ একই লেখক অনেক সময় ২-৩-৪ ভাষাতেই অনূদিত হয়েছিল)। সুতরাং কাজটা খুব কম হয়েছে তা বলা চলে না। কিন্তু উল্টোদিকের ট্রাফিকটা কি রকম। অর্থাৎ অন্য ভাষা থেকে বাংলাভাষায়। সে ছবিটা কিন্তু সুন্দর নয়। বরং খুবই নিরুৎসাহব্যঞ্জক। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে বাংলার কি তবে অন্য ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ নেই, বাংলার কি তবে ওই অংশে যে বলেছি প্রথম ধরনের সমাজ যে সমাজ নিজেদের সাহিত্য নিয়েই আত্মসন্তুষ্ট। আমার অবশ্য তা কখনই মনে হয়নি। গ্রাম, শহরে ঘুরে, শহর শহরতলির একেবারে ওকোণ ওকোণ ঘুরে। বরং মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষ বাংলার চিরকালই অন্য ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। তবে একথা ঠিকই বাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা বিদগ্ধজনেরা কতটা আগ্রহী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। না হলে কেমন কোন অনুবাদ-সংস্থা, কেমন কোন দক্ষ অনুবাদকের দল তৈরি হয়ে উঠতে পারল না কেন। সংহতির প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে সব

কাজ সরকারের ওপর নয়, বেসরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমেও এই ধরনের আদান প্রদানের প্রয়াস থাকা উচিত ছিল। অসলে জাতীয় সংহতির কথা সকলেই বক্তৃতার জন্যই হয়ত বলে থাকেন, তাঁরা বাস্তবসম্মত মানুষ। এত খুঁটিনাটি বিষয়ে যাওয়ার সময় কোথায় তাঁদের।

তাঁর 'রাষ্ট্রীয় ভাষা কি বিষয়ে সে বক্তৃতায় উত্তরচাঁদ 'একলিপি' প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। সেটার সরকারই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু খুবই চাল লাগে যখন শুনি যে প্রেমচাঁদ বলেছেন হিন্দী ভাষা বাংলার অনুবাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে কিন্তু আরও দুঃখ যদি শুনতাম একই কথা প্রায় সব ভাষা থেকেই।

আমার ত মনে হয় যথেষ্ট বিলম্ব ইতিমধ্যেই হয়েছে। আর বিলম্ব না করে আই আর ডি পি-র মতন আই টি ডি পি (ইনটিগ্রেটেড ট্রান্সলেটার্স ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রেস) করা উচিত। এরকম একটা সংস্থা হয়ত সমস্ত সংযোজন এবং সহযোগিতায় কাজটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে নিতে পারবে। সৃষ্টিশীল ও মননমূলক অনুবাদকদের বলে দিয়ে স্বজনপোষণ বা ক্ষেত্রপীসূলভ ব্যবস্থা হলে অবশ্য এরকম কোন সংস্থার জন্ম বহু কিছুর মতন কেবল নামকা ওয়াস্তে হয়েই থাকবে তার জন্য আমাদের চিন্তিত হয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

অনুবাদ সমস্যা জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতি প্রশ্নে গভীরভাবে দেখা দিচ্ছে। সত্যিকারের জ্ঞানী ও পণ্ডিতরা, লেখক কবিরা তাই এই সমস্যাকে আরও অবহেলা করে চললে, ওই সংহতির মূলেই কাটল ধরতে পারে। আশা করি সে ঝুঁকি আমরা কেউই নিতে চাইব না।

লেখক বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশে অনূদিত গল্পের বিষয় সার্বভারতীয় অনুবাদ-প্রকল্পের জন্য তৈরী প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

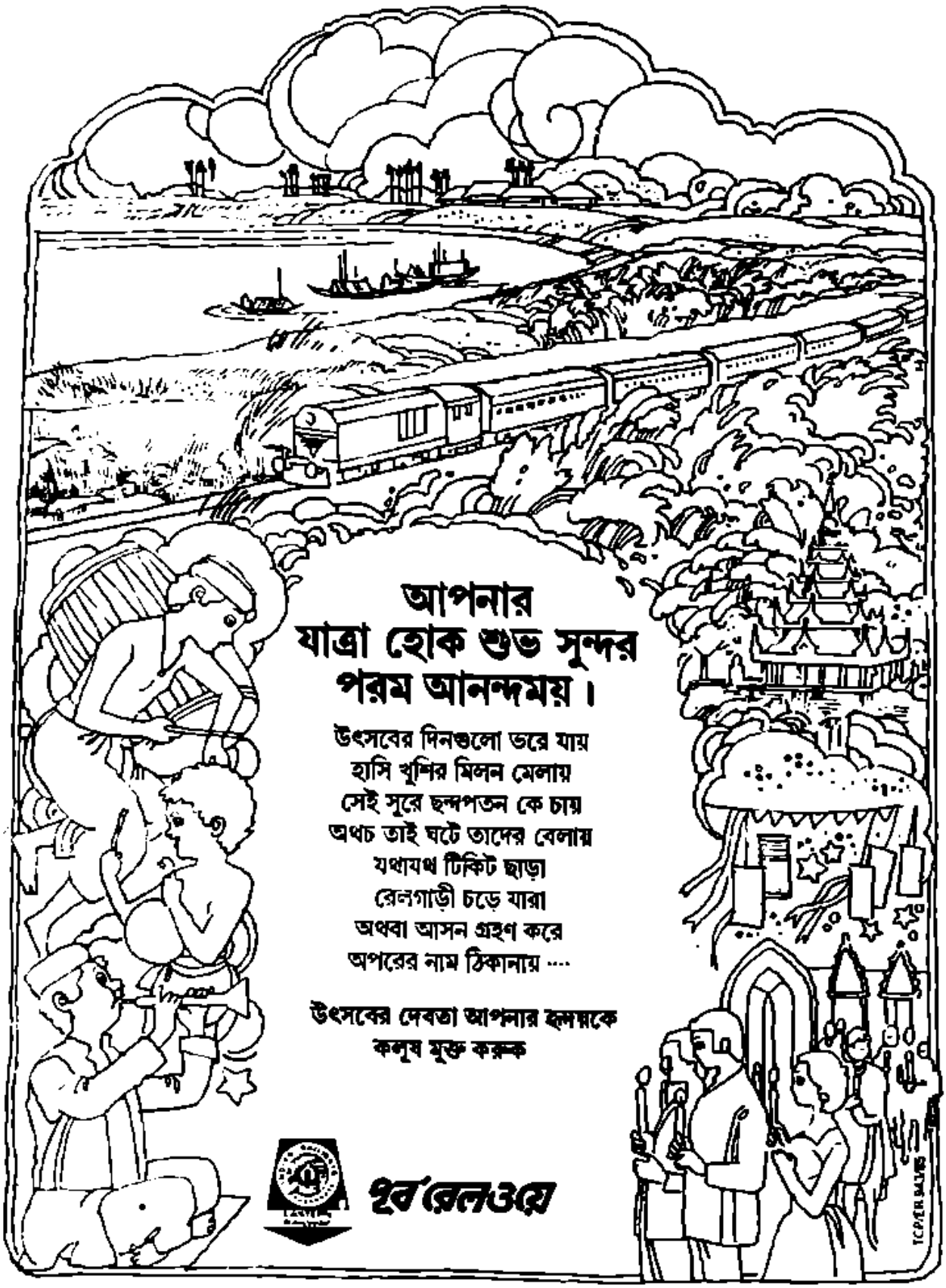
আপনার
যাত্রা হোক শুভ সুন্দর
পরম আনন্দময়।
উৎসবের দিনগুলো ভরে যায়
হাসি খুশির মিলন মেলায়
সেই সুরে ছন্দপতন কে চায়
অথচ তাই ঘটে তাদের বেলায়
যথাযথ টিকিট ছাড়া
রেলগাড়ী চড়ে যারা
অথবা আসন গ্রহণ করে
অপরের নাম ঠিকানায় ....
উৎসবের দেবতা আপনার হৃদয়কে
কলুষ মুক্ত করুক
পূর্ব রেলওয়ে

ঘৃণা

দিব্যেন্দু পালিত

সকালে ব্যস্ত হাতে উৎপলের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিল পলা। এমন সময় কোঁ-কোঁ শব্দে ডোরবেল বেজে উঠল।

পলার হাত জোড়া। আজকের লোক পুরুলও পাঁউরুটির স্লাইস কেটে স্যাণ্ডউইচ বানাতে ব্যস্ত। পলা তাড়া দিয়ে বলল, 'যাও দেখে এসো কে—

যে এসেছে সে নিশ্চয়ই খুব ব্যস্তমানুষ। একবার বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করার সামান্য ধৈর্যটুকু পর্যন্ত নেই। পুরুল যেতে না যেতেই শব্দ উঠল আবার। শব্দটা বিশ্রী। কালই উৎপলকে বলেছিল অফিসের ইলেকট্রিশিয়ানকে বলতে বেলটা পাল্টে দিয়ে যেতে। আজকাল কত রকমের বাহারে শব্দের বেল বেরিয়েছে। অমনি বৈচিত্র্যে ভাদের কোনো কোনোটা কান জুড়িয়ে দেয়; সেরকম কিছু একটা লাগিয়ে দিলেই তো হয়। তা নয়, শব্দ শুনে মনে হবে একটা ছাগলের গলা টিপে ধরেছে কেউ!

পলার বিরক্তি অবশ্য শুধু আওয়াজের জন্যে নয়। আসলে কাজের সময় এইরকম লোকজনের উপদ্রব সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তার ওপর আজ ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে বেশ। সাধারণত উৎপলের ব্রেকফাস্টের যোগাড়যন্ত্র রাতেই করে রাখে সে; সকালে, নির্দেশমতো কাজ এগিয়ে রাখে পুরুল। কাল সন্ধে থেকে এমনই বৃষ্টি নামল যে বাজারে পাঠানো গেল না লোকটাকে। বুদ্ধি করে যে সকালে বেরিয়ে কিনে আনবে তাও করেনি লোকটা—এসব দেখে ঘুম ভেঙে উঠেই মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল পলার। এর মধ্যে আবার বেল!

এই সকালে আসবেই বা কে। আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের কেউই এখন নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানে না এখনো। চেনাশোনারা জানে এটা অসময়। নিশ্চয়ই চাঁদাকলা চাইতে কোনো লোক বা কোনো কোম্পানির সেলসম্যান বা ওইরকম কেউ হবে। নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর এই ঝঞ্ঝাটটা বেড়ে গেছে। অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কিংবা এই ফ্ল্যাটেই আগে যারা ছিল তাদের খোঁজখবর করতে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ এসে বেল মেরে এখানে—গ্রাম ছোটোদের কলকাকে নেমপ্লেট লাগানো সত্ত্বেও উৎপল রায়ের ফ্ল্যাটে এসে প্রবীর বসু বা দিলদের ঠিকানা খোঁজ করে।

পুরুল ফিরে এসে বলল, 'একজন বাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন—'আমাকে!' স্যুপে হাতা নাড়তে নাড়তে পলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কে?'

'নাম বলে নি।'

উৎপল বাথরুমে। আর মিনিট পাঁচ-সাতেক মধ্যেই বেরিয়ে আসবে তারপর আর নষ্ট করার মতো সময় থাকে না হাতে। কাটায় কাটায় নটায় স্টার্ট দেবেই গাড়িতে। এদিকে দেরি হয়ে গেছে।

কিছু না ভেবেই পলা বলল, 'বলে দাও পরে আসতে—'

পুরুল গেল এবং পলা নতুন কিছু ভাবতে না ভাবতেই ফিরে এলো বলছেন জরুরি দরকার। বলছেন পরে এসে দেখা করবেন।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতরটা। আজ খুব তাড়াতাড়ি। কয়েকটি আগুনের তাপে গরমও বেশি, হাওয়া লাগবার জন্যে তাই ব্রাউজের ওপরের বোতামটা খুলে রেখেছিল পলা।

'নাম বলেনি? কীরকম দেখতে?'

'লম্বা মতন। ফরসা। ধুতি পরা বাবু। আপনার নাম করে ডেকে দিতে বললেন—'

পলা ঢোক গিলল। ঠিকঠাক করে নিল ব্রাউজটা। হাতের হাতা এবং স্প্যাটি পুরুলের হাতে দিল। চাপা, স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'নাম যদি না বলবে যে কোনো লোককে দরজা খুলে দাও কেন?'

স্বাভাবিকভাবে কিচেন থেকে বেরিয়ে হলঘরের দিকে গেল পলা।

'কী ব্যাপার?'

'অবাক হচ্ছ!? না চিনে?'

ভরাট সোফায় চমৎকার গা এলিয়ে বসে আছে দীপঙ্কর; পলা ঘরে ঢুকলেও উঠে দাঁড়াবার সামান্যতম চেষ্টাও করল না। হাতের খবরের কাগজটা শুধু অ্যাসট্রে চাপা দিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

এক মুহূর্ত দীপঙ্করের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকাল পলা। কঠিন হয়ে উঠল চোয়াল। বোতামটায় হাত রাখলেও লাগানো হয়নি তখনো। দীপঙ্কর বেভাবে তাকিয়ে আছে তাতে এখন কিছু করা মানেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

চাপা গলায় পলা জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

'কিছু চাইতে হবে কেন? তোমার কাছে এমনি আসতে পারি না!'

'পারো। কিন্তু—'

কথা আটকে গেল পলার। অসহ্যভাবে জঙ্ঘার পাশে শাড়ির আঁশ দু'হাতে মুঠো করে চেপে ধরল সে। জল হয়ে এলো নিঃশ্বাস। চোখের তলায় ঘাম। আর দু'তিন মিনিটের মধ্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবে উৎপল। এই সময়—

পলার ইচ্ছে হল লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। আটকানো জায়গা থেকেই সে আবার ফিরে গেল কথায়।

'কিন্তু—'

'অতো কিন্তু কিন্তু করছ কেন! তোমার বাড়িতে কেনো ভদ্রলোক আসে না কখনো?'

'আসে। জানিয়ে আসে—'

'ও! জানিয়ে!' দীপঙ্করের ভঙ্গিতে কোনো বাহুল্যের দেখা গেল না। খানিক বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'উপায় থাকলে তো! আবিষ্কার করে আসতে হয়েছে।

পলার মনে হল বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ পেল। দম বন্ধ করে তাড়াতাড়ি একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে নিল সে। দরজা বন্ধ থাকলে ডোর-বেলের শব্দ বাথরুম অব্দি পৌঁছবে না। তাছাড়া কেউ যে আসতে পারে এমন কোনো ধারণাই তখন উৎপলের মনে নেই। আরও দু-এক মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে যে ভাবেই হোক বিদায় করতে হবে দীপঙ্করকে। এটা নিশ্চিত যে ধমকে ওঠানো যাবে না ওকে, বেফাঁস কিছু বললে একুণি যা তা কাণ্ড করে বসতে পারে।

অলক্ষ্যে থেকে বোতামটার ওপর হাত চলে গেল আবার। লাগলো না। যতটা সম্ভব মোলায়েম করে পলা জিজ্ঞেস করল, 'ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?'

দীপঙ্কর হাসল; সেই হাসি, অর্থ নিয়ে যা সহজেই পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট জায়গায়।

'কী ভেবেছিলে, আর কোনোদিন খুঁজে পাব না!'

'তা বলিনি—'

'তাহলে!'

সোজাসুজি তাকাল দীপঙ্কর; পাঞ্জাবির বুক পকেট হাতড়ে বের করে আনল খবরের কাগজের একটা টুকরো। হাসতে হাসতে বলল, 'বেচারা উৎপল! সাহেবি অলঙ্ক-কারদা তো ভুলতে পারেনি এখনো—স্টেটসম্যানের পার্সোনাল কলামে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছিল একটা। ওকে বলে দিলেই পারতে! না ভুলে তোমার এত বড় একটা সর্বনাশ করে দিল!'

'দীপঙ্কর, প্লীজ!' ধৈর্যটা কোনদিকে যাচ্ছে বুঝবার আগেই অসহ্যভাবে পলা বলল, 'আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। উৎপল অফিসে বেরুবে এখনি। তুমি আরেকদিন এসো—'

'যখন উৎপল থাকবে না!'

পলা ধমকে গেল আবার। দীপঙ্করের উদ্দেশ্য ভাল নয়; কথা শুনেই মনে হচ্ছে জ্বালাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে আজ। ওই, উৎপল বেরুল বাথরুম থেকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল পলার। অবস্থি চাপা দেবার জন্যে পুরো উল্টোটা তুলে কপাল মুছতে ব্যস্ত হল।

'আঃ!' মুখে একটা পরিতৃপ্তির শব্দ করল দীপঙ্কর, 'পলা, কী সুন্দর বুক তোমার! ব্রা পরতে ভুলে গেছ, নাকি আমি অসময় বলেই—'

হাত দুটো দ্রুত বুকের ওপর জড় করে আনল পলা।

'অসভ্য! ইতর! বেরিয়ে যাও এক্ষুণি—'

'বেরিয়ে যাব!' অল্প নড়ে বসে নিচুর ভঙ্গিতে হাসল দীপঙ্কর। পা দুটো তুলে নিল সেন্টার টেবিলের ওপরে।

'বাড়িটা তোমার নয়, উৎপলের। আমি আমার বন্ধু উৎপলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তুমি আমাকে যেতে বলতে পারো না—'

তীব্র চোখে ক'পলক দীপঙ্করের নির্বিকার, পাথুরে মুখের দিকে তাকিয়ে পলা বলল, 'বেশ।'

তারপরেই ছুটে চলে গেল ভিতরে।

এইবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকেছে উৎপল। তৈরি হতে ব্যস্ত। তার মনে কেউ যে এসেছে তা জানে না এখনো। কিন্তু না বলে কিচেনে গিয়ে পুরুষকে তাড়া দিল পলা। তারপর উৎপলের চোখ এড়িয়ে আলনা থেকে প্রেসিয়ারটা তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল বাথরুমে। ঘষে জাবজেবে ব্লাউজ—তখনও এই অবস্থায় থাকলে দীপঙ্কর তার অনেকটাই দেখেছে। একদিন দীপঙ্করের ওই ছুঁচলো দৃষ্টিকে তার মনে করতে পারত পলা; কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, দীপঙ্কর দেখেছে ভেবে লাল হয়ে উঠল কান দুটো। এই দরজাবন্ধ বাথরুমের ভিতরেও দীপঙ্করের চোখ তাকে খুঁজছে ভেবে তাড়াতাড়ি প্রেসিয়ারটা পরে, ব্লাউজের বোতাম এঁটে, চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এল পলা। টেবিল সাজানো। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার হয়েছে? এসো—'

'কেউ এসেছে নাকি?' চুল ব্রাশ করতে করতে উৎপল বলল, 'কলিং বেলের আওয়াজ শুনলাম মনে হল?'

'হ্যাঁ—।' পলা এখন মরিয়া। দীপঙ্কর যা-ই ভেবে আসুক, উৎপলের সামনে নিজেকে সে কিছুতেই ধরা দেবে না। পরিষ্কার গলায় বলল, 'দীপঙ্কর। তোমার খোঁজে—'

'দীপঙ্কর!' অল্প ভুরু কোঁচকালো উৎপল, 'ও। দীপঙ্কর?'

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে জুতোর মোজা টেনে নিল উৎপল। মাথা নিচু, একটু চিন্তিতও যেন।

'এই সময়ে এলো! ও তো ছিল না এখানে!'

'এলেই তো হল না। বলে দাও তোমার অফিস আছে, ছুটি ছাটার দিনে আসুক—'

'তাই বলতে হবে—'

পলা বেরিয়ে এলো। কিচেনে ঢুকে ফুটন্ত চায়ের জল নামিয়ে পটে ঢালল, আন্দাজমতো পাতা ছেড়ে দিল তাতে। ঝোঁয়া আপ ছড়ালো মুখে। অফিস সমস্যা উৎপলকে জানানোর জন্যেই কী ভেবেছিল, পলা খবর দেবে না! কী কথা বলবে সে উৎপলকে?

এলোমেলো ভাবতে ভাবতে আবার ঘামতে শুরু করল পলা। বেরিয়ে এসে দেখল জুতো পরে টেবিলে না এসে ড্রইংরুমের দিকে যাচ্ছে উৎপল। ব্যস্তভাবে পলা বলল, 'শোনো, বসে আছে থাক। তুমি খেয়ে নাও আগে—'

ইতস্তত করে ফিরে এসে টেবিলে বসল উৎপল। সুপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে কী দরকার থাকতে পারে!'

'আমি কী করে বলব! এমনিই হয়তো—'

'এমনিই! উৎপল একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'ও কোথায় যেন ছিল? হিজলি না?'

'ওইরকমই কোথায় একটা—পলা বলল, 'ও কি। টোস্টটা সরিয়ে রাখছ কেন।'

'না, খাচ্ছি।' অন্যমনস্ক গলায় বলল উৎপল, 'তোমার সেই লক-আউটটা তো ওঠেনি এখনো। অনেকদিন হয়ে গেল—'

হঠাৎ চোখ তুলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল উৎপল। কিন্তু বলতে গিয়েও বলল না। পলা দেখল, খুব চটপটে হাতে খাওয়া সারছে উৎপল। জল খেয়ে ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'চা-টা দিয়ে যেও। ওকেও দিও।'

উৎপলের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসে পড়ল পলা। ঠিক জানে না উৎপল তাদের কতটা জানে। তবে, নিশ্চয়ই অনেকটাই জানে না। জানলে আজও হিজলিতেই থেমে থাকত না—আজ সকালে দীপঙ্করের হঠাৎ আবির্ভাবে বিব্রত বোধ করত না এতটা। যেভাবে এইমাত্র একটা ভুল করে ফেলেছে সে। উৎপলকে বলা উচিত ছিল হিজলি থেকে অনেকদিন আগেই কলকাতায় ফিরে এসেছে দীপঙ্কর; একদিন তাদের পুরনো ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। উৎপল তখন অফিসে। মনে হয় উৎপল বাড়ি থাকবে না জেনেই আসার জন্যে ওই সময়টা বেছে নিয়েছিল দীপঙ্কর। ভুল চেহারা। দুপুরের গনগনে রোদের অনেকটাই ঘরে এসেছিল শরীরে—তাহলে গায়ে কাঁটা দেয় এখনো।

'যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে'—অনুনয়ের গলায় সেদিন বলেছিল পলা, 'ভুলে যাও, দীপঙ্কর। মনে করো আমি মরে গেছি। আমাকে বাঁচতে দাও—'

'তোমাকে বাঁচতে দিলে আমাকে মরতে হয়। তা কী করে হয়! কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার পুরো পাওনা আমি নেবে চাই—'

'দীপঙ্কর তোমার পায়ে পড়ি'—

প্রবল হাতের এক টানে কাছে টেনে তাকে বুকে জাপটে ধরেছিল দীপঙ্কর। এবং পলা কিছু বুঝবার আগেই ঠোঁটের ওপর চেপে বসেছিল তপ্ত পুরু ঠোঁট।

কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে পলা বলেছিল, 'পাওনা মানে তো এইসব! বেশ, পাবে। যা চাও, সব পাবে! আমিই তোমার কাছে আসব। এখন চলে যাও। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি, এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে। যাও—প্লীজ, চলে যাও—'

দীপঙ্করের পুরো চোখই তখন পরিণত হয়েছে জিবে। বন্যই তুলে ঠোঁটের কোনা মুছে তাকিয়েছিল তার দিকে।

'কবে?'

পলা বলেছিল, 'যে-কোনোদিন।'

দীপঙ্কর দাঁড়ায়নি আর। ভেজানো দরজাটা খুলে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

'কই, চা-টা দিলে না?'

ঈষৎ অন্যমনস্কতার মধ্যেই উৎপলের গলা শুনল পলা। এখনো একই ভাবনায়, দীপঙ্করের ঠোঁট থেকে মুখটা ছাড়াতে গিয়ে অনুভব করল লালায় ভরে গেছে সেটা মুখ, তাড়াতাড়ি বেসিনে গিয়ে থুথু ফেলে এল অনেকটা। ধূমায়িত চায়ের কাপ দুটো টেবিলে রেখে গেছে পুরুষ। উৎপলের আর তার। তার? মুখে দিলেই তো বমি উঠে আসবে এক্ষুণি।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল পলার। দীপঙ্করের হাঁটুতে কপাল চেপে ধরে সে প্রার্থনা করেছিল, বোল না, এভাবে ভেঙে দিও না। তারপর চায়ের কাপ দুটো তুলে নিল হাতে।

এখন সিগারেট খাচ্ছে। উৎপলই দিয়েছে বোঝা যায়। যেভাবে জুত হয়ে বসেছে দীপঙ্কর, তাতে এখনই উঠবে মনে হয় না। বাঁ হাতের আঙুল ঝুলিয়ে প্লেটসমেত কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে দ্রুত সরে দাঁড়াল পলা।

'দীপঙ্করের ব্যাপার শুনেছ?'

উৎপল বলল, 'দু'মাসের ওপর নাকি হিজলি থেকে ফিরেছে। এর মধ্যে একবারও আসতে পারল না।'

চেপে রাখা নিশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল পলা। উৎপলের চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ হাসলো। এতক্ষণ যখন বলেনি, তখন হয়তো, আর বলবে না। উৎপল, তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে—এই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ছ না কেন।

'এসে কী লাভ।' দীপঙ্কর বলল, 'এসেই যা অভ্যর্থনা পেলাম। পলা তো আমাকে তাড়িয়েই দিচ্ছিল প্রায়—'

'আঃ!'

এখন দুজনেরই চোখ তার দিকে। পলা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'তাড়াইনি। বলেছিলাম অফিসে যেতে—'

'তাই বলো।'

উৎপল চা শেষ করল। আড়ে তাকিয়ে পলা দেখল কালে ঠোঁট ছুঁইয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে দীপঙ্কর। সম্ভবত ব্যাপারটা এখন উৎপলের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। উৎপল উঠলে দীপঙ্করও নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। তাতেও অবশ্য নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই। বাড়িটা চিনে গেল, ও আবার আসবে। হয়তো আজ, আজ দুপুরেই। যদি আসে—

এক বুক নিশ্বাস উঠে এসে পলা পাকাতে লাগলো কণ্ঠনালীতে। আর কিছু গুছিয়ে ভাবতে পারলো না পলা। এই মুহূর্তটি থেকে সে মুক্তি চায়—যে কোন উপায়ে; না হলে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে যে কোন মুহূর্তে তার হাঁটু ভেঙে যেতে পারে।

'পলা!'

চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো পলা। উৎপলের মুখ দীপঙ্করের দিকে। দীপঙ্কর জানে কীভাবে তাকালে দৃষ্টিটা চিরে যাবে তাকে।

'প্রথম দেখে তোমাকে অন্যরকম লেগেছিল। এখন ভালো লাগছে। তুমি অনেক বদলে গেছ—'

পলা জানে কথাগুলোর মানে কি। জবাব দিল না। আঁচলটা ভাল করে বুকের ওপর জড়িয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু গলায় ও বলল, 'তোমার দেরি হচ্ছে, তুমি এবার ওঠো।' উৎপল উঠে দাঁড়াল। দীপঙ্কর আর একটিও কথা বলেনি।

'বলছ?'

'নিশ্চয়ই।' দীপঙ্কর তখনো বসে আছে দেখে সময় নিল উৎপল, সিগারেট ধরিয়ে নিল আর একটা। তারপর বলল, 'তুমি কি সেই একই বাড়িতে আছ?'

'হ্যাঁ, সেই একই বাড়িতে।' টেনে টেনে বলল দীপঙ্কর, 'সেই একই ঠিকানায়। তোমাদের মতো ঘন ঘন পালিয়ে বেড়াবো আমার ধাতে সয় না।'

'সেটা পালাব ইচ্ছেয়। ওই-ই তাড়াহুড়ো করে এই ফ্ল্যাটটা নিল। আগের ফ্ল্যাটটাই আমার কনভিনিয়েন্ট লাগত। ভাড়াও বেশি, অফিস থেকেও কাছে হতো—'

'তাহলে ঠিকানা বদলের দরকারটা পলারই ছিল।' আর হেসে বলল দীপঙ্কর, 'মন্দ কি! এখানেও জায়গা কিন্তু কম নেই।'

পলা জানে এসব কথা হলো তার ও দীপঙ্করের মধ্যে, উৎপল না থাকলেও চলত। তবে, আছে বলেই আড়ালটা যায়নি এখনো। না হলে এতক্ষণে দাঁত বসিয়ে দিতে পারত দীপঙ্কর।

কিন্তু, আর কতক্ষণ? উৎপল, একটা উটকো লোক এসে আজ তোমার সব ডিসিপ্লিন ভেঙে দিচ্ছে কেন! নাকি দীপঙ্করের সম্পর্কে যথাযথের 'ভয়' কাবু করে ফেলেছে তোমাকেও?

'না, আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।' রিস্টওয়াচে চোখ রাখলো উৎপল, 'কী, বেরুবে তো? আমি তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি কিন্তু—'

তাড়া ছিল না। আমার তো কোনো কাজ নেই—বাড়ি গিয়ে শুয়ে বসে সময় কাটানো!' সহজ গলায় কথাগুলো বলতেও হঠাৎ কিছু ভেবে উঠে দাঁড়াল দীপঙ্কর, 'পলা চাইলে অবশ্য আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যেতাম। তা চলো, তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি—'

উৎপলের সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করেরও দরজার দিকে এগোতে দেখে একটা স্বস্তি নেমে গেল পা বেয়ে। যেখানে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ, পলা জানে, সেখান থেকে সরে গেলেও পুরো দুটো পায়ের ছাপ পড়ে থাকবে। এতদিন পরেও রক্ত থেকে ঘাম আলাদা করে নেবার চেষ্টায় এতটুকু ঢিলে দেয়নি দীপঙ্কর। কখনো কি দেবে?

উৎপল এগিয়ে গেছে। হাত পিছনে যেতে যেতে থেমে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল দীপঙ্কর। বাঁ চোখটা ছোট হয়ে এসেছে একটু, বেঁকিয়ে গেছে ঠোঁটের কোণ দুটো। ঠিক তখনই, যাতে ছাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায় পলার। হাসিটা আবার বিস্তৃত হবার আগেই পলা মুখে নিল শরীরের ভিতরে একটা বাঘের আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপায় ঢুকে যাচ্ছে দীপঙ্কর। গন্ধটা চিনে রাখল।

'চলি তাহলে। এসো।' উৎপলকে শুনিয়েই বলল দীপঙ্কর, 'গাড়ি যখন আছে, আসতে অসুবিধে কী! আমি সব সময়েই থাকি।'

পলা শুধু বোধ করল। এখনো আড়াল আছে, অজ্ঞাত কারণে এখনো কিছুটা আড়াল রেখে যাচ্ছে দীপঙ্কর—প্রবল প্রতিপক্ষের মতো এখনো সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে তাকে। এটা ভেঙে যেতে কতক্ষণ! আজ ইচ্ছে করেই সকালে এসেছে, উৎপলের মুখোমুখি হবার ইচ্ছে থেকেই বুঝিয়ে দিয়ে গেল, দরকার হলে সে তারও এগোবে। আরও মানে কতখানি! যাতে দু'টুকরো কাঠের মতো সে আর উৎপল ছিটকে পড়ে এদিক ওদিকে।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও দরজার পিঠে লাগিয়ে রেখে কিছুটা সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল পলা। উত্তেজনা ঘিরিয়ে এলেও তার জ্বালা শেষ হয়নি এখনো। সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাসট্রের ধারে

আধপোড়া সিগারেট থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে—অবশ্যন দেখেই বোঝা যায় ওটা দীপঙ্করেরই ফেলে যাওয়া। পাখার হাওয়ায় কাত হয়ে পড়লে টেবিলক্লথে লাগবে। তবু ওটাকে পুরোপুরি নিবিয়ে অ্যাসট্রের ভিতর গুঁজে দেবার কোনো চেষ্টা করল না পলা। অপলকে তাকিয়ে ও শুধু দেখতে লাগল আগুন দেখা যাচ্ছে না—তবু ধোঁয়াটা উড়ে যাচ্ছে একইভাবে।

পুরুষ এসে কাপ দুটো নিয়ে গেল। চলে যাচ্ছিল, জেগে উঠে পলা বলল, 'অ্যাসট্রেটা নিয়ে যাও। পরিষ্কার করে রাখো।—'

'আপনার চা দেবো?'

'না, থাক—'

পলা টের পেল মুখটা আবার শুকিয়ে যাচ্ছে লোনা ঘামে। গরম হয়ে উঠছে ঠোঁটের কোল দুটো। তাড়াতাড়ি বেসিনে গিয়ে এক মুখ জল উপরে ও ভাবল, এর নাম কৃপা। দীপঙ্কর যতদিন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, রক্তের ভিতর এটাও ততদিন ছড়িয়ে থাকবে, ছায়ার মতো। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসবে এইভাবে। এটা বরং সহ্য করা যায়। কিন্তু, আবার যদি ও ফিরে আসে, যদি পাশাপাশি বসে দেখ, উৎপল, তুমি কতটুকু জানো! যদি বলে দেয়—

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সারা শরীর কাঁপিয়ে কান্না এলো পলার। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে বলল, 'না। যা পেয়েছি তা হারাতে পারব না।'

দীপঙ্কর বলল, 'তা কী করে হয়। ওটা তোমার চুরি করে পাওয়া, ওটা তোমার পাপ। 'পাপের শাস্তি পেতে হবে না।'

'দীপঙ্কর, একদিন তুমি আমায় ভালবাসতে—'

'বাসতাম। কিন্তু সে কথা আর ওঠে না।'

কেন দীপঙ্কর! এরকম তো কতোই হয়—সবাই কি সবাইকে পায়!'

'হয়তো। সেটা ভাগ্যের ব্যাপার। তোমারটা ঠকানো।' বলতে বলতেই অসহিষ্ণু হলো দীপঙ্কর, 'তুমি কোনোদিনই আমাকে ভালোবাসো নি—ভালোবেসেছিলে আমার অবস্থাটাকে। তারপর, আমার দুরবস্থার সুযোগে উৎপলকে—'

'উৎপল তোমার বন্ধু—'

'আকামি কোরো না। অপমান ছাড়া আমার কোনো বন্ধু নেই। সে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে—'

'তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না, দীপঙ্কর?'

'না। ভালোবাসা থাকলে ক্ষমা করা যায়। আমার শরীরে ঘিনে ছাড়া আর কিছু নেই—'

'তোমার ঘিনে আমি ঠোটাবো কেন!'

'একদিন তুমি নিজেই চেয়েছিলে। দিতে চেয়েছিলে সবই—'

'দীপঙ্কর, আমি একজনের স্ত্রী—'

'স্ত্রী: হাঃ ভাল স্ত্রী।

'দীপঙ্কর, ক্ষমা করো। আমার সংসার, আমার সুখ এভাবে কেড়ে নিও না—'

তোমার সংসারে আমার কোন লোভ নেই। আমি তোমাকে চাই—'

সংলাপ কোথায় পৌঁছে গিল না। প্রায় ঘোরের মধ্যে, তারপর অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল পলা। শূন্য চোখে বাইরের রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ। আগুন সরাসরি ঢুকে পড়ছে শরীরে, তবু গরম লাগছে না এতোটুকু। ফাঁকা হয়ে আসছে মাথাটাও। শুকনো, কাঠ কাঠ গলায় বিড়বিড় করে ও শুধু বলল, 'ঠিক আছে।'

চানটান সকালেই সেরে নিয়েছিল। যা দেখা তারপর আর ঘিনে থাকে না। চটপট বিছানা ছেড়ে নেমে পোশাক বদলাবার জন্যে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পলা। অনেকদিন এমনভাবে দাঁড়াবনি নিজেকে। দেখতে দেখতে চোখদুটো ভরে এল জলে। পলা বলল, শরীর তোমার দাম কি?

কথাগুলো আয়নায় নিজেদের প্রতিফলিত করছে বিভিন্ন ভাবের ভঙ্গি। জবাব পেল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে পুরুষকে ডাকলো পলা।

'আমি একটু বেরুচ্ছি। দরজাটা লাগিয়ে যাও।'

রাস্তায় বেরুবার মুখে দ্বিধা কেঁপেছিল একবার। আর এগিয়ে যেতেই স্বাভাবিক হয়ে এল সব। সহজেই ট্রামে উঠল পলা। প্রায় ফাঁকা ট্রামের এক কোণে বসে রাস্তা দেখতে লাগল চুপ করে।

নির্দিষ্ট স্টপে নেমে আশেপাশে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল কিন্তু। চেনা রাস্তা। নিশ্চক্ষে হেঁটে যেতে কোনোই অসুবিধা হলো না।

দীপঙ্করের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করল পলা। নিজেকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করল। একবার মনে হলো মাথা ঘুরছে। দেয়াল ধরে সামলে নিল। তারপরেই বেল টিপল সজোরে।

দরজা খুলল একটি বছর বারো তেরোর ছেলে। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পলা দেখল, ছেলেটির প্রায় পিছনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে দীপঙ্কর। পরনে পাজামা আর গেঞ্জি, চোখে অপ্রস্তুত দৃষ্টি।

পলা নিজেই ভিতরে ঢুকল। সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। ছেলেটাকে বাইরে যেতে বলো—'

'কী ব্যাপার?'

'যা বলছি করো।'

হতচকিত ভঙ্গি, ইশারায় ছেলেটিকে বাইরে যেতে বলল দীপঙ্কর। ঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে পলা দেখল দরজাটাও ভেজিয়ে দিচ্ছে দীপঙ্কর।

এখন সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই, অন্তত দৃষ্টির আচ্ছন্নতায় তা-ই মনে হলো পলার। বুকভর্তি নিশ্বাস টেনে ঘরটার আশেপাশে চোখ বোলালো সে। বিছানা, বালিশ, আলনা, পর্দা—যেটি যেমনভাবে থাকা উচিত তেমনিই আছে, ঠিক আগে যেমন থাকত। নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, শরীর তোমার দাম কি?

'কী ব্যাপার' দরজা থেকেই জিজ্ঞেস করল দীপঙ্কর 'হঠাৎ'?

'বলছি—'

নিজেই এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার ছিটকিনি তুলে দিল পলা। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

'আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, দীপঙ্কর। তোমার যা ইচ্ছে করো।'

এক ঝটকায় বুক থেকে আঁচল সরিয়ে দিল পলা। চোখদুটো দীপঙ্করের মুখের ওপর নিবদ্ধ।

নিস্তব্ধ চোখে খানিক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে এল দীপঙ্কর। শক্ত হাতে চেপে ধরল কাঁধদুটো। ঠোঁট কাঁপছে।

নিজের গলে ও কপালে দীপঙ্করের গরম নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করতে করতে একবার ওর চোখের দিকে তাকাল পলা। হাতদুটো ঠেলে সরিয়ে দিল কাঁধ থেকে।

'একটা শর্ত আছে—' নির্ভুল গলায় বলল পলা, এই শেষ। আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না—'

দীপঙ্কর চুপ করে থাকল। চওড়া পাতলা ঠোঁটে মুখের রেখা। পলা জানে, আর একটু পরেই ফোট ফোটির হয়ে যাবে ওগুলো—ঘিনঘিন নিয়ে ফেরতে থাকবে রক্ত। তার কিছুই করবার থাকবে না। এরকমই হবে। দীপঙ্কর তার প্রশ্ন বুঝে নিক।

'রাজী আছ?'

দীপঙ্কর হাসল, দ্রুত এবং অদ্ভুতভাবে।

নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল পলা।

'আমার সময় কম, দীপঙ্কর। যা করবার তাড়াতাড়ি করো।'

এখন চোখে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। শরীর জুড়ে শীত। চোখ বন্ধ করেই নিশ্বাস টেনে শীতটা সহ্য করল পলা, সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় জোর আনতে লাগল হাঁটুতে।

কয়েক মুহূর্ত।

খানিক পরে চোখ খুলে দেখল, দীপঙ্কর সরে গেছে অনেক দূরে। দূর থেকেই চোখদুটো কঠিন করে তাকিয়ে আছে তার দিকে—

ঘৃণা কিংবা আক্রোশে ঠোঁট দুটো বেঁকে আছে বিশ্রীভাবে।

'শর্তটা থাকবে।' একটু পরে, থেমে থেমে বলল দীপঙ্কর, 'তুমি এখন যেতে পারো—'

।। দ্বিরাগমন ।।

আনন্দ বাগচী

ওরা খানিকটা মন দিয়া হয়েই চলে গেল। মৌচাকে মক্ষীরানী না থাকলে যেমন হয়। যেন চাক খালি করে উড়ে গেল। ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসে বসে অতসী সব দেখল। লাকসারি বাসগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় শেষ রাতের ঘোর লেগে থাকা সমুদ্রের কিনারে, বলতে গেলে হোটেলগুলোর দরজায়। টুরিস্টরা জলবর করতে করতে নিজের নিজের টিকিট দেখে নম্বরী বাস খুঁজছিল। ব্রেকফাস্টের বাস্কেট নিয়ে মেয়ের দল, ক্যামেরা আর সাইড ব্যাগ কাঁধে ছেলেরা। তেপায় ল্যাম্পগুলোর ম্যাকমে আলোয় প্রসাধন করা সুখী মুখগুলো আহারী চোখে নিজেদের জটলার বাইরে অন্যদের খুঁটিয়ে দেখছিল। কারা ভি ভি ও কোচে আছে, কারা অর্ডিনারী, কাদের বাসে পুশব্যাক সিস্টেম আছে সব। পোশাকে, ক্যামেরা-ব্যাইনোকুলার আর ট্রাভেলেও যেন স্ট্যাটাস লেবেল সাঁটা আছে, এমনি মতিগতি।

এই গুপ্তর থেকে, তিন তলার ব্যালকনি থেকে মানুষগুলোকে সত্যিই ছোট মনে হচ্ছিল। যেন কোনারক-ভুবনেশ্বর-উদয়গিরি-খণ্ডগিরি কি চিল্কা দেখতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে নিজেদেরই দেখতে, সাইট সীরিং উপলক্ষ, একটু বাড়তি সুখের খোঁজে, ঠিক আনন্দ না, উত্তেজনার মালক, একটু লুকিয়ে চুরিয়ে অন্যরকম মুহূর্তে যাচ্ছে যাকে যদি কিছুটা অবৈধ উল্লাস ফুড়োনো যায় মনের ভেতর সেই লেভ এই সী বীচ থেকেই উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। দেখছিল আর অতসীর মনের ভেতরটা ওটিয়ে আসছিল বিরক্তিতে ঘেন্নায়। মানুষের, বিশেষ করে পুরুষদের চেয়ারা চিরকাল সব জায়গায় একরকম থেকে গেল, স্যাটিসফাই আর কমফ্রেন্ড করা ব্যক্তিদ্বে আর তীব্রতার সিত কৌতুকের তলায় সেই বর্বরতিপনা। নরম গোলগাল থাকার মধ্যেও যেন বাহুবল লুকোনো। শিরায়-শিরায় অ্যালকোহলিক রক্ত যেন থমকে আছে, মানুষখেকোর থাবায় অনেক পাপ, তাঁচা রক্ত মাংসের স্বাদগন্ধ মোছেনি, জীবনে মুছবে না। এই হচ্ছে আজকের আধুনিক সমাজ, ফাইভস্টারী সোসাইটি। নীচের তলা, বেসমেন্ট পর্ব ছাড়াতেই এক চেহারা, ফাস্ট লাইফ আর ফক্স গেরো, ন্যায়-নীতি বন্ধন কল্পন নিয়ে হাই অলটিচুডে কেউ মাথা ঘামায় না। সে যুগে বাহিরবাড়ি, বাগান বাড়ি ছিল, ছিল দূরে গিয়ে নিশি যাপন। সংখ্যায় বেশি ছিল না হয়তো, কিন্তু ছিল। আজও তাই আছে, তবে অন্য নামে অন্য চেহারায়, ভোল্ডে ঢুকে ঘরের মধ্যে, অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকে এসেছে। এখন আর আঙুলে গোণা যাবে না এই যা। ফী সেকেন্ড, লিচটুগোদার অন্য নাম। এবং তারও বাইপ্রোডাক্ট, বরি মাছ না ছুঁই পানি নিকল্পার। বোহলের ভূত ঘরে ঘরে অন্য চেহারায়।

ভেতরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল অতসীর, কেমন বমি বমি লাগছিল এই সকাল বেলায়। এতদিন পরে, আজ হঠাৎ কেন এমন হল কে জানে। হয়তো আজ নয়, কাল সন্ধে থেকেই এই অসুখের জার্ম তার দেহে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে। কিংবা কে জানে তারও আগে থেকেই এর সূচনা. ইনফিউবেশন পরিয়ডটা ছিল মনেরও অগোচর। মানুষের মতিগতি সত্যিই রহস্যময়, মানুষ নিজেও জানে না। পা ফোলার আগের মুহূর্তেও সে জানে না কোন দিকে যাবে, পা ফেলেও হয়তো, কোন দিকে যাচ্ছে।

লেডি ব্রাবোর্নের জিওলজির অধ্যাপিকা অতসী মৈত্র, নাকি মজুমদার হঠাৎ এভাবে ব্রেক জার্নি করবে সে কি নিজেও জানতো। এবং এই ভাবনা, যা তার ত্রিসীমানার মধ্যেও ছিল না, এভাবে আজ তাকে ঘিরে ফেলবে আবহাওয়া পরিবর্তনের পোপন খবরেও তার ঘুণাক্ষর উল্লেখ ছিল না গতকাল বিকেল পর্যন্ত।

কাল বিকেলের ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না কিছুতেই। অতসীর মনে পড়ছিল একটা চাপা অস্বস্তি উঠে আসছিল ভেতর থেকে। পাক দিয়ে ঘুলিয়ে উঠছিল পেটের ভেতরটা। কাল অতসীর জন্মদিন ছিল।

কলকাতায় থাকলে বড় দল পার্টি হত, কলেজের মিলন হত। পুরনো বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে নতুনদেরও আমন্ত্রণ হত সেখানে। এখানে অবশ্য তেমন কিছুই হবনি। ইনকাম্বা অতসী প্রায় কুলেই নিয়েছিল ব্যাপারটা। আর হবি মনে পড়েও থাকে তা মনেই মেখেছিল, প্রকাশ করেনি। কিন্তু সুব্রত লাহিড়ী আর ছিলেন মিত্র তোলেননি। তলায় তলায় ছোটখাটো একটা আয়োজন করে ফেলেছিলেন। সুব্রতের ঘরে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত অতসীর কাছে কেউ ব্যাপারটা ফাঁসায়নি। বাইরের অতিথি অবশ্য একজনই ছিলেন, তিনি এই হোটেলের ম্যানেজার। খানা এবং পিনা। দু ব্যাপারেই কোন কৃপণতা রাখেনি লাহিড়ী। সামান্য গান বাজনাও হল। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল।

একটু রাত হতেই লাহিড়ী মিত্র মিলে নেশার মধ্যে একে একে ওজরাটি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছিল যখন সুব্রত বলল, 'অতসী, আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনার উপহারগুলো ওদিকে নিয়ে আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

সবাই ওরা এক হোটেলে ওঠেনি, তবে সী ভিউ হোটেলে মিসেস মিত্র চোখে-মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'উইশ ইউ লাকি ওড চয়েস। তবে কাল ভোরে আর একটা জার্নি আছে মনে রেখো, লাহিড়ী। রাতটা ঠিক রেখো।' তার পরে হঠাৎ প্রায় ট্রাজেডির মত অতসীর গালটা টিপে দিয়ে কলহাসো বেরিয়ে গেলেন।

ওদের পায়ের শব্দ রাস্তায় মিলিয়ে যাবনি—সুব্রত দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। রাতের আর কিছু বাকি আছে—। সুব্রতের এই চেয়ারা অতসী দেখার জন্যে তৈরি ছিল না। প্রেমিক সুলভ একটা দুর্বলতা আছে তার ওপরে, এরকমই মনে হয়েছে এতদিন। কিন্তু সুব্রতের ভেতর থেকে আর একটা লম্বা সুব্রত বেরিয়ে এল আচমকা। ম্যানেজারে তার নিশ্বাস ঘন হয়েছে, চোখ লাল। পুরুষের এই চেয়ারা অনেকবার দেখেছে অতসী, অনেক অসতর্ক মুহূর্তে। সব পুরুষ এক, যেন ছাঁচে ঢালা। অসহিষ্ণু অস্থির হিংস্র, ক্ষমতের জোরে সবকিছু দখল করতে চায়। পশুর সঙ্গে মানুষের এক জায়গায় তফাত আছে, সৌন্দর্য আর ছন্দকে নষ্ট করে মানুষ আপনার সহজাতের অনেক পরে বেটা মনুষ্যত্বের প্রাচীন আজানা। অতকের মত মানুষ তার বিস্তৃত ছায়া ব্যবহার করে।

সুব্রত সেই জায়গাটাই কাছল। দৈহিক আলাপনের সঙ্গে সঙ্গে সে একটা উপহারও অবশ্য করল। শুধু লালসা প্রকাশ করলে বেটা হত না। অতসীকে সে জানিয়ে দিল, সচেতন করে দিল নিজের মূল্যবোধে। এই প্রথম, এতদিন পরে এই প্রথম অতসীর অবহেলার দুর্গ হল। নিজের নগ্ন কুৎসিত সে বুঝতে পারল। হাতে ছাতে ধোয়া অনুল কথা পরস্পর মত নিজেকে হেয়, অসহায় নিস্ব মনে হল। সকলের থেকে আলাদা, একা।

কাল সারারাত ঘুমোতে পারেনি। এক রাত্রিতেই মুখ চোখ বসে গিয়েছিল অতসীর। তাই ভোরে যখন ওরা ডাকতে এসেছিল আর অতসী শরীর খারাপ এই অজুহাতে যাবে না বলেছিল তখন অসন্তুষ্ট হলেও অবিশ্বাস করেনি। সুব্রত আজকে একেবারে অন্য মানুষ, যেন কাল নেশার ঘোরে কি করেছে কি বলেছে কিছুই তার মনে নেই। অনুনয় অতসীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে সুব্রতও হোটেলে থেকে যাবার মতলব করেছিল। কিন্তু অতসীর চাপা কঠিন অবজ্ঞার মেখে আর ভরসা পায়নি, দলের সঙ্গেই ফিরে গেছে আবার। কিন্তু লোকটা পাকড়া ছাড়েনি। আশা ছাড়েনি। সবাই বাসে উঠে গেছে, বাস এবার ছাড়বে। কিন্তু নির্লজ্জ লোকটা এখনও নিচে দাঁড়িয়ে তার 'বালকনির দিকে তাকিয়ে রুমাল নাড়ছে।

ছোটোমোটাদের কলকলটা সাঁই সাঁই করে একের পর এক বেরিয়ে যেতেই সমুদ্রের ধারটা হঠাৎ নির্জন, ফাঁকা হয়ে গেল। বিসর্জনের পরে পুজো প্যান্ডেলের মতো। ওদিকে সী ভিউ হোটেল আবার ওজ করেছে। নিজের ছায়ারার কেউ জলের কিনারে ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ এই সাত সকালেই জলে নেমে পড়েছে। এখানে ওখানে কিছু জটলা। সমুদ্রের সফেন ঢেউগুলো এসে ভেঙে পড়ছে কূলে এসে। সাদা সিল্কের সুতোর যেন ফেন জালের মতো জলের ফেনা এসে অবিশ্রান্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে বালির ওপর। তারপর ফিরে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ঝিনুক কুড়োচ্ছে ছুটোছুটি করে। একটা ছেলে ভিড়ি কূলে ভিড়তেই কিছু কৌতূহলী মানুষ তাদের দেখতে ছুটে এল সেই দিকে।

অদিন এই বালকনিতে বসে বসে সমুদ্রের এই নিকটা চেনা দৃশ্যের মতো মুগ্ধ হয়ে গেছে অতসীর। কিছু জানবী, কিছু পরিবার তার চেনা হয়ে গেছে দূর থেকে দেখেই। কয়েক দিনেও তাদের দেখেছে। এক একটা দলের চাল চলন এক এক রকমের। কেউ উঁচে পৌঁছেই সমুদ্র প্রণাম সেরে চক্রতীর্থের দিকে হাঁটা শুরু করবে। কত রকমের মানুষ, কত বিচিত্র চেয়ারা, রকমারি পোশাক, হাঁটার ঢং। সেই লোকটা যোবনের দরজাটার দিক থেকে মৌড় মারবে এবার, সঙ্গে বছর দশ-এগারোর একটি ছেলে। পিছনে এসে নেমে পড়েছে অন্ধকারের বেঁচে। চা-ওলা আসবে এর পর। তার একটু বেলায় নুলিয়া আর ঝাড় তার শিশু শিশু অ্যালবাম হাতে নিয়ে রেডিমেড ফটোগ্রাফারের দল।

পূর্বীর সমুদ্র এই রকমই। অতসীকে বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছিল সব কিছু। বাইরের জগৎ থেকে আবার নিজের ভেতরে ফিরে আসতেই উঠে দাঁড়াল। বালকনি থেকে ফিরে এল ঘরের মধ্যে। আটটার ফ্লাক্স নিয়ে যাবে ঘরে। তার আগেই স্নান কাজ সেরে নেওয়া ভাল। আজ আর ব্রেকফাস্ট নেই। জল খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়বে সমুদ্রের ধারে। একা একা ঘুরে বেড়াবে এদোমেলো। নিজের সঙ্গে তার এখনও কিছু বোঝাপড়া বাকি।

জানের জায়গা থেকে অনেকটা তফাতে ভাঙা জঙ্গলের কাছাকাছি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল অতসী। এদিকটায় লোকজন কম। নুলিয়ারা এখানে যায় বড়জোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝেড়-জাল বোনে, মেরামত করে। আর ঝাঁঝা কাটকাঠের লম্বা লম্বা কালি দিয়ে বিচিত্র আকারের নৌকো বানায়। বাংলাদেশের নৌকোর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। অনেকটা ভেলা টাইপের। একটা বাকল ছাড়ানো গাছের গুঁড়ি মালির ওপর পড়ে ছিল। বোঝার চেষ্টে ওকোনোর অপেক্ষায়। জায়গাটা নিরিবিলি দেখে অতসী তার ওপরে বসে পড়ল। অনেকটা হাঁটাহাঁটি করে এখন সামান্য ক্লান্ত লাগছে। আসলে মনটা আজ তেমন তরতাজা নেই।

কিছু আগে ব্রেকফাস্টের কিছু আগে হোটেলে শুভাঙ্গরের নিচে দাঁড়াতে গিয়ে বেসিনের আয়নার সামনে থমকে গিয়েছিল অতসী। নিজেকে এমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের চোখ দিয়ে আগে কখনো দেখেনি। পঁয়ত্রিশ বছরের এই শরীরটাকে বলতে গেলে নতুন চেয়ারার আবিষ্কার করে চমকে উঠল। তার এত ভাল এত যৌবন চেহারা চেহারা যেন আরও উদ্ভত হয়ে উপচে পড়ছে। বাইরের যে কারো চোখে তাই মনে হবে। কিন্তু আসল রহস্যটা ধরা পড়ে গেল তার কাছে। জোয়ার শেষ হয়ে প্রথম ভাটার টান চোখে পড়ে না, কিন্তু জলের তলায় তলায় আয়োজন শুরু হয়ে যায়। অতসী বুঝতে পারল কাল বেলা শুরু হয়ে গেছে। এবার ভাটার পালা। বেলা শেষের রোদের যেন কার্নিসে টান পেয়েছে। ছায়া এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে কোথাও। বাজে কথার সূত্রে—গানের লাইনটা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে একই জায়গায় আসতে লাগল। বহু মানুষ আর অনেক ঘটনার ভেতর দিয়ে দশ এগারো বছর সে সময়ের আগে আগে দৌড়ে এসেছে, পিছন ফিরে তাকাবারও অবকাশ পায়নি। কিন্তু কি লাভ হল এত ছুটে? এখন তো শূন্য হাতে ফিরে যাবার পালা। সময় তাকে কুড়তে নেয়নি কখন ছুঁয়ে ফেলেছে।

এইসব আজগুবি-গাজগুবি ভাবছিল চোখ বুজে। এমন সময় মনে হল কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ খুলেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল অতসী। হাত তিনেকের দূরে লোকটা খালকে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে কেমন একটা অবাক ভাব।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল অতসী।

লোকটা অতোমতো খেয়ে বলল, 'সরি।'

অতসীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি। লোকটা পিছন ফিরে ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছে। বেশ দ্রুত পায়েই। বোধ হয় অন্যমনস্ক আসটা কাটিয়ার জন্যেই। অতসী বিমূঢ় ভাবের ভেতরে রক্তের ঢেউ যেন

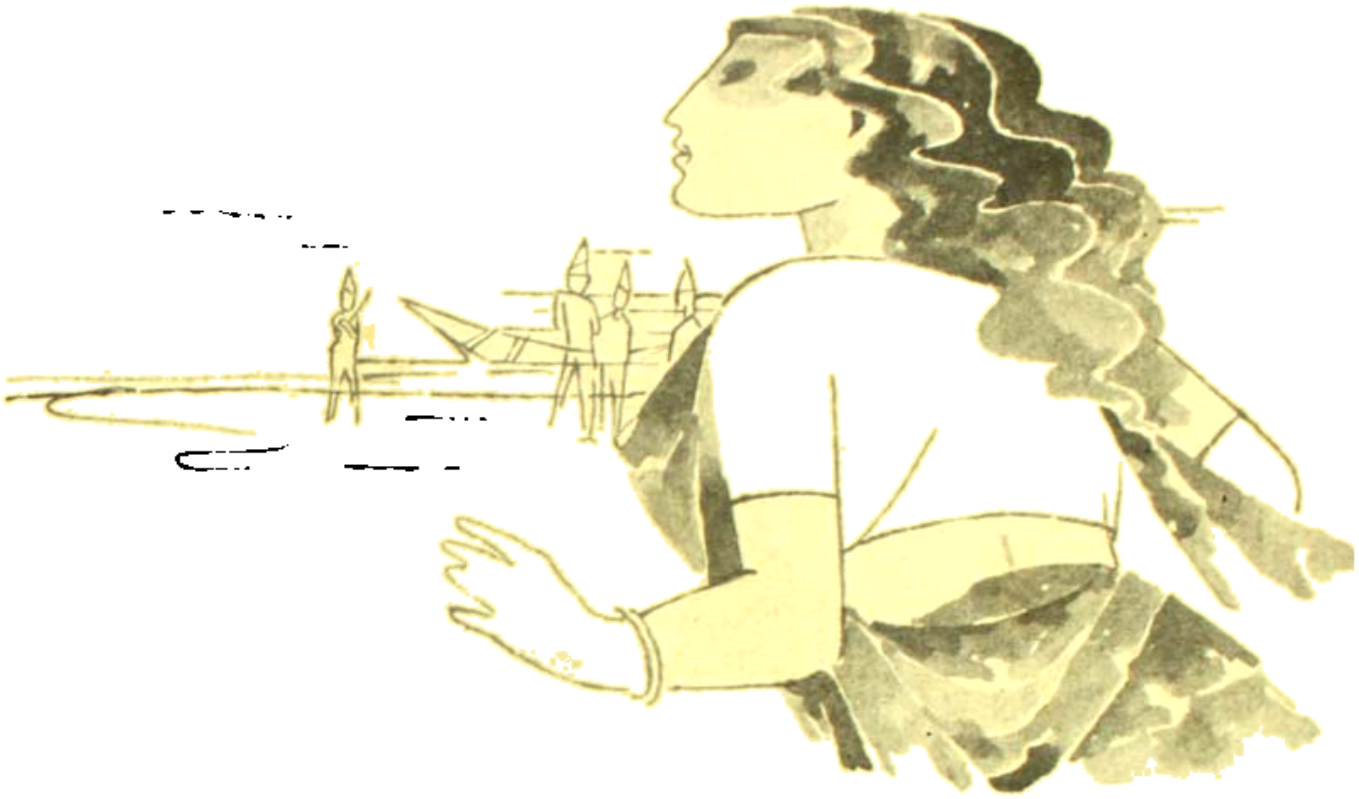

উত্তাল পাথাল আছে। নিজের ওপর নিজের আর নিয়ন্ত্রণ নেই। ভারসাম্য হারিয়ে কেলা মানুষের মত পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়েছে খুব জোর।

ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে স্বপ্নের মত অবাস্তব মনে হল। মনে হল অপটিক ইলিউশন, ভুল দেখেছে। দশ বছর আগের স্মৃতি এখন ঝাপসা, ওই মুখ ওই চোখ একটু আগেও তো খুব স্পষ্ট ছিল না। অসাবধান, অবাক্ত, হারিয়ে যাওয়া। পুরনো একটা ব্যথা শুধু চিনচিন করে উঠলো ক্ষণিক কখনো, তার বেশি না।

লোকটা এগিয়ে গেছে অনেকটা। একবারের জন্যেও আর পিছন ফিরে তাকায়নি। চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল অতসী। গলায় কিংবা মনের মধ্যে তেমন জোর খুঁজে পেল না। হয়তো কি বলে ডাকবে তাও।

দীর্ঘ দশ বছর যে বলতে গেলে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল তাকে এমনভাবে, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পুরীর এই সমুদ্র সৈকতে মুখোমুখি পাওয়া যাবে কল্পনাও করেনি অতসী। এই দশটা বছরে সত্যি বলতে কি সে নিজে তাঁকে খুঁজে বেড়ায়নি কখনও। তবে কখন কেন, দু'পক্ষেরই পরিচিত যারা তারা খুঁজেছে। অতসীও হয়তো মনে মনে খোঁজ চেয়েছে। এক ধরনের নিষ্ঠুরতাই হয়তো কাজ করেছে মনের অগোচরে। শত্রুর ধ্বংসেধ্বংসে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যেমন এক গোপন তৃপ্তি থাকে। হ্যাঁ শত্রুই, একদিন শত্রু ছাড়া এই লোকটাকে ভাবতে পারেনি সে। যে তাকে ভোগ করেছে, তার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে এক রাত্রিবেলা—এই সত্যটা সময় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে ধীরে ধীরে। বাইরে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করলেও এটাও তার মোক্ষম পরাজয়। পরাজয়, যতদিন না জানতে পারছে লোকটা দুমড়ে মুচড়ে জীবনের কাছে নতজানু হয়ে গেছে, আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি মাথা উঁচু করে।

কিন্তু অন্য মনের ভেতরের প্রতিক্রিয়াটা সঙ্গে সঙ্গে বোধগম্য হয়নি অতসীর। এক বিচিত্র রহস্যময় মানসিক অবসাদের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। নিজের ভেতরে স্পষ্ট দুঃখ বা অনুশোচনা কিছুই কেন জানি খুঁজে না পেয়ে নিজেকে আরও অসহায় আর একলা বোধ হল। মানসিক অবসাদ আর একটা অবয়বহীন যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল কয়েক মুহূর্ত। আর এই কয়েক পলক সময়ের মধ্যে সুপারফাস্ট চলচ্চিত্রের মতো অনেক দিন অনেক রাতের ভুলে যাওয়া ছবি, অনেক সংলাপ, অনেক আবিষ্ট করা অনুভূতি অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে মনের পর্দায় ভেসে গেল। আর তখনই মনে হল হিমাদ্রি মজুমদারকে তার বড় প্রয়োজন।

কিন্তু হিমাদ্রি, ও যদি হিমাদ্রি হয়, বড় বড় পা ফেলে একেবারে নাগালের বাইরেই চলে গেছে বলা যায়। কিছু ভাল করে ভেবে না দেখেই অতসী প্রায় ছুটতে শুরু করে দিল হিমাদ্রিকে ধরবে বলে। কিন্তু অসাবধানে, পা ডুবোন ভুসভুসে বালির মধ্যে চটি পরে ভাল করে হাঁটাই যায় না, দৌড়বে কি! পায়ে জোর পাওয়া যাচ্ছে না, জোরে চলতে গেলেই পা পেঁচিয়ে যাচ্ছে, ফিপার খুলে যাচ্ছে পা থেকে। যার কতক চেঁচিয়ে ডাকল কিন্তু সমুদ্রের একটানা গর্জন তার জোড়ো হাওয়ায় সে গলা কোথাও পৌঁছয়নি। এক সময় হতাশ হয়ে যেখান হিমাদ্রি বড় রাস্তা পেরিয়ে দূরের এক গলির মধ্যে মিলিয়ে গেল। বোধহয় সারা জীবনের মতই হারিয়ে গেল এবার।

দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় অতসীর চোখে জল এল। হিমাদ্রি মজুমদার তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল, বোধহয় শোধ তুললে দশ বছর আগের রাত্তিরের। কিন্তু সেদিন কি সবটাই অতসীর দোষে ঘটেছিল? হিমাদ্রির কি কোনই ভূমিকা ছিল না? বড়লোকের একমাত্র আদুরে মেয়ে অতসীর তখন কতই বা বয়েস। পঁচিশ-ছাব্বিশ বড় জোর। সংসারের ভাল মন্দর কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা ছিল তার? রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথায়, মোহের ধাঁধায় পড়ে, বাইরের উসকানি-কুসলনিতে নিজেকে বস্তু করার সর্বনাশায় ধনি পেয়েই থাকে/তাকে ফেরাবার, মুখরে দেবার অপেক্ষা করে থাকবার দায়িত্ব কি তারও ছিল না। আজকেকার চিন্তা করলে নিজেকেও

সে যে আসা করতে পারে তা নয়। অন্তত একজনের জন্যে সে কখনো অপেক্ষা থেকে যাবে চিরদিন। সেই একজন, যে তার একান্ত আপনার, অবিচ্ছেদ্য অংশ। মনের ভেতরটা হু হু করে উঠল তার জন্যে এতকাল পরে সে কোথায় আছে,কেমন আছে কে জানে। তার কথা ভাবতেও বুক দুরু দুরু করে। জেল জমাদার আর অভিযানের দুর্গম যতদিন খাড়া ছিল বেশ ছিল, এবার সব ধসে পড়বার মুখে।

কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেলে তো চলবে না, হিমাদ্রিকে সে আর পালাতে দেবে না। খুঁজে বের করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যোগাপড়া করতেই হবে। আজ না পারে কাল, কাল না পারে পরশু। যেকরার হলে আরও কদিন থেকেই যাবে এখানে। কোন হোটেল কিংবা হস্টিলে হোমে, নয়তো ভাড়া বাড়িতে উঠেছে নিশ্চয়। ডেস্ক টু ডেস্ক করলে ঠিক বের করে ফেলতে পারবে অতসী। একটা স্বস্তির বিষয় এই, যে দলটার সঙ্গে অতসী পুরী এসেছে তারা কেউ হিমাদ্রিকে চেনে না। হয়তো নামটাও শোনেনি কখনো।

খিদের পেটের ভেতরটা চন চন করছে। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতসী দেখল বেলা একটা বাজে। আর পারা যাচ্ছে না। সেই সকাল থেকে একটানা ঘুরে ঘুরে পায়ের নড়া ছিঁড়ে পড়ার দাখিল। ব্লাউজ ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে, খুব্বো চুলগুলো কপালে এলোমেলো লেপটে আছে, ভেতরে ভেতরে বিধ্বস্ত। নিরুপায় অতসী ক্রমশ যেন মনের জোর হারিয়ে ফেলছে, কেবলই মনে হচ্ছে এভাবে বৃথা হাঁসের পিছনে ছুটে কোন লাভ হবে না। যে পালাতে চায়, তাকে আর ধরা যায় না। সকাল থেকে কম হন্যেরানি তো হল না। প্রথমে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল, এ গলি সে গলি, দোকান-পাট; পরে হোটেলে হোটেলে। কোথাও হয়তো তখন ম্যানেজার থাকে না, কিংবা থাকলে ও ভবে এসেছে, কি বৃত্তান্ত চায়ন্তে চায়। কেউ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, না ম্যাডাম, ওনামে কোন বোডার এখন আমাদের হোটেলে নেই।

সদরে দাঁড়িয়ে বার দুই ইতস্তত করল অতসী। কিন্তু ফিরে যেতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত গেল না। এটাই অন্যদের মত লাস্ট হোটেল, নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিল কথাটা বলে। তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'দেখুন আমার কিছু জানবার ছিল—আপনিই কি ম্যানেজার?' প্রথম যার দিকে চোখ পড়ল তাকেই ওধোলো কথাটা। বৃদ্ধি লোক তখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, 'আপনি বসুন, ম্যানেজার এখুনি আসছেন।'

'ঠিক আছে।' অধৈর্য অতসী খালি চেয়ার পেয়েও বসল না। আর ঠিক তখুনি ভেতরের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে হিমাদ্রি বেরিয়ে এল। চলার ঝোঁকে কয়েক পা এগিয়ে এসেই থমকে গেল। তার চোখে বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা। ঠোঁটে ঠোঁট ঘুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের আবছা হাসিটা মিলিয়ে গেল, চিবুক টান টান, চোয়াল শক্ত হল।

অতসীর বুকের ঠিক মধ্যিখানে যেন গুলি লাগল। কোনক্রমে সামনের চেয়ারটার পিঠ চেপে ধরে টাল সামলে নিল। হ্যাঁ, হিমাদ্রিই, কোন ভুল নেই এবার। শুধু এই দশ বছরে বেশ কিছুটা বুড়িয়ে গেছে যেন। মাথার সামনের দিকের সেই চিরুনী চলে না এমন ঘন চুলও রীতিমত পাতলা হয়ে এসেছে। রঙের পাশে ঝুলকিতে অনেকখানি সাদার পোঁচের লেগেছে। কপালে মধু পেন্সিলের কয়েকটা রেখা যেন রবার ঘষার পরেও আবছা হয়ে গেছে। এই চল্লিশেই কাঁচ কুলে পড়ে খানিকটা ঝুঁজো ভাব এসেছে, কিন্তু চোখে এখনো ঝুলির ঝলসর মতো দৃষ্টি।

প্রশ্নোত্তরের সম্ভাব্য সময় পেরিয়ে গিয়েছিল উত্তর দিকেই। ঘরের অন্য দুটি প্রাণীর কাছে ঘোরতর রহস্যময় ঠেকল ব্যাপারটা। একজন সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'ইনিই ম্যানেজার। মিস মজুমদার, দেখুন ইনি কী যেন জানতে চাইছেন।'

সামলে ঝুঁকড়ে গেল অতসী। এই দুজন বাইরের ভদ্র লোকের সামনে হিমাদ্রি এতদিন পরে ঠিক কি ধরনের আচরণ করে বসবে কে জানে। ওর মুখ চোখের চেহারা ভাল নয়। ঘোলার পলতের আগুনটা অনেক এগিয়ে, ফুলঝুরি কেটে হয়তো যেন অপেক্ষা করছে, কিন্তু নিবে গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অতসী তাড়াতাড়ি বলল, 'না, মানে ইয়ে—'

ওরটা ভারী গলায় হিমাদ্রি বলল, 'ভেতরে এসো।'

হিমাদ্রির নিজু নিজু অতসী যে ঘরটায় ঢুকল সেটা একটা শোবার ঘর। বোঝাই নিজেই থাকে। একেবারে সাদামাটা ঝকঝকে। এক পাশে একটা সিঙ্গল খাট আর আলনা, অন্যপাশে দুখানা পিঠখাড়া চেয়ার আর একটা টেবিল, টেবিলে গুনগুনেক বাংলা ইংরেজী বই। এক কোণে কাঁচের গ্লাস মাখার চাপানো ঝুঁজো।

বুকের ভেতরটা ধক্ ধরে, উঠল। খাট আলনা জুতোর র‍্যাক আর পড়ার টেবিল ঘরে ঘরে চোখ ঘুরে এল এক লহমায়। হিমাদ্রি কি তাহলে একা? একাই থাকে। সংসার করেনি বোঝাই যাচ্ছে। করলে তার মেয়েলি চোখে ধুলো নিতে পারত না, এক আধটা চিহ্ন ছেড়েই যেত। ওই ঝোপার বয়সী অনেক এলো মেলো বৃষ্টি প্যান্ট পাজামা শার্ট সেন্ডি চাপালে আলনা, জুতোর র‍্যাক ছড়ানো ছিটানো বাইরের টেবিলে হিমাদ্রির উদাসীন অন্যমনস্ক উজ্জ্বল হাতের ছাপ স্পষ্ট। সে তাহলে কোথায়? সে কি নেই? অতসী আর ভাবতে পারল না। তার পা কাঁপছিল, ঘরের চেয়ার অবধি আর পৌঁছতে পারল না, খাটের ওপরেই ধপ্ করে বসে পড়ল। এক লহমা তাকিয়ে দেখে হিমাদ্রি আবার বাইরের অফিস ঘরে ফিরে গেল। ঘোলাটে অন্ধকারের ঘুজনের সঙ্গে কোন জরুরী কথা কিংবা কথা সারতে। বাইরের ঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই আর অতসীর কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না। নদীতে ডুব দিলে যে রকম একটা গুঞ্জন কানে আসে তেমনি অর্থহীন শব্দ আসছিল তার আচ্ছন্ন চেতনার ঘুরে। অর্থহীন সবই অর্থহীন।

একটু পরে হিমাদ্রি ঘরে ঢুকে দেখল অতসী দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানার ওপর বসে আছে। টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

হাতের ফোকর থেকে মুখ তুলতে একটু সময় লাগল। অতসী বোধহয় এতক্ষণ কাঁদছিল। তার চোখ দুটো লাল। ঠোঁট কাঁপল, কী বলতে চেয়েছিল, পারল না। শেষে অনেক কষ্টে বলল, 'কেমন আছ?'

হিমাদ্রি হাসলে, 'যেমন দেখছ।'

উত্তরটা কেমন কাটাকাটা, নিষ্ঠুর। তবু কত দূর পরে ওর গলার স্বর শুনল। এরকম কথার পিঠে সে কি বলবে ভেবে পেল না। কেমন থতিয়ে গিয়ে অতসী বলল, 'তোমাকে এখানে এভাবে দেখবো ভাবতে পারিনি।'

হিমাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল। পরে বলল, 'জীবন এই রকমই। একদিন যা যা দিয়েছিল সুদে আসলে ফিরিয়ে নেয়। কিছুই তো বাকিতে সে চিরদিনের জন্য রেখে দেয় না।'

অতসী চমকে তাকালে। তার মুখ কেমন পাণ্ডু হয়ে গেল।

'একা?'

'সবাই। আমি। তুমি।' হিমাদ্রি হাসল।

অতসী হাতে ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'চলি।'

'এখনি?'

'হ্যাঁ।' হাতঘড়ি দেখল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। তোমাকে খুব বিরক্ত করে গেলাম।'

'জানতাম।'

'কী?'

'তুমি আসবে।'

অতসী ফিরে দাঁড়াল, 'কিন্তু তাহলে ওভাবে পালালে কেন?'

'তুমি খুঁজে নেবে বলে।'

অতসী আর কথা বলল না, দরজার দিকে পা বাড়াল। হিমাদ্রি পেছন থেকে সুরে বলল, 'দাঁড়াও।'

অতসী যেন পাথর হয়ে দাঁড়াল।

হিমাদ্রি গলা চড়িয়ে ডাকল, 'বাবলু, এই বাবলু!'

একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে কাছেই কোথাও ছিল, দরজার আড়ালের মতো ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল।

সর্বস্ব

সমরেশ মজুমদার

শেষ পর্যন্ত একটা সোওয়ার ভারসা পেয়ে গেল নিখিল। ইন্টারভিউ-এর চিঠিটা অফিসের গোলমালে তার কাছে যখন এসেছিল তখন ঠিক একদিন বাকি। ছুট বলতেই পার্সিলিং মেলে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। ট্রেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে সে একটা সাধারণ কামরায় জায়গা দখল করেছিল। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারলেই নিউ জলপাইগুড়ি। সেখানে নেমে শিলিগুড়ি শহর বড় জোর আধঘন্টা। এসপ্লেটার হাজির হতে বলেছে। এখন ট্রেনটা দেরি না করলেই সবকূল রক্ষা পায়।

একটা রাত না ঘুমালে কিছু ক্ষতি হয় না। নিখিল ঠিক করেছিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেই স্নান সেরে পরিষ্কার হয়ে নেবে। সঙ্গে একটা ছোলা ব্যাগ এক সেট জামাকাপড় অর ভোয়ালে ছাড়া সে বাড়তি কিছু নেয়নি। নেওয়ার প্রয়োজনও নেই। ইন্টারভিউ দিয়ে সন্ধের ট্রেন ধরবে সে।

চাকরিটা যে হবেই এমন আশা নেই তার। তবে যে সূত্রে সে খবরটা পেয়েছিল সেই সমীরণবাবু বলেছিলেন যে তিনি চেষ্টা করবেন। সমীরণবাবু একসময় নিখিলের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। এখন শিলিগুড়ির সেই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। আজকাল কোন ব্যাপারেই তেমন আশা করে না নিখিল। ওতে কষ্ট বাড়ে। এর আগে অন্তত আঠারোটা ইন্টারভিউ দিয়েছে সে। প্রথম প্রথম মাঝেমাঝে ভিল, শেষেরগুলোয় সে খুব সপ্রতিভ ভাবে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। কিন্তু ইন্টারভিউ এলে না যাওয়ার বিলাসিতা করার অবস্থা তার নয়। বেকার ভাইকে দাদা যে কোন মুহূর্তেই গলাগ্রহ ভাবতে পারে। অতএব তাকে আসতে হল। বেকারের সময় বিধবা মা যতই ঠাকুরের বেলপাতা কপালে ছোঁয়াক সমীরণবাবুর প্রভাব না থাকলে কিছুই হবে না। পার্সিলিং মেলে এত ভিড় হয় জানা ছিল না। বিশেষ করে আনরিজার্ভড বলেই বোধহয় জনতার চাপ বেশি। যে যেখানে পারছে জিনিসপত্র রাখছে, দখল করছে। নিখিলের মাথার ওপর জিনিসপত্র রাখার যে বাঙ্কটা সেখানে একজন ছাত্র পা ছড়িয়ে শুয়েছিল গোড়া থেকেই। প্রত্যেকেই তাদের মালপত্র ওপরে উঠিয়ে অনুরোধ করা মাত্র নিচ থেকে একজন জানিয়েছে, না না ঘুমাই ওকে তুলবেন না, টিবি পেশেন্ট।

এতেই কাজ হয়েছিল। নিখিল লোকটার মুখ দেখতে পায়নি। কিন্তু ওই বিশেষ অসুখটা লোকটাকে এই যাত্রায় রক্ষা করেছে বলে ঈর্ষাও হচ্ছিল। এই হরিদ্বারহাটের মেলায় হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া কম কথা নয়। ট্রেন ছাড়ার পর দেখা গেল ভিড়টা হঠাৎ খিতিয়ে গেল। একটু যেন নড়াচড়া যাচ্ছে। আনরিজার্ভড বলেই বোধহয় কামরায় আলো কম। নিখিল জানলার ধারে বসে দেখল আলোকিত স্টেশনগুলো একের পর এক চলে যাচ্ছে। এই পথে সে গিয়েছিল বছর দশেক আগে। তখন শিলিগুড়িতে মেজ মাসী থাকতেন।

সন্ধে বেলার ট্রেন ছেড়েছে। পুরো রাতটা সামনে পড়ে। নিখিলের মনে

পড়ল সঙ্গে কোন জামা নেই। এই দারুণ ঝামেলার নিশ্চয়ই ছেলের লোক খবর নিয়ে আসবে না। তার সামনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। তার ঠিক পাশেই ওপরের বোকটার সঙ্গী। সে ট্রেন ছাড়া মাত্র মাথাটা হেলিয়ে চোখ বুঁজেছে। নিখিলের ডান দিকে একটা ঔটকো চেহারার মহিলা। তার পাশেই নূতন মন্তব্যকারী মহিলা। তাদের অন্তবর্তী, ওপাশের নিখিলের ডান দিকে নয়। সে ঘুমন্ত এবং ঠিক পরিমাণ জীবনযাপন করে না। একজন ডিবে থেকে পান বের করে সুপুরি তুলে নিয়ে অন্যজনকে দিল। শরীরে পদ্মফুল তার এসে গেছে কিন্তু যৌবনে সঙ্গে সঙ্গে নেমেনি। অন্ধ বুকের আঁচল যে অনেকক্ষণ খসে গেছে সেদিকে বিশেষের মনোযোগ নেই। দ্বিতীয়জন সুপুরি গালে পুরে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই জিনিসটাকে সরে বসতে বলুন তো, আরাম করতে দিচ্ছে না'। সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা ভদ্রলোক সোজা হল। নিখিল কিছু বলার আগেই ভাল্লা বাবুর বলল, 'আপনি এদিকে বসবেন বাবু, বসি কেমন তকলিফ না হয়।'

তারপর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়াল আসন ছেড়ে। নিখিল ঠাওর করতে পারছিল না তার কি করা উচিত। কিন্তু প্রথম মহিলা বলে উঠলেন, 'সেই ভাল। এই ঔটকোগুলোকে দুই চোখে দেখতে পারি না।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'তোমার আগের কর্তাও তো এই ছিল।'

প্রথম জন মাথা নাড়ল, 'তাতো। সবই ভাগ্য বুঝলি'

অতএব নিখিল মহিলাদের পাশে এল। এবং আসতেই সে খুব সস্তা ধরনের তীব্র সন্তমুক্ত স্নোর ঝলক পেল। মহিলার গায়ের রঙ মর্ষিত কালো নয় তবু এত স্নো মাখার কোন দরকার ছিল না। নিখিল যতটা সম্ভব হেঁয়াচ বাঁচিয়ে বসতে প্রথম মহিলা পান চিবোতে চিবোতে বলল, 'টি বি হয়েছে ওপরের লোকটার, আমার নয়।

—'মানে?' নিখিল অবাক হল।

'যে ভাবে বসছেন তাতে মনে হচ্ছে আমি যেন হেঁয়াচে রুগী। আরাম করে বসুন না।'

আপনি কোন অসুবিধে ভোগ করবেন?'

'আ। আপনি বসলে অসুবিধে হবে না। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'শিলিগুড়ি।' নিখিলের এই গায়ে পড়ে আলাপ করা পছন্দ হচ্ছিল না।

'আমরাও শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখানেই থাকা হয়?'

'না, কাজে যাচ্ছি।'

'অ। জায়গাটা আমরাও ভালো করে চিনি না। মেয়ে জেদ ধরল পনের দিন হল। বলেছিল, পাঁচ দিনেই ফিরে আসবে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'উনি কোথায় গিয়েছেন আপনারা জানেন?'

'বলেছিল হোটেলে উঠবে। যে নিয়ে গিয়েছিল সে কোথায় রেখেছে কে জানে। পাঁচদিন মানে পাঁচদিন, পনের দিন যখন হয়ে গেল তখন ভয় হচ্ছে। এ লাইনে পাখি যদি একবার শেকল ছেড়ে তাহলে আনন্দ দুর্লভ। পান খাবেন?'

'না'। চমকে উঠল নিখিল। বুঝতে বাকি রইল না এরা কারা, কি উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে যাচ্ছে। মহিলাদের সঙ্গে আর কথা না বাড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এই সময় দ্বিতীয় জন বলল, 'আপনি কি করেন? ব্যবসা?'

এবার যেন পরিত্রাণ পেল নিখিল, স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি কিছুই করিনা। চাকরির খোঁজে ওখানে যাচ্ছি।' যে কথাটা সে বলল না অথচ বোঝাতে চাইল, আমার সঙ্গে আর জড়িয়ে যেন লাভ হবে না, আমি বেকার।

এরপর কথাবার্তা আর এগোল না। ও পক্ষ যেন আচমকা নিজের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘাড়িলির যেন চলছে যেন ঘোরে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিখিল সেই মেয়েটির কথা আবার চেষ্টা করল। এমনও তো হতে পারে মেয়েটি তার পছন্দের ছেলের সঙ্গে বাইরে গিয়ে তার মেয়ের জীবনে ফিরতে চায়নি। উত্তর বাংলার কোথাও সে সংসার পেতে বসেছে। অন্ধ শনির মত এই ভ্রমণ চলেছে তাকে ঘিরিয়ে

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে, ভরা নদীর কলোচ্ছাসে, বিহগকুলের কাকলি-কূজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে।
সমাসন্ন মাতৃপূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য-প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে সংগ্রামে বিজয় বরলাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।
দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।
অজস্র দুঃখ, অসংখ্য সমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

কে· সি· দাশ প্রাঃ লিঃ
আবিষ্কারক
রসোমালাই এবং ডায়াবিটিকদের
জন্য চিনি বর্জিত মিষ্টান্ন
কলিকাতা
১১, এসপ্ল্যানেড ইস্ট
ফোন ২৩-৫৯২০
ব্যাঙ্গালোর
৪৮, সেন্ট মার্কস রোড
ফোন ৫৫ ০০৩
SASC/KCD/1/9/85

জানতে। সে মনে মনে প্রার্থনা করল সেরকম হলে এরা যেন মেয়েটির দেখা না পায়।

বোলপুর যখন ছাড়ল ট্রেনটা তখন মধ্যরাত। নিখিল অর্ধেক চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ মনে হল তার সামনে কিছু ঝুলছে। সে সজাগ হতেই দুটো পা দেখতে পেল। মাথার ওপরের বাঙ্ক থেকে নেমে আসছে সেই অসুস্থ মানুষটি। নিচে নেমেই লোকটি দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে আলস্য ভাঙল, 'ভাল ঘুমিয়েছি। আঃ বাঙ্গাল!' বলে নিখিলের দিকে তাকিয়ে হাসল। পুরো চোখ খুলে নিখিল লোকটাকে দেখল। মোটেই টি বি পেশেন্ট বলে মনে হচ্ছে না। রোগ মিথ্যে বলে এই সমস্তটুকু ঘুমিয়ে নিল।

প্রশ্নটা করে কিন্তু লোকটা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেনি। জানলায় ঝুঁকে রাতের অন্ধকারে জায়গাটা দেখে নিয়ে বলল, এখনও দেরি আছে। তুই ওঠ দোস্ত, কিছুক্ষণ সেঁটে যা।' বলামাত্র একটি রোগা তড়াক করে ওপরের বাঙ্কে উঠে গেল। নিখিল দেখল ওই রোগাটিকে। ট্রেনের ঝাড়ার সময় অসুস্থতার সংকেত এর মুখ থেকেই সবাই শুনেছিল। নেমে আসা লোকটা এবার উঠে যাওয়ার রোগাটার জানলার আরাম করে বসল। তার চোখ ঘুরছে। দেখলেই বোঝা যায় বাঙ্গাবাজ। একটা হাত বাড়িয়ে সে নিখিলকে বলল, 'সিগারেট হবে?'

নিখিল সামনা বিরক্ত, মাথা নেড়ে নিঃশব্দে 'না' বলল।

লোকটি এবার দুজন মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'পান হবে?'

মহিলারা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে মাথা নাড়ল। একটা পান তৈরি হলে হাত বদল হল। লোকটি সেটাকে মুখে চালান করে বলল, 'জর্দা?' এবার সেটাও সেটাও দেওয়া হল। দ্বিতীয় মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' চোখ বন্ধ করে পানের রস ম্যানেজ করতে করতে লোকটা বলল, 'আলুয়াবাড়ি।' তারপর কিছুক্ষণ নীরবে পান চিবিয়ে বলল,'মকরাতে পান খেলে মনে রঙ জমে। আলুয়াবাড়ির নাম শোনা আছে?'

দ্বিতীয়া মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমরা যাচ্ছি শিলিগুড়ি।'

'অ: বাঙ্গার?'

মানে? দ্বিতীয়াই কথা বলছিল।

'আরে মাছ হল মাছ। তা পুকুরের তোবার আর নদীর মোক, কিছুই তফাৎ নেই। আমিও মাছ তোমরাও মাছ। মাছ তো মাছকেই চিনবে। যেঁ যেঁ।'

'মন : কথা শুনেছিস?' দ্বিতীয় প্রথমাকে ছোট্ট ঠেলা দিল। তারপর হেসে বলল, 'তা এই মাছ যে সমুদ্রের নয় তা বুঝল কি করে। সমুদ্রের মাছ বেশি ঘোড়েল হয়।'

হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসল লোকটা। তারপর বলল,' আমার নাম রতন হালদার।'

নিখিলের কানে প্রতিটি শব্দ আসছিল। রতন লোকটা কথা বলার কায়দা জানে বটে। নইলে দ্বিতীয়া ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে আলাপ শুরু করে দেয়? প্রথমা কিন্তু চুপচাপ বসে আছে। রাতের এই ট্রেনে যখন প্রত্যেকের চোখে ঘুম তখন সে পাথরের মত বসে। মনে হয় মেয়েটি না ফিরে আসায় ওর শেরক বেশি।

রতন বলল,এই কথা। দুটো দিন। আজ দুটো দিন লাগবে। আরে নর্থ বেঙ্গলটা আমার হাতের তালুর চেয়ে বেশি চেনা। দুটো দিনেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করে দিব। বয়স কত?

'উনিশ।'

'ছলবার বয়স। ছালাবার বয়স। ভয় নেই, আমার আবার খুব ঘরে বউ না হলে ভাল লাগে না। তিনশো লাগবে।' নির্বিকার ঘরে বলল, রতন।'

'তিনশো? যাশের জমিদারি পেয়েছ? পঞ্চাশ দিতে পারি।'

দিও। নেওয়ার লোকের অভাব হবে না। মেয়ে পাবে না ফিরে। আমি বাবা ভড়কিবাজিতে নেই, ছেলে কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর? তা তুমি যখন পান খাওয়ালে তখন না হয় খুশেই দিও আর পথ খরচা। নর্থ বেঙ্গলটা আর কলকাতা নয় বাবা। কোথায় কোন চা বাগান কিংবা জঙ্গলে পিরীত করছে সেটা খুঁজে বের করা সহজ ব্যাপার নয়। তারপর হল গিয়ে, তোমাদের মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে। চলে আয় কললেই যদি না আসে তাহলে গুলটি।' রতন হালদার উঁকি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অন্ধকার দেখল। রাতের ট্রেন ছুটে গেলে পৃথিবীটা কেমন অচেনা হয়ে যায়। কিংবা সব জায়গাতেই একই রকম মনে হয়। কিন্তু নিখিলের মনে হল রতনের যেন অস্বস্তি হচ্ছে। সে কথা বলছে বটে কিন্তু চোখ মাঝে মাঝেই বাইরে ঘুরছে। আলুয়াবাড়ি কি এসে গেল? কামরার বাকি যাত্রীরা সমানে ঘুমাচ্ছে। এদের কথাবার্তায় কারো মন নেই। কিন্তু নিখিলের চোখে ঘুম আসছে না। বসে বসে ঘুমানো তার অভ্যেস নেই, তার ওপর এই সব কথাবার্তা। দুই মহিলা ততক্ষণে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল। তারপর দ্বিতীয়া জানাল, 'ঠিক আছে তাই হবে। তবে কিনা মেয়েকে ফিরে পেলেই ভাল দেব। তড়কি দিয়ে নিয়ে যাবে তা হবেনা।'

রতন একটা চোখ ছোট করল, কিন্তু তো আগাম ছাড়বে। নইলে এ পাব কি করে?'

দ্বিতীয়া বলল, 'দেখা যাবে।'

রতন এবার জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়ের নাম কি?'

'পারুল।'

'ছবি আছে?'

দ্বিতীয়া হাসিমুখ করতে প্রথমা হাতব্যাগ থেকে একটা খাম বের করল, 'খাসা: এ মেয়ে তেসে গেলে কষ্ট তো হবেই। আহা, যেন কামদেব্। যতদিন কাছে থাকবে ততদিন!

মাথা দোলালো সে. 'এতো সুচ নয় যে খুঁজতে হবে; লোহার কিম, যে গাদায় থাক না কেন চোখে পড়বেই। কি রূপ, কি জ্যোতি।'

দ্বিতীয়া ছবি ফেরত নিয়ে প্রথমাকে দিল। প্রথমা খামে পুরতে পুরতে কি মনে করে নিখিলের সামনে ধরল, 'এই হল সেই মেয়ে। জন্ম থেকে মানুষ করলাম এমন পাখা গজাতেই হাওয়া। ঘর আঁধার দেখছে। মরণ।

নিখিল দেখল। তরতাজা একটি যুবতী হওয়া মেয়ে সুন্দর চোখে হাসছে।সেই হাসিতে কোন মালিন্য স্পর্শ করেনি। প্রথমা তখনো ছবিটাকে ধরেছিল, নিখিল সেই দিক থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'কেউ যদি ঘর বাঁধে তাহলে [illegible] আপত্তি হচ্ছে কেন?'

'কারণ সেটা টিকবে না। দুদিন পর শিরীষ ফুরিয়ে গেলে ভাতার লাথি মেরে তাড়াবে। যাজখান থেকে যৌবন যাবে খসে, ঘুলঘন ঘরিয়ে যাবসা হয়: কি করবে তখন?' ছবিটা আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল প্রথমা।

'টিকবে না কেন ভাবছেন?'

'বেশ্যার মেয়েকে বেশিদিন ঘরের বউ ভাবা যায় না। এ কথা দেখলাম: তবু মজা হল, ঘরের বউ করার প্রস্তাব এলেই উত্তেজিত বয়সীদের মন ঢোক ঢোক করে। ঠিক যেমন করে শোকাস্মরুড় ভাঁপায় আগুনে' তাই সময় থাকতেই ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। নিজেরটা বুঝে নিক। জন্ম দিয়েছি যখন তখন কর্তব্য করতে হবেই।'

নিখিল চমকে মুখ ফিরিয়ে নিল। পিতা কিংবা মাতা হিসাবে কেউ এরকম কর্তব্য করে তা তার জানা ছিল না।

এই সময় ট্রেনের গতি কমে এল। রতন হালদার চট করে উঠে যাওয়ার লোকটার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'উঠে পড় দোস্ত' টাইম হো গিয়া।' কলামাত্র ওপরের লোকটি পটু হাতে শরীর নামিয়ে আনল নিচে। তারপর ঝুঁকে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে দরজার দিকে চলে গেল মানুষ ডিঙোতে ডিঙোতে। নিখিল লক্ষ্য করল রতন হালদার বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। সে আর ফিরে বসেনি। এক সময় তাকেও দরজার দিকে যেতে দেখা গেল। অন্ধকার চিরে ট্রেনটা ফাপসা আলোর স্টেশনে এসে দাঁড়াল। নিখিল মুখ বাড়িয়ে দেখল স্টেশনে লোকজন নেই বললেই চলে।

রতন হালদারকে প্লাটফর্ম ধরে হাঁটতে দেখল সে। তারপরেই হুইসলের শব্দ, টিকারের চেঁচামেচি এবং সেইসঙ্গে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পাওয়া

মাত্র দুজন ট্রেনটা দেখে উঠল। প্লাটফর্মে কেবল পুলিসের উত্তেজিত চেহারাটি. যাত্রীদের অন্তর্হিত মুখ দেখতে দেখতে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। নিখিল দেখল রতন হালদারেরা ফিরে আসেনি। সে একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'রতনবাবুরা এলেন না তো!'

প্রথমা চিন্তিত, 'দেখছি তো তাই। বাইরে গোলমাল হচ্ছে। উঠতে পারল তো!'

ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করল, 'আক্সিডেন্ট হয়েছে। সবাই এখানে এসে দেখেছি আছে। কিন্তুটি আর বড় বেশি হিল।'

এবার দ্বিতীয়া বলল,'লোকটা নির্ঘাৎ স্মাগলার। চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল দু নম্বরী। এতগুলো নিয়ে যাওয়ার ধান্দায় ছিল।'

প্রথমা বলল, 'তাহলে কি হবে? লোকটা সাহায্য করবে বলেছিল।'

দ্বিতীয়া বলল, 'পুরো জলপাই পেখেই দেব। এ দেশ আর একজন নিয়ে আসবে। তাই নিয়ে ভাবনা কি। পারুলকে না নিয়ে আসবি না। ও নিয়ে তুমি ভেবো না।'

প্রথমা এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একটু সাহায্য করবেন না? আমরা দু' জনে অসহায় মেয়েছেলে।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনটা বেশ বড়। ট্রেনটা আসতেই যাত্রীরা নেমে বাহিল তড়বড়িয়ে। এখন বেশি বেলা হয়নি। ইন্টারভিউটা বেলি দেরি নয়, অবশ্য একটু পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার। প্রথমা প্লাটফর্মে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

নিখিল হাসল, 'আমি ওয়েটিং রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে যাব ইন্টারভিউ দিতে।' ঠিক তখনই রতন হালদারকে হাসতে হাসতে এদিকে আসতে দেখা গেল। তাকে দেখে দ্বিতীয়া প্রায় ছুটে গেল।

'ওমা, কখন উঠেছ? আমার তো ভয় হচ্ছিল, পড়েই থাকলে বোধহয়।'

রতন বলল, 'পড়ে থাকার জন্যে এ শর্মা জন্মায়নি। কিন্তু ঝড়ে আছে পেছনে। এমন ভাব করা যেন আমরা ফ্লাসব্যাক ওয়াইফ।'

'মুখে আগুন: আমার ঘরে যেতে।' দ্বিতীয়া চপল গলায় বলল।

'তাহলে সাহায্য পাবে না।'

'ঠিক আছে বাবা, বউ তো কারো হইনি কখনও, ঢঙ করতে জানি না। কি করতে হবে বলে দিও। এখন আমরা উঠছি কোথায়?'

'দিয়া নিয়ে লিলিতছি চল। নর্থ কোল হোটেলে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে চিন্তা করা যাবে কি করণীয়। দাদা কোথায় থাকেন?'

প্রশ্নটা নিখিলের উদ্দেশ্যেই, কারণ সে তখনও দাঁড়িয়েছিল। নিখিল বলল, 'আমি এই শহরে নতুনই বলতে পারেন। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। আজ সন্ধের ট্রেনে ফিরে যাব। শহরে যেতে হবে কলটার জন্যে।'

'একদমই না বেন?'

'পরিষ্কার হয়ে যাব ওয়েটিং রুম থেকে।'

'ও, চল।' রতন এগোল। দলটা রতনের হবার আগে প্রথমা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হোটেলটার নামটা তো শুনলেন। ফেরার আগে যদি সময় থাকে তো একটু দেখা করে যাবেন।'

নিখিল এমনভাবে হাসল যার দু রকম মানেই হয়।

ইন্টারভিউ খারাপ দেয় না নিখিল। এবারও দিল না। সমীরণবাবু বললেন, 'তুমি নভুনই তাল নিশ্চিন্ত থাক নিখিল, সামনের মাসে তোমাকে এখানে পাকাপাকি আসতে হবে মনে হচ্ছে।'

নিখিল বলল, 'ওই কল তালটাই বড় গোলমাল করে স্যার।'

সমীরণবাবু হাসলেন, 'মনে হচ্ছে এবার করবে না। তুমি কোথায় উঠছ?'

'কোথাও না। আজ সন্ধের ট্রেনেই ফিরে যাব।'

'আমার এখানে আজ থেকে যেতে পারতে।'

'পাকাপাকি এলে তো প্রায়ই বিরক্ত করব স্যার। আজ থাক।'

মোটামুটি ভেবে ভেল চাকরিটা হবে। মনে আনন্দ এল। ঘড়িতে তখন সবে আড়াইটে। বাইরে বেরিয়ে একটা দোকানে সামান্য খেয়ে নিল সে। ট্রেন ছাড়তে এখনও অনেক দেরি। শহরটাকে দেখবার জন্যে পা বাড়াল নিখিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল। যেমন নোংরা এবং ঘিঞ্জি। রিক্সা এবং গাড়ির ধাপটে ছোট রাস্তার হাঁটা বেশ কঠিনও। এত নামকরা শহর কিন্তু। নিখিল ভাবল, আজ চাকরিটা পেলে তাকে এখানেই থাকতে হবে। অবশ্য এই শহর ছাড়লেই যদের মত জায়গাগুলোর চেয়ারগুলো ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর আকর্ষণে এখানে থাকা যায়। হেসে ফেলল নিখিল। যার চাকরি নেই এবং চাকরি পাচ্ছে তার আবার শহর অশহর:

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল সে। হঠাৎ হোটেলটা নজরে এল। এইটির নামই সে শুনেছিল সকালে। একটু কৌতূহল বোধ করল সে। প্রথমা তাকে বলেছিল সময় পেলে দেখা করতে। ওরা কি পারুল বলে মেয়েটার সন্ধান পেয়েছে? অসম্ভব ছাড়া সেটা কি সম্ভব? ঈশ্বর করুন পারুল যেন চিরকাল অন্তরালেই থেকে যায়। একটি মেয়ে জেনারেল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে সুস্থ জীবন যাপন করবে অথচ এরা সেটা হতে দেবে না। ব্যাপারটা সমর্থন করা যায় না। খবরের কাগজে সে পড়েছে খারাপ জীবন যাপনে প্ররোচনা করার অপরাধে পুলিশ প্রায়ই অনেককে গ্রেপ্তার করে। এদের বিরুদ্ধে থানায় জানিয়ে এলে কেমন হয়? কি সিদ্ধান্ত নেবে ঠিক করতে পারছিল না নিখিল। এমন সময় চোখে পড়ল রতন আর দ্বিতীয়া হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সায় উঠল। ওরা মুখন কথা বলতে বলতে এমন মশগুল যে এদিকে তাকাল না পর্যন্ত।

রিক্সাটা চোখের আড়ালে চলে গেলে সে রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকল। খুবই সাধারণ স্তরের হোটেল। রিসেপশন্ বলতে কিছুই নেই। খালি গা তুলি পরা একটা লোক বসে খইনি খাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আজ সকালে কলকাতা থেকে এক বাবু আর দুইজন মহিলা এসেছে। কোন ঘরে থাকে।'

'আভি নিকাল গিয়া মোজান। বারা নম্বর কামরা সে হ্যায় উনলোগ্।' লোকটা নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল।

বেরিয়ে যে গেছে সেটা নজরে পড়েছে। কিন্তু একজন তো আছে। নিখিল ঝুঁকে ঝুঁজে বারো নম্বর ঘর কের করতে বুঝল হোটেলটা সত্যি ঐদো। বিচিত্র ধরনের মানুষ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধ দরজায় শব্দ করল সে। চটপট প্রশ্ন এল, 'কে?'

'আমি।'জবাব দিয়ে পরিচয় কি বুঝতে না পেরে সে যোগ করল, 'আজ ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। দেখা করতে বলেছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, 'ও মা: কি ভাগ্যি। আসুন আসুন।' প্রথমা হাসিমুখে দরজা খুলল। আড়াই ভঙ্গীতে নিখিল ঘরে ঢুকে দেখল দুটো খাট এবং একটা টেবিল ছাড়া ঘরটায় বিশেষত্ব কিছু নেই। প্রথমা বলল, 'এই চেয়ারটায় বসুন। আমি আপনার কথা খুব ভাবছিলাম।'

সসম্ভ্রমে নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে নিখিল না জানার ভান করে প্রশ্ন করল, 'আর কাউকে দেখছি না। বাইরে গেছেন বুঝি।'

হ্যাঁ। রতনবাবু একটা খবর এনেছেন। দেখতে গেছে ওরা।' প্রথমা বলল, 'কথাটা শুনে আমার বিশ্বাস হল না।'

'কিন্তু মনে করবেন না, আপনারা কি ওকে ছেড়ে দিতে পারেন না?' চমকে তাকাল প্রথমা। তার মুখটা করুণ হয়ে উঠল। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'দিতে পারলে তো নিতাম। কিন্তু ওকে নইলে বুড়ি হয়ে যেতে বাঁচব কি করে। তোমাদের ছেলেপিলে বুড়ো বয়সে খাওয়ায়, আমাদের কে খাওয়াবে? ছেড়ে দিন এসব কথা: আপনি আজই ফিরে যাচ্ছেন?

'হ্যাঁ। সন্ধের ট্রেনে।'

'কাজ হলো?'

'মোটামুটি।'

'আমার একটা উপকার করবেন?'

'বলুন।'

'মনে হচ্ছে ফিরতে দেরি হবে। আসবার সময় তাড়াহুড়োয় ভুলের আলমারির চাবি বালিশের নিচে ফেলে এসেছি। ওতে আমার সর্বস্ব

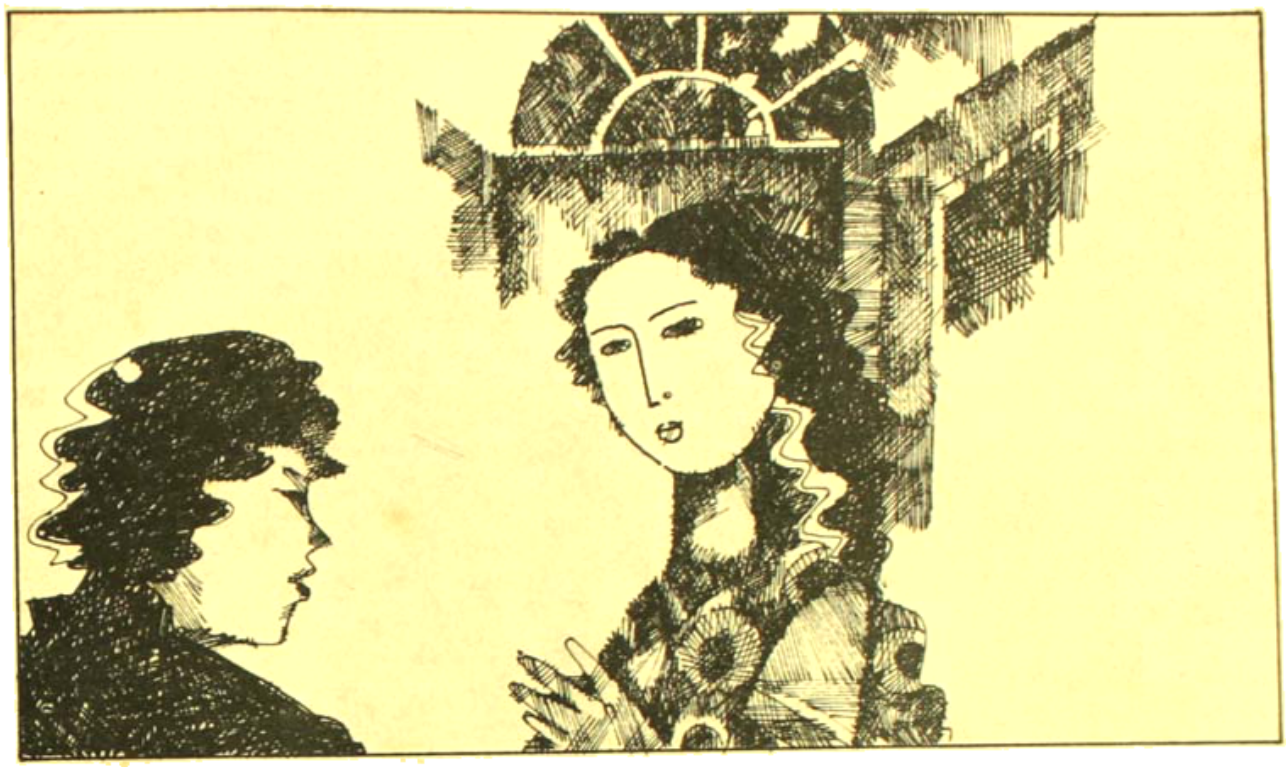

আছে। মনটা খুব খুঁত খুঁত করছে। আশেপাশের মেয়েদের যা চরিত্তির। আপনি সুবাসী বলে একজনের খোঁজ করবেন। তাকে বলবেন চাবিটা তার কাছেই রেখে দিতে সুবাসী আমার বাড়িতেই থাকে। চিঠি দিলে কবে ছুটতে পড়বে সেবে আর এক বিপত্তি। পারবেন এই কাজটা? নিজে যদি যেতে না চান তাহলে, অন্য কাউকে পাঠিয়ে সুবাসীকে এই খবরটা দিলেই হবে। পারবেন না?' কাতর চোখে তাকাল প্রথমা।

এখানে দেখা করা এক আর একমত ডেরার দিয়ে; কিন্তু নিখিল অস্বীকার করতে পারল না। বলল, 'চেষ্টা করব। আপনার ঠিকানা কি?'

গাড়িটির মেলে বসে ব্যাপারটা ভাবছিল নিখিল। চিরকালই সে উঠকো' ঝামেলাকে ডেকে কাঁধে টেনে নেয়। কোন দরকার ছিল না হোটেলে যাওয়ার, সিরেই ক্যাসানটাকে ডাকল সে। প্রথমার নামটি বেশ কুসুম। দেখলেই বোঝা যায় যৌবনে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। রাস্তাটি অবশ্য খুবই কুক্ষাত। শেষ পর্যন্ত নিখিল এড়াতে পারল না। তার জন্যে যদি মেয়ের সর্বস্ব চলে যায় সেটা ভাবতে ভাল লাগবে না।

দুপুরে ঘুমিয়ে নিখিল বের হল। এখন বেলা মরে গেছে। কলকাতার ঠিক সন্ধে। আগে এক ধরণের মন খারাপ করা ছায়া নামে। নিখিল ইচ্ছে করেই দর্জিপাড়ার বাস থেকে না নেমে একটু এগিয়ে নামল। বাস শুদ্ধ লোক দেখবে সে খারাপ পাড়ায় যাচ্ছে, সেটা ভাল লাগল না। পাড়াটাকে আসা-যাওয়ার পথে বাস থেকে দেখেছে সে। রাস্তাঘাটের কোন পরিচয় নেই। নম্বর মিলিয়ে সে যখন বাড়িটার সামনে দাঁড়াল তখন দালান পেরিয়ে গেছে পেরুনে। নিখিল তাকে স্পষ্ট বলল, 'শ্যাখো ভাই, তুমি যা ভাবছ সেজন্যে আমি আসিনি। আমাকে কুসুম পাঠিয়েছে একটা খবর দেবার জন্যে। সুবাসী কোথায় থাকে বলতে পার?'

পরিচিত নাম শুনে মেয়েটা বলল, 'দোতালায় ডান দিকের ঘর।'

নিখিল পুরোন দেশের ধরা বাড়িটায় ঢুকতেই সন্ত্রস্ত হল। চারপাশে মেয়েদের রাত্রের খদ্দের ধরার আয়োজন চলছে। ওকে দেখে কয়েকটা রসালো মন্তব্য ছিটকে এল। দোতালায় উঠে সে দেখল ডানদিকের দরজাটা বন্ধ। কি করবে সে বুঝতে পারছিল না, এই সময় একটি মেয়ে শরীর দুলিয়ে এগিয়ে এল, 'কি গো, বসবে নাকি?'

নিখিল বলল, 'সুবাসী কোথায় থাকে?'

'নেই, বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছে। সুবাসীকে কি দরকার, আমি তো আছি।'

'আমার ওকেই দরকার। কুসুম পাঠিয়েছে আমাকে।'

'ও। বাঁধা ঘর। তা যাওনা তিনতলায় কুসুমের ঘরে।' বলে মেয়েটা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল। তিনতলায় কুসুমের ঘর? নিখিল কৌতূহলী হল। তিনতলায় উঠে আসতেই একজন বুড়ি সামনে দাঁড়াল, 'কাকে চাই?'

'কুসুমের—।'

'সে নেই।'

'জানি। তার ঘরে কেউ আছে?'

'কে রে পাঁচুর মা?' বলতে বলতে যে এসে দাঁড়াল তাকে সুন্দরী না বলে পারা যায় না। টাইট করে শাড়ি অঙ্গে জড়িয়েছে, টেনে বাঁধা চুল বিনুনিতে বদ্ধ। চমক আছে দৃষ্টিতে। মেয়েটি নিখিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বসতে এসেছেন? আজ আমার শরীর খারাপ।'

'না, না, আমি মানে, কুসুম আমাকে পাঠিয়েছে। আমি—।'

'মা পাঠিয়েছে আপনাকে? কোত্থেকে আসছেন আপনি?'

'শিলিগুড়ি।'

'ওমা, আসুন। কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনি কে? আপনার নামটা?'

'পারুল। ওর মেয়ে।'

চমকে উঠল নিখিল। তারপর ফ্যাকাশে স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ফিরে এসেছেন?'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল পারুল, 'ফিরব না কেন? থাকতে গিয়েছি নাকি আমি? পাগল? কেউ কি সাধ করে খাঁচায় ঢোকে? আমি মায়ের মেয়ে না।'

নিঃশ্বাস ফেলল নিখিল। তারপর কোনমতে বলল, 'আপনার মা চাবি ফেলে গিয়েছিলেন ধালিশের নিচে।'

তৃপ্তির হাসি হাসল পারুল। তারপর কোমর থেকে আঁচলটা সামান্য সরিয়ে দেখাল।'ও এই কথা: ঠিক জায়গায় রেখে গিয়েছি। আমাদের সর্বস্ব হুতহুতড়া করা কি চলে?

আমার জীবনই আমার বাণী

সত্য
অহিংসা
শান্তি
প্রেম
সহনশীলতা
নির্ভীকতা
সরলতা
সাম্য
স্বদেশী

গান্ধীজীর কাছে এগুলি কয়েকটি প্রতীকী শব্দমাত্রই ছিল না। তাঁর প্রতি কাজ, প্রতিটি আচরণ ছিল ঐ পরশমণিগুলির স্পর্শে উজ্জ্বল।

আর তাই তাঁর জীবন ছিল মানবতা, মানবীয় মূল্যবোধের সার-সত্ত্বা। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য শুধু শব্দের সমষ্টি-মাত্রই ছিল না—ছিল প্রকৃত অর্থে মহাত্মার বাণী।

এই বাণীই আমাদের চিরদিনের প্রেরণা হয়ে থাকুক

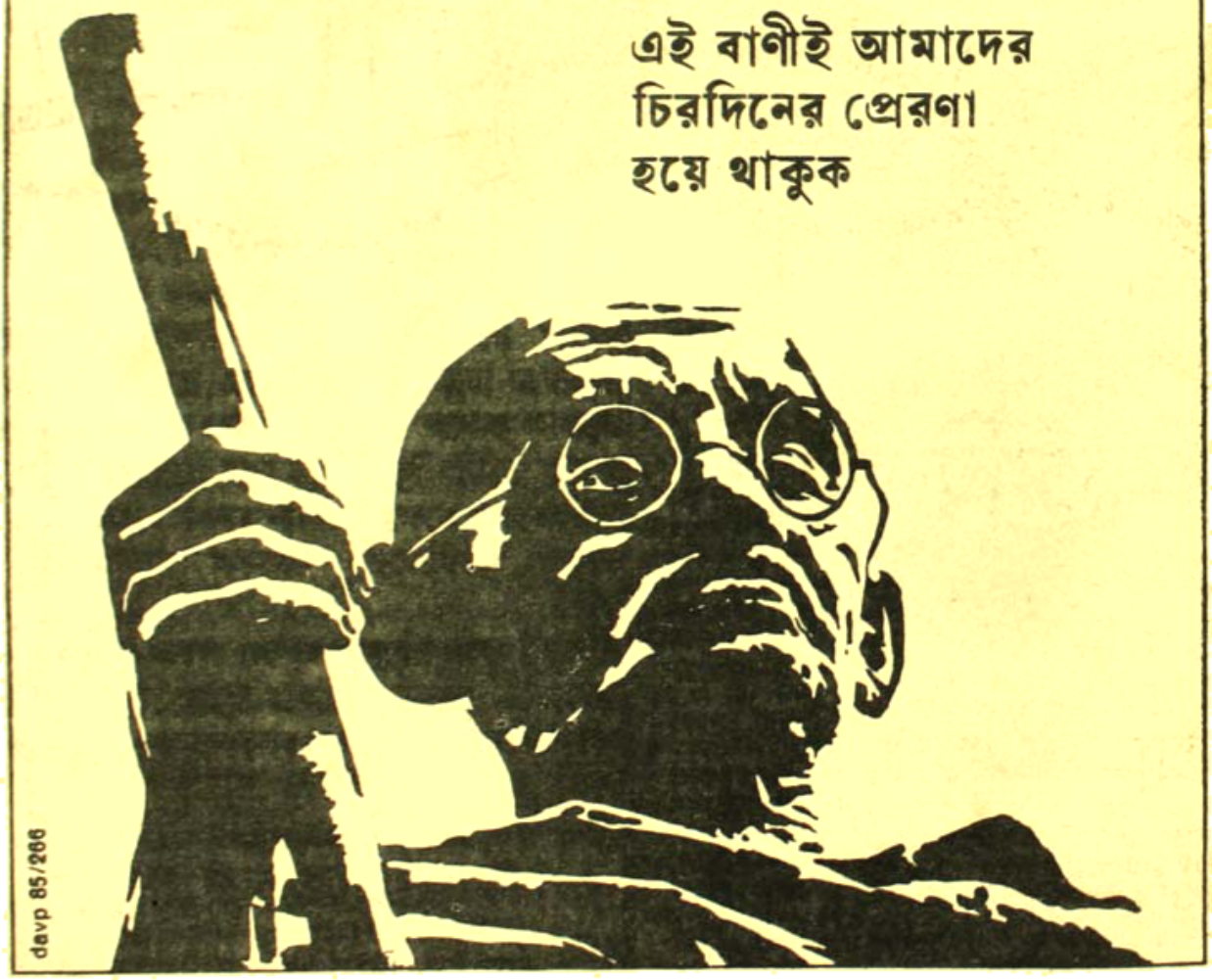

davp 85/266

অভিযোগ

দিব্যেন্দু সিংহ

আজ আমার ঘুম ভাঙবে না। নতুন কাজিনরা আমার সঙ্গে ঘুম ভাঙতে চায় না। এবং ওদের যা-হোক করে মা আজ বিছানা পেতে দিয়েছে। আমার পাশে একগাদা গুয়েবের বাচ্চার মতো আমার ছোট ভাইবোনেরা ঘুমোচ্ছে। ওদের দিকে তাকাতে আমার উৎসব বিশ্রী লাগে। মাথায় চিরুনি নেই, গায়ে জেল পড়ে না, সাবান পড়ে না গোটা গা ময়লা ভর্তি।

ট্রেন স্টেশনে ঢুকিয়ে মাত্র একটা ভিখিরি এসে বলল একটা পয়সা দিন বাবু। সেই একটা পয়সা, বাবু, ভাবলেশ মানুষটার অনেক ভেবেও বাবু সেই বললাম না, সত্যিই নেই, কারণ ওইদিন ভিখিরিটা দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। উৎসব বন্ধ হয়েছিল। আর মনে পড়ে গিয়েছিল আমার ভাইবোনেদের কথা। বাড়িতে কেউ এলে ওদের ওই করে।

সমস্যার মূলে কবে। কবে আর মা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা সংসার। ওদের কাছে বোঝেয় তা নয়। শুনেছি, বাড়িটা সেদিই একদম একেবারে চলে যাবে কি, সম্ভবত ভেঙে ফেলা হবে। সবই শুনছে। যদি চলেও যা একটু অসুবিধে। মা কবে তেমন কথাতেই না বলে না।

মা আর বাবা ঘেরে বসেছে। অনেক বিয়েটা একবার দিয়ে দেওয়া উচিৎ আছা থাক না আর দুটো দিন বাড়িতে। তা অবশ্য ঠিক। কী আর এমন বড় হয়েছে। জানোতো, এখনকার দিনে সবাই বেশি বয়সে বিয়ে করে। তা ঠিক নিশ্চয়। না-না, তবু বেশিদিন আর ওকে বসিয়ে রাখা চলে না। প্রশ্নও সেই কথাই বলছিলাম। এত কারণ সামনে মানুষের এই ধরনের কথাগুলো শুনতে। বাবা যা বলবে সব ওতেই হ্যাঁ একটু অসুবিধে তো সব

জানলাটা বন্ধ, এ আর এমন কি ... তা ও ছাড়া মেরে বলছে?—পঞ্চাশের টাকা ... ঘরের মধ্যে প্রথম একশ টাকার মতো এসিডে হাত যায়। কী করে?—মা মশা মারে ধনে ধনে ... বাড়িতে নিয়ে উঠলে তো আরও অনেক টাকা হাত হবে ... বেশ হলো আমার মা-বাবাকে তখন।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে মা আর বন্টুটা ঘুমোচ্ছে। সবাই জায়গা করে, যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। আমার পায়ের কাছে ঘুমোচ্ছে দাদারা আর মাঝখানে কাছে বড়দি। কি বিশ্রীভাবে শুয়েছে বড়দিটা। কাপড় ঠিক নেই, পাশে শুয়ে আছে গৌতম, বাচ্চু, বেঁটে আর সন্তু। বেঁটের বুদ্ধি অন্যদের চেয়ে একটু বেশি, আগে আমরা যখন পাঁচজন ছিলাম, তখন সবাই হিন্দু স্কুলে পড়তাম। ভালো সাদা জামা-কাপড় পরে স্কুলে যেতাম গৌতম, বাচ্চু আর বেঁটে হওয়ার পর বাবা ওদের সবাইকে মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি করে দিল। সব স্কুলই সমান। এই দাম না, এই জমি যে আজ এত বড় হয়েছি, কেন স্কুলে পড়ে জানিস্। একটা টিনের চাল দেওয়া স্কুল। তখনকার দিনে ওর চেয়ে ভাল স্কুল কোথাও ছিল না, তাই। আমি বলে ফেলেছিলাম। ইঃ। বাবা গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গৌতম, বাচ্চু আর বেঁটে স্লেট-বই বগলে নিয়ে পুকুরে ঠেঙা চটি পরে মিশনারিদের স্কুলে যেত। জীবন খারাপ লাগত অন্য জাতকে ওদের আলাদা ভাই বলে পরিচয় দিতে। এর মোরগ।

বেঁটের বুদ্ধি বেশি। ওকে একটু ভাল স্কুলে দেওয়া হোক। বাবা বলল আর মা তাতে শায় দিল। বাবার সঙ্গে বেঁটে ফেল হিন্দু স্কুলে ভর্তি হতে। বাবার ঘটিয়ে বেঁটে ওদের পরীক্ষাতেও পাশ করে গেল। টাকাপয়সা নিয়েই কিচেছিল ওকে একেবারে ভর্তি করে দেবার জন্য। রেজিস্ট্রি খাতায় নাম তোলার সময় করণিকটাকে নাম জিজ্ঞেস করেছিল। কী আশ্চর্য! এরকম কথা কেউ কোনদিনও শুনেছে। বাবা নাকি খরচও দেবে বলেছিল। নাম? ওর নাম তো এখন ঠিক মনে পড়ছে না। ঠিক আছে, আসবার দিনে দিস—বেঁটে, বেঁটে সরকার। কালকে ও এসে ভাল নাম বলে যাবে।

এসব কথা আমি মায়ের মুখ থেকে শুনেছি। মা হেসে হেসে কাকে যেন গল্প করে এই ঘটনাটা বলছিল। এত ভোলা মন ওদের যে নিজের ছেলের ভাল নামটাও বলে থাকে না। মা হেসে গড়িয়ে পড়বার জোগাড়। লজ্জাও করে না মায়ের। ভোলা মন না, ছাই। নিজের ছোটবেলাকার ঘটনাগুলো তো খুব মনে আছে। মায়ের এই এক দোষ। বাবার এত বেশি প্রশংসা করে যে শুনতেও কেমন কেমন খারাপ লাগে। কেন, কাল তো বেঁটেকে জিজ্ঞেস করলেই পারত ওর নামটা: বেঁটেও কি ওর নিজের নামটা ভুলে গিয়েছিল নাকি! জিজ্ঞেস করে বললেই হতো বলাই সরকার। লজ্জাও করে না নিজের ছেলের নাম ভুলে যেতে।

একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরটার মধ্যে। বড়দিটাও মাথার কাছে ঘ-টা তাবে শুয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সবাইকেই পবিত্র দেখা যাচ্ছে। উঠে একবার গেট্টা করলাম জানলাটা বন্ধ করতে। বন্ধ করা গেল না। এসে আবার নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লাম চিঠি ছুড়ে। বড়দির চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। মুখে লালিত্য নেই একেবারে। স্বাস্থ্যও আর আগের মতো নেই। কি বিশ্রী যে দেখাচ্ছে বড়দিকে এখন। গায়ের কাপড়টার নানা জায়গায় ছেঁড়া। শেষবার সন্ধ্য বড়দি এটা পরেই শোয়। মায়েরও বোধহয় এমনি একটা কাপড় আছে। বাবা আগে বড়দিকে কোন বাইরের লোকের সামনে বের হতে দিত না। বাবার ইচ্ছে ছিল বেশ ভাল পাত্রের সঙ্গে বড়দির বিয়ে দেওয়া। পছন্দ অন্য কোন ছেলেকে বড়দি আবার ভালবেসে ফেলে, বাবার তাই জীবন রাগ ছিল। আগে বাবাকে আমরা দৈত্য বলে জানতাম। ছেলেকে ভাল করে দেখবার বাবার অনেকদিনের ইচ্ছে। কলাই-কলাইটা তখনো হয়নি। ওরা হবার পর থেকে বাবা-মার মধ্যে মাঝে মাঝে কলহ হতো। অলক্ষ্মী ঢুকেছে অনার ঘরে। তোমার হাতে পাঁচশ টাকা তুলে দিলেও বলা কিছু নেই। হাজার টাকা তুলে দিলেও কিছু নেই। আমরা কি দোষ বল। এতগুলি ছেলেমেয়ের মুখে ভাত-জল তো দিতে হয় রোজ। তাছাড়া পড়ালা আছে, ওদের পড়াবার মাস্টার আছেন—। ছাড়িয়ে দাও মাস্টার, আমিই পড়াব ওদের। বড়দিও কি করে যেন বাবার মনের খবর টের পেয়ে গেল। তারপর থেকে প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফিরত। বাবাও তখন তার থেকে অলক্ষুণেটাকে বিদায় না দেওয়া পর্যন্ত।

ছোটবেলায় মায়ের মুখে গল্প শুনেছি। মা বলত বাবার গল্প। বাবা আর মা। বিয়ের পর তোদের বাবা একমাস কোর্টে যেতেন না। আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন মুর্শীদাবাদ। তোরা তো তখনো প্লেনে চড়িস নি। তখনকার দিনে ওখানকার সবচেয়ে দামী হোটেলে উঠেছিলাম। তোদের বাবার তো আবার ছোটবেলা থেকে ভাল খাবার খাওয়ার অভ্যেস। এখন অবশ্য—

মায়ের অন্য কোন কথা আমার কানে যেত না। কেন আমরা ভাল থাকব না। কি দোষ করেছি আমরা। কি দোষ করেছে গৌতম-বাচ্চু-কানাই-বলাইরা। কেন ওরা ভাল স্কুলে পড়বে না। বাড়িভাড়া বাবার টাকা চাইলে কেন বাবা দেবে না। সংসারের অন্য খরচা আছে। কিন্তু আমি তার কি জানি। সংসার কি আমি বাড়িয়েছি। আমরা সকলে ভালভাবে মানুষ হতে চাই—আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব বাবার।

বাবা-মা কোথাও গেলে আমাদের নিয়ে যেতে চাইত না। কেবল পরমের ছুটিতে দীঘাপুরা বিয়েতে বাড়ির সবাই গিয়েছিল অনেক আগে। আমি বাড়ির সাথে যেতে পারতাম না। টাস্টিগুলো আমাদের সবাইকে নিয়েও চাইত না। বাবা গৌতম, বাচ্চু, অন্তু-সন্তুদের মেঝিয়ে ট্রাস্টিয়ারকে বেড়াত, এরা তো একদম বাচ্চা। এরা সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। জীবন খারাপ লাগত আমার। বিয়ের দিন দীঘাপুরা ওখানে গিয়েছিলাম। অনেক আত্মীয় এসেছিল আমাদের। আমার চোখ ঘুরছিল ছোটদের ওপর। ওরা সবাই সুন্দর জামাকাপড় পরে দৌড়োদৌড়ি করছে। বাচ্চু, অন্তু-সন্তুর গায়ে গেঞ্জি, প্যান্ট নেই। মা ওখানে যাবার আগে ওদের প্যান্ট-জামা সবই নিয়েছিল। কিন্তু ওদের গায়ে নাকি জামা রাখা অভ্যেস নেই। মা বলে। কেন অভ্যেস নেই। ওরা দেখলাম তিনজনে একসাথে মায়ের পিছু পিছু ঘুরছে। মা মাঝে মাঝে হেগে দিয়ে থাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধরছে। আমার ছেলেগুলি খালি সেদিন বিয়ে বাড়িতে কেঁদেছিল।

সন্তু নন্তুটা জীবন কাঁদে। অফিসের বাড়িতে একটা টেলিফোন ছিল। বাবার দেখেছি দিনে অন্তত দশ-বারোবার কোন করতে হয়। কোন আসেও অনেকবার। আমি সুমিতকে কোন করছিলাম। এমন সময় সন্তু-নন্তুটা একসাথে কেঁদে উঠল। তখন ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের দুজনের মুখে দু টুকরো কাপড় গুঁজে দিই। মা আমাকে জানে, তাই ওদের নিয়ে গেল এ ঘর থেকে।

মা বোধ হয় এতদিনে বুঝতে পেরেছে আমি এত তাড়াতাড়ি চাই না। পরশু জানুয়ারি আমরা সবাই বাড়ি থেকে চিড়িয়াখানায় যাই। এতদিন আমিও যেতি। একদম ভাল লাগত না যেতে। গাড়ি থেকে এক এক করে একগাদা ছেলেপিলে নামা আমার কেন জানি না পছন্দ হয় না। জীবন অস্বস্তি লাগে। বাবা বুঝতে চাইত না। —কেন যাবি না বল। না যাবার কি আছে? আমি জব না। তোর বাবা এত করে বলছেন, আর তুই যাবি না। বললাম তো, যাব না। আমার ইচ্ছে আমি যাব না।

বাড়িতে কারুর আসা বন্ধ পছন্দ করে না। কেন কারুর নেই। একবার বাবার এক সহকর্মীর স্ত্রী ওপরে উঠে এসেছিলেন। শোবার ঘরে। আমি জীবন রেগে গিয়েছিল। আর একবার, বাবা নিচে বসে আছে। কথা বলছে সহকর্মীদের সাথে। মা বোধহয় কোন কাজে ব্যস্ত ছিল। বেঁটে, কানাই, অন্তু, সন্তু নিচে নেমে গিয়েছিল। বাবা তখুনি ওপরে উঠে এসেছিল। তোমার ছেলেদের তুমি সামলাতে পার না, ওরা নিচে নেমে গেল কি করে? মা না থাকলে বাবা বোধহয় ওদের খুন করে ফেলত। আমার তাই মনে হয়েছিল। বাবা না থাকলে দেখেছি ওরা চারজনেই রাস্তায় বেরিয়ে যায়। তারপর রাস্তাতেই দৌড়াদৌড় করে। সকলের গায়ে একটা করে কাপড়। আর কী জীবন নোংরা জিনিস ভালবাসে ওরা।

পরিষ্কার জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ার সুমিতের খুবতুতো ভাইবোনরা। সুমিতের বাড়ি অনেকবার গেছি। সুমিত আমার কলেজের বন্ধু। টুলুদা আর

নাচনকে ডাকলেই কেমন কাছে আসে। সুন্দর কথা বলে। অন্তু-সন্তুদের ডাকলে আসে না। মায়ের সাথে সাথে ঘোরে। এইজন্যে আমার বন্ধুদের আমি বাড়িতে নিয়ে আসি না।

সুমিতরা দু ভাই দু বোন। অরুণ বাবার এক ছেলে। চঞ্চলরা এক ভাই দু বোন। চঞ্চল ভাই ভাইকোটায় বেশ আদর পায়। বড়দি আমাদের কপালে ফোঁটা দিয়ে থালি এক থালা মিষ্টি তুলে দেয়। —বড়দি, এবার ছাড়ছি না, তুমি যেখান থেকে পার টাকা যোগাড় করে আমাদের ভাল করে খাওয়াও আজ রাত্রে। মা শুনলেন। আড়ালে একবার হাসলেন। ছোরা ক'ভাই শুনে নেও তো, অত কি করে অতজনকে খাওয়াবে? তা ঠিক। আমরা বারো ভাই। কম নয়। আমাদেরই উচিৎ বড়দিকে কিছু দেওয়া। বড়দি আমাদের খুব ভালবাসে। আমরাই বা কোথা থেকে দিই। আমরা বারো জনে মিলে বাবার কাছে হাত পাতলে বাবা আমাদের ভীষণভাবে বকে দেবে। বড়দি, থাক তোমাকে কিছু খাওয়াতে হবে না।

মঙ্গলবার আমাদের ক্লাস একটা চল্লিশে ছুটি হয়। সেদিনও হয়েছিল। অন্যদিন কেউ ক্যান্টিনে যেতাম, কেউ বাড়ি চলে আসতাম। সেদিন সবাই একসাথে থেকে গেলাম। ক্লাসেই। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। সুমিত, অরুণ, চঞ্চল, অনিল আর আমি। ইউনিয়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমাদের সকলের ইচ্ছে সুমিত ক্লাস রিপ্রেজেনটেটিভ হোক। না-না, বিনয় তুমি দাঁড়াও। আমরা সবাই তোমাকে ভোট দেব। আমার সি আর হবার একদম ইচ্ছে নেই। সুমিত, তোমারই হওয়া উচিৎ। সি- আর হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে। সবাই সাধ দিয়েছিলো। চঞ্চল পকেট থেকে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান বের করে সবাইকে দিল। আমরা সবাই তা জ্বালিয়ে পাখার নিচে বসে টানতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর অরুণ কথা বলল। —কলেজে এত ছেলে যে কারুর সাথে ভালো করে আলাপ পরিচয়ই হয় না। একসঙ্গে ছেলে নেওয়ার কোন মানে হয় না। সুমিত মুখ থেকে সিগারেট নামাল। তাহলে এরা যাবে কোথায়? হয় আরো কলেজ করা দরকার, নাহলে পপুলেশন চেক করা উচিৎ। অবশ্য প্রাইভেট কলেজে এত ছেলে না নিয়েও উপায় নেই। তা না হলে তো প্রফেসরদের ভাত মারাই পাবেন না। তাদের তো আমাদের পড়িয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু হয় না, তা পড়ে। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু একটা কথা তো ঠিক আমি আমার বাবার মতো লোকের ছেলে পাস না করলে সন্তুদের মতো করে। অরুণ বলল। সুমিত আমাদের মধ্যে একটু চিন্তা করে কথা বলে। —আসলে, আমাদের মতো যে ওরা মানে গরিবরা এদেশ চালাচ্ছে। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরেটারে আছে, নট-প্লেস-ব্যাঙ্কনা এ ও কলেজের ছবি আছে। অরুণ কেরানীদের কথা ভেবে দেখ। কিসে ওরা ছেলেদের ভালো ইস্কুলে আনে, ভিন ভাষা ওদের তো ওদের মতো ছেলে থাকে নেই। ওই ওদের সন্তোষেই এত সন্তানের আধিক্য। আমার মাথায় যে কেন একটা পাখার ঢুকিয়ে দিয়েছে কোন কথা বলতে পারছি না। উত্তর প্রত্যুত্তর করতে ওখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। এরপর এই আলোচনা কখন শেষ হবে? আর যে পারছি না বসে থাকতে।

সেদিন ওখান থেকে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমি চলে আসতাম, সুমিত আসতে দিল না। ওর সঙ্গে ক্যান্টিনে গিয়ে বসলাম। অনেক কথা হল। বুঝতে পারলাম, সুমিত আমার সাথে ভালভাবে আলাপ করতে চায়। ক্যান্টিন থেকে মাঠে এলাম। সুমিত আর আমি সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সুমিত হঠাৎ কথা বলল —তোমরা ক' ভাইবোন? চমকে উঠলাম সুমিতের প্রশ্নে। বিরক্ত হলাম। দুভাই এক বোন। আমি ছোট। কেন বললাম, কেন ঐ মিথ্যে কথাটা বললাম। আমার মুখ কি লাল হয়ে গিয়েছিল। সুমিত কি বুঝতে পেরেছিল, আমি ওকে মিথ্যে বলেছি। বলেই তো পারতাম আমরা তিন ভাইবোন কেন কথাটা আটকে গেল।

আর সেইদিন থেকে আমার মনটা কিরকম এই একটা কথা চিন্তা করত। তিন ভাইবোন। কেন কথাটা আটকে গেল। এবং তখন থেকে গৌতম-বাচ্চু অন্তু-সন্তু-নন্তু এরা সবাই আমার কাছাকাছি উত্তেজনায় সৃষ্টি

একটি অন্ধ মেয়ের প্রার্থনা অনুভব করুন

চির-অন্ধকারের জগতে আমার বাস—হে প্রভু, আমার প্রণতি গ্রহণ করো তুমি।

জানিনা, আমার কথা তোমার কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা—আমার যে অনেক কথাই বলার ছিল তোমাকে।

বলতে পারো হাসি কেমন? একি শুধু সেই শব্দ যা আমার কানে আসে অথচ চোখে ধরা পড়ে না।

পাখির কল-কাকলি আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু কেমন দেখতে তারা বলতে পারো? আর বলেই বা লাভ কি, বুঝতে তো আমি পারবো না।

জানো, সেই দশজন অন্ধলোক আর হাতির গল্প আমিও শুনেছি। গল্প শুনে যেমন হেসেছি, তেমনি কেঁদেছিও। কারণ আমি নিজেও যে জানিনা হাতি কেমন··· ফুল কেমন দেখতে··· রামধনুর রঙ কেমন··· আমার মা কেমন দেখতে···

প্রভু, আমাকে ঘিরে আমার মায়ের অনেক স্বপ্ন! তাঁর মুখেই শুনেছি জগতে এমন লোকও নাকি আছেন যাঁরা মৃত্যুর পর তাঁদের চোখ দুটি দান করে যান আমার মতো হতভাগীর জন্যে, যাতে তাঁদের চোখ দিয়েই আমাদের ঘটে মুক্তি-অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ।

এও কি সম্ভব প্রভু! এমন লোক সত্যিই কি আছেন? আছে কি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান! আমার জন্যে চোখ দুটি দান করে যাবেন—এমন মহৎপ্রাণ সত্যিই আছেন এই পৃথিবীতে?

বলো প্রভু—একবার বলো!

ইণ্টারন্যাশনাল আই ব্যাঙ্ক, কলিকাতা

৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন ঃ ২৩-৮৫৪১

হয়েছে। ভুলের মাশুল। বড়দাকে মাঝে মাঝে পরিত্ত মনে হয়। বড়দা নিশ্চয় ভাবে যে এক নববিবাহিত বর-বধূর গভীর ভালবাসার সৃষ্টি সে। মেজদাও তাই। অন্য দাদারাও। বড়দিও। আর আমি। আমি কি? আমাদের পেয়ে কি বাবা-মা সুখী হয়েছেন? ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের সকলের আছে। আজ যদি গৌতম-বাচ্চুরা না থাকত, আমরা নিশ্চয় তাহলে ভালভাবে থাকতাম। আজ এই বাড়িতে উঠে আসতে হতো না। কেন ওরা হলো। ওরা আমাদের অধিকারে ভাগ বসাতে এসেছে। আমাদের ভালবাসার অংশীদার হতে এসেছে। কেন-কেন ওরা এসেছে। কিন্তু এদের দোষ কি। আরেকজন—আরেকজন তো আসছে। মাকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

সুমিত একদিন এসেছিল আমাদের বাড়ি। সুমিতের ঠিক মনে আছে আমরা তিন ভাইবোন। ওকে নিচে বসিয়ে জলখাবারের জন্য মাকে বলতে ওপরে এলাম। কে এসেছে? আমার কলেজের বন্ধু সুমিত। মা গৌতমকে পাঠিয়ে দিল মিষ্টি আনতে। আর আমি নিচে এলাম। সুমিতের পাশে বসলাম। এমন সময় দেখি সুমিত মিষ্টি হেসে কাকে যেন ডাকছে—শোন, শোন। দেখি, দরজার কাছে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার ভাইরা। আমাকে দেখেই সরে গেল দরজার আড়ালে। কে রে এরা? সুমিত প্রশ্ন করল। উত্তরটা নিয়ে তৈরিই ছিলাম। পাশের বস্তিতে থাকে এরা। আমাদের উঠোনে খেলাধুলো করে। ভুল করে বলে ফেলি নি এরা আমার ভাই। নোংরা জামাকাপড় পরা চারটে কাচ্চাকাচ্চা বয়সের ছেলে। চারজনেরই মাথায় চিরুনি পড়েনি, গায়ে তেল মাখে না, সাবান মাখে না, সারা গা ভর্তি ময়লা।

আরেকজন, আরেকজন আসছে সংসারে। আমাদের সংখ্যা হবে চোদ্দ। আরেকটা শিশু জন্মাবে এ বাড়িতে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব। প্রায় পাগল হবার মতো অবস্থা আমার। বাড়িতে থাকি না। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। বন্ধুদের বাড়িতে গল্প করি। দেখে একদিন সব ঠিক করে ফেললাম। মনটাকে শক্ত করলাম। এছাড়া কোন উপায় নেই। সরবে প্রতিবাদ জানালে সম্ভব নয়। তাই নীরবে— নীরবে আমি অবজ্ঞা দেখাব আমার বাবার আগামী সন্তানকে।

হাসপাতালে সবাই গিয়েছিল। দাদারা, বড়দি, গৌতম, বাচ্চু, বলাই-কলাই, অন্তু-সন্তু-বন্তু সবাই। বাবা তো দিনের বেশির ভাগ সময় ওখানে কাটাত। খালি আমি যাইনি মাকে দেখতে। মাকে আর ছোট্ট বোনটাকে দেখতে। মামা-মামীমারাও গিয়েছিল। আর সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার ব্যবহারে। মিনুটা এল না কেন। একবার অন্তত ওর আসা উচিৎ ছিল। মায়ের অবস্থা এবার খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আমি যাইনি। মিনু, আজ বিকেলে তুমি তোমার মাকে একবার দেখতে যাবে। তোমার মা আজ বারবার তোমার কথা বলছিলেন। —না, যাব না। মনের ভেতর থেকে কে যেন বেতে বলছে বারবার। কিন্তু না, আমি যাব না। আমি কিছুতেই যাব না ওকে দেখতে। হলোই বা এতজন ভাইয়ের পর ছোট্ট একটা বোন। চিরকাল আমার অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকবে সে। একে চিরটাকাল ঘৃণাতে হবে আমার অভিশাপ। একে আমি কোন মতেই ক্ষমা করব না।

মা ফিরে এলেন হাসপাতাল থেকে। পুতুলকে আমি একদিনও দেখতে যাইনি। বড়দির দেওয়া নাম পুতুল। দেখতে নাকি ঠিক জলপুতুলের মতো টুলটুকে। সোনালী চুল মাথায়। চোখ দুটো বড় বড়, উজ্জ্বল। ছোট্ট একটা নাক। তুলোর মত নরম শরীর। বাবার স্ত্রীরূপ অবতারের পুতুল। পুতুলের জন্য বাবা দোকান থেকে নতুন সাদা ধবধবে ফ্রক কিনে নিয়ে এসেছেন। অন্তু-সন্তুরা সবাই আমাদের ছোটবেলাকার পুরনো জামা পরে এসেছে। গৌতম বাচ্চু কলাই বলাই এরা সবাই চারপাশে ঝুঁকে পড়ে পুতুলকে দেখে। অবাক হয়ে যায় বোধহয়। ঐ রকম ছোট্ট একটা মানুষকে দেখে।

ও হওয়ার পর চার মাস কেটে গেছে : আমি তখনো ওকে দেখি নি। মা ওকে যে ঘরে রাখে, আমি সে ঘরে ঢুকি না। দাদারা সবাই ওকে কোলে তুলে আদর করেছে। বড়দি তো সব সময় ওকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর জামা সেলাই করছে, জাঁথা সেলাই করছে, বাজার থেকে কুমকুমি কিনে আনছে। পুতুল আমাদের সংসারে অনেকদিন পর যেন একটা নতুন আনন্দ। ছ বছরের অন্তুটা ওর পুরনো সাদা কেডসটাকে আলতা দিয়ে ভিজিয়ে লাল টুকটুকে করে পুতুলের মুটো করা ছোট্ট দুটো হাতে তুলে দিয়েছে। সন্তু রাগ করে। পুতুল কেন তার সাথে খুব ভাব করবে না। আর সবাই বোধ হয় অবাক হয়ে যায়। আমি এখনো না দেখে আছি কি করে। কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অটল। পুতুলের মুখ আমি দেখব না।

মা অভিযোগ করল। —হ্যাঁরে মিনু, তুই পুতুলকে একদিনও কোলে নিস্ নি কেন রে। ওর ওপর তুই রাগ করেছিস? মায়ের প্রশ্নে আমার চোখে প্রায় জল চলে এসেছিল। কিন্তু না। দুর্বল হলে চলবে না। জানাতেই হবে মাকে। —আমি বেশি ছেলেমেয়ে ভালবাসি না। মা একরকম চাঁদের মতো করুণ করে হাসলেন। —তাই তুই ওর ওপর রাগ করেছিস। —হ্যাঁ। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কথাটা বাবার কানে পৌঁছল। মিনু, এ কথাটা নিশ্চয় তোমার অজানা নয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার ত্রয়োদশতম সন্তান। তিনি কি মানুষ হন নি, না বড় হন নি? মুখে একটা উত্তর এসেছিল, কিন্তু বলতে পারিনি; বাবা, ভুলে যেও না, তাঁরা সবাই কপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার মুখে এত বড় কথাটা শোভা পায় না। বাবা নিশ্চয় তাঁকে আঘাত পাবে।

বড়দি এখন একটা আলাদা ছোট ঘরে শোয়। দাদারা একটা ঘরে। বাবা মা অন্তু আর পুতুল একটা ঘরে। আর আমি গৌতম, বাচ্চু বৈচি, কলাই, বন্তু, সন্তু একটা ঘরে। ওদের পাশে শুয়ে আমার ঘুম আসত না। অনেক রাতে ঘুম থেকে উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতাম। এই অসংখ্য নিষ্পাপগুলোর ভবিষ্যৎ। কর্পোরেশন স্কুলে যারা শিক্ষা পাচ্ছে। গৌতমরা কোনদিন মানুষ হবে না। ওরা সংসারের আবর্জনার মতো সমাজের একধারে পড়ে থাকবে। দেশের বেকার সমস্যা জটিলতর করতে থাকবে। পুতুল—পুতুল এদের অনেক দূর। না, ওকে কিছুতেই ক্ষমা করা চলে না। কোনমতেই ওকে ক্ষমা করা চলে না।

সেই রবিবারটার কথা। আমি ভুলব না। বোধহয় ছাব্বিশের রবিবার। অন্যান্য রবিবারের মতো সেদিনও আমাদের খেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া দাওয়ার পর বড়দা বাড়ির সবাইকে নিয়ে গিয়েছিল আমার বাড়িতে। আমি যাই নি। আমি বাড়ির কারুর সাথে কোথাও যেতাম না। সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। বাবা-মা খেতে বসেছেন নিচে। আমি ছাদে পায়চারি করছি। ঠিক এমনি সময় একটা কান্নার শব্দ শুনলাম। পুতুল—পুতুল কাঁদছে। মা ওকে খাটে ঘুম পাড়িয়ে নিচে খেতে বসেছে। পুতুলের ঘুম ভেঙে গেছে। এতজনের কাউকে কাছে না পাওয়ার ও বোধ হয় অভিমানে কেঁদে উঠল এইমাত্র। কাঁদুক, পুতুল কাঁদছে। দেখে আসি। পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম পুতুলকে। ও খাটের মাঝখানে বসে আছে। কেমন করে জানি না ও আমার পায়ের শব্দ টের পেয়েছে। কান্না থামিয়ে ও চোখ মেলে চাইল চারদিকে। কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার কান্না শুরু করে দিল। নিচে নেমে এলাম। ভাবলাম মাকে বলব, কিন্তু না, সেই প্রতিজ্ঞাটা আমার মনের টুঁটি টিপে ধরে আছে। মাকে কিছু বললাম না। নিচ থেকে কান্নার শব্দ একটুও শোনা যাচ্ছে না। কী করে? কী করতে পারি এখন? না-না, কোনমতেই ওর নাম মুখে আনব না, ওর কথা বলব না। মাকে কি করে বলি—মা, পুতুল উঠেছে। কাঁদছে। অসম্ভব। আমি পারব না। কোনমতেই পারব না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে দাঁড়ালাম দরজার কাছে। প্রথমে সাবা শরীরে কিছু কিছু ঘাম। সামনে শুয়ে দেখলাম সেই ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুটা খাটের একেবারে ধারে এসে মুহূর্তের জন্য কান্না থামিয়ে হাত দুটি ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। না। কিছুতেই না। এক লাফে নিচে চলে এলাম। আর ঠিক এমনি সময় ভারী কি যেন একটা পড়ার শব্দ হল ওপরে। তারপর সব চুপ।

পুতুল। পুতুলকে আমি দেখি নি। পুতুল আমারই কাছে অপরিচিত হয়ে রইল।

আজও অনেক রহস্য

চিরজীব সেন ১২·০০

পৃথিবীতে এখনও অনেক অজানা রহস্য আছে যা বিজ্ঞানের যুগেও উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। লেখক সেই রহস্য একটার পর একটা বর্ণনা করেছেন।

জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ

ডঃ তারকনাথ ঘোষ ২৫·০০

এই গ্রন্থে লেখক কথাশিল্পীর জীবন আলেখ্য, ছোট গল্প, উপন্যাস তাঁর অনুকাশিত দিনলিপি সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

জ্যোতিষে গ্রহরত্ন

প্রীতাঙ্কর ৮·০০

ভারতীয় ও পাশ্চাত্যমতে গ্রহরত্নের কথা এবং ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিরুদ্ধগ্রহ প্রতিকারের অন্যান্য ব্যবস্থার কথাও এই পুস্তকে বলা হয়েছে।

ফুটপাতের বাসিন্দা

অসীম মুখোপাধ্যায় ১০·০০

কলকাতার ফুটপাতের বাসিন্দারা যারা বিভিন্ন ধোঁকেবাজীর শিকার হয়েছেন। মানুষ হয়েও জন্মে যারা কুকুর বিড়ালের মত জীবন যাপন করছে তাদের কাহিনী সুন্দরভাবে লেখক আলোচনা করেছেন।

জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি

আজোকময় দত্ত

মন মাতানো শিকার কাহিনী যা পড়তে পড়তে আপনাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাবে তারপর শিহরীত হয়ে উঠতে হবে। ১২·০০

সতীদাহ

দোরাচাঁদ মিত্র

এক অদ্ভুত অপার্থিব সুখ ভোগের আশায় ভারতীয় হিন্দুনারীরা কিভাবে শিকার হয়েছেন পৃথিবীর নৃশংসতম প্রথার—বহুতথ্য এবং বহু দুষ্প্রাপ্য দলিল এই গ্রন্থের আকর্ষণ। ২০·০০

আনন্দধারা

৭৯।১ বি মহাত্মাগান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

Growing range of Gen-Set for the growing need of industry

Kirloskar

DIESEL GENERATING SET

A CLASS BY ITSELF

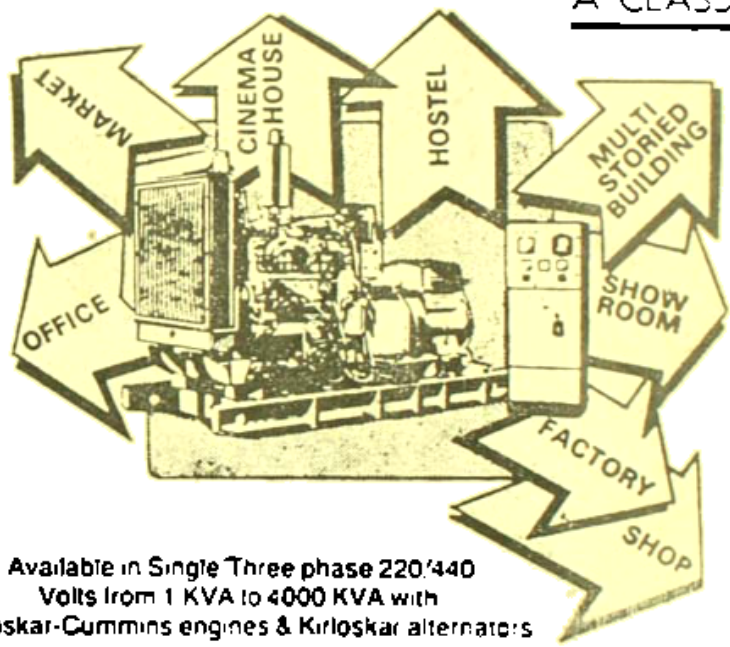

Available in Single Three phase 220/440 Volts from 1 KVA to 4000 KVA with Kirloskar-Cummins engines & Kirloskar alternators

Contact Authorised DEALERS

VINEET ELECTRICAL INDUSTRIES (P) LTD.

Authorised Selling House of Kirloskar

সুতি ও লিনেন, ছাপা শাড়ী, ধুতি,
পলিয়েস্টার সাটিং ও শার্টিং, রেডিমেড পোষাক ও
গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি

তন্তুজ
বাংলার তাঁতের কাপড়
দি এমপ্লয়িজ কোঅপারেটিভ স্টোর্স (১৯৪৮) ওয়েস্টবেঙ্গল কো-অপারেটিভ সেলসম্যান্স সোসাইটি লিমিটেড
৪৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

ABC/T-27285